শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা

৪৩শ বর্ষ } অগ্রহায়ণ, ১৩৯৮ { ১০ম সংখ্যা

শ্রীগোলোকগঞ্জ গৌড়ীয় মঠে সেবিত
শ্রীশ্রীগৌর-রাধা-বিনোদবিহারীজীউ

সম্পাদক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত ত্রিবিক্রম মহারাজ
উপ-সম্পাদক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবেদান্ত পর্য্যটক মহারাজ
কার্য্যালয়ঃ— ফোন : ৩৩-৮৯৭৩
শ্রীবিনোদবিহারী গৌড়ীয় মঠ, [redacted]
২৮, হালদার বাগান লেন ; কলিকাতা-৭০০০০৪

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির মুখপত্র

শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকার

প্রতিষ্ঠাতা—নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ

পরমহংসস্বামী ১০৮ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজ

সভাপতি-অধ্যক্ষ—পরিব্রাজকাচার্য্য

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত বামন গোস্বামী মহারাজ

—(*)—

সম্পাদক-সঙ্ঘপতি—

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত নারায়ণ মহারাজ

সহকারী সম্পাদক-সঙ্ঘ—

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবেদান্ত ঊর্দ্ধমন্থী মহারাজ

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবেদান্ত বিষ্ণু মহারাজ

পণ্ডিত শ্রীযুক্ত সুদর্শন দাসাধিকারী, বি. এ, বি. টি., কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ

পণ্ডিত শ্রীযুত রসিকরঞ্জন দাসাধিকারী, বি. এ.

পণ্ডিত শ্রীযুত কৃষ্ণকৃপা ব্রহ্মচারী, ভক্তসেবক, ব্যাকরণতীর্থ

পণ্ডিত শ্রীযুত জিতকৃষ্ণ দাসাধিকারী, ভক্তিভূষণ

পণ্ডিত শ্রীযুত চৈতন্যকৃষ্ণ দাসাধিকারী, কবিভূষণ

—(*)—

প্রচার-সম্পাদক—

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবেদান্ত হরিজন মহারাজ
ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবেদান্ত ত্রিদণ্ডী মহারাজ

কার্য্যাধ্যক্ষ—

শ্রীসত্যানন্দ দাস ব্রহ্মচারী

(ত্রিদণ্ডিস্বামী) শ্রীভক্তিবেদান্ত আচার্য্য (মহারাজ)-কর্তৃক শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠ, তেঘরিপাড়া, পোঃ নবদ্বীপ (নদীয়া) হইতে প্রকাশিত ও নবদ্বীপস্থ শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা প্রেস হইতে তৎকর্ত্তৃক মুদ্রিত।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির মুখপত্র

শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা

(মাসিক)

ত্রিচত্বারিংশ-বর্ষ (১ম-১২শ সংখ্যা)

(শ্রীগৌরাব্দ ৫০৫ বিষ্ণু হইতে ৫০৫ মাধব,
বঙ্গাব্দ ১৩৯৭ ফাল্গুন হইতে ১৩৯৮ মাঘ,
খৃষ্টাব্দ ১৯৯১ মার্চ্চ হইতে ১৯৯২ ফেব্রুয়ারী।)

প্রতিষ্ঠাতা-নিয়ামক—

পরমহংসস্বামী শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজ

সভাপতি-আচার্য্য—

ত্রিদণ্ডিস্বামী ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত বামন গোস্বামী মহারাজ

সম্পাদক—

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত ত্রিবিক্রম মহারাজ

প্রকাশক—

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত আচার্য্য মহারাজ

শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠ, পোঃ নবদ্বীপ (নদীয়া) পঃ বঃ।

শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকার

আজীবন সদস্যগণের তালিকা

১। শ্রীসুধীরকৃষ্ণ দাসাধিকারী, ২৭, মায়াদাসী রোড, বেহালা, কলিকাতা-৬০।

২। শ্রীবিনোদবিহারী পুরকায়স্থ, পোলো হিল্‌স্, শিলং-১ (মেঘালয়)।

৩। শ্রীমতী সুমিত্রা দেবী, c/o শ্রীনরহরি দাসাধিকারী, বলরাম ঠাকুরবাড়ী, ঠাকুরগলি, চুঁচুড়া (হুগলী)।

৪। শ্রীঅশোক কুমার পুরকাইত, উত্তর হাজীপুর, পোঃ ডায়মণ্ডহারবার (দক্ষিণ ২৪ পরগণা)।

৫। শ্রীরসিকশেখর দাসাধিকারী, গ্রাঃ+পোঃ দ্বারিবেড়িয়া (মেদিনীপুর)।

৬। শ্রীরসিকরঞ্জন দাসাধিকারী, ইমামবারা রোড, দঙ্গলপাড়া, ডুমকা (বিহার)।

৭। শ্রীগৌরগোবিন্দ ব্রহ্মচারী, c/o শ্রীগৌরগোবিন্দ ভজন আশ্রম, গ্রাঃ+পোঃ—পুঁড়া (উত্তর ২৪ পরগণা)।

৮। শ্রীচৈতন্যকৃষ্ণ দাসাধিকারী, বড় বহরকুলি, পোঃ বাদলা (বর্দ্ধমান)।

বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকার গ্রাহকগণকে জানানো হইতেছে যে, শ্রীপত্রিকায় আজীবন সদস্য গ্রহণ করা হইতেছে। যাঁহারা আজীবন সদস্য হইতে ইচ্ছুক তাঁহারা ১০০১৲ (এক হাজার এক) টাকা এককালীন বা এক বৎসরে চারিটী সমান কিস্তিতে দিয়া সদস্য হইতে পারেন। এ ব্যাপারে কার্য্যাধ্যক্ষের সহিত যোগাযোগ করুন।

বিনীত নিবেদক—

কার্য্যাধ্যক্ষ,

শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা

ত্রিচত্বারিংশ-বর্ষ শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকার

প্রবন্ধাদির সূচীপত্র

প্রবন্ধের নাম	সংখ্যা ও পত্রাঙ্ক
অপবর্গের স্বরূপ ও তল্লাভোপায়	১|২৫
অবতার ও বঞ্চক	৩|৯৮
অপরাধ-ভঞ্জনের পাট ও শ্রীদেবানন্দ পণ্ডিত	৯|৩৫১
আত্মঘাতী কে ?	৩|১০৫
আনুগত্য ও স্বতন্ত্রতা	৪|১৪১
আত্মধর্ম্ম বা সনাতন ধর্ম্মের বৈশিষ্ট্য	৭|২৫৩
আত্মরক্ষা [কবিতা]	১২|৪৭০
আমি 'এই' নই, আমি 'সেই' [শ্রীল সরস্বতী ঠাকুর]	৮|২৮৭
আমরা কাহার কিঙ্কর ?	১০|৩৭২
ইহলোক [শ্রীল সরস্বতী ঠাকুর]	৪|১২৭
উত্তমা ভক্তি [শ্রীল ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব]	৯|৩৩১
এক জাতি [শ্রীল সরস্বতী ঠাকুর]	৩|৮৯
একালের চৈতন্যের আলোকে অলোক-চৈতন্য-বিগ্রহ শ্রীমন্মহাপ্রভু	৬|২১৬
কমিনা [শ্রীল স্বরস্বতী ঠাকুর]	২|৫১
কমিউনিজম্ ও বৈদিক সাম্যবাদ	৮|২৯৯, ৯|৩৩৬
কার্ত্তিক-ব্রত-মাহাত্ম্যম্—শ্রী	৭|২৪১
কার্ত্তিকব্রতে বিধিনিষেধাঃ—শ্রী	৮|২৮১
কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ	৪|১৫২
কৃষ্ণচৈতন্য গৌরহরি—শ্রী	৮|৩০৬
কৃষ্ণ-স্তোত্রম্—শ্রী	৯|৩২১
কৃষ্ণ-নামাষ্টকম্—শ্রীশ্রী	১০|৩৬১
কেশবজী গৌড়ীয় মঠে শ্রীঝুলনযাত্রা-শ্রীজন্মাষ্টমী ও শ্রীশ্রীরাধাষ্টমী-মহোৎসব—শ্রী [বিবরণ]	৯|৩৫৫

প্রবন্ধের নাম **সংখ্যা ও পত্রাঙ্ক**

গুরু-মহারাজের বক্তৃতা—শ্রীল [ব্যাসপূজোপলক্ষে ধুবড়ীতে প্রদত্ত] ১।৩২, ৩।১১৩, ৪।১৪৬, ৫।১৮০, ৬।২২৫
গুরু-চরণে বিজ্ঞপ্তি—শ্রী [কবিতা] ৩।১০০
গুরু-চরণে নিবেদন—শ্রী [কবিতা] ৫।১৭১
গুরুপাদপদ্মে দীনার প্রার্থনা —শ্রী [কবিতা] ৭।২৬৭
গুরু-মহারাজের বক্তৃতা—শ্রীল [শ্রীকৃষ্ণ-জন্মাষ্টমী উপলক্ষে শ্রীমেঘালয় গৌড়ীয় মঠে প্রদত্ত] ৭।২৬৮, ৮।৩০৭, ৯।৩৪৫, ১০।৩৮৪
গুরুদেবের শ্রীপাদপদ্মে আত্মসমর্পণ ও সকাতর প্রার্থনা—শ্রীশ্রী [কবিতা] ১০।৩৮২
গুরু-তত্ত্ব—শ্রী ১০।৩৮৮
গুরুদেবের শ্রীচরণে প্রার্থনা [কবিতা] ১১।৪১৫
"গুরুষু নরমতির্যস্য বা নারকী সঃ" ১১।৪১৭
গুরু-মহারাজের বক্তৃতা—শ্রীল [শ্রীল ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামীর বিরহ-মহোৎসবে প্রদত্ত] ১১।৪২৩, ১২।৪৫৬
গুরুপূজা-মহোৎসব—শ্রীশ্রী ১১।৪৩৮
গোবিন্দাচ্যুত-মাধব-স্তোত্রম্—শ্রীশ্রী ৩।৮১
চাতুর্মাস্য-ব্রতম্ ৫।১৬১
চাতুর্মাস্য [শ্রীল সরস্বতী ঠাকুর] ৬।২০৭
চৈতন্যদেব ও শ্রীহরিনাম—শ্রী ১।১৮, ২।৫৭
চৈতন্যে মর্ত্ত্যবুদ্ধি—নাস্তিকতা ও অপরাধ—শ্রী [প্রতিবাদ] ২।৭৩, ৩।১১৭, ৪।১৫৪, ৫।১৯০, ৬।২৩৩, ৭।২৭৪, ৮।৩১৮, ৯।৩৫৭, ১০।৩৯৫, ১১।৪৩৫, ১২।৪৬২
চৈতন্যদেবের বৈশিষ্ট্য—শ্রী [বিজ্ঞাপন] ১০।৩৮১
জন্মাষ্টমী-ব্রতে শ্রীশ্রীকৃষ্ণপূজা-মাহাত্ম্যম্—শ্রী ১।১
জগন্নাথদেবের রথযাত্রা মহোৎসবে আহ্বান—শ্রীশ্রী [নিমন্ত্রণ-পত্র] ৪।১৫৯
জন্মাষ্টমী-ব্রত-কৃত্যম্—শ্রীশ্রী ৬।২০১
জীবের নিত্যকল্যাণ লাভের উপায় কি ? ২।৬৪
জীবের স্বরূপ হয় কৃষ্ণের নিত্যদাস ৩।১০৯, ৪।১৩৬
জীব-সেবা ও জীবে দয়া [শ্রীল ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব] ৬।২১২
ঝুলনযাত্রা ও শ্রীজন্মাষ্টমী উপলক্ষে সাদর আহ্বান [নিমন্ত্রণ-পত্র] ৫।১৯৯

প্রবন্ধের নাম	সংখ্যা ও পত্রাঙ্ক
ঠাকুর সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ—শ্রীল [শ্রীল ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব]	৪।১৩০
ত্যাগী শুদ্ধভক্তের ভিক্ষাবৃত্তি	৮।২৯৩
দর্শন-শাস্ত্র [শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর]	৬।২০৬
দামোদরাষ্টক সম্বন্ধে দুই একটী কথা—শ্রীশ্রী [শ্রীল ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব]	৮।২৯০
দামবন্ধন-লীলার তাৎপর্য্য [কবিতা]	৮।৩১৪, ৯।৩৪১
দীনের শ্রদ্ধাঞ্জলি [কবিতা শ্রীল ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামীর আবির্ভাব-তিথিতে]	২।৬২
দেবগণকৃতম্ শ্রীরামচন্দ্র-স্তোত্রম্—শ্রী	২।৪১
নবদ্বীপধাম-পরিক্রমা ও শ্রীগৌরজন্ম-মহোৎসব—শ্রী [বিবরণ]	২।৭৯
নবদ্বীপধাম-পরিক্রমা ও শ্রীগৌরজন্ম-মহোৎসব—শ্রী [নিমন্ত্রণ-পত্র]	১২।৪৭১
নাম ও নামাপরাধ—শ্রী	৩।১০২
নাম-মুখে বৈষ্ণব	৭।২৬৫
নিত্যানন্দাষ্টকম্—শ্রীশ্রী	১১।৪০১
পরমপ্রিয়ের সন্ধানে	৪।১৪৩
পরলোক [শ্রীল সরস্বতী ঠাকুর]	৫।১৬৭
পাষণ্ডী কে ?	১২।৪৬৭
পুরুষোত্তম-মাস-মাহাত্ম্য—শ্রী [শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর]	২।৪৩
পুরুষোত্তম-মাস-কৃত্য—শ্রী [শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর]	৩।৮৪
প্রয়োজন-তত্ত্ব	১।২৯, ২।৬৫
প্রশ্নোত্তর [শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর]	৭।২৪৪, ৮।২৮৩, ৯।৩২৩, ১০।৩৬৩, ১১।৪০৪, ১২।৪৪৪
বস্তু আলোচনা [শ্রীল ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব]	১।১০
বর্ষ-প্রবেশ	১।৩৭
বর্ত্তমান সমাজ ও নিরাকারবাদ (শ্রীল ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব)	২।৫৪
বস্তু-বিচারে বৈষ্ণব ও অবৈষ্ণব (শ্রীল ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব)	৭।২৫১
'বড় আমি' ও 'ভাল আমি' (শ্রীল সরস্বতী ঠাকুর)	১১।৪০৮
বাসুদেব গৌড়ীয় মঠে শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের রথযাত্রা-মহোৎসব—শ্রী (বিবরণ)	৬।২৩৭

প্রবন্ধের নাম — সংখ্যা ও পত্রাঙ্ক

বাস্তব বস্তু (শ্রীল সরস্বতী প্রভুপাদ) ১২।৪৪৭
বাঁশী যদি নাহি বাজে (কবিতা) ৫।১৭৫
বিষয়ীর কৃষ্ণপ্রেম (শ্রীল সরস্বতী ঠাকুর) ৭।২৪৮
বিরহ-বেদনা (শ্রীল কেশব গোস্বামীর বিরহ-তিথিতে) ৮।৩০৪
বিরহ-স্মৃতি (শ্রীল প্রভুপাদের আবির্ভাব-বাসরে)
শ্রীল ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব ১১।৪১২, ১২।৪৪৯
বৃন্দাবনাষ্টকম্—শ্রীশ্রী ১২।৪৪১
বেদান্ত দর্শন (শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর) ১।৩
বৈষ্ণব-সেবা (শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর) ৫।১৬৪
বৈষ্ণব-চরণে প্রার্থনা—শ্রী (কবিতা) ৭।২৭৮
ব্যাসপূজা-মহোৎসব—শ্রীশ্রী (নিমন্ত্রণ-পত্র) ১০।৪০০
ব্রহ্ম, পরমাত্ম ও ভগবত্তত্ব ১।১২, ৩।৯৫
ব্রহ্ম—খণ্ডবস্তু (শ্রীল ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব) ৫।১৬৯
ব্রজমণ্ডলে পুরুষোত্তম-ব্রত-পালন—শ্রী (বিবরণ) ৫।১৯৬
ভক্তি-পুষ্পাঞ্জলি (কবিতা) শ্রীল ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী
ঠাকুরের শুভ প্রকট-বাসরে ১।৩৫
ভগবানের দণ্ডই দয়া ২।৬৯
ভগবদনুশীলন (শ্রীল ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব) ৩।৯১
ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজের বিরহ-মহোৎসব – শ্রীমদ্
(নিমন্ত্রণ-পত্র) ৭।২৭৯
ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজের বিরহ-মহোৎসব—শ্রীমদ্
(বিবরণ) ৯।৩৬০
ভাগবত-বিবৃতি (শ্রীল সরস্বতী ঠাকুর) ৯।৩২৭
ভোগবাদ ও ভক্তি (শ্রীল সরস্বতী ঠাকুর) ১০।৩৬৭
ভ্রম-সংশোধন ৯।৩৩০
মহাপ্রভুর আবির্ভাব-তিথিতে মহিমা-মাহাত্ম্য বর্ণন—শ্রীমন্
(কবিতা) ১।১৫
মহামন্ত্র (কবিতা) ৬।২৩৯
"মহাজনো যেন গতঃ সঃ পন্থাঃ" ১০।৩৭৫

প্রবন্ধের নাম	সংখ্যা ও পত্রাঙ্ক
মহামিলনের প্রতীক্ষায়	১১।৪৩২
মায়াবাদী কাহাকে বলি ? (শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর)	৪।১২৩
মানব-জীবনের সার্থকতা কোথায় ?	৫।১৭২
মেঘালয় গৌড়ীয় মঠে শ্রীশ্রীজন্মাষ্টমী-মহোৎসব—শ্রী (বিবরণ)	৮।৩১৬
"যেই জন কৃষ্ণ ভজে সে বড় চতুর"	৫।১৭৬
রথযাত্রায় সগণ শ্রীমন্মহাপ্রভুর মহিমা-কীর্তন—শ্রীশ্রী (কবিতা)	৬।২৪০
লীলাপুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের বিপ্রলম্ভ-লীলা	৫।১৮৭, ৬।২২৩
শক্তি-সঞ্চার (শ্রীল সরস্বতী ঠাকুর)	১।৭
শরণাগতি (কবিতা)	৪।১৪০
শিষ্ট ও অশিষ্টাচার	১।২৩
শিষ্য-বাৎসল্যের নিদর্শন (পত্র)	১০।৩৭১
সংসার-রঙ্গমঞ্চ	৭।২৫৮
সাধুসঙ্গে শ্রীব্রজ ও দ্বারকাধাম-পরিক্রমা	৫।১৯৮
সাধনক্ষেত্রে গুরুবাদ ও অবতারবাদ	১২।৪৫৩
সাধুসঙ্গ ও শ্রীগুরুতত্ত্ব	৭।২৬১
সিদ্ধ-ব্রহ্মর্ষিগণ-কৃতং শ্রীবরাহদেব-স্তোত্রম্	৪।১২১
হিন্দু (শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর)	৬।২০৪
Statement about Shri Goudiya-Patrika	১।৪০

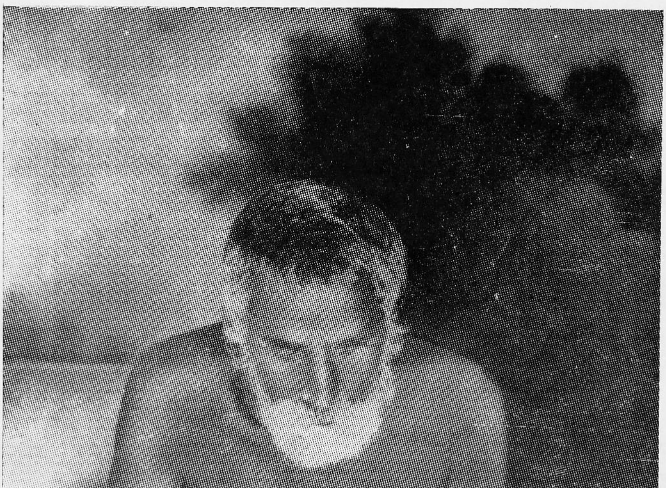

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ গৌরকিশোরদাস বাবাজী মহারাজ

॥ শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ ॥

স বৈ পুংসাং পরো ধর্ম্মো যতো ভক্তিরধোক্ষজে ।

ধর্ম্মঃ স্বনুষ্ঠিতঃ পুংসাং বিষ্বক্সেন-কথাসু যঃ ।

নোৎপাদয়েদ্যদি রতিং শ্রম এব হি কেবলম্ ॥

অহৈতুক্যপ্রতিহতা যয়াত্মা সুপ্রসীদতি ॥

সেই ধর্ম্ম শ্রেষ্ঠ যাতে আত্ম-পরসন্ন ।
অধোক্ষজে অহৈতুকী ভক্তি বিঘ্নশূন্য ॥

অন্য ধর্ম্ম সুষ্ঠুরূপে পালে যেই জন ।
হরি-কথায় রতি নৈলে পণ্ড সেই শ্রম ॥

৪৩শ বর্ষ | ১৫ বিষ্ণু, গর্ভোদশায়ী, ৫০৫ শ্রীগৌরাব্দ
৩০ ফাল্গুন, শুক্রবার, ১৩৯৭, ইং ১৫।৩।৯১ | ১ম সংখ্যা

সানুবাদং

শ্রীজন্মাষ্টমী-ব্রতে শ্রীশ্রীকৃষ্ণপূজা-মাহাত্ম্যম্

অগ্নিরুবাচ,—

[কৃষ্ণপক্ষে ভাদ্রপদে অষ্টম্যাং রোহিণীযুতে ।
উপোষিতোঽর্চ্চয়েৎ কৃষ্ণং ভুক্তি-মুক্তিপ্রদায়কম্ ॥ ৩ ॥
আবাহয়াম্যহং কৃষ্ণং বলভদ্রঞ্চ দেবকীম্ ।
বসুদেবং যশোদাং গাঃ পূজয়ামি নমোঽস্তু তে ॥ ৪ ॥
যোগায় যোগপতয়ে যোগেশায় নমো নমঃ ।
যোগাদিসম্ভবায়ৈব গোবিন্দায় নমো নমঃ ॥ ৫ ॥
স্নানং কৃষ্ণায় দদ্যাৎ তু অর্ঘ্যঞ্চানেন দাপয়েৎ ॥ ৬ ॥]

[অগ্নিদেব বলিলেন,—ভাদ্রমাসের কৃষ্ণপক্ষে অষ্টমীতে রোহিণী নক্ষত্রে উপবাসী থাকিয়া কৃষ্ণের অর্চ্চনা করিলে ভুক্তি-মুক্তি লাভ হয়। আমি কৃষ্ণ,

বলভদ্র, দেবকী, বসুদেব ও যশোদাকে আবাহন ও পূজা করিতেছি ; হে কৃষ্ণ ! তোমাকে নমস্কার। তুমি যোগস্বরূপ, যোগপতি ও যোগেশ, তোমাকে নমস্কার, নমস্কার। তুমি যোগাদিসম্ভব গোবিন্দ, তোমাকে বার বার নমস্কার করি। এই বলিয়া কৃষ্ণকে স্নান করাইয়া, পূজা করিবে ॥ ৩-৬ ॥]

যজ্ঞায় যজ্ঞেশ্বরায় যজ্ঞানাং পতয়ে নমঃ।
যজ্ঞাদিসম্ভবায়ৈব গোবিন্দায় নমো নমঃ ॥ ৭ ॥

তুমি যজ্ঞ, যজ্ঞেশ্বর ও যজ্ঞসকলের পতি। তোমাকে নমস্কার। তুমি যজ্ঞাদিসম্ভব গোবিন্দ, তোমাকে বার বার নমস্কার ॥ ৭ ॥

গৃহাণ দেব পুষ্পাণি সুগন্ধীনি প্রিয়াণি তে।
সর্ব্বকামপ্রদো দেব ভব মে দেববন্দিত ॥ ৮ ॥

হে দেব! তোমার প্রিয় এই সকল সুগন্ধি পুষ্প গ্রহণ কর। হে দেব-বন্দিত আদিদেব! আমার সকল কামনা পূর্ণ কর ॥ ৮ ॥

ধূপধূপিত ধূপং ত্বং ধূপিতৈস্ত্বং গৃহাণ মে।
সুগন্ধ-ধূপগন্ধাঢ্যং কুরু মাং সর্ব্বদা হরে ॥ ৯ ॥

হে ধূপধূপিত! তুমি ধূপস্বরূপ, এই ধূপ গ্রহণ কর। হে সুগন্ধ! হে হরে! আমাকে সর্ব্বদা ধূপগন্ধসম্পন্ন কর ॥ ৯ ॥

দীপদীপ্ত মহাদীপং দীপদীপ্তিদ সর্ব্বদা।
ময়া দত্তং গৃহাণ ত্বং কুরু চোর্দ্ধগতিঞ্চ মাম্ ॥ ১০ ॥

হে দীপদীপ্ত! তুমি মহাদীপস্বরূপ। তুমি সর্ব্বদা দীপদীপ্ত প্রদান কর, তোমাকে নমস্কার। আমার প্রদত্ত এই প্রদীপ গ্রহণ করিয়া আমার উর্দ্ধগতি বিধান কর ॥ ১০ ॥

বিশ্বায় বিশ্বপতয়ে বিশ্বেশায় নমো নমঃ।
বিশ্বাদিসম্ভবায়ৈব গোবিন্দায় নিবেদিতম্ ॥ ১১ ॥

তুমি বিশ্ব, বিশ্বপতি ও বিশ্বেশ্বর, তোমাকে বার বার নমস্কার। তুমি বিশ্বাদিসম্ভব গোবিন্দ, তোমাকে আত্মনিবেদন করিলাম, আমার উদ্ধার কর, উদ্ধার কর ॥ ১১ ॥

ধর্ম্মায় ধর্ম্মপতয়ে ধর্ম্মেশায় নমো নমঃ।
ধর্ম্মাদিসম্ভবায়ৈব গোবিন্দ শয়নং কুরু ॥ ১২ ॥

তুমি ধর্ম্ম, ধর্ম্মপতি ও ধর্ম্মেশ, তোমাকে নমস্কার, নমস্কার। তুমি ধর্ম্মাদিসম্ভব গোবিন্দ, শয়ন কর ॥ ১২ ॥

সর্ব্বায় সর্ব্বপতয়ে সর্ব্বেশায় নমো নমঃ।
সর্ব্বাদিসম্ভবায়ৈব গোবিন্দায় চ পাবনম্ ॥ ১৩ ॥

তুমি সর্ব্ব, সর্ব্বপতি ও সর্ব্বেশ্বর, তোমাকে নমস্কার, নমস্কার। তুমি সর্ব্বাদিসম্ভব গোবিন্দ ; আমাকে পবিত্র কর ॥ ১৩ ॥

বেদান্ত দর্শন

গোবিন্দ-ভাষ্যের প্রকাশ

আমরা শ্রীযুত কৃষ্ণগোপাল ভক্ত-সম্পাদিত বেদান্ত দর্শন পাঠ করিয়া অতিশয় আনন্দলাভ করিয়াছি। এই গ্রন্থে মহর্ষি বেদব্যাসকৃত উত্তর-মীমাংসা অর্থাৎ ব্রহ্মসূত্র, সটীক গোবিন্দ-ভাষ্য, তথা শ্রীযুত শ্যামলাল গোস্বামী সিদ্ধান্ত বাচস্পতিকৃত বঙ্গানুবাদ ও বিবৃতি মুদ্রিত হইয়াছে। ভারতবর্ষে যে-সকল মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত নক্ষত্রের ন্যায় উদিত হইয়া জগৎকে আলোকিত করিয়াছেন, তাঁহারা সকলেই একবাক্যে ব্রহ্মসূত্রের অত্যন্ত প্রশংসা করিয়াছেন। শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য্য, শ্রীমদ্রামানুজাচার্য্য প্রভৃতি জ্ঞানী ও ভক্ত-সম্প্রদায়ের আচার্য্যগণ এই ব্রহ্মসূত্রকে অবলম্বন করিয়া নিজ নিজ মতের সংস্থাপন করিয়াছেন ; এমত কি, যে সম্প্রদায় ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্য রচনা করেন নাই, সে সম্প্রদায় ভারতে কিছুমাত্র আচার্য্যত্ব সম্মান লাভ করেন নাই।

ব্রহ্মসূত্রের পরিচয়

ব্রহ্মসূত্রের পরিচয় এই যে, বেদান্তসকল উপনিষৎ আকারে নিত্য বর্ত্তমান ; উপনিষদ্বাক্যসকল সর্ব্বজ্ঞানসম্পন্ন হইয়াও দুর্ব্বোধ্য। এক বাক্যের অর্থের সহিত অন্য বাক্যের কি সম্বন্ধ তাহা সহজে বুঝা যায় না, সুতরাং বিদ্যার্থী ব্যক্তির পক্ষে উপনিষৎ পাঠে বিশেষ ফল হওয়া কঠিন। সদ্গুরু-উপদেশ ব্যতীত

উপনিষদর্থ কখনই হৃদয়ঙ্গম হয় না। উপনিষদই বেদের শিরোভাগ। আত্মজ্ঞান ও জীবের কর্ত্তব্যতা কেবল উপনিষদেই আছে। উপনিষদর্থ না জানিলে মানব-জন্ম সফল করা যায় না। ভগবান্ বাদরায়ণ এই বিষয় হৃদয়ে আলোচনা করিয়া সমস্ত উপনিষদ্বাক্যের বিষয় বিভাগপূর্ব্বক যে সূত্রগুলি প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহারই নাম ব্রহ্মসূত্র। সাংখ্য, পাতঞ্জল, ন্যায়, বৈশেষিক ও পূর্ব্ব-মীমাংসার ন্যায় ব্রহ্মসূত্র কেবল বিচার-নৈপুণ্যমাত্র নয়; কিন্তু বেদ-শিরোভাগের যথার্থ তাৎপর্য্য নির্ণায়ক আর্য্যগ্রন্থ বলিয়া ইহাকে সকলেই পূজা করিয়া থাকেন। যথার্থ তত্ত্বজ্ঞান সংগ্রহ করিবার জন্য যাঁহাদের স্পৃহা আছে, তাঁহারা অন্য কোন শাস্ত্রে অধিক পরিশ্রম না করিয়া ব্রহ্মসূত্র অধ্যয়ন করুন।

সারদাপীঠে শ্রীশঙ্কর-কর্ত্তৃক বৌধায়ন-ভাষ্য সংগোপিত

ব্রহ্মসূত্রার্থ সংগ্রহ করাও জীবের পক্ষে সহজ নয়। সূত্রপাঠ করিলে যে অর্থ বোধ হয় এরূপ নয়, সূত্রের ভাষ্য ব্যতীত সূত্রার্থ বোধগম্য হয় না, অথবা কোন সদ্গুরুর নিকট সূত্রার্থ শিক্ষা করিতে পারিলে তত্ত্বজ্ঞান হয়, এস্থলে কঠিন এই যে, সূত্রের যথার্থ ভাষ্য কোথায় পাওয়া যায় অথবা সূত্রার্থ নির্ণায়ক সদ্গুরুই বা কোথায় পাওয়া যায়। বৌধায়ন ঋষি ব্রহ্মসূত্রের যে ভাষ্য করিয়াছিলেন, তাহা প্রায় অপ্রাপ্য হইয়াছিল। সারদাপীঠ হইতে বহু যত্নসহকারে শ্রীরামানুজ স্বামী সেই ভাষ্য সংগ্রহ করিয়া নিজের শ্রীভাষ্য রচনা করেন—এরূপ সংস্কৃত প্রপন্নামৃত গ্রন্থে দেখা যায়। সারদাপীঠ শ্রীশঙ্করাচার্য্যের স্থান-বিশেষ। শঙ্কর স্বামী অনেক যত্নে ঐ বৌধায়ন-ভাষ্য নিজ মঠে রাখিয়াছিলেন, ইহাতে সন্দেহ কি? শঙ্কর স্বামী সাক্ষাৎ রুদ্রাবতার, তিনি কার্য্যোদ্ধারের জন্য স্বীয় শারীরক ভাষ্য রচনা করেন, সেই ভাষ্যের প্রচলন বৃদ্ধি করিবার জন্য বৌধায়ন-ভাষ্যকে গোপন করিয়া রাখিয়াছিলেন এরূপ জনশ্রুতি আছে।

শ্রীমদ্ভাগবতই ব্রহ্মসূত্রের প্রকৃত ভাষ্য

বেদব্যাসই ব্রহ্মসূত্রের কর্ত্তা। সূত্রসকল রচনা করিয়া তিনি বিচার করিলেন যে, যে কারণে উপনিষদর্থ সংগ্রহপূর্ব্বক সূত্র রচনা করিলাম তাহা সফল হইল না, আমি স্বয়ং কোন ভাষ্য না করিলে সূত্র কিরূপে প্রচলিত হইবে। শ্রীনারদের উপদেশে তিনি যখন শ্রীমদ্ভাগবত প্রকাশ করিলেন, সেই সময়ে সূত্রার্থ প্রকাশ করিবার যত্ন হইতেছিল, ব্যাসদেব তখন শ্রীমদ্ভাগবতকেই ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্যরূপে প্রণয়ন করিলেন, ইহা নানা পুরাণে কথিত আছে।

শঙ্করস্বামি-কর্ত্তৃক ব্রহ্মসূত্রের উক্ত ভাষ্যদ্বয় সংগোপন

মহাপুরাণ শ্রীমদ্ভাগবত ব্রহ্মসূত্রের যথার্থ অকৃত্রিম ভাষ্য হইলেও বৌধায়ন ঋষি তদীয় গুরুর আজ্ঞায় একটী রীতিমত ভাষ্য প্রস্তুত করিলেন। জগতে ব্রহ্মসূত্রের দুইটী ভাষ্য বিরাজমান হইল। শঙ্করস্বামী ভগবদাজ্ঞা পালনরূপ কার্য্যোদ্ধারের জন্য মায়াবাদ-ভাষ্য রচনা করত পূর্ব্বোক্ত উভয় ভাষ্যের যাহাতে গোপন হয় তাহার চেষ্টা করিয়াছিলেন।

বেদান্তের মধুর রস-প্রকাশক গোবিন্দ-ভাষ্যই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ

সঙ্কর্ষণাবতার শ্রীরামানুজ বৌধায়ন-ভাষ্য সংগ্রহ করত শ্রীমদ্ভাগবত অবলম্বন-পূর্ব্বক স্বীয় শ্রীভাষ্য জগতে প্রচার করিয়া সূত্রের যথার্থ অর্থ জগৎকে দিয়াছিলেন। সেই শ্রীভাষ্যে যে মধুর রসাশ্রিত তত্ত্ব অনাবিষ্কৃত ছিল, তাহা সাধু জিজ্ঞাসুদিগকে দিবার জন্য শ্রীমদ্গোবিন্দ-দেব শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণকে আজ্ঞা করেন। শ্রীচৈতন্যদেবের চরণাশ্রিত সর্ব্ববেদাধ্যয়নশীল বলদেব জয়পুর প্রদেশে এই গোবিন্দ-ভাষ্যের আবিষ্কার করেন। শ্রীমদ্গোবিন্দ-ভাষ্যই অন্য সকল ভাষ্যের মধ্যে অধিক উপাদেয় হইবে সন্দেহ কি? মায়াবাদ-দূষিত পণ্ডিতগণ যাহাই বলুন, ভক্ত-মণ্ডলীতে গোবিন্দ-ভাষ্যের তুল্য আর মাননীয় গ্রন্থ নাই—ইহা বলিলে অত্যুক্তি হয় না।

পঞ্চাঙ্গী ব্রহ্মসূত্রের বিভিন্ন অধ্যায়ে বিভিন্ন পাদের পরিচয়

ব্রহ্মসূত্র চারি অধ্যায়ে বিভক্ত। প্রতি অধ্যায়ে চারিটী করিয়া পাদ আছে। বলদেব নিজভাষ্যের প্রারম্ভে লিখিয়াছেন,—"তত্র প্রথমে লক্ষণে সর্ব্বেষাং বেদানাং-ব্রহ্মণি সমন্বয়ঃ। দ্বিতীয়ে সর্ব্ব শাস্ত্রাবিরোধঃ। তৃতীয়ে ব্রহ্মাপ্তি-সাধনানি। চতুর্থে তু তদাপ্তিঃ ফলমিতি। যত নিষ্কামধর্ম্ম-নির্ম্মলচিত্তঃ সৎপ্রসঙ্গলুব্ধঃ শ্রদ্ধালুঃ শান্ত্যাদিমান্ অধিকারী। সম্বন্ধো বাচ্যবাচকভাবঃ। বিষয়ো নিরবদ্যো বিশুদ্ধানন্তগুণগণোঽচিন্ত্যানন্তশক্তিঃ সচ্চিদানন্দঃ পুরুষোত্তমঃ। প্রয়োজনমশেষ-দোষবিনাশপূর্ব্বকস্তৎ সাক্ষাৎকার ইত্যুপরিস্পষ্টং ভাবি। যস্যাঃ খলু বিষয়-সংশয়-পূর্ব্বপক্ষ-সিদ্ধান্ত-সঙ্গতিভেদাৎ পঞ্চন্যায়াঙ্গানি ভবন্তি। ন্যায়াধিকরণং। বিষয়ো বিচারযোগ্যবাক্যং। সঙ্গতিরিহ শাস্ত্রাদিবিষয়তয়া বহুবিধাপি ন বিতায়তে।"

শ্রীযুত শ্যামলাল গোস্বামী প্রভু ইহার এই প্রকার অনুবাদ করিয়াছেন—এই ব্রহ্মসূত্রের প্রথমাধ্যায় সমস্ত বেদের ব্রহ্মে সমন্বয়। দ্বিতীয়ে সকল শাস্ত্রের

সহিত **বিরোধ পরিহার**। তৃতীয়ে ব্রহ্মপ্রাপ্তির **সাধন**। চতুর্থে ব্রহ্ম প্রাপ্তিই পুরুষার্থ উক্ত হইয়াছে। নিষ্কাম ধর্ম্ম, নির্ম্মল-চিত্ত, সৎপ্রসঙ্গলুব্ধ, শ্রদ্ধালু, শমদয়াদিসম্পন্ন জীব এই শাস্ত্রের **অধিকারী**। এই শাস্ত্র স্বয়ং বাচক এবং ব্রহ্ম ইহার বাচ্য, সুতরাং পরস্পর বাচ্যবাচক **সম্বন্ধ**। শাস্ত্র প্রতিপাদ্য **বিষয়**, নিরবদ্য বিশুদ্ধানন্তগুণগণ অচিন্ত্যানন্দশক্তি-সচ্চিদানন্দ পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণ। অশেষ দোষবিনাশ পুরঃসর তৎসাক্ষাৎকারই ইহার **প্রয়োজন**। এই শাস্ত্রে বিষয়, সংশয়, পূর্ব্বপক্ষ, সিদ্ধান্ত ও সঙ্গতি—এই পাঁচটী ন্যায়াবয়ব। অধিকরণ অর্থাৎ অধ্যায়ের অংশবিশেষের নামই ন্যায়। বিচারযোগ্য বাক্যের নাম **বিষয়**। এক ধর্ম্মিত্বে পরস্পর বিরোধী নানাপ্রকার অর্থ বিচারের নাম **সংশয়**। প্রতিকূল অর্থের নাম **পূর্ব্বপক্ষ**। প্রামাণিকরূপে অভ্যুপগত অর্থের নাম **সিদ্ধান্ত**। পূর্ব্বোত্তর অর্থদ্বয়ের নাম **সঙ্গতি**। এই সঙ্গতি বহুবিধ, তাহা বাহুল্যভয়ে বিবৃত হইল না; শাস্ত্রার্থা-বগতিতে স্থানবিশেষে স্বয়ংই বিবৃত হইবে।

গোবিন্দ-ভাষ্য অতি উপাদেয়, সুতরাং বৈষ্ণবমাত্রেরই পাঠ্য

এই গ্রন্থের পাঠক মহাশয়গণ দেখুন যে, এই সূত্র-ভাষ্য কিরূপ উপাদেয়, আবার গোস্বামী যে অনুবাদ করিয়াছেন, তাহা কিরূপ প্রাঞ্জল ও নির্দ্দোষ। অতএব বৈষ্ণব-জগতের বিশেষ উপকার-স্বরূপ এই গ্রন্থখানি সকলেই যত্নপূর্ব্বক সংগ্রহ করুন। অনেকেই মনে মনে করেন আমি বৈষ্ণব, কিন্তু কি কি বিষয় জানিলে ও কি কি করিলে জীব বৈষ্ণবপদবাচ্য হন, তাহা অবগত হইতে গেলে শ্রীগোবিন্দ-ভাষ্য পাঠ করা আবশ্যক। এই গোবিন্দ-ভাষ্য-বেদান্তই বৈষ্ণবের পক্ষে অমূল্য নিধি।

—জগদ্গুরু শ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুর

"যিনি অপ্রাকৃত দিব্যজ্ঞানের অপব্যবহার করিবার মানসে কপটতার বশবর্ত্তী হইয়া গৌড়ীয় মঠের আনুগত্য স্বীকার করেন, তাঁহার সহিত গৌড়ীয় মঠের কোন সম্বন্ধ থাকিতে পারে না বা নাই; যেরূপ যাত্রার দলের অভিনয়ে বাস্তব সত্যের অভাব লক্ষিত হয়, তদ্রূপ। দীক্ষার অভিনয় ও দিব্যজ্ঞান এক নহে।"

—শ্রীল সরস্বতী প্রভুপাদ

শক্তি-সঞ্চার

ভগবান্ সর্ব্বশক্তিমান্। তিনি যে বস্তুতে তাঁহার যে শক্তি সঞ্চার করেন, সেই ভগবৎশক্তির কণায় বললাভ করিয়া সেই বস্তু সেই শক্তিদ্বারা তাঁহারই সেবা করিতে সমর্থ হয়। তিনিই শক্তির প্রস্রবণ, আকর বা মূল আশ্রয়। তিনি শক্তিমান্ হইলেও শক্তির সহিত যুগপৎ ভিন্ন ও অভিন্ন। শক্তিমান্ অলঙ্কার শাস্ত্রের কথিত 'বিষয়' শব্দ-বাচ্য এবং শক্তি 'আশ্রয়' শব্দ-বাচ্য। বিষয় ও আশ্রয়ে যে বিশেষ আছে, তাহাতে শক্তিমান্ হইতে শক্তি ভিন্ন। আবার শক্তি-বিচ্যুত শক্তিমান্ শব্দের অধিষ্ঠান জ্ঞান, জ্ঞেয় ও জ্ঞাতার বৃত্তি-ত্রয়ের অগম্য। এই ত্রিবিধ সমন্বয়ে প্রাকৃত দৃশ্যজগৎ বিজ্ঞতার অভাবেই প্রকৃতিতেই বিলীন হয়। আবার, কাহারও মতে পূর্ণজ্ঞানেই নির্ব্বাণ লাভ করে; তখন আর কে কাহাকে কোন বৃত্তিদ্বারা জানিবে? এই নির্ব্বিশিষ্ট ভাব কেবলজ্ঞাননিষ্ঠ সম্প্রদায়ে আদর লাভ করিয়াছে। এজন্য শ্রীজীব গোস্বামী প্রভুপাদ বলেন, ব্রহ্ম বিশেষ্য-নিষ্ঠ, পরমাত্মা বিশেষণ-নিষ্ঠ এবং ভগবান্ বিশিষ্ট-নিষ্ঠ। বিশিষ্টনিষ্ঠার অন্তরালে আমরা তত্ত্ববস্তুকে দেখিতে গিয়া তাঁহাকে শক্তিমান্ এবং বিশেষগুলিকে শক্তি বলি। অপ্রকটিত বিশেষগুলি বিশেষ্যেরই বিশেষণ। জড় বিশেষগুলি পরমাত্মার বাহ্য বিশেষণ, চিদ্‌বিশেষ অন্তর্যামিত্ব অন্তর্বিশেষণ। এইরূপ বিশেষণভূষিত হইলেও কেবলমাত্র পূর্ণ চিদ্বিশেষ-বিলাসের পরিচয় না দেওয়ায় তিনি ভগবৎপ্রতীতির শুদ্ধত্ব, পূর্ণত্ব, মুক্তত্ব ও নিত্যত্ব হইতে পৃথক্। ভগবৎশক্তি অখণ্ড ও সম্যগ্। পরমাত্মায় লক্ষিত শক্তি খণ্ডিত ও ব্রহ্মে লক্ষিত শক্তিবর্গলক্ষণ শক্তিধর্ম্মাতিরিক্ত হওয়ায় অসম্যক্ ও কেবলজ্ঞানগম্য।

বেদে সেই শক্তিকে তিন শ্রেণীতে বিভাগ করিয়াছেন। সম্বিৎ বা জ্ঞানশক্তি, সন্ধিনী বা বলশক্তি ও হ্লাদিনী বা ক্রিয়াশক্তি। যাঁহাতে গোলোকে বাস্তববিজ্ঞানে বল ও ক্রিয়াশক্তি স্বভাবক্রমে অপরিলক্ষিত, সে বিগ্রহই অদ্বয়জ্ঞান ব্রজেন্দ্রনন্দন। গোলোকে যে বিগ্রহে জ্ঞান ও ক্রিয়াশক্তি অলক্ষিত, সে বিগ্রহই তত্ত্বপ্রকাশ বলদেব। গোলোকে যে বিগ্রহে স্বয়ংরূপ জ্ঞান ও তত্ত্বপ্রকাশ বল লক্ষিত হয় না, তথায় ক্রিয়া বা হ্লাদিনী বিরাজমানা।

অদ্বয়জ্ঞান ব্রজেন্দ্রনন্দনের অঙ্গকান্তি ব্রহ্ম, অংশবৈভব পরমাত্মা এবং অঙ্গী

ভগবান্। অঙ্গী ভগবানের বহিরঙ্গা শক্তি মায়া, অন্তরঙ্গা শক্তি তদ্রূপবৈভব ও তটস্থা শক্তি জীব।

তত্ত্বপ্রকাশ বলদেবের চিৎশক্তি জীবজগৎ, অচিৎশক্তি জড়জগৎ এবং স্বয়ংপ্রকাশ ঈশ্বর।

হ্লাদিনী মহাভাবস্বরূপিণী বার্ষভানবী, কায়ব্যূহ পরব্যোমস্থ লক্ষ্মীগণ এবং হরিবিমুখিনী শচী উমাদি দেবীগণ।

বহিরঙ্গা মায়াশক্তি বদ্ধজীবের কর্ম্মভূমি রচনা করিয়াছেন। চিৎশক্তি জীব অসংখ্য অণুচিৎ বলিয়া তদ্রূপবৈভব বিস্মৃত হইয়া সেই কর্ম্মভূমিতে ভ্রমণ করেন। তাঁহার ভ্রমণ যোগ্যতায় অণুচিৎ বা স্বাতন্ত্র্য-ধর্ম্মের বিভুচিৎ দয়াময় হইয়াও ব্যাঘাত করেন না যদি ঈশ্বর বস্তু অণুচিতের স্বতন্ত্রতার প্রতি হস্তক্ষেপ করিতেন তাহা হইলে তাহাকে আর চিন্ময় বা স্বতন্ত্র ধর্ম্মবিশিষ্ট বলা হইত না —মায়াপ্রসূত নশ্বর জড় নামে অভিধান করাই সঙ্গত হইত। এই স্বতন্ত্রতা-বশে তটস্থা-শক্তিসম্পন্ন অণুচিৎ জীব মায়িক বদ্ধধর্ম্মের আবাহন করিয়া মায়াদ্বারা সম্যক্‌রূপে মূঢ়তা লাভ করিতে সমর্থ। আবার স্বতন্ত্রতা-ক্রমে ঈশোন্মুখী সেবা তাঁহার স্মৃতিপথে উদ্দীপিতা হইলে তিনিই কৃপাশক্তিবলে নিত্য স্বভাবে অবস্থিত হন।

ভগবান্ গৌরহরি অভিন্ন-ব্রজেন্দ্রনন্দন হইয়াও ঈশোন্মুখ শ্রীগুরুদেবের লীলাভিনয় করিতে প্রপঞ্চে অবতরণ করেন। তিনি জীবের অলৌকিক যোগ্যতার পুনঃ প্রাপ্তির কথা স্বীয় লীলায় ও ভক্তগণের চরিত্রে প্রতিফলিত করিয়াছেন।

প্রয়াগে যে সময়ে শ্রীভগবান্ শ্রীগৌরসুন্দরের নিকট শ্রীরূপ গোস্বামী সকল দুঃসঙ্গ-পরিহারলীলা প্রদর্শনপূর্ব্বক উপস্থিত হইয়াছিলেন, সেই সময় শ্রীরূপ-গোস্বামীতে আমরা দেখিতে পাই, তিনি শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-নামধারী,-গৌররূপধারী, মহাবদান্যগুণধারী এবং কৃষ্ণপ্রেমপ্রদান-লীলাময় কৃষ্ণের নিকট বাহ্য জগতের সকল অহমিকা ছাড়িয়া দিয়া নমস্কার করিয়াছিলেন। সেই চতুর্দ্দশ ভুবনপতি, ব্রহ্মাণ্ডসমূহ ও বৈকুণ্ঠসমূহের পতি, সকল গুরুর গুরু শ্রীচৈতন্যদেব তাঁহাকে শক্তি সঞ্চার করিয়া দশ দিবসকাল লোকাতীত শুদ্ধাত্মার নিত্যবৃত্তি ভক্তির উপদেশ করেন। অন্তেবাসী শ্রীরূপ গোস্বামীকে এই উপদেশের মধ্যে জড়ীয় ভোগময় কুতর্ক আবাহন করিতে দেখা যায় না—তিনি কেবল-নিরস্তকুহক, বাস্তবজ্ঞানময় অবিসংবাদিত সত্য শ্রবণ করিয়াছিলেন। শ্রীমদ্-ভাগবতে যেরূপ শ্রদ্দধান মুনিগণ অবিমিশ্র জ্ঞান ও ভগবদিতর বিষয়ে বীতস্পৃহ

হইয়া স্বরূপ, বহিরঙ্গা ও তটস্থা শক্ত্যাত্মক পরমাত্মাকে আত্মবৃত্তিদ্বারা এবং শ্রীগুরুদেবের মুখনিঃসৃত আম্নায়বাক্যশ্রবণে তদনুসরণে প্রেমাঞ্জনচ্ছুরিত সেবাময়ী-দৃষ্টিতে দর্শন করেন, সেইরূপ শ্রীরূপপ্রভু শ্রীমন্মহাপ্রভুর উপদিষ্ট বিষয় গ্রহণ করিয়াছিলেন।

"তচ্ছ্রদ্দধানা মুনয়ো জ্ঞানবৈরাগ্যযুক্তয়া।
পশ্যন্ত্যাত্মনি চাত্মানং ভক্ত্যা শ্রুতগৃহীতয়া ॥"

শ্রীভগবানের মায়াশক্তি যেকালে ঈশ-সেবায় উদাসীন জীবের উপর প্রবলতা লাভ করিয়া শক্তি সঞ্চার করেন, সেই সময় জীব আপনাকে ত্রিগুণাত্মক মায়িক বদ্ধজীব মনে করে। অঙ্গী অথবা তাঁহার অন্তরঙ্গা শক্তি যেকালে জীবের তটস্থ-ধর্ম্মে সঞ্চারিত হইয়া জীবের কর্ম্মফল ভোগের নশ্বরতা বা ফল্গুতা উপলব্ধি করাইয়া সেবোন্মুখতা সম্পাদন করে, তখনই মুক্তজীবে ভগবানের নিত্য কৃপাশক্তি সঞ্চারিত হইয়া তাঁহার জন্য নিরস্তকুহক বাস্তব জ্ঞানের উপদেষ্টা গুরুরূপে প্রপঞ্চে অবতীর্ণ হন। মায়াশক্তির অল্পকালস্থায়ী অসম্পূর্ণ বললাভ করিয়া জীবের হরিবিমুখতা-ধর্ম্ম অভ্যাগতরূপে প্রকাশমান হইলে জীব গুণ-ত্রয়কেই নিজের শক্তি বলিয়া মনে ভ্রম করে। আবার শ্রীগুরুদেব ও কৃষ্ণের নিকট ভগবৎসেবা-প্রবৃত্তি লাভ করিয়া নিত্য বৈকুণ্ঠ বস্তুতে শ্রদ্ধাবিশিষ্ট হন। অধোক্ষজ-সেবায় মায়াশক্তির প্রাধান্য নাই। অক্ষজ-জ্ঞানের দ্বারাই বহিরঙ্গা শক্তি বদ্ধজীবকে বিমোহিত করে। জীবের অস্মিতায় ফলভোগ-বুদ্ধি তিরোহিত না হইলে গুরুকৃষ্ণ-প্রসাদলাভ ঘটে না। চিদ্বিলাস-শক্তি সঞ্চারিত না হইলে বদ্ধজীব ভ্রমক্রমে ব্রহ্মে বিলীন হইবার অসচ্চেষ্টা পোষণ করে।

—জগদ্গুরু শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর

"ঈশ্বরের আকার নাই, কোন রূপ নাই, কোন গুণ নাই, কোন শক্তি নাই, আছে কেবল অলীক কল্পনা ; এই অলীক কল্পনার মূলই বৌদ্ধের শূন্যবাদ বা বেদবিরুদ্ধ নাস্তিক্যবাদ। পরন্তু ঈশ্বরের নিত্য আকার বা স্বরূপ স্বীকার করাই আস্তিক্যবাদ ; যাঁহারা এই 'নিত্যরূপের' অস্বীকার করেন, তাঁহারাই নাস্তিক।"

—শ্রীল ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী

বস্তু আলোচনা

বস্তুতে বিভিন্ন গুণের সমাবেশ থাকিলেও বস্তু এক, এই প্রবন্ধে আমরা তাহা আলোচনা করিব। গুণ, ধর্ম্ম, শক্তি, অংশ, কার্য্য প্রভৃতি দার্শনিক বিচারে এক-পর্য্যায়গত শব্দ। কেহ কেহ ভ্রান্তিবশে বস্তুকে নির্গুণ, নিঃশক্তিক, নির্ধর্ম্মক, নিরংশক, কার্য্যত্বশূন্য, কারণস্বরূপ প্রতিপন্ন করিতে গিয়া তাঁহাকে জড়-স্বরূপের ন্যায় প্রতিপন্ন করিয়াছেন। বস্তু পূর্ণচেতন; তাঁহাকে জড়ের ন্যায় প্রতিপন্ন করিতে গিয়া অদ্বৈতবাদী বিবর্ত্তগর্ত্তে পতিত হইয়াছেন।

"অতত্ত্বতোঽন্যথা প্রথা বিবর্ত্ত ইত্যুদাহৃতঃ॥" (বেদান্তসার ৬০)

তত্ত্ববস্তুকে জড়পিণ্ড অতত্ত্ববৎ প্রতিপন্ন করিবার উদ্দেশ্য—পাছে তাহাতে নানাত্ব বা বহুত্ব আসিয়া পড়ে এই ভয়ে। কিন্তু বস্তুর নানাত্ব কোন পক্ষেরই স্বীকৃত তত্ত্ব নহে, তবে বস্তুতে নানাত্ব থাকিলে বস্তুত্বের কোন প্রকারেই হানি হয় না। তাহাতে যদি কেহ মনে করেন বস্তুতে নানাত্ব স্বীকৃত হইলে বস্তু-বিপর্য্যয়ক্রমে বস্তুবিকারবাদ বা বস্তু-পরিণামবাদ আসিয়া পড়ে, সেইজন্য বিষ্ণুস্বামী সম্প্রদায়ের আচার্য্য বল্লভ উপনিষদের "বহু স্যাং প্রজায়েয়েতি" (তৈঃ উঃ ২।৬) মন্ত্রের দ্বারা বস্তুবিকারের শাব্দপ্রামাণিকতা অঙ্গীকার করিলেও আমরা তৎপ্রমাণ হইতে স্বতন্ত্রভাবে বস্তুগত শক্তির পরিণাম স্বীকার করিয়া বস্তুর হানি না করিয়া বস্তুবিকারবাদ হইতে পৃথক্ অবস্থান করিতেছি। বেদান্তের "আত্মকৃতে পরিণামাৎ" (১।৪।২৬) সূত্রানুসারে জানা যায়, বস্তু স্বয়ংই ইচ্ছা-শক্তিপ্রভাবে জগতের রচয়িতারূপে পরিণত হইয়াছেন। উক্ত সূত্রের 'কৃতে'-শব্দের দ্বারা 'রচনা' বুঝিতে হইবে। সুতরাং বস্তুর কর্তৃত্ব ও "সোঽকাময়ত", (তৈঃ উঃ ২।৬) এই মন্ত্রের দ্বারা বস্তুর ইচ্ছাশক্তিযুক্তত্ব প্রতিপন্ন হইতেছে। পরিণাম স্বীকার করিলে বস্তু বিকৃত হন বলিয়া বিবর্ত্ত-বাদিগণ জগৎকে ব্রহ্মের বিবর্ত্ত বলিয়া কল্পনা করিয়াছেন। কিন্তু উক্ত বেদান্ত-সূত্রানুসারে পরিণামবাদই বেদব্যাস-কর্ত্তৃক স্পষ্টরূপে স্বীকৃত হইয়াছে বলিয়া জানা যায়। 'সঃ অকাময়ত বহু স্যাং' ইত্যাদি মন্ত্র হইতে 'তদ্বস্তু ইচ্ছা করিলেন—আমি বহু হইব' ইত্যাদি দ্বারা পরিস্ফুটরূপে প্রতিপন্ন হইতেছে যে, জগৎ ভগবদ্বস্তুর ইচ্ছাশক্তির পরিণাম। আচার্য্য শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী এই সম্পর্কে বলিয়াছেন,—

"অবিচিন্ত্য-শক্তিযুক্ত শ্রীভগবান্।
ইচ্ছায় জগৎরূপে পায় পরিণাম॥ (চৈঃ চঃ আঃ ৭।১২৪)

তিনি আরও একটী জাগতিক দৃষ্টান্তদ্বারা প্রতিপন্ন করিয়াছেন যে, অচিন্ত্য ভগবচ্ছক্তি জগৎরূপে পরিণত হইলেও শক্তি চিন্তামণির ন্যায় বিবিধ রত্নরাশি প্রসব করিয়াও অবিকৃতভাবে অবস্থান করেন।

"তথাপি অচিন্ত্যশক্ত্যে হয় অধিকারী।
প্রাকৃত চিন্তামণি তাহে দৃষ্টান্ত ধরি॥
নানারত্নরাশি হয় চিন্তামণি হৈতে।
তথাপিহ মণি রহে স্বরূপে অবিকৃতে॥
প্রাকৃত-বস্তুতে যদি অচিন্ত্যশক্তি হয়।
ঈশ্বরের অচিন্ত্যশক্তি—ইথে কি বিস্ময়॥"

(চৈঃ চঃ আঃ ৭।১২৫-১২৭)

সুতরাং বস্তুতে নানাত্ব থাকিলে বস্তুর অখণ্ডত্বের হানি না হইয়া বরং পূর্ণতাই প্রতিপন্ন হয়। "বস্তুনোঽংশো জীবঃ বস্তুনঃ শক্তিমায়া চ বস্তুনঃ কার্য্যং জগচ্চ তৎ সর্ব্বং বস্ত্বেব॥" (ভাবার্থদীপিকা ১।১।২)

উক্ত বাক্য হইতেও আমরা বস্তুতত্ত্বের বিষয় স্পষ্টরূপে অভিজ্ঞান লাভ করিতে পারি যে, সমস্ত তত্ত্বটী বস্তু হইলেও অংশরূপে জীব, শক্তিরূপে মায়া এবং কার্য্যরূপে জগৎ তাঁহাতেই অবস্থান করিতেছে। বস্তুকে নির্ব্বিশিষ্ট করিলে উল্লিখিত বিচার ও শাস্ত্রযুক্তিসমূহের অসঙ্গতি ও একদেশদর্শিতা হয়। জাগতিক হেয়তাযুক্ত ঘৃণিত বিশেষের অভাবই বস্তুতে পরিলক্ষিত হয়। জাগতিক আনন্দ, উপাদেয়তা প্রভৃতি ক্ষণস্থায়ী—নিরানন্দ ও অনুপাদেয়তা হইতে জাত বলিয়া তাহাদের নশ্বরতা কথিত হয় মাত্র। কিন্তু বস্তুর স্বরূপগত শক্তিতে বিলাস-বৈশিষ্ট্য নশ্বরতা, পরিবর্ত্তনশীলতা ও হেয়তাবর্জ্জিত। মায়ার বিলাস-বৈচিত্র্যের অবস্থান্তর দেখিয়া বস্তুর নির্ব্বিশেষ কল্পনাকেই 'মায়াবাদ' বলিয়া থাকে। মায়িকদৃষ্টি তাহাদের অত্যন্ত প্রবলা বিধায় মায়াতীত বৈচিত্র্যে তাহাদের অধিকার জন্মে নাই। তাহাদের পক্ষে ইহকালেও ক্লেশস্বীকার হেতু আনন্দলাভ হইতে বঞ্চিত হইতে এবং পরেও নির্ব্বিশেষ বস্তুতে পর্য্যবসান লাভ করায় চিদানন্দের অপ্রাপক হইয়া আত্মবিনাশ সাধন করিতে দেখা যায়। জগৎকে ও জাগতিক বস্তুকে থুৎকার করিতে গিয়া বস্তুনির্দ্দেশকল্পে যে 'নেতি নেতি' বিচার অবলম্বিত হইয়াছে তাহাও বস্তুর অন্তর্ভুক্ত বিশেষ তত্ত্বেরই একটী প্রকাশস্বরূপ হওয়ায় জ্যোতির্ম্ময় তত্ত্বকে পাওয়া যাইতেছে। তাহাকে আমরা বস্তুর খণ্ডপ্রতীতি বা তাঁহার আভাস জ্ঞান বলিয়া জানিতে পারি। বস্তুর আভাস বস্তু হইতে পৃথক্ না হইলেও কেবলমাত্র তাহাতেই আবদ্ধ থাকা অসম্পূর্ণ বিচার হেতু ভ্রম-বিচার বলা যাইতে পারে। জ্যামিতির প্রতিজ্ঞা প্রতিপাদন করিতে গিয়া আংশিক উত্তর প্রদত্ত হইলে তাহাতে উত্তরদাতার ভ্রান্তিই প্রকাশ পায়।

—জগদ্‌গুরু শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী

ব্রহ্ম, পরমাত্ম ও ভগবত্তত্ত্ব

আত্মকল্যাণাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তি-মাত্রই অনিত্য অবর-জগতের হেয়তা ও অবরতা লক্ষ্য করিয়া বর বস্তু বা শ্রেষ্ঠ বস্তুর অনুশীলন বা অনুসন্ধান-প্রয়াসী। শ্রেষ্ঠ বস্তুর অনুসন্ধানকারিগণ যখন শাস্ত্রানুসন্ধানে নিযুক্ত হন, তখন তাঁহাদের সম্মুখে পরতত্ত্বের অতুলনীয়, অতিমর্ত্ত্য, অসমোর্দ্ধ বৈশিষ্ট্য দৃগ্-গোচর হয়। পরতত্ত্ববস্তু অদ্বয়-জ্ঞান-স্বরূপ—সচ্চিদানন্দময়। তিনি সমস্ত জীবের আদি-কারণ-স্বরূপ পরমপিতা; তাই তাঁহার সঙ্গেই সমস্ত জীবের নিত্যকালের নিত্য সম্বন্ধ। পরতত্ত্ব নির্দ্ধারণ করিতে গিয়া শাস্ত্র-কর্ত্তৃগণ বেদ ও বেদানুগশাস্ত্রে সম্বন্ধ, অভিধেয় ও প্রয়োজন-তত্ত্বের বিষয় সর্ব্বশ্রেষ্ঠরূপে বর্ণন করিয়া তাহার প্রতি সকলকেই—সাধক-মাত্রকেই বিশেষ লক্ষ্য করিতে বলিয়াছেন। সচ্চিদানন্দময় ভগবান্ অখিল-রসামৃত-মূর্ত্তি। তাঁহারই শ্রীচরণ-নখ-কোণে সর্ব্বপ্রকার সু-সৌভাগ্য, সু-সৌন্দর্য্য, সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য বা পরানন্দের অফুরন্ত প্রবাহ নিত্য অবস্থিত। জীবসমূহ সেই অমৃতের সন্তান হইয়াও নিরানন্দ-সাগরে কেন প্রতিনিয়ত হাবুডুবু খাইতেছে? ইহার কারণ কি? ইহার কারণ-নির্দ্দেশে শ্রীল জীবগোস্বামিপাদ অভিধেয়তত্ত্ব-প্রকাশক ভক্তিসন্দর্ভে সম্বন্ধ-জ্ঞানোপদেশ-মুখে ইহার কারণ এইরূপে জানাইয়াছেন।

"পরমাত্ম-বৈভব-গণনে চ তত্তটস্থ-শক্তিরূপাণাং চিদেক-রসানামপি অনাদি-পরতত্ত্ব-জ্ঞান-সংসর্গাভাবময়-তদ্বৈমুখ্য-লব্ধচ্ছিদ্রয়া তন্মায়য়াবৃত-স্বরূপ-জ্ঞানানাং তয়ৈব সত্ত্ব-রজ-স্তমোময়ে জড়ে প্রধানে রচিতাত্ম-ভাবানাং জীবানাং সংসারদুঃখঞ্চ জ্ঞাপিতম্।" (ভঃ সঃ ১)

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর প্রিয় পার্ষদ-ভক্ত ছয় গোস্বামীর অন্যতম শ্রীল জীবগোস্বামিপাদ 'তত্ত্ব', 'পরমাত্ম', 'ভগবৎ' ও 'কৃষ্ণসন্দর্ভে' পরতত্ত্ব-নির্দ্দেশমুখে ব্রহ্ম, পরমাত্মা ও ভগবানের বৈশিষ্ট্য বর্ণনদ্বারা সম্বন্ধ-তত্ত্ব নির্দ্ধারণপূর্ব্বক অভিধেয়-তত্ত্ব বর্ণন করিতে গিয়া 'ভক্তিসন্দর্ভের' প্রথমেই বলিলেন,— "পরমাত্ম-বৈভবগণনাকালে জীবসমূহ শ্রীভগবানের তটস্থ-শক্তিরূপ ও একমাত্র চিন্ময়-রসবিশিষ্ট বলিয়া জ্ঞাপিত হইলেও অনাদি-পরতত্ত্বের জ্ঞান-সংসর্গের অভাবময় হরিবিমুখতাবশতঃ ছিদ্র পাইয়া ভগবানের মায়া জীবের স্বরূপ-জ্ঞান আচ্ছাদন করিয়াছে। সেই মায়ার প্রভাবে সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণময় প্রাকৃত

জড়জগতে 'আমি স্থূলদেহ ও সূক্ষ্মমন'—এইরূপ অভিমানবশতঃ জীবগণ সংসার-দুঃখ লাভ করিতেছে।"

পুনরায় এই সংসার-দুঃখ হইতে অব্যাহতি কি-প্রকারের হইবে, তাহার উপায় বর্ণনমুখে অভিধেয়-যাজন-কর্ত্তব্যতা উপদেশ করিতে গিয়া বলিলেন,—"তত্রাভিধেয়ং তদ্বৈমুখ্য-বিরোধিত্বাত্তৎ-সাম্মুখ্যমেব। তচ্চ তদুপাসন-লক্ষণং, যত এব তজ্জ্ঞানমাবির্ভবতি। প্রয়োজনঞ্চ তদনুভবঃ। স চান্তর্বহিঃ সাক্ষাৎকার-লক্ষণম্। যত এব স্বয়ং কৃতস্ন-দুঃখ-নিবৃত্তির্ভবতি।" "পরতত্ত্ব-বিষয়ে অভিধেয়ানুষ্ঠানেই ভগবৎ-সাম্মুখ্য লাভ হয়। উহাই হরি-বিমুখতার বিরোধী। সেই অভিধেয়—উপাসনালক্ষণাত্মক; যেহেতু উপাসনা-প্রভাবেই সম্বন্ধজ্ঞান আবির্ভূত হয়। আর প্রয়োজন অর্থে ভগবদনুভবকেই বুঝায়। সেই ভগবদনুভব অন্তরে ও বাহিরে পরতত্ত্ব বস্তুর সাক্ষাৎকার লাভকেই বুঝায়। প্রয়োজন লাভ হইতেই আপনা-আপনি সমগ্র দুঃখ নিবৃত্ত হয়।"

বর্ত্তমান প্রবন্ধে সম্বন্ধতত্ত্বই আমাদের আলোচ্য বিষয়। সম্বন্ধ-ব্যতীত জীবের অস্তিত্ব সংরক্ষিত হইতে পারে না। ক্রিয়াশীল চেতন-জীবের সম্বন্ধ ব্যতীত কোনপ্রকার ক্রিয়াও অনুষ্ঠিত হইতে পারে না; সেই কারণ, সম্বন্ধ-জ্ঞান একান্ত আবশ্যক। শাস্ত্র-কর্ত্তৃগণ পরতত্ত্ব বা শ্রেষ্ঠতত্ত্বের সঙ্গেই প্রত্যেক জীবের নিত্য সম্বন্ধ আছে, ইহাই জানাইয়াছেন। শ্রীমদ্ভাগবত সেই পরতত্ত্ববস্তু সম্বন্ধে এই প্রকার পরিচয় প্রদান করিতেছেন—

বদন্তি তৎ তত্ত্ববিদস্তত্ত্বং যজ্জ্ঞানমদ্বয়ম্।
ব্রহ্মেতি পরমাত্মেতি ভগবানিতি শব্দ্যতে॥ (ভাঃ ১।২।১১)

তত্ত্ববিদ্‌গণ অদ্বয়জ্ঞানকেই তত্ত্ব বলেন। সেই তত্ত্ববস্তু 'ব্রহ্ম', 'পরমাত্মা' ও 'ভগবান্'—এই ত্রিবিধ সংজ্ঞায় কথিত হইয়া থাকেন।

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী প্রভু পরতত্ত্ববস্তু সম্বন্ধে বলিতেছেন,—অদ্বয়-জ্ঞান-তত্ত্ববস্তু কৃষ্ণের স্বরূপ।
ব্রহ্ম, আত্মা, ভগবান্—তিন তাঁর রূপ॥ (চৈঃ চঃ আঃ ২।৬৪)

পরতত্ত্ববস্তু একটীই, তাই তাঁহাকে অদ্বয়-জ্ঞানতত্ত্ববস্তু বলিয়া শাস্ত্রে নির্দ্দেশ করিয়াছেন। সেই একই তত্ত্ববস্তু সম্বন্ধে উপাসনাকারী অধিকার-ভেদে ত্রিবিধ প্রতীতি বা অনুভূতি লাভ করিয়া থাকেন। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতকার শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী প্রভু বলিতেছেন যে,—জ্ঞান, যোগ ও ভক্তি—এই ত্রিবিধ সাধনপন্থাবলম্বিগণ সেই পরতত্ত্ব বস্তুকে ত্রিবিধভাবে অনুভব করিয়া থাকেন। জ্ঞান-মার্গীয় উপাসকগণ তাঁহাকে ব্রহ্মরূপে, যোগ-পন্থাবলম্বিগণ

তাঁহাকে পরমাত্মরূপে এবং ভক্তি-মার্গাবলম্বনকারিগণ তাঁহাকে বিগ্রহবান্ ভগবদ্রূপে দর্শন করিয়া থাকেন।

ভক্তিযোগে ভক্ত পায় যাঁহার দর্শন।
সূর্য্য যেন সবিগ্রহ দেখে দেবগণ॥
জ্ঞান-যোগ-মার্গে তাঁরে ভজে যেই সব।
ব্রহ্ম-আত্মারূপে তাঁরে করে অনুভব॥ (চৈঃ চঃ আঃ ২।২৫-২৬)

এ-বিষয়ে শ্রীল জীব গোস্বামিপাদ তত্ত্বসন্দর্ভে জানাইয়াছেন,—

যস্য ব্রহ্মেতি সংজ্ঞাং ক্বচিদপি নিগমে যাতি চিন্মাত্রসত্তা
প্যংশো যস্যাংশকৈঃ স্বৈর্বিভবতি বশয়ন্নেব মায়াং পুমাংশ্চ॥
একং যস্যৈব রূপং বিলসতি পরব্যোম্নি নারায়ণাখ্যং
স শ্রীকৃষ্ণো বিধত্তাং স্বয়মিহ ভগবান্ প্রেম তৎপাদভাজাম্॥
(তত্ত্বসন্দর্ভ ৮ম শ্লোক)

যাঁহার নির্ব্বিশেষ চিন্মাত্রসত্তা শ্রুতির কোন কোন স্থানে 'ব্রহ্ম'-সংজ্ঞায় সংজ্ঞিত হইয়াছেন, যাঁহার অংশ মায়া-নিয়ন্তা কারণার্ণবশায়ী পুরুষ মায়াকে স্ববশে আনয়নপূর্ব্বক তাহার (মায়ার) প্রতি দৃষ্টিশক্তি সঞ্চার করিয়া তদ্দ্বারা ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করাইয়াছেন এবং প্রদ্যুম্নরূপে মৎস্য, কূর্ম্ম প্রভৃতি নিজ অংশ-অবতারগণের সহিত বিভবসংজ্ঞক লীলাবতারসমূহের প্রকট করেন, সেই স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ, এই জগতে তাঁহার পাদপদ্ম ভজনকারী ভক্তদিগকে স্বীয় প্রেম প্রদান করুন। কঠশ্রুতি, মুণ্ডক ও শ্বেতাশ্বতরোপনিষদে পরব্রহ্মের স্বরূপ এইরূপ বর্ণিত হইয়াছে,—

ন তত্র সূর্য্যো ভাতি ন চন্দ্র-তারকং
নেমা বিদ্যুতো ভান্তি কুতোঽয়মগ্নিঃ।
তমেব ভান্তমনুভাতি সর্ব্বং
তস্য ভাসা সর্ব্বমিদং বিভাতি॥ (কঠ ২।২।১৫)

সেই স্বপ্রকাশ পরব্রহ্মকে সূর্য্য-চন্দ্র-নক্ষত্ররাজি বা এই বিদ্যুৎসকল প্রকাশ করিতে পারে না, অগ্নির কথা আর কি বলিব? কিন্তু সেই স্ব-প্রকাশ পরমব্রহ্মকে অনুসরণ করিয়া মরীচিমালী প্রভৃতি সকলেই দীপ্তি পাইয়া থাকে, সেই পরব্রহ্মের অঙ্গকান্তিতেই এই সকল অর্থাৎ জগৎ দীপ্তি প্রাপ্ত হয়।

ব্রহ্মসংহিতাতেও পরব্রহ্মকে—আদিপুরুষ শ্রীভগবান্ গোবিন্দ আখ্যায় আখ্যাত করিয়া তাঁহার অঙ্গকান্তিকেই ব্রহ্মসংজ্ঞায় অভিহিত করিয়া শ্রীভগবানকেই ব্রহ্মের কারণরূপে নির্দ্দেশিত করিয়াছেন—

যস্ত প্রভা প্রভবতো জগদণ্ড-কোটী-
কোটীষশেষ-বসুধাদি-বিভূতি-ভিন্নম্।
তদ্ ব্রহ্ম নিষ্কলমনন্তমশেষভূতং
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি॥ (ব্রহ্মসংহিতা ৫।৪০)

কোটী কোটী ব্রহ্মাণ্ডে অশেষ বসুধাদি ঐশ্বর্য্যদ্বারা পৃথক্‌কৃত, নিষ্কল, অনন্ত, অশেষভূত ব্রহ্ম যাঁহার প্রভা হইতে উৎপন্ন হইয়াছেন, সেই আদি-পুরুষ গোবিন্দকে আমি ভজনা করি। (ক্রমশঃ)

—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসৌরভ ভক্তিসার মহারাজ

শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাব-তিথিতে
মহিমা-মাহাত্ম্য-বর্ণন

জয় জয় শ্রীগৌরাঙ্গ বিষ্ণুপ্রিয়া-নাথ।
জীব-প্রতি কর প্রভু শুভ দৃষ্টিপাত॥ ১॥
জয় জয় শ্রীগৌরাঙ্গ গদাধর-নাথ।
জীব-প্রতি কর প্রভু শুভ দৃষ্টিপাত।। ২॥
জয় জয় শ্রীগৌরাঙ্গ বিষ্ণুপ্রিয়া-প্রাণ।
জীব-প্রতি কর প্রভু শুভ দৃষ্টিদান॥ ৩॥
জয় জয় শ্রীগৌরাঙ্গ নরহরির প্রাণ।
জীব-প্রতি কর প্রভু শুভ দৃষ্টিদান॥ ৪॥
জয় জয় শ্রীগৌরাঙ্গ লক্ষ্মীপ্রিয়া-নাথ।
বঙ্গবাসী ভক্তগণে কৈলা আত্মসাৎ॥ ৫॥
জয় জয় শ্রীগৌরাঙ্গ ভক্তগণ-প্রাণ।
কৃপাদৃষ্টি কর প্রভু সর্ব্বজীবে ত্রাণ॥ ৬॥
জয় জয় শ্রীগৌরাঙ্গ স্বয়ং ভগবান্।
সর্ব্বজীবে কর প্রভু শুভ দৃষ্টিদান॥ ৭॥
জয় জয় শ্রীগৌরাঙ্গ স্বয়ং ভগবান্।
সর্ব্বজীবে কর প্রভু প্রেমভক্তিদান॥ ৮॥

জয় জয় শ্রীগৌরাঙ্গ স্বয়ং ভগবান্।
প্রেমভক্তি দিয়া কৈলা পরম কল্যাণ ॥ ৯ ॥
জয় জয় শ্রীগৌরাঙ্গ স্বয়ং ভগবান্।
স্ব-চরণে ভক্তি দিয়া কর ভাগ্যবান্ ॥ ১০ ॥
জয় জয় শ্রীগৌরাঙ্গ সর্ব্ব জীব-প্রাণ।
তোমার পদারবিন্দে সতত প্রণাম ॥ ১১ ॥
জয় জয় শ্রীগৌরাঙ্গ শ্রীশচীনন্দন।
দুষ্কৃতি হরিয়া দেহ প্রেমভক্তি-ধন ॥ ১২ ॥
জয় জয় শ্রীগৌরাঙ্গ পরম-ঈশ্বর।
সর্ব্বজীব কর্ম্ম দেখ বাহির-অন্তর ॥ ১৩ ॥
জয় জয় শ্রীগৌরাঙ্গ সর্ব্বজীব-শরণ।
কর প্রভু সবার অপরাধ মোচন ॥ ১৪ ॥
জয় জয় শ্রীগৌরাঙ্গ সর্ব্বজীব-পিতা।
আ-চণ্ডাল সবাকারে প্রেম-ভক্তিদাতা ॥ ১৫ ॥
জয় জয় শ্রীগৌরাঙ্গ সর্ব্ব-মহীপতি।
তোমার শরণ বিনা নাহি জীবের গতি ॥ ১৬ ॥
জয় জয় শ্রীগৌরাঙ্গ অগতির গতি।
জনমে জনমে দিও তুয়া পদে মতি ॥ ১৭ ॥
জয় জয় শ্রীগৌরাঙ্গ শচীর কুমার।
অহং-মম অভিমান ঘুচাও আমার ॥ ১৮ ॥
জয় জয় শ্রীগৌরাঙ্গ শ্রীশচীদুলাল।
কামনা ঘুচায়ে দেহ শুদ্ধভক্তি-বল ॥ ১৯ ॥
জয় জয় শ্রীগৌরাঙ্গ গৌরগোপাল।
অস্থির চিত্ত সুস্থির কর দেখিয়া কাঙ্গাল ॥ ২০ ॥
জয় জয় শ্রীগৌরাঙ্গ শচীর দুলাল।
শরণ লইনু ঘুচাও সংসার-জঞ্জাল ॥ ২১ ॥
জয় জয় শ্রীগৌরাঙ্গ শচীর নন্দন।
তোমার অভয়পদে লইনু শরণ ॥ ২২ ॥

জয় জয় শ্রীগৌরাঙ্গ বিশ্বম্ভর রায়।
চাহি পরসাদ যাহে অভিমান যায় ॥ ২৩ ॥
জয় জয় শ্রীগৌরাঙ্গ সর্ব্বেশ্বরেশ্বর।
তুমি আমার আমি ত' তোমার কিঙ্কর ॥ ২৪ ॥
জয় জয় শ্রীগৌরাঙ্গ পতিতপাবন।
বদ্ধজীব প্রেম পায় তোমারি কারণ ॥ ২৫ ॥
জয় জয় শ্রীগৌরাঙ্গ করুণাসাগর।
উথলিল প্রেমবন্যা জীবের অন্তর ॥ ২৬ ॥
জয় জয় শ্রীগৌরাঙ্গ করুণার সিন্ধু।
ভাসিল নদীয়াপুর যার একবিন্দু ॥ ২৭ ॥
জয় জয় শ্রীগৌরাঙ্গ বাঞ্ছাকল্পতরু।
সর্ব্বজীবের পরমাত্মা পরমগুরু ॥ ২৮ ॥
জয় জয় শ্রীগৌরাঙ্গ প্রাণের ঈশ্বর।
সবাকারে নাচাও হইয়া যাদুকর ॥ ২৯ ॥
জয় জয় শ্রীগৌরাঙ্গ নট-শিরোমণি।
যেমনি করে নাচাও নাচয়ে তেমনি ॥ ৩০ ॥
জয় জয় শ্রীগৌরাঙ্গ করুণানিধান।
জনমিলা নাম সঙ্গে করিয়া বিধান ॥ ৩১ ॥
জয় জয় শ্রীগৌরাঙ্গ শ্রীশচীনন্দন।
গ্রহণছলে লওয়াইলা নাম-সংকীর্ত্তন ॥ ৩২ ॥
ঈশ্বরের কর্ম্ম বুঝিবার শক্তি কার ?
রাহু আচ্ছাদিল চন্দ্রে ইচ্ছায় তোমার ॥ ৩৩ ॥
জয় জয় জগতজীবন গৌরচন্দ্র।
অনুক্ষণ হউ স্মৃতি তুয়া পদদ্বন্দ্ব ॥ ৩৪ ॥
জয় জয় জগতজীবন গৌরচন্দ্র।
হৃদয়ে স্থান দেহ তব পদদ্বন্দ্ব ॥ ৩৫ ॥
অগতির গতি প্রভু তুমি যে আমার।
ফাল্গুনী পূর্ণিমায় কোটি নমস্কার ॥ ৩৬ ॥

—শ্রীনকুলচন্দ্র সাহা
'হা গৌরাঙ্গ কুটীর' তমালতলা (নবদ্বীপ)

শ্রীচৈতন্যদেব ও শ্রীহরিনাম

শ্রীহরিনাম সর্ব্বযুগেই শ্রেষ্ঠ সাধন বলিয়া বিচারিত হইলেও অন্যান্যযুগে ধ্যান, যজ্ঞ এবং অর্চ্চন-বিধিরও বহুল প্রচলন ছিল। যেমন মৃতসঞ্জীবনী ঔষধ বিষয়ে অজ্ঞ চিকিৎসকগণ রোগনিবারণার্থে ত্রিকটু নিম্বাদি নানাবিধ ক্লেশকর ও কষ্টসাধ্য ঔষধাদির ব্যবস্থা করিয়া থাকেন, তদ্রূপ সত্য, ত্রেতা ও দ্বাপরযুগে ধ্যান, যজ্ঞ ও অর্চ্চনাদির ব্যবস্থাকেও জানিতে হইবে। সুচতুর ও মৃতসঞ্জীবনী ঔষধ বিষয়ে অভিজ্ঞ চিকিৎসক একমাত্র সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মৃতসঞ্জীবনীর ব্যবস্থা করিয়া রোগীকে বিনা যন্ত্রণা ও বিনা ক্লেশেই নিরাময় করিয়া থাকেন, সেইরূপ সত্য, ত্রেতা ও দ্বাপর যুগেও অজামিল, রত্নাকর প্রভৃতিকে একমাত্র শ্রীহরিনামাশ্রয় করিয়া সর্ব্বাধিক পাপ হইতে অনায়াসে নির্ম্মুক্ত হইয়া অতীব সুখে শ্রীহরির পাদপদ্ম লাভ করিতে দেখা যায়। সত্যযুগে হাজার হাজার বৎসর করিয়া বায়ুভুক্ হইয়া, ঊর্দ্ধপদ ও হেঁটমুণ্ডে থাকিয়া কঠোর তপস্যা ও ধ্যানাদিতে বহুকষ্টে সাধকগণ যাহা লাভ করিতেন, অজামিল অনায়াসে ও অতীব সুখকর শ্রীনাম কীর্ত্তন-পন্থায় তদপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বস্তুকে লাভ করিলেন। ত্রেতাযুগে রত্নাকরের ন্যায় ঘোর পাপী, যাহার সংস্পর্শ দূরে থাকুক, দর্শন-মাত্রেই জলাশয়েরও জল শুষ্ক হইয়া গিয়াছিল, সেই ব্যক্তিও শ্রীহরিনাম কীর্ত্তনের দ্বারা সমস্ত পাপ-নির্ম্মুক্ত হইয়া অতিশ্রেষ্ঠ মুনির পদবী লাভ করিলেন। সুতরাং অন্যান্য যুগে যে হরিনামের মাহাত্ম্য অন্যান্য পন্থা হইতে হীন ছিল তাহা কখনই নহে। তবে অনধিকার হেতু এইরূপ শ্রেষ্ঠ বস্তুতেও সকলের রুচি ছিল না বলিয়াই অন্যান্য যুগে আড়ম্বরপূর্ণ মার্গে সাধারণ ব্যক্তিগণ আসক্ত হইতেন। পরন্তু শ্রীহরিনামের মাহাত্ম্য কেবল কলিযুগে বৃদ্ধি পাইয়াছে, অন্যযুগে তাহা এত অধিক ছিল না, অথবা অন্য পন্থা সাধনে শক্তিহীন বলিয়াই কলিযুগের মানবগণ এই নিকৃষ্ট সাধন (?) হরিনাম করিবেন—তাহা নহে।

সত্য, ত্রেতা ও দ্বাপরের অনধিকারী ব্যক্তির ন্যায় এই কলিযুগে বহু ব্যক্তিকে তজ্জন্য শ্রীনাম গ্রহণে অনাদর করিয়া অন্যান্য মার্গে ভ্রমণ করিতে দেখা যায়। এ স্থলে বিশেষ বিচার এই যে, অন্যান্য যুগে জীবগণের সামর্থ্য ছিল বলিয়া শ্রীনাম ব্যতীত অন্য পন্থারও তখন ব্যবস্থা ছিল অর্থাৎ তৎকালে জীবহৃদয় বর্ত্তমান কালের ন্যায় পাপমলিন না হওয়ায় অন্য পন্থাগুলি ভক্তির আনুগত্যেই প্রতিষ্ঠিত ছিল। কিন্তু কলিহত জীবগণ সেই শক্তি-সামর্থ্য হইতে

বঞ্চিত বলিয়া কলিকালে অন্য পন্থা নিষিদ্ধ হইয়াছে এবং একমাত্র শ্রীহরিনামই বিহিত হইয়াছে জানিতে হইবে। যথা :—

হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলম্।
কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা॥

কলিসন্তরণ উপনিষদ্ ও পদ্মপুরাণাদি অন্যান্য শাস্ত্র তারস্বরে এই কথা কীর্ত্তন করিয়া কলির জীবকে একমাত্র শ্রীহরিনামাশ্রয় করিবার এবং অন্যান্য পন্থা পরিত্যাগ করিবারই উপদেশ করিয়াছেন। শাস্ত্র প্রতিজ্ঞা করিয়া ত্রিসত্য করিয়া এই বিধি ও এই নিষেধ কীর্ত্তন করিয়াছেন। 'হরের্নাম' পদটী একবার মাত্র উল্লেখ না করিয়া তিনবার উল্লেখ করিবার প্রয়োজন কি আছে —তাহা অনুধাবন করা আবশ্যক। তিনবার উল্লেখের দ্বারা ইহা শাস্ত্রের ত্রিসত্য করিয়া প্রতিজ্ঞাই সূচিত হইয়াছে। শাস্ত্র এইরূপে বলিতেছেন যে, হরিনামই কলিকালে একমাত্র সাধন। পাপমলিনচিত্ত মানবের তথাপি বিশ্বাস না হওয়ায় 'হরের্নাম' পদের সহিত প্রতি বারেই 'এব' পদটী উচ্চারণ করিলেন। এব—নিশ্চয়ার্থে। সুতরাং 'এব' পদের দ্বারা অধিকতর নিশ্চয় ভাব প্রকাশ করিলেন। তথাপি মন্দভাগ্য মানব মনে করিতেছে—সামান্য 'হরি' এই শব্দ উচ্চারণ করিয়া কি কখনও কর্ম্ম-জ্ঞান-যোগাদির সমতুল্য বস্তুকে লাভ করা সম্ভবপর হয়? এত আড়ম্বরপূর্ণ যাগ-যজ্ঞ-পূজা-যোগের ফল শুধু হরিনাম করিলে কি পাওয়া যাইবে? তাহাদের এই সংশয় বিদূরিত করিবার জন্য শাস্ত্র 'কেবলম্' পদটী উদ্ধার করিলেন। অর্থাৎ কেবল হরিনামই কর্ত্তব্য, ইহার সহিত কিছুটা কর্ম্ম, জ্ঞান ও যোগাদি না মিশাইলে সম্যক্ ফল ফলিবে না—এ বিচার সম্পূর্ণরূপে নিরাস করিতেছেন। তাহা আরও স্পষ্টীকৃত করিবার জন্য সাক্ষাদ্ভাবে নিষেধ-বাক্য উচ্চারণ করিয়া বলিতেছেন,—'নাস্তি', 'নাস্তি', 'নাস্তি'। তিনবার উচ্চারণদ্বারা পূর্ব্ববৎ ত্রিসত্য প্রতিজ্ঞাই সূচিত হইতেছে এবং অধিকতর দৃঢ়তার জন্য তিনটী পদেই 'এব' পদটী সংযুক্ত করিয়াছেন অর্থাৎ এই হরিনাম ব্যতীত অন্য পন্থা বা সাধন কলিকালে সম্পূর্ণরূপে বর্জ্জিত—ইহাই জ্ঞাপন করিলেন। শাস্ত্রের প্রতি অবজ্ঞা করত যে সমস্ত মানব শ্রীহরিনাম আশ্রয় না করিয়া অন্যান্য মার্গে প্রধাবিত হইতেছেন, তাঁহারা শাস্ত্র ও ভগবচ্চরণে অপরাধ অর্জ্জন করিয়া কেবলমাত্র অধোগতিই লাভ করিবেন—সন্দেহ নাই।

শ্রীমন্মহাপ্রভু কলিজীবের প্রতি কৃপাপরবশ হইয়া অবতীর্ণ হন এবং শাস্ত্রমধ্যে লুক্কায়িত এই বাণীকে জীবের সম্মুখে প্রকাশ করিয়া দিলেন।

ইতঃপূর্ব্বে এই শ্লোকটী আর কাহারও আদরের বিষয় বলিয়া দৃষ্টি আকর্ষণ করে নাই। ইহা শ্রীমন্মহাপ্রভুর লীলায় আত্মপ্রকাশ করিবার জন্যই যেন এতকাল শাস্ত্রমধ্যে আত্মগোপন করিয়া অবস্থান করিতেছিল।

শ্রীমন্মহাপ্রভু শুধু এই শ্লোকের আবিষ্কারক নহেন। তিনি ছিলেন—এই শ্লোকের মূর্ত্ত বিগ্রহ। তিনি এই শ্লোকস্থ "কেবলম্" পদটীর অটুট আদর্শ ছিলেন এবং তদ্দ্বারাই কৈবল্যের শুদ্ধস্বরূপ জগৎকে শিক্ষা দিয়াছেন। এই হেতু তিনি কর্ম্ম, জ্ঞান ও যোগাদি পন্থাকে তাঁহার লীলায় সর্ব্বত্রই গর্হণ করিয়াছেন। তিনি নামাত্মক ভক্তিযোগকে অন্যান্য মতের সহিত তজ্জন্য কোথাও সমপর্য্যায়ভুক্ত বা সমান বলিয়া শিক্ষা দেন নাই। তিনি শ্রীহরিনামকে অসমোর্দ্ধ তত্ত্ব বলিয়াই শিক্ষা প্রদান করিয়াছেন। শ্রীহরিনাম ও শ্রীহরি অভিন্ন বস্তু—ইহাও তিনি শাস্ত্রবাক্য উদ্ধার করিয়া জীবকে জানাইয়াছেন। যথা:—

নামঃ চিন্তামণিঃ কৃষ্ণশ্চৈতন্য-রসবিগ্রহঃ।
পূর্ণঃ শুদ্ধো নিত্যমুক্তোঽভিন্নত্বান্নামনামিনঃ॥ (পদ্মপুরাণ)

তিনি পদ্মপুরাণ হইতে আরও জানাইলেন—"ধর্ম্ম-ব্রত-ত্যাগ-হুতাদি-সর্ব্ব-শুভক্রিয়া সাম্যমপি প্রমাদঃ।" সুতরাং শ্রীনামের সহিত অন্যান্য শুভক্রিয়াকে সমান জ্ঞান করিলে তাহা কখনই নামভজন হইবে না। পরন্তু ইহাতে শ্রীনামের চরণে অপরাধ অর্জ্জিত হইবে—ইহাই শ্রীমন্মহাপ্রভুর ও নিখিল শাস্ত্রের শিক্ষা।

শ্রীনামভজনই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম—ইহাই সমস্ত শাস্ত্রের অভিমত। সর্ব্বশাস্ত্র-শিরোমণি শ্রীমদ্ভাগবত বলিতেছেন,—

এতাবানেব লোকেঽস্মিন্ পুংসাং ধর্ম্মঃ পরঃ স্মৃতঃ।
ভক্তিযোগো ভগবতি তন্নাম গ্রহণাদিভিঃ॥

অর্থাৎ জীবগণের বহু ধর্ম্মে রুচি হইলেও সকল ধর্ম্মই একই স্তরের নহে। নিরপেক্ষভাবে বিচার করিলে দেখা যায়, সর্ব্বেশ্বরেশ্বর ভগবান্ বিষ্ণুর শ্রীনাম গ্রহণদ্বারা অনুষ্ঠিত ভক্তিযোগই পর অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম।

শাস্ত্রে বহু ক্ষেত্রেই এইরূপ পরধর্ম্মের উল্লেখ করিয়া সমস্ত মতেই যে একইরূপ ফল ফলে না, তাহাই প্রকাশ করিয়াছেন। শাস্ত্রে সকল মতকে এক না বলিয়া সবগুলির তুলনামূলক বিচারদ্বারা ভক্তিপথকেই একমাত্র শ্রেষ্ঠতম বলিয়া সর্ব্বত্রই কীর্ত্তন করিয়াছেন। গীতাশাস্ত্র সম্যক্‌রূপে আলোচনা করিলে দেখা যায়—গুহ্য, গুহ্যতর, গুহ্যতম ও সর্ব্বগুহ্যতম প্রভৃতি তারতম্যমূলক শব্দের প্রয়োগ-

দ্বারা 'সকল মতই এক বা সমান' ইহার নিষেধ করিয়া চরমে শরণাগতিমূলক ভক্তিধর্ম্মকেই উল্লেখ করিয়াছেন। তজ্জন্য অন্য সমস্ত ধর্ম্মকে ত্যাগ করিবার বিধিও প্রদত্ত হইয়াছে। যথা :—

"সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।"

সমস্তধর্ম্মকে পরিত্যাগ করিয়া বিষ্ণুভক্তিকে আশ্রয় করিবার উপদেশ সর্ব্বত্রই পরিদৃষ্ট হয়, কিন্তু কুত্রাপি বিষ্ণুভক্তিকে ত্যাগ করত অন্য উপাসনার বিধি নাই; পরন্তু মোহ বা দুর্ভাগ্যবশতঃ কেহ এরূপ করিলে শাস্ত্র তাহাকে যথেষ্ট নিন্দা করিয়াছেন। যথা :—

বাসুদেবং পরিত্যজ্য যো অন্যদেবমুপাসতে।
তক্তামৃতং স মূঢাত্মা ভুঙ্‌ক্তে হলাহলং বিষম্॥ (স্কন্দপুরাণ)

অর্থাৎ যে ব্যক্তি বাসুদেবকে পরিত্যাগ করিয়া অন্য দেবতা উপাসনা করে, সেই মূঢ়াত্মা অমৃত পরিত্যাগ করিয়া হলাহল বিষ পান করে।

সর্ব্বশাস্ত্র-শিরোমণি শ্রীমদ্ভাগবত অন্যান্য মত বা ধর্ম্ম হইতে ভক্তিকে স্পষ্ট করিয়াই শ্রেষ্ঠ বলিয়া কীর্ত্তন করিতেছেন।—

ন সাধয়তি মাং যোগো ন সাঙ্খ্যং ধর্ম্ম উদ্ধব।
ন স্বাধ্যায়স্তপস্ত্যাগো যথা ভক্তির্ম্মমোর্জ্জিতা॥ (ভাঃ ১১।১৪।২০)

অর্থাৎ আমার প্রতি ঐকান্তিকী ভক্তি যেরূপ আমাকে অধীন বা বশীভূত করিতে পারে, সাঙ্খ্যজ্ঞান বা যোগাদি পন্থা তদ্রূপ পারে না।

উপনিষদেও ভক্তিরই মাহাত্ম্য প্রদর্শিত হইয়াছে। যথা—

ভক্তিরেবৈনং নয়তি ভক্তিরেবৈনং দর্শয়তি।
ভক্তিবশঃ পুরুষো ভক্তিরেব ভূয়সী॥

যুক্তির দিক্ হইতে দেখিলেও বিচারিত হয় যে, এই জগৎ পরজগতের প্রতিবিম্ব বা ছায়াসদৃশ। মূল বিম্বে যাহা বর্ত্তমান, এখানে তাহারই হেয় প্রতিচ্ছবি পরিলক্ষিত হয় মাত্র। এ জগতে এমন দুইটী বস্তু নাই যাহারা সর্ব্বতোভাবে সমান। কিছু না কিছু ভেদ পরস্পর অবশ্যই বর্ত্তমান থাকে। একই মাতৃগর্ভে একই পিতার ঔরসে জন্মগ্রহণ করিয়াও দুইটী ভ্রাতাও সর্ব্বতোভাবে সম হইতে পারে না। প্রতিবিম্বে যদি এরূপ পরিদৃষ্ট হয়, তবে মূল বিম্বেও তদ্রূপ নিত্যভেদ অবশ্যই স্বীকার্য্য। বৈশিষ্ট্যহীনতা ব্রহ্মের ধর্ম্ম নহে, পরন্তু বৈশিষ্ট্যই ব্রহ্মের স্বভাব। জোর করিয়া ব্রহ্মকে নির্ব্বিশেষ বলিয়া মনে করিলেও তাহা কখনই তদ্রূপ নহে। নির্ব্বিশেষ বচন শাস্ত্রের অচিদ্বৈশিষ্ট্য নিরসনপূর্ব্বক চিদ্বৈশিষ্ট্য স্থাপনের প্রয়াস বলিয়াই জ্ঞাতব্য। বর্ত্তমান যুগের যে 'সকলই

সমান' বিচার—ইহা হাস্যাস্পদ বিচার মাত্র। ধনী-দরিদ্র, পণ্ডিত-মূর্খ, শিক্ষিত-অশিক্ষিত, সাধু ও ঠগ, সৎ ও অসৎ—এই বৈশিষ্ট্য কখনই রদ করা যাইবে না। তজ্জন্য 'সব সমান' করিয়া চিৎকারটী মাত্র মৌখিকই রহিল, কার্য্যে তাহা কখনই পরিণত হইবে না বা হইতে পারে না। কারণ বস্তুই বৈশিষ্ট্যময়। সুতরাং ধর্ম্মক্ষেত্রেও সেই বৈশিষ্ট্য বর্ত্তমান বলিয়া সমস্ত মত কখনই একই ফল প্রসব করে না।

বর্ত্তমান উচ্ছৃঙ্খল যুগে, সব সমানের যুগে, সর্ব্ব ধর্ম্ম সমন্বয়ের যুগে সর্ব্ব-বিভাগেই উচ্ছৃঙ্খলতাই নৃত্য করিতেছে। এক্ষণে উচ্ছৃঙ্খলতাই উদারতা বলিয়া বিবেচিত হইতেছে। 'সব সমান' মন্ত্রের কুফলে সমাজ এতই উচ্ছৃঙ্খল যে বালক বৃদ্ধকে সম্মান করে না, লঘু গুরুকে ভক্তি করে না, মূর্খ পণ্ডিতকে শ্রদ্ধা করে না। এই সব-সমান কুমন্ত্রের কুফলে সামাজিক জীবন অত্যন্ত বিপদাপন্ন হইয়া নিস্তার লাভের উপায় চিন্তায় ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছে। এইরূপ উচ্ছৃঙ্খলতা রাজনীতি ক্ষেত্রে, সাহিত্য ক্ষেত্রে ও ধর্ম্মক্ষেত্রেও প্রবেশ করিয়াছে। তৎফলেই সর্ব্বধর্ম্মসমন্বয় অর্থে 'সব সমান' দাঁড়াইয়াছে। পরন্তু সমন্বয়-শব্দে এইরূপ 'সব সমান' না হইয়া 'যথাযোগ্য' অর্থই সঙ্গত। কর্ত্তা, কর্ম্ম ও ক্রিয়াদির যথাযোগ্য স্থানে প্রতিষ্ঠাকেই যেমন অন্বয় বলা যায়, তদ্রূপ কর্ম্ম, জ্ঞান, যোগ ও ভক্তি প্রভৃতি মতের মধ্যে ভক্তিকে শ্রেষ্ঠ আসন দিয়া অন্যগুলিকে যথাযোগ্য মর্য্যাদা প্রদানই সমন্বয়ের উদ্দেশ্য। কিন্তু অধুনা এই উদ্দেশ্য বিপর্য্যস্ত হইতেছে। তজ্জন্যই উচ্ছৃঙ্খল ও দাম্ভিক সমাজ আজ হীন হইয়াও নিজেকে হীন বলিয়া মানিতে নারাজ। আহার-বিহার, আচার-বিচার ও ধর্ম্মচিন্তায় তামসিক ভাবাপন্ন হইয়াও সত্ত্বগুণাপন্ন সদাচারী ও সদ্ধর্ম্মাবলম্বী সাধুগণের সহিত সমান মর্য্যাদা দাবী করিতেও লজ্জিত হয় না। সেইজন্য সম্প্রদায়ের গণ্ডীকে ভঙ্গ করিয়া তমোগুণের প্রতিষ্ঠামানসে সৎসম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করিয়া আসুরিক স্বভাবের পরিচয় দিতেছে।—ইহাই কলিকালোচিত বৃত্তি। সাধুসমাজ ইহাতে বিন্দুমাত্র আশ্চর্য্যান্বিত ও ভীত নহেন। তাঁহারা জানেন—অসত্যের প্রতিষ্ঠা কোনদিনই নাই। তামসিক কালের অনুকূলে তাহা কিয়দ্দিন মাত্র প্রবল থাকিয়া দৈব বলে অচিরেই নাশ প্রাপ্ত হইবে। (ক্রমশঃ)

—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত ত্রিবিক্রম মহারাজ

শিষ্ট ও অশিষ্টাচার

যাঁহারা সাত্বত-স্মৃতির শাসন মানিয়া চলে না তাঁহারা অশিষ্ট। অশিষ্টগণ প্রেয়ঃপথের পথিক ; তাঁহারা মানসিক বৃত্তি চরিতার্থতার জন্য স্বেচ্ছাচারী হইয়া পড়েন। সুতরাং তাঁহাদের আচারে স্বেচ্ছাচারিতার প্রবল তরঙ্গ দৃষ্ট হয়। শাস্ত্রের শাসনবাণীর সহিত নিজেদের অশান্ত মনের চিন্তাস্রোতের মিল হয় না বলিয়া অনেক সময় তাঁহারা সাত্বত শাস্ত্রকারগণকে একদেশদর্শী, সাম্প্রদায়িক প্রভৃতি সংজ্ঞা প্রদান করিয়া তাঁহাদিগকে অজ্ঞ এবং নিজদিগকে বিজ্ঞ জ্ঞান করেন। কোনও পাশ্চাত্ত্য মনীষী বলিয়াছেন,—"We think our fore-fathers and superiors fool. Our wiser sons and daughters will no doubt think us so." বস্তুতঃ অশিষ্টাচারের গতি এই প্রকারই। প্রতিষ্ঠা লাভের আশায় নিজেদের প্রতিভা দেখাইতে যাইয়া যদি আমরা আমাদের পরম হিতৈষী পূর্ব্বাচার্য্যগণকে অজ্ঞ বলিতে দ্বিধা বোধ না করি, তাহা হইলে আমাদের সন্তানসন্ততিগণ যে আমাদের উচ্ছৃঙ্খলবৃত্তি লক্ষ্য করিয়া আমাদিগকে অজ্ঞ, মূর্খ, অসভ্য প্রভৃতি বলিবে, তাহাতে আর বিচিত্র কি?

একটী সত্য ঘটনা লিখিতেছি। কোনও স্ত্রীলো কতাহার বৃদ্ধা শ্বশ্রূমাতাকে সর্ব্বদা বাক্যবাণে জর্জ্জরিত করিত। বৃদ্ধা একটী ভগ্ন পাথরের থালায় আহার করিত। আহারান্তে থালাটী তাহাকেই পুষ্করিণীতে লইয়া যাইয়া ধৌত করিতে হইত। একদিন পুষ্করিণী হইতে আসিবার সময় থালাটী হস্ত হইতে পড়িয়া একেবারে চূর্ণ হইয়া গেল। ইহাতে বৃদ্ধার পুত্রবধূর ক্রোধের আর পরিসীমা রহিল না। সে অনর্গল ধারায় বচনামৃত বর্ষণ করিতে লাগিল। এই গালি শ্রবণ করিয়া তাহার পুত্র—বৃদ্ধার পৌত্রও বৃদ্ধাকে গালি দিয়া বলিতে লাগিল— "বুড়ি তুই আমার যে ক্ষতি কর্‌লি এইরূপ ক্ষতি আর কেহ করে নাই। ভাঙ্গা পাথরখানা যে একেবারে চুর্‌মার কর্‌লি, আমার মা যখন বৃদ্ধা হইবে তখন আমি তাহাকে ভাত দিবার জন্য এইপ্রকার মূল্যবান্ ভাঙ্গা পাথর আর কোথায় পাইব?"

এইবার বৃদ্ধার পুত্রবধূর একটু চৈতন্যোদয় হইল। সে দেখিল—বৃদ্ধাকে সে যেভাবে উৎপীড়িত করিতেছে, তাহার পুত্রও তাহাকে সেইপ্রকার উৎপীড়নের জন্য প্রস্তুত হইতেছে। ঐ দিন হইতে সে শিষ্ট হইল—শ্বশ্রূমাতাকে যথাসাধ্য যত্ন করিতে লাগিল। এই উদাহরণ দেখিয়া—নিজেরা অশিষ্ট হইলে সন্তান-

সন্ততিগণকর্তৃক তাহার উপযুক্ত পুরস্কার পাওয়া যাইবে, এই চিন্তা করিয়াও যদি জনগণ অশিষ্টাচার পরিত্যাগ করে তাহা হইলেও অন্ততঃ মন্দের ভাল নহে কি? উপদেশে শিক্ষা না হইলে অনেকে অপরের অবস্থা দেখিয়া শিক্ষা করে। সর্বশেষে ঠেকিয়া শিক্ষা হইয়া থাকে। তাহাতেও যাহার চৈতন্যোদয় না হয়, সে ত' পশুরও অধম।

সাত্বত-শাস্ত্রবাণীর প্রতি অনাদরের ফলে পুণ্যভূমি ভারতবর্ষের পর্য্যন্ত আজ কি ভীষণ দুর্গতি হইয়াছে। অনেকে বলিবেন,—ভারতে রেলগাড়ীর বন্দোবস্ত হইয়াছে, ডাকবিভাগের উন্নতি হইয়াছে, মুদ্রণ-যন্ত্রাদি হইয়াছে, নূতন নূতন শিল্পাগার প্রতিষ্ঠিত হইতেছে, সুতরাং ভারতের দুর্গতি কোথায়? কিন্তু ঐগুলি কি সুগতির চরম লক্ষণ? বৈজ্ঞানিক উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে অশান্তির মাত্রা বৃদ্ধি পাইতেছে কেন? অধিকাংশ স্থলেই ত' কনিষ্ঠ জ্যেষ্ঠকে সম্মানের চক্ষে দেখিতেছে না; ইহার কারণ কি? অপস্বার্থ আসিয়া বন্ধুতার মধ্যস্থলে দণ্ডায়মান হইতেছে কেন? দেশে দেশে, প্রদেশে প্রদেশে, বিভাগে বিভাগে, জেলায় জেলায়, মহকুমায় মহকুমায়, থানায় থানায়, বোর্ডে বোর্ডে, গ্রামে গ্রামে বিবাদ-বিসম্বাদ প্রজ্বলিত অবস্থায় কেন? জাতিতে জাতিতে অহি-নকুল সম্বন্ধ হইতেছে কেন? এইসকল কি অশিষ্টতা নহে?

শিক্ষার আগার যে-সকল স্থান, সে-সকল স্থান হইতেও ছাত্রবৃন্দের ক্রমশঃই অধিকতর দুর্বিনীত হইবার অভিযোগ শিক্ষক ও অধ্যাপকমণ্ডলী হইতেও পাওয়া যাইতেছে কেন? স্থিরচিত্তে নিরপেক্ষভাবে কারণ অনুসন্ধান করুন, দেখিতে পাইবেন, সাত্বত-স্মৃতির প্রতি ঔদাসীন্য-পরমার্থশিক্ষার প্রতি দৃষ্টিহীনতাই ইহার মূলীভূত কারণ। কেহ কেহ বলেন,—পরাধীনতাই এই অশিষ্টতা-বৃদ্ধির কারণ; কিন্তু পাশ্চাত্য স্বাধীন দেশগুলির মধ্যে কি অশিষ্টতার উদাহরণ কিছু কম পাওয়া যায়?

শিষ্টতার আগার হৃদয়ে ধারণ করিয়া যাঁহারা আমাদের জন্য অহৈতুক-করুণাবশতঃ উপদেশবাণী সাত্বতশাস্ত্ররূপে সংরক্ষণ করিয়াছেন, তৎপ্রতি যদি উপেক্ষা প্রদর্শন করি—প্রকৃত শিক্ষককে যদি অবহেলা করি—যাহা আমাকে শিষ্টাচার শিক্ষা দিবে, তাহাকে যদি উড়াইয়া দিবার চেষ্টা করি, তাহা হইলে অশিষ্টাচার বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বিকৃতমস্তিষ্কতার ফলস্বরূপ অশান্তির অনল সমগ্র দেশ গ্রাস করিবে বৈকি? তাই আমাদের শিক্ষিত ভ্রাতৃবৃন্দের নিকট নিবেদন —তাঁহারা কি ঠেকিয়াও শিখিবেন না? পরমার্থ-জ্ঞানের অভাবে যে ভীষণ অবস্থা শিক্ষামন্দিরে পর্য্যন্ত আত্মপ্রকাশ করিয়াছে, তাহা প্রতিক্ষণ অনুভব

করিয়াও কি "Back to God and back to Home" এর জন্য যত্নবিশিষ্ট হইবেন না? তাঁহারা কি প্রকৃত শিষ্টাচার—ভগবৎসেবায় আত্মনিয়োগপূর্ব্বক "আপনি আচরি' ধর্ম্ম জীবেরে শিখায়" এই শিক্ষাসার বরণ করিবেন না? তাহা হইলে তাঁহাদের শিক্ষার মূল্য কি?

পাশ্চাত্য ভূখণ্ড হইতে আমদানী কপট-শিষ্টাচার ভারতের সম্পত্তি নহে। মনঃপ্রাণে সরল হইয়া ভগবদ্ভজন—জীবমাত্রকেই স্বরূপতঃ ভগবদ্দাস জানিয়া সকলকেই প্রীতির চক্ষে অবলোকন—সকলকেই ভগবদ্ভজনের মাধুর্য্য আকর্ষণই ভারতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ শিষ্টাচার। সে-স্থানের আচার ব্যবহার যে আবরণেই আবৃত থাকুক এই শিষ্টাচারের অভাব যে-স্থানে, ভারত—পরমার্থ-ভারতের দৃষ্টিতে তাহা অশিষ্টাচার ব্যতীত আর কিছুই নহে। পরমার্থ-ভারত সর্ব্বদাই স্বাধীন আছে, ভবিষ্যতেও স্বাধীন থাকিবে। পরমার্থ-ভারত জগতের গুরু, তিনি স্বীয় শিষ্টাচারের আলোকে জগতের যাবতীয় অশিষ্টাচার দূরীভূত করিবেন। তাঁহার অধীনতায় থাকাই প্রকৃত মনুষ্যত্ব।

—শ্রীউপেন্দ্রকৃষ্ণ দাস ব্রহ্মচারী

অপবর্গের স্বরূপ ও তল্লাভোপায়

ত্রৈবর্গিক ও আপবর্গিক-ভেদে ধার্ম্মিকগণ চারিশ্রেণীতে বিভক্ত—কর্ম্মী, জ্ঞানী, যোগী ও ভক্ত। অভক্ত ভোগিগণ বা ফলভোগী কর্ম্মিগণ বিচার করেন,—"ধর্ম্মের অর্থই ফল, অর্থের কামই ফল, কামের ইন্দ্রিয়প্রীতি ফল, ইন্দ্রিয়প্রীতির পুনরায় ধর্ম্মই ফল অর্থাৎ ধর্ম্মার্থ-কাম-পরম্পরাই প্রয়োজনীয় ত্রিবর্গ।" কিন্তু জ্ঞানী, যোগী ও ভক্তের বিচারে ধর্ম্মের ফল পরপর শম-দমাদি, যম-নিয়মাদি ও শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি। জ্ঞানী ও যোগিগণ 'মোক্ষ'কেই অপবর্গ বলিয়া থাকেন। ভক্তের মতে 'প্রেমভক্তিই' অপবর্গ। অপবর্গের আভিধানিক অর্থ—মুক্তি, সংসারবন্ধন-মোচন, জীবাত্মার পরমাত্মার মিলন প্রভৃতি হইলেও, সকল শাস্ত্র কেবলমাত্র 'প্রেমভক্তিকেই' অপবর্গ শব্দে চিহ্নিত করিয়াছেন। ভাগবতের ১ম স্কন্ধের ১৮শ অধ্যায়ের ১৬শ শ্লোকের তাৎপর্য্যমতে, 'অপবর্গ' শব্দ হরিভক্তিতেই পর্য্যবসিত। ভাঃ ১।১৮।১৬ শ্লোকের টীকায় শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী 'অপবর্গের' সংজ্ঞা দিয়াছেন,—"অপবর্গ ইত্যাখ্যা যস্য তৎ,

ভক্তের্ভগবৎপাদমূলমেবাপবর্গ উচ্যতে।" উক্ত শ্লোকের তথ্যে জগদ্গুরু শ্রীল সরস্বতী প্রভুপাদ বলিয়াছেন,—"অপবর্গ—ভগবৎপাদমূল বা ভক্তি-যোগ।" সর্ব্বভূতাত্মা, বাগাদি রহিত, বাক্যের অগোচর, অনাধার (নিজেই নিজের আশ্রয়স্বরূপ), পরমেশ্বর ভগবান্ বাসুদেবে অহৈতুকী ভক্তিযোগই যে অপবর্গের স্বরূপ তাহা আবার শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তীর ভাঃ ৫।১৯।১৯ শ্লোকের টীকা "বাসুদেব বসুদেব-নন্দনেঽনন্ত নিমিত্তোঽহৈতুকো ভক্তিযোগ এব লক্ষণং স্বরূপং যস্য সঃ। নন্বপবর্গ-শব্দেন রূঢ্যা মোক্ষ এবোচ্যতে।" হইতে পাওয়া যায়। স্কান্দের রেবাখণ্ডেও নিশ্চলা হরিভক্তিকেই অপবর্গ বলিয়াছেন।

ভক্তি সম্পাদনাই অপবর্গের স্বরূপ। আপবর্গ্য-ধর্ম্মের ফল 'অর্থ'—এইরূপ কখনও হইতে পারে না। আবার অব্যভিচারী অর্থে কাম বা বিষয়ভোগ ফল নহে—তাহাই তত্ত্ববিদ্‌গণ স্থির করিয়াছেন। কাম বা বিষয়ভোগের ফল ইন্দ্রিয়প্রীতি নহে, কারণ যে-কাল পর্য্যন্ত জীবন থাকে, তৎকালাবধিই কেবল বিষয়ভোগ লাভ ঘটে অর্থাৎ কাম জীবনাবধিই সেব্য। জীবের জীবনের পুনরায় ধর্ম্মানুষ্ঠানদ্বারা যে কর্ম্মফল-প্রসিদ্ধ স্বর্গাদি লাভ, তাহা জীবের জীবনের চরমফল হইতে পারে না। স্বর্গাদি ফল নশ্বর অনাত্ম-প্রতীতির ভোগমাত্র। স্বরূপে ভগবদ্দাস জীবগণ নিজ নিজ স্বভাবে মায়াদ্বারা অভিভূত হইয়া ভগবৎসেবা করিবার অযোগ্য হইলে তাঁহারা স্থূল ও সূক্ষ্ম আবরণদ্বয়কে আত্মপ্রতীতিতে গ্রহণ করে। তাঁহাদের অজ্ঞানের চেষ্টাকে নশ্বর উপলব্ধি বা হরিবিমুখতা বলে।

স্থূল-সূক্ষ্ম দেহাভিমানী হরিবিমুখ জীব কর্ম্মালানে বদ্ধ হইয়া ত্যাগ ও গ্রহণ—এই অনিত্য কর্ম্মদ্বয়ের আহ্বান করে। বিবর্ত্তাশ্রিত জীব পথভ্রষ্ট হইয়া ত্রিগুণময়ী মায়ার ভূমিকায় নাসিকাবদ্ধ বলদের ন্যায় ভবাটবীতে ভ্রমণ করে। এই ভ্রমণের পথই কর্ম্মমার্গ। স্বরূপবিস্মৃতির ফলেই জীবের কর্ম্মফল-বাধ্যতা জন্মে, তাহাতে চতুরশীতি লক্ষ বিভিন্ন যোনিলাভ ও ভোগময়ী চেষ্টা বর্ত্তমান থাকে। দেহের পুষ্টির জন্য খাদ্য গ্রহণ করিলে যেমন উদরস্থিত ক্রিমিকুল সেই খাদ্যে পুষ্টিলাভ করে এবং ফলে দেহের পুষ্টিবিষয়ে খাদ্যের যোগ্যতা থাকে না, সেইরূপ নশ্বর স্বর্গাদি-সুখ নিত্য আত্মার স্বাভাবিক বৃত্তির উদ্দীপনের পরিবর্ত্তে অনাত্ম-প্রতীতিদ্বারা ভোগে শৃঙ্খলাবদ্ধ করে।

নশ্বরতাহেতু স্বর্গফল তুচ্ছ ও ক্লেশকর। আত্মসুখের উদ্দীপনায় নশ্বর স্বর্গাদি-সুখ মলিন ও অগ্রাহ্য হইয়া পড়ে। অধিরোহবাদাশ্রয়ে মায়াবদ্ধ জীবের অতিশয় ক্লেশে উপার্জ্জিত নশ্বর সুখভোগকেও আত্মবিৎ অকিঞ্চিৎকর

জানেন। বাস্তবিক তত্ত্বজিজ্ঞাসাই জীবের জীবনের ফল। সেই তত্ত্বজ্ঞানই ভক্তির গৌণ ফল বলিয়া শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে, সেই ভক্তিই প্রকৃত জীবনের পরম ফল। ভক্তি ব্যতীত কর্ম্মচেষ্টার অন্তরালে সচ্চিদানন্দ-ভগবৎ-সাক্ষাৎকারের অভাবে নশ্বর অজ্ঞান ও ক্লেশ বর্ত্তমান আছে।

অন্যাভিলাষ, কর্ম্মফলভোগ ও নির্ভেদ ব্রহ্মানুসন্ধান—এই তিনটী জীবের বন্ধনের কারণ। মুক্তির অনিচ্ছাক্রমে যে সকল বদ্ধজীব ভুক্তির আবাহন করেন, তাঁহারা যথেচ্ছাচারিতার বন্ধনে এবং পুণ্যবন্ধনে ধর্ম্মার্থ-কাম-লাভাশায় আবদ্ধ হন। আর যাঁহারা এই ফলভোগ-বাসনার হস্ত হইতে পরিত্রাণ লাভ করিয়া মুক্ত হইবেন বা হইয়াছেন মনে করেন, তাঁহারাও হরিবিমুখতার বন্ধনে আবদ্ধ হন। যথেচ্ছাচারিতার হস্ত হইতে পুণ্যকামী ফলভোগী কর্ম্মী যে বৈরাগ্য প্রদর্শন করেন, তাহা ভোগবৃদ্ধির উদ্দেশ্যেই অনুষ্ঠিত হয়। আবার জ্ঞানীর যে নশ্বর ভোগ-বাসনায় বিরাগ, তাহাতেও ভগবৎসেবার প্রতি বিরাগ প্রবল থাকায় তাহাও বন্ধনের কারণ।

কর্ম্ম-জ্ঞানাদি উভয়প্রবৃত্তি অনাত্মচেষ্টারই বিশৃঙ্খলতা ও অমঙ্গলকর। আত্মবৃত্তি ভক্তির উদয়ে ভজন ব্যতীত অন্যসকল উদ্দাম চেষ্টার নিত্য অকর্ম্মণ্যতা প্রসিদ্ধ। নশ্বর ভোগ ও ত্যাগানুভূতিমুক্ত হইলেই জীব আত্মধর্ম্ম-ভক্তিতে অবস্থিত হন। ভক্তিবলেই আত্মদর্শন হয়। ভক্তি হইতে জাত জ্ঞান ও বৈরাগ্য ভক্তি হইতে স্বতন্ত্র হইয়া অভীষ্ট ফলপ্রদানে অসমর্থ। এই কারণে বর্ণাশ্রম-বিভাগ অবলম্বন করিয়া বর্ণাশ্রমে অবস্থিত হইয়া যথাবিহিত সুষ্ঠুভাবে যে ধর্ম্মাচরণ করেন, শ্রীহরির সন্তোষ-লাভই তাহার মুখ্য-ফল।

অপবর্গ দুই প্রকার :—(১) অভেদ অপবর্গ-সাযুজ্য, (২) অচিন্ত্য-ভেদাভেদ-মতে অপবর্গ শুদ্ধাত্মধর্ম্ম—পরাভক্তি। সাযুজ্য-সালোক্যাদি পঞ্চবিধ মুক্তির অন্যতম এবং অন্য চারটী মুক্তি অপেক্ষা অত্যন্ত নিকৃষ্ট ও ঘৃণার্হ। ভক্ত 'কৃষ্ণভক্তি' ব্যতীত অন্য কিছুই প্রার্থনা করেন না। ভাঃ ৩/২৯/১৩ "সালোক্য-সার্ষ্টি-সারূপ্য" শ্লোকে ভগবদ্বাক্য হইতে ইহার পরিষ্কার প্রমাণ পাওয়া যায়। শুদ্ধভক্তিতে সকলই শুভ হয়। কর্ম্মদ্বারা, তপস্যাদ্বারা, জ্ঞানদ্বারা, বৈরাগ্য-দ্বারা, অষ্টাঙ্গযোগদ্বারা, দানধর্ম্মদ্বারা এবং অন্য যতপ্রকার শুভকর্ম্ম আছে, সে-সমুদায়ের দ্বারা যে ফলের সম্ভাবনা থাকে, সে-সমুদয়ই ভক্ত ভক্তিযোগের দ্বারা সহজে প্রাপ্ত হইতে পারেন। কিন্তু ভক্তির অনুকূল ব্যতীত ভক্ত অন্য কোন বস্তুই গ্রহণ করেন না। ত্রিবর্গজনক ধর্ম্ম একপ্রকার এবং অপবর্গজনক ধর্ম্ম আর একপ্রকার। ত্রিবর্গজনক ধর্ম্ম অর্থ ও কামকে উৎপন্ন করিয়া নিরস্ত হয়।

অপবর্গধর্ম্ম ত্রিবর্গদ্বারা সীমাবদ্ধ নয়। আপবর্গ্যধর্ম্মের অর্থ গৃহীত হইয়া কামলাভের জন্যই উহা অনুষ্ঠিত হয় না। ধর্ম্মে যে অর্থ হয় তাহাতে কাম পাওয়া যায় বটে, কিন্তু কামে একান্ত ধর্ম্মের পর্য্যবসান নয়। সে কাম কেবল জীবনযাত্রার উপযোগী মাত্র। কামভোগ চরম নয়, ইন্দ্রিয়প্রীতির অনুসন্ধান এই ধর্ম্মে নাই। নিষ্পাপ সহজ অবিরোধ জীবন নির্ব্বাহিত হইয়া জীবনের প্রধান উদ্দেশ্য যে কৃষ্ণভক্তি, তাহা সম্পাদিত হওয়াই অপবর্গ-ধর্ম্মের তাৎপর্য্য।

ভারতবর্ষে যে বর্ণের যেরূপ বিধান অর্থাৎ সন্ন্যাস-বাণপ্রস্থাদি বিহিত আছে, তাহা ব্যতিক্রম না করিয়া অর্থাৎ নিজ নিজ বর্ণধর্ম্মের অর্পণাদিক্রমে নরমাত্রের অপবর্গ লাভ ঘটে। জন্মজন্মান্তরের পরিপুষ্ট সুকৃতির ফলে যৎকালে ভগবদ্ভক্তের প্রকৃষ্টসঙ্গ লাভ হয়, তৎকালে দেব, তির্য্যক্, মনুষ্যাদি যোনিতে জন্মগ্রহণের হেতুস্বরূপ কাম্যকর্ম্মাদির মূল যে অবিদ্যাগ্রন্থি, তাহা ছিন্ন হইয়া বাসুদেবে অহৈতুক ভক্তিযোগস্বরূপ অপবর্গ লাভ হয়। বাসুদেব পরমকল্যাণ-সৌন্দর্য্যাদি-গুণবান্, সর্ব্বভূতচিত্তাকর্ষক, জীবাত্মার সেব্য প্রাকৃত রাগাদি-রহিত, বাক্যদ্বারা তাঁহার মাহাত্ম্য অলভ্য, মহাপ্রলয়কালে তাঁহার রূপ ও গুণের অনস্তিত্ব ঘটে না এবং প্রাকৃত তত্ত্বের ন্যায় তাঁহার লয় নাই ও তিনি পরমাত্মা ও ভজনীয়ত্বের পরমোৎকর্ষ। মুক্ত মহাত্মাগণই ভগবান্ বাসুদেবে অহৈতুক-ভক্তিযোগ-লক্ষণযুক্ত অপবর্গ লাভ করিয়া থাকেন।

এই প্রসঙ্গে স্কন্দপুরাণের রেবাখণ্ডে পাওয়া যায়,—"হে জনার্দ্দন! তোমার প্রতি নিশ্চলা সেবাই 'মুক্তি' পদবাচ্য, যেহেতু হে হরে, হে বিষ্ণো, মুক্তগণই কেবল তোমার ভক্তসমূহ।" এই প্রসঙ্গে ভাগবতে (ভাঃ ৭।৬।১৮) ভক্ত প্রহ্লাদ মহারাজ দৈত্যবালকগণকে উপদেশ দিতে গিয়া বলিয়াছেন,—"হে দৈত্যবালকগণ! কোন দেশে বা কোন কালে জ্ঞানহীন ভগবদ্বিমুখ ব্যক্তি নিজেকে মুক্ত করিতে পারে না, সেই কাম-লম্পট ব্যক্তিগণ বিহারার্থ স্ত্রীগণের ক্রীড়া-মৃগতুল্য হইয়া পড়ে, পুত্র-পৌত্রাদিই তাহার বন্ধন-শৃঙ্খল হয়। বিষয়াসক্ত ব্যক্তিগণের সঙ্গ পরিত্যাগ করিয়া আদিদেব নারায়ণের শরণাপন্ন হও। যেহেতু হরিসেবাই মূল অপবর্গ।" অতএব গুরু-বৈষ্ণবের আনুগত্যে সাধন-ভজন ব্যতীত জীবের 'কৃষ্ণভক্তি'রূপ অপবর্গ লাভের কোন সম্ভাবনা নাই।

—শ্রীবলভদ্র দাস ব্রহ্মচারী

প্রয়োজন-তত্ত্ব

"যাহা গোলোকে গোপনে ছিল।
গৌর এসে প্রকাশিল॥"

পরম করুণাময় ভগবান্, ঔদার্য্যময় বিগ্রহ শ্রীগৌরসুন্দর জগতে ভক্তভাব অঙ্গীকারপূর্ব্বক যাহা প্রকাশ করিলেন, তাহাই জীবের চরম সাধ্য, পরম প্রয়োজনীয়। গোলোকের গূঢ় যে প্রেমরহস্য গৌরহরি প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন, সে কৃষ্ণপ্রেম যে কি বস্তু, তাহা একমাত্র শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ, শ্রীরূপ-রঘুনাথের কৃপাতেই বুঝা সম্ভব। কারণ অপ্রাকৃত তত্ত্ব প্রাকৃত ভূমিকায় অবস্থিত জীবের উপলব্ধির বিষয় নহে। যদিও প্রেমই জীবের নিত্যসিদ্ধভাব, কিন্তু বর্ত্তমানে জীব স্বরূপবিভ্রান্ত, সেকারণে তাহার হৃদয়ে এই নিত্যসিদ্ধভাব প্রকটিত নহে। প্রেমলাভই জীবের নিত্য-প্রয়োজন। আর সেই নিত্য-প্রয়োজন—প্রেমলাভ একমাত্র শুদ্ধ-ভক্তিপথ অবলম্বনেই লাভ হয়।

"রামানন্দ-পাশে যত সিদ্ধান্ত শুনিল।
রূপে কৃপা করি' তাহা সব সঞ্চারিল॥"

শ্রীমন্ মহাপ্রভু রায় রামানন্দের শ্রীমুখে চরম সাধ্যসাধন রসতত্ত্ব প্রকাশ করাইয়া নিজে আস্বাদন করিয়াছেন। এ 'রসতত্ত্ব' শ্রীরায়ের নিজস্ব বস্তু নহে, মহাপ্রভুরই মূক অভিব্যক্তি শ্রীরায়ের শ্রীমুখে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। কিন্তু এ তত্ত্ব প্রভু নিজে আস্বাদন করিয়া পরিতুষ্ট নহেন। তিনি দেশ-কাল-পাত্র-ভেদে সর্ব্বত্র এই তত্ত্ব বিলাইতে অমন্দোদয়াপাত্র হইয়া দাঁড়াইলেন। শ্রীরূপের লেখনী-মাধ্যমে এই তত্ত্ব বিলাইবার জন্যই শ্রীরূপকে কৃপা করিয়া সবকিছু তাঁহার মধ্যে সঞ্চারিত করিলেন। তাঁহার ঔদার্য্যলীলার বৈশিষ্ট্যই এইপ্রকার অভিনব।

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে শ্রীরূপের শিক্ষায় বলিয়াছেন,—

"ব্রহ্মাণ্ড ভ্রমিতে কোন ভাগ্যবান্ জীব।
গুরু-কৃষ্ণ-প্রসাদে পায় ভক্তিলতা-বীজ॥
মালী হঞা করে সেই বীজ আরোপণ।
শ্রবণ-কীর্ত্তন-জলে করয়ে সেচন॥
উপজিয়া বাড়ে লতা 'ব্রহ্মাণ্ড' ভেদি' যায়।
'বিরজা', 'ব্রহ্মলোক', ভেদি', 'পরব্যোম' পায়॥

তবে যায় তদুপরি 'গোলোক-বৃন্দাবন'।
কৃষ্ণচরণ-কল্পবৃক্ষে করে আরোহণ॥
তাঁহা বিস্তারিত হঞা ফলে প্রেম-ফল।
ইহাঁ মালী সেচে নিত্য শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি জল॥"

চতুর্দ্দশ মায়িক ব্রহ্মাণ্ডে বিভিন্ন যোনিতে ভ্রমণ করিতে করিতে কোন জীবের ভাগ্যে যদি গুরুকৃপা লাভ হয়, তবে সে ভক্তিলতার বীজ পায়। সেই বীজ মালীরূপে হৃদয়ক্ষেত্রে বপন করিয়া শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি-জল সেচন করিতে থাকে। এই জল সেচনের ফলে উর্ব্বর হৃদয়ক্ষেত্রে অঙ্কুরোদ্গম হইয়া ভক্তিলতা বাড়িতে থাকে। বাড়িতে বাড়িতে মায়িক ব্রহ্মাণ্ড ভেদ করিয়া বিরজা পার হইয়া ব্রহ্মলোক ছাড়াইয়া পরব্যোমে পৌঁছায়। তারপরে তদুপরি গোলোক-বৃন্দাবনে যায়। সেখানে কৃষ্ণচরণ-কল্পবৃক্ষে আরোহণ করিয়া প্রেমফল ফলায়। ভক্তিলতা কৃষ্ণ-কল্পবৃক্ষে আরোহণ করিয়া যে-কাল পর্য্যন্ত প্রেমফল না ফলায়, সে-কাল পর্য্যন্ত মালীকে সাধন অবস্থায় শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি জল সেচন করিতে হইবে। 'অভিধেয় তত্ত্বে' সাধনভক্তি সম্পর্কে যদি আমরা শ্রীগুরুকৃপায় কিছু বুঝিয়া থাকি তবে তাহা শ্রীগুরুচরণে শরণাগত হইবার পরই সম্ভব। এবার পঞ্চম পুরুষার্থ শ্রীকৃষ্ণপ্রেম সম্পর্কে কিছু জানিতে চেষ্টা করি।

এইত পরম-ফল 'পরম-পুরুষার্থ'।
যাঁর আগে তৃণতুল্য চারি পুরুষার্থ॥

কৃষ্ণসেবা ভুলিয়া বা স্বরূপের ধর্ম্ম ভুলিয়া বর্ত্তমানে আমাদের ষোলআনা আসক্তি এই মায়িক সংসারে। কি উপায়ে সেই পূর্ণ আসক্তিকে শ্রীকৃষ্ণাভিমুখী করা যাইবে, সে সম্পর্কে মহাপ্রভু শ্রীসনাতন-শিক্ষায় বলিয়াছেন,—

কোন ভাগ্যে কোন জীবের 'শ্রদ্ধা' যদি হয়।
তবে সেই জীব 'সাধুসঙ্গ' করয়॥

শ্রদ্ধা ও সাধুসঙ্গের ফলে জীবের দুই আনা দুই আনা চারি আনা আসক্তি শ্রীকৃষ্ণে চলিয়া যায়। থাকে সংসারে বার আনা আসক্তি।

সাধুসঙ্গ হইতে হয় 'শ্রবণ-কীর্ত্তন'।
সাধনভক্ত্যে হয় 'সর্ব্বানর্থ-নিবর্ত্তন'॥

সাধুসঙ্গ সহিত সেই জীবের 'শ্রবণ-কীর্ত্তন' চলিতে থাকে। ইহার ফলে আরও দুই আনা আসক্তি সংসার হইতে শ্রীকৃষ্ণে সন্নিবেশিত হয়। 'শ্রবণ-কীর্ত্তনের' সহিত সাধুসঙ্গ যত চলিতে থাকে ততই জীবের অনর্থের ক্ষয় হইতে

থাকে অর্থাৎ মায়িক বাসনা কমিতে থাকে। ইহার ফলে আরও দুই আনা আসক্তি শ্রীকৃষ্ণে চলিয়া যায়।

অনর্থনিবৃত্তি হৈলে ভক্তি 'নিষ্ঠা' হয়।
নিষ্ঠা হইতে শ্রবণাদ্যে 'রুচি' উপজয়॥

অনর্থনিবৃত্তি যতই হইতে থাকে ততই অনন্যভক্তিতে নিষ্ঠা। নিষ্ঠা হইতে শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি অধিক পরিমাণে চলিতে থাকিলে রুচির উদয় হয়। নিষ্ঠা ও রুচির দ্বারা শ্রীকৃষ্ণে আরও চারি আনা আসক্তি বাড়িয়া যায়।

রুচি ভক্তি হৈতে হয় 'আসক্তি' প্রচুর।
আসক্তি হৈতে চিত্তে জন্মে কৃষ্ণে প্রীত্যঙ্কুর॥
সেই 'রতি' গাঢ় হৈলে ধরে 'প্রেম'-নাম।
সেই প্রেমা—'প্রয়োজন' সর্ব্বানন্দ-ধাম॥

রুচি যত বাড়িতে থাকে শ্রীকৃষ্ণে আসক্তি ততই বৃদ্ধি পায়। শ্রীকৃষ্ণে আসক্তিতে সংসার-আসক্তি আরও দুআনা কমিয়া মোট চৌদ্দআনা শ্রীকৃষ্ণে আসে। এই আসক্তি হইতে শুদ্ধভক্তের চিত্তে প্রেমের অঙ্কুরোদ্গম হয়। যখনই প্রেমের অঙ্কুর বা ভাব বা রতি ভক্ত-হৃদয়ে উদয় হয়, তখনই সংসার-আসক্তি ষোলআনা শ্রীকৃষ্ণে যুক্ত হয় এবং সেই রতি যখন ভক্ত-হৃদয়ে গাঢ়ত্ব-প্রাপ্ত হয়, তখনই 'প্রেম' নামে অভিহিত হয়। এই প্রেমই জীবের একমাত্র প্রয়োজন ও সর্ব্বানন্দের মূল স্থল। এই প্রেমলাভ করাই জীবের মূল উদ্দেশ্য।

এবার আমরা প্রেমের অঙ্কুর যে ভাব সেই 'ভাব' সম্পর্কে কিছু জানিতে চেষ্টা করি। আমরা অনেক সময় বলিয়া বা শুনিয়া থাকি,—"আহা, লোকটির কি ভাব! একেবারে কাঁদিয়া গড়াগড়ি দিতেছে।" বহু সময় বহু কীর্ত্তনের আসরেই এইপ্রকার বহু ভাবুককে আমরা দেখিয়া থাকি। সকল-ক্ষেত্রে ইহা প্রকৃতই ভাব কিনা তাহা শ্রীগুরুকৃপায় জানিতে চেষ্টা করি।

প্রীত্যঙ্কুরে 'রতি', 'ভাব' হয় দুই নাম।
যাহা হৈতে বশ হন শ্রীভগবান্॥

ষোলআনা সংসারাসক্তি শ্রীকৃষ্ণে অর্পিত না হওয়া পর্য্যন্ত ভাবের উদয় হয় না এবং শ্রীভগবান্ও বশ হন না। এমন যে ভাব তাহা কখনই সহজলভ্য নহে। মায়াবদ্ধ জীবের পিচ্ছিল চক্ষের ক্রন্দনের দ্বারা শুদ্ধভাবের উদয় হইতে পারে না। (ক্রমশঃ)

—শ্রীমতী মায়া সরকার

শ্রীল গুরু-মহারাজের বক্তৃতা

[ধুবড়ী, আসাম, তাং ১০।১২।১৯৯০)

অজ্ঞান-তিমিরান্ধস্য জ্ঞানাঞ্জন-শলাকয়া।
চক্ষুরুন্মীলিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ॥
নমো ওঁ বিষ্ণুপাদায় আচার্য্য-সিংহরূপিণে।
শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান-কেশব ইতি নামিনে॥

আমার পূর্ব্ববর্ত্তী বক্তৃমহোদয়গণ সকলেই শ্রীব্যাসপূজা বা শ্রীগুরুপূজা সম্বন্ধে তাঁদের স্ব-স্ব বক্তব্য রেখেছেন। সেই ব্যাস কে, তার ব্যাখ্যাও দিয়েছেন। ব্যাসাভিন্ন জগদ্গুরুই অনন্ত বিশ্বের কল্যাণ করতে পারেন—এটাও শ্রবণ করলাম।

আজকাল সমাজে গুরুতত্ত্ব নিয়ে যে আলোচনা হচ্ছে, সেটা সর্ব্বাঙ্গসুন্দর আলোচনা নয়। সেখানে দেখা যায়, গুরুর গুরুত্ব কোন একটী মনুষ্যে আরোপ করা হচ্ছে। তত্ত্বদর্শন নিয়ে আলোচনা করা আমাদের সবথেকে অধিক প্রয়োজন। কিন্তু তত্ত্বদর্শনকে সরিয়ে দিয়ে অনেক সময় আমরা ব্যক্তি-বিশেষকে সেই সম্মানটা দিয়ে থাকি। তাতে অনেক সময় ভুল বুঝাবুঝির সৃষ্টি হয়। সাধারণ কর্ম্মী, জ্ঞানী, যোগি-সম্প্রদায় গুরুতত্ত্ব নিয়ে যা আলোচনা করেন, সেটা খণ্ডিত, সীমিত জ্ঞান। আজকাল অনেকে বলেন, এই যে গুরু-পূজার অনুষ্ঠান, এটা ব্যক্তিপূজা-বিশেষ বা মানুষ-পূজা। কিন্তু শাস্ত্র যা বলছেন, সেটা আমাদের মেনে নিতে হয়। এ সংসারে সব মানুষ সমান নয়, সব মানুষের অধিকার সমান নয়। সুতরাং গুরুপূজাকে ব্যক্তিপূজা বলে অস্বীকার করলে হবে না। যাঁরা আমার উপরওয়ালা, যাঁরা আমার অভিভাবক, গুরুবর্গ, মুনি-ঋষিগণ, তাঁদের মহিমা আমাকে বলতেই হবে, তাঁদের মাহাত্ম্য আমাকে কীর্ত্তন করতেই হবে। তাহলে চিত্তবৃত্তি শোধন হয়, আত্মবৃত্তির উন্মেষ হয়। সেইজন্য অনুষ্ঠান করা বিশেষ প্রয়োজন হচ্ছে।

এ জগতে সকলে সমান অধিকার নিয়ে বসে নাই, উচ্চাবচ ভাব আছে। রাজনীতিতে একটা কথা শুনতে পাই আমরা। সেখানে 'শ্রেণীহীন সমাজের' কথা এসেছে। কিন্তু শ্রেণীহীন সমাজের কল্পনা করা যায় না। শ্রেণীবিভাগ চিরদিনই আছে, চিরদিনই থাকবে। উচ্চাবচ ভাব চিরদিনই আছে এবং থাকবে। সব সমান কোনদিন হবে না, হয়ে যেতে পারে না। এটা অসম্ভব।

Classification আছে, থাকবে। স্কুল-কলেজেও শ্রেণীবিভাগ আছে। সব ক্লাসগুলো সমান নয়। সব ক্লাসগুলোর পড়াশুনা এক নয়। সুতরাং ঐ জাতীয় মুখরোচক কথাগুলো আজ বর্ত্তমান সমাজকে পেয়ে বসেছে। যদিও তার বাস্তবসত্তা খুজে পাওয়া যায় না। সেক্ষেত্রে আমরা দেখছি, বৈশিষ্ট্য বলে একটা জিনিস আছে। এ বৈশিষ্ট্য সবসময় রক্ষা করে চলতে হবে আমাদের। তা না হলে সমাজের কল্যাণ নাই। আমি যদি আমার উপরওয়ালাকে অস্বীকার করি, তাহলে আমার কোন পরিচয় থাকে না। সুতরাং সেইভাবে আমরা জিনিসটাকে বুঝবার চেষ্টা করব।

আজ দুনিয়ায় সাম্যবাদ নিয়ে খুব কথা চলছে। কিন্তু সাম্যবাদ কি করে আসবে, সে বিধি-ব্যবস্থা কেউ দিতে পারছেন না। সাম্যবাদ প্রয়োজন—এটুকু বলে শেষ হচ্ছে। আমরা যদি সচ্ছাস্ত্র আলোচনা করি, তাহলে দেখব এর মীমাংসা আছে। একজন খাঁটী হিন্দু, একজন খাঁটী মুসলমান, একজন খাঁটী খৃষ্টানের মধ্যে কোন মতভেদ নাই, ঝগড়া-বিবাদ নাই। যখনই রাজনীতি এর ভিতরে প্রবেশ করে, তখনই গণ্ডগোলের সৃষ্টি হয়। যে গণ্ডগোল আজ সমগ্র ভারতকে, তথা বিশ্বকে আলোড়িত করছে। সেখানেও যদি ধর্ম্ম-সম্প্রদায়ের উপর ছেড়ে দেওয়া হয় বিচারটী, এর ভিতরে যদি কোনরকম রাজনীতি প্রবেশ না করে, তাহলে দেখা যাবে—মীমাংসা হয়ে আছে। প্রত্যেক সমাজে, প্রত্যেক ধর্ম্মের মধ্যে বিচক্ষণ ব্যক্তি বসে আছেন। বিশ্বের যাঁরা বিদ্বজ্জন, বিশ্বের যাঁরা চিন্তাশীল মনীষী, তাঁরা কঠিন সমস্যার মীমাংসা যে-কোন বিষয়ে করে নিতে পারেন। সে পথ খোলা আছে। কিন্তু বাদ সাধছে আজ রাজনীতি-নামক এক মহা অসুর, দানব ও মহা রাক্ষস। প্রত্যেকটার মধ্যে মাথা গলাচ্ছে। সব তছ্‌নছ্‌ করে দিচ্ছে। মানুষের ভিতরে স্নেহ, মায়া, মমতাগুলো কেড়ে নিচ্ছে। মানুষের ভিতরে ঈর্ষা, হিংসা, মাৎসর্য্য প্রবলরূপে বাড়িয়ে দিচ্ছে। কি প্রতিকার এর?—শাস্ত্রে এর প্রতিকার বাতলানো আছে। যাঁকে বলা হয় সদ্‌গুরু, যাঁকে বলা হয় বাস্তবক্ষেত্রে প্রকৃত সাধু ভক্ত। সবটার মধ্যে মীমাংসা আছে। আমরা যদি এটা ভালভাবে আলোচনা করি, তাহলে নিশ্চয়ই একটা সামঞ্জস্য খুঁজে পাব। সেইরূপ সামঞ্জস্য করবার মত সুযোগ-সুবিধা দেওয়া হচ্ছে না। বর্ত্তমান সমাজে—এইটাই সবথেকে দুঃখের কারণ হয়েছে।

আমার বলার উদ্দেশ্য হচ্ছে—সনাতন ধর্ম্ম থেকেই প্রত্যেকটী ধর্ম্মের উদ্ভব। এর থেকে নিয়ে যাঁরা যতটুকু বক্তব্য রেখেছেন সেই অনুসারেই তাঁদের

স্বীকৃতি। প্রত্যেকটা ধর্ম্মের ভিতরে মূলনীতি-আদর্শ কিছু না কিছু আছে। সুতরাং সেইটুকু মূলনীতি-আদর্শ নিয়ে আমরা পরস্পর ভ্রাতৃত্বসূত্রে চলতে পারি। সমন্বয় কোথায় হবে বলুন ত'? সম্যক্‌রূপে অন্বয়, মিলনটা হবে কোথায়? দুটো জিনিস একইরকম হলে তবে ত'। "যোগ্যং যোগ্যেন যুজ্যতে"। সমভাবাপন্ন ব্যক্তির সঙ্গে ত' সমভাবাপন্ন ব্যক্তির মিলন হয়। একজন চোরের সঙ্গে একজন সাধুর মিলন হতে পারে না। চোরের সঙ্গে চোরের মিলন হবে, সাধুর সঙ্গে সাধুর মিলন হবে। সুতরাং 'সমন্বয়' শব্দটা খুব সাবধানতার সঙ্গে—Cautiously, Carefully ব্যবহার করতে হবে। স্বজাতীয় বস্তু হওয়া চাই। বিজাতীয় বস্তুর সঙ্গে স্বজাতীয়ের মিল হবে না কোনদিন, হয় না। বিশেষতঃ যেখানে ধারণাটা সম্পূর্ণ উল্টো—Diametrically opposite, সেখানে কি করে মিলন হবে?

আমার পূর্ব্ববক্তা বক্তৃমহোদয়গণ তাঁদের সংক্ষিপ্ত ভাষণে যেটুকু বক্তব্য রেখেছেন, তাতে বুঝাবার চেষ্টা করেছেন—কি করে মিলেমিশে এ সংসারে আমরা চলতে পারি। শুধু এ সংসারে আমাদের থাকার কথা নয়। কেন? —গণ্ডগোলের জায়গা। চিরদিনই এখানে গণ্ডগোল থাকবে, গণ্ডগোলের জন্যই এটা সৃষ্টি হয়েছে। "তস্মাদিদং জগদশেষমসৎস্বরূপং স্বপ্নাভমস্তধিষণং পুরুদুঃখদুঃখম্।"—দুঃখ দিয়ে গড়া হয়েছে এ সংসারটা। মহামায়া দুর্গাদেবী এই সংসারের অধিকর্ত্রী। সুতরাং খুব দুঃখ-কষ্ট দিয়ে তৈরী করা হয়েছে এটাকে। এখানে আমরা অবিমিশ্র আনন্দ, অবিমিশ্র সুখ-শান্তি কি করে আশা করতে পারি? কিন্তু আমরা ভাবছি, আমরা এখানে সব পাব। সদ্‌বৃত্তি যদি মানুষের মধ্যে থাকে, তাহলে তিনি এখানে কিছু আশা করতে পারেন।

'গুরু'-শব্দের যে ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে, অন্ধকার থেকে যিনি আলোর পথে নিয়ে যাচ্ছেন, তাঁকে বলা হয়েছে সদ্‌গুরু। অন্ধকার কোন্‌টা, আর আলোক কোন্‌টা—এ সম্বন্ধে আমাদের সম্পূর্ণ অভিজ্ঞতা থাকা চাই—Concrete idea রাখা চাই। আমরা কাকে অন্ধকার বলতে চাচ্ছি? —অজ্ঞানকে বলছি অন্ধকার। আর আলো বলছি কাকে?—জ্ঞানকে বলছি আলো। কিন্তু সেই জ্ঞান যদি নিরাকার, নির্ব্বিশেষ, নির্গুণ, নিঃশক্তিক বিচারগুলো আমাদের কাছে এনে দেয়, আমরা তখন কি করব? সমগ্র দুনিয়াটা আজ যেন একইভাবে চলছে। Negetive idea নিয়ে আমরা কি লাভ করতে পারছি? Positive something-কে যদি আমরা স্বীকার করে না নেই, তাহলে Negetivity আসে কি করে? শাস্ত্রে সেগুলো

সুন্দরভাবে বুঝানো হয়েছে। বেদ, বেদান্ত, উপনিষদ্, গীতা, ভাগবত, রামায়ণ, মহাভারতাদির মধ্যে ত' তত্ত্বদর্শনই শিক্ষা দেওয়া হয়েছে।

যা যা শ্রুতির্জল্পতি নির্বিশেষং, সা সাভিধত্তে সবিশেষমেব।
বিচারযোগে সতি হন্ত তাসাং, প্রায়ো বলীয়ঃ সবিশেষমেব ॥

তাহলে আগে নিরাকারের কথা আসবে, না সাকারের কথা আসবে? যদি কেউ প্রশ্ন করেন আপনারা আমার কাছে—ভগবান্ কি সাকার, না নিরাকার? শাস্ত্রে বলছেন,—ভগবান্ সাকার, নিরাকার উভয়ই। যদি তাঁকে সাকার বলা যায়, তাহলে তিনি নিরাকার নন। সর্ব্বশক্তিমান্ সেই ভগবান্, তিনি ত' যুগপৎ সবকিছু হতে পারেন একাধারে। 'অণোরণীয়ান্ মহতো মহীয়ান্'—কথাটী বলা হয়েছে। তিনি কি না হতে পারেন। কিন্তু শাস্ত্রে যে সাকার-রূপটী দেওয়া তাকে অনেকে ব্যাখ্যা করছেন—মায়াময়, মায়িক আকার। ধারণা ঠিক নয়। আবার কেউ বলছেন, তিনি নিরাকার। এই নিরাকারের কি অর্থ করছেন? তাঁর কি আদৌ কোন আকার নাই? সেই ভগবান্ যদি নিরাকার হন, তাহলে এই যে অনন্ত বিশ্ব সৃষ্টি তিনি করেছেন, সেটা কি করে করলেন? এখানে যে তৃণ, বৃক্ষ, লতা, গুল্ম, পাখী, পশু, মনুষ্যগোষ্ঠী, দৈত্য, দানব, দেবতাগোষ্ঠী এরা সব কোথা থেকে এল? তিনি যদি সাকার না হন, তাহলে এদের আকার এল কোথা থেকে?

(ক্রমশঃ)

পরমারাধ্যতম নিত্যলীলা প্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ ১০৮শ্রী

শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী ঠাকুরের

শুভ প্রকট-বাসরে ভক্তি-পুষ্পাঞ্জলি

জয় জয় শ্রীকেশব গোস্বামী ঠাকুর।
তব নাম-গুণ-লীলা অতীব মধুর ॥
তোমার উদয়-তিথি আজি সমাগত।
তাই মোরা তব গুণ গাহি অবিরত ॥
শ্যামের ইচ্ছায় তুমি গোলোক হইতে।
এসেছিলে এ জগতে জীব-উদ্ধারিতে ॥

তব নাম লৈলে হয় পাপ-তমঃ ক্ষয়।
তব গুণগানে শ্যাম পরিতুষ্ট হয়॥
তুমি রাধা-সহচরী বিনোদ মঞ্জরী।
সেবিছ শ্রীশ্যামচাঁদে সদা প্রাণ ভরি'॥
বেদান্ত শাস্ত্রেতে তুমি পরম পণ্ডিত।
তোমার প্রতিভা হেরি' জগৎ বিস্মিত॥
বেদান্তের ভাষ্য যাহা লিখিলা শঙ্কর।
তোমার বিচারে তাহা নিতান্ত অসার॥
শঙ্কর-ভাষ্যের ত্রুটী করিয়া প্রমাণ।
জগজ্জীবেরে তুমি করিলে সাবধান॥
মায়াবাদ-হ্রদে যেবা হইবে পতিত।
ভগবৎ-প্রেম থেকে সে চিরবঞ্চিত॥
দুর্ল্লভ গৌর-প্রেম করিতে বিতরণ।
মায়াবাদ-মত তুমি করেছো খণ্ডন॥
'মা ব্রুয়াৎ সত্যমপ্রিয়ম্'—নীতি কথা।
মানিতে নিষেধ তুমি করেছো সর্ব্বথা॥
সত্য অপ্রিয় হ'লেও কহা প্রয়োজন।
নতুবা শাস্ত্র-রহস্য রহিবে গোপন॥
নাস্তিক পাষণ্ডিগণে করিয়া দলন।
আশ্রিতজনেরে স্নেহে করিলে পালন॥
কৃষ্ণ-সুখ পরায়ণ বৈরাগ্য তোমার।
ভক্তি-নেত্রে ভক্তগণ দেখে অনিবার॥
শ্রীগোস্বামী মহারাজ কহিত তোমারে।
'তোমা' হেরি' প্রভুপাদে সদা মনে পড়ে॥'
গোস্বামী মহারাজের এ হেন বচনে।
তব গুণ উপলব্ধি করে ভক্তগণে॥
যাঁ'রে হেরি' মনে পড়ে শ্রীগুরু-চরণ।
শ্রীগুরু-স্বরূপ তিনি গৌরপ্রেষ্ঠ জন॥

এ হেন মহান তুমি আচার্য্যকেশরী।
সতত 'রাজিছ তুমি ভক্ত-হৃদি জুড়ি' ॥
জয় জয় প্রভুবর অগতির গতি।
জয় বাঞ্ছাকল্পতরু, মোর প্রাণ-নিধি ॥
এই পুষ্পাঞ্জলিসহ লহ মোর নতি।
জন্মে জন্মে তব পদে থাকে যেন মতি ॥

শ্রীগুরু-প্রকট-বাসর
৩রা গোবিন্দ, ৫০৪ শ্রীগৌরাব্দ

শ্রীগুরু-কৃপা-কণা প্রার্থী—
শ্রীচৈতন্যকৃষ্ণ দাসাধিকারী

বর্ষ-প্রবেশ

"বিশ্বপ্রেমিক শ্রীগৌড়ীয় ভেদবুদ্ধিহীন, সুতরাং সর্ব্বত্র সমাদৃত

শ্রীরাধা-ব্রজবনবিহারীর অভিন্নতনু গৌড়ীয়ের প্রাণের ঠাকুর শ্রীগৌরসুন্দরের কৃপায় শুদ্ধভক্তি-ধর্ম্মের মুখপাত্র 'শ্রীগৌড়ীয়' * বর্ষে পদার্পণ করিলেন। আর্য্যাবর্ত্তে প্রাকট্যলাভ করিয়া বিন্ধ্যের দক্ষিণদেশবাসিগণ হইতে পার্থক্য স্থাপন করিলেও দ্রাবিড়ীয় ভগবদ্ভক্তগণের সহিত আর্য্যাবর্ত্তবাসী গৌড়ীয় অকৃত্রিম সৌহার্দ্দে বদ্ধ। কেবল ভারতবাসী কেন, জম্বুদ্বীপের সকল মানবগণের একমাত্র উপাস্য ভগবানের সেবকসূত্রে গৌড়ীয়ের সহিত জম্বুদ্বীপের অধিবাসিমাত্রের কোন বৈষম্য নাই। জম্বুদ্বীপবাসী কেন, শক, প্লক্ষ, শাল্মলী প্রভৃতি সপ্তদ্বীপবাসিগণের সহিত গৌড়ীয়ের কোন ভেদবুদ্ধি নাই। বিশ্বজনীন প্রেম, যাঁহাদের ভিতরে বাহিরে দেদীপ্যমান, তাঁহারা যে দ্বীপেরই অধিবাসী হউন না কেন, তাঁহাদের সহিত গৌড়ীয় সমসূত্রে গ্রথিত। শ্রীগৌরসুন্দরের উদার প্রেমধর্ম্ম সকল জগতে চতুর্দ্দশ ভুবনে বিরজা ও ব্রহ্মলোকে সর্ব্বত্রই একবাক্যে সমাদৃত।

প্রেমধর্ম্মের বিরোধহেতু ভেদ ও অশান্তির সৃষ্টি

যেখানে সকল সদ্গুণনিলয় প্রেমধর্ম্মের সহিত বিরোধ বাসনা, সেখানেই অশান্তি, অপ্রসন্নতা ও ভেদনীতি প্রবল। অদ্বয়জ্ঞান ব্রজেন্দ্রনন্দনের প্রেমসেবা-তাৎপর্য্যপর হইয়া নিখিল জীবকুলকে শ্রীগৌড়ীয়ের উপাস্য ভগবান্ শ্রীগৌরসুন্দর একত্র মিলিত হইয়া ভগবৎ-প্রীতির সাহচর্য্য করিতে বুদ্ধিযোগ

প্রদান করিয়াছেন। যেখানে প্রেমময়তনু শ্রীচৈতন্যদেবের সহিত মতভেদ করিয়া তাঁহার সহিত প্রকাশ্য বা প্রচ্ছন্নভাবে বিরোধ কল্পিত হইয়াছে, সেইখানেই প্রেমের অভাব।

অভক্তেরই গৌড়ীয়-পত্রিকার সহিত মতভেদ

বদ্ধজীবকুল গৌড়ীয়ের সহিত প্রীতিরহিত হইয়াই নানাপ্রকার মতবাদের অন্তরালে প্রেমকে ভোগ বলিয়া গ্রহণ করায় প্রীতির স্বরূপ-দর্শনে বঞ্চিত হইয়াছেন। শ্রীভগবান্ গৌরসুন্দরের উৎসাহসূচক বাক্য যাঁহার কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হইয়াছে, তিনিই জানেন যে, নরমাত্রেরই ভগবানের সেবা-ধর্ম্মে যোগ্যতা আছে। যাঁহাদের ভক্তিধর্ম্মে যোগ্যতা, তাঁহারাই গৌড়ীয়ের অনুসরণ করিতে পারেন, আর যাঁহারা ভগবৎ-প্রীতিরহিত তাঁহারা গৌড়ীয়ের সহিত মতভেদ করিয়া আপনাদিগের অগৌড়ীয়ের আচরণ প্রচার করিয়া হরিপ্রেম হইতে বঞ্চিত হন ও প্রেমকে পশুপক্ষীর বা নশ্বর মানবদম্পতির কামের সহিত এক করিয়া ফেলেন।

গৌড়ীয়ের সঙ্গপ্রভাবেই প্রেম নবনবায়মান

নিত্যপ্রেমা নশ্বর বস্তুসমূহের মধ্যে কখনই আবদ্ধ নহে। এই লোকাতীত নিত্যপ্রেমা নরমাত্রের হৃদয়ে অব্যক্ত অবস্থায় লুকায়িত থাকিলেও প্রেমিক গৌড়ীয়ের সঙ্গপ্রভাবে কেবলমাত্র উন্মেষিত হয় না, অধিকন্তু অনুক্ষণ নব-নবায়মান হইয়া সম্বর্দ্ধিত হইতে থাকে। প্রকৃতির অন্তর্ভুক্ত রাজ্যে প্রেমের অস্ফুট প্রকাশ লক্ষিত হইলেও তাহা আবৃত হইয়া নশ্বর ধর্ম্মান্তর্গত ধারণায় পর্য্যবসিত হয়।

শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকার প্রত্যেক প্রবন্ধই সেবা-ধর্ম্মের প্রকাশক

বিগত বর্ষে গৌড়ীয়ের নবাভ্যুদিত প্রকাশের মধ্যে অপ্রাকৃত বস্তুর উদ্দেশ্যে সেবা-ধর্ম্মই প্রত্যেক প্রবন্ধে ও প্রস্তাবে কীর্ত্তিত হইয়াছে। যদিও কেহ কেহ নিজ নিজ যোগ্যতার অভাবে সম্যক্‌রূপে গ্রহণ করিতে অসমর্থ হইয়াছেন, তথাপি তাদৃশ কৌতূহলোদ্দীপক বিজ্ঞান-রহস্য তাঁহাদিগকে ন্যূনাধিক প্রেম-রাজ্যে অগ্রসর করাইতে কুণ্ঠিত হয় নাই।

শ্রীপত্রিকার অধোক্ষজ-সেবা অক্ষজ-জ্ঞান-বহির্ভূত

অক্ষজজ্ঞানের তাড়নায় অনেকে অধোক্ষজ-সেবার স্বরূপ-নির্ণয়ে অসমর্থ হইয়াছেন এবং অধোক্ষজ-সেবাকে অক্ষজজ্ঞানের জ্ঞেয় বস্তুরূপে ভ্রম করিয়াছেন,

তথাপি তাঁহাদের ভবসাগরের প্রবল তরঙ্গ, শ্বাস-প্রশ্বাস ফেলিবার জন্ত নিমগ্ন হইবার পরিবর্ত্তে উর্দ্ধদেশেই উত্তোলন করিয়াছে। যাহারা অক্ষজজ্ঞানের বিড়ম্বনায় প্রতারিত, তাহাদিগকে আমরা সানুনয় নিবেদন করিতেছি যে, অধোক্ষজ বস্তু কিছু ভোগের বস্তু নহে। অধোক্ষজ-বস্তু-বিজ্ঞান কিছু ইন্দ্রিয়-তর্পণের কথা নহে যে, ইন্দ্রিয় জ্ঞানের সাহায্যে অপর বিষয় মীমাংসার ন্তায় নিজ নিজ অভিমত প্রকাশ করিয়া সত্য বস্তুকে বিকৃত করা যায়। গৌড়ীয়ে প্রকাশিত বিষয়সমূহ আম্নায় পারম্পর্য্যাগত, সুতরাং প্রাকৃত বস্তুবিষয়ক জ্ঞান ভ্রমে তাহাকে পরিমর্দ্দিত, পরিবর্দ্ধিত বা পরিবর্জ্জিত করিবার প্রয়াস তাহাদিগের পক্ষে শোভনীয় নহে।

শ্রীগৌড়ীয় পাঠের অনুরোধ

বিগত বর্ষে গৌড়ীয়ে প্রধানতঃ শুদ্ধ বর্ণাশ্রমধর্ম্ম সম্বন্ধে এবং অধোক্ষজ-সেবা সম্বন্ধে, অক্ষজ ভোগি-সম্প্রদায়ের কার্য্যপ্রণালীর অকর্ম্মণ্যতা দর্শিত হইয়াছে। যেহেতু বিষয়টী অভিনব, তজ্জন্ত আমরা ধীর পাঠকগণকে সর্ব্বতোভাবে গৌড়ীয়ে প্রকাশিত হরিকথা শ্রবণ করিতে অনুরোধ করি। অবহিত চিত্তে শ্রদ্ধার সহিত শ্রবণ করিলেই তাঁহারা জীবাত্মার নিত্যধর্ম্ম ভক্তির স্বরূপ বুঝিতে সমর্থ হইবেন।

নির্ম্মৎসর-হরিকথাই হৃদয়ের অন্ধকার-নাশিকা

প্রবর্ত্তমান বর্ষে আমরা বিগত বর্ষের আলোচিত বিষয়গুলি নানাপ্রকারে সুধী পাঠকবর্গের নিকট উপস্থাপিত করিতে ইচ্ছা করি। সকলের সহিত যথাযোগ্য প্রারম্ভিক সম্ভাষণপূর্ব্বক শ্রীমন্মহাপ্রভু-প্রচারিত হিতকর উপদেশাবলী প্রচার কার্য্যই যেন আমাদের সম্বল হয়। নির্ম্মৎসর সাধুদিগের কথা আমাদিগের অসাধুচিত্তে আপাতবিষময় বোধ হইলেও উহাই পরিণামে হিতকর হইবে জানিয়া আমরা অসাধুসঙ্গ-বর্জ্জন এবং সাধুসঙ্গে আসক্তিপ্রভাবে হৃদয়ের অন্তঃস্থলস্থিত অন্ধকাররাশি বিদূরিত করিতে যেন প্রবৃত্ত হই। শাস্ত্র এবং গুরুবর্গই এই কার্য্যে আমাদিগের একমাত্র অবলম্বন।

আরোহবাদীর মতবাদ কল্পিত ও ভ্রমপূর্ণ

আরোহপথের পথিকের চেষ্টাসমূহ আমরা গ্রহণ করিতে না পারায় কেহ যেন আমাদিগের কার্য্যে বাধা না দেন। আরোহবাদী যে চেষ্টা প্রদর্শন করেন, তাহাতে সত্য না থাকিতে পারে, কিন্তু সত্যের অবতরণ-বাদ স্বীকার করিলে আরোহবাদীর ন্তায় ভ্রমে পতিত হইতে হয় না। আমাদিগের কোন কথাই নিজের কল্পিত নহে, কিন্তু ঐগুলি নিরস্ত-কুহক নিত্যসত্য মাত্র, তাহাই বৈষ্ণব জগতে ভগবানের অভিব্যক্তি।"

FORM—IV

STATEMENT ABOUT OWNERSHIP AND PARTICULARS ABOUT NEWSPAPER

SHRI GOUDIYA-PATRIKA

[Under Rule 6 of the Registration of Newspapers
(Central) Rules 1956]

1. Place of Publication —Shri Devananda Goudiya Math, Tegharipara, P. O. —Nabadwip Nadia), W. B.

Periodicity of its Publication —Last day of every Bengali month i. e. once in month.

3. Printer's Name —Tridandi Swami Bhakti Vedanta Acharyya Maharaj.

Nationality Indian — Goudiya-Vaishnaba.
Address – Shri Devananda Goudiya Math,
Tegharipara, P.O.— Nabadwip (Nadia), W.B.

4. Publisher's Name — Do
Nationality— Do
Address— Do

5. Editor's Name —Tridandi-Swami Shri Shrimad Bhakti Vedanta Trivikram Maharaj.

Nationality —Indian — Goudiya-Vishnaba.
Address — Shri Devananda Goudiya Math,
Tegharipara, P. O. —Nabadwip (Nadia), W. B.

6. Name and address of individuals who won the newspapers and partners or share holders holding more than one percent of the total capital,— Tridandi Swami Shri Shrimad Bhakti Vedanta Baman Maharaj, President-Acharyya, on behalf of Shri Goudiya Vedanta Samiti.

I, *Swami Bhakti Vedanta Acharyya* hereby declare that the particulars given above are true to the best of my knowledge and belief.

Sd./-Swami B. V. Acharyya
Signature of Publisher.

Dated —28. 2. 91

॥ শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ ॥

স বৈ পুংসাং পরো ধর্ম্মো যতো ভক্তিরধোক্ষজে।

ধর্ম্মঃ স্বনুষ্ঠিতঃ পুংসাং বিষ্বক্‌সেন-কথাসু যঃ।

নোৎপাদয়েদ্যদি রতিং শ্রম এব হি কেবলম্॥

অহৈতুক্যপ্রতিহতা যয়াত্মা সুপ্রসীদতি॥

সেই ধর্ম্ম শ্রেষ্ঠ যাতে আত্ম-পরসন্ন।
অধোক্ষজে অহৈতুকী ভক্তি বিঘ্নশূন্য॥

অন্য ধর্ম্ম সুষ্ঠুরূপে পালে যেই জন।
হরি-কথায় রতি নৈলে পণ্ড সেই শ্রম॥

৪৩শ বর্ষ — ১৫ মধুসূদন, বাসুদেব, ৫০৫ শ্রীগৌরাব্দ, ৩০ চৈত্র, রবিবার, ১৩৯৭, ইং ১৪।৪।৯১ — ২য় সংখ্যা

শ্রীদেবগণকৃতম্ শ্রীরামচন্দ্র-স্তোত্রম্

[শ্রীপদ্মপুরাণে পাতালখণ্ডে শেষ-বাৎস্যায়ন-সম্বাদে তৃতীয়েঽধ্যায়ে]

শ্রীশেষ উবাচ,—

[অথাভিষিক্তং রামং তু তুষ্টুবুঃ প্রণতাঃ সুরাঃ।
রাবণাভিধ-দৈত্যেন্দ্রবধ-হর্ষিতমানসাঃ॥]

[অনন্তদেব কহিলেন,—রাবণ-রাক্ষস নিহত হওয়ায় দেবগণ বিশেষ আহ্লাদিত হইয়াছিলেন। শ্রীরামের রাজ্যাভিষেকের পর তাঁহারা প্রণতঃ হইয়া শ্রীরামচন্দ্রের স্তব আরম্ভ করিলেন,—]

শ্রীদেবা উচুঃ,—

১। জয় দাশরথে সুরার্ত্তিহঞ্জয়তাদ্দানববংশদাহক।
জয় দেববরাঙ্গণাগণব্যপকর্ষাদ্দিকরারিদারক॥ ৫৬॥

হে দেবগণের আর্ত্তিনাশন! দশরথনন্দন রাম! আপনার জয় হউক,

হে রাম! আপনি দৈত্যবংশ দগ্ধ করিয়াছেন। আপনি দেবাঙ্গণাগণের অত্যাচারকারী অতিদুষ্ট ত্রিভুবন-শত্রু রাবণকে বধ করিয়াছেন। আপনার জয় হউক ॥ ৫৬ ॥

২। তব যদ্দনুজেন্দ্রনাশনং কবয়স্তৎ কথয়ন্তু চোৎসুকাঃ।
প্রলয়ে জগতাং ততীঃ পুনর্গ্রসসে ত্বং ভুবনেশ লীলয়া ॥ ৫৭॥

আপনার এই দৈত্যরাক্ষস-বিনাশন-কথা কবিগণ আগ্রহসহকারে বর্ণন করুন। হে ভুবনেশ্বর! এই জগৎ আপনারই লীলা ; এই লীলা অবসানে—প্রলয়কালে আপনিই আবার এই জগৎসমূহ গ্রাস করিয়া থাকেন ॥ ৫৭ ॥

৩। জয় জন্মজরাদিদুঃখকৈঃ পরিমুক্তপ্রবলোদ্ধরোদ্ধর।
জয় ধর্ম্মকরান্বয়াম্বুধৌ কৃতজন্মন্নজরামরাচ্যুত ॥ ৫৮ ॥

আপনি জন্মজরাদি দুঃখ হইতে নির্ম্মুক্ত ; আপনার জয় হউক। আপনি অতি উদ্ধত দৈত্যদিগকে নিহত করিয়া উদ্ধার করিয়াছেন। হে অজর, অমর, অচ্যুত! আপনি সূর্য্যবংশরূপ সাগরে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, আপনার জয় হউক ॥ ৫৮ ॥

৪। তব দেববরস্য নামভির্ব্বহুপাপাশ্চ গতাঃ পবিত্রতাম্।
কিমু সাধুদ্বিজবর্য্যপূর্ব্বকাঃ সুভনুং মানুষতামুপগতাঃ ॥ ৫৯ ॥

হে দেববর! আপনার নাম উচ্চারণ করিয়া বহুতর পাপী উদ্ধার পাইয়াছে, যাহারা সাধু দ্বিজবর সতত পুণ্যকারী সুমানুষ-জন্ম লাভ করিয়াছে, তাহাদের ত' কথাই নাই ॥ ৫৯ ॥

৫। হরবিরিঞ্চিনুতং তব পাদয়ো-
র্যুগলমীপ্সিতকাম-সমৃদ্ধিদম্।
হৃদি পবিত্রযবাদিকচিহ্নিতৈঃ
সুরচিতং মনসা স্পৃহয়াম তে ॥ ৬০ ॥

ঈপ্সিত ফলদায়ী হরবিরিঞ্চিস্তুত পবিত্র যবাদিচিহ্নযুক্ত ভবদীয় পাদপদ্ম-যুগল হৃদয়ে ধারণ করিতে আমাদের নিতান্ত স্পৃহা হইয়াছে ॥ ৬০ ॥

৬। যদি ভবান্ন দধাত্যভয়ংভুবো মদনমূর্ত্তিতিরস্করকান্তিভৃৎ।
সুরগণাশ্চ কথং সুখিনঃ পুনর্ননু ভবন্তি ঘৃণাময় পাবন ॥ ৬১॥

হে মদনমোহন! সুন্দরমূর্ত্তে! আপনি যদি পৃথিবীকে অভয়দান না করেন, তাহা হইলে হে দয়াময় পাবন! দেবগণ কিরূপে সুখী থাকিবে ?? ৬১ ॥

৭। যদা যদাস্মান্ দনুজা হি দুঃখদা-
স্তদাতদা ত্বং ভুবি জন্মভাগ্ ভব।
অজোঽব্যয়োঽপি প্রবরোঽপি সন্‌বিভো
স্বভাবমাস্থায় নিজং নিজার্চ্চিতঃ ॥ ৬২ ॥

হে সর্ব্বেশ্বর! হে বিভো! আপনি অজ, অব্যগ্র এবং স্বভাবে অবস্থিত হইলেও, দৈত্যগণ যখন নিতান্ত উপদ্রবকারী হইবে, তখন অনুগ্রহ করিয়া পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করিবেন ॥ ৬২ ॥

৮। মৃতসুধাসদৃশৈরঘনাশনৈঃ
সুচরিতৈরবকীর্য্য মহীতলম্।
অমনুজৈর্গুণজৈঃসিভিরীড়িতস্ত্বমত
আশু পুনঃ প্রবিশেঃ পদম্ ॥ ৬৩ ॥

এইরূপে মৃতব্যক্তির সঞ্জীবনী-সুধাকল্প পাপনাশন বহুগুণশোভিত অলৌকিক চরিত্রগুণে সমস্ত ভূতলে পূজিত হইয়া পুনরায় নিজপদে প্রবিষ্ট হইবেন ॥ ৬৩ ॥

৯। অনাদিরাদ্যোজররূপধারী
হারী কিরীটী মকরধ্বজাভঃ।
জয়ং করোতু প্রসভং হতারিঃ
স্মরারিসংসেবিতপাদপদ্মঃ ॥ ৬৪ ॥

আপনিই সকলের আদি, আপনার আদি কেহই নাই। আপনি অজর-রূপধারী, কন্দর্পতুল্য রূপবান্; হারকিরীট-শোভিত। মহাদেব আপনার পাদপদ্মসেবা করিয়া থাকেন। আপনি নিখিলশত্রু নিহত করিয়াছেন, আপনার জয় হউক ॥ ৬৪ ॥

শ্রীপুরুষোত্তম-মাস-মাহাত্ম্য

স্মার্ত্ত ও পরমার্থ-ভেদে শাস্ত্র দ্বিবিধ

'স্মার্ত্ত', 'পরমার্থ'-ভেদে বৈদিক আর্য্য-শাস্ত্র দুই ভাগে বিভক্ত। যাঁহারা স্মার্ত্ত-বিভাগের অধিকারী তাঁহারা স্বভাবতঃ 'পরমার্থ'-শাস্ত্রে রুচিপ্রাপ্ত নন। নিজ-নিজ রুচি অনুসারেই মানবের বিচার, সিদ্ধান্ত, ক্রিয়া ও জীবনের উদ্দেশ্য গঠিত হয়। স্মার্ত্তগণ নিজ-নিজ রুচিসম্মত শাস্ত্রে অধিকতর বিশ্বাস করেন।

পারমার্থিক-শাস্ত্রে তাঁহাদের সেরূপ অধিকার না থাকায় সেরূপ আস্থাও প্রকাশ করেন না। এরূপ বিভাগের কর্ত্তা—বিধাতা। সুতরাং ইহাতে জগৎপাতার একটী গূঢ় উদ্দেশ্য আছে, সন্দেহ নাই। আমরা যতদূর জানিতে পারিয়াছি সে-উদ্দেশ্য এই—স্বীয় স্বীয় অধিকারে স্থির থাকিতে পারিলেই জীবের ক্রমোন্নতি হয়। অধিকার-চ্যুত হইলেই পতন হয়। মানবগণ স্বীয় স্বীয় কর্ম্মানুসারে কর্ম্মাধিকার ও ভক্ত্যধিকার-বশে দ্বিবিধ অধিকার লাভ করিয়া থাকেন। যে-পর্য্যন্ত মানবের কর্ম্মাধিকার থাকে, সে-পর্য্যন্ত তাঁহার স্মার্ত্ত পথই শ্রেয়ঃ। কর্ম্মাধিকার অতিক্রম করত যখন তিনি ভক্তি-অধিকারে প্রবেশ করেন, তখন তাঁহার পারমার্থিক পথে স্বভাবতঃ রুচি জন্মে। এতন্নিবন্ধন বিধাতা স্মার্ত্ত-পরমার্থ-ভেদে দ্বিবিধ শাস্ত্র করিয়াছেন।

স্মার্ত্ত-শাস্ত্রের বিধিবিধান—কর্ম্মপর

স্মার্ত্ত-শাস্ত্র মানবগণকে সর্ব্বদা কর্ম্মাধিকারে নিষ্ঠা লাভ করাইবার চেষ্টায় অনেক প্রকার বিধি-বিধান করিয়াছেন। এমত কি সেইসকল বিধি-বিধানে বিশেষ নিষ্ঠা দিবার জন্য পরমার্থ-শাস্ত্রের প্রতি অনেক স্থলে ঔদাসীন্য প্রকাশ করিয়াছেন। বস্তুতঃ শাস্ত্র এক হইলেও লোকের নিকট ইহাঁর দুই প্রকার ভাব। অধিকার-নিষ্ঠা ব্যতীত জীবের মঙ্গল হয় না। তাই শাস্ত্র স্মার্ত্ত-পরমার্থ-ভেদে দ্বিবিধ বলিয়া প্রতীত।

অধিমাস সৎকর্ম্ম-হীন, ইহার নামান্তর মলমাস

বৎসরকে দ্বাদশ ভাগে বিভাগ করিয়া, দ্বাদশ মাসে স্মার্ত্ত-শাস্ত্র সর্ব্বসৎকর্ম্ম নিরূপণ করিয়াছেন। বর্ণাশ্রম-গত সমস্ত কর্ম্মই যখন দ্বাদশ মাসে বিভক্ত হইল, তখন 'অধিমাস' কর্ম্মহীন মাস হইয়া গেল। **অধিমাসে কোন সৎকর্ম্ম নাই।** চান্দ্র মাস ও সৌর মাসের মিল রাখিবার জন্য ৩২ মাসে একটী করিয়া মাস বাদ দিতে হয়। * সেই মাসটীর নাম অধিমাস। স্মার্ত্তগণ অধিমাসকে **মলমাস** বলিয়া পরিত্যাগ করিয়াছেন। মলিম্লুচ (চোর), মলিন-মাস ইত্যাদি নাম দিয়া অধিমাসকে ঘৃণিত বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

---

* শ্রীসূর্য্য-সিদ্ধান্তে উক্ত হইয়াছে—ষড়বহ্নি-ত্রিহুতাশাঙ্কাতিথয়শ্চাধিমাসকাঃ। খচতুষ্ক সমুদ্রাষ্ট কুপঞ্চ রবিমাসকাঃ॥ অর্থাৎ এক মহাযুগে অধিমাস ১৫৯৩৩৩৬ ও রবি মাস ৫১৮৪০০০০। অতএব রবিমাগে মাসাদি ৩২।১৬।৪ অন্তর একটী একটী অধিমাস হয়।

পরমার্থ-শাস্ত্রে অধিমাস শ্রেষ্ঠ ও হরি-ভজনোপযোগী

এদিকে পরমারাধ্য পরমার্থ-শাস্ত্র অধিমাসকে পরমার্থ-কার্য্যে সর্ব্বোপরি শ্রেষ্ঠ বলিয়া প্রকাশ করেন। জীবন অনিত্য। জীবনের কোন অংশই বৃথা যাপন করা উচিত নয়। সর্ব্বদা সর্ব্বক্ষণ হরি-ভজনে থাকাই জীবের কর্ত্তব্য। সুতরাং প্রত্যেক তৃতীয় বৎসরে যে অধিমাস হয়, তাহাও হরিভজনের উপযোগী হউক —ইহাই পরমার্থ-শাস্ত্রের নিগূঢ় চেষ্টা। আবার যখন কর্ম্মিগণ ঐ মাসকে সমস্ত সৎকর্ম্মশূন্য বলিয়া জানিলেন, তখন সর্ব্বজীবের উদ্ধারের জন্য পরমার্থ-শাস্ত্র সেই কালকে ভজনের বিশেষ উপযোগী বলিয়া নির্দ্ধারিত করিলেন। পরমার্থ-শাস্ত্র বলেন যে, হে জীব! কেন অধিমাসে হরি-ভজনে আলস্য কর? এই মাস শ্রীমদ্ গোলোকনাথ-কর্ত্তৃক সর্ব্বোপরি স্থাপিত হইয়াছে। এমন কি **কার্ত্তিক, মাঘ ও বৈশাখাদি মহাপুণ্য মাস অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ।** এই মাসে বিশেষ ভজন বিধির সহিত শ্রীশ্রীরাধা-কৃষ্ণার্চ্চন কর। সমস্ত লাভ হইবে।

অধিমাসের ইতিহাস ও মাহাত্ম্য, এবং ইহার 'পুরুষোত্তম' আখ্যা প্রাপ্তি

নারদীয়-পুরাণে অধিমাসের মাহাত্ম্য একত্রিংশৎ অধ্যায়ে বর্ণিত আছে। দ্বাদশ মাসের আধিপত্য ও আপনার অপমান বিচার করিয়া অধিমাস বহুকষ্টে বৈকুণ্ঠে গমন করত নিজ দুঃখ শ্রীনারায়ণকে জানাইয়াছিলেন। বৈকুণ্ঠ-পতি কৃপা করিয়া অধিমাসকে সঙ্গে লইয়া গোলোকে শ্রীকৃষ্ণের নিকট উপস্থিত হইলেন। শ্রীকৃষ্ণ মলমাসের আর্ত্তি শ্রবণ করত দয়ার্দ্র হইয়া বলিলেন,—

অহমেতৈর্যথা লোকে প্রথিতঃ পুরুষোত্তমঃ।
তথায়মপি লোকেষু প্রথিতঃ পুরুষোত্তমঃ॥
অস্মৈ সমর্পিতাঃ সর্ব্বে যে গুণময়ি সংস্থিতাঃ।
মৎসাদৃশ্যমুপাগম্য মাসানামধিপো ভবেৎ॥
জগৎপূজ্যো জগদ্বন্দ্যো মাসোঽয়ং তু ভবিষ্যতি।
সর্ব্বে মাসাঃ সকামাশ্চ নিষ্কামোঽয়ং ময়া কৃতঃ॥
অকামঃ সর্ব্বকামো বা যোঽধিমাসং প্রপূজয়েৎ।
কর্ম্মাণি ভস্মসাৎ কৃত্বা মামেবৈষ্যত্যসংশয়ম্॥
কদাচিন্মম ভক্তানামপরাধেতি গণ্যতে।
পুরুষোত্তম-ভক্তানাং নাপরাধঃ কদাচন॥

য এতস্মিন্মহা মূঢ়া জপ-দানাদি-বর্জ্জিতাঃ।
সৎকর্ম্ম-স্নান-রহিতা দেব-তীর্থ-দ্বিজ-দ্বিষঃ॥
জায়ন্তে দুর্ভগা দুষ্টাঃ পর-ভাগ্যোপজীবিনঃ।
ন কদাচিৎ সুখং তেষাং স্বপ্নেঽপি শশশৃঙ্গবৎ॥
যেনাহমর্চ্চিতো ভক্ত্যা মাসেঽস্মিন্ পুরুষোত্তমে।
ধন-পুত্র-সুখং ভুংক্ত্বা পশ্চাদ্গোলোকবাসভাক্॥

ইহার অর্থ এই যে,—হে রমাপতি! আমি যেরূপ এই জগতে পুরুষোত্তম বলিয়া বিখ্যাত, এই অধিমাসও লোকে পুরুষোত্তম বলিয়া বিখ্যাত হইবে। আমাতে যে সমস্ত গুণ আছে সেই সমস্তই এই মাসে অর্পিত হইল। আমার সদৃশ হইয়া এই অধিমাস অন্য সকল মাসের অধিপতি হইল। এই মাস জগৎ পূজ্য ও জগদ্বন্দ্য। অন্য সকল মাস সকাম। এই মাসটী নিষ্কাম। যিনি অকাম হইয়া বা সর্ব্বকাম হইয়া এই মাসের পূজা করেন, তিনি সকল কর্ম্ম ভস্মসাৎ করিয়া আমাকে প্রাপ্ত হন। আমার ভক্তদিগের কদাচিৎ অপরাধ হয়, এই পুরুষোত্তম-মাসের ভক্তগণের কখনই অপরাধ হইবে না। যে-সকল মহামূঢ় এই অধিমাসে জপ-দানাদি-বর্জ্জিত, সৎকর্ম্মও স্নানাদি-রহিত এবং দেব-তীর্থ ও দ্বিজগণের প্রতি বিদ্বেষ করে, সেই সকল দুষ্ট দুর্ভাগা পরভাগ্যোপজীবি হইয়া স্বপ্নেও কিছু-মাত্র সুখ পায় না। এই পুরুষোত্তম-মাসে যিনি আমাকে ভক্তিপূর্ব্বক অর্চ্চন করেন, তিনি ধন-পুত্রাদি-সুখ-ভোগ করিয়া অবশেষে গোলোকবাসী হন।

পুরুষোত্তম-মাস-মাহাত্ম্য-প্রসঙ্গে দ্রৌপদীর ইতিহাস বর্ণন

পুরুষোত্তম-মাসের মাহাত্ম্য-প্রসঙ্গে অনেকগুলি পৌরাণিক প্রসঙ্গ কথিত হইয়াছে। দ্রৌপদী পূর্ব্বজন্মে 'মেধা'-ঋষির কন্যা ছিলেন। দুর্ব্বাসা-প্রোক্ত 'পুরুষোত্তম-মাহাত্ম্য' শুনিয়াও তিনি ঐ মাসকে অবহেলা করেন, তাহাতে সে-জন্মে কষ্ট ও দ্রৌপদী-জন্মে পঞ্চপতির অধীন হন। শ্রীকৃষ্ণের উপদেশে পাণ্ডবগণ দ্রৌপদীর সহিত পুরুষোত্তম-মাস-ব্রত আচরণ করিয়া সমস্ত বনবাস-দুঃখের পার প্রাপ্ত হন। যথা :—

এবং সর্ব্বেষু তীর্থেষু ভ্রমন্তঃ পাণ্ডুনন্দনাঃ।
পুরুষোত্তম-মাসাত্য-ব্রতং চেরুর্ব্বিধানতঃ॥
তদন্তে রাজ্যমতুলমবাপুর্গতকণ্টকম্।
পূর্ণে চতুর্দ্দশে বর্ষে শ্রীকৃষ্ণ-কৃপয়া মুনে॥

পুরুষোত্তম-ব্রত সম্বন্ধে বাল্মীকি-কথিত দৃঢ়ধন্বা রাজার বৃত্তান্ত

দৃঢ়ধন্বা রাজার বৃত্তান্তও পূর্ব্বজন্ম বৃত্তান্তে পুরুষোত্তম-মাস-মাহাত্ম্য বিশেষ-রূপে কথিত হইয়াছে। বাল্মীকি মুনি দৃঢ়ধন্বার প্রশ্নমতে যে ব্রত-প্রকরণ বলিয়াছিলেন, তাহা নারদ শ্রীনারায়ণ-ঋষির নিকট বদরিকাশ্রমে শ্রবণ করেন। ধর্ম্মশাস্ত্রে যেরূপ ব্রাহ্মণের আহ্নিক-বিধি নিরূপিত আছে, তদ্রূপ ব্রাহ্ম-মুহূর্ত্ত হইতে পুরুষোত্তম-সেবকের কর্ত্তব্য বিধান করিয়াছেন।

শ্রীপুরুষোত্তম-মাসে স্নান-বিধি

শ্রীপুরুষোত্তম-মাসে স্নান-বিধানে বলিয়াছেন যে,—

সমুদ্রগা নদী-স্নানমুত্তমং পরিকীর্ত্তিতম্।
বাপী-কূপ-তড়াগেষু মধ্যমং কথিতং বুধৈঃ।
গৃহে স্নানং তু সামান্যং গৃহস্থস্য প্রকীর্ত্তিতম্॥

শ্রীপুরুষোত্তম-ব্রতী স্নান করিয়া—

সপবিত্রেণ হস্তেন কুর্য্যাদাচমন-ক্রিয়াম্।
আচম্য তিলকং কুর্য্যাদ্গোপী-চন্দন-মৃৎস্নয়া॥
ঊর্দ্ধপুণ্ড্রমৃজুং সৌম্যং দণ্ডাকারং প্রকল্পয়েৎ।
শঙ্খ-চক্রাদিকং ধার্য্যং গোপী-চন্দন-মৃৎস্নয়া॥

শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ-পূজাই পুরুষোত্তম-মাস-কৃত্য

শ্রীকৃষ্ণ-পূজাই পুরুষোত্তম-মাসে কর্ত্তব্য, যথা—

পুরুষোত্তম-মাসস্য দৈবতং পুরুষোত্তমঃ।
তস্মাৎ সম্পূজয়েদ্ভক্ত্যা শ্রদ্ধয়া পুরুষোত্তমম্॥

বাল্মীকি কহিলেন,—হে দৃঢ়ধন্বা! পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণই পুরুষোত্তম মাসের অধিদেবতা। অতএব সেই মাসে প্রতিদিন ভক্তিশ্রদ্ধাপূর্ব্বক পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণকে ষোড়শ উপচারে পূজা করিবে। যথা—

ষোড়শোপচারৈশ্চ পূজয়েৎ পুরুষোত্তম্।

শ্রীশ্রীরাধা-কৃষ্ণের যুগলোপাসনাই কর্ত্তব্য, যথা—

আগচ্ছ দেব দেবেশ শ্রীকৃষ্ণ পুরুষোত্তম।
রাধয়া সহিতশ্চাত্র গৃহাণ পূজনং মম॥

পুরুষোত্তম-মাসে অকরণীয়

এই শাস্ত্রে শ্রীপুরুষোত্তম-ব্রত সম্বন্ধে পূর্ব্বে যে-সমস্ত বিধি-নিয়ম লিখিত

হইয়াছে, সে-সমস্ত সর্ব্ব বর্ণধর্ম্মপরায়ণ ধার্ম্মিক লোকের পালনীয়। গ্রন্থ-শেষে নৈমিষ-ক্ষেত্রে শ্রীসূত গোস্বামী ঋষিগণকে এই বলিয়াছেন,—

ভারতে জনুরাসাদ্য পুরুষোত্তমমুত্তমম্।
ন সেবন্তে ন শৃণ্বন্তি গৃহাসক্তা নরাধমাঃ॥
গতাগতং ভজন্তেঽত্র দুর্ভগা জন্মজন্মনি।
পুত্র-মিত্র-কলত্রাপ্ত-বিয়োগাদ্দুঃখভাগিনঃ॥
অস্মিন্মাসে দ্বিজশ্রেষ্ঠা নাসচ্ছাস্ত্রাণ্যুদাহরেৎ।
ন স্বপেৎ পর-শয্যায়াং নালপেৎ বিতথং ক্বচিৎ॥
পরাপবাদান্ন ব্রূয়ান্ন কথঞ্চিৎ কদাচন।
পরান্নঞ্চ ন ভুঞ্জীত ন কুর্ব্বীত পরক্রিয়াম্॥

ভারতে জন্ম-লাভ করত গৃহাসক্ত নরাধমগণ শ্রীপুরুষোত্তম-ব্রত-কথা শ্রবণ এবং ঐ ব্রত পালন করে না। দুর্ভাগাগণ জন্মজন্ম মরণ-ভোগ করে এবং পুত্র-মিত্র-কলত্র ও নিজ-জনের বিয়োগ-জনিত দুঃখভাগী হয়। এই পুরুষোত্তম মাসে হে দ্বিজবরগণ! বৃথা কাব্যালঙ্কারাদি অসৎ-শাস্ত্র আলোচনা করিবে না। পর-শয্যায় শয়ন এবং অনিত্য বিষয়ালাপ করিবে না। পরনিন্দা বাক্যালাপ করিবে না। পরান্ন ভোজন ও পরকার্য্য করিবে না।

পুরুষোত্তম-মাসে করণীয়

বিত্তশাঠ্যমকুর্ব্বাণো দানং দদ্যাদ্দ্বিজাতয়ে।
বিদ্যমানে ধনে শাঠ্যং কুর্ব্বাণো রৌরবং ব্রজেৎ॥
দিনে দিনে দ্বিজেন্দ্রায়-দত্ত্বা ভোজনমুত্তমম্।
দিবসস্যাষ্টমে ভাগে ব্রতী ভোজনমাচরেৎ॥
ইন্দ্রদ্যুম্নঃ শতদ্যুম্নো যৌবনাশ্বো ভগীরথঃ।
পুরুষোত্তমমারাধ্য যযুর্ভগবদন্তিকম্॥
তস্মাৎ সর্ব্ব প্রযত্নেন সংসেব্য পুরুষোত্তমঃ।
সর্ব্ব সাধনতঃ শ্রেষ্ঠঃ সর্ব্বার্থফলদায়কঃ॥
গোবর্দ্ধনধরং বন্দে গোপালং গোপরূপিনম্।
গোকুলোৎসবমীশানং গোবিন্দং গোপিকাপ্রিয়ম্॥
কৌণ্ডিন্যেন পুরাপ্রোক্তমিমং মন্ত্রং পুনঃ পুনঃ।
জপন্মাসং নয়েদ্ভক্ত্যা পুরুষোত্তমমাপ্নুয়াৎ॥

ধ্যায়ন্নবঘন-শ্যামং দ্বিভুজং মুরলীধরম্।
লসৎ পীত-পটং রম্যং সরাধং পুরুষোত্তমম্॥
ধ্যায়ং ধ্যায়ং নয়েন্মাসং পূজয়ন্ পুরুষোত্তমম্।
এবং যঃ কুরুতে ভক্ত্যা স্বাভীষ্টং সর্ব্বমাপ্নুয়াৎ॥

বিত্তশাঠ্য পরিত্যাগপূর্ব্বক ব্রাহ্মণদিগকে দান করিবে। ধন থাকিলে শাঠ্য করা রৌরব গমনের কারণ হয়। প্রতিদিন বৈষ্ণব ও ব্রাহ্মণদিগকে উত্তম ভোজন দিবে। ব্রতী নিজে দিবসের অষ্টমভাগে ভোজন করিবে। ইন্দ্রদ্যুম্ন, শতদ্যুম্ন, যৌবনাশ্ব ও ভগীরথ পুরুষোত্তম আরাধনা করিয়া ভগবৎ-সামীপ্য লাভ করিয়াছিলেন। সর্ব্বপ্রকার যত্নের সহিত পুরুষোত্তম-সেবা করিবে। এই পুরুষোত্তম-সেবা সকল সাধন অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ও সর্ব্বার্থ ফলদায়ক। 'গোবর্দ্ধনধরং' প্রভৃতি মন্ত্রটী পূর্ব্বে কৌণ্ডিন্য মুনি পুনঃ পুনঃ জপ করিয়াছিলেন। এই মন্ত্র ভক্তিপূর্ব্বক শ্রীপুরুষোত্তম-মাসে জপ করিয়া পুরুষোত্তম প্রাপ্ত হইবে। নব-ঘন দ্বিভুজ মুরলীধর পীতাম্বর শ্রীকৃষ্ণকে শ্রীরাধার সহিত নিয়ত ধ্যান করিতে করিতে পুরুষোত্তম-মাসকে যাপিত করিবে। যিনি ভক্তিপূর্ব্বক এরূপ করেন, তিনি সকল অভীষ্ট লাভ করেন।

স্বনিষ্ঠ, পরনিষ্ঠ ও নিরপেক্ষ পরমার্থির কৃত্য

পরমার্থী তিন প্রকার অর্থাৎ স্বনিষ্ঠ, পরিনিষ্ঠিত ও নিরপেক্ষ। পূর্ব্বোক্ত কার্য্যসকল স্বনিষ্ঠ পরমার্থির পক্ষে বিধেয়। পরিনিষ্ঠিত ভক্তমণ্ডলী স্বীয় স্বীয় আচার্য্য-নির্দ্দিষ্ট 'কার্ত্তিক-মাস-ব্রত-পালন'-নিয়মানুসারে 'পুরুষোত্তম-ব্রত-পালন' করিতে অধিকারী। নিরপেক্ষ-ভক্তগণ ঐকান্তিকী প্রবৃত্তিদ্বারা 'শ্রীভগবৎ-প্রসাদ-সেবন' নিয়মের সহিত অহরহঃ সাধ্যানুসারে 'শ্রীহরিনাম-শ্রবণ-কীর্ত্তন'-দ্বারা সমস্ত পবিত্র মাসগুলি যাপন করিয়া থাকেন। যথা শ্রীহরিভক্তি-বিলাসে চরমোপদেশে বিষ্ণুরহস্য-বাক্য,—

ইন্দ্রিয়ার্থেষ্বসক্তানাং সদৈব বিমলা মতিঃ।
পরিতোষয়তে বিষ্ণুং নোপবাসো জিতাত্মনঃ

যাঁহাদের মতি ভক্তিপূত হইয়া ইন্দ্রিয়ার্থে অনাসক্ত, তাঁহাদের মতি স্বভাবতঃ বিমলা, সুতরাং তাঁহারা জিতাত্মা। সর্ব্ব সময়েই স্বাভাবিকী ভক্তিদ্বারা শ্রীকৃষ্ণকে পরিতোষ করেন। উপবাসাদি তাঁহাদের চিত্তশুদ্ধির কারণ হইতে পারে না।

একান্তিদিগের স্বাভাবিক রুচি ও করণীয়

অতএব শ্রীসনাতন গোস্বামী একান্তিদিগের সম্বন্ধে এই কথা বলিয়া গ্রন্থ সমাপ্ত করিয়াছেন—

এবমেকান্তিনাং প্রায়ঃ কীর্ত্তনং স্মরণং প্রভোঃ।
কুর্ব্বতাং পরম-প্রীত্যা কৃত্যমন্যন্ন রোচতে ॥
ভাবেন কেনচিৎ প্রেষ্ঠঃ শ্রীমূর্ত্তেরঙ্ঘ্রি সেবনে।
স্যাদিচ্ছৈষাং স্বতন্ত্রেণ স্বরসেনৈব তদ্বিধিঃ ॥
বিহিতেষ্বেব নিত্যেষু প্রবর্ত্তন্তে স্বয়ং হিতে।
ইত্যাদ্যেকান্তিনাং ভাতি মাহাত্ম্যং লিখিতং হি তৎ ॥

একান্ত কৃষ্ণভক্তদিগের শ্রীকৃষ্ণ-স্মরণ ও শ্রীকৃষ্ণ-কীর্ত্তনই অত্যন্ত প্রিয়। প্রায় তাঁহারা এই দুই অঙ্গ ব্যতীত আর কোন অঙ্গে ব্যস্ত হন না। পরম প্রীতির সহিত উক্ত অঙ্গদ্বয় পালন-করণে এতদূর আগ্রহ যে, অন্য কৃত্যসকল তাঁহাদের রুচি সংগ্রহ করিতে পারে না। শ্রীকৃষ্ণের অঙ্ঘ্রি-সেবা কোন বিশেষ ভাবের সহিত করিতে তাঁহাদের ইচ্ছা প্রবলা হয়; সুতরাং কিছু স্বতন্ত্রতার সহিত এবং স্বীয় রসের অনুকূলভাবে কৃষ্ণাঙ্ঘ্রি-সেবাই তাঁহাদের বিধি হয়। ঋষিগণ যে-সকল বিধি বিধান করিয়াছেন, তাহাতে একান্তী ভক্তদিগের বিধিবাধ্য ভাব নাই। স্বয়ং প্রবৃত্তি-ভাবই স্বভাবতঃ বর্ত্তমান হয়। ইহাই একান্ত ভক্তদিগের মাহাত্ম্য।

কর্ম্মকাণ্ডের পীড়ন না থাকায় অধিমাস ভক্তের প্রিয়

ভক্তগণ স্বনিষ্ঠ, পরিনিষ্ঠিত ও একান্ত ভাবভেদে যথাধিকার শ্রীপুরুষোত্তম-মাস পালন করিতে প্রবৃত্ত হইবেন। ভগবান্ ব্রজনাথ শ্রীকৃষ্ণ এই মাসের অধিপতি। সুতরাং অধিমাস ভক্তমাত্রেরই প্রিয় মাস, যেহেতু ঘটনাক্রমে ঐ মাসে কোন কর্ম্মকাণ্ডের পীড়ন আসিয়া ভক্তির ব্যাঘাত করিবে না।

(সজ্জনতোষণী ১০ম খণ্ড ৬ষ্ঠ সংখ্যা)

—জগদ্গুরু শ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুর

কমিনা

'উচ্চ' ও 'নীচ' এই সংস্কৃত শব্দদ্বয় বৈদেশিক ভাষায় 'মোকাদিম্' ও 'কমিনা' শব্দে কথিত হয়। 'বড়' ও 'ছোট'—এই দুইটী পরিমাণের জ্ঞাপক। মায়ার রাজ্যেই ইহার পরিমিতি হয়। বৈকুণ্ঠে এই মাপের বড় ছোট নাই। এইজন্যই শুদ্ধজীব মাত্রেই কৃষ্ণদাস। দাস্যের পরিমাণ মায়িক রাজ্যের ন্যায় বড় ছোট, ভাল-মন্দ প্রকাশ করিয়া হিংসা মৎসরতা প্রভৃতি অনিত্য মায়িক ভাবের সৃষ্টি করে না। যাহারা বৈকুণ্ঠ রাজ্যকে বা শুদ্ধজীবগণকে অহঙ্কারের মাপে বড়-ছোট মনে করে, ভজনের আধিক্য ও স্বল্পতায় যাহাদের ভেদদৃষ্টি নাই, তাহারাই পারমার্থিকের নিত্য বিচারে অবর বা নীচ। এই কমিনার বিচার পারমার্থিক গ্রন্থ শ্রীমদ্ভাগবত ও শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থে সূত্ররূপে এরূপ নির্দ্দিষ্ট আছে। শ্রীচরিতামৃতে লিখিত আছে যে—"নীচ-জাতি নহে কৃষ্ণভজনে অযোগ্য। সৎকুল-বিপ্র নহে ভজনের যোগ্য॥ যেই ভজে সেই বড়, অভক্ত হীন ছার।"

সংসারে কৃতিপুরুষের সন্তান পিতার গৌরব অনেক স্থলে রক্ষা করিতে অসমর্থ হন, আবার পিতৃমহত্ত্ব সন্তানদ্বারাই উজ্জ্বলীকৃত হয়। শাস্ত্রে লিখিত আছে, যদি বংশে একটী কনিষ্ঠ ভাগবত জন্মগ্রহণ করেন, তাহা হইলে তাঁহার ঊর্দ্ধতন তিন পুরুষ ও পরবর্ত্তী তিন পুরুষ উচ্চতা লাভ করেন। মধ্যমাধিকারে জন্ম লাভ করিলে ঊর্দ্ধ চতুর্দ্দশ পুরুষ এবং নিম্ন চতুর্দ্দশ পুরুষ সর্ব্বশ্রেষ্ঠতা লাভ করেন। মহাভাগবত জন্মগ্রহণ করিলে শত পুরুষ ঊর্দ্ধে এবং শত পুরুষ নিম্নে সেই শ্রেষ্ঠ মর্য্যাদার অধিকারী হন। যিনি ভগবদ্ভজনহীন হইয়া উচ্চের সন্তান বলিয়া অহঙ্কার করেন, তাঁহাকে লোকে অসতের সন্তান বলিয়াই দর্শন করে। বংশের মুখোজ্জ্বলকারী বা কুলাঙ্গার বলিয়া প্রতিপন্ন হওয়া জীবের নিজের সৌভাগ্যের উপর নির্ভর করে। উচ্চের সন্তান স্বয়ং নীচ হইতে পারেন, কিন্তু উচ্চের পিতাকে কেহ 'নীচ' বলিয়া সংজ্ঞা দেয় না। যে পিতৃত্বের ফলে প্রকৃত ব্রহ্মজ্ঞ, সমাজের কল্যাণ বিধান করেন, সেই পিতাকে নীচ-কর্ম্মা বলা যায় না। মনু বলেন,—যিনি বেদপাঠরূপ ব্রাহ্মণধর্ম্ম ছাড়িয়া দেন এবং অন্য ব্যবসায় অবলম্বন করেন, তিনি উচ্চ ব্রহ্মজ্ঞকুল হইতে সদ্যই নীচ হইয়া যান। সেই নীচের পুত্রের উপনয়নাদি-সংস্কার বিহিত নহে। যে-কালে বংশে বিষ্ণুভক্তিবিশিষ্ট ব্রহ্মজ্ঞ জন্মগ্রহণ করেন, সেইকালে তাঁহার পূর্ব্বপুরুষগণের

কলঙ্ক অপনোদিত হয়। এই প্রথা অবলম্বন করিয়াই সমাজে মোকাদিম্ ও কমিনা উৎপত্তি লাভ করিয়াছে।

জীবের বাহ্য পরিচয়ে বড়-ছোট বিচার আছে। বৈকুণ্ঠ দর্শনে জীবের সমত্ব সর্ব্বশাস্ত্রে বিগীত হয়। আপনাকে জানিতে না পারিয়া যাঁহারা স্থূল ও সূক্ষ্ম দ্বিবিধ আবরণকেই 'আমি' বলিয়া সনাক্ত করেন, তাঁহাদের মুখনির্গলিত কমিনা-নির্ব্বাচন ভ্রমপূর্ণ হয়। কমিনাগণই আপনাদিগকে মোকাদিম্ সাজাইতে সর্ব্বদা চেষ্টা করে, কিন্তু তাহাদের ব্যবহার লইয়াই শ্রেষ্ঠতা ও অবরতার বিচার হয়। নিরীশ্বর অনাত্মবাদী কর্ম্মকাণ্ড আবাহন করিয়া বেদতাৎপর্য্যকে অহঙ্কারে বিষয় করিয়া তুলে, শুদ্ধ বর্ণাশ্রমকে মূর্খতার ব্যপদেশে বিকৃতভাবাপন্ন করে। জগতে অবুঝের সংখ্যাই বেশী; সুতরাং তাহাদিগের গলাবাজীতে অনেক নীচ উচ্চ হইয়া পড়ে এবং অনেক উচ্চাবস্থিত মহৎ উচ্চস্থান পাওয়া দূরে থা'ক্, নীচের সুনীচ স্তরেও স্থাপিত হয়। আত্মহিংসক, বন্ধুহিংসক, স্বদেশহিংসক, প্রাণিহিংসক পরদ্রোহে নিপুণ হইয়া অনেক সময় পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ প্রভৃতির হিংসা করে। কখনও মৎস্য, অণ্ড প্রভৃতি পরহিংসা-দ্বারা নিজের ক্ষুদ্রপ্রাণ ধারণ করে এবং বাহ্যশরীর পুষ্ট করে। কখনও মাদক দ্রব্য গ্রহণ করিতে গিয়া তাম্বুলাদি হইতে ধূম্রযাত্রা ও আসবাদিপানে অগ্রসর হয়। এগুলি নিশ্চয়ই মহতের বৃত্তি নহে, সভ্যতার অনুমোদিত নহে বা ব্রহ্মজ্ঞানের আদর্শ নহে।

সনাতন ধর্ম্মের নামে আজকাল অনেকপ্রকার সঙ্কীর্ণ সাম্প্রদায়িকতা চলিতেছে। কিন্তু সেগুলি সনাতন ধর্ম্ম নহে। বিকৃত বর্ণাশ্রমকে 'আমার দাঁড়ে ছোলা' সম্প্রদায় সনাতন ধর্ম্ম বলিয়া প্রচার করিতে গিয়া যে সমাজের বিঘ্ন করিতেছেন, তাহার বিষময় ফল আমাদিগকে আর চোখ ফুটাইয়া দেখাইয়া দিতে হইবে না। বর্ণধর্ম্মবিচারে দুই প্রকার পদ্ধতি গৃহীত হয়। সাধারণতঃ মূর্খ লোক বৃত্তবিচারে অযোগ্য হওয়ায় স্থূল পদ্ধতিমতে শৌক্র অধস্তনকেই তত্তৎবর্ণ নির্দ্দেশ করেন। ইহা পুরোহিত সম্প্রদায়ের অবিমৃষ্যকারিতার ফল মাত্র। যদি পুরোহিতগণ প্রকৃতপ্রস্তাবে বেদজ্ঞ ও ব্রহ্মনিষ্ঠ হইতেন, তাহা হইলে শৌক্রবিচার অবলম্বন করিয়া খামকে চিঠি বলিয়া ভ্রম করিতেন না, অচিৎকে চিৎ বলিয়া চালাইবার চেষ্টা করিতেন না। গিল্টিকে আসল বলা, চুণের গোলাকে দুধ বলা, তালগাছশূন্য পুষ্করিণীকে তালপুকুর বলা, তালগাছযুক্ত পুকুরকে বেলপুকুর বলার আদর করিতেন না। জড় হইতে চিৎ উৎপন্ন হয়, এরূপ প্রত্যক্ষবাদের আবাহন করিতে সকল বেদ-বেদান্ত তারস্বরে

নিষেধ করিয়াছেন। কিন্তু কালের কি মহিমা! ব্রহ্মবস্তুকে কারণরূপে স্বীকার না করিয়া ব্রহ্মেতর মায়াশক্তিকে ভোগবুদ্ধিবলে আদিপুরুষরূপে সাজান এবং বস্তুভ্রান্তির আরোপ অবাধে হইতে চলিল। যাহারা খণ্ড বস্তুকে পরিমিত করিয়া তাহাকেই ব্রহ্ম বলিয়া ভ্রম করে এবং তাদৃশ ব্রহ্মকে মায়া-শক্তিজাত বলিতে কুণ্ঠিত হয় না, তাহার বৈকুণ্ঠ বস্তু বৈষ্ণবকে ব্রহ্মজ্ঞ বলিতেও পরাঙ্মুখ হয়। এরূপ ব্রহ্মবাদিগুলিকে ব্রাহ্মণ না বলিয়া শাস্ত্রকারগণ 'প্রকৃতিবাদী' বা 'মায়াবাদী' বলিয়াছেন এবং 'নাস্তিক জড়হেতুবাদী' বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

বৃহতের সন্তান আত্মদর্শী ঋষিগণ। মায়াজাত ক্ষুদ্রগণ বৃহৎ নহেন। তাঁহারা ব্রহ্মজ্ঞ হইলে মায়াজাত-পরিচয়ে অব্রাহ্মণ বলিয়া পরিচয় দিবার জন্য ব্যস্ত হন না। বৃহৎ বস্তুকে মায়া অধীন করিতে সমর্থ হয় না। ব্রহ্মজ্ঞ যোগী যখন ভগবানের ভজন করেন, তখনই তিনি উচ্চ এবং অচ্যুত-সন্তান। ব্রহ্ম বা বেদই তাঁহার আশ্রয়। তিনিই ব্রাহ্মণ। আর নিজেকে ভগবদ্‌ভজনের অযোগ্য জানিলেই পরমাত্মার সহিত জড়ের যোগ-প্রয়াস ও ভোগের সহিত ভজনের ভ্রান্তি আসিয়া তাহাকে মায়াবাদী অক্ষজজ্ঞানবিশিষ্ট বলিয়া স্থাপন করে। বদ্ধজীব কখনও স্বর্ণশৃঙ্খলে বদ্ধ হইয়া নিজের অহঙ্কার করে, কখনও বা লৌহশৃঙ্খলে বদ্ধ হইয়া আপনাকে 'কম্মিনা' মনে করে। ভগবদ্‌বৈমুখ্যই এই উচ্চাবচ-দর্শনের কারণ। এই জন্যই অণুচিৎগণ সমধর্ম্মা অর্থাৎ সকলেই জীবাত্মা বা ব্রাহ্মণ। যেখানে বৈষম্য উপস্থিত, সেই স্থলেই সত্যপ্রিয়তার অভাব ও ক্রূরতার মূর্ত্তিমান্ অধিষ্ঠান। আমরা পণ্ডিত ব্রাহ্মণ-গণকে বৃত্তবিচার অবলম্বন করিয়া শ্রীগীতা পাঠ করিতে অনুরোধ করি,—

বিদ্যাবিনয়সম্পন্নে ব্রাহ্মণে গবি হস্তিনি।
শুনি চৈব শ্বপাকে চ পণ্ডিতাঃ সমদর্শিনঃ॥

বাহ্যজগৎ ব্রহ্ম নহে। উহা মায়া-রচিত। মায়ার হাত হইতে পরিত্রাণ লাভ করিলেই ব্রাহ্মণতা।

—জগদ্‌গুরু শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর

বর্ত্তমান সমাজ ও নিরাকারবাদ

ছেলেবেলা থেকে শোনা যায়, আমরা ভগবানে মিশে যাব। এই অদ্বৈত-বাদ সম্বন্ধে দার্শনিক জগতে বহু আলোচনা হয়েছে। যদি আমরা ভগবানের সহিত এক হ'য়ে যাই তবে উপাসনার প্রয়োজন কি? এ সম্পর্কে গৌড়ীয়গণ বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করেছেন। শাস্ত্র বলেন,—

"সম্প্রদায়-বিহীনা যে মন্ত্রাস্তে বিফলা মতাঃ।
অতঃ কলৌ ভবিষ্যন্তি চত্বারঃ সম্প্রদায়িনঃ॥
শ্রী-ব্রহ্ম-রুদ্র-সনকাঃ বৈষ্ণবা ক্ষিতিপাবনাঃ।
চত্বারস্তে কলৌ ভাব্যা হ্যুৎকলে পুরুষোত্তমাৎ॥"

চারজন বৈষ্ণব-আচার্য্য চারভাবে ভগবানের উপাসনা করেছেন। কেহ বিষ্ণু-উপাসনায় শিবের (রুদ্র), কেহ লক্ষ্মীদেবীর, কেহ বা ব্রহ্মা এবং কেহ বা সনক-সনাতন-সনন্দ-সনৎকুমার—এই চতুঃসনাদির পন্থা অবলম্বন করেছেন; কারণ, বিষ্ণু ছাড়া আর কেহ মুক্তি দিতে পারেন না। বিষ্ণুই মোক্ষদাতা। ভারতে দ্বাদশটী জ্যোতির্লিঙ্গ আছে। সে-সব স্থানের প্রত্যেক স্থলেই বিষ্ণু-বিগ্রহ আছেন। কাশীতে বিশ্বনাথের মন্দিরেও বিষ্ণু আছেন। ভুবনেশ্বরে অনন্ত-বাসুদেবের প্রসাদদ্বারা ভুবনেশ্বর শিবের পূজা করা হয়। এই প্রকারে বিষ্ণুই পৃথিবীতে সর্ব্বত্র পূজিত হইয়া থাকেন; কিন্তু শঙ্করাচার্য্য আমাদের দেশে মায়াবাদ প্রচলন করে গেছেন। সেগুলি কেবল অসুরমোহনের জন্যই বুঝিতে হইবে। শাস্ত্রেও এ সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাণী আছে,—

"মায়াবাদমসচ্ছাস্ত্রং প্রচ্ছন্নং বৌদ্ধমুচ্যতে।
ময়ৈব বিহিতং দেবি কলৌ ব্রাহ্মণমূর্ত্তিনা॥" (পদ্মপুরাণ)

(শিব পার্ব্বতীকে বলছেন) "হে দেবি! আমি কলিকালে ব্রাহ্মণ-কুলে অবতীর্ণ হইয়া মায়াবাদরূপ অসৎ শাস্ত্র যাহা প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধবাদ, প্রচার করিব।"

মায়াবাদীরা ঈশ্বরকে 'নিরাকার', 'নির্ব্বিশেষ' বলে থাকেন। এগুলি দ্বারা নাস্তিকতা বোঝায়। আজকাল শিক্ষিত লোকসমাজ সকলেই সেজন্য নাস্তিক হ'য়ে পড়েছে। আমাদের হিন্দুসমাজ কিন্তু তা কোনদিন বরদাস্ত করেনি। যারা ভগবানের আকার স্বীকার করে না, তারা অস্পৃশ্য। খ্রীষ্টানগণ আমাদের "Idolator" বলে, মুসলমানগণ আমাদিগকে "বুৎপরাস্ত্" বলে। সেজন্য তাদেরকে ঘরে উঠতে দেওয়া হয় না। খ্রীষ্টানরা আমাদের Idolator বলে,

কারণ তারা নিরাকারবাদ স্বীকার করে। কোন হিন্দু মুসলমানের সাথে খাওয়া-দাওয়া মনে মনে স্বীকার করবে না, অথচ ধুয়া চলছে, "সব এক"।

হিন্দু-সমাজের একটা পদ্ধতি হাজার হাজার বছর ধরে চলছে। সেটা হ'ল,—সমাজে সর্ব্বদা দুইটী শ্রেণী,—একদল ঈশ্বরের আকার স্বীকার করে, আর একদল তা'র বিরোধিতা করে। কবীর-পন্থী, নানক-পন্থী, আর্য্যসমাজী সকলেই নিরাকারবাদী। এ জন্য তাদের হিন্দুর ঘরে উঠতে দেওয়া হয় না। আর্য্যসমাজীরা বেদের নাম করে দেশে নিরাকারবাদ চালায়। এদের সম্বন্ধে সাবধান থাকবেন। দয়ানন্দ (আর্য্যসমাজের প্রতিষ্ঠাতা) ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ করে 'কোরাণ শরীফ' পাঠ করেছিল এবং সেই মতের পরিপোষক হয়। এতে পিতা তাকে ত্যাজ্যপুত্র করেন,—"তুই অধার্ম্মিক, তোকে ঘরে ঠাঁই দেবো না।" দয়ানন্দ দেখলে, যদি মুসলমানই হ'য়ে থাকি তবে বেদ পড়ে ইসলামী মতকে বেদের নামে চালাব। শেষে বেদ পড়ে সে তাই করল। রামমোহনকেও তাঁর পিতা এইরূপ করেছিলেন।

আমাদের দেশে রবিঠাকুর 'নিরাকার ব্রহ্ম'-বাদী, অর্থাৎ ব্রাহ্ম। তিনি হিন্দুসমাজের বিরোধী ছিলেন, তাই হিন্দুদের বিরুদ্ধে অত্যন্ত বিষোদ্গার তাঁর কাব্যের মধ্যে পাওয়া যায়। একটা বিষাক্ত বীজ তিনি আমাদের মধ্যে চালিয়ে গেছেন। আমাদের দেশের শিক্ষিত যুবকদের মধ্যে একটা বিষাক্ত বীজ তিনি বপন করে গেছেন। তাঁর সব কাব্য অবশ্য পড়িনি, তবে যেগুলো জানি সেগুলোতে স্পষ্ট করে এই বিষাক্ত বীজের বপন দেখেছি। দেশের আবহাওয়াটা যাচ্ছে কোথায়? এসব না লক্ষ্য করলে আমরা মরব। আমরা সমগ্র ভারত জুড়ে এই কথা বলছি। নিতান্ত অকৃতকার্য্য হইনি; কিন্তু সুফল হ'য়েছে। হিন্দুধর্ম্মকে উড়িয়ে দিতে সমগ্র পৃথিবী উঠে পড়ে লেগেছে। এ সম্বন্ধে রবি ঠাকুরকে তাহারা সহযোগী ভাবল। তাই গত রবি ঠাকুরের জন্ম-শতবার্ষিকীতে বিলাতে হৈ হৈ হ'ল। আমাদের সরকারও বহু টাকা খরচ করলেন। তারা ভাবলেন,—এটা একটা Policy।

যারা ঈশ্বরকে নিরাকার বলবে তাদেরকে একঘরে ক'রে দিন। তাদের বলুন,—তোরা পূর্ব্বজন্মে নিশ্চয় খ্রীষ্টান বা মুসলমান ছিলি। আমার মতে ঈশ্বরসেবী মাতাল ভাল; তবুও নিরীশ্বর সচ্চরিত্র ব্যক্তি ভাল নয়।

আমাদের দেশে বৌদ্ধধর্ম্ম প্রায় ২৫০০ বছর প্রচলিত, জৈনধর্ম্মও প্রায় তাই। কিন্তু তারা ভারতে কোন প্রভাব বিস্তার করতে পারেনি। আচার্য্য শঙ্করের ব্রহ্মমতও বৌদ্ধদের শূন্যবাদ-প্রায়। Jesus-Christ এই মতটী স্বীকার

করে তাঁর মত চালিয়েছেন। ভারতে নেই এমন মত আজ পর্য্যন্ত পৃথিবীতে তৈরী হয় নি। "Out of nothing everything has been created" মতটী কি যুক্তিসিদ্ধ? Cause and Effect Theory (কার্য্য-কারণবাদ) আলোচনা করুন। বস্তুসত্তা মূল কারণে না থাকলে ফলে তা দেখতে পাওয়া যায় না। ইট গুঁড়িয়ে তেল হয় না। Potency (সত্তা) Cause (কারণ)-এ না থাকলে বস্তুটি ফলে থাকতে পারে না। সেজন্য বস্তু কখনও নিঃশক্তিক হ'তে পারে না। এটা যুক্তিহীন বিচার। ঈশ্বর নাই বা তাঁর কোন আকার নাই—এটা নাস্তিকের উক্তি।

"World is an accident" (পৃথিবীটা আকস্মিক)—এটা যুক্তিবিরুদ্ধ মত; কারণ When the accident is a frequent feature it must be a law. (আকস্মিক ঘটনা প্রায়শঃ সংঘটিত হলে, সেইটাই একটা নিয়মে পরিণত হয়)। যদি কোন Law বা 'নিয়ম' আবিষ্কার করতে না পারা যায়, তবে সেটা যুক্তির দুর্ব্বলতা। নাস্তিক চার্ব্বাকও এই মতের প্রচারক। সায়ন মাধব তাঁর রচিত "সর্ব্বদর্শন-সংগ্রহ" পুস্তকে কয়েকটি দার্শনিক মতের উল্লেখ করেছেন। তাঁকে শঙ্করের অবতার বলা হয়। তিনিও এইরূপ মতের পোষক। সেজন্য তাঁর দর্শন Totally failure। Christianity, Mohamedanism ইত্যাদি এই মতের উপর based। এতে নিত্যশান্তি কোনদিন আসেনি। আমরা গৌরব বোধ করছি যে, আমরা হিন্দু। আমাদের মত পৃথিবীতে শান্তি দিবে।

চার্ব্বাক বলে,—"ভস্মীভূতস্য দেহস্য পুনরাগমনং কুতঃ"? এই মতবাদই আমাদের দেশে নাস্তিকতা ও নিরীশ্বরবাদ আনয়ন করে। একটী লোকের পাঁচটী ছেলে পাঁচ রকম হয় কেন? অযৌক্তিক নাস্তিকগণ বলবে, ওটা accident; বিশুদ্ধ বৈদান্তিকগণ বলেন, ওটা পূর্ব্বজন্মের কর্ম্মফল। পাশ্চাত্ত্যের Charles Darwin সাহেব আমাদের এই মতটা কিছুটা নিয়েছেন। তাঁর মত—পশু-পক্ষী ইত্যাদি থেকে Gradual development-এ (ক্রমোন্নতিতে) মনুষ্য জন্ম হয়, মানুষই শ্রেষ্ঠ জন্ম। এই মতটী আমাদের শাস্ত্রের "জলজা নবলক্ষাণি"-শ্লোকটীর প্রতিধ্বনি মাত্র। তবে তাঁর ভ্রম এই যে,—তিনি মনুষ্য-জন্মের পর আর কোন জন্ম নেই বলেছেন। এইটাই সর্ব্বাপেক্ষা মারাত্মক ভ্রম। আমরা কিন্তু আমাদের দেশের উদাহরণ হ'তে জানতে পারি—অহল্যা পাষাণী হয়েছিলেন; ভরতরাজা হরিণ হয়েছিলেন, নলকুবর-মণিগ্রীব যমলার্জ্জুন বৃক্ষ হয়েছিলেন—ইত্যাদি। যদি মনুষ্য-জন্মই শেষ জন্ম তবে সততার

আর প্রয়োজন কি ? "যতদিন থাক লুটে পুটে খাও, মরার পর ত' আর কিছু নেই"—এইরূপ মত তখন অত্যন্ত প্রবল হ'য়ে উঠে। দেশের শান্তির সাম্যাবস্থা তখন ব্যাহত হয়। শ্রীমন্ মহাপ্রভু এ সম্বন্ধে খুব বিশ্লেষণ করেছেন। সেথায় দেখি, "কীট জন্ম হউ যথা তুয়া দাস।"

পূর্ব্বে বর্ণিত অসৎ চিন্তার প্রাদুর্ভাবের একমাত্র কারণ—মূলেতে ঈশ্বর বিশ্বাস নাই। পূর্ব্ব জন্ম আমাদের স্বীকার করতেই হবে। সেথায় কোন একগুঁয়েমি চলবে না যে, ওটা মানি না। ভক্তের গৃহের পশুরও মূল্য আছে; কারণ তারা মহাপ্রসাদ পায়। পরজন্মে তারা ভগবদ্ভক্ত হবে। মহাজন বলেন,—"যোগে যোগী পায় যাহা, ভোগে আজি হবে তাহা।" যোগিগণ হেঁটমুণ্ড ইত্যাদি দ্বারা বহু কষ্টে তপস্যা করে। কিন্তু ফল হয় কি? তারা যা লাভ করে সেটা একটা জড় রহস্য বৈ আর কিছু নয়। প্রসাদে ভোগবুদ্ধি থাকলেও তৎসেবনকারী যোগী অপেক্ষা অধিকতর মঙ্গলদায়ক ফল লাভ করে। আমাদের দুর্ভাগ্যবশতঃ সেটী বুঝতে পারি না, তথাপিও মঙ্গল হবে। শুধু খেয়ে দেয়ে মরব কেন? পশুরাও ত' তাই করে। বেঁচে থাকার জন্যই শুধু খাব নাকি? এতে লাভ কি? মনুষ্য জন্মের Speciality (বিশেষত্ব) পালতেই হবে। ষোল আনা না পারি, এক আনা করব। একেবারে ছাড়ব কেন? কেনই বা আত্মীয়-স্বজন, কেনই বা চিন্তা, কেনই বা আমাদের দুঃখ-কষ্ট—সেগুলো আমাদের চিন্তা করা দরকার। "এ বাড়ী আমার, এ ছেলে আমার"—ইত্যাদি Provincialism পশুর মধ্যেও আছে। ধর্ম্মচিন্তা পশুর নেই। সেই Speciality আমরা ছাড়ব কেন?

—জগদ্গুরু শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী

শ্রীচৈতন্যদেব ও শ্রীহরিনাম

[পূর্ব্বপ্রকাশিত ৪৩শ বর্ষ, ১ম সংখ্যা, ২২ পৃষ্ঠার পর]

কলিকালে এই প্রকার তামসিক মতবাদ বা অসৎ সম্প্রদায়ের প্রাদুর্ভাব হইবে—ইহা অবগত হইয়াই কলিজীবের রক্ষার নিমিত্ত শ্রীব্যাসদেব সৎসম্প্রদায়-গুলির নাম পদ্মপুরাণে উল্লেখ করিয়াছেন। যথা:—

সম্প্রদায়বিহীনা যে মন্ত্রাস্তে বিফলা মতাঃ।
অতঃ কলৌ ভবিষ্যন্তি চত্বার সম্প্রদায়িনঃ॥

শ্রী-ব্রহ্ম-রুদ্র-সনকা বৈষ্ণবাঃ ক্ষিতিপাবনাঃ।
চত্বারস্তে কলৌ ভাব্যা হ্যুৎকলে পুরুষোত্তমাৎ ॥

অর্থাৎ যে-সমস্ত মন্ত্র ও মতবাদ সৎসম্প্রদায়ের অনুগত নহে তদ্দ্বারা বিফলতাই লভ্য হইবে, জীবের যে প্রয়োজন ভগবৎসেবা তাহা কখনই লাভ হইবে না। কত না কত ভুঁইফোড় ভগবান্ (?) নিরন্তর গজাইয়া উঠিয়া মনগড়া, শ্রুতি-স্মৃতি-বিধান-শূন্য কত না কত আজব ছড়াকে মন্ত্রাদি বলিয়া লোক-বঞ্চনা করিতেছে! কত না কত সৃষ্টিছাড়া মতবাদকে ধর্ম্ম বলিয়া চালাইতেছে! ত্রিকালজ্ঞ শ্রীব্যাসদেব কলিকালের ভাবী অবস্থা সম্যক্ দর্শন করিয়াই শ্রী, ব্রহ্ম, রুদ্র ও সনক—এই চারিটী সম্প্রদায়কেই জগৎ পবিত্রকারী বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু স্বয়ং ভগবান্ হইয়াও শাস্ত্র-মর্য্যাদা রক্ষণ করিয়া এই সম্প্রদায়কে অঙ্গীকার করিয়াছেন। এই চারিটী সম্প্রদায়ই বৈষ্ণব সম্প্রদায়। সকলেরই মত—শ্রীবিষ্ণুই পরাৎপর তত্ত্ব; তাঁহার সেবাই জীবের নিত্যধর্ম্ম। সুতরাং এই সৎসম্প্রদায়ের অনুগত বলিয়া অভিমানকারী ব্যক্তি কখনই নির্ব্বিশেষ মার্গের 'যত মত তত পথ' অথবা বিষ্ণুভক্তিকে স্মার্ত্ত-সমাজের পঞ্চোপাসনার অন্তর্গত বলিয়া অঙ্গীকার করেন না। শ্রীমন্মহাপ্রভু এইরূপ নির্ব্বিশেষবাদী ও পঞ্চোপাসকী হইয়া নামাপরাধ প্রচার করেন নাই। ঐকান্তিকী ভক্তিই তাঁহার প্রচার্য্য বিষয় ছিল। ধর্ম্মধ্বজী, জগৎবঞ্চক ও উচ্ছৃঙ্খল সমাজের মনস্তুষ্টি করত অপস্বার্থ-সিদ্ধির জন্য তিনি কোন প্রকারেই শাস্ত্রমর্য্যাদা লঙ্ঘন করেন নাই। তিনি সমস্ত দার্শনিক জগৎকে জানাইয়াছেন যে,—এই নির্ব্বিশেষবাদই নামভজনের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বাধা এবং এই নির্ব্বিশেষবাদ বেদাদি শাস্ত্রের অভিমত নহে। নির্ব্বিশেষবাদ আসুরিক চিত্তবৃত্তিবিশিষ্ট ব্যক্তিগণকে মোহিত করিবার জন্য অসচ্ছাস্ত্ররূপে আচার্য্য শঙ্করদ্বারা জগতে প্রচারিত হইয়াছে মাত্র। যথা:—

স্বাগমৈঃ কল্পিতৈস্ত্বঞ্চ জনান্ মদ্বিমুখান্ কুরু।
মাঞ্চ গোপয় যেন স্যাৎ সৃষ্টিরেষোত্তরোত্তরা ॥
মায়াবাদং অসচ্ছাস্ত্রং প্রচ্ছন্নং বৌদ্ধমুচ্যতে।
ময়ৈব বিহিতং দেবি কলৌ ব্রাহ্মণমূর্ত্তিনা ॥ (পদ্মপুরাণ)

সুতরাং নির্ব্বিশেষবাদকে অঞ্চলে গ্রন্থিবদ্ধ করিয়া যাহারা শ্রীনামের সাধন (?) করে, তাহাদের হরিনামে ও শ্রীমন্মহাপ্রভুর হরিনামে দিবারাত্র ভেদ জানিতে হইবে। 'এতাবানেব' শ্লোকে শ্রীমদ্ভাগবত নামগ্রহণকে ভক্তিযোগ বলিয়াই আখ্যা দিয়াছেন। কিন্তু নির্ব্বিশেষবাদীর নাম কখনই ভক্তিযোগ

নহে। যেহেতু নির্ব্বিশেষবাদে ত্রিপুটী অর্থাৎ সেব্য, সেবক ও সেবার নিত্যত্ব নাই, তজ্জন্য যাঁহারা নির্ব্বিশেষ বা কৈবল্যমুক্তি কামনা করিয়া ওঁকার তত্ত্বে আকৃষ্টচিত্ত, তাঁহারা শ্রীনামকে তৎসাধনরূপে গ্রহণ করিয়া ভক্ত হইতে পারেন না ; পরন্তু ভক্তিদেবীর চরণে অপরাধই সঞ্চয় করিয়া থাকেন। তাঁহাদের ঐ নামকে শাস্ত্রে নামাপরাধ বলিয়াই উক্তি করিয়াছেন। শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু ঐরূপ নামাপরাধের প্রচারক ছিলেন না। তিনি জানাইয়াছেন :—

ভুক্তি-মুক্তি-স্পৃহা যাবৎ পিশাচী হৃদি বর্ত্ততে।
তাবদ্ভক্তিসুখস্যাত্র কথমভ্যুদয়ো ভবেৎ ॥

ঐরূপ মুক্তি-বাঞ্ছা ও ভুক্তি-বাঞ্ছাকে তিনি পিশাচী বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন। সুতরাং পিশাচীগ্রস্ত জীবের শুদ্ধনামে মতি হয় না।

শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীনাম-প্রচার; শুদ্ধভক্তি ; ইহা কর্ম্ম বা জ্ঞানের অঙ্গস্বরূপ নহে। যাহারা নির্ব্বিশেষবাদী বা 'সব সমান' মতের পথিক তাহাদের নাম কখনই ভক্তিযোগ নহে ; উহা কর্ম বা জ্ঞানের অন্তর্গত নামাপরাধ ভিন্ন কিছুই নহে। কর্ম্মী, জ্ঞানী, যোগী সকলেই স্ব স্ব সাধনকে কষ্টকর ও তদ্দ্বারা সম্যক্ ফললাভের সম্ভাবনা নাই দেখিয়া শ্রীনামের আশ্রয় গ্রহণ করে। তাহারা সকলেই সাধনকালে এই নামের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া নামবলে সহজে সিদ্ধিলাভ করিতে চেষ্টা করে। শ্রীনাম কৃপাপূর্ব্বক নিজ লাঞ্ছনা অঙ্গীকার করিয়াও তত্তৎ কর্ম্মী, জ্ঞানী ও যোগীকে তাহাদের অভীষ্ট ফল প্রদান করেন ; কিন্তু নামের মুখ্য ও প্রকৃষ্ট ফল প্রেমভক্তি কখনই প্রদান করেন না।

নাম, নামাভাস ও নামাপরাধ কখনই একবস্তু নহে। কর্ম্মীর ভুক্তি অর্থাৎ ইহলৌকিক ও পারলৌকিক ভোগসুখ নামাপরাধেই অনায়াসে লভ্য হয়। এই কারণে কর্ম্মিগণও এই নামগ্রহণকে অতীব আদর করে। তাহারা মাতা-পিতার শ্রাদ্ধে ও যজ্ঞকর্ম্মের ছিদ্রাদি হইতে রক্ষা পাইবার জন্য কর্ম্মের অঙ্গস্বরূপে এই নামকীর্ত্তন করে। নামের কৃপায় তাহাদের পিতৃগণ স্বর্গাদিতে বাস করিতে পারিবেন জানিয়া শ্রাদ্ধাদিতে এই নামকীর্ত্তন, নামভজন বা নামসেবা নহে। গ্রামে কলেরা, বসন্ত প্রভৃতি মহামারীর প্রাদুর্ভাব হইলে সকলে মিলিয়া নাম-সঙ্কীর্ত্তন চালাইতে থাকে। তাহাদের এই প্রকার নাম-সঙ্কীর্ত্তন নামসেবা নহে—ইহা নামের দ্বারা নিজের সেবা-সাধনের চেষ্টামাত্র। শুদ্ধ ভক্তগণ এই প্রকার নাম-সঙ্কীর্ত্তন দেখিয়া আনন্দের পরিবর্ত্তে মনে কষ্ট অনুভব করেন। যে নাম সেব্যবস্তু, তাঁহাকে নিজভোগে লাগাইয়া নিজ অপস্বার্থ সিদ্ধ করিতে দেখিয়া তাঁহারা অন্তরে অতীব ব্যথিত হন। এইরূপ নামসঙ্কীর্ত্তনকে

তজ্জন্য নামপরাধ বলিয়াই গণ্য করা হইয়াছে। তদ্ধেতু শুদ্ধনামভজনকারী এবম্প্রকার নাম-সঙ্কীর্ত্তনে সহযোগিতা দূরে থাকুক তাহা হইতে বহুদূরে অবস্থান করেন।

কর্ম্মীদিগের ন্যায় জ্ঞানী ও যোগীরাও কৃচ্ছসাধ্য জ্ঞানদ্বারা মুক্তিলাভে অসমর্থ হইয়া নাম-সঙ্কীর্ত্তনের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া থাকে। নির্ব্বিশেষ-মার্গ যে ক্লেশকর তদ্বিষয়ে শ্রীগীতা বলেন,—

ক্লেশোঽধিকতরস্তেষামব্যক্তাসক্তচেতসাম্।
অব্যক্তা হি গতির্দুঃখং দেহবদ্ভিরবাপ্যতে॥

অর্থাৎ—নির্ব্বিশেষ-স্বরূপে আকৃষ্টচিত্ত ব্যক্তিগণের ক্লেশ অধিকতর। কেন না, দেহধারী (স্বরূপতঃ নিত্য বিশেষ) জীবের পক্ষে নির্ব্বিশেষ গতি (প্রতিকূল অনুশীলন বলিয়া) অত্যন্ত দুঃখেই লভ্য হয়। সুতরাং কেবলজ্ঞানে মুক্তিলাভ করা এইরূপ কষ্টসাধ্য দেখিয়া জ্ঞানী ও যোগিগণও এই নাম সঙ্কীর্ত্তনের আশ্রয় গ্রহণ করে। পরন্তু উদ্দেশ্য—নামের সেবা নহে, নামের নিকট হইতে ঐরূপ নির্ব্বিশেষ বা কৈবল্য মুক্তিকে লাভ করা মাত্র। তজ্জন্য শুদ্ধভক্তগণ ইহাকেও নামাপরাধ মধ্যেই গণ্য করিয়াছেন এবং এই প্রকার নাম-সঙ্কীর্ত্তনকারীদের সঙ্গ হইতে সর্ব্বদা দূরে অবস্থান করেন। ভক্তগণ জ্ঞানী ও যোগীর ঈপ্সিত নির্ব্বিশেষ মুক্তি বা কৈবল্যকে অত্যন্ত ঘৃণা ও ভীতির চক্ষেই দর্শন করিয়া থাকেন। তজ্জন্য ত্রিদণ্ডিপাদ শ্রীল প্রবোধানন্দ স্বরস্বতী লিখিয়াছেন,—

কৈবল্যং নরকায়তে ত্রিদশাপুরাকাশপুষ্পায়তে
দুর্দ্দান্তেন্দ্রিয় কালসর্পপটলী প্রোৎখাত দ্রংষ্ট্রায়তে।
বিশ্বং পূর্ণসুখায়তে বিধি-মহেন্দ্রাদিশ্চ কীটায়তে
যৎ কারুণ্যকটাক্ষবৈভবতাং তং গৌরমেব স্তুমঃ॥

অর্থাৎ যোগী ও জ্ঞানীদিগের আদরণীয় কৈবল্যমুক্তিকে ভক্ত নরকসদৃশ ক্লেশকর ও ঘৃণ্যবস্তু বলিয়া বিচার করেন। শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভুর কৃপাকটাক্ষ লাভ করত শুদ্ধভক্তির আস্বাদ যিনি পাইয়াছেন তাঁহার নিকট প্রেমসুখের তুলনায় কৈবল্যমুক্তিকে নরকতুল্য যন্ত্রণাদায়ক ও ঘৃণ্যবস্তু বলিয়াই বোধ হয়। কর্ম্মীর বাঞ্ছনীয় ইন্দ্রপদবী বা ব্রহ্মাপদবীকে কীটপদবীবৎ অতি তুচ্ছ বলিয়া বিবেচিত হয়। স্বর্গসুখকেও আকাশকুসুমের ন্যায় অলীক বলিয়াই তিনি মনে করেন। সুতরাং ভুক্তি-মুক্তিকামীর নামসঙ্কীর্ত্তনকে ভক্তগণ নামাপরাধ-মধ্যেই গণ্য করেন।

শুদ্ধজ্ঞানী বা ভক্তিপথের অনুশীলনকারীর জড়মুক্তি শ্রীনামের আভাসেই

লভ্য হইয়া থাকে। এই প্রকার মুক্তি কৈবল্যমুক্তি হইতে বিলক্ষণ। আনুসঙ্গিকভাবে ভক্তগণ অযত্নেও তাহা নামাভাস হইতে লাভ করিয়া থাকেন। অজামিল সেইপ্রকার নামাভাসে মুক্ত হইয়াছিলেন। এইরূপ নামাভাসও নামাপরাধ থাকিতে সম্ভব হয় না। নামাপরাধ-শূন্য শুদ্ধভক্ত ইহা আনুসঙ্গিকভাবে লাভ করেন। যথা :—

ভক্তিস্ত্বয়ি স্থিরতরা ভগবন্ যদি স্যাৎ
দৈবেন নঃ ফলতি দিব্যকিশোরমূর্ত্তিঃ।
মুক্তিঃ স্বয়ং মুকুলিতাঞ্জলি সেবতেঽস্মান্
ধর্ম্মার্থকামগতয়ঃ সময়প্রতীক্ষাঃ॥　　(কৃষ্ণকর্ণামৃত)

অর্থাৎ দিব্যকিশোরমূর্ত্তি শ্রীভগবানে ঐকান্তিকী ভক্তির উদয় হইলে মুক্তি করযোড়ে শুদ্ধভক্তের সেবার জন্য অবস্থান করেন এবং ধর্ম্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষ প্রভৃতি আজ্ঞাবাহীবৎ ঐ প্রকার ভক্তের জন্য সময় প্রতীক্ষা করিতে থাকেন। শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত হরিনাম এবম্প্রকার শুদ্ধাভক্তি ; ইহা কর্ম্মী, জ্ঞানী বা যোগীদিগের নামাপরাধ নহে। ইহা কর্ম্মী, জ্ঞানী বা যোগীর অধিকারের বহির্ভূত বস্তু। কোনপ্রকার অন্যাভিলাষ লইয়া সেই নাম কীর্ত্তন করা যায় না। মায়াবাদী শ্রীকৃষ্ণে অপরাধী, তাহারা তাঁহার নিত্য সচ্চিদানন্দ রূপাদি স্বীকার করে না। তজ্জন্য তাহারা প্রেমপ্রদাতা হরিনাম কীর্ত্তনে চিরদিন অপারগ হইয়া প্রেমধনে বঞ্চিত। পঞ্চোপাসকী স্মার্ত্তকুল যতই কেন হরিনাম কীর্ত্তন করুন, তাঁহারাও "বিষ্ণৌ সর্ব্বেশ্বরেশ্বরে তদিতর সমধীর্যস্য বা নারকী সঃ"—বচনানুসারে সর্ব্বেশ্বরেশ্বর শ্রীবিষ্ণুকে তাঁহার বিভূতিস্বরূপ অন্যদেবতার সহিত সমান জ্ঞান করত চিরদিন অপরাধী থাকিয়া প্রেমলাভে বঞ্চিত থাকিবেন।

শ্রীনাম সঙ্কীর্ত্তনে এবম্প্রকার ভেদ-বিষয়ে অনভিজ্ঞ মানবকুলের সরলতা ও শ্রীনামের প্রতি শ্রদ্ধার সুযোগ লইয়া কতিপয় নির্ব্বিশেষবাদী ও স্মার্ত্তধুরন্ধর নিজ নিজ অপস্বার্থ সিদ্ধি করিতেছে ও সরল ধর্ম্মবিশ্বাসী মানবগণকে প্রেমধন হইতে বঞ্চিত করিতেছে ; এমনকি, শ্রীমন্মহাপ্রভু হইতেও অধিক পরিমাণে নামপ্রচার করিতেছে বলিয়া তাহারা উক্তি করিতেও লজ্জাবোধ করে না। সুতরাং সাধু সাবধান। এবম্প্রকার নামাপরাধকে শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত শ্রীহরিনাম বলিয়া কখনও মনে করিবেন না।

—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত ত্রিবিক্রম মহারাজ

———

শ্রীশ্রীপরমগুরুপাদপদ্মের আবির্ভাব-তিথিতে

দীনের শ্রদ্ধাঞ্জলি

জয় জয় পরমগুরু ভকতিপ্রজ্ঞান।
শিরে ধরি বন্দি তব অভয় চরণ॥
জগত পবিত্র লাগি' কৃষ্ণ-তৃতীয়া তিথিতে।
অবতরণ করিয়াছ বঙ্গভূমিতে॥
জড়সুখ ঐশ্বর্য্যাদি করিয়া বর্জ্জন।
মায়াপুরের উদ্দেশ্যেতে করিলে গমন॥
উপনীত হইয়া তথায় হরসিত হইয়া।
প্রভুপাদের শ্রীচরণে শরণ লইলা॥
নিজজন দেখিয়া বহু স্নেহ সম্ভাষিয়া।
দীক্ষা প্রদানিলা প্রভু যতন করিয়া॥
'শ্রীবিনোদবিহারী ব্রহ্মচারী' নাম ধরি'।
গুরুভক্তি শিক্ষা দিলা বহুকষ্ট করি'॥
এইমত কতকাল মায়াপুরেতে রহিলা।
শ্রীপ্রভুপাদ তবে অপ্রকট হইল॥
অতঃপর নবদ্বীপে আসি' শ্রীকোলদ্বীপেতে।
মন্দির বানাইলা প্রভু জীব নিস্তারিতে॥
তব আকর্ষণে কত ভাগ্যবান্ জন।
চরণে পাইলা স্থান ধন্য হইল জীবন॥
গৌরনাম-গৌরধামের করিয়া কীর্ত্তন।
আনন্দে মাতাইলা সব ভক্তবৃন্দের মন॥
নানাদেশে শ্রীমঠ-মন্দির করিয়া স্থাপন।
জীবের নিস্তার লাগি' তথায় করিলা গমন॥
নাস্তিক-পাষণ্ড যত করিল পলায়ন।
তব কৃপা হইতে তারা লভিল বঞ্চন॥
তব কৃপাশীর্ব্বাদ প্রভু যাহারা মানিল।
কৃষ্ণনামামৃত সদা তাহারা পান কৈল॥

আবির্ভাব-দিনে সব তব ভক্তগণ।
আনন্দে করিছে নৃত্য কৃষ্ণ-সংকীর্ত্তন॥
পাদপদ্ম পূজা করে ভক্তি-সহকারে।
বহু স্তব-স্তুতি-ধ্যান করয়ে অন্তরে॥
আমি অধম ভক্তিশূন্য নাহি তত্ত্বজ্ঞান।
কৃপা করি' তব পদে ভক্তি দেহ দান॥
বিদ্যা নাই, বুদ্ধি নাই, করুণা মাত্র সার।
তোমা বিনা দয়া মম কে করিবে আর ??
ধন্য কর জীবন মোর অগতির গতি।
পাদপদ্মে দেহ স্থান করি যে মিনতি॥
সাধ্য-সাধন-তত্ত্ব যে কিছু আছয়।
তব কৃপায় স্ফুর্ত্তি হয় জানি দয়াময়॥
বিদ্যা-বুদ্ধিহীন আর ভক্তিশূন্য জানি'।
উপেক্ষা না কর প্রভু, রাখিহ চরণে॥
তব প্রিয় সেবকগণ বড় দয়াবান্।
তব পাদপদ্মে আশ্রয় করিলা প্রদান॥
মন্দবুদ্ধি মুই অতি পাষণ্ড অধম।
তব কৃপা লভিবারে না করিলাম শ্রম॥
শুভদৃষ্টি কর প্রভু দাও শুভমতি।
শ্রীচরণ ভজিবারে যেন বাড়য়ে আসক্তি॥
দুষ্টবুদ্ধি মন্দাশা ছাড়াইয়া মোরে।
আশ্রয়দান কর প্রভু শ্রীচরণ কমলে॥
দাও প্রভু, দাও মোরে এইমাত্র ভিক্ষা।
অধম জনারে আর না কর উপেক্ষা॥
পুনঃ পুনঃ শ্রীচরণে করিগো প্রণতি।
কৃপা করি এ অধমে দাও কৃষ্ণভক্তি॥

শ্রীবৈষ্ণব চরণে কৃপাপ্রার্থী—
—শ্রীমদনমোহন দাস ব্রহ্মচারী

জীবের নিত্যকল্যাণ লাভের উপায় কি ?

ভগবদ্ভক্তের শুভাকাঙ্ক্ষা এই যে, জীবগণ কেবল অমঙ্গলের মধ্যেই না থাকুক, তারা নিত্যকল্যাণ লাভ করুক। সেই নিত্যকল্যাণ লাভের উপায়—কৃষ্ণপ্রেষ্ঠ শ্রীগুরুদেবের পাদপদ্মাশ্রয়। যাঁর পাদপদ্ম আশ্রয় করলে নন্দনন্দন কৃষ্ণের সেবালাভ হয়। শ্রীরূপাভিন্ন সেই শ্রীগুরুদেবের সেবা দৃঢ়বিশ্বাস ও প্রীতির সহিত করিতে হইবে এবং তাঁহার শ্রীমুখে হরিভজনের কথা শ্রবণ করিতে হইবে। শ্রীগুরুদেবের পদধূলি সম্বল হইলে ভুবনমোহন শ্রীকৃষ্ণের মাধুর্য্যসেবা লাভ করিতে পারা যাইবে।

এজন্য শ্রীগুরুদেবের পাদপদ্ম নিত্য ভজনীয়। অপ্রাকৃত শ্রীগুরুদেবের পাদপদ্ম এজগতের বস্তু নহেন, তিনি রক্ত-মাংসের পিণ্ডমাত্র নহেন। তিনি ভগবানের ন্যায়ই সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহ। শ্রীগুরুপাদপদ্ম—নর-ব্রহ্ম, নরমাত্র নহেন। ভগবদ্বস্তুকে অর্থাৎ গুরু ও গৌরাঙ্গকে যাহারা জগতের অন্যতম বস্তু বলিয়া মনে করেন, তাহারা নিজের স্বার্থসিদ্ধির জন্য সেবার অভিনয় মাত্র করেন। তাহা শুদ্ধসেবা নহে, তাহাকে বণিয়াবৃত্তি বা পদ্মানীতি বলা হয়।

জীব যে-কাল পর্য্যন্ত ভজনীয় বস্তু শ্রীগুরুপাদপদ্মের পূর্ণ আনুগত্য না করে, সে-কাল পর্য্যন্ত ভগবান্ তাহার দর্শনীয় হন না। যাহারা শ্রীগুরুপাদপদ্মের অপ্রাকৃতত্ব, ঈশ্বরত্ব ও কৃষ্ণপ্রেষ্ঠত্ব অবগত নহে, তাহারা চিদ্‌রাজ্যে অর্থাৎ কৃষ্ণসেবা-রাজ্যে প্রবেশের সম্পূর্ণ অযোগ্য।

শ্রীগুরুদেবের কৃপা হইলেই আমরা অপ্রাকৃত বস্তুর নিকট যাইতে পারিব—শ্রীচৈতন্যদেবের শ্রীপাদপদ্ম আশ্রয় করিয়া চেতনময় সেবা-শোভাময় দিব্যচক্ষুর দ্বারা তাঁহার দর্শন লাভ করিতে পারিব। স্বয়ংরূপ শ্রীকৃষ্ণের শ্রীপাদপদ্মের নিকটে পৌঁছিবার সৌভাগ্য পাইয়া ধন্য ও কৃতার্থ হইব। প্রাকৃত রূপে আবদ্ধ থাকিলে শ্রীরূপাভিন্ন শ্রীগুরুপাদপদ্মের দর্শন লাভ হইবে না। ভজনীয় বস্তু গুরু-কৃষ্ণের ভজন নিষ্কপটে করিলেই মঙ্গল হইবে, তখন আর ভোগপর দর্শন থাকিবে না।

আমি দন্তে তৃণ ধারণ করিয়া পুনঃ পুনঃ এই প্রার্থনা করি যে, আমি অন্য কিছুই চাই না, আমি ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ কিছুই চাই না ; আমি কেবলমাত্র শ্রীগুরুদেবের পদধূলি হইতে চাই—শ্রীগুরুদেব যে-প্রকারে ভগবানের সেবা সতত করেন, আমি তাঁহার আনুগত্যে সেইভাবেই ভগবানের সেবা করিতে চাই। কৃষ্ণ আমার, আমি কৃষ্ণের সেবা না করিলে কৃষ্ণের বড়ই কষ্ট হইবে—এইরূপ ভাব পূর্ণরূপে বৃদ্ধি পাইলে তবে আমাদের কৃষ্ণপ্রেম বা কৃষ্ণপ্রাপ্তি হইবে। শ্রীগুরুদেবের স্নেহ-সেবাদ্বারাই এই সৌভাগ্য লাভ ঘটে। শ্রীগুরোঃ কৃপাহি কেবলম্।

—শ্রীমৎ উদ্ধবদাস বাবাজী মহারাজ

প্রয়োজন-তত্ত্ব

[পূর্ব্বপ্রকাশিত ৪৩শ বর্ষ, ১ম সংখ্যা, ৩১ পৃষ্ঠার পর]

সাধনভক্তির দ্বারা সাধন করিতে করিতে সিদ্ধাবস্থার উদয় হয়। এই সিদ্ধাবস্থা দুই প্রকার—স্বরূপসিদ্ধি ও বস্তুসিদ্ধি। নিজস্বরূপ অবগত হইয়া জীব যখন স্বরূপের ধর্ম্মে-নিত্য অবস্থিতির জন্য সর্ব্বক্ষণ সচেষ্ট হয়, তাহাই জীবের স্বরূপ-সিদ্ধির অবস্থা; এই অবস্থাতে প্রথমে ভাবের উদয় হয়। স্বরূপসিদ্ধ-অবস্থায় জীব যখন নিত্যলীলায় প্রবিষ্ট হন, তখনই বস্তুসিদ্ধিলাভ করেন। পরমপুরুষার্থ লাভের পরে বস্তুসিদ্ধি ঘটে।

জীবের ভাগ্যে ভাবের উদয় দুই প্রকারে ঘটিতে পারে,—(১) সাধনাভিনিবেশজভাব, (২) কৃষ্ণ ও কৃষ্ণভক্তের প্রসাদজ ভাব। সাধনাভিনিবেশজ ভাবই অধিকাংশ সময় ঘটিয়া থাকে, প্রসাদজ ভাব বিরল। সাধনার স্তরগুলি অতিক্রম করিয়া যে ভাবের উদয় হয়, তাহাই সাধনাভিনিবেশজ ভাব। শ্রীকৃষ্ণ ও কৃষ্ণভক্তের কৃপায় যে ভাব প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহা প্রসাদজ ভাব।

যে ভক্তের মধ্যে ভাবের উদয় হয় তাঁহার মধ্যে কতকগুলি লক্ষণের প্রকাশ হয়—

> "যাঁহার হৃদয়ে এই ভাবাঙ্কুর হয়।
> তাঁহাতে এতেক চিহ্ন সর্ব্বশাস্ত্রে কয়॥"

শ্রীরূপগোস্বামী ভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে লক্ষণগুলির পরিচয় দিয়াছেন,—

> ক্ষান্তিরব্যর্থকালত্বং বিরক্তির্মানশূন্যতা।
> আশাবন্ধঃ সমুৎকণ্ঠা নামগানে সদা রুচিঃ॥
> আসক্তিস্তদ্গুণাখ্যানে প্রীতিস্তদ্বসতিস্থলে।
> ইত্যাদয়োঽনুভাবাঃ স্যুর্জ্জাত ভাবাঙ্কুরে জনে॥

ক্ষান্তি অর্থাৎ ক্ষমা, অব্যর্থকালত্ব অর্থাৎ কাল বৃথা না যায়—এরূপ যত্ন, বিরক্তি অর্থাৎ কৃষ্ণসম্বন্ধ-ব্যতীত অন্য বস্তুতে বৈরাগ্য, মানশূন্যতা অর্থাৎ হঠাৎ মানের হেতু থাকিতেও মানহীন হওয়া, আশাবন্ধ—কৃষ্ণ আমাকে অবশ্য কৃপা করিবেন—এইরূপ দৃঢ় বিশ্বাসের সহিত ভজনে মনোনিবেশ করা, সমুৎকণ্ঠা—স্বীয় অভীষ্টলাভের জন্য গুরুতর লোভ।

নামগানে সদা রুচি—শ্রীনামই শ্রেষ্ঠ জ্ঞানে সর্ব্বদা হরিনাম করা।

তদ্গুণাখ্যানে আসক্তি—শ্রীকৃষ্ণ-গুণকথা যতই শুনা যায়, ততই আসক্তির বৃদ্ধি।

ভক্তসতিস্থলে প্রীতি ইত্যাদি লক্ষণগুলি ভাবের উদয়ের সহিত আসিয়া হাজির হয়।

সরলভাবে চিত্তে শ্রীকৃষ্ণপ্রতি যে ভাব উদিত হয়, তাহাই 'রতি'। কোন মুক্তিপিপাসু বা কোন ভোগবাঞ্ছাকারী ব্যক্তি ক্রন্দনের সহিত গড়াগড়ি দিতে থাকিলে তাহাকে ভাব বলা যায় না। শুদ্ধ-কৃষ্ণভজন ব্যতীত ভাব উদিত হয় না।

এই শুদ্ধভাব বা রতি উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতে পাইতে গাঢ়ত্ব প্রাপ্ত হইলে তখন তাহাকে 'প্রেম' বলে।

যাঁর চিত্তে কৃষ্ণপ্রেমা করয়ে উদয়।
তাঁর বাক্য, ক্রিয়া, মুদ্রা বিজ্ঞেহ না বুঝয়॥

কৃষ্ণপ্রেমলাভ যাঁহার ভাগ্যে ঘটিয়াছে, তাঁহার ক্রিয়াকলাপ বুঝা কঠিন। রসাস্বাদের তারতম্যহেতু অধিকারিভেদে কৃষ্ণপ্রেম পঞ্চপ্রকার,—

অধিকারি-ভেদে রতি—পঞ্চ প্রকার।
শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য, মধুর আর॥
এই পঞ্চ স্থায়ীভাবে হয় পঞ্চ 'রস'।
যে-রসে ভক্ত 'সুখী', কৃষ্ণ হন 'বশ'॥
বিভাব, অনুভাব, সাত্ত্বিক, ব্যভিচারী।
স্থায়ীভাব 'রস' হয় এই চারি মিলি'॥
দধি যেন খণ্ড-মরিচ-কর্পূর-মিলনে।
'রসালাখ্য' রস হয় অপূর্ব্বাস্বাদনে॥

পঞ্চরসের শান্তরসে 'রতি' বৃদ্ধি পাইয়া 'প্রেম' পর্য্যন্ত পৌঁছায়। দাস্যরসে দাস্যরতি—স্নেহ, মান, প্রণয় ও রাগ পর্য্যন্ত পৌঁছায়। সখ্যরসে সখ্যরতি, বাৎসল্যে রাগের পরে অনুরাগে আসিয়া হাজির হয়। আর মধুর রসে—

'রূঢ়', 'অধিরূঢ়' ভাব কেবল 'মধুরে'।
মহিষীগণের 'রূঢ়', 'অধিরূঢ়' গোপিকা-নিকরে॥

পঞ্চরসের গুণ পরপর বৃদ্ধি পাইয়া মধুররসেই চমৎকারিতা লাভ করে। সেকারণে মধুররসই সর্ব্বোত্তম রস। ব্রজের মধুররসের সেবাতেই একমাত্র কৃষ্ণচন্দ্র পরম পরিতৃপ্তি লাভ করেন। সে কারণে ইহাকে উজ্জ্বল রস বলা হইয়াছে। উজ্জ্বলনীলমণিতে উজ্জ্বলরসের কথা বর্ণনা করা হইয়াছে।—

"জয় জয়োজ্জ্বলরস সর্ব্বরস-সার।
পরকীয়াভাবে যাহা ব্রজেতে প্রচার।"

গোলোকের গোপন তত্ত্ব এই উজ্জ্বলরসতত্ত্ব। শ্রীগৌরসুন্দর কৃপা করিয়া জীবকে গোলোকের এই গোপন তত্ত্ব জানাইয়া দিয়া গিয়াছেন।

শান্তরসের ঈশ্বরভাবাপেক্ষা দাস্যরসের প্রভু-ভাব উৎকৃষ্ট। সখ্যভাবে তদপেক্ষা রসের উৎকর্ষ। বাৎসল্যে ততোধিক উৎকর্ষ। শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য রসের সমস্ত গুণ মধুররসে বর্ত্তমান। এ কারণে মধুর রসকে সর্ব্বোত্তম বলা হইয়াছে। মধুররসের প্রেমই সর্ব্বোৎকৃষ্ট। সাধকের স্ব-স্ব ভাবই সর্ব্বোত্তম।

এই জড় জগতে মধুর রসকেই নিকৃষ্টরস বলা হয়। ইহার কারণ চিজ্জগতের প্রতিচ্ছবি এই জড়জগৎ, একারণের বিপরীত প্রতীতি। পুষ্করিণী সমীপের বৃক্ষের প্রতিবিম্বকে যেমন বিপরীত দেখায়, তদ্রূপ চিজ্জগতের বিপরীত সব এই জড়জগতে। চিজ্জগতে একমাত্র পুরুষ শ্রীকৃষ্ণ, আর সবাই প্রকৃতি ও পুরুষ শ্রীকৃষ্ণের ভোগ্য সামগ্রী। একারণে সেখানে লজ্জাকর বা ইতররস কিছুই নাই। জড়জগতে ভোক্তা নাই, একারণে মধুররস ইতররসে রূপান্তরিত এবং লজ্জা ও ঘৃণার বিষয়। তত্ত্বতঃ জীব ভোক্তা নয়—সকল জীবই ভোগ্যা ও কৃষ্ণই একমাত্র ভোক্তা। প্রাকৃত প্রেম ও অপ্রাকৃত প্রেমের মধ্যে একারণে একটী অত্যন্ত হেয় ও অপরটী উপাদেয়।

এমন যে উপাদেয় মধুররসের প্রেম যাহা একমাত্র যাঁহারা কৃষ্ণ পাদপদ্মকেই সর্ব্বস্ব বলিয়া জানেন, সেই শুদ্ধভক্তগণই অনুভব করেন। শ্রীরাধারাণী হ্লাদিনীর মূল আধার। এই হ্লাদিনীশক্তি যখন কোন জীব-মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট হয়, তখনই জীবের মধ্যে কৃষ্ণপ্রেমের অনুভব ঘটে।

নববিধা ভক্তির পূর্ণ অভিব্যক্তি কৃষ্ণপ্রেমে। শ্রবণ-কীর্ত্তন যখন কৃষ্ণ-প্রেমপ্রাপ্ত হয়, তখন কৃষ্ণনাম ও গুণগান শুনিয়া কিছুতেই তৃপ্তি হয় না। অযুত কর্ণ ও সহস্র বদন লাভের বাসনা জন্মায়।—

"সখী কেবা শুনাইল শ্যাম-নাম।
কাণের ভিতর দিয়া মরমে পশিল গো
আকুল করিল মম প্রাণ॥"

প্রেমলাভে কৃষ্ণ-স্মরণ অনুক্ষণ চলিতে থাকে। শয়নে, স্বপনে, আহারে, গমনে স্মরণ চলিতে থাকে।

"সখি যখন নয়ন মুদিয়া থাকি,
অন্তরে গোবিন্দ দেখি
নয়ন মেলিয়া দেখি শ্যাম;

যখন জল আনিতে যাই যমুনায়,
সে যে চলে আমার পায় পায়,
চরণে চরণ ঠেকাইয়া ॥"

পূর্ণ আত্মসমর্পণ অবস্থায় প্রেমের পূর্ণ অভিব্যক্তি মহাপ্রভু শিক্ষাষ্টকের অষ্টম শ্লোকে ব্যক্ত করিয়াছেন,—

"আশ্লিষ্য বা পাদরতাং পিনষ্টু মামদর্শনান্মর্ম্মাহতাং করোতু বা।
যথা তথা বা বিদধাতু লম্পটো মৎপ্রাণনাথস্তু স এব নাপরঃ ॥"

"এই পাদরতা দাসীকে কৃষ্ণ আলিঙ্গনপূর্ব্বক পেষণ করুন, অথবা অদর্শন-দ্বারা মর্ম্মাহতাই করুন, তিনি লম্পট—পুরুষ, আমার প্রতি যেরূপই বিধান করুন না কেন, তিনি অপর কেহ নন, আমারই প্রাণনাথ।"

ব্রজের মদীয়ভাবে পরকীয়া প্রেমকেই সর্ব্বোৎকৃষ্ট বলা হইয়াছে। ব্রজ-গোপীদের প্রেমের কাছে ভগবান্ স্বয়ং ঋণ স্বীকার করিয়াছেন। শ্রীউদ্ধব মহারাজ এই ব্রজগোপীদের চরণ-রেণু পাইবার লালসা প্রকাশ করিয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণ-মাধুর্য্যের পরমোৎকর্ষ একমাত্র ব্রজাঙ্গনাগণই অনুভব করিয়াছেন এবং উহার আস্বাদনে তাঁহারাই পরমতম অভিনিবেশ প্রাপ্ত হইয়াছেন। পারকীয় রসে মদীয় ভাবে তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণপ্রেমে শ্রীকৃষ্ণ-মাধুর্য্য আস্বাদন করিয়াছেন। নারায়ণের বক্ষস্থিতা লক্ষ্মীদেবীর ভাগ্যেও এই প্রেমের আস্বাদন ঘটে নাই।

শ্রীগৌরসুন্দর তাঁহার অন্তরঙ্গ ভক্তের নিকটে ব্রজের কুঞ্জাভ্যন্তরের সেই গোপন প্রেমলীলা প্রকাশ করিয়াছেন। জগতে নামপ্রেম প্রচারের দ্বারা এমন অলভ্য কৃষ্ণপ্রেম সকলের মাঝে অমন্দোদয়ার মাধ্যমে দান করিয়া গিয়াছেন। শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতী গোস্বামিপাদ তাঁহার শ্রীশ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্-গ্রন্থে বলিয়াছেন,—"কর্ম্মিগণ কর্ম্মনিষ্ঠায় যাহা লাভ করিতে পারেন না, যোগিগণ তপস্যা, ধ্যান ও অষ্টাঙ্গ যোগের প্রভাবে যাহা জ্ঞাত হইতে পারেন না, জ্ঞানমিশ্র ভক্ত বৈরাগ্য, কর্ম্মত্যাগ, তত্ত্বজ্ঞান ও স্তবপাঠ প্রভৃতি দ্বারাও যাহা উপলব্ধি করিতে সমর্থ হন না, এমনকি, শ্রীগোবিন্দের প্রেমসেবাপরায়ণ ভক্তগণেরও যাহা অলভ্য, সেই নিগূঢ় প্রেম যাঁহার আবির্ভাবে নামগ্রহণের দ্বারাই স্বয়ং আসিয়া উদিত হইয়াছিল, সেই গৌরহরিকে আমি স্তব করি।"

—শ্রীমতী মায়া সরকার

ভগবানের দণ্ডই দয়া

সুখ-দুঃখ, নিন্দা-স্তুতি, পুরস্কার-তিরস্কার প্রভৃতি অনুভব করিবার জন্যই প্রকৃতি ও পুরুষের বিবেকহীনতা-প্রযুক্ত মানবের এই পাঞ্চভৌতিক শরীর নির্ম্মিত হইয়াছে। এই শরীরের প্রতি মমত্ব-বুদ্ধি হইতেই মানবগণের 'আমি' ও 'আমার' এইরূপ বৈষম্য উপস্থিত হয় এবং এই প্রকার বৈষম্য-বশতঃই পীড়ন, তাড়ন, হিংসা ও নিন্দা হইয়া থাকে। সর্ব্বভূতান্তর্যামী ও অদ্বিতীয় ভগবানের বদ্ধজীবের ন্যায় 'আমি' ও 'আমার' ইত্যাকার কোন জড়ীয় অভিমান নাই; অতএব তাঁহাতে 'হিংসা' ও 'পীড়নাদির' সম্ভাবনা লেশমাত্র থাকিতে পারে কি? তিনি শত্রু ও মিত্র উভয়ের প্রতিই সমদর্শী এবং তাঁহার দ্বেষ্য বা দ্বেষ্টা কেহই নাই। তিনি কেবলমাত্র মানবগণের ভবিষ্যৎ মঙ্গলের কথা চিন্তা করিয়াই দণ্ডবিধান করিয়া থাকেন।

ভগবান্ জীবগণকে দণ্ডপ্রদান করিয়া তাঁহাদের দেহের প্রতি আসক্তি ও নানাপ্রকার কুবাসনাগুলিকে ছেদন করিয়া থাকেন। ভগবানের দণ্ডগ্রহণে কোনদিনই উপকার ব্যতীত অপকার হয় না। ইহা জগতের কৃষ্ণ-বহির্ম্মুখ মাতা, পিতা বা গুরুজন যে-সকল মায়াময় বাক্য বলেন, তাহা অত্যন্ত মধুর বলিয়া মনে হয়; কিন্তু তাহাতে আমরা মায়াতেই আসক্ত হইয়া পড়ি। কোন কোন ক্ষেত্রে মাতা, পিতা, আত্মীয়-স্বজনাদি তাঁহাদের নিজজনকে দণ্ড বা শাস্তিপ্রদান করিয়া কুপথ হইতে সুপথে আনিবার চেষ্টা করেন। 'সুপথ' বলিতে তাঁহারা জড়েন্দ্রিয়-সুখবর্দ্ধনের পথকেই লক্ষ্য করিয়া থাকেন। ছাত্রগণকে জড়বিদ্যায় পারদর্শী করিবার জন্য শিক্ষকেরাও দণ্ড বা শাস্তিপ্রদান করিতে পিছপা হন না। কিন্তু জাগতিক দণ্ডের সাহায্যে কাহারও প্রকৃত কল্যাণ সাধিত হইতে পারে না।

জাগতিক সুশৃঙ্খলা রক্ষার্থে দণ্ডপ্রদানের প্রয়োজন হইলেও অনেকক্ষেত্রে তাহা বিপরীত ফলই প্রসব করিয়া থাকে। পিষ্টবস্তুকে পুনরায় পেষণ করিলে যেমন কোন ফল হয় না, তেমনি প্রমত্তকে দণ্ডপ্রদান করিলে তাহার প্রমত্ততার উপশম হয় না; বরং আরও বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। অসৎকর্ম্মে নিযুক্ত কোন ব্যক্তিকে দণ্ড বা শাস্তিপ্রদান না করিয়া ঐ কার্য্যে উৎসাহ প্রদান করিলে অসৎকর্ম্মীর ইহকাল ও পরকাল—দুইই নষ্ট করা হয়। কিন্তু তাই বলিয়া সৎকর্ম্মীর পরকালের পথ পরিষ্কার—তাহাও বলা যাইবে না। কারণ অসৎকর্ম্মী ও

সৎকর্ম্মী উভয়েই যমরাজের দণ্ডার্হ। যমদণ্ড ও ভগবানের দণ্ড কখনও সমপর্য্যায়ভুক্ত নহে। যমদণ্ড অত্যন্ত যাতনাদায়ক, কিন্তু ভগবানের দণ্ডরূপ অস্ত্রের দ্বারা হৃদয়গ্রন্থি ও অসদ্‌বিষয়ে আসক্তিসমূহ ছিন্ন হইলেই জীবের স্বরূপের উপলব্ধি হয়। তখনই জীব ভগবৎসেবায় প্রবিষ্ট হইতে পারেন—ইহাই নিত্য পরম শান্তিলাভের একমাত্র উপায়। তাই ভগবানের দণ্ডই প্রকৃত দয়া এবং অত্যন্ত সৌভাগ্যবান্ ব্যতীত অন্য কেহ তাহা লাভ করিতে সক্ষম নহে। এতৎপ্রসঙ্গে মহামতি বলিরাজ ভগবানের স্তব করিতে গিয়া বলিয়াছেন,—

পুংসাং শ্লাঘ্যতমং মন্যে দণ্ডমর্হত্তমার্পিতম্।
যং ন মাতা পিতা ভ্রাতা সুহৃদশ্চাদিশন্তি হি॥
ত্বং ন্যূনমসুরাণাং নঃ পরোক্ষঃ পরমো গুরুঃ।
যো নোঽনেকমদান্ধানাং বিভ্রংশং চক্ষুরাদিশৎ॥
(ভাঃ ৮।২২।৫)

"হে উত্তমশ্লোক! মাতা, পিতা, ভ্রাতা এবং সুহৃদ্‌বর্গ যে দণ্ডের বিধান করেন না, পরমপূজ্য আপনা-কর্ত্তৃক বিহিত সেই দণ্ড আমি পুরুষদিগের মধ্যে শ্লাঘ্যতম বলিয়া মনে করিতেছি। আপনি নিশ্চয়ই আমাদের অসুরগণের পরোক্ষে পরমহিতকারী অর্থাৎ শত্রুরূপে বর্ত্তমান থাকিয়া আমাদের হিতসাধন করেন ; যেহেতু আপনি শৌর্য্য, বীর্য্য প্রভৃতির মদে অন্ধ—সুতরাং শ্রেয়ঃপথ দর্শনে অসমর্থ আমাদের সেই মত্ততা-বিনাশক দিব্যদর্শন প্রদান করিয়াছেন।" অন্যত্র কালীয়নাগ দমনকালে নাগপত্নীগণ শ্রীকৃষ্ণের স্তবেও বলিয়াছেন,—

অনুগ্রহোঽয়ং ভবতঃ কৃতো হি নো
দণ্ডোঽসতাং তে খলু কল্মষাপহঃ।
যদ্দন্দশূকত্বমমুষ্য দেহিনঃ
ক্রোধোঽপি তেঽনুগ্রহ এব সম্মতঃ॥ (ভাঃ ১০।১৬।৩৪)

—"হে দেব! যেহেতু আপনার দণ্ড নিশ্চিতভাবে পাপিগণের পাপনাশ করিয়া থাকে, সেইজন্য আপনি দণ্ডরূপে আমাদিগকে অনুগ্রহই করিয়াছেন। বিশেষতঃ আমাদের এই স্বামী যে পাপে সর্পত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন, সেই পাপনাশ করায় আপনার ক্রোধকেও আমরা অনুগ্রহই মনে করিতেছি।"

যিনি ভগবানের দণ্ড-প্রদানকে বহুমানন করেন না, তিনি কখনও প্রেম-ভক্তি-লাভের যোগ্য হন না। কারণ ভগবৎতত্ত্বে অনভিজ্ঞতাই তাঁহার প্রেমভক্তিলাভের প্রধান প্রতিবন্ধক হইয়া দাঁড়ায়। যিনি ভগবানের দণ্ডকে

নিজ-মঙ্গল-লাভের কারণ বলিয়া জানেন, তাঁহারই প্রেমভক্তি-লাভের সুযোগ ঘটে। ভগবান্ শ্রীচৈতন্যের বাক্যদণ্ড লাভ করিয়া দেবানন্দ পণ্ডিতের প্রথমে সুকৃতির উদয় এবং পরে দুর্ল্লভ কৃষ্ণভক্তি লাভ হইয়াছিল। এই প্রসঙ্গে ব্যাসাবতার শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর শ্রীচৈতন্যভাগবতে বলিয়াছেন,—

তথাপিহ দেবানন্দ বড় পুণ্যবন্ত।
বচনেও প্রভু যারে করিলেন দণ্ড॥
চৈতন্যের দণ্ড মহাসুকৃতি সে পায়।
যাঁর দণ্ডে মরিলে বৈকুণ্ঠে লোক যায়॥
চৈতন্যের দণ্ড যে মস্তকে করি' লয়।
সেই দণ্ড তা'রে প্রেমভক্তি-যোগ হয়॥
চৈতন্যের দণ্ডে যার চিত্তে নাহি ভয়।
জন্মে জন্মে সে পাপিষ্ঠ যমদণ্ড্য হয়॥

(চৈঃ ভাঃ মধ্য ২১।৭৭-৮০)

অনেকে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে মহাপ্রভু-কর্ত্তৃক ছোট হরিদাসের ত্যাগের অর্থাৎ দণ্ডের মধ্যে নির্দ্দয়তার প্রতিচ্ছবি দেখিতে পান। ভগবানের প্রতি বীতরাগের জন্যে তাঁহারা কুদর্শন ফলে চিরকালের জন্য নিজেদের মঙ্গলের পথ হারাইয়া ফেলেন। কবিরাজ রোগ আরোগ্যের জন্য তিক্ত ঔষধের ব্যবস্থা করিলেন অথবা শল্য চিকিৎসক রোগীর বিস্ফোটকে অস্ত্রোপচার করিলেন, তাহাতে কবিরাজ ও ডাক্তারের প্রতি বিরক্ত হইয়া অসন্তুষ্ট হইয়া আমরা যদি তাঁহাদিগকে শাসন করিতে যাই, তাহা হইলে আমাদের রোগ আরোগ্যের কোন সম্ভাবনা থাকিবে না। ডাক্তার-কবিরাজ নির্দ্দয়—মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী নহেন—এই সর্ব্বনাশা চিন্তাধারা সর্পগ্রস্তের ন্যায় আমাদের হৃদয়কে গ্রাস করিবে। প্রকৃত মঙ্গলকারীকে 'অমঙ্গলকারী' ও 'নির্দ্দয়' বলিলে ভুলের ফাঁদে পা রাখা হইবে না কি? ছোট হরিদাসকে ত্যাগের মাধ্যমে স্বয়ং মহাপ্রভু যে মহৎ উপকার করিয়াছেন, তাহা জগদ্‌গুরু শ্রীল সরস্বতী প্রভুপাদ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের 'অনুভাষ্যের' মধ্যে অত্যন্ত সুন্দরভাবে বর্ণনা করিয়াছেন,—

"যদিও কপটতাপূর্ব্বক অবৈধ স্ত্রীসঙ্গও পাপের অন্যতম মাত্র, তথাপি বৈষ্ণবের ত্রিগুণাতীত অপ্রাকৃত পরমোচ্চ আসন বুঝাইবার জন্য এবং ভাবিকালের বিদ্ধ প্রাকৃত-সহজিয়া প্রভৃতি উপধর্ম্ম-অপধর্ম্মযাজী নারকীগণের ব্যবহার যে নিতান্ত অধর্ম্ম ভিত্তিতে গঠিত ও শুদ্ধবৈষ্ণব-ধর্ম্মের সম্পূর্ণ বিপরীত ও স্বতন্ত্র—তাহা বুঝাইবার জন্য নিজভক্ত ছোট হরিদাসকে দণ্ড প্রদান করিলেন।

শ্রীমাধবী দেবী—উচ্চাধিকারিণী, মহাভাগবত, তাঁহার নিকট তণ্ডুল ভিক্ষা-গ্রহণ হরিদাসের ন্যায় প্রভুপার্ষদের অবৈধ-কার্য্য না হইলেও ভবিষ্যতে তোমার ঐ প্রকার উদাহরণ বা আদর্শের অনুকরণ করিয়া অনেকে শাঠ্য ও কাপট্য বিস্তারপূর্ব্বক কলিজনোচিত অবৈষ্ণব-মত প্রচার করিতে পারে—তাহার নিবারণকল্পে জগদ্গুরু লোকশিক্ষক ভগবানের এই হরিদাস-সম্বন্ধিনী দণ্ড-লীলা। শ্রীগৌরসুন্দর অসামান্য দয়ার সাগর হইয়াও কলিজীবের দুর্ব্বলতা বুঝিয়াই এরূপ সঙ্গত্যাগরূপ সুকঠোর দণ্ডপ্রদান করিয়া অমন্দোদয়া দয়ার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিলেন।"

নিরন্তর ভগবৎ-সেবাপর চিত্ত সম্পূর্ণরূপে আত্মস্বরূপের উপলব্ধি করিয়া থাকেন। তাই ভগবদ্বিহিত কোন কার্য্যে তিনি স্বীয় অসন্তোষ প্রকাশ করেন না। আপনাকে দণ্ডার্হজ্ঞানে ভগবানের বিধান শিরে ধারণ করিয়া স্বীয় পূর্ব্ব অপরাধের যোগ্যতাই বিচার করেন এবং ধীরভাবে ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, ও মোক্ষ প্রভৃতি ফললাভের উদ্দেশ্যে ভগবদ্বিধানের প্রতিকূল চেষ্টাবিশিষ্ট হন না। তাই বেদান্তের অকৃত্রিম ভাষ্য শ্রীমদ্ভাগবতের নিম্নোক্ত শ্লোকের মধ্যে যাহা উল্লেখ রহিয়াছে, তাহা স্মরণপূর্ব্বক 'ভগবানের দণ্ডই প্রকৃত দয়া' বিচার করিয়া শ্রীরাধাগোবিন্দের সেবায় আত্মনিয়োগ করিলে আমাদের মানব-জন্ম ধারণ সার্থক হইবে—এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।

তত্তেঽনুকম্পাং সুসমীক্ষমাণো ভুঞ্জান এবাত্মকৃতং বিপাকম্।
হৃদ্বাগ্বপুর্ভির্বিদধন্নমস্তে জীবেত যো মুক্তিপদে স দায়ভাক্॥

(ভাঃ ১০।১৪।৮)

"জীব প্রাকৃত কর্ম্মফলে সুখ ও দুঃখ ভোগ করে। যাঁহারা ঐ সকল নিজকৃত কর্ম্মফল 'ভগবানেরই কৃপা'—এইরূপ বিচার করিয়া তাহা ভোগ করিতে করিতে কায়, মন ও বাক্যের দ্বারা শ্রীভগবানের পাদপদ্মে নমস্কার বিধানপূর্ব্বক জীবনধারণ করেন, তাঁহারাই মুক্তির আশ্রয়স্বরূপ ঐ পাদপদ্ম-লাভের অধিকারী।"

—শ্রীবলভদ্রদাস ব্রহ্মচারী

শ্রীচৈতন্যে মর্ত্ত্যবুদ্ধি—নাস্তিকতা ও অপরাধ

(২)

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু নিত্যানন্দের সঙ্গী নির্দ্দেশ করিয়াছেন এবং অদৃশ্য থাকিয়া গৌড়ে নিত্যানন্দ-নৃত্য দর্শনে অঙ্গীকার করিয়াছেন।—

"রামদাস, গদাধর আদি কতজনে।
তোমার সহায় লাগি' দিলুঁ তোমার সনে॥
মধ্যে মধ্যে আমি তোমার নিকটে যাইব।
অলক্ষিতে রহি' তোমার নৃত্য দেখিব॥"

(চৈঃ চঃ মধ্য ১৫।৪৩-৪৪)

শ্রীশ্রীগৌরকৃষ্ণ-নিত্য-পার্ষদপ্রবর শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ এ সম্বন্ধে আরও উপদেশ দিয়াছেন,—"শ্রীমন্মহাপ্রভু নিত্যানন্দকে বিবাহ করিয়া বংশ রক্ষা করিবার জন্য নীলাচল হইতে গৌড়দেশে পাঠাইয়াছিলেন, এরূপ কথা কোনও প্রামাণিক গ্রন্থে নাই। মহাপ্রভু নিত্যানন্দপ্রভুকে গৌড়দেশে অনর্গল প্রেমভক্তি প্রচার করিবার জন্যই আজ্ঞা করিয়াছিলেন। কিন্তু মহাপ্রভুর প্রকটলীলাতে নিত্যানন্দের বিবাহকার্য্যে মহাপ্রভু নিষেধ করিলেন না কেন? তদুত্তর—যদি মহাপ্রভুর অনুমোদনে বিবাহ করিয়া থাকেন তবে ত' বিবাহকার্য্য বা গার্হস্থ্যলীলা ঠিকই হইয়াছে। যেহেতু তিনি শ্রীগৌরসুন্দরের স্বীকৃতির জন্যই বিবাহ করিয়াছিলেন। দ্বিতীয়তঃ শ্রীগৌরসুন্দর 'অবধূত বা স্বতন্ত্র বৈষ্ণব'—বদ্ধজীবের ন্যায় কোনও বিধির বাধ্য নহেন, ইহাই নিত্যানন্দের দ্বারা প্রচার করাইলেন। বিষ্ণুর গৃহিণী, গুরুপত্নী কখনও অবিষ্ণুবস্তুর কল্পিত ভোগ্যা, বদ্ধজীবের ভোগ্যা ও গুরুব্রুবের কল্পিত ভোগ্যের সহিত এক নহে। ঈশ্বর বা প্রভুবস্তু সমস্ত কার্য্য করিতে সমর্থ। তাই মহাপ্রভু নিত্যানন্দ প্রভুর সম্বন্ধে বলিয়াছেন,—

মদিরা যবনী যদি নিত্যানন্দ ধরে।
তথাপি ব্রহ্মার বন্দ্য কহিল তোমারে॥"

শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু গার্হস্থ্যলীলার অভিনয় করিলেও শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য প্রভু তাঁহাকে বলিয়াছিলেন,—"পরমহংসের পথে তুমি অধিকারী।" ইহাতে শ্রীনিত্যানন্দের প্রতি শ্রীমন্মহাপ্রভুর আদেশ সম্পর্কে লেখকের পুস্তকের ৩৩পৃষ্ঠার বক্তব্যের অসত্যতা প্রতিপন্ন হইতেছে। আবার লেখক যে লিখিয়াছেন,—'বস্তুতঃ মনের দিক্ থেকে চৈতন্য কোনদিনই সন্ন্যাসী ছিলেন না।'—ইহাও

মথ্যা কথা। 'শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত' হইতে উদ্ধৃত কয়েকটি মাত্র শ্লোকের প্রতি সুধী পাঠকবৃন্দের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি ;—

"মহাপ্রভুর ভক্তগণের বৈরাগ্য প্রধান।
যাহা দেখি' প্রীত হন গৌর-ভগবান্ ॥"

(চৈঃ চঃ অন্ত্য ৬।২২০)

শ্রীসনাতনের যুক্তবৈরাগ্য দেখিয়া মহাপ্রভুর আনন্দ হইত,—

"সনাতনের বৈরাগ্যে প্রভুর আনন্দ অপার।
ভোট-কম্বল পানে প্রভু চাহে বারে বার ॥"

(চৈঃ চঃ মধ্য ২০।৮২)

যুক্ত-বৈরাগ্যই জীবের কাম্য এবং ফল্গু-বৈরাগ্য সর্ব্বথা ত্যাজ্য।—

"যুক্তবৈরাগ্য-স্থিতি সব শিখাইল।
শুষ্ক-বৈরাগ্য-জ্ঞান সব নিষেধিল ॥"

(চৈঃ চঃ মধ্য ২৩।৯৯)

সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য কহিয়াছেন,—

"বৈরাগ্য-বিদ্যা-নিজভক্তিযোগ-শিক্ষার্থমেকঃ পুরুষঃ পুরাণঃ।
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-শরীরধারী কৃপাম্বুধির্যস্তমহং প্রপদ্যে ॥"

(চৈঃ চঃ মধ্য ৬।২৫৪)

অর্থাৎ—"বৈরাগ্য, বিদ্যা ও নিজভক্তিযোগ শিক্ষা দিবার জন্য শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্য-রূপধারী এক সনাতন পুরুষ—সর্ব্বদা কৃপাসমুদ্র, তাঁহার প্রতি আমি প্রপন্ন হই।"

জীবোদ্ধারের নিমিত্ত মহাপ্রভু সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াছিলেন। প্রেমারুরুক্ষুর ভোক্তৃভাবে ভোগ্য দর্শন অত্যন্ত নিষিদ্ধ,—

যথা—চৈতন্যচন্দ্রোদয়-নাটকে (৮।২৪)—

"নিষ্কিঞ্চনস্য ভগবদ্ভজনোন্মুখস্য
পারং পরং জিগমিষোর্ভব-সাগরস্য।
সন্দর্শনং বিষয়িণামথ যোষিতাঞ্চ
হা হন্ত হন্ত বিষভক্ষণতোঽপ্যসাধু ॥"

(চৈঃ চঃ মধ্য ১১।৮)

অর্থাৎ—"শ্রীচৈতন্যদেব খেদের সহিত কহিলেন—হায়! ভবসাগর সম্পূর্ণ-রূপে পার হইবার যাঁহাদের ইচ্ছা, এরূপ ভগবদ্ভজনোন্মুখ নিষ্কিঞ্চন ব্যক্তির পক্ষে বিষয়ী ও স্ত্রী-সন্দর্শন বিষভক্ষণ অপেক্ষাও অসাধু।"

শ্রীমন্ মহাপ্রভু কিভাবে সন্ন্যাস ও গুরুর মর্য্যাদা রক্ষা করিতে হয়, তাহা নিজে আচরণ করিয়া আমাদের শিক্ষা দিয়াছেন। পাষণ্ডিগণের উদ্ধারার্থে মহাপ্রভু সন্ন্যাস-লীলাভিনয়ের সঙ্কল্প করিলেন এবং তাঁহাকে যতি-জ্ঞানে নমস্কার-ফলে পাষণ্ড বিপ্রাদি উচ্চ জাতিরও শুদ্ধচিত্তে সেবা-প্রবৃত্তির উদয় হইবে—এইরূপ চিন্তা করিলেন। যথা—

"মোরে নিন্দা করে যে, না করে নমস্কার।
এসব জীবেরে অবশ্য করিব উদ্ধার॥
অতএব অবশ্য আমি সন্ন্যাস করিব।
সন্ন্যাসি-বুদ্ধ্যে মোরে প্রণত হইব॥
প্রণতিতে হ'বে ইহার অপরাধ ক্ষয়।
নির্ম্মল হৃদয়ে ভক্তি করাইব উদয়॥
এসব পাষণ্ডীর তবে হইবে নিস্তার।
আর কোন উপায় নাহি, এই যুক্তি সার॥

(চৈঃ চঃ আদি ১৭।২৬৪-২৬৭)

শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা—সাধুসঙ্গ—'অন্বয়'রূপে বৈষ্ণব-আচার, আর অসৎসঙ্গ ত্যাগ—'ব্যতিরেক'-রূপে বৈষ্ণব-আচার। যথা—

"অসৎসঙ্গ-ত্যাগ,—এই বৈষ্ণব-আচার।
'স্ত্রীসঙ্গী'—এক অসাধু; কৃষ্ণাভক্ত আর॥"

(চৈঃ চঃ মধ্য ২২।৮৪)

কীর্ত্তনীয়া ছোট হরিদাস-বর্জ্জনলীলা-দ্বারা কীর্ত্তনকারী মহাজনগণের চরিত্র কিরূপ নির্ম্মল হওয়া উচিত—এই শিক্ষাই মহাপ্রভু দিয়াছেন। প্রসঙ্গতঃ মহাপ্রভুর হেঁয়ালিচ্ছলে সন্ন্যাস-গ্রহণের বার্ত্তা প্রকাশ এস্থলে উল্লেখ করিলে অত্যুক্তি হইবে না।—

"করিল পিপ্পলিখণ্ড কফ নিবারিতে।
উলটিয়া আরো কফ বাড়িল দেহেতে॥
বলি' অট্ট অট্ট হাসে' সর্ব্ব-লোকনাথ।
কারণ না বুঝি' ভয় জন্মিল সবা'ত॥
নিত্যানন্দ বুঝিলেন প্রভুর অন্তর।
জানিলেন—'প্রভু শীঘ্র ছাড়িবেন ঘর॥
বিষাদে হইলা মগ্ন নিত্যানন্দ-রায়।
হইব সন্ন্যাসি-রূপ প্রভু সর্ব্বথায়॥"

(চৈঃ ভাঃ মধ্য ২৬।১২১-১২৪)

উক্তরূপ অবস্থা বিচার করিলে শ্রীচৈতন্যদেব মনে-প্রাণে কিরূপ নিষ্ঠাবান্ সন্ন্যাসী ছিলেন, তাহা অবশ্যই অনুধাবনের বিষয় হইবে, আশা করি।

(৯) লেখক আবার ৮৫ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন,—"দেখা যাচ্ছে, বিশ্বরূপের গৃহত্যাগের পর এই চৈতন্য একদিন অদ্ভুত একটা স্বপ্ন দেখলেন, ঘুমের ঘোরে দেখা নয়, মূর্চ্ছার ঘোরে দেখা স্বপ্ন (চৈ. চরিতামৃত ১।১৪।১০৪-১০৮)। তো এই স্বপ্নে গৃহত্যাগী বিশ্বরূপ ছোট ভাই চৈতন্যকে 'সন্ন্যাস করহ তুমি' বলে উদ্বুদ্ধ করছেন। চৈতন্য এতে রাজী নন। তখন তাঁর বক্তব্য ছিল 'গৃহস্থ হইয়া করিব পিতা-মাতার সেবন।' মূর্চ্ছা ভঙ্গের পর মা শচীদেবীকে স্বপ্নের কথা বললেন চৈতন্য। বললেন সন্ন্যাসী হবার জন্য চৈতন্যের কাছে বিশ্বরূপের নির্বন্ধের কথা। শুনে শচীদেবী চিন্তান্বিত হলেন।"

লেখক ১০০ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন,—"লক্ষ্মীপ্রিয়া জীবিত থাকলে বিশ্বম্ভর মিশ্র মস্তক মুণ্ডন করে, গেরুয়া-সন্ন্যাস নিয়ে গৃহত্যাগ করতেন একথা স্বপ্নেও ভাবা যায় না।" লেখক পুস্তিকার ১১৫ পৃষ্ঠাতে মন্তব্য করিয়াছেন—"লক্ষ্মীপ্রিয়ার অকাল মৃত্যুই বিশ্বম্ভর মিশ্রের সন্ন্যাসী চৈতন্য হওয়ার উপক্রমণিকা। এই এক সূত্র ধরেই নিমাইয়ের সন্ন্যাস জীবন সূচিত হয়েছিল।"

লেখকের স্বলিখিত ৮৫ পৃষ্ঠার মন্তব্যে লেখক স্বীকার করিয়াছেন যে, বিশ্বরূপের গৃহত্যাগের পর চৈতন্য মূর্চ্ছার ঘোরে স্বপ্নে বিশ্বরূপের সাক্ষাৎ লাভ করিয়া বিশ্বরূপকর্তৃক সন্ন্যাস করিতে উদ্বুদ্ধ হন এবং স্বপ্নভঙ্গে মাতা শচীদেবীকে তাহা বলেন। উক্ত ঘটনা প্রামাণিক গ্রন্থ 'চৈতন্যচরিতামৃতে' আদিলীলা পঞ্চদশ পরিচ্ছেদে উল্লিখিত আছে। চৈতন্যদেব স্বপ্নে বিশ্বরূপের সহিত সাক্ষাৎকার কালে অবিবাহিত ছিলেন এবং তাঁহার পিতৃদেবও প্রকট ছিলেন। শ্রীচৈতন্যদেব স্বপ্নে দেখা সন্ন্যাস গ্রহণ করার ইঙ্গিত তাঁহার জননীকে জানাইয়াছিলেন।

বিশ্বরূপের সন্ন্যাস শ্রবণে জগন্নাথ মিশ্র দুঃখিত হইয়া ভাবি-কালে চৈতন্যের গৃহস্থ-ধর্ম্ম-স্বীকারে সংশয় প্রকাশ করেন।—

"মিশ্র বোলে,—এই পুত্র রহিবেক ঘরে।
ইহাতে প্রমাণ মোর না লয় অন্তরে॥"

(চৈঃ ভাঃ আদি ৭।৮৯)

শচীদেবীর নিকট মিশ্র একদিন বিশ্বম্ভরের ভাবি-সন্ন্যাস সম্বন্ধে আশঙ্কা প্রকাশ করেন,—

"শচী-প্রতি বোলে জগন্নাথ মিশ্রবর।
এহো পুত্র না রহিবে সংসার-ভিতর॥"

(চৈঃ ভাঃ আদি ৭।১২২)

"এহো যদি সর্ব্বশাস্ত্রে হইবে জ্ঞানবান্।
ছাড়িয়া সংসার-সুখ করিবে পয়ান॥"

(চৈঃ ভাঃ আদি ৭।১২৫)

একদিন জগন্নাথ মিশ্র স্বপ্নে শিশু নিমাইয়ের সন্ন্যাসি-বেষ দেখিয়া ও বিষ্ণু সিংহাসনে উপবেশন করত ভক্তগণকে কৃপা করিতে দেখিয়া বুঝিয়াছিলেন যে এই শিশুও গৃহে থাকিবে না।

"দৈবে একদিন স্বপ্ন দেখি' মিশ্রবর।
হরিষে বিষাদ বড় হইল অন্তর॥
স্বপ্ন দেখি' স্তব পড়ি' দণ্ডবৎ করে।
'হে গোবিন্দ, নিমাঞি রহুক মোর ঘরে॥
সবে এই বর, কৃষ্ণ, মাগি তোর ঠাঁঞি।
গৃহস্থ হইয়া ঘরে রহুক নিমাঞি॥
শচী জিজ্ঞাসয়ে বড় হইয়া বিস্মিত।
'এ সকল বর কেনে মাগ' আচম্বিত ??'
মিশ্র বোলে,—আজি মুই দেখিলুঁ স্বপন।
নিমাঞি করিয়াছে যেন শিখার মুণ্ডন॥
অদ্ভুত সন্ন্যাসি-বেশ কহনে না যায়।
হাসে নাচে কান্দে 'কৃষ্ণ' বলি' সর্ব্বদায়॥
অদ্বৈত-আচার্য্য-আদি যত ভক্তগণ।
নিমাঞি বেড়িয়া সবে করেন কীর্ত্তন॥
কখনো নিমাঞি বৈসে বিষ্ণুর খট্টায়।
চরণ তুলিয়া দেয় সবার মাথায়॥
চতুর্ম্মুখ, পঞ্চমুখ, সহস্রবদন।
সবেই গায়েন,—'জয় শ্রীশচীনন্দন'॥
মহানন্দে চতুর্দ্দিকে সবে স্তুতি করে।
দেখিয়া আমার ভয়ে বাক্য নাহি স্ফুরে॥
কতক্ষণে দেখি,—কোটি কোটি লোক লৈয়া।
নিমাই বুলেন প্রতি নগরে নাচিয়া॥

লক্ষ কোটি লোক নিমাঞির পাছে ধায়।
ব্রহ্মাণ্ড স্পর্শিয়া সবে হরিধ্বনি গায়॥
চতুর্দ্দিকে শুনি' মাত্র নিমাঞির স্তুতি।
নীলাচলে যায় সর্ব্ব-ভক্তের সংহতি॥
এই স্বপ্ন দেখি' চিন্তা পাঙ্ সর্ব্বথায়।
'বিরক্ত হইয়া পাছে পুত্র বাহিরায়'॥"

(চৈঃ ভাঃ আদি ৮।৯২-১০৫)

জগন্নাথ মিশ্র স্বপ্নে নিমাইয়ের ভাবি-সন্ন্যাস-লীলা দর্শনে নিমাইয়ের সন্ন্যাস-লীলার বিরহ সহ্য করিতে পারিবেন না বলিয়া সহসা একদিন অপ্রকট হইলেন।

লক্ষ্মীপ্রিয়ার প্রকটকালে শ্রীচৈতন্যদেব অদ্বৈতসভায় কৃষ্ণকীর্ত্তনকারী সর্ব্ব বৈষ্ণবপ্রিয় মুকুন্দকে লক্ষ্য করিয়া স্বীয় ভাবি-সন্ন্যাস গ্রহণ লীলার ভবিষ্যদ্বাণী ইঙ্গিতে জানাইয়াছিলেন,—

"হাসি' বোলে প্রভু—'আগে পড়ো কতদিন।
তবে সে দেখিবা মোর বৈষ্ণবের চিন॥
এমত বৈষ্ণব মুই হইমু সংসারে।
অজ-ভব আসিবেক আমার দুয়ারে॥
শুন, ভাই সব, এই আমার বচন।
বৈষ্ণব হইমু মুই সর্ব্ব-বিলক্ষণ॥
আমারে দেখিয়া এবে যে সব পলায়।
তাহারাও যেন মোর গুণ-কীর্ত্তি গায়॥"

(চৈঃ ভাঃ আদি ১১।৪৬-৪৯)

উপরোক্ত অবস্থায় 'চৈতন্যচরিতামৃত' ও 'চৈতন্যভাগবতে' শ্রীচৈতন্যদেবের সন্ন্যাস গ্রহণের যে আভাস পাওয়া যায়, তাহাতে লক্ষ্মীপ্রিয়া জীবিত থাকিলে তিনি সন্ন্যাস লইয়া গৃহত্যাগ করিতেন না—এমন কোন ইঙ্গিত প্রকাশ পায় না।

উপরোক্ত অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে ও তাঁহার পুস্তকের ৮৫ পৃষ্ঠায় লিখিত চৈতন্যচরিতামৃতের বিবরণে চৈতন্যদেবকর্ত্তৃক সন্ন্যাস গ্রহণের ইঙ্গিত থাকায় ১০০ পৃষ্ঠা ও ১১৫ পৃষ্ঠার উক্ত বক্তব্য অসার ও অযৌক্তিক প্রতিপন্ন হইতেছে। (ক্রমশঃ)

—শ্রীচৈতন্যকৃষ্ণ দাসাধিকারী

শ্রীনবদ্বীপধাম-পরিক্রমা ও শ্রীগৌরজন্ম-মহোৎসব

প্রকৃতি নিজ নিয়মে দুর্ব্বার গতিতে পথ অতিক্রম করিয়া চলিয়াছে। সময় কাহারও জন্ম বিন্দুমাত্র অপেক্ষা করিতেছে না। কিন্তু এই কালের গতিতে পৃথিবীর ইতিহাসে কতই না পরিবর্ত্তন—দেশের রাজনৈতিক পটপরিবর্ত্তন, উপসাগরীয় যুদ্ধ প্রভৃতি হইয়া গেল। এই পরিবর্ত্তন যখন আমাদের চোখের সামনে ঘটিয়া চলিয়াছে, ঠিক তখনই চিরশাশ্বত সনাতন ধর্ম্মাবলম্বী শ্রীগৌড়ীয়-বৈষ্ণব জগতের তথা বিশ্ববাসীর সর্ব্ববরেণ্য পরমারাধ্যতত্ত্ব—কলিযুগপাবনাবতারী অমন্দোদয়দয়া বিতরণকারী শ্রীশচীনন্দন গৌরহরির শুভাবির্ভাব-তিথি ফাল্গুনী-পূর্ণিমা আমাদের নিকট সমুপস্থিত। এই তিথিকে অবলম্বন করিয়া এই বৃন্দাবনাভিন্ন শ্রীধাম নবদ্বীপে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন কলিকলুষ-কল্মষনাশকারী রাধাভাবদ্যুতিসুবলিত সুবর্ণ-কান্তি স্বয়ং ভগবান্ শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু।

তাঁর আবির্ভাব-তিথি উপলক্ষে জগদ্গুরু নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামি-প্রতিষ্ঠিত শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির সেবকগণ প্রতি বৎসর সপ্তদিবসব্যাপী শ্রীধাম নবদ্বীপ-পরিক্রমার আয়োজন করিয়া থাকেন। কিন্তু বর্ত্তমানে দেশের রাজনৈতিক অস্থিরতা ও উপসাগরীয় যুদ্ধের ফলে উদ্ভূত অর্থনৈতিক সঙ্কটের সমাধানে মহামান্য সরকার জনসাধারণকে ব্যয় সংকোচ করার নির্দ্দেশ দিতেছেন। এই নির্দ্দেশের বিষয় চিন্তা করিয়া ও অন্যান্য বিশেষ অসুবিধা হেতু শ্রীসমিতি সাতদিনের পরিবর্ত্তে পাঁচদিন পরিক্রমা করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। কিন্তু পরবর্ত্তিকালে যাত্রীসাধারণের অবস্থা—পাঁচদিনের পরিক্রমার কষ্টকর পরিস্থিতি চিন্তা করিয়া কর্ত্তৃপক্ষ উক্ত সিদ্ধান্ত পরিবর্ত্তন করিয়া সাতদিনই পরিক্রমা চালাইতে বাধ্য হন।

পরিবর্ত্তিত সিদ্ধান্তানুযায়ী ১০ই ফাল্গুন, ১৩৯৭ (ইং ২৩।২।৯১) শনিবার হইতে পরিক্রমা আরম্ভ হইবার কথা। কিন্তু উক্ত পরিবর্ত্তিত সিদ্ধান্ত সকল স্থানে প্রচারিত না হওয়ায় যাত্রিগণ সময়মত উপস্থিত হইতে পারেন নাই। তজ্জন্য আরও একদিন পরে অর্থাৎ ১১ই ফাল্গুন, ১৩৯৭ (ইং ২৪।২।৯১) রবিবার হইতে পরিক্রমা আরম্ভ করিতে হয়।

১১ই ফাল্গুন, রবিবার যাত্রিগণ গঙ্গাস্পর্শনান্তে শ্রীগৌরজন্মস্থান যোগপীঠ শ্রীধাম-মায়াপুরের উদ্দেশ্যে দণ্ডবৎ-প্রণত হইয়া পরিক্রমাসূচী-অনুযায়ী যথাক্রমে শ্রীগোদ্রুমদ্বীপ, শ্রীমধ্যদ্বীপ, শ্রীকোলদ্বীপ, শ্রীঋতুদ্বীপ, শ্রীজহ্নুদ্বীপ, শ্রীমোদদ্রুমদ্বীপ,

শ্রীরুদ্রদ্বীপ, শ্রীসীমন্তদ্বীপ ও শ্রীঅন্তর্দ্বীপ পরিক্রমা ও দর্শন করিয়া ১৪ই ফাল্গুন, বুধবার পরিক্রমা সমাপ্ত করেন।

শ্রীগোদ্রুমদ্বীপের অন্তর্গত স্বানন্দ-সুখদ-কুঞ্জে শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের ভজনস্থলী ও সমাধিক্ষেত্রে শ্রীসমিতির সভাপতি-আচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি-বেদান্ত বামন গোস্বামী মহারাজ, শ্রীগৌর-বাণী-বিনোদ আশ্রমের সভাপতি-আচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিজীবন জনার্দ্দন গোস্বামী মহারাজ, শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকার সম্পাদক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত ত্রিবিক্রম মহারাজ এবং শ্রীসমিতির সহ-সভাপতি ও সাধারণ-সম্পাদক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত নারায়ণ মহারাজের তত্ত্বসিদ্ধান্তপূর্ণ ভাব-গম্ভীর কল্যাণজনক ভাষণ শ্রবণ করিয়া যাত্রিগণ পারমার্থিক মঙ্গল লাভ করেন। এতদ্ব্যতীত সমিতির অন্যান্য ত্রিদণ্ডিপাদগণ ও ব্রহ্মচারিগণ বিভিন্ন স্থানের মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিয়া যাত্রীবৃন্দকে প্রভূত আনন্দদান করেন।

১৫ই ফাল্গুন, বৃহস্পতিবার শ্রীগৌরজন্মোৎসব-দিবসে সন্ন্যাসি-ব্রহ্মচারিগণ সারাদিন শ্রীচৈতন্যভাগবত পারায়ণ ও কীর্ত্তনে অতিবাহিত করেন। হরি-ভজনোৎসুক ভক্তগণকে শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেব কৃপাপূর্ব্বক শ্রীনাম-দীক্ষা প্রদান করেন। সন্ধ্যায় শ্রীমন্মহাপ্রভুর অভিষেক, সন্ধ্যারতি ও শ্রীমন্দির-পরিক্রমান্তে যাত্রীদিগকে অনুকল্প প্রসাদ প্রদান করা হয়। রাত্রে আকস্মিক প্রবল বর্ষণে যাত্রিগণ সাময়িক অসুবিধা বোধ করিলেও সেবানন্দে মগ্ন থাকায় কোনরূপ ক্লেশ বোধ করেন নাই।

সাধারণ-মহোৎসবের দিন অর্থাৎ ১৬ই ফাল্গুন, শুক্রবার পরিক্রমাকারী যাত্রী ব্যতীত সর্ব্বসাধারণে মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়। এই মহোৎসবের প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত আনুমানিক ৮০ হাজার ব্যক্তিকে মহাপ্রসাদ বিতরিত হইয়াছে।

পরিক্রমা ও সাধারণ-মহোৎসবান্তে শ্রীসমিতির পরিচালক-মণ্ডলীর বার্ষিক সাধারণ-সভা আরম্ভ হয়। উক্ত সভায় ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত পর্য্যটক মহারাজকে 'শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা'র 'উপসম্পাদক' এবং শ্রীসত্যানন্দ ব্রহ্মচারীকে 'কার্য্যাধ্যক্ষে'র দায়িত্ব অর্পণ করা হয়।

—নিজস্ব সংবাদ

॥ শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ ॥

স বৈ পুংসাং পরো ধর্ম্মো যতো ভক্তিরধোক্ষজে ।

ধর্ম্মঃ স্বনুষ্ঠিতঃ পুংসাং বিষ্বক্‌সেন-কথাসু যঃ ।

শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা

নোৎপাদয়েদ্‌যদি রতিং শ্রম এব হি কেবলম্‌ ॥

অহৈতুক্যপ্রতিহতা যয়াত্মা সুপ্রসীদতি ॥

সেই ধর্ম্ম শ্রেষ্ঠ যাতে আত্ম-পরসন্ন ।
অধোক্ষজে অহৈতুকী ভক্তি বিঘ্নশূন্য ॥

অন্য ধর্ম্ম সুষ্ঠুরূপে পালে যেই জন ।
হরি-কথায় রতি নৈলে পণ্ড সেই শ্রম ॥

৪৩শ বর্ষ | ১৬ মধুসূদন, অনিরুদ্ধ, ৫০৫ শ্রীগৌরাব্দ ৩১ বৈশাখ, বুধবার, ১৩৯৮, ইং ১৫।৫।৯১ | ৩য় সংখ্যা

সানুবাদং

শ্রীশ্রীগোবিন্দাচ্যুত-মাধব-স্তোত্রম্‌

[শ্রীকৌর্ম্মে মহাপুরাণে পূর্ব্বভাগে ইন্দ্রদ্যুম্নমোক্ষে প্রথমেঽধ্যায়ে]

শ্রীরুবাচ,—

[ততো বহুতিথে কালে গতে নারায়ণং স্বয়ম্‌ ।
প্রাদুরাসীন্মহাযোগী পীতবাসা জগন্ময়ঃ ॥
দৃষ্ট্বা দেবং সমায়ান্তং বিষ্ণুমাত্মানমব্যয়ম্‌ ।
জানুভ্যামবনীং গত্বা তুষ্টাব গরুড়ধ্বজম্‌ ॥ ৬৭-৬৮ ॥]

[সুপ্রসন্না শ্রীলক্ষ্মীদেবী বলিলেন,—অনন্তর বহুকাল গত হইলে, মহাযোগী পীতবস্ত্রধারী জগন্ময় স্বয়ং নারায়ণ আবির্ভূত হইয়াছিলেন। পরমাত্ম-স্বরূপ অব্যয় দেব বিষ্ণুকে সমাগত দেখিয়া, ইন্দ্রদ্যুম্ন জানুতে অবনী স্পর্শপূর্ব্বক গরুড়ধ্বজকে স্তব করিয়াছিলেন।]

শ্রীইন্দ্রদ্যুম্ন উবাচ,—

১। যজ্ঞেশাচ্যুত গোবিন্দ মাধবানন্ত কেশব।
কৃষ্ণ বিষ্ণো হৃষীকেশ তুভ্যং বিশ্বাত্মনে নমঃ ॥ ৬৯ ॥

শ্রীইন্দ্রদ্যুম্ন বলিলেন,—হে যজ্ঞেশ, অচ্যুত, গোবিন্দ, মাধব, অনন্ত, কেশব, কৃষ্ণ, বিষ্ণো, হৃষীকেশ, বিশ্বাত্মন্! তোমাকে নমস্কার ॥ ৬৯ ॥

২। নমোঽস্তু তে পুরাণায় হরয়ে বিশ্বমূর্ত্তয়ে।
স্বর্গ-স্থিতি-বিনাশানাং হেতবেঽনন্তশক্তয়ে ॥ ৭০ ॥

হে পুরাণ-পুরুষ! হে হরে, বিশ্বমূর্ত্তে! সৃষ্টি-স্থিতি-বিনাশ-হেতো! অনন্তশক্তে! তোমাকে নমস্কার করি ॥ ৭০ ॥

৩। নির্গুণায় নমস্তুভ্যং নিষ্কলায় নমো নমঃ।
পুরুষায় নমস্তেঽস্তু বিশ্বরূপায় তে নমঃ ॥ ৭১ ॥

হে ত্রিগুণাতীত, নিষ্কল! তোমাকে নমস্কার করি। হে বিশ্বরূপ, পরমপুরুষ! তোমাকে নমস্কার ॥ ৭১ ॥

৪। নমস্তে বাসুদেবায় বিষ্ণবে বিশ্বযোনয়ে।
আদি-মধ্যান্ত-হীনায় জ্ঞানগম্যায় তে নমঃ ॥ ৭২ ॥

হে বাসুদেব, বিষ্ণো, বিশ্বযোনে, আদি-মধ্যান্তহীন, জ্ঞানগম্য, তোমাকে নমস্কার ॥ ৭২ ॥

৫। নমস্তে নির্ব্বিকারায় নিষ্প্রপঞ্চায় তে নমঃ।
ভেদাভেদ-বিহীনায় নমোঽস্ত্বানন্দ-রূপিণে ॥ ৭৩ ॥

হে নির্ব্বিকার, নিষ্প্রপঞ্চ, ভেদাভেদবিহীন, আনন্দরূপিন্! তোমাকে নমস্কার ॥ ৭৩ ॥

৬। নমস্তারায় শান্তায় নমোঽপ্রতিহতাত্মনে।
অনন্তমূর্ত্তয়ে তুভ্যমমূর্ত্তায় নমো নমঃ ॥ ৭৪ ॥

হে তারক, শান্ত, অপ্রতিহতাত্মন্, অনন্তমূর্ত্তে, অমূর্ত্তে! তোমাকে নমস্কার ॥ ৭৪ ॥

৭। নমস্তে পরমার্থায় মায়াতীতায় তে নমঃ।
নমস্তে পরমেশায় ব্রহ্মণে পরমাত্মনে ॥ ৭৫ ॥

হে পরমার্থ, মায়াতীত, পরমাত্মন্, পরমেশ, ব্রহ্মন্! তোমাকে নমস্কার ॥ ৭৫ ॥

৮। নমোঽস্তু তে সুসূক্ষ্মায় মহাদেবায় তে নমঃ।
নমঃ শিবায় শুদ্ধায় নমস্তে পরমেষ্ঠিনে ॥ ৭৬ ॥

হে সুসূক্ষ্ম, মহাদেব, শিব, শুদ্ধ, পরমেষ্ঠিন্! তোমাকে নমস্কার ॥ ৭৬ ॥

৯। ত্বয়ৈতৎ সৃষ্টমখিলং ত্বমেব পরমা গতিঃ।
ত্বং পিতা সর্ব্বভূতানাং ত্বং মাতা পুরুষোত্তম ॥ ৭৭ ॥

হে পুরুষোত্তম! তুমিই সমুদয় সৃষ্টি করিয়াছ, তুমিই (জীবের) পরম গতি; তুমিই সর্ব্বভূতের পিতা ও মাতা ॥ ৭৭ ॥

১০। ত্বমক্ষরং পরং ধাম চিন্মাত্রং ব্যোম নিষ্কলম্।
সর্ব্বস্যাধারমব্যক্তমনন্তং তমসঃ পরম্ ॥ ৭৮ ॥
প্রপশ্যন্তি পরাত্মানং জ্ঞানদীপেন কেবলম্।
প্রপদ্যে ভবতো রূপং তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদম্ ॥ ৭৯ ॥

তুমি অক্ষর পরম-তেজস্বরূপ, চিন্ময়, আকাশ, নিষ্কল, সকলের আধার, অব্যক্ত, তমোতীত ও অনন্ত। কেবল জ্ঞানদীপদ্বারা যে পরমাত্মা বিলক্ষণ অবলোকন করেন, সেই পরমপদ-স্বরূপ আপনার রূপকে আমি আশ্রয় করিতেছে ॥ ৭৮-৭৯ ॥

১১। ত্বৎপ্রসাদাদসন্দিগ্ধমুৎপন্নং পুরুষোত্তম।
জ্ঞানং ব্রহ্মৈকবিষয়ং পরমানন্দ-সিদ্ধিদম্ ॥
নমো ভগবতে তুভ্যং বাসুদেবায় বেধসে।
কিং করিষ্যামি যোগেশ তন্মে বদ জগন্ময় ॥ ৮৩-৮৪ ॥

হে পুরুষোত্তম! তোমার প্রসাদে, তোমার অনুগ্রহে আমার অসন্দিগ্ধ ব্রহ্মৈকনিষ্ঠ পরমানন্দ-সিদ্ধিপ্রদ জ্ঞান উৎপন্ন হইয়াছে। হে ভগবন্, বাসুদেব, বিধাতঃ! তোমাকে নমস্কার। হে যোগেশ, জগন্ময়! এক্ষণে আমার কি কর্ত্তব্য, সে-বিষয়ে উপদেশ প্রদান করুন ॥ ৮৩-৮৪ ॥

বাংলা-সাহিত্য সংস্কৃত-সাহিত্যের একান্ত আনুগত্য করিয়া সমগ্র ভারতে সর্ব্বোত্তম ভাষারূপে আদৃত। দুঃখের বিষয়, বাংলা-ভাষাকেও সংস্কৃত-ভাষার আনুগত্য হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া দেওয়া হইতেছে। ইহার মূলে সংস্কৃত-ভাষার প্রতি অশ্রদ্ধা ও ভারতীয় বেদ-উপনিষদ্ ও পুরাণাদির চিন্তাধারার প্রতি অবহেলাও বুঝিতে হইবে।

—শ্রীল ভক্তিপ্রজ্ঞান-কেশব গোস্বামী

শ্রীপুরুষোত্তম-মাস-কৃত্য

শ্রীপুরুষোত্তম-মাসে যে-সকল নিয়ম পালন করিতে হইবে, তাহা বাল্মীকি-কর্ত্তৃক এইরূপ কীর্ত্তিত হইয়াছে,—

হবিষ্যান্ন কাহাকে বলে

"হবিষ্যান্নং চ ভুঞ্জীত প্রযতঃ পুরুষোত্তমে।
গোধূমাঃ শালয়ঃ সর্ব্বাঃ সিতা মুদ্গা যবাস্তিলাঃ॥
কলায়-কঙ্গুনী-বারা বাস্তুকং হিলমোচিকা।
আদ্রকং কাল-শাকঞ্চ মূলং কন্দঞ্চ কর্কটীম্॥
রম্ভা সৈন্ধব-সামুদ্রে লবণে দধি-সর্পিষী।
পয়োঽনুদ্ধৃত-সারঞ্চ পনসাম্র-হরিতকী॥
পিপ্পলী-জীরকঞ্চৈব নাগরং চৈব তিন্তিড়ী।
ক্রমুকং লবলী-ধাত্রী ফলান্যগুড়মৈক্ষবম্॥
অতৈলং-পক্বং মুনয়ো **হবিষ্যং প্রবদন্তি চ।**
হবিষ্য-ভোজনং নৃণামুপবাস-সমং বিদুঃ॥"

পুরুষোত্তম-ব্রতী হবিষ্যান্ন ভোজন করিবেন। গোধূম, শালি-তণ্ডুল, মুদ্গ, যব, তিল, মটর, কাঙ্গনী-তণ্ডুল, উড়ী-তণ্ডুল, বাস্তুক-শাক, হিলমোচিকা শাক, আদ্রক, কাল-শাক, মূলক, কন্দমূল, কাঁকুড়, রম্ভা, সৈন্ধব ও সামুদ্র-লবণ, দধি, ঘৃত, অনুদ্ধৃত-দুগ্ধসার, পনস, আম্র, হরিতকী, পিপ্পলী, জীরক, শুঁঠ, তেঁতুল, ক্রমুক, আতা, আমলকী-ফল, ইক্ষুজাত চিনি, মিশ্রি, অতৈল-পক্ব ব্যঞ্জনাদি-দ্রব্য—**এই সমস্ত হবিষ্যান্ন। উপবাস ও হবিষ্যান্নে একই প্রকার ফল।**

পরিত্যাজ্য বস্তু ও আচরণ

"সর্ব্বামিষাণি মাংসঞ্চ ক্ষৌদ্রং সৌবীরকং তথা।
রাজমাসাদিকং চৈব রাজিকা মাদকং তথা॥
দ্বিদলং তিল-তৈলঞ্চ তথান্নং শাল্য-দূষিতম্।
ভাব-দুষ্টং ক্রিয়া-দুষ্টং শব্দ-দুষ্টঞ্চ বর্জ্জয়েৎ॥
পরান্নঞ্চ পরদ্রোহং পর-দার-গমং তথা।
তীর্থং বিনা প্রয়াণঞ্চ পরদেশং পরিত্যজেৎ॥
দেব-বেদ-দ্বিজানাঞ্চ গুরু-গো-ব্রতিনাং তথা।
স্ত্রী-রাজ-মহতাং নিন্দাং **বর্জ্জয়েৎ পুরুষোত্তমে॥"**

সর্ব্বপ্রকার মৎস্য ও আমিষ, মাংস, মধু, কুলকর্কটী-ফল, রাই-সর্ষপ এবং সমস্ত মাদক-দ্রব্য পরিত্যাগ করিবে। দ্বিদল অর্থাৎ চনকাদি দাল, তিল-তৈল, কাঁকরযুক্ত অন্ন, ভাব-দুষ্ট, ক্রিয়া-দুষ্ট ও শব্দ-দুষ্ট দ্রব্যসকল বর্জ্জন করিবে। পরান্ন-ভোজন, পরদ্রোহ, পরদার-গমন, তীর্থযাত্রা-বিনা দূরদেশ ও পরদেশ-গমন পরিত্যাগ করিবে। পুরুষোত্তম-মাসে দেবতা, বেদ, গুরু, গো, ব্রতী, স্ত্রীলোক, রাজা ও মহজ্জনের নিন্দা পরিত্যাগ করিবে।

আমিষ কাহাকে বলে

"প্রাণ্যঙ্গমামিষং চূর্ণং ফলে জম্বীরমামিষম্।
ধান্যে মসূরিকা প্রোক্তা অন্নং পর্য্যুষিতং তথা॥
অজা-গো-মহিষী-দুগ্ধাদন্য-দুগ্ধাদি-চামিষম্।
দ্বিজ-ক্রীতা রসাঃ সর্ব্বে লবণং ভূমিজং তথা॥
তাম্র-পাত্রস্থিতং গব্যং জলং চর্ম্মণি সংস্থিতম্।
আত্মার্থং পাচিতং চান্নমামিষং তদ্বুধৈঃ স্মৃতম্॥"

জন্তুর অঙ্গোদ্ভুত চূর্ণ—আমিষ, ও ফলের মধ্যে জম্বীর অর্থাৎ গোঁড়ানেবু—আমিষ। ধান্যের মধ্যে মসূরিকা ও পর্য্যুষিত অন্ন—আমিষ। অজা, গো, মহিষের দুগ্ধ ব্যতীত অন্য দুগ্ধই আমিষ। ব্রাহ্মণের বিক্রীত সর্ব্বপ্রকার লবণ ও ভূমিজাত লবণ, তাম্র-পাত্রস্থিত গব্য, চর্ম্মস্থিত জল ও নিজের জন্য পাচিত অন্ন—আমিষ-মধ্যে গণিত।

বর্জ্জনীয় দ্রব্যাদি

"রজস্বলাং ত্যজন্ ম্লেচ্ছ-পতিতৈর্ব্রাত্যকৈঃ সহ।
দ্বিজ-দ্বিট্-বেদ বাহ্যৈশ্চ ন বদেৎ পুরুষোত্তমে॥
এভিঃ দৃষ্টং চ কাকৈশ্চ সূতকান্নং চ যত্নবেৎ।
দ্বিপাচিতং চ দগ্ধান্নং নৈবাদ্যাৎ পুরুষোত্তমে॥
পলাণ্ডুং লশূনং মুস্তাং ছত্রাকং গৃঞ্জনং তথা।
নালিকং মূলকং শীঘ্রং বর্জ্জয়েৎ পুরুষোত্তমে॥
যদ্-যদ্ যো বর্জ্জয়েৎ কিঞ্চিৎ পুরুষোত্তম-তুষ্টয়ে।
তৎপুনর্ব্রাহ্মণে দত্ত্বা ভক্ষয়েৎ সর্ব্বদৈব হি॥"

রজস্বলা, ম্লেচ্ছ, পতিত, ব্রাত্য-ব্যক্তি, দ্বিজ-দ্বেষী, বেদ-বাহ্য, এইসকলের সহিত আলাপ করিবে না। এইসকল ব্যক্তির দৃষ্ট এবং কাক-দৃষ্ট-অন্ন, সূতকান্ন, দ্বিপাচিত-অন্ন ও দগ্ধান্ন খাইবে না। পলাণ্ডু, লসুন, মুস্তা, ছত্রাক,

গাজর, নালিতা, কেমুক-নামক-মূলক, শজিনা—**এইসমস্ত বর্জ্জন করিবে।** পুরুষোত্তম-মাস বিগত হইলে ঐ বর্জ্জিত দ্রব্যসকল ব্রাহ্মণকে দিয়া ভক্ষণ করিবে।

পুরুষোত্তম, কার্ত্তিক ও মাঘ মাসত্রয়ের একই কৃত্য ও ত্রিবিধ ব্রত

"ব্রহ্মচর্য্যমধঃ শয্যাং পত্রাবল্যাঞ্চ ভোজনম্।
চতুর্থকালে ভুক্তিং চ প্রকুর্য্যাৎ **পুরুষোত্তমে** ॥
কুর্য্যাদেতাংশ্চ নিয়মান্ ব্রতী "কার্ত্তিক-মাঘয়োঃ" ।
পুণ্যেহ্নি প্রাতরুত্থায় কৃত্বা পৌর্ব্বাহ্নিকীঃ ক্রিয়াঃ ॥
গৃহ্ণীয়ান্নিয়মং ভক্ত্যা শ্রীকৃষ্ণঞ্চ হৃদি স্মরন্।
উপবাসস্তু নক্তস্তু চৈকভুক্তস্তু ভূপতে ॥
এবঞ্চ নিশ্চয়ং কৃত্বা ব্রতমেতৎ সমাচরেৎ।"

ব্রহ্মচর্য্য অর্থাৎ অমৈথুন, অধঃশয্যা, পত্রাবলিতে ভোজন, চতুর্থযামে ভোজন **পুরুষোত্তম-মাসে** প্রশস্ত। **কার্ত্তিক** এবং **মাঘেও এই** সকল নিয়মে ব্রত করিবে। প্রাতঃকালে উঠিয়া পৌর্ব্বাহ্নিকী ক্রিয়া সমাপনপূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণকে ভক্তিপূর্ব্বক হৃদয়ে স্মরণ করিয়া পূর্ব্বোক্ত নিয়মগুলি গ্রহণ করিবে। ব্রত তিন প্রকার অর্থাৎ **উপবাস, নক্তহবিষ্যান্ন-গ্রহণ ও এক-ভোজন**—ব্রতীর পক্ষে যেটী কর্ত্তব্য বলিয়া বোধ হয়, তাহা নিশ্চয় করিয়া এই ব্রত আচরণ করিবে।

পুরুষোত্তম-মাসে শ্রীভাগবত-শ্রবণ ও ব্রত-পালনের ফল

"শ্রীমদ্ভাগবতং ভক্ত্যা শ্রোতব্যং পুরুষোত্তমে ॥
তৎপুণ্যং বচসা বক্তুং বিধাতা হি ন শক্নুয়াৎ।
শালগ্রামার্চ্চনং কার্য্যং মাসে শ্রীপুরুষোত্তমে ॥
এতন্মাসব্রতং রাজন্ শ্রেষ্ঠং ক্রতুশতাদপি।
ক্রতুং কৃত্বাপ্নুয়াৎ স্বর্গং গোলোকং পুরুষোত্তমে ॥
পৃথিব্যাং যানি তীর্থানি ক্ষেত্রাণি সর্ব্বদেবতাঃ।
তদ্দেহে তানি তিষ্ঠন্তি যঃ কুর্য্যাৎ পুরুষোত্তমম্ ॥"

পুরুষোত্তম-মাসে ভক্তিপূর্ব্বক শ্রীমদ্ভাগবত-গ্রন্থ শ্রবণ করিবে। ভাগবত-শ্রবণের পুণ্য বিধাতাও বলিতে পারেন না। ভক্তগণ শ্রীশালগ্রামশিলায় অর্চ্চন করিবেন। এই মাসে ব্রত, শত ক্রতু অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। কেননা, ক্রতু করিয়া স্বর্গলাভ হয়; (কিন্তু) যিনি পুরুষোত্তম-ব্রত করেন তাঁহার দেহে সকল তীর্থ, ক্ষেত্র ও দেবতাগণ থাকেন।

দীপ-দান ও তাহার ফল

"কর্ত্তব্যং দীপ-দানঞ্চ পুরুষোত্তম-তুষ্টয়ে।
তিল-তৈলেন কর্ত্তব্যং সর্পিষা বৈভবে সতি॥
তয়োর্ম্মধ্যে ন কিঞ্চিত্তে কাননে বসতোঽধুনা।
ইঙ্গুদীজেন তৈলেন দীপঃ কার্য্যস্ত্বয়ানঘ॥
যোগো জ্ঞানং তথা সাংখ্যং তন্ত্রাণি সকলান্যপি।
পুরুষোত্তম-দীপস্য কলাং নার্হন্তি ষোড়শীম্॥"

পুরুষোত্তম-তুষ্টির জন্য দীপ দান করা কর্ত্তব্য। বৈভব থাকিলে ঘৃত-প্রদীপ, নতুবা তিল-তৈল-প্রদীপ দেওয়া বিধেয়। হে মণিগ্রীব! তোমার বনবাসে ঘৃত ও তিল-তৈল পাওয়া যাইবে না। তুমি ইঙ্গুদি-তৈলে দীপ দান কর। অষ্টাঙ্গ-যোগ, ব্রহ্মজ্ঞান ও সাংখ্য-জ্ঞান এবং সমস্ত তান্ত্রিক-ক্রিয়া—পুরুষোত্তম-মাসে দীপ-দানের ষোড়শী কলারও তুল্য হয় না।

পুরুষোত্তম-মাসে কৃষ্ণপক্ষের চতুর্দ্দশী, নবমী ও অষ্টমী তিথির বিশেষ ক্রিয়া-প্রকরণ

এই ব্রত-উদ্‌যাপন সম্বন্ধে বাল্মীকি বলিলেন,—হে মহারাজ! কৃষ্ণপক্ষে চতুর্দ্দশী, নবমী অথবা অষ্টমী তিথিতে পুরুষোত্তম-মাসে এই ব্রতের উদ্‌যাপন করিতে হয়। বিশুদ্ধ ভক্ত-ব্রাহ্মণকে নিমন্ত্রণ করিয়া সমাহিত-মনে উদ্‌যাপন-ক্রিয়া করিবে। পঞ্চ-ধ্যানের দ্বারা অতিসুন্দর সর্ব্বতোভদ্র রচনা করিবে। চারিটী কলস মণ্ডলোপরি স্থাপনপূর্ব্বক চতুর্দ্দিকে চতুর্ব্যূহ-প্রীতি-কামনায় শ্রীফলান্বিত করিবে। সদ্বস্ত্র-বেষ্টিত পান-দ্বারা চতুর্ব্যূহ স্থাপন করিবে। শ্রীরাধা-মাধবকে কলসের সহিত স্থাপন করিবে। বেদ-বেদাঙ্গ-পারগ বৈষ্ণবাচার্য্যকে বরণ করিবে। চতুর্ব্যূহ জপ করিয়া—চতুর্দ্দিকে চারিটী দীপ প্রজ্জ্বলিত করিবে।

অর্ঘ্য-মন্ত্র ও নমস্কার-মন্ত্র

ক্রমে শ্রদ্ধা-ভক্তির সহিত সপত্নীক নারিকেলাদি অর্ঘ্য দান করিবে। **অর্ঘ্য মন্ত্র,—**

"দেব দেব নমস্তুভ্যং পুরাণ-পুরুষোত্তম।
গৃহাণার্ঘ্যং ময়া দত্তং রাধয়া সহিত হরে॥"

এই মন্ত্র বলিয়া **নমস্কার** করিবে,—

"বন্দে নবঘন-শ্যামং দ্বিভুজং মুরলীধরম্।
পীতাম্বরধরং দেবং সরাধং পুরুষোত্তমম্॥"

নীরাজন, ধ্যান ও পুষ্পাঞ্জলি-মন্ত্র

তদনন্তরে তিল-হোম করিয়া নীরাজন করিবে। **নীরাজন-মন্ত্র** এই,—

"নিরাজয়ামি দেবেশমিন্দীবর-দলচ্ছবিম্।
রাধিকা-রমণং প্রেম্ণা কোটি-কন্দর্প-সুন্দরম্॥"

অথ **ধ্যান-মন্ত্র**,—

"অন্তর্জ্যোতিরনন্ত-রত্ন-রচিতে সিংহাসনে সংস্থিতম্।
বংশীনাদ-বিমোহিত-ব্রজবধূ বৃন্দাবনে সুন্দরম্॥
ধ্যায়েদ্ রাধিকয়া সকৌস্তভমণি-প্রদ্যোতিতোরস্থলম্।
রাজদ্রত্ন-কিরীট-কুণ্ডলধরং প্রত্যগ্র-পীতাম্বরম্॥"

ধ্যান করিয়া **পুষ্পাঞ্জলি** অর্পণ করিবে ও এই মন্ত্রে **নমস্কার** করিবে,—

"নৌমি নবঘন-শ্যামং পীতবাসসমচ্যুতম্।
শ্রীবৎস-ভাসিতোরস্কং রাধিকা-সহিতং হরিম্॥"

ব্রতের শেষ-কৃত্য ও নিয়ম-ভঙ্গের বিধি

পরে ভক্ত-ব্রাহ্মণে পূর্ণপাত্র দান করিয়া আচার্য্যকে দক্ষিণা দিবে। তৎপরে দান করিবে। এই সময়ে উপযুক্ত বৈষ্ণব-ব্রাহ্মণকে ভাগবত দান করিবার বিধি করিয়াছেন। ব্রাহ্মণকে সংপুটিত কাংস্য-পাত্র দান করিবে। পরে ব্রাহ্মণদিগকে ঘৃত-পায়স ভোজন করাইবে। পরে সকলকে অন্ন বিভাগ করিয়া দিয়া স্বজনের সহিত ভোজন করিবে। উদ্যাপন করিয়া ব্রত-নিয়ম পরিত্যাগ করিবে।

—জগদ্গুরু শ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুর

———

এক জাতি

ভারতবর্ষে অতি প্রাচীনকালে 'হংস' নামে একমাত্র জাতির বাস ছিল। তাঁহারা সাধ্যায়-নিরত ব্রহ্মজ্ঞ, যোগী ও ভগবদ্ভক্ত ছিলেন। হংসগণের মধ্যে যাঁহারা ভজনবলে, যোগবলে, ব্রহ্মজ্ঞানপ্রভাবে অপরাপর স্বগোষ্ঠীর মধ্যে বিশেষত্ব প্রদর্শন করিতেন, তাঁহারাই হংসগণের দ্বারা 'পরমহংস'-শব্দে গৃহীত হইতেন। সাধারণ ব্রহ্মজ্ঞ ও যোগনিরত ভারতীয়গণের মধ্যে ভাগবত পরমহংসগণের কথা কয়েকস্থানে বিশেষভাবে উল্লিখিত হয়। ভাগবত পরমহংসগণের সহিত ব্রহ্মজ্ঞ ও যোগী পরমহংসের যে ভেদ আছে তাহা শ্রীজীব গোস্বামিপাদের 'ব্রহ্ম', 'পরমাত্মা' ও 'ভগবৎ'-শব্দে উদ্দিষ্ট অদ্বয়জ্ঞান-বস্তুতত্ত্ব-আলোচনায় ব্যাপারটী পরিস্ফুট হইয়াছে। 'ব্রহ্ম'-শব্দে অখণ্ড জ্ঞান বা পূর্ণ-চেতন, কেবল-চেতন, শুদ্ধ-চেতন, নিত্য-চেতনের পরিমাণগত বৃহত্ত্ববাচক ও পুষ্টিকারক বুঝায়। 'ব্রহ্ম' শব্দ 'জীব' শব্দ হইতে যে পার্থক্য নির্দ্দেশ করেন তাহা শ্রীমদানন্দতীর্থ পূর্ণপ্রজ্ঞ মধ্ব ভগবান্ স্বীয় অনুগতজনের হৃদয়ে পূর্ণ বিকশিত করিয়াছেন। জীবের স্বরূপে তিনি অখণ্ড জ্ঞান নির্দ্দেশ করেন নাই। জীব-স্বরূপে খণ্ডজ্ঞানময় বস্তু বলিয়া তাহার কোন সময় অখণ্ডজ্ঞানের অন্তর্গত পরিচয়, কখনও বা খণ্ডজ্ঞাতৃ-সূত্রে ব্রহ্ম বলিয়া ভ্রান্তি এবং কখনও বা অব্রহ্ম বলিয়া ব্রহ্মের বিপরীত ধর্ম্মাবলম্বী জড়াভিমান। জড়াভিমানের আনুগত্য পরিহার করিলেই জীবের বৈষ্ণব বলিয়া অনুভূতি। তখন চিন্ময় স্বভাবক্রমে জড়াকাঙ্ক্ষা জড়াভাব তাঁহাকে আক্রমণ করিতে পারে না। জীবের ব্রহ্মজ্ঞানাভাবই তাঁহাকে অব্রহ্মজ্ঞ করিয়া তুলে। তিনি ব্রহ্মেতর বস্তু গ্রহণ করিয়া কোন সময়ে আপনাকে ব্রহ্মত্বে স্থাপন করিতে ব্যস্ত, কখনও বা দৃশ্য-জগতের বিবর্ত্তময় অনুভূতিতে ব্রহ্ম বলিতে উদ্গ্রীব, কখনও বা কামকামী হইয়া বিবর্ত্ত পরিহারপূর্ব্বক ভাগবানের মায়াশক্তিকে ব্রহ্ম দর্শন করিবার জন্য দৃঢ়সঙ্কল্পবিশিষ্ট। অতাত্ত্বিকগণ নিজ নিজ গুরুর প্রতি অবজ্ঞা করিয়াই নিজ অক্ষজ-জ্ঞানবিকাশ-ফলে অধিরোহবাদ অবলম্বন করেন ও দৃশ্যজগতে বিচরণ করিয়াও আপনাদিগকে ব্রহ্মজ্ঞ বলিয়া অযথা শ্লাঘা করেন। ব্রহ্মজ্ঞ বলিয়া পরিচয় দিয়াও হংস, অপ্রকটিত-বৈশিষ্ট্যাকারবিশেষ ব্রহ্মকে ভগবানের অসম্যগ্ আবির্ভাব বলিয়া সুস্পষ্টভাবে জানেন।

কতিপয় হংস মায়াশক্তি প্রচুর চিচ্ছক্তির অন্তর্যামিত্বময় বিশেষকে পরমাত্মা বলিয়া জানিয়া মায়াশক্তি-পরিণত দৃশ্যজগতের অনুশীলন হইতে বিযুক্ত হন।

সেই বিয়োগ-সিদ্ধিই তাঁহাকে পরমাত্ম-যোগনিরত যোগী করিয়া তুলে। ব্রহ্মজ্ঞ স্বসিদ্ধিতে এবং যোগী নিজ সিদ্ধিকালে যে অবস্থা লাভ করেন, তাহা হইতে ভগবজ্‌জ্ঞান-লাভ ও ভগবানে ভক্তিযোগ তাঁহার পক্ষে সুদুরূহ নহে, বরং তাঁহাদের উত্তরোত্তর সমৃদ্ধিমাত্র। ভগবদ্‌ভক্ত বা ভাগবত-পরমহংস ব্রহ্মজ্ঞ-হংস ও যোগী-হংসের উৎকৃষ্ট উন্নতির স্তর মাত্র। ভক্ত বা ভাগবত-পরমহংস নিম্নে অবতরণ করিলে বা তত্তৎস্থানস্থিত দ্রষ্টার নিকট অব্রহ্মজ্ঞ বা কুযোগী নহেন। ভাগবত-পরমহংস উৎকৃষ্ট যোগী ও পরমোন্নত ব্রহ্মজ্ঞ। তাঁহাকে যোগী বা ব্রহ্মজ্ঞ অপেক্ষা ন্যূন জ্ঞান করা উচিত নহে।

হংস ব্রহ্মজ্ঞ যেকালে নিজের হংসত্ব, ব্রহ্মজ্ঞান বা সমত্ব পরিহার করিয়া নিজের ব্যক্তিগত গৃহ্যোক্ত ব্যবহার গ্রহণ করেন এবং অপর হংসগণের মধ্যে স্বীয় পার্থক্য-স্থাপনে যত্নবান্ হন, সেইকালেই গুণ-কর্ম্মবিভাগক্রমে চারিটী ধর্ম্ম ও চারিটী আশ্রম পরিলক্ষিত হয়। সত্যযুগে হংস বর্ণ বা একবর্ণ মাত্র অবস্থিত ছিল; পরে ১৭২৮০০ সৌরবর্ষ অতীত হইলে হংসজাতির মধ্যে বর্ণবিভাগ প্রবর্ত্তিত হয়। বৃত্ত, স্বভাব ও লক্ষণ এবং ভাবি উপযোগিতার সম্ভাবনা প্রভৃতির বিচারমুখেই এই বিভাগ কার্য্যে পরিণত হয়। সাধ্য ও সিদ্ধ বা বিবিৎসা ও বিদ্বৎ-প্রণালীতে যে কার্য্যগত ভেদ আছে, তদ্দ্বারা দুইপ্রকার বর্ণ ও আশ্রম নিরূপিত হইয়া থাকে। ভাবি উপযোগিতার সম্ভাবনা-বিচারে শৌক্রপদ্ধতিতে বর্ণ-নিরূপণ-প্রথা দেশাচারের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে; আবার বৃত্ত স্বভাব ও লক্ষণ শৌক্রপদ্ধতিকে চিরদিনই পুষ্ট করিয়াছে।

ঐতরেয় ব্রাহ্মণ-লিখিত কবষের কথা, ছান্দোগ্য উপনিষৎ-লিখিত জাবালের কথা অনুশীলন করিলে আমাদের কেবল শৌক্রপদ্ধতির বিচার সুষ্ঠুতা লাভ করে। শ্রীমহাভারত, হরিবংশ, অষ্টাদশ-পুরাণ প্রভৃতি সকলেই একবাক্যে উভয়প্রকার প্রণালীমতেই বর্ণ ও আশ্রমের বিভাগ উল্লিখিত করিয়াছেন। উহা যে একবার মাত্র ত্রেতা-প্রারম্ভে নিরূপিত হইয়া শৌক্র-পদ্ধতিমতে চিরদিন চলিবে এবং মূল প্রয়োজন বিনষ্ট হইয়া মাছিমারা কেরাণীগিরিই অক্ষুণ্ণ রাখিতে হইবে—এরূপ কথা সত্যপ্রিয় ভারতীয় হংসজাতি স্বীকার করেন না। কল্পশাস্ত্র, গোভিল-কাত্যায়নাদি গৃহ্যসূত্র-সংকলিত বেদবাণীতে যে অষ্টবর্ষেই ব্রাহ্মণের উপনয়ন-বিধি নির্দ্দিষ্ট আছে, তাহা সাধ্য, বিবিৎসোত্থ বা প্রস্তাবমাত্র। হংস জাতি সকলেই সমান হইলেও যখন গৃহ্যোক্ত নির্দ্দিষ্ট প্রণালীর বিধিগ্রহণ করিতে যাঁহারা প্রস্তুত, তাঁহারা ও তাঁহাদের অধস্তন ভাবী ব্রাহ্মণ-সংজ্ঞাবিশিষ্ট, বলিয়া প্রস্তাবিত ব্রাহ্মণ। ব্রাহ্মণ বা দ্বিজজাতিরই গৃহ্যোক্ত সংস্কার আবশ্যক।

যাঁহারা সংস্কার-গ্রহণে অযোগ্য ও অসম্মত, ব্রহ্মজ্ঞ হইতে যাঁহাদের কোন প্রবৃত্তিই দেখা যায় না, তাঁহারা হংসজাতির মধ্যে সংস্কার-বর্জ্জিত অদ্বিজ বা শৌক্র অধস্তন মাত্র। দ্বিজেরই গৃহ্যোক্ত-বিধি পালনীয়। যাঁহারা পালন করিলেন, তাঁহাদের কুলগত প্রথানুসারে দ্বিজত্ব চলিতেছিল। যে হংস, দ্বিজগণকর্ত্তৃক 'শূদ্র'-শব্দে সংজ্ঞিত হইলেন, তাঁহারা নিজ নিজ আলস্যক্রমেই হউক বা বিদ্বেষের বশবর্ত্তী হইয়াই হউক, স্ব-স্ব-স্বভাবে অবস্থিত হওয়ায় তাহাদের দ্বিজত্ব ঘটে নাই। তাঁহাদের বংশধরগণ যেকালে গৃহ্যোক্ত সংস্কারের পক্ষপাতী হইবেন, তখন তাঁহারা নিজ নিজ বৃত্ত, স্বভাব বা লক্ষণে পুনরায় পরিদৃষ্ট হইবার সুযোগ হইতে বঞ্চিত হইবেন না।

হংস জাতির মধ্যে ব্রহ্মজ্ঞ, যোগী ও উপাসকের বৃত্ত, স্বভাব ও লক্ষণ চিরদিনই বর্ত্তমান আছে, থাকিবে এবং ছিল। সনাতন-প্রথা-মতে যখন বর্ণাশ্রম-বিভাগ প্রবলভাবে প্রচলিত ছিল না, সেইকালে হংসগণই ভাগবত পরমহংসতা লাভ করিতেন। নিম্নস্তরে কিঞ্চিদ্ ভগবদনুশীলনরত যোগনিরত সম্প্রদায়ে ও তন্নিম্নস্তরে জ্ঞাননিরত ব্রহ্মজ্ঞ সম্প্রদায়েও পরমহংস দেখা যাইত। কিন্তু বিশ্বব্যাপী হংসজাতির মধ্যে ব্রহ্মজ্ঞ-ধর্ম্মও যখন ক্রমশঃ বিস্মৃতির অতল জলধি-গর্ভে ভাসিয়া যাইতে আরম্ভ করিল, তখন নিরীশ্বর নাস্তিক্যবাদের প্রসার আরম্ভ হইল—শ্রীগুরুদেবের বাক্য বিপর্য্যস্ত হইল, আম্নায়ের বেদের নিরস্তকুহক সত্যের অমর্য্যাদা হংসজাতির কতিপয়ের হৃদয়ে কুজ্ঝটিকার ন্যায় আচ্ছাদন করিল। তাঁহারা নিজ নিজ অক্ষজ-জ্ঞানে প্রতারিত হইয়া সত্যের অনাদর করিতে আরম্ভ করিলেন। এইরূপ একমাত্র হংসজাতি চারি বর্ণে বিভক্ত হইয়াছেন।

—জগদ্গুরু শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর

ভগবদনুশীলন

শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা তাঁহার বর্ত্তমান বর্ষের প্রথম সংখ্যাতেই পৃথিবীতে যতপ্রকার নাস্তিকতা আছে তাহার স্বরূপ নিরপেক্ষ পাঠকগণের সম্মুখে উপস্থাপিত করিবেন বলিয়া জানাইয়াছেন। 'অস্তি' এমন বস্তুর অস্বীকার-কারীই 'নাস্তিক' বলিয়া বর্ত্তমান ধর্ম্ম-প্রগল্‌ভতার যুগে, অত্যন্ত আদর লাভ করায় গৌড়ীয়ের চেতনময়ী লেখনী সচলা হইয়া উঠিয়াছে। পাশ্চাত্ত্য দেশে

একটী প্রবাদ আছে "Pen is mightier than the sword." অর্থাৎ তরবারি অপেক্ষা লেখনী শক্তিশালিনী। পাশ্চাত্ত্য দেশ যাহারা অত্যন্ত জড়বাদী তাহারা শব্দের এবম্বিধ প্রাধান্য কেমন করিয়া দিতে শিক্ষা করিল জানি না, তবে ভারতবর্ষের উন্নততম চিন্তায় শব্দের মাহাত্ম্য এবং স্বতঃপ্রামাণ্যের বহুল সংবাদ আমরা বেদাদি অপৌরুষের সাহিত্য হইতে জানিতে পারি। ধর্ম্ম ও অধর্ম্মের চূড়ান্ত বিচারের জন্য ধর্ম্মক্ষেত্র কুরুক্ষেত্রে নিকটাগত কলির মূর্ত্ত প্রতীক দুর্য্যোধন কার্ষ্ণ অর্জ্জুনাদির নিকট নিদারুণভাবে পরাজিত হইয়াছিল। সেইখানে আমরা দেখিতে পাই, প্রত্যহ দশ সহস্র সৈন্য বধ করিতে প্রতিজ্ঞা-কারী দ্রোণাচার্য্য "অশ্বত্থামা হতঃ" সামান্য এই শব্দদ্বয় শ্রবণ করিয়া অস্ত্র সঞ্চালনে সম্পূর্ণ অক্ষম হইয়া প্রাণত্যাগ করিয়াছিলেন। লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, "অশ্বত্থামা হতঃ" শব্দদ্বয়ের উচ্চারণকর্ত্তা কোনও গণ-সামান্য ছিলেন না, দ্বাপরের ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির, যিনি ন্যায়-নীতির সর্ব্বোচ্চ শিখরে আরোহণ করিয়াছিলেন, তিনিই এই শব্দদ্বয়ের বাহক।

সুতরাং "Pen is mightier than the sword" এই প্রবাদটীর আলোচনা করিতে বসিয়া আমরা কোন প্রকার নাস্তিক লোকের লেখনীর প্রশংসা করিব না, বা করিতে পারি না। নাস্তিক লোক প্রতিষ্ঠাকামী। 'অস্তি' বস্তুর উপর মিথ্যা নঞর্থক ধারণা করা কোন সভ্য লোকের সমীচীন নহে। জড়ের সমীক্ষকই বলেন, জড় বস্তু ধ্বংসশীল। "অস্তি" এমন বস্তু ধ্বংসশীল নহে বলিয়াই জড় হইতে পারে না, উহা নিত্য। হরি ও জীবাত্মাই সেই বস্তু। অতএব ভগবানের অনুশীলন করিতে যাইয়া আমরা নাস্তিকের নিকট ঋণ করিবার আশা পোষণ করি না। তবে স্বভাবগত দোষে আস্তিক লোকের নিকটও নাস্তিক ব্যক্তি পসার জমাইতে চায়—ইহাই হাস্যাস্পদ।

নাস্তিক লোক হরি-অন্বেষণের ভাণ করে কেন? ইহার উত্তর অতীব সহজ। 'অস্তি' কি তাহা জানিতে না পারিলে 'নাস্তি' বলা যাইবে না। সুতরাং হরি ও হরি-সম্বন্ধীয় বস্তুর দুয়ারে হানা দেওয়া নাস্তিক লোকের স্বভাব। সে সর্ব্বপ্রকারে হরি-বিরোধী কার্য্য করিতে থাকে। লেখনীকেও সে তাহার সহায়করূপে গ্রহণ করিয়া থাকে। এইজন্য নাস্তিক লোকের লেখনী পাঠ করিয়া মানুষ ভগবদ্বিশ্বাস হারাইয়া ফেলে। যাহারা নাস্তিক হইতে চায়, অথচ জগতের নিকট নাস্তিক বলিয়া পরিচয় দিতে লজ্জা বোধ করে, তাহারা নাস্তিকের লেখায় যেখানে ঈশ্বরের বিষয়ে আলোচনা আছে তাহা পাঠ করে, ভোটের জোরে নাস্তিক লোককে ভক্ত দাঁড় করাইয়া

আস্তিককেই নাস্তিক বলিতে চায়। নাস্তিকের শাস্ত্র আলোচনা কপটতা মাত্র। ভ্রমর ও লুতাকীট উভয়েই ফুলে ফুলে ঘুরিয়া বেড়ায়। ভ্রমর ফুলের মধু অন্বেষণ করে, আর লুতাকীট ফুলকে নষ্ট করিবার জন্য মাৎসর্য্যপূর্ণ হৃদয়ে ফুলের উপর বসে। পাষণ্ডের শাস্ত্রালোচনাও তদ্রূপ। সম্প্রতিকালে কোন এক বিশিষ্ট রাজনীতিবিদের মৃত্যুর পর সংবাদপত্রে দেখা গেল যে, তাঁহার শয্যার পার্শ্বে গীতা ধর্মগ্রন্থখানি ছিল। অথচ তাঁহার সমস্ত জীবন ধরিয়া বলিয়াছেন, ধর্ম্ম কাপুরুষের জন্য। সুতরাং তিনি কিরূপে গীতা স্পর্শ করিতে পারেন ? যদি ঘটনাটি সত্যও হয়, তবে উহা লুতাকীটের পুষ্পের উপর উপবেশন বুঝিতে হইবে।

এক দেশে এক বিরাট্ ধনী লোক বাস করিত। লোকটী অত্যন্ত বুদ্ধিমান ছিল এবং ধনী হইলেও খুব কৃপণ ছিল। উহার দুইজন প্রধান কর্ম্মচারী ছিল। তাহারাও অত্যন্ত কৃপণ ছিল। একবার উক্ত ধনী লোকটী একটী উৎসব করিয়া স্বীয় কার্পণ্যদোষ অপনোদন করিতে মনস্থ করিল। কিন্তু অর্থ ব্যয় না করিয়াই যাহাতে উৎসব হইতে পারে, সেই ইচ্ছা তাহার একেবারে নষ্ট হইল না। তথাপি তাহার কৃপণ কর্ম্মচারী দুইটীকে বাজারে পাঠাইল এবং বলিয়া দিল—খুব ভাল দ্রব্য বাজার হইতে ক্রয় করিয়া আনিবে। ব্যয়কুণ্ঠ কর্ম্মচারী দুইটী পয়সা ব্যয় করিতে নারাজ। যাহা হউক, দুইজনে বাজার হইতে ফিরিয়া আসিয়া দুইটী কৈফিয়ৎ দিল। একজন বলিল, বাজারে ভাল দ্রব্য নাই। আর একজন বলিল, ভাল দ্রব্য বলিয়া কিছু দেখিলাম না, যাহা যাহা পাওয়া যাইতেছে সবই সমান বলিয়া বোধ হইল, একটী হইতে আর একটীর তফাৎ নাই। বুদ্ধিমান মালিক স্বীয় উদ্দেশ্য সাধন হইল জানিয়া মনে মনে সন্তুষ্ট হইলেন। তথাপি মৌখিক জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমাদের উক্তি দুই প্রকার হইলেও মূলতঃ একই ; কারণ কেহই আমাকে আমার আদিষ্ট দ্রব্যগুলি সংগ্রহ করিয়া আনিলে না।

ভগবদনুশীলনে রত হইয়া জগতের নাস্তিকগণ ঐ কৃপণ কর্ম্মচারিদ্বয়ের ন্যায় মন্তব্য করিয়া থাকে। তাহাতে যাহারা প্রকৃত ভগবদনুশীলন করিতে চাহে না, তাহারা আনন্দ প্রকাশ করিয়া থাকে এবং ঐপ্রকার মন্তব্যকেই ভগবৎসিদ্ধান্ত বলিয়া প্রচার করে। আমরা ঐপ্রকার দুইটী মতের সমানতা প্রদর্শন করিব। পূর্ব্ব মত দুইটীর একটীতে সরাসরি দ্রব্য নাই এবং অপরটীতে 'সব দ্রব্যই ভাল, ইহার সহিত অন্যের কোন পার্থক্য নাই' উক্ত হইয়াছে। প্রথমজন বোকা, সেইজন্য ভাল দ্রব্য নাই বলিয়া ধ্বনি তুলিয়াছে।

বুদ্ধিমান এবং চাপা দ্বিতীয় কর্ম্মচারী চিন্তাসহকারে পরে উত্তর দিল যে, সমস্ত দ্রব্যই ভাল, অর্থাৎ যাহা খুশী তাহাই ক্রয় করিতে পারা যায়। মূল ভাবটী এই যে, অধিক মূল্যের দ্রব্য ক্রয় করিবার আবশ্যকতা নাই। 'সব ধর্ম্মই সমান' উক্তিকারীও তদ্রূপ।

কোন কোন নাস্তিক বলিয়া থাকে ঈশ্বর নাই, পরলোক নাই। লোকায়ত (চার্ব্বাক) দর্শন এই শ্রেণীর। "যাবজ্জীবং সুখং জীবেৎ"—এই তাঁর নীতি। চার্ব্বাক অত্যন্ত প্রত্যক্ষবাদী। কালক্রমে ঐ মত বিভিন্ন আচার্য্য-কর্ত্তৃক ভীষণভাবে নিন্দিত হইলে বর্ত্তমানের নাস্তিকগণ লূতাকীটের পন্থা অবলম্বন করিয়াছে। উক্ত দ্বিতীয় কর্ম্মচারীটীর ন্যায় তাহারা বলে, প্রত্যেকেই ভগবান্—Everybody is God. শিক্ষিত সমাজ কি একটু বিচারও করিবেন না? ভগবান্ নাই এবং প্রত্যেকেই ভগবান্—উক্তিদ্বয় একই,—ইহা নহে কি? প্রত্যেক জীবমাত্রই যদি ভগবান্ হইয়া থাকে তাহা হইলে ভগবানের সেবা আর কে না করে? চেতন বস্তুমাত্র জীব, প্রত্যেকে নিজ নিজ সুখ উৎপাদনে সচেষ্ট। সুতরাং ঈশ্বরসেবা ত' প্রত্যেকেরই হইল? এই সকল চিন্তা কি কপটতার আকর নহে? পরস্পরের মধ্যে ভেদ-বৈশিষ্ট্য না থাকিলে 'প্রত্যেক' শব্দটির সৃষ্টি কি করিয়া সম্ভব? যাহারা নাস্তিক হইতে চাহে, নাস্তিকতার বৃদ্ধিসাধনে যাহারা তৎপর, তাহারা ভিন্ন আর কে বলিবে যে জীবমাত্রই শিব, ভগবান্? বিশেষতঃ গৃহত্যাগী সন্ন্যাসীর পক্ষে "জীবই ভগবান্" বলা স্ববিরোধ। যদি তাহাই হইত, সেই বিশ্বাস যদি তাহার প্রকৃতই থাকিত, তবে তিনি গৃহ-ত্যাগ করিলেন কেন? গৃহের মাতা, পিতা, স্ত্রী, বন্ধুবর্গ সকলেই ত' ভগবান্—তাহাদের সেবা করিলেই ত' ভগবানের সেবা হইয়া যাইত। তবে আবার লাল কাপড় পরিবার কপটতা কেন? ইহা উদ্দেশ্য-সাধনে ব্যর্থ জীবের উক্তি নহে কি? প্রত্যেকেই ভগবান্ আর প্রত্যেকের মধ্যেই ভগবান্ আছেন—এই দুইটী পৃথক্ কথা। প্রত্যেকের মধ্যে ভগবান্ আছেন বলিয়া প্রত্যেকের সেবাবিধান কি-প্রকারে ভগবানের সেবা হইতে পারে?

কুক্কুরগুলি বিষ্ঠা গ্রহণ করে এবং উহাদের জীবনও তাহাতে রক্ষিত হয়। সুতরাং বিষ্ঠাতেও মনুষ্যাদি জঙ্গম প্রাণীর জীবনধারণের উপাদানগুলি আছে বুঝা যায়, কিন্তু তজ্জন্য বিষ্ঠা মানুষ বা মানবেতর কোন উচ্চ প্রাণীর আহার্য্য হইতে পারে না এবং মানুষ যে খাদ্যদ্রব্য গ্রহণ করিয়া থাকে তাহার সহিত কুক্কুরের ভক্ষ্য বিষ্ঠা সমতুল্য হইতে পারে না। যদি কেহ সব খাদ্যদ্রব্যই সমান

বলিয়া থাকে, সে পাগল বা তজ্জাতীয় কোন বিকৃত মস্তিষ্ক হইবে। তাহাকে মানুষ বলা কোনও ক্রমে যাইবে না, যাইতে পারে না। সেইপ্রকার একের বাঞ্ছাপূরক ধর্ম্মকে অন্যের ধর্ম্মের সহিত সমান জ্ঞান করা যায় না। যদি কেহ সেইরূপ উক্তি করিয়া থাকেন, তিনি পূর্ব্বের উদাহরণের শিকার হইবেন না কেন—সুধী পাঠকবর্গ তাহার কৈফিয়ৎ তলব করিবেন। সুতরাং সব ধর্ম্ম সমান—ইহা কোন শাস্ত্র ও যুক্তিসিদ্ধ হইতে পারে না। প্রত্যেক জীবও ভগবান্ হইতে পারে না। এইরূপ উক্তি মিথ্যাবাদীরাই করিতে পারে। কোন পাত্রের মধ্যে তৈল আছে বলিয়া পাত্রটীই তৈল বা তৈলই পাত্র—এরূপ বলা যেমন মূর্খতা, তদ্রূপ জীবের মধ্যে ভগবান্ আছেন বলিয়া জীবই ভগবান্ বা ভগবানই জীব একথা বলা মূর্খতা। আধার ও আধেয় কখনই এক নহে। ইহাতে ভগবানের একত্বে বহুত্বের দোষও আপতিত হয়। সুতরাং ভগবান্ নাই এবং প্রত্যেকেই ভগবান্—ইহা একই কথা, উক্তিদ্বয়ে বিন্দুমাত্র পার্থক্য নাই। ইহাই নাস্তিকতার প্রতীক।

—জগদ্গুরু শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী

ব্রহ্ম, পরমাত্ম ও ভগবত্তত্ত্ব

[পূর্ব্বপ্রকাশিত ৪৩শ বর্ষ, ১ম সংখ্যা, ১৫ পৃষ্ঠার পর]

গীতোপনিষদেও ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ নিজমুখে জানাইয়াছেন যে, জ্ঞানীদিগের উপাস্য নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মেরও তিনিই (শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রই) একমাত্র প্রতিষ্ঠা বা আশ্রয়—

ব্রহ্মণোহি প্রতিষ্ঠাহহমমৃতস্যাব্যয়স্য চ।
শাশ্বতস্য চ ধর্ম্মস্য সুখস্যৈকান্তিকস্য চ॥ (গীঃ ১৪।২৭)

সবিশেষতত্ত্ব আমিই জ্ঞানীদিগের চরম গতি নির্গুণ ব্রহ্মের প্রতিষ্ঠা বা আশ্রয়। অমৃতত্ব, অব্যয়ত্ব, নিত্যত্ব, নিত্যধর্ম্মরূপ প্রেম এবং ঐকান্তিক সুখরূপ ব্রজরস—সমুদয়ই এই নির্গুণ সবিশেষতত্ত্বরূপ শ্রীকৃষ্ণকে আশ্রয় করিয়া থাকে।

উপর্য্যুক্ত শাস্ত্রীয় প্রমাণাবলী হইতে অবগত হওয়া যাইতেছে যে, নির্গুণ ব্রহ্মতত্ত্ব সবিশেষ পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গপ্রভা বা অসম্যক্ প্রতীতি মাত্র। সবিশেষ পরব্রহ্মই মূল বস্তু। নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম তাঁহার অসম্যক্ প্রকাশ মাত্র। পরব্রহ্ম ভগবানের অস্তিত্ব ব্যতীত নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মের পৃথক্ অস্তিত্বের অভাবই দৃষ্ট হইতেছে। সুতরাং শ্রীকৃষ্ণই যে পরতমতত্ত্ব ইহাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মহাজনানুমোদিত।

পরমাত্মতত্ত্বের অনুসন্ধান করিলেও আমরা জানিতে পারিব যে, পরমাত্মা সেই আদিপুরুষ শ্রীকৃষ্ণেরই আংশিক প্রতীতি। গীতাতে পরমাত্মতত্ত্বের কার্য্য ও পরিচয় স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ এই প্রকারে জানাইয়াছেন—

অথবা বহুনৈতেন কিং জ্ঞাতেন তবার্জ্জুন।
বিষ্টভ্যাহমিদং কৃৎস্নমেকাংশেন স্থিতো জগৎ॥ (গীঃ ১০।৪২)

অধিক কি বলিব, হে অর্জ্জুন! আমার প্রকৃতি সর্ব্বশক্তিসম্পন্না। তাহার এক আংশিক প্রভাবদ্বারা আমি সারা জগতে প্রবিষ্ট হইয়া পরমাত্মারূপে বর্ত্তমান।

পুনরায় বলিতেছেন,—

ঈশ্বরঃ সর্ব্বভূতানাং হৃদ্দেশেঽর্জ্জুন তিষ্ঠতি।
ভ্রাময়ন্ সর্ব্বভূতানি যন্ত্রারূঢ়ানি মায়য়া॥ (গীঃ ১৮।৬১)

হে অর্জ্জুন! সর্ব্বজীবের হৃদয়ে পরমাত্মরূপে আমি অবস্থিত। আমার অংশ পরমাত্মাই সর্ব্বজীবের নিয়ন্তা ও ঈশ্বর। যন্ত্রারূঢ়বস্তু যেমন ভ্রামিত হয়, জীবসকলও তদ্রূপ ঈশ্বরের সর্ব্বনিয়ন্তৃত্ব ধর্ম্ম হইতে জগতে ভ্রামিত হয়।

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতকার বলিতেছেন,—

পরমাত্মা যিঁহ, তিঁহো কৃষ্ণের এক অংশ।
আত্মার আত্মা হন কৃষ্ণ,—সর্ব্ব-অবতংশ॥ (চৈঃ চঃ মঃ ২০।১৬১)

ভাগবতে যোগী-পুরুষগণের ধ্যেয় পরমাত্ম-তত্ত্ব-সম্বন্ধে এইরূপ বলিয়াছেন—

কেচিৎ স্বদেহান্তর্হৃদয়াবকাশে প্রাদেশমাত্রং পুরুষং বসন্তম্।
চতুর্ভুজং কঞ্জরথাঙ্গশঙ্খগদাধরং ধারণয়া স্মরন্তি॥ (ভাঃ ২।২।৮)

কোন কোন যোগীপুরুষ স্ব-স্ব দেহে হৃদয়গহ্বরে বিরাজিত চতুর্ভুজ, শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মধৃক্ অঙ্গুষ্ঠ পরিমিত পুরুষকে ধারণার দ্বারা স্মরণ করেন।

শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী প্রভু শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করিতে গিয়া তাঁহাকে পরতমতত্ত্বরূপে নির্দ্ধারণ করিয়া ব্রহ্ম, পরমাত্মা ও ভগবৎ-স্বরূপ সম্বন্ধেও এইপ্রকার বর্ণনা করিয়াছেন,—

যদদ্বৈতং ব্রহ্মোপনিষদি তদপ্যস্য তনুভা
য আত্মান্তর্যামী-পুরুষ ইতি সোঽস্যাংশ-বিভবঃ।
ষড়ৈশ্বর্য্যৈঃ পূর্ণো য ইহ ভগবান্ স স্বয়ময়ং
ন চৈতন্যাৎ কৃষ্ণাজ্জগতি পরতত্ত্বং পরমিহ॥

উপনিষদ্গণ যাঁহাকে অদ্বৈতব্রহ্ম বলেন, তিনি আমার প্রভুর অঙ্গকান্তি।

যাঁহাকে যোগশাস্ত্রে অন্তর্যামী পুরুষ বা পরমাত্মা বলেন, তিনি আমার প্রভুর অংশস্বরূপ। যাঁহাকে ব্রহ্ম ও পরমাত্মার আশ্রয় ও অংশীস্বরূপ ষড়ৈশ্বর্য্যপূর্ণ ভগবান্ বলেন, আমার প্রভু অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু সেই স্বয়ং ভগবান্। অতএব শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য অপেক্ষা জগতে আর পরতত্ত্ব নাই।

পরতম-তত্ত্ব যে স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ, সে সম্বন্ধে শ্রীমদ্ভাগবত বলিতেছেন,—

এতে চাংশকলাঃ পুংসঃ কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ম্।
ইন্দ্রারিব্যাকুলং লোকং মৃড়য়ন্তি যুগে যুগে॥ (ভাঃ ১।৩।২৮)

পূর্ব্বে যে-সকল অবতারের বিষয় কীর্ত্তন করা হইয়াছে, তাঁহাদের মধ্যে কেহ বা পুরুষাবতার কারণার্ণবশায়ী মহাবিষ্ণুর অংশ, কেহ বা আবেশাবতার। এই সকল অবতার দৈত্য-নিপীড়িত জগৎকে রক্ষা করিবার নিমিত্ত প্রতিযুগে অবতীর্ণ হন। কিন্তু ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান্, অবতারগণের মূল পুরুষ, আদ্য-পুরুষাবতার মহাবিষ্ণুরও আদি বা মূল।

ব্রহ্মসংহিতা-গ্রন্থেও শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রকেই সকল ঈশ-তত্ত্বের ঈশ্বর বা পরমেশ্বর বলিয়া নির্দ্ধারণপূর্ব্বক, তিনি যে সকল কারণের কারণ ও আদি পুরুষ, তাহা স্পষ্টভাবে ব্যক্ত করিয়াছেন। যথা—

ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহঃ।
অনাদিরাদির্গোবিন্দঃ সর্ব্বকারণ-কারণম্॥ (ব্রঃ সঃ ৫।১)

সৎ, চিৎ ও আনন্দময় বিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণই পরমেশ্বর। তিনি স্বয়ংরূপ অনাদি এবং সর্ব্ব বিষ্ণু ও বৈষ্ণবতত্ত্বের আদি এবং সর্ব্বকারণের কারণ।

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতকার শ্রীকৃষ্ণতত্ত্ব সম্বন্ধে বলিতেছেন,—

ঈশ্বর পরম কৃষ্ণ, স্বয়ং ভগবান্।
সর্ব্ব-অবতারী, সর্ব্বকারণ-প্রধান॥
অনন্ত বৈকুণ্ঠ আর অনন্ত অবতার।
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড ইহা, সবার আধার॥
সচ্চিদানন্দ তনু, ব্রজেন্দ্রনন্দন।
সর্ব্বৈশ্বর্য্য-সর্ব্বশক্তি-সর্ব্বরস-পূর্ণ॥ (চৈঃ চঃ মঃ ৮।১৩৩-১৩৫)

উপর্য্যুক্ত প্রমাণাবলী হইতে ইহাই জানা যাইতেছে যে, শ্রীকৃষ্ণই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আরাধ্যতত্ত্ব। শ্রীভগবত্তত্ত্বমাত্রই আরাধ্যতত্ত্ব হইলেও শ্রীকৃষ্ণই সকল ভগবৎ-তত্ত্বেরও মূল পুরুষ, সুতরাং তিনিই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ; অতএব একমাত্র আরাধ্যতত্ত্ব।

—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসৌরভ ভক্তিসার মহারাজ

———

অবতার ও বঞ্চক

সাত্বত-শাস্ত্রে ষড়্বিধ অবতারের কথাই পাওয়া যায়। অবতারী শ্রীকৃষ্ণ হইতেই তাঁহাদের প্রাকট্য—

অবতার হয় কৃষ্ণের ষড়্বিধ প্রকার।
পুরুষাবতার এক লীলাবতার আর॥
গুণাবতার আর মন্বন্তর অবতার।
যুগাবতার আর শক্ত্যাবেশ অবতার॥

বাসুদেবঃ সঙ্কর্ষণঃ প্রদ্যুম্নোঽনিরুদ্ধোঽহং মৎস্যঃ কূর্ম্মঃ বরাহঃ।
নৃসিংহো বামনো রামো রামো বুদ্ধঃ কল্কিরহমিতি॥

অবতারী ভগবান্ বলিতেছেন,—আমি বাসুদেব, সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন, অনিরুদ্ধ; আমি বলদেব, মৎস্য, কূর্ম্ম, বরাহ, নৃসিংহ, বামন, পরশুরাম ও রাম এবং আমি কল্কি, আমি বুদ্ধ। এই সকল অবতার বদ্ধজীবের ন্যায় জন্মগ্রহণ করেন না। বদ্ধজীবের ন্যায় ইহাঁদের জ্ঞান বদ্ধ ও মুক্ত হয় না। ইহাঁদের সকলেই পূর্ণ, অজর, অমৃত, পরতত্ত্ব ও পরমানন্দ-স্বরূপ।

ইহাঁরা সকলেই প্রপঞ্চাতীত বস্তু। পরব্যোমে সকলেরই প্রকোষ্ঠ রহিয়াছে। তাঁহারা ধর্ম্মস্থাপন ও অধর্ম্ম বিনাশোদ্দেশ্যে ইহজগতে অবতরণ করেন বলিয়া তাঁহাদিগকে অবতার বলে,—

সৃষ্টিহেতু যেই মূর্ত্তি প্রপঞ্চে অবতরে।
সেই ঈশ্বরমূর্ত্তি 'অবতার' নাম ধরে॥
মায়াতীত পরব্যোমে সবার অবস্থান।
বিশ্বে অবতরি' ধরে অবতার নাম॥

ষড়্বিধ অবতারের মধ্যে সমস্তই অনুস্যূত রহিয়াছে। প্রত্যেক অবতারের এক একটী কার্য্য আছে। তাঁহারা সেই সেই কার্য্য প্রতিপালন করিবার জন্য যথাসময়ে অবতীর্ণ হন। উক্ত ষড়্বিধ অবতারের মধ্যে আমরা শক্ত্যাবেশ অবতারের কথা পাইয়া থাকি। কোন যোগ্য জীবাদিতে যদি শ্রীভগবানের শক্তির আবেশ হয়, তাহাকে আবেশরূপ বলে। এবম্বিধ ভগবদবতার সর্ব্ব-সময়ে সর্ব্বস্থানে অবতরণ করেন না। তাঁহাদের অবতরণ করিবার সময় আসিলে অবতারীর ইচ্ছা অনুসারে অবতারসকল স্বগণসহ এই প্রপঞ্চে শুভবিজয় করেন। এবম্বিধ ভগবদবতারের শ্রীচরণে জীবন উৎসর্গ করিয়া তৎসেবায় নিয়োজিত হইতে পারিলে জীবের নিত্যমঙ্গল লাভ হইয়া থাকে।

কলির প্রাবল্যে মায়ার কারাগারের কতকগুলি আসামীও প্রতিষ্ঠার আশায় আজকাল আপনাদিগকে 'অবতার' বলিয়া পরিচয় দিয়া দুর্ব্বলচিত্ত জনগণের সর্ব্বনাশ করিতেছে। ঐ সকল অবতারব্রুব ভগবানের সেবা করিবার পরিবর্ত্তে বদ্ধজীবসমূহের নিকট হইতে ভগবানের ন্যায় পূজা-অর্চ্চনাদি লাভের জন্য বদ্ধপরিকর হইয়া কতকগুলি কৃত্রিম বুজ্‌রুগি শিখিয়া রাখিয়াছে। তাহার ফলে তাহারা হয়ত' ছাইকে চিনি বলিয়া, পরিষ্কার জলকে ময়লা বলিয়া অথবা বিভিন্ন রঙের জল বলিয়া দেখাইতে পারে। যে-কোন জায়গায় যে-কোনও ফুলের ঘ্রাণ ছড়াইতে পারে। এই সকল দেখাইয়া হঠযোগীদের কেহ কেহ নিজদিগকে ভগবদবতার বলিয়া বিজ্ঞাপিত করে। তাহাদের অসৎ বঞ্চনাপূর্ণ বাক্যগুলি কোমলশ্রদ্ধ ব্যক্তিদের হৃদয়ে প্রবেশ করিয়া তাহাদিগকে বিস্মিত করিয়া থাকে। তত্ত্ব-জ্ঞানের অভাবে তাহারা মেকী জিনিস ধরিতে পারে না। পূর্ব্বোক্ত প্রকারের বহু অবতার (?) বহুস্থানে ভুঁইফোঁড়ভাবে উঠিতেছেন। কেহ নিজকে শিবের অবতার, কেহ বিষ্ণুর অবতার, কেহ বলরাম-কৃষ্ণের যুগ্মাবতার, কেহ বা আবার একাধারে রাম-কৃষ্ণ-শ্রীচৈতন্যদেবের অবতার বলিয়া বিশ্ববাসীর নিকট বহুপ্রকারে প্রচার করিতেছেন। এই সকল ব্যক্তি জানিয়া শুনিয়াই মনুষ্যগণকে নিত্যমঙ্গলের পথ হইতে বিচ্যুত করিয়া চিরতরে নরকের পথে লইয়া যাইতেছে।

এই সকল অবতার (?) ও তাহাদের অনুচরগণের স্মরণ থাকা উচিত যে,—

"ন জাতু কামকামানামুপভোগেন শাম্যতি।
হবিষা কৃষ্ণবর্ত্মে'ব ভূয় এবাভিবর্দ্ধতে ॥"

অগ্নিতে যতই ঘৃতাহুতি প্রদান করা যায়, ততই দাউ দাউ করিয়া জ্বলিয়া উঠে। ঘৃতপ্রদানে অগ্নি কখনই নির্ব্বাপিত হয় না। সেইপ্রকার কামাগ্নিতে যতই ইন্ধন যোগান হইবে, ততই দাউ দাউ করিয়া জ্বলিয়া উঠিবে।

বিশ্ববাসী ভ্রাতৃবৃন্দ স্মরণ রাখিবেন,—

হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে ॥
ষোড়শৈতানি নামানি দ্বাত্রিংশদ্ বর্ণকানি হি।
কলৌযুগে মহামন্ত্রঃ সম্মতো জীবতারণে ॥
বর্জ্জয়িত্বা তু নামৈতদ্ দুর্জ্জনৈঃ পরিকল্পিতম্।
ছন্দোবদ্ধং সুসিদ্ধান্তবিরুদ্ধং নাভ্যসেৎ পদম্ ॥

তারকং ব্রহ্মণামৈতদ্ ব্রহ্মণা গুরুণাদিনা।
কলিসন্তরণাদ্যাসু শ্রুতিষধিগতং হরেঃ॥
প্রাপ্তং শ্রীব্রহ্মশিষ্যেন শ্রীনারদেন ধীমতা।
নামৈতদুত্তমং শ্রৌত-পারম্পর্য্যেণ ব্রহ্মণঃ॥
উৎসৃজ্যৈতন্মহামন্ত্রং যে ত্বন্যৎ কল্পিতং পদম্।
মহানামেতি গায়ন্তি তে শাস্ত্র-গুরুলঙ্ঘিনঃ॥
তত্ত্ববিরোধসংপৃক্তং তাদৃশং দৌর্জ্জনং মতম্।
সর্ব্বথা পরিহার্য্যং স্যাদাত্মহিতার্থিনা সদা॥
"হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে॥"

এই ষোলনাম বত্রিশ অক্ষর কলিযুগে মহামন্ত্র এবং জীবতারণে অভিমত। এই নাম বর্জ্জন করিয়া দুর্জ্জন-পরিকল্পিত ছন্দবদ্ধ, সুসিদ্ধান্তবিরুদ্ধ রসাভাসদুষ্ট পদ কদাচ অভ্যাস করিবে না। এই তারক-ব্রহ্ম হরিনাম আদিগুরু ব্রহ্মা "কলিসন্তরণাদি শ্রুতিতে" পাইয়াছেন, ব্রহ্মার নিকট হইতে শ্রুতি-পরম্পরায় ব্রহ্মার শিষ্য ধীমান্ নারদ এই উত্তম নাম প্রাপ্ত হইয়াছেন।

এই মহামন্ত্র ত্যাগ করিয়া যাহারা অন্যান্য কল্পিত পদকে মহানাম প্রভৃতি বলিয়া কীর্ত্তন করে, তাহারা শাস্ত্র ও গুরু-লঙ্ঘনকারী। আত্ম-হিতার্থী সর্ব্বদা সর্ব্বতোভাবে তত্ত্ববিরোধপূর্ণ সেই সব দুর্জ্জন মত (দুঃসঙ্গজ্ঞানে) পরিত্যাগ করিবে।

—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিকুমুদ সন্ত মহারাজ

শ্রীগুরু-চরণে বিজ্ঞপ্তি

হে প্রভু গুরুদেব তুমি, হে মম অন্তরযামী।
প্রথমে জানাই আকুতি তোমায় সভক্তি প্রণমি॥
পাপে দেহ জীর্ণতরী বুঝিবা ডুবিয়া যায়।
হে গুরু আশ্রয় দিয়ে রাখ চরণ-আঙিনায়॥
কত জন্মে কত আমি করিয়াছি মহাপাপ।
তাই বুঝি এ জীবনে পাইতেছি মনস্তাপ॥

কৃপা করি' কৃপাময় দিয়েছ অমূল্য ধন।
আমি যেন রাখিতে পারি—এই মোর নিবেদন॥
চারিপাশে শত্রু মোর লাগিয়াছে পিছনে।
আছে মোর কেবা আর রক্ষিতে তোমা বিনে॥
আত্মীয়-স্বজন মোর কেহ ত' আপন নয়।
আপন যদি থাকিতে হয় তুমি ছাড়া কেহ নয়॥
ধরম-করম কিছু নাহি জানি, কিছু নাই মোর সম্বল।
এবে শুধু তুমিই ভরসা, তোমারি চরণ মোর একমাত্র বল॥
কাম-ক্রোধ-লোভ-মোহ আর মদ-মাৎসর্য্য।
তোমারই চরণতলে আজ করিলাম উৎসর্গ॥
নিষ্কামে করিলে ভজন পাব মুক্তি তোমারে।
তুমি প্রভু কৃপা কর দুঃখিনী এ দাসীরে॥
ওগো মোর গুরুদেব তুমি বস মম হৃদি মাঝে।
শোন মোর যত কথা মনে আছে যাহা॥
হৃদে মোর কত কথা জানে কোন্ জন?
তোমারি চরণে তাই করে যাই নিবেদন॥
কারে বা জানাই মোর এ মনের আকুলতা।
তুমি ছাড়া কে বুঝিবে মনের এই ব্যাকুলতা॥
কত ছল ছলিবে মোরে, আরও কতদিন?
কৃপা কর কৃপাময়, আমি অতি দীনহীন॥
এ মনের বেদনা দিয়ে গেঁথে যাই পুষ্পাহার।
ধর ওগো গুরুদেব এ দাসীর উপহার॥

—কুমারী দীপালী রায় চৌধুরী
বাদলা (বর্দ্ধমান)

শ্রীনাম ও নামাপরাধ

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে আদেশ আছে, "অপরাধশূন্য হ'য়ে লহ কৃষ্ণনাম।" অপরাধ-শূন্য হইয়া কৃষ্ণনাম না করিলে কৃষ্ণনাম হয় না, অক্ষরমাত্র উচ্চারণে শ্রীনামী ভগবান্ কৃষ্ণ হইতে অভিন্ন শ্রীনামের শরণ লওয়া হয় না। এই জন্যই এত নাম করিয়াও শ্রীনামাশ্রয়ের ফল কৃষ্ণপ্রেমা আমাদের উদয় হইতেছে না। অপরাধ থাকাকালে নামকীর্ত্তনের স্থলে কেবল বিষয় কীর্ত্তনই হইয়া যায়। এরূপভাবে 'কোটি জন্ম করে যদি নাম-সঙ্কীর্ত্তন। তথাপি না পায় কৃষ্ণপদে প্রেম-ধন॥" (চরিতামৃত)। কিন্তু মানবের এমনি দুর্ভাগ্য যে, তাঁহারা অসৎব্যক্তিকে গুরুত্বে বরণ করিয়া আজ পর্য্যন্ত জানিবার সুযোগ পান নাই যে, 'নামাপরাধ' বলিয়া এক তত্ত্ব আছে, তাহা নাম-সেবার বাধা। তাঁহাদের ধারণা যে 'যাহাই করা যাউক না কেন, নামের যখন এত মাহাত্ম্য আছে, তখন আমরা যে ভাবেই নাম করি না কেন আমাদের সুবিধা হইয়া যাইবে।' নামাপরাধী বিষয়ীর শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়া তাঁহারা নামাপরাধমুক্ত হইবার কোন যত্নই করেন না, বরং বৈষ্ণব-বিদ্বেষ পোষণ করিতে শিক্ষা করিয়া তাঁহারা আরও অপরাধ বর্দ্ধন করিয়া হরিভজন-বিচ্যুত হইয়া পড়িতেছেন। আমিও নামাপরাধী, কিন্তু আমাতে ও তাঁহাদের মধ্যে পার্থক্য এই যে, আমি দীনাতিদীন, হতভাগ্য হইয়াও, সাধু-গুরু-চরণে নামাপরাধ-বিচার-শ্রবণের যোগ্যতা লাভ করিয়া তাহা হইতে মুক্ত হইবার যত্ন করিতেছি, আর তাঁহারা এ সকল সংবাদ না পাইয়া, অথবা সংবাদ পাইয়াও তাহাতে আবশ্যকমত মনঃসংযোগ করিতেছেন না, যেহেতু তাঁহারা সাধু-গুরু-পদাশ্রয়পূর্ব্বক আদর্শ দেখিবার সৌভাগ্যে বঞ্চিত আছেন। সৎসঙ্গের অভাবে তাঁহাদের এই অসুবিধা। তাঁহারা অসাধুকে সাধুত্বে আরোপ করিয়া শ্রীজগদানন্দ প্রভুর আদেশ বুঝিবার অবসর পাইতেছেন না যে, "অসাধুসঙ্গে ভাই, হরিনাম নাহি হয়। নাম বাহিরায় বটে, নাম কভু নয়॥ কভু নামাভাস, সদা নাম-অপরাধ। ইহাই জানিবে ভাই, কৃষ্ণভক্তির বাধ॥" অসাধুকে সাধুত্বে বরণ করিলে 'সাধু' সংজ্ঞার অপব্যবহার ও সাধুনিন্দা-রূপ নামাপরাধ হইয়া যায়। সুতরাং অপরাধশূন্য শুদ্ধ নামাশ্রয় করিতে হইলে অসাধুসঙ্গ দূরে পরিহার করিয়া যথার্থ সাধুসঙ্গ করিতে হয়। যথার্থ ভগবদ্-বিশ্বাসীর চরণাশ্রয় না করিলে ঈশ্বরে অবিশ্বাসরূপ সমূহ অনর্থরাশির মূল আমাদিগকে অনন্তকাল বদ্ধ রাখিবে।

নামাপরাধের মূলে কৃষ্ণদাস্য-বিস্মৃতি ও আমাদের ভোক্তৃত্ব-বুদ্ধিই পরিলক্ষিত হয়। তাহা হইতেই অহং-কর্তৃত্ব, 'আমি বুদ্ধিমান্' ইত্যাদিরূপ জড়াভিমান প্রবল হইয়া আমাদিগকে নামাপরাধে পাতিত করে। নাম-মাহাত্ম্য শুনিয়াও তাহাতে আমাদের বিশ্বাস হয় না, রুচি জন্মে না। আমরা শ্রীনামে অবিশ্বাসী বলিয়া কপট বিশ্বাস দেখাইয়া অশ্রদ্দধান হরিবিদ্বেষি-জনকে পর্য্যন্ত নাম উপদেশ করিতে প্রবৃত্ত হই, যেন নাম একটী খেলার সামগ্রী, তাহাকে লইয়া একটু খেলা করাও চলে। শ্রীনামে অশ্রদ্ধাই এরূপ অনাচারের কারণ। শ্রীনামকে স্বয়ং নামী হইতে অভিন্ন বুদ্ধি না করিয়া অন্য শুভ কর্ম্মের সহিত তাহার সাম্য মনন করিয়া শ্রীনামে অশ্রদ্ধা সংগ্রহ করি, শ্রীনামের যোগে আমরা রোগ নিরসন, জাগতিক বিপন্নিবৃত্তি প্রভৃতি কার্য্যে নিয়োগ করিতে প্রবৃত্ত হই। আবার অন্যরূপ দুর্ব্বুদ্ধিবশে বলি—'আচ্ছা, নামের মাহাত্ম্য যদি এতই হয়, তবে আর ভাবনা কি ? আমরা যতই পাপ করি না কেন, দিনান্তে নাম করিয়া সে পাপ খণ্ডন করিয়া লইব, আবার পাপ করিব, আবার নাম করিয়া নাশ করিব ইত্যাদি।' আর হরি বলিতে সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণকে না বুঝিয়া "নিরঞ্জন হরি," "নিরাকার হরি," "চিদানন্দ হরি" প্রভৃতি বিশেষণ প্রয়োগ করিয়া রসশেখর শ্রীকৃষ্ণ তত্ত্ব হইতে হরিকে পৃথক্‌রূপে বুঝিতে চেষ্টা করিয়া শুষ্কজ্ঞান অবলম্বনরূপ ঈশ্বরে অবিশ্বাস পোষণ করিয়া প্রকারান্তরে হরিনামের অর্থ কল্পনা করিয়া বসি।

আবার, হয়ত' 'রোচনার্থা ফলশ্রুতি' জ্ঞানে অর্থাৎ সৎকর্ম্ম-প্রবৃত্তির উন্মেষের জন্য যেরূপ কর্ম্মাঙ্গগুলির প্রশংসা কীর্ত্তিত হয়, অথচ সেগুলির কীর্ত্তিত ফলসকল সত্য নহে, হরিনামের মাহাত্ম্য-কীর্ত্তনও তদ্রূপ প্রশংসা-মাত্র, এইরূপ মনে করিয়া হরিনামে অর্থবাদ মনন করিয়া তাহাতে রুচিবিশিষ্ট হই না। অন্যদিকে আবার দাম্ভিকতাবশে নূতন মত প্রকাশ করিয়া নূতন নূতন অবতার চালাইয়া বেদশাস্ত্র ও তদনুগ শ্রীমদ্ভাগবতাদি পুরাণ, তদনুগ পঞ্চরাত্রাদি সাত্বত তন্ত্র প্রভৃতি যে-সকল শাস্ত্র হরিনামের মহিমা কীর্ত্তন করেন, তাঁহাদের নিন্দা বা তৎপ্রতি অনাদর, অনাস্থা স্থাপন করিয়া স্বকপোলকল্পিত মতেরই অথবা যাঁহারা স্বকপোলকল্পিত মত প্রচলন করেন, তাঁহাদের আনুগত্যে দুষ্ট সেই মতেরই প্রাধান্য-স্থাপনের জন্য প্রয়াস পাইবার দুর্ভাগ্য অর্জ্জন করি। আর যে গুরুসকাশে শ্রীনাম-মহামন্ত্র পাই, তাঁহাকে আমাদেরই ন্যায় মনুষ্যবুদ্ধি করিয়া তিনিও আমাদের ন্যায় ভ্রান্ত, অতএব তাঁহার প্রদত্ত ভক্তিসাধনোপায় শ্রীনামভজন সমীচীন না হইতেও পারে, এই সন্দেহ পোষণ করিয়া গুর্ব্ববজ্ঞা

করিয়া ভজনক্রিয়া ত্যাগ করি। আবার শিবাদি দেবতাকে ভাগবত বুদ্ধি না করিয়া স্বতন্ত্র দেবতাজ্ঞানে বৈষ্ণবশাস্ত্রের মর্য্যাদা লঙ্ঘনপূর্ব্বক শ্রীনাম মহামন্ত্রে আস্থা হ্রাস করি, কিংবা সাধুনিন্দা করিয়া সাধুসঙ্গে রুচির অভাবে অসৎসঙ্গ করিতে করিতে নরকের পথে অগ্রসর হই। নামাপরাধ এই দশবিধ। পদ্মপুরাণে এই দশাপরাধ বিস্তৃতরূপে আলোচিত হইয়াছে। ক্রম-সন্দর্ভে "শ্রবণং কীর্ত্তনং" শ্লোকের টীকায় শ্রীপাদ জীব গোস্বামিপ্রভু তাহাদের সংক্ষিপ্ত উল্লেখ করিয়াছেন। অনুসন্ধিৎসু পাঠকগণ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-কৃত শ্রীশ্রীচৈতন্য-শিক্ষামৃত, জৈবধর্ম্ম ও শ্রীহরিনাম-চিন্তামণিতে এই দশাপরাধের বিস্তৃত আলোচনা দেখিতে পাইবেন। এখানে তাহারই বিষয় অতি সংক্ষেপে আলোচিত হইল।

পদ্মপুরাণে অপরাধের ফল বলিতেছেন যে, সর্ব্ব অপরাধ করিয়াও হরিকে আশ্রয় করিলে তাহা হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারে। আবার, যে নরাধম হরির প্রতি অপরাধ করে, নামাশ্রয় করিলে নামবলে কখন কখন তাহা হইতে মুক্তি পাইতে পারে, কিন্তু সকলের সুহৃদ্ যে শ্রীনাম, যেইরূপে ভগবান্ প্রপঞ্চে জীবোদ্ধার জন্য অবতীর্ণ, সেই শ্রীনামের প্রতি অপরাধ করিলে অধঃপতনই তাহার ফল। পাপী লোক বরং ভাল, কেন না, তাহার পাপ-প্রবৃত্তিতে ঘৃণা আসিয়া সাধুসঙ্গপ্রভাবে একদিন তাহার পাপমতি বিদূরিত হইবার সম্ভাবনা আছে। কিন্তু নামাপরাধী ব্যক্তির আর উপায় নাই, কেন না, নিজে সর্ব্বজ্ঞ-অভিমানে সে সাধুসঙ্গ স্বীকার করিতেই প্রস্তুত নহে। এই নামাপরাধের অন্য প্রায়শ্চিত্ত নাই। তবে যদি প্রগাঢ় ভক্তি করিয়া নিরন্তর নাম করিতে করিতে অপরাধ দূর করিতে যত্ন করে, তখন তাহার অসাবধানতা-জনিত অপরাধ ক্রমে হ্রাসপ্রাপ্ত হইবে। জ্ঞানকৃত অপরাধের মোচন নাই। পদ্মপুরাণ আমাদিগকে আশ্বাস দিয়াছেন,—

"নামাপরাধযুক্তানাং নামান্যেব হরন্ত্যঘং।
অবিশ্রান্ত-প্রযুক্তানি তান্যেবার্থকরাণি চ॥"

—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত বামন মহারাজ

আত্মঘাতী কে ?

বাহ্যিক বা জাগতিক বিচারে মানুষের কৃত্রিম উপায়ে দেহত্যাগের নামই 'আত্মহত্যা'। জলে ডুবিয়া, ফাঁসি লইয়া, বিষপান করিয়া, নিজগাত্র অগ্নিতে দগ্ধ করিয়া, নিজ অঙ্গে অস্ত্রাঘাত করিয়া বা চলন্ত গাড়ীর তলায় ঝাঁপ দিয়া দেহ পরিত্যাগ করা প্রভৃতিই আত্মহত্যার পর্য্যায়ভুক্ত। জড়দেহে আত্মবুদ্ধি-সম্পন্ন ব্যক্তিরা "উধোর পিণ্ডি বুধোর ঘাড়ে" চাপাইবার ন্যায় দেহের নাশকে আত্মার নাশ বলিয়া ভুলের ফাঁদে পা দিয়া থাকেন। জড়দেহের বিনাশে আত্মার বিনাশ কিরূপে সম্ভবপর হইতে পারে ? কারণ বিনাশশীল জড়দেহের সহিত অক্ষয় আত্মার আসমান্ জমিন্ ফারাক্ বিদ্যমান। দুইটী সম্পূর্ণ বিপরীত-ধর্ম্মী বস্তুকে সমজ্ঞান করা কোন বুদ্ধিমানের কার্য্য নহে। শাস্ত্রে আত্মাকে নিত্য, অচ্ছেদ্য, অদাহ্য, অক্লেদ্য, অশোষ্য, বিকাররহিত ও সনাতন বলিয়াছেন। কেহ কেহ পূর্ব্বপক্ষ করিতে পারেন,—"গৃহদাহ হইলে যেমন গৃহের মধ্যে অবস্থিত ব্যক্তির বিনাশ হয়, তদ্রূপ অস্ত্রাঘাতাদির দ্বারা শরীর নষ্ট হইলে শরীরের অভ্যন্তরে স্থিত আত্মারও বিনাশ হইবে।" তাঁহাদের সন্দেহ নিরাকরণের জন্য স্বয়ং শ্রীভগবান্ গীতায় ২।২৩ শ্লোকের অবতারণাপূর্ব্বক বলিয়াছেন যে,—"কোন প্রকার খড়্গাদি অস্ত্রশস্ত্র, এমনকি, আগ্নেয়াস্ত্র, পর্জ্জন্যাস্ত্র, মারুতও জীবাত্মাকে বিনাশ করা ত' দূরের কথা, কোনরূপ ব্যথা বা কষ্ট বিন্দুমাত্র দিতে পারিবে না।" শ্রুতিতেও পাওয়া যায়,—"অরে অয়মাত্মা-নুচ্ছিত্তিধর্ম্মা" অর্থাৎ "এই আত্মা উচ্ছেদ ধর্ম্মাত্মক নহেন।" সুতরাং জীবাত্মা নিত্য, শাশ্বত ও সনাতন।

বাস্তবিকপক্ষে 'দেহ' কখনও 'দেহী' বা 'আত্মা' হইতে পারে না, কারণ 'দেহ' যদি 'দেহী' হইতেন, তাহা হইলে আমাদের আত্মজগণ আমাদিগকে ঔর্দ্ধদেহিক ক্রিয়াকালে পঞ্চভূতকে সেই সেই ভূত পুনঃ প্রদান করিবার যত্ন করিবে কেন ? 'আমি' অর্থাৎ 'আত্মা' জড় দেহ-ভাণ্ড হইতে স্বতন্ত্রতত্ত্ব বলিয়াই আমাদের দেহ-সম্বন্ধে সম্বন্ধযুক্ত আত্মীয়গণ আমাদের দেহকে দেহত্যাগের পর অপ্রিয়জ্ঞানে গৃহ হইতে বাহির করিয়া দেয়। কেহ কেহ প্রশ্ন উত্থাপন করিতে পারেন,—"পুরাণাদি শাস্ত্রে যে আত্মঘাতীর ভূত-প্রেত-পিশাচযোনি প্রাপ্তি বা নিরয়গমনের কথা উল্লেখ রহিয়াছে, তাহার মীমাংসা কোথায় ? কারণ এক্ষেত্রে ত' অস্ত্রাঘাতাদিদ্বারা দেহত্যাগকেই আত্মহত্যা বলা হইয়াছে।" তাহার উত্তর এই,—"জীব আশি লক্ষ যোনি পরিভ্রমণের পর দুর্ল্লভ মনুষ্যজন্ম লাভ করিয়া থাকে। 'আত্মার স্বরূপ হয় কৃষ্ণের নিত্যদাস।' এই উপলব্ধি একমাত্র

মনুষ্যজন্মে সম্ভবপর বলিয়া মনুষ্যদেহ প্রাপ্তি অত্যন্ত দুর্ল্লভ। তাই বহু আয়াসলব্ধ অমূল্য সম্পত্তি মনুষ্য দেহকে ধ্বংস করিবার জীবের কোন অধিকার নাই। কেবলমাত্র আত্মানুগত মনুষ্যদেহদ্বারাই ভগবদ্ আরাধনা তথা ভগবৎপ্রাপ্তি সম্ভব। অস্ত্রঘাতাদিদ্বারা মনুষ্যদেহ বিনষ্ট করিয়া ভূত-প্রেত-পিশাচাদি নিকৃষ্ট যোনি প্রাপ্ত হইলে তখন কিরূপে ভগবদ্ভজন সম্ভবপর হইতে পারে? মনুষ্যজন্ম ব্যতীত অন্য কোন নিকৃষ্ট জন্ম 'আত্মার স্বরূপ' প্রকাশে সম্পূর্ণ অপারগ। মনুষ্যদেহ 'আত্মার স্বরূপ' প্রকাশে সম্পূর্ণরূপে সমর্থ বলিয়া শাস্ত্র বিষপানাদিদ্বারা দেহত্যাগকে আত্মহত্যা বলিয়াছেন; বাস্তবিকপক্ষে কখনও 'দেহ' ও 'দেহী'কে এক পর্য্যায়ভুক্ত করিয়া ভ্রান্তি সৃষ্টি করেন নাই। আবার দেহত্যাগাদি সব তমোধর্ম্মের ব্যাপার। তমোগুণসম্পন্ন ব্যক্তিরা যে ভূত-পিশাচাদি নিকৃষ্ট যোনি প্রাপ্ত হয়, তাহার ভূরি ভূরি প্রমাণ শাস্ত্রে রহিয়াছে।—

দেহত্যাগাদি তমো-ধর্ম্ম—পাতক কারণ।
সাধক না পায় তাতে কৃষ্ণের চরণ॥ (চৈঃ চঃ অঃ ৪।৬০)
দেহত্যাগাদি যত, সব—তমো-ধর্ম্ম।
তমো-রজো-ধর্ম্মে কৃষ্ণের না পাইয়ে মর্ম্ম॥ (চৈঃ চঃ অঃ ৪।৫৭)

দুঃখ-যন্ত্রণা ঘুচাইয়া আনন্দপ্রাপ্তির জন্য মানুষের অস্ত্রঘাতাদিদ্বারা দেহত্যাগের যে প্রচেষ্টা, তাহা অত্যন্ত নিন্দনীয় এবং ভগবদ্ভজনের সম্পূর্ণ বিরোধী—ইহা শাস্ত্রসিদ্ধ।"

ভগবদ্বিস্মৃত ব্যক্তিই যথার্থ আত্মঘাতী

মনুষ্য-শরীরে আত্মতত্ত্ব-প্রতিপাদক শাস্ত্রজ্ঞান ও অনুভবজন্য জ্ঞান, উভয়ই সম্ভব হইতে পারে। যে ব্যক্তি আত্মাকে না জানিয়া দেহত্যাগ করে, সে কদাচিৎ দেবাদি যোনি প্রাপ্ত হইলেও প্রকৃত শ্রেয়ঃ লাভ করিতে সক্ষম হয় না। আত্মস্বরূপ বিস্মৃত হওয়াতেই জীব অবিদ্যমান দ্বৈতে অভিনিবিষ্ট হইয়া ঘোরতর বিচিত্র সংসার প্রাপ্ত হইয়া থাকে। ঐহিক ও পারত্রিক অনিত্য ভোগ্যবিষয়সমূহের অনুক্ষণ চিন্তায় সংসারবন্ধন ও আত্মনাশ হইয়া থাকে। জন্ম-স্থিতি-ভঙ্গশীল এই প্রপঞ্চে প্রত্যেক বস্তুই কালের অভ্যন্তরে ক্রমে উদ্ভূত হয়, লালিত-পালিত হইয়া বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় এবং পরিশেষে বিনষ্ট হইয়া যায়। চিন্ময় জীব স্বীয় চেতন-ধর্ম্মের অপব্যবহার করিয়া কৃষ্ণেতর মায়িক বস্তুর প্রতি লুব্ধ হইয়া কৃষ্ণভজন পরিত্যাগপূর্ব্বক আত্মনাশ করে। জীবের স্বতন্ত্রতার

অপব্যবহারই জীবকে আত্মঘাতী করায়। জগৎপিতা কৃষ্ণের ভজন হইতে বিরত থাকিলে কর্ম্মসঞ্চিত বিত্তও সর্ব্বতোভাবে ক্লেশদায়ক হইয়া আমাদিগকে আত্মহত্যার পথে ঠেলিয়া দেয়। কৃষ্ণভজনবিহীন ব্যক্তিকে জন্ম জন্ম মায়িক ব্রহ্মাণ্ডে ত্রিতাপ জ্বালায় দগ্ধীভূত হইতে হয়।

জগতের পিতা কৃষ্ণ যে না ভজে বাপ।
পিতৃদ্রোহী পাতকীর জন্মে জন্মে তাপ॥ (চৈঃ ভাঃ)

হরি-গুরু-বৈষ্ণবের সেবার জন্যই জীব দুর্লভ মনুষ্যজন্ম লাভ করিয়া থাকে। হরি-গুরু-বৈষ্ণবের সেবাই যদি না হইল, তবে মনুষ্যদেহ ধারণের সার্থকতা কোথায়? মহাজন-পদাবলীতে উল্লেখ রহিয়াছে,—

লোচন বলে মোর নিতাই যে বা না ভজিল।
জানিয়া শুনিয়া সেই আত্মঘাতী হৈল॥

জগদ্‌গুরু শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী প্রভুপাদ ভাগবতের (ভাঃ ১১।২০।১৭) "নৃদেহমাদ্যং সুলভং সুদুর্ল্লভং" শ্লোকের বিবৃতিতে যাহা বলিয়াছেন, তাহা বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। শ্রীল প্রভুপাদের বিবৃতি,—"মানবজীবনই মানবগণের নিজমঙ্গল লাভের একমাত্র উপায়। বহু জন্মের পরে ইহার লাভ ঘটে। ভগবদনুশীলননিপুণ শ্রীগুরুদেব কর্ণধারের কার্য্য করেন। ভগবৎকৃপারূপ অনুকূল বায়ু নরদেহরূপ নৌকাকে পরিচালনা করিয়া এই ভবসংসার-ভোগ হইতে পরপারে লইয়া যায়। যিনি স্বীয় নরদেহকে নৌকা জানিতে পারেন না, গুরুদেবকে স্বীয় কর্ণধার বুঝিতে পারেন না এবং ভগবৎকৃপাকেই অনুকূল বায়ুরূপ মঙ্গল বা প্রয়োজন সাধক বলিয়া জানিতে পারেন না, তিনি নিজের নিত্যমঙ্গল বিনাশপূর্ব্বক আত্মঘাতী হন।"

(বৃঃ আঃ ৪।৪।১৪) শ্রুতি ভজনবিহীন লোকদিগকে ধিক্কার দিয়াছেন,— "যিনি আত্মতত্ত্ব জানেন না, তবে তাঁহার মহাসর্ব্বনাশ উপস্থিত হয়। যাঁহারা তাহা জানেন, তাঁহারা অমৃত হন, অন্যসকলে দুঃখপ্রাপ্ত হন।" ভগবদ্‌বিস্মৃত ব্যক্তিগণকে যে মরণের পরে অন্ধতমঃ নিরয়ে গমন করিতে হয়, তাহা ঈশোপনিষদ্ পরিষ্কারভাবে জানাইয়াছেন,—"যাঁহারা আত্মঘাতী (অবিদ্যাবশে ভগবদ্‌বিস্মৃত) তাঁহারা দেহত্যাগান্তে সূর্য্যশূন্য অন্ধতমঃ নরকে যায়।" পশুঘাতী ব্যাধ অথবা আত্মঘাতী অপরাধী ব্যতীত কোন বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিই হরিসেবা তথা শ্রীহরিকীর্ত্তন হইতে বিরত থাকিতে পারে না। ভবরোগের ঔষধস্বরূপ শ্রীহরির গুণানুকীর্ত্তন শ্রৌতপারম্পর্য্যে সাধিত হয় এবং তাহা রুচিপর ভক্তের হৃৎকর্ণ-রসায়ন। কৃষ্ণেতর বিষয়-তৃষ্ণাযুক্ত বদ্ধ জীবগণ কখনও কীর্ত্তন করিবার

অধিকার লাভ করিতে পারে না। অবিবেকী ব্যক্তিরাই বিষয় মল পরিত্যাগ করিয়া হরিভজনের পথে অগ্রসর হইতে কুণ্ঠা বোধ করেন। জগদ্গুরু শ্রীল প্রভুপাদ তাঁহার উপদেশাবলীর মধ্যে হরিসেবাবিমুখ ব্যক্তিগণকেই আত্মঘাতীর আখ্যায় আখ্যায়িত করিতে গিয়া বলিয়াছেন,—"হরিভজনকারী ব্যতীত সকলেই নির্ব্বোধ ও আত্মঘাতী।"

এ জগতে কেহই দুঃখ চায় না, সুখই প্রত্যেকের আকাঙ্ক্ষিত বস্তু। ভগবৎ-প্রেমেই আত্যন্তিক সুখপ্রাপ্তি এবং দুঃখ নিবৃত্তি হইয়া থাকে। নির্ব্বিশেষ-বাদীরা সুখপ্রাপ্তি না হইলেও আত্যন্তিক দুঃখ নিবৃত্তিকেই জীবনের চরম উদ্দেশ্য মনে করিয়া নিজেদের ও জগতের ঘোর সর্ব্বনাশ করিয়া থাকেন। তাঁহারা দুঃখ নিবৃত্তি করিতে গিয়া আত্মনাশই করেন। কারণ, জীব আনন্দময় ভগবানেরই সন্তান, আনন্দই তাহার প্রাপ্যবস্তু। আনন্দপ্রাপ্তি না হইয়া কেবলমাত্র দুঃখ নিবৃত্তি হইলে তাহা ত' আত্মহত্যারই সামিল। তাই নির্ব্বিশেষবাদিগণকে শাস্ত্র আত্মঘাতীই বলিয়াছেন। এতৎপ্রসঙ্গে জগদ্গুরু শ্রীল কেশব গোস্বামী মহারাজ তাঁহার "ভগবদ্দর্শন" প্রবন্ধে যে মূল্যবান তথ্য প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা নিম্নে বর্ণনা করা হইতেছে,—

"একটী লোকের হাতে ঘা হইয়াছে। সুতরাং নিরাময়ই প্রয়োজন। একজন ডাক্তার আত্যন্তিক দুঃখ-নিবৃত্তিই প্রয়োজন জানিয়া তাহার হাতখানা কাটিয়া দিতে প্রস্তাব করিলেন। কেননা, যদি হাতখানা থাকে তাহা হইলে আবার তাহাতে 'ঘা' হইতে পারে। 'হাত' না থাকিলে হাতে আর কখনও ঘা হইতে পারিবে না। আর কখনও 'ঘা' এর যন্ত্রণা সহ্য করিতে হইবে না। রোগী ইহা শুনিলে কখনই ইহাতে রাজী হইবে না, বরং ডাক্তারকে মূর্খ বলিয়া বিদায় দিবে। তাই মুক্তিতে দুঃখবিনাশ করিতে গিয়া যদি আত্মবিনাশ বা আত্মার লয়সাধন করিতে চাহেন, তাহা হইলে সুখপ্রাপ্তি বলিয়া কোনও বস্তু তাহার ভাগ্যে ঘটিল না। ব্রহ্ম আনন্দময় বা নিরানন্দময় বলিবার সার্থকতাই বা কি থাকিল? তাহার ভোক্তা বা অনুভবকারীও কেহ থাকিল না। অর্থাৎ আমি যদি 'চিনি' হইয়া গেলাম, তবে চিনি মিষ্টি, টক বা তিক্ত, কি Tasteless, ইহা বুঝিবে কে? সেখানে ত' আস্বাদকের কোন পৃথক্ সত্তা নাই। সুতরাং আত্যন্তিক অভাব হইল। বস্তুর অভাব হইলেই তাহাকে অনিত্য বস্তু বলে। অনিত্য বস্তু কখনও নিত্য বস্তুকে লাভ করিতে পারে না, পক্ষান্তরে অনিত্য কখনও নিত্য হয় না।

একটী ব্যক্তি আত্মহত্যা করিয়াছে। সে আত্মহত্যা কেন করিল? তাহার

কারণ, সে জীবিত থাকা অপেক্ষা আত্মহত্যাকেই অধিক সুখ বলিয়া মনে করিয়াছে। এখানে সুখই তাহার মূল উদ্দেশ্য। এইজন্য আনন্দপ্রাপ্তিই সকলের মূল প্রয়োজন। আত্মহত্যাকারী কখনও আত্মহত্যা করিয়া সুখ পায় না। তজ্জন্য তাহাকে পাপী বলিয়া গণ্য করা হয়। এমনকি, সেই ব্যক্তি ডাক্তারাদির ঔষধ প্রয়োগাদিদ্বারা জীবন লাভ করিলেও তাহাকে Penal code এর আইন অনুসারে কঠোর শাস্তি দেওয়া হয়। কেননা, আত্মহত্যা করা Crime, sin and unlawful, তাহাতে তাহার অধিকার নাই। এই কারণে যাহারা নিজের সত্তা ব্রহ্মে বিলাইয়া দিয়া আত্যন্তিক দুঃখ নিবৃত্তি করিতে চান, ভগবান্ তাহাদের চেতনতা আচ্ছাদিত ও আবদ্ধ করিয়া তাহাদিগকে শোধন করিবার জন্য রাজদ্রোহীদের ন্যায় Intern (অন্তরীণ) করিয়া থাকেন। অতএব ভগবান্ উপাস্য, (শুদ্ধ) জীব উপাসক ও ভক্তিই উপাসনা, ইহাদের কখনও ধ্বংস হয় না। সুতরাং শ্রীকৃষ্ণপ্রেমই জীবের একমাত্র প্রয়োজন।"

বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি অহোরাত্র আয়ুক্ষয় হইতেছে জানিয়া জড় বিষয়াসক্তি পরিত্যাগপূর্ব্বক শ্রীহরির আরাধনা করিয়া নিত্যমঙ্গল লাভ করেন। পক্ষিগণের বাসা ধ্বংসপ্রাপ্ত হইলে পক্ষিগণ যেরূপ অন্য বাসস্থান সংগ্রহ করিয়া বসবাস করে, তদ্রূপ এই মায়িক জগতে আমাদের স্থায়ী বাসস্থান নাই জানিয়া নিত্যধাম লাভের জন্য চেষ্টাবিশিষ্ট হওয়াই একমাত্র কর্ত্তব্য। মায়িক জগতের ভোগপ্রবৃত্তি রহিত হইয়া ভগবদনুশীলন করিতে আরম্ভ করিলে আমরা 'আত্মঘাতী' এই উপাধিশূন্য হইয়া প্রকৃত শান্তি লাভ করিব, এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।

—শ্রীবলভদ্রদাস ব্রহ্মচারী

জীবের স্বরূপ হয় কৃষ্ণের নিত্যদাস

'আত্মভোলা জীব'—এই মহাজনবাক্যটি বহু সময় ইচ্ছা-অনিচ্ছা সত্ত্বেও আমাদের কর্ণকুহরে প্রবেশ করিয়া থাকে। কিন্তু ইহার অর্থগ্রহণে আমরা জীব পদবাচ্য যাহারা কখনই আগ্রহী নহি, বরং উদাসীন। আর যাহাদের কর্ণে এই বাক্য একটু অধিক মাত্রায় প্রবেশ করিয়া তাহাদের সচকিত করিবার প্রয়াস পায়, তাহারাও অধিকাংশ দেহাত্মবুদ্ধিরূপ দ্বিতীয় অভিনিবেশের অভিমান হেতু তর্কে লিপ্ত হইয়া নিজকে প্রাকৃত ভূমিকায় প্রমাণ করিতে চেষ্টা করেন।

শ্রুতি কহিয়াছেন,—"আত্মানং বিদ্ধি," অর্থাৎ নিজেকে জান। এই শ্রুতিবাক্যেও আমরা বিচলিত না হইয়া দ্বিতীয় অভিনিবেশের ভয় হেতু নিজেদের এই প্রাকৃত জগতের সম্বন্ধে প্রতিষ্ঠিত করিবার প্রয়াস পাই। বলিয়া থাকি,—"কি বলিতেছেন আমি নিজেকে জানি না? আমি অমুকের পিতা, অমুকের মাতা, অমুকের পুত্র, অমুকের স্ত্রী ইত্যাদি। অথবা বলিয়া থাকি, আমার এত ঐশ্বর্য্য, মান, প্রতিষ্ঠা, আমি এত জ্ঞানী, পণ্ডিত, এই জগৎকে আমি আমার নিজ ক্ষমতায় করতলগত করিয়াছি। সুতরাং এইসকল কথা শুনাইয়া আমাকে জ্ঞান দিতে আসিবেন না।"

কেন এরূপ বলিয়া থাকি?—এজগতে আমার সম্বন্ধে যাহা কিছু পাইয়াছি, তাহা পাছে হারাইয়া ফেলিতে হয়, সেই ভয়েই এইরূপ কথা আমরা বলিয়া থাকি।

ভোগবাদী দার্শনিক চার্ব্বাক আমাদের মত আত্মভোলা জীবদের চরম ভোগে লিপ্ত করিবার জন্য আমাদের মনঃপূত কথাই বলিয়া গিয়াছেন,—"ঋণং কৃত্বা ঘৃতং পিবেৎ যাবৎ জীবেৎ সুখং জীবেৎ।" অর্থাৎ 'যতদিন বাঁচিবে, সুখে বাঁচিবে, ঋণ করিয়াও ঘি খাইবে।' সুতরাং এইসকল ভোগবাদী হিতৈষীদের বাক্য নস্যাৎ করিয়া কি-প্রকারে সাধুবাক্য আমাদের কর্ণকুহরে প্রবেশ করিবে?

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর কীর্ত্তন করিয়াছেন,—

"জীব জাগ জীব জাগ গোরাচাঁদ বলে।
কত নিদ্রা যাও মায়া পিশাচীর কোলে॥
ভজিব বলিয়া এসে সংসার ভিতরে।
ভুলিয়া রহিলে তুমি অবিদ্যার ভরে॥"

কিন্তু মায়া পিশাচীর কোলে আমরা এমনই গভীর নিদ্রায় নিদ্রিত হইয়া আছি যে শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর এ আহ্বান আমাদের মধ্যে কোনপ্রকার চাঞ্চল্যের উদ্রেক করিতেছে না।

মানব জনমকে "দুর্ল্লভ জনম" আখ্যা দেওয়া হইয়াছে। ইহার কারণ কি?—আশি লক্ষ যোনি ভ্রমণের পর এই জন্ম লাভ হইয়াছে এবং স্বতন্ত্র ইচ্ছাশক্তির সদ্ব্যবহার জীব একমাত্র এই জন্মেই করিতে সমর্থ, এই জন্যই 'দুর্ল্লভ জনম।' আমরা সেই 'দুর্ল্লভ জনমের' অধিকারী যখন ভাগ্যক্রমে হইয়াছি, তখন একবার কি আমাদের অনুসন্ধান করিয়া দেখা উচিত নয় কেন বলা হইয়াছে,—'আত্মভোলা জীব', আর কেনই বা শ্রুতি বলিয়াছেন,—'আত্মানং বিদ্ধি'?

এ অনুসন্ধান আমাদের ন্যায় বদ্ধজীবের পক্ষে সম্ভব নয় জানিয়াই পরম ঔদার্য্যময়বিগ্রহ শ্রীগৌরসুন্দর তাঁহার নিত্যপার্ষদ শ্রীল সনাতন গোস্বামীর শ্রীমুখে প্রশ্ন করাইয়া নিজে উত্তর দিয়াছেন। শ্রীল সনাতন গোস্বামী প্রশ্ন করিয়াছেন,—"কে আমি, কেনে আমায় জারে তাপত্রয়।

ইহা নাহি জানি কৈছে হিত হয়॥"

পার্থিব সুখানুসন্ধানী জীবসকল অনুক্ষণ ত্রিতাপ জ্বালায় পিষ্ট হইতেছে। চতুর্দ্দশ ভূমণ্ডলের এই দেবীধামে কোন জীবেরই এই ত্রিতাপজ্বালা হইতে নিস্তার নাই। আধ্যাত্মিক তাপ—মনস্তাপ ও শরীরের ব্যাধিজনিত তাপ। আধিদৈবিক তাপ—ঝড়ঝঞ্ঝা', অতিবৃষ্টি, অনাবৃষ্টি, ভূকম্পনাদি দৈব ঘটনা সকল হইতে তাপ। আধিভৌতিক তাপ—জীবকর্তৃক জীবকে দংশন, আঘাত ও স্বার্থের সংঘাতজনিত তাপসকল। জন্মগ্রহণ করিলে এইসকল তাপ প্রত্যেককেই কম-বেশী ভোগ করিতে হয়। কিন্তু জীব কি এইসকল চায়? কখনই নয়। অধিকন্তু জীবের আপ্রাণ প্রচেষ্টা এইসকল দুঃখকে পরিহার করিয়া সুখের সন্ধান করা। এই উদ্দেশ্যে সে মরীচিকার ন্যায় ইহজগতের সুখের পশ্চাতে ছুটিয়া চলিয়াছে। কিন্তু ইহজগতের সুখ ত' প্রকৃত সুখ নহে, ইহা দুঃখের ক্ষণিক বিরতি মাত্র। আত্মভোলা, প্রাকৃত জগতের ভোগাকৃষ্ট জীব ইহাকেই প্রকৃত সুখজ্ঞান করিয়া পাইবার লালসায় বিভিন্ন উপায় অনুসন্ধানে অনুক্ষণ তৎপর। সুখের সন্ধানে যেমন জীব ছুটিয়াছে, তেমনই দুঃখকে পরিহার করিবার জন্য নানাবিধ ধর্ম্মীয় পথ অবলম্বন করিতেছে। প্রকৃত তত্ত্ব না জানিয়া অন্ধজীব ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্তভাবে অন্যাভিলাষী হইতেছে বা ধর্ম্মজ্ঞান করিয়া কর্ম্ম, যোগ, জ্ঞান প্রকৃতি বিভিন্ন পথে পরিভ্রমণ করিয়া ধন খুঁজিতেছে। কিন্তু প্রকৃত সম্বন্ধজ্ঞান না থাকায় যথার্থ ধনলাভ তাহার ভাগ্যে ঘটিতেছে না। ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ—এই চতুর্বর্গ ফল লইয়াই জীব ভুলিয়া আছে। প্রকৃত সম্বন্ধজ্ঞান না হইলে নিত্য-ধর্ম্মে প্রবেশ লাভ হয় না, আর যথার্থ ধনলাভ হয় না।

"পৃথিবীতে ধর্ম্ম নামে যাহা কিছু চলে।
ভাগবত কহে তাহা পরিপূর্ণ ছলে॥"

সুতরাং মানুষ-পদবাচ্য জীব ধর্ম্ম করিতে গিয়া অধিকাংশক্ষেত্রে ছল-ধর্ম্মই যাজন করিতেছে এবং নিজেকে নিজে ঠকাইতেছে। কারণ, সঠিক স্বরূপের জ্ঞান না হইলে সঠিক পথ অবলম্বন হইবে না। ফলে কর্ম্ম, জ্ঞান, যোগপথে গোলোক ধাঁধার ন্যায় পরিভ্রমণ করিয়া বেড়াইতে হইবে।

শ্রীগুরুদেবের কৃপাতেই প্রকৃত স্বরূপজ্ঞান লাভ হয়। জীব কোথা হইতে আসিয়া এই দেবীধামে প্রবেশ করিয়া ত্রিতাপ জালার অধীন হইয়া পড়িল, শ্রীমন্মহাপ্রভুর কৃপায় তাহা একটু জানিতে চেষ্টা করি।

শ্রীল সনাতন গোস্বামীর প্রশ্নের উত্তরে মহাপ্রভু বলিয়াছেন,—

"জীবের 'স্বরূপ' হয় কৃষ্ণের 'নিত্যদাস'।
কৃষ্ণের 'তটস্থা-শক্তি', 'ভেদাভেদ-প্রকাশ'॥" (চৈঃ চঃ)

ত্রিতাপ জালাহত পঞ্চভূতে গঠিত জীবের জড় শরীরটি জীবের মধ্যস্থিত 'আমি' নয়। আবার মন, বুদ্ধি, অহংকারে গঠিত জীবের সূক্ষ্ম শরীরটিও জীবের 'আমি' নয়। 'আমি' বলিতে জীব যাহাকে বুঝাইতে চাহিয়াছে, তাহার স্বরূপ হইল "কৃষ্ণের নিত্যদাস"। অনন্ত শক্তির মালিক কৃষ্ণের প্রধান তিন শক্তির মধ্যে 'তটস্থা' শক্তিই হইল জীব।

কৃষ্ণের যে শক্তির কথা শ্রীগৌরসুন্দর বলিয়াছেন, তাহা অনুধাবন করিবার পূর্ব্বে শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপ না জানিলে, শক্তির জ্ঞান ও সম্বন্ধের জ্ঞান না জানিলে জীবের স্বরূপ প্রকাশিত হইবে না। শ্রীল সনাতন গোস্বামীকে মহাপ্রভু শিক্ষা দিতে গিয়া বলিয়াছেন,—

"কৃষ্ণের স্বরূপ-বিচার শুন, সনাতন।
অদ্বয়জ্ঞান-তত্ত্ব, ব্রজে ব্রজেন্দ্রনন্দন॥
সর্ব্ব-আদি, সর্ব্ব-অংশী, কিশোর-শেখর।
চিদানন্দ-দেহ, সর্ব্বাশ্রয়, সর্ব্বেশ্বর॥" (চৈঃ চঃ)

শ্রীল প্রভুপাদ অনুভাষ্যে ব্যাখ্যা দিয়াছেন,—"হে সনাতন, কৃষ্ণের স্বরূপ বিচার এই যে, কৃষ্ণ ব্রজধামে ব্রজপতি নন্দের কুমার, তিনি অদ্বয়জ্ঞানতত্ত্ব, তাঁহার নাম, রূপ, গুণ ও লীলা—এই চারি প্রকার তত্ত্বে মায়াজনিত পরস্পর ভেদ বা বিরোধ দৃষ্ট হয় না অর্থাৎ কৃষ্ণের নাম, রূপ, গুণ ও লীলার মধ্যে মায়িক ভেদ-বিধি কার্য্য করিতে পারে না।

কৃষ্ণ—সকল বিষ্ণুতত্ত্বের ও বৈষ্ণবতত্ত্বের আদি তত্ত্ব ; তাহা হইতেই সকল অংশ প্রকটিত হইয়াছে ; তিনি—পূর্ণকিশোরবয়ঃ, সচ্চিদানন্দবিগ্রহ, সকলের প্রভু ও সকল বস্তুর আশ্রয়।"

ব্রহ্মসংহিতায় বলা হইয়াছে,—

"ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দবিগ্রহঃ।
অনাদিরাদির্গোবিন্দঃ সর্ব্বকারণকারণম্॥"

বেদে বহুবার "অসমোর্দ্ধ" কথাটির প্রয়োগের দ্বারা বুঝান হইয়াছে, তাঁহার

'ঊর্দ্ধ ত' দূরের কথা, তাঁহার সমানও কেহই নাই। "কিন্তু যাহারা নির্ব্বিশেষ জ্ঞানদ্বারা সেই অদ্বয়তত্ত্বের অনুসন্ধান করেন, তাহাদের নিকটে নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মই প্রতীত হন। অর্থাৎ তাহারা কেবলমাত্র ব্রহ্মের অঙ্গজ্যোতিই দর্শন করেন। জ্যোতির্মধ্যস্থিত স্বয়ংরূপ দর্শনের বা সেবার সৌভাগ্য তাহাদের ভাগ্যে ঘটে না। যাহারা অষ্টাঙ্গযোগমার্গে সেই পরমবস্তুর অনুসন্ধান করেন, তাহাদের নিকট হৃদ্দেশস্থিত হইয়া জগদ্‌গত পরমাত্মা উদিত হন।" পরমাত্মা কৃষ্ণের অংশবিশেষ। সুতরাং তাহারা অংশ দর্শন করিয়াই তৃপ্ত হন, পূর্ণ দর্শন করিবার সৌভাগ্য হইতে বঞ্চিত থাকেন। "যাঁহারা শুদ্ধভক্তিদ্বারা পরম-তত্ত্বের সাধন করেন, তাঁহারা ভগবান্‌কে দর্শন করেন।" সুতরাং শুদ্ধভক্তি লাভই জীবের অভিধেয়। (ক্রমশঃ)

—শ্রীব্রতীমায়া সরকার

শ্রীল গুরু-মহারাজের বক্তৃতা

[পূর্ব্বপ্রকাশিত ৪৩শ বর্ষ, ১ম সংখ্যা, ৩৫ পৃষ্ঠার পর]

আকার থেকে ত' আকার আসে। শূন্য থেকে জগৎ সৃষ্টি হয় নাই। 'Out of nothing everything has been created'—এই যে কথাটী এটা নাস্তিক্য-দর্শন, আস্তিক্য-দর্শন নয়। এরূপ ভ্রান্তবিচার পাশ্চাত্ত্য দেশে আছে, আমাদের দেশেও প্রচলিত আছে। কিন্তু সেই দেশই আবার এই কথার প্রতিবাদ করেছেন আমাদের গীতার শ্লোক থেকে,—"নাসতো বিদ্যতে ভাবো নাভাবো বিদ্যতে সতঃ।" 'Out of something something has been created'—এটা হল যুক্তির কথা, তত্ত্বসিদ্ধান্তের কথা। যাঁর নিজের কোন আকার নাই, তিনি কি করে আকার সৃষ্টি করবেন? ভগবান্ যদি নিরাকার হন, তাহলে এ জগৎ—অনন্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ড তিনি সৃষ্টি করেছেন কি করে, জৈব-জগৎ কি করে সৃষ্টি হল? সুতরাং ভগবান্ সাকার, আকারবান্। কিরকম আকার? যাঁর চোখে দেখতে পাই না তাঁকে মানব না মশাই। এ অধিকার লাভের জন্য সাধনের ত' প্রয়োজন আছে জীবনে। সাধন-ভজনের দ্বারা তত্ত্বদর্শন লাভ হয়। আমি কিছু করব না, অথচ আমার সব চাই—এই অন্যায় আবদার আজ সমাজে। লেখাপড়া শিখবে না ছেলেমেয়েরা, অথচ ডিগ্রি-ডিপ্লোমা চাই, হয় কি এটা?

সাধন-ভজনের ক্লেশ আছে। 'কষ্ট করলে কেষ্ট পায়'। Practice দরকার

আছে জীবনে। মন আমাদের চঞ্চল। সেই চঞ্চল মনকে বশীভূত করতে হয়। অর্জ্জুন প্রশ্ন করেছেন কৃষ্ণের কাছে, গীতার মধ্যে আছে—

চঞ্চলং হি মনঃ কৃষ্ণ প্রমাথি বলবদ্দৃঢ়ম্।
তস্যাহং নিগ্রহং মন্যে বায়োরিব সুদুষ্করম্॥

সখা কৃষ্ণ! তুমি ত' অনেক উপদেশ দিয়েছ, কিন্তু আমি ত' কিছু মনে রাখতে পারছি না, আমার মন বড় চঞ্চল। কৃষ্ণ কি রকম উত্তর দিয়েছেন সেখানে সখাকে,—

অসংশয়ং মহাবাহো মনো দুর্নিগ্রহং চলম্।
অভ্যাসেন তু কৌন্তেয় বৈরাগ্যেণ চ গৃহ্যতে॥

তুমি অভ্যাসযোগ, বৈরাগ্যযোগ অবলম্বন কর, তাহলে তোমার মন নির্জ্জিত হবে, অন্তরাত্মা তোমার শুদ্ধিতা লাভ করবে, তুমি সাধন-ভজন পথে অগ্রসর হবে এবং অন্তিমেতে তুমি আমাকেই পাবে—এই কথাই ত' বলেছেন। সুতরাং কষ্টের প্রয়োজন আছে।

সাধন-ভজনের ক্লেশ আছে, এটাকে স্বীকার করতে হবে, মানতে হবে। যদি আমরা প্রথম মুখেই সবটাকে শেষ করে দেই, তাহলে কি লাভ হবে? ভগবান্ কি ঠুঁটোরাম, তাঁর কি কোন Initiative নেওয়ার ক্ষমতা নাই। তাঁকে নিরাকার কেন বলতে যাচ্ছি? তাঁকে নিরাকার, নির্ব্বিশেষ, নির্গুণ, নিঃশক্তিক—এইসব বিশেষণগুলো প্রয়োগ করলে তাঁর অবমাননা করা হয়, অপমান করা হয়। আমাদের সেই Supreme Guardian ভগবান্—যিনি সর্ব্বেশ্বরেশ্বর, যিনি পরমারাধ্য তত্ত্ব, সর্ব্বেশ্বরের সর্ব্বারাধ্যতত্ত্ব, তাঁকে অস্বীকার করা হয়। এই সকল জিনিসগুলো আমাদের বুঝতে হবে শাস্ত্র আলোচনা করে, সাধু-গুরু বাক্য থেকে। কে বুঝিয়ে দেবেন এসব কথা সমাজকে? বুঝাবার লোক কম আছে, বুঝবার লোকও কম আছে। সেইকথাই ত' আপনারা বেদে, উপনিষদে, গীতার মধ্যে পেয়েছেন,—"আশ্চর্য্যোঽস্য বক্তা কুশলোঽস্য লব্ধা আশ্চর্য্যো জ্ঞাতা কুশলানুশিষ্টঃ॥" এটা বুঝাবার লোক কম আছে। অন্তরদর্শী লোকের অভাব আজ। সেই অভাবটাকে মিটিয়ে দিতে হবে। মানুষ ভুল কথা-গুলো শিখছে। আপাত মনোরম যে কথাগুলো সে গুলোকে মানুষ আজ লুফে নিচ্ছে। তত্ত্বদর্শন থেকে তারা সরে যাচ্ছে। Universal Truth, Axiomatic Truth কে অস্বীকার করতে যাচ্ছে মানুষ আজ। এর থেকে আর আহাম্মক কাকে বলে, নির্ব্বোধ কাকে বলে? যে জিনিসটাকে মেনে নিলে আমাদের পরিচয়, সে জিনিসটাকে অস্বীকার করছে তারা। মানি না, মানি না, ভগবান্

মানি না, কেষ্ট-বিষ্টু কিছু মানি না। তুমি ত' কিছুই মান না, তাহলে কাকে মানছ ? নিজেকে মান ত' ?

বেদাঃ প্রমাণং স্মৃতয়ঃ প্রমাণং ধর্ম্মার্থযুক্তং বচনং প্রমাণম্।
এতৎ প্রমাণং ন ভবেৎ প্রমাণং কস্তস্য কুর্য্যাদ্ বচনং প্রমাণম্॥

বেদ প্রমাণ, স্মৃতিশাস্ত্র প্রমাণ, ধর্ম্মার্থযুক্ত বচন প্রমাণ। এইসব প্রমাণকে যারা অস্বীকার করে, তাদের কথা কে মানবে ? সবটাই অস্বীকার করছেন যারা, আবার তারাই বলতে চাচ্ছেন—আমাকে মান। এ আবার কি কথা ! তুমি ত' কাকেও মান না, তোমাকে আবার কে মানবে হে ? যদি ধর্ম কিছু নয়, ভক্ত কিছু নয়, তাহলে কার কি পরিচয় আছে এ সংসারে ? জানতে পারছি কি করে আমরা তত্ত্বদর্শনটা, জানাবে কে আমাকে, আমাদের উপায় কি আছে ?—মাধ্যম সেখানে 'সদ্‌গুরু'। সেই সদ্‌গুরুর কথা শাস্ত্রে সব জায়গায় বলা আছে। সেই সদ্‌গুরুর শরণাপন্ন হওয়ার কথা লেখা আছে।—

তস্মাদ্ গুরুং প্রপদ্যেত জিজ্ঞাসুঃ শ্রেয় উত্তমম্।
শাব্দে পরে চ নিষ্ণাতং ব্রহ্মণ্যুপশমাশ্রয়ম্॥

সেই সদ্‌গুরুর পদাশ্রয় কর, গুরুদেবতাত্মা হও বলছেন। তিনি ত' উল্টোপাল্টা কথা কিছু শিখাবেন না। সদ্‌গুরু ভগবানের সেবা শিক্ষা দেবেন, সাধু-গুরু-বৈষ্ণবের সেবা শিক্ষা দেবেন।

সমস্ত শাস্ত্র—বেদ, বেদান্ত, উপনিষদ্ সবই সম্বন্ধ, অভিধেয়, প্রয়োজন—এই তিন তত্ত্ব নিয়ে ব্যাখ্যা করেছেন। সবিশেষ, নির্ব্বিশেষ দুটো নিয়েই আলোচনা আছে শাস্ত্রে। আমরা One sided view কেন নেব ? শাস্ত্রে দুরকম কথাই বলা আছে। Negetive idea—সেরকম বহু শব্দ বলা আছে।

অশব্দমস্পর্শমরূপমব্যয়ং তথাঽরসং নিত্যমগন্ধবচ্চ যৎ।
অনাদ্যনন্তং মহতঃ পরং ধ্রুবং নিচায্য তন্মৃত্যুমুখাৎ প্রমুচ্যতে॥
অগ্নির্মূর্দ্ধা চক্ষুষী চন্দ্রসূর্য্যৌ দিশঃ শ্রোত্রে বাগ্বিবৃতাশ্চ বেদাঃ।
বায়ুঃ প্রাণো হৃদয়ং বিশ্বমস্য পদ্ভ্যাং পৃথিবী হ্যেষ সর্ব্বভূতান্তরাত্মা॥

উদাহরণ দিতে গিয়ে বহু কথা এনে ফেলেছি। অতীন্দ্রিয় বস্তুতত্ত্বকে তত্ত্বের সঙ্গে উদাহরণ দিতে গিয়ে পার্থিব জগতের কিছু উদাহরণ এসে গেছে। তাই বলে কি আপ্রকৃত-প্রাকৃত দুটোই সমান হবে ? কখনও নয়। উদাহরণ দেওয়া হয়েছে মাত্র। সব জিনিসটাকে আমাদের As it is করে বুঝতে হবে। উল্টোপাল্টা করলে হবে না। Formula শিখতে হবে, উহা Apply করতেও শিখতে হবে, তবে অঙ্কটা ঠিক হবে। Process, Procedure ঠিক থাকলে

উত্তর মিলবে। আজ এ জাতীয় শিক্ষা সমাজে নাই। এইটারই অভাব হয়ে গেছে। শ্রীগৌড়ীয় মঠ বা শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি সেই জিনিসটা বলতে পিছ্‌পা হবে না। যিনি যত বড় ব্যক্তি হউক না কেন, যদি তত্ত্বদর্শন ভুল করেন, তার বাদ-প্রতিবাদ হবেই। শুনতেই হবে তাকে। কারও রেহাই নাই এ সংসারে।

যদি বলেন, আজ যেমন চলছে সমাজে ধর্ম বলে কিছু নাই, তেমনই করে ধর্মবিদ্‌রা বলবেন রাজনীতি, সমাজনীতি বলে কিছু নাই। হে সমাজনৈতিক নেতাগণ! ওসব কিছু নয়। এইভাবে পরস্পর তত্ত্বদর্শন অস্বীকার করলে কি সব মিটবে? হবে না তা। সবটা মেনে নিতে হচ্ছে পাশাপাশি রেখে। আমরা সেই রাজনীতি মানি না, যে রাজনীতি সুষ্ঠু সনাতন ধর্মের সমালোচনা করে। আমরা সেই সমাজনীতি মানি না, যে সমাজনীতি সুষ্ঠু সনাতন ধর্মের সমালোচনা করে। একথাটা আমাদের বুঝতে হবে। যেখানে নাস্তিক্যবাদ রয়েছে, সেখানে সব শেষ হয়ে গিয়েছে। স্বয়ং কৃষ্ণ গীতার মধ্যে বলছেন, জগতে দুই রকমের লোক আছে অর্জ্জুন। কি দুই রকম? রাজনৈতিক ক্ষেত্রে আমরা শ্লোগান শুনছি—ধনী আর গরীব। কিন্তু কৃষ্ণ ত' সেই বিচার ধরেন নাই। কৃষ্ণ কি বললেন?—

দ্বৌ ভূতসর্গৌ লোকেঽস্মিন্ দৈব আসুর এব চ।
বিষ্ণুভক্তঃ স্মৃতো দৈব আসুরস্তদ্বিপর্য্যয়ঃ॥

শোন, শোন, অর্জ্জুন! এ জগতে দুই শ্রেণীর মানুষ আছে। এক আস্তিক, আর এক নাস্তিক। যারা আমাকে মানে, তারা আস্তিক, দৈবীভাবাপন্ন; আর যারা আমাকে অস্বীকার করে, তারা নাস্তিক, অসুরভাবাপন্ন। তাদের গতি নাই। এসব নাস্তিকের তালিকা কৃষ্ণ নিজেই গীতার মধ্যে দিয়ে গেছেন। সেগুলো আলোচনার বিষয়, আমাদের আলোচনা করতে হবে। ভাল-মন্দের বিচার ঐখানে। একটা লোক ভাল, আর একটা লোক খারাপ—এই বিচারের মধ্যে এনে সেই Formula দিয়ে তাকে কষতে হবে কে ভাল আর কে মন্দ, কে সৎ আর কে অসৎ। এটা শাস্ত্রীয় Theory দিয়েই কষতে হবে। সেখানে কারও কোন খেয়ালখুশী চলবে না। শাস্ত্রীয় যুক্তি চাই এবং সেটা বিজ্ঞানভিত্তিক আলোচনা।

বর্ত্তমান জগতে জ্ঞান-বিজ্ঞানের যে ব্যাখ্যা দেওয়া হচ্ছে, এটা সম্পূর্ণ ভুল ধারণা। শাস্ত্রীয় যে জ্ঞান সেটা ভগবানকে পাওয়ার জ্ঞান, ভগবানকে লাভ করবার জ্ঞান। আর বিজ্ঞান শব্দটা ব্যবহার হয়েছে কখন?—যখন ওটা অনুভূতির মধ্যে এসেছে। শাস্ত্রে এটা ব্যাখ্যা দিয়েছেন।

শ্রীচৈতন্যে মর্ত্ত্যবুদ্ধি—নাস্তিকতা ও অপরাধ

[পূর্ব্বপ্রকাশিত ৪৩শ বর্ষ, ২য় সংখ্যা, ৭৮ পৃষ্ঠার পর]

(১০) লেখক ২৩০।২৩১ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন—"সার্ব্বভৌম এই 'আত্মারামাশ্চ মুনয়ো' শ্লোকটির তেরো রকম ভিন্ন ভিন্ন ব্যাখ্যান করলেন এবং পরিশেষে 'আর শক্তি নাহিক' বলে বিরত হলেন। কিন্তু সেই সঙ্গে এই 'আত্মারামাশ্চ মুনয়ো' শ্লোকের তেরো রকম ব্যাখ্যার পর তদতিরিক্ত এই শ্লোকের বিশ্লেষণ করা যে কারু পক্ষে আর সম্ভব না এ বিষয়েও নিশ্চিৎ ছিলেন সার্ব্বভৌম। কিন্তু পরক্ষণে সার্ব্বভৌম পণ্ডিতকে পরম বিস্ময়ে ফেললেন চৈতন্য। যখন চৈতন্য বললেন, 'এবে শুন আমি কিছু করিয়ে ব্যাখ্যান।'............

মূলতঃ, সার্ব্বভৌমের এই 'আত্মারামাশ্চ মুনয়ো' শ্লোকের তেরো প্রকার ব্যাখ্যার উত্তরে চৈতন্য কি বা কতো প্রকার ব্যাখ্যা করেছিলেন তা যেমন স্পষ্ট নয়, তেমনি, তিনি (চৈতন্য) এই 'আত্মারামাশ্চ মুনয়ো' শ্লোকের সার্ব্বভৌমকৃত তের প্রকার ব্যাখ্যার উত্তরে আদৌ কোন ব্যাখ্যান করেছিলেন কিনা সে বিষয়ে প্রশ্ন জাগে।"

ইহার উত্তর এই যে, 'চৈতন্যভাগবতে' অন্ত্যখণ্ডে লিখিত আছে সার্ব্বভৌম-বর্ণিত ১৩ প্রকার অর্থ ব্যতীত গৌরসুন্দর স্বয়ং অন্য বহুপ্রকার ব্যাখ্যা করেন। সেই সকল ব্যাখ্যার সন্ধান কৃষ্ণেতর কোন ব্যক্তি অনন্তকালেও পায় না। ইহাতে সার্ব্বভৌম পরম বিস্মিত হন এবং মনে ভাবেন—'এই কিবা ঈশ্বর বিদিত।' (চৈঃ ভাঃ অন্ত্য ৩।৯৯)

চৈতন্যচরিতামৃতে লিখিত আছে—সার্ব্বভৌম ৯ প্রকার ব্যাখ্যা করেন, কিন্তু শ্রীমন্মহাপ্রভু তদ্ব্যতীত ১৮ প্রকার ব্যাখ্যা করেন। ইহাতে সার্ব্বভৌম বিস্মিত ও পরাজিত হন। সার্ব্বভৌম মহাপ্রভুর চরণে শরণ লইলে তিনি কৃপা করেন। উভয় গ্রন্থেই মহাপ্রভুকর্ত্তৃক সার্ব্বভৌমের নিকট ষড়্ভুজ মূর্ত্তি প্রকট করার কথা লিখিত আছে। চৈতন্যচরিতামৃতের মধ্যলীলায় চতুর্ব্বিংশ পরিচ্ছেদে উক্ত হইয়াছে যে, সনাতন শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভুর নিকট সার্ব্বভৌম-সমীপে পূর্ব্বে বর্ণিত 'আত্মারামাশ্চ' শ্লোকের ১৮ প্রকার ব্যাখ্যা শুনিতে অভিলাষ করেন: যথা—

"পূর্ব্বে শুনিয়াছোঁ, তুমি সার্ব্বভৌম-স্থানে।
এক শ্লোকে আঠার অর্থ কৈরাছ ব্যাখ্যানে॥
আশ্চর্য্য শুনিয়া মোর উৎকণ্ঠিত মন।
কৃপা করি' কহ যদি, জুড়ায় শ্রবণ॥"

(চৈঃ চঃ মধ্য ২৪।৪,৬)

মহাপ্রভু সার্ব্বভৌম-সমীপে সার্ব্বভৌমের ব্যাখ্যার একটী শব্দও না লইয়া ১৮ প্রকার ব্যাখ্যা করেন। সনাতনের প্রার্থনা-মতে মহাপ্রভু "আত্মারামাশ্চ মুনয়ঃ"—শ্লোকের পূর্ব্বকৃত ১৮ প্রকার অর্থ ছাড়িয়া সর্বসাকুল্যে ৬১ প্রকার অর্থ করিয়াছিলেন এবং তাহা শুনিয়া সনাতন বিস্মিত হইয়া মহাপ্রভুর স্তুতি করেন। যথা শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত বাণী—

"একষষ্টি অর্থ এবে স্ফুরিল তোমা-সঙ্গে।
তোমার ভক্তিবশে উঠে অর্থের তরঙ্গে॥"

(চৈঃ চঃ মধ্য ২৪।৩১২)

"অর্থ শুনি' সনাতন বিস্মিত হঞা।
স্তুতি করে মহাপ্রভুর চরণে ধরিয়া॥"

(চৈঃ চঃ মধ্য ২৪।৩১৪)

"সাক্ষাৎ ঈশ্বর তুমি, ব্রজেন্দ্রনন্দন।
তোমার নিঃশ্বাসে সর্ব্ববেদ-প্রবর্ত্তন॥"

(চৈঃ চঃ মধ্য ২৪।৩১৫)

এমতাবস্থায় শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ও শ্রীচৈতন্যভাগবত গ্রন্থদ্বয় আলোচনা করিলে স্পষ্টই জানা যায় যে, সার্ব্বভৌম-কর্ত্তৃক 'আত্মারামাশ্চ মুনয়ঃ' শ্লোকের ব্যাখ্যার উত্তরে শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু ১৮ প্রকার ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন। তাই সার্ব্বভৌমের ব্যাখ্যার উত্তরে চৈতন্যমহাপ্রভু আদৌ কোন ব্যাখ্যান করিয়াছিলেন কিনা—এই প্রশ্ন লেখকের মনে জাগার কারণ 'চৈতন্যচরিতামৃত' ও 'চৈতন্যভাগবত'-গ্রন্থদ্বয়ের বিষয়বস্তু সম্পর্কে লেখকের অজ্ঞতা। কাশীতে সকলের আগ্রহে শ্রীমন্মহাপ্রভু-কর্ত্তৃক 'আত্মারামাশ্চ মুনয়ঃ' শ্লোকের ৬১ প্রকার অর্থ ব্যাখ্যান; যথা—

"তবে সব লোক শুনিতে আগ্রহ করিল।
'একষষ্টি' অর্থ প্রভু বিবরি' কহিল॥
শুনিয়া লোকের বড় চমৎকার হৈল।
চৈতন্য গোসাঞি—'শ্রীকৃষ্ণ', নির্দ্ধারিল॥

(চৈঃ চঃ মধ্য ২৫।১৬২-১৬৩)

এক্ষণে 'আত্মারামাশ্চ মুনয়ঃ' শ্লোকের ৬১ প্রকার ব্যাখ্যা করা কি কোন মানুষের পক্ষে সম্ভব হইতে পারে? তাই শ্রীচৈতন্যদেব যে স্বয়ং ভগবান্—ইহাতে সন্দেহ নাই।

ভগবান্ শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভুর লীলার মধ্য দিয়া তাঁহার পূর্ণ ঐশ্বর্য্য, বীর্য্য,

যশঃ, শ্রী, জ্ঞান ও বৈরাগ্য প্রকাশিত হইয়া পড়ে এবং তদ্দ্বারাই ভগবানকে চেনা যায়। কিন্তু ভক্ত ব্যতীত কাহারও হৃদয়ে ভগবানের এই গুণগুলি স্পর্শ করে না।

(১১) লেখক ১১৪ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন—"আবার যুগপৎ ঐতিহাসিক ও ভক্ত চৈতন্য জীবনী-চরিতকারদের সৃষ্টি ভগবান চৈতন্যের ভেতর থেকে মানুষ চৈতন্যকে খুঁজে আনা দুরূহ নয় বলছি এজন্য যে,

'কেবলং শাস্ত্রমাশ্রিত্য ন কর্ত্তব্যো বিনির্ণয়ঃ।
যুক্তিহীন বিচারেণ ধর্ম্মহানিঃ প্রজায়তে ॥'　　[চার্বাক-দর্শন]

অর্থাৎ, কেবলমাত্র শাস্ত্র অবলম্বন করে তত্ত্ব নির্ণয় করা উচিত নয়। যেহেতু যুক্তিহীন বিচারে ধর্মহানি ঘটে।"

১৯৪ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন—"সুতরাং পাঁচশো বছর ধরে চৈতন্যকে পণ্ডিত বলেছি বলে যে আজও তাঁকে পণ্ডিত বলতে হবে এমন কোন কথা নেই। এ পর্য্যন্ত যুধিষ্ঠির বাবুর প্রভুজীর বকলমে লেখা বক্তব্য ঠিকই আছে। এবং তাঁর সঙ্গে আমরাও একমত। কিন্তু মুশকিল বাধাচ্ছে চার্বাক কবির সেই অমোঘ শ্লোকটি—

'কেবলং শাস্ত্রমাশ্রিত্য ন কর্ত্তব্যো বিনির্ণয়ঃ।
যুক্তিহীন বিচারেণ ধর্ম্মহানিঃ প্রজায়তে ॥"

অর্থাৎ কেবল শাস্ত্র দিয়ে কোন কিছুর বিচার নির্ণয় করলে চলবে না। তাকে যুক্তি দিয়েও বিচার করতে হবে, নচেৎ তা ধর্ম্মহানির কারণ ঘটে।"

লেখকের উপরোক্ত মন্তব্য অনুযায়ী জানা যায় যে, লেখক শ্রীচৈতন্যদেবকে পণ্ডিত বলিতে সম্মত নহেন। মহাপ্রভুর আচারমুখী পাণ্ডিত্যের প্রতিভায় অভিভূত হইয়া ভারবাহী প্রকাশানন্দের চিত্ত বিগলিত হইয়াছিল। মহাপণ্ডিত সার্ব্বভৌম যাঁহার নিকট শাস্ত্রবিচারে পরাস্ত হইয়াছিলেন; কাশ্মীর-দেশীয় 'কেশব' নামক পণ্ডিত নিজ প্রতিভাদ্বারা পণ্ডিতগণকে জয় করিবার মানসে বহির্গত হইয়া অবশেষে নবদ্বীপে আসিয়া যাঁহার নিকট পরাজয় স্বীকার করেন; রূপ-সনাতন প্রভৃতি পণ্ডিতবর্গ যাঁহার অন্তরঙ্গ শিষ্য ও পার্ষদ—সেই শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভুকে লেখক পণ্ডিত বলিয়া স্বীকার না করিলে লোকে লেখককে বাহবা দিবে, না উপহাস করিবে? লেখক কি 'পণ্ডিত' শব্দের অর্থ জানেন? 'পণ্ডা' শব্দ হইতে 'পণ্ডিত' শব্দের উৎপত্তি হইয়াছে। 'পণ্ডা' শব্দের অর্থ 'শাস্ত্রে উজ্জ্বলা বুদ্ধি।' অতএব শাস্ত্রে উজ্জ্বলা বুদ্ধি থাকা পণ্ডিতের লক্ষণ। শ্রীমদ্ভাগবত বলেন—"মূর্খো দেহাদ্যহং বুদ্ধিঃ পণ্ডিতো বন্ধমোক্ষবিৎ।"

অর্থাৎ "দেহাদিতে আত্ম-বুদ্ধিবিশিষ্ট প্রাকৃত সহজিয়াগণই মূর্খ এবং বন্ধন ও মোক্ষ সম্বন্ধে অভিজ্ঞ ব্যক্তিগণই পণ্ডিত।" মহাভারতে দৃষ্ট হয়—

"পাঠকা পাঠকাশ্চৈব যে চান্যে শাস্ত্র-চিন্তকাঃ।
সর্ব্বে ব্যসনিনো মূর্খাঃ যঃ ক্রিয়াবান্ স পণ্ডিতঃ॥"

অর্থাৎ—"যে-সকল অধ্যাপক কলি-পঙ্কের সেবনকারী, তাহারা মূর্খ। কিন্তু যাঁহারা শাস্ত্রের নির্দ্দেশানুযায়ী আচরণ করেন, জড়ীয় পাণ্ডিত্য না থাকিলেও তাঁহারাই পণ্ডিত।" অতএব ভারবাহিগণকে পণ্ডিত বলা যায় না। যাঁহারা শাস্ত্রের তাৎপর্য্য অনুযায়ী আচরণ করেন, সেই সারগ্রাহিগণই পণ্ডিত। 'পণ্ডিত' শব্দের উক্ত সংজ্ঞা থাকায় লেখক পণ্ডিত পর্য্যায়ে পড়েন কিনা সুধী পাঠকগণ বিচার করিবেন।

লেখক তাঁহার পুস্তকে দুইবার চার্ব্বাকের শ্লোক উল্লেখ করিয়াছেন। চার্ব্বাক প্রত্যক্ষবাদী,—তিনি যে প্রত্যক্ষকে স্বীকার করিয়াছেন—তাহা অবৈদুষ প্রত্যক্ষ। ঐন্দ্রজালিকের ম্যাজিক প্রত্যক্ষ দেখা গেলেও তাহা ভ্রান্ত। স্থূল দৃষ্টিসম্পন্ন ব্যক্তিরাই চার্ব্বাকের মতানুযায়ী পঞ্চভূতাত্মক দেহকেই আত্মা বলিয়া মনে করে। যাঁহারা চার্ব্বাকের আনুগত্য করেন, তাঁহারা ঈশ্বরবিমুখ,—সুতরাং নাস্তিক। অপ্রাকৃততত্ত্বকে দর্শন করিতে হইলে তাহা প্রত্যক্ষ প্রভৃতি অতিক্রম করিয়া শব্দ প্রমাণের আশ্রয় লইতে হইবে। চক্ষু প্রাকৃত, কাজেই চক্ষুদ্বারা যে বস্তু দেখা যায় তাহাও প্রাকৃত। জড়েতে অভিনিবেশবশতঃ জড়োত্থভাবসমূহকে মন বলা হয়। উক্ত জড়োত্থ ভাবসমূহের বিচারপ্রবণ দিক্‌ই বুদ্ধি। তাই জড়বুদ্ধি ও মন লইয়া যে যুক্তি গ্রহণ করা যায়, তাহাও প্রাকৃত। শব্দব্রহ্ম অর্থাৎ শ্রুতি-শাস্ত্র-সিদ্ধান্ত ব্যতীত মনোধর্ম্মের যুক্তিবিচারে চালিত হইলে অপ্রাকৃত তত্ত্ব জানা যায় না। লেখক নিবেদনে গীতার অমোঘ-বাণী স্মরণ করিয়াছেন সত্য, কিন্তু ১১৪ এবং ১৯৪ পৃষ্ঠায় দুইবার জ্ঞানবাদী নাস্তিক চার্ব্বাকের একই শ্লোক বিবৃত করিয়াছেন,—ইহাতে চার্ব্বাকের দর্শনকেই লেখক যে বহুমানন করিয়াছেন, তাহা সহজেই বুঝা যাইতেছে।

নৈয়ায়িক হেতুবাদিগণ, কর্ম্মজড়স্মার্ত্তগণ, নির্ব্বিশেষ মায়াবাদিগণ ও নাস্তিকগণ কখনও শ্রীচৈতন্যদেবের বৈশিষ্ট্য উপলব্ধি করিতে পারেন না। "ধর্ম্মমূলং হি ভগবান্" (ভাঃ ৭।১১।৭)—যতপ্রকার ধর্ম্মের ব্যবস্থা আছে, তাহার মূল উদ্দেশ্য হইল ভগবান্ শ্রীহরি।

(ক্রমশঃ)

—শ্রীচৈতন্যকৃষ্ণ দাসাধিকারী

॥ শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ ॥

স বৈ পুংসাং পরো ধর্ম্মো যতো ভক্তিরধোক্ষজে।

ধর্ম্মঃ স্বনুষ্ঠিতঃ পুংসাং বিষ্বক্সেন-কথাসু যঃ।

গৌড়ীয়-পত্রিকা

নোৎপাদয়েদ্যদি রতিং শ্রম এব হি কেবলম্॥

অহৈতুক্যপ্রতিহতা যয়াত্মা সুপ্রসীদতি॥

সেই ধর্ম্ম শ্রেষ্ঠ যাতে আত্ম-পরসন।
অধোক্ষজে অহৈতুকী ভক্তি বিঘ্নশূন্য॥

অন্য ধর্ম্ম সুষ্ঠুরূপে পালে যেই জন।
হরি-কথায় রতি নৈলে পণ্ড সেই শ্রম॥

৪৩শ বর্ষ } ১৮ ত্রিবিক্রম, ক্ষীরোদশায়ী, ৫০৫ শ্রীগৌরাব্দ
৩১ জ্যৈষ্ঠ, শনিবার, ১৩৯৮, ইং ১৫।৬।৯১ } ৪র্থ সংখ্যা

সানুবাদং

সিদ্ধ-ব্রহ্মর্ষিগণ-কৃতং শ্রীবরাহদেব-স্তোত্রম্

[শ্রীকৌর্ম্মে মহাপুরাণে পূর্ব্বভাগে পৃথিব্যুদ্ধারে ষষ্ঠেঽধ্যায়ে]

শ্রীকূর্ম্ম উবাচ,—

[পৃথিব্যুদ্ধরণার্থায় প্রবিশ্য চ রসাতলম্।
দংষ্ট্রয়াভ্যুজ্জহারৈনামাত্মাধারো ধরাধরঃ॥
দৃষ্ট্বা দংষ্ট্রাগ্র-বিন্যস্তাং পৃথ্বীং প্রথিত-পৌরুষম্।
অস্তুবন্ জনলোকস্থাঃ সিদ্ধা ব্রহ্মর্ষয়ো হরিম্॥ ৯-১০ ॥]

[পৃথিবীকে সলিলমধ্যে নিমগ্না জানিয়া, তাঁহার উদ্ধারসাধনের নিমিত্ত প্রস্তুত হইয়া ব্রহ্মসংজ্ঞিত পরমপুরুষ বরাহের রূপ অবলম্বনপূর্ব্বক রসাতলে প্রবেশ করত এই ধরিত্রীকে দন্তদ্বারা উদ্ধার করিয়াছিলেন। তাঁহার দন্তে পৃথিবীকে

বিস্মৃতা দেখিয়া, জন-লোকস্থ সিদ্ধ ও ব্রহ্মর্ষিগণ প্রথিতযশাঃ হরিকে স্তব করিতে প্রবৃত্ত হইলেন।]

ঋষয় উচুঃ,—

১। নমস্তে দেবদেবায় ব্রহ্মণে পরমেষ্ঠিনে।
পুরুষায় পুরাণায় শাশ্বতায়াজরায় চ ॥ ১১ ॥

ঋষিগণ বলিলেন,—হে দেবদেব, ব্রহ্মন্, পরমেষ্ঠিন্, পুরাণ-পুরুষ, শাশ্বত, অজর! তোমাকে নমস্কার ॥ ১১ ॥

২। নমঃ স্বয়ম্ভুবে তুভ্যং স্রষ্ট্রে সর্ব্বার্থবেদিনে।
নমো হিরণ্যগর্ভায় বেধসে পরমাত্মনে ॥ ১২ ॥

হে স্বয়ম্ভু, সৃষ্টিকারিন্, সর্ব্বার্থবেদিন্, হিরণ্যগর্ভ, বেধঃ পরমাত্মন্! তোমাকে নমস্কার ॥ ১২ ॥

৩। নমস্তে বাসুদেবায় বিষ্ণবে বিশ্বযোনয়ে।
নারায়ণায় দেবায় দেবানাং হিতকারিণে ॥ ১৩ ॥

হে বাসুদেব, বিষ্ণো, বিশ্বযোনে, নারায়ণ, দেবদেব, হিতকারিন্! তোমাকে নমস্কার ॥ ১৩ ॥

৪। নমোঽস্তু তে চতুর্ব্বক্ত্র-শার্ঙ্গ-চক্রাসি-ধারিণে।
সর্ব্বভূতাত্ম-ভূতায় কূটস্থায় নমো নমঃ ॥ ১৪ ॥

হে চতুর্মুখ, শার্ঙ্গ-চক্র-অসিধারিন্, সর্ব্বভূতের আত্মস্বরূপ, কূটস্থ! তোমাকে নমস্কার ॥ ১৪ ॥

৫। নমো বেদরহস্যায় নমস্তে বেদযোনয়ে।
নমো বুদ্ধায় শুদ্ধায় নমস্তে জ্ঞানরূপিণে ॥ ১৫ ॥

হে বেদরহস্যে, বেদযোনে, বুদ্ধ, শুদ্ধ-জ্ঞানরূপিন্! তোমাকে নমস্কার ॥ ১৫ ॥

৬। নমোঽস্ত্বানন্দ-রূপায় সাক্ষিণে জগতাং নমঃ।
অনন্তায়াপ্রমেয়ায় কার্য্যায় কারণায় চ ॥ ১৬ ॥

হে আনন্দরূপ, জগৎসাক্ষিন্, অনন্ত, অপ্রমেয়, কার্য্যকারণ! তোমাকে নমস্কার ॥ ১৬ ॥

৭। নমস্তে পঞ্চভূতায় পঞ্চভূতাত্মনে নমঃ।
নমো মূলপ্রকৃতয়ে মায়ারূপায় তে নমঃ ॥ ১৭ ॥

হে পঞ্চভূত-স্রষ্টা, হে পঞ্চভূত-নিয়ামক, মূলপ্রকৃতির অধীশ্বর, মায়া নিয়ন্তা! তোমাকে নমস্কার ॥ ১৭ ॥

৮। নমোঽস্তু তে বরাহায় নমস্তে মৎস্যরূপিণে।
নমো যোগাধিগম্যায় নমঃ সঙ্কর্ষণায় তে ॥ ১৮ ॥

হে বরাহ, মৎস্যরূপিন্, যোগাধিগম্য, সঙ্কর্ষণ! তোমাকে নমস্কার ॥ ১৮ ॥

৯। নমস্ত্রিমূর্ত্তয়ে তুভ্যং ত্রিধাম্নে দিব্যতেজসে।
নমঃ সিদ্ধায় পূজ্যায় গুণত্রয়-বিভাগিনে ॥ ১৯ ॥

হে ত্রিমূর্ত্তে, ত্রিধামন্, দিব্যতেজঃ, সিদ্ধপূজ্য, গুণত্রয়-বিভাগিন্! তোমাকে নমস্কার ॥ ১৯ ॥

১০। নমোঽস্ত্বাদিত্যরূপায় নমস্তে পদ্মযোনয়ে।
নমোঽমূর্ত্তায় মূর্ত্তায় মাধবায় নমো নমঃ ॥ ২০ ॥

হে আদিত্যরূপ পদ্মযোনে অমূর্ত্ত, মূর্ত্ত, মাধব! তোমাকে নমস্কার ॥ ২০ ॥

১১। ত্বয়ৈব সৃষ্টমখিলং ত্বয্যেব সকলং স্থিতম্।
পালয়ৈতজ্জগৎ সর্ব্বং ত্রাতা ত্বং শরণং গতিঃ ॥ ২১ ॥

তুমিই সকল সৃষ্টি করিয়াছ, তোমাতেই সমুদয় অবস্থিত; তুমি এই জগৎ পালন কর; তুমি রক্ষিতা, তুমি শরণ, তুমিই গতি ॥ ২১ ॥

[সেই বরাহদেহধারী ঈশ্বর ভগবান্ বিষ্ণু সনকাদি ঋষিকর্ত্তৃক এইরূপে স্তুত হইয়া তাঁহাদের প্রতি অনুগ্রহ প্রদর্শন করিলেন।]

মায়াবাদী কাহাকে বলি ?

যিনি শুদ্ধ-বৈষ্ণব হইতে বাসনা করেন, তিনি যেন মায়াবাদী না হন। শ্রীশ্রীমহাপ্রভু বলিয়াছেন,—

প্রভু কহে,—মায়াবাদী কৃষ্ণে অপরাধী।
'ব্রহ্ম', 'আত্মা', 'চৈতন্য' কহে নিরবধি ॥
অতএব তার মুখে না আইসে কৃষ্ণনাম।
কৃষ্ণনাম, কৃষ্ণস্বরূপ দুইত সমান ॥
নাম, বিগ্রহ, স্বরূপ—তিন একরূপ।
তিনে ভেদ নাহি, তিন চিদানন্দ-রূপ ॥
দেহ-দেহীর, নাম-নামীর কৃষ্ণে নাহি ভেদ।
জীবের ধর্ম্ম-নাম-দেহ-স্বরূপে বিভেদ ॥

অতএব কৃষ্ণের নাম, দেহ, বিলাস।
প্রাকৃতেন্দ্রিয়-গ্রাহ্য নহে, হয় স্বপ্রকাশ॥
কৃষ্ণনাম, কৃষ্ণগুণ, কৃষ্ণলীলাবৃন্দ।
কৃষ্ণের স্বরূপসম, সব চিদানন্দ॥
অতএব কৃষ্ণনাম না আইসে তার মুখে।
মায়াবাদিগণ, যাতে মহা-বহির্ম্মুখে॥ (চৈঃ চঃ মঃ ১৭শ অধ্যায়)

যিনি মায়াবাদী তিনি স্বরূপতঃ কৃষ্ণ-অপরাধী। তিনি বলেন যে,—কৃষ্ণমূর্ত্তি, কৃষ্ণনাম ও কৃষ্ণলীলা মায়িক। 'মায়িক'-শব্দের অর্থ এই যে, মায়ামিশ্রিত অর্থাৎ জড়ময়। **মায়াবাদীর মতে শুদ্ধতত্ত্ব নিরাকার ও নির্ব্বিশেষ।** কার্য্য-উপরোধে সেই শুদ্ধতত্ত্ব মায়াকে আশ্রয় করিয়া রাম-কৃষ্ণাদি জড়ীয় শরীর স্বীকার করেন। শুদ্ধতত্ত্বের নাম—ব্রহ্ম, পরমাত্মা বা চৈতন্য। রাম-কৃষ্ণাদি মূর্ত্তি জড়োদিত। রাম-কৃষ্ণাদি নামও জড়-শব্দাধীন। রাম-কৃষ্ণাদির বিলাস জড়াশ্রিত। তবে জীবে ও রাম-কৃষ্ণাদিতে ভেদ এই যে, জীব কর্ম্মদোষে বা গুণে জড়শরীর পাইতে বাধ্য হন; কিন্তু চৈতন্য নিজ ইচ্ছাতে জড়শরীর গ্রহণ করিয়া জগতে কার্য্য করেন এবং নিজ ইচ্ছামতে পুনরায় জড় শরীর ত্যাগ করেন। অতএব রাম-কৃষ্ণাদির নাম, স্বরূপ ও লীলা মায়া-আশ্রয় হইতেই হয়। যে-পর্য্যন্ত সাধক জ্ঞান লাভ না করেন, সে-পর্য্যন্ত রাম-কৃষ্ণাদির উপাসনা করিবেন। জ্ঞান লাভ হইলে ব্রহ্ম, পরমাত্মা, চৈতন্য এইমাত্র জপ করিবেন। আর রাম-কৃষ্ণরূপ জড়ীয় নাম ও ধ্যানে তখন প্রয়োজন হয় না।

মায়াবাদী সুতরাং রামকৃষ্ণ-স্বরূপকে শুদ্ধতত্ত্ব অপেক্ষা হেয় জ্ঞান করেন। **এইজন্যই মায়াবাদী কৃষ্ণ-অপরাধী।** মায়াবাদীর মুখ হইতে যে কৃষ্ণনাম নিঃসৃত হয়, তাহা কৃষ্ণনাম নয়। তাহা কেবল-কৃষ্ণনামের প্রতিবিম্ব আভাস মাত্র। অতএব তাহা উচ্চারণ করিয়াও মায়াবাদী নামাপরাধ-দোষে পতিত।

বস্তুতঃ কৃষ্ণনাম কি, তাহা কথিত হইতেছে:—**কৃষ্ণনাম, কৃষ্ণস্বরূপ ও কৃষ্ণ-বিগ্রহ—তিনই এক তত্ত্ব, অর্থাৎ সচ্চিদানন্দ-স্বরূপ। তিনই জড়াতীত ও মায়াতীত, অতি শুদ্ধতত্ত্ব।** কৃষ্ণ-বিগ্রহের কান্তি বিস্তৃত হইয়া মায়াবাদীর অনুসন্ধেয় ব্রহ্ম কল্পিত হইয়াছে। কৃষ্ণনামের নির্ব্বিশেষ নামান্তর ব্রহ্ম, আত্মা বা চৈতন্য। কৃষ্ণ-স্বরূপের এক অংশ পরমাত্মা। অতএব মায়াবাদীর দোষ এই যে, তিনি শুদ্ধতত্ত্ব যে কৃষ্ণতত্ত্ব, তাহা জানেন না। বদ্ধজীবের দেহ ও জীবরূপ দেহী পৃথক্। বদ্ধজীবের নাম ও সিদ্ধনাম যে কৃষ্ণদাস, তাহা পৃথক্;

যেহেতু বদ্ধজীবে একটী সিদ্ধতত্ত্ব ও একটী মায়িকতত্ত্ব মিশ্রিত আছে। কৃষ্ণে সেরূপ নাই, কৃষ্ণে সেরূপ থাকারও প্রয়োজন নাই। **কৃষ্ণ চিচ্ছক্তিদ্বারা স্বীয় অতীন্দ্রিয় নাম, রূপ ও বিগ্রহ জীবের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য করিয়াছেন।** তাঁহাকে কর্ম্মবশ জীবের ন্যায় মায়াশক্তি অর্থাৎ জড়মায়ার আশ্রয় লইতে হয় না। তিনি স্বীয় যোগমায়াদ্বারা সমস্ত লীলা করিয়াছেন। সেইসব লীলা তাঁহার কৃপানুগত যোগমায়াকৃত জড়জগতে প্রকট হইয়াছে। তাহা কেবল কৃষ্ণের অবিচিন্ত্য শক্তির পরিচয়। নির্ব্বোধ জীব আপনার ন্যায় কৃষ্ণকে হীনবল বুঝিয়া তাহাতে জড়শক্তির ক্রিয়া আরোপ করে এবং শক্তিতত্ত্বের অনভিজ্ঞতা-প্রযুক্ত মায়াশক্তি ব্যতীত তিনি জড়জগতে প্রকট হইতে পারেন না—এই সিদ্ধান্ত করিয়া মায়াবাদী হয়।

বস্তুতঃ **কৃষ্ণনাম, কৃষ্ণদেহ ও কৃষ্ণবিলাস নিত্য স্বপ্রকাশ-তত্ত্ব।** কোন জড়ীয় সূর্য্য, চন্দ্র বা তারকা বা জড়েন্দ্রিয় চক্ষু-কর্ণাদিদ্বারা তিনি প্রকাশ হন না। মানবের প্রাকৃতেন্দ্রিয় কৃষ্ণ-রূপ দেখিতে পায় না ও প্রাকৃত জিহ্বা কৃষ্ণ-নাম উচ্চারণ করিতে পারে না। তাহারা যাহা দেখে ও উচ্চারণ করে, সমস্তই জড়তত্ত্ব। ভক্তি একটী অতীন্দ্রিয় ব্যাপার। জীবের চিদ্বিভাগে তাঁহার অধিষ্ঠান। যখন ভক্তি বলবতী হইয়া জীবের চক্ষু-কর্ণ-নাসিকা ও জিহ্বাকে স্বীয় শক্তিতে ভাবিত করেন, তখন তত্তৎ ইন্দ্রিয়ে চিচ্ছক্তির আবির্ভাব হইয়া চিন্ময় ইন্দ্রিয়গণকে প্রকাশ করে। তখনই যে কৃষ্ণবিগ্রহ দর্শন ও কৃষ্ণনাম উচ্চারণ হয়, তাহা প্রকৃত রূপ ও নাম হইয়া থাকে। মায়াবাদী শুদ্ধভক্তি-বিহীন, কেবল পার্থিব জ্ঞানের চালনায় ব্রহ্মাদি তত্ত্ব ব্যতিরেক পথে অনুশীলন করেন। সুতরাং অন্বয়পথলব্ধ ভক্তির কোন ক্রিয়া তাঁহাতে সম্ভব হয় না। অতএব মায়াবাদী নিরন্তর কৃষ্ণবহির্ম্মুখ ও কৃষ্ণাপরাধী।

ইহাতে বুঝিতে হইবে যে, মায়াবাদী সাধনকালে যে কৃষ্ণ-কীর্ত্তনাদি করেন, তাহাও অপরাধ। **তাঁহার কৃষ্ণ-কীর্ত্তনে শুদ্ধভক্তের অনুমোদন করা উচিত নয়।** কেননা, তাঁহার সংসর্গে নামাপরাধ সম্ভব। মায়াবাদী যদিও কীর্ত্তনে অশ্রু-পুলকাদি ও অন্যান্য সাত্ত্বিকভাব প্রকাশ করেন, তাহা শুদ্ধ নয়। তাহা কেবল সাত্ত্বিক ভাবাভাস, প্রতিবিম্ব-লক্ষণ অপরাধ-বিশেষ। ইহার উদাহরণ শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধু-গ্রন্থে, যথা—

বারাণসীনিবাসী কশ্চিদয়ং ব্যাহরন্ হরেশ্চরিতম্।
যতিগোষ্ঠ্যামুৎপুলকঃ সিঞ্চতি গণ্ডদ্বয়ীমস্রৈঃ॥ (ভঃ রঃ সিঃ ২।৩।৪৯)

বারাণসী-নিবাসী সন্ন্যাসিগণ প্রসিদ্ধ মায়াবাদী। তাঁহারাই যে

কেবল মায়াবাদী এরূপ নয়, **তাঁহাদের মতস্থ পঞ্চোপাসক গৃহস্থসকলও মায়াবাদী**। যিনি মায়াবাদ-মত স্বীকার করিয়াছেন, তিনিই মায়াবাদী। বৈষ্ণবমন্ত্রে দীক্ষিত হইলেও ঐ মতবাদিগণকে মায়াবাদী বলা যায়। এমত কি, মহাপ্রভু চৈতন্যদেবের অন্তরঙ্গ বলিয়া যাঁহারা পরিচয় দেন, তাঁহাদের মধ্যেও অনেক মায়াবাদী আছেন। অনেক বাউল-দরবেশের মত—মায়াবাদ।

নামাভাস-দোষযুক্ত অনেকেই মায়াবাদী। তন্মধ্যে যাঁহারা মায়াবাদী, তাঁহারা অপরাধী। যাঁহারা কোন 'বাদ' জানেন না, অথচ শাস্ত্রীয় শ্রদ্ধা লাভ না করিয়াও বিষ্ণুমন্ত্রে দীক্ষিত হইয়াছেন, তাঁহারা ছায়া-নামাভাসী। ছায়া-নামাভাসী কনিষ্ঠ-বৈষ্ণব বলিয়া পরিচিত। কিন্তু নির্ম্মায়িক ভগবদ্ভাব যে-পর্য্যন্ত না পাওয়া যায়, সে-পর্য্যন্ত 'শুদ্ধবৈষ্ণব'-পদবী লাভ করিতে পারেন না। মধ্যম অধিকারী ও উত্তম অধিকারিগণ শুদ্ধবৈষ্ণব। কনিষ্ঠ অধিকারিগণ ছায়া-নামাভাসী। তাঁহারাও সাধুসঙ্গক্রমে মধ্যম অধিকারী শীঘ্রই হইয়া থাকেন।

মায়াবাদী প্রতিবিম্ব-নামাভাসী; অতএব অপরাধী। ইঁহাদের পক্ষে শুদ্ধ বৈষ্ণব হওয়া বড়ই কঠিন। যতই সাত্ত্বিকভাবের আভাস প্রকাশ করুন না কেন, তাঁহাদিগকে বৈষ্ণব বলা যাইবে না।

মায়াতীত চিচ্ছক্তিসম্পন্ন ভগবৎস্বরূপ বিগ্রহ ও নামকে এক অখণ্ড তত্ত্ব জানিয়া এবং তদ্রূপ তত্ত্বে বিশ্বাসী বৈষ্ণবকে ভ্রাতৃস্নেহপূর্ব্বক যিনি বৈষ্ণবধর্ম্মের শ্রদ্ধা করেন, তাঁহার শ্রদ্ধার নাম—**শাস্ত্রীয় শ্রদ্ধা**। এইরূপ শ্রদ্ধা যাঁহার নাই, তিনি মায়াবাদ-দূষিত না হইলেও 'শুদ্ধ-বৈষ্ণব'-পদবী লাভ করিতে পারেন না। **মায়াবাদ-মত যাঁহার আছে, তিনি অবৈষ্ণব। মায়াবাদীর অষ্টসাত্ত্বিক বিকারাদিও কাজের নয়**। শুদ্ধবৈষ্ণবের যদি কৃষ্ণনামে একটু চক্ষু আর্দ্র হয়, তাহাও বাঞ্ছনীয়।

আজকাল এ সম্বন্ধে অনেক ভেল চলিতেছে বলিয়া আমরা এই বিষয়টী এত স্পষ্ট করিয়া লিখিলাম। পরের চর্চ্চা করা বৈষ্ণবের কর্ত্তব্য নয়, অতএব আমারা পরচর্চ্চা করিতেছি না। কেবল শুদ্ধবৈষ্ণবদিগকে স্বীয় পদে দৃঢ় রাখিবার জন্য এই কয়টীর এতদূর আলোচনা করিলাম।

—**জগদ্গুরু শ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুর**

———

ইহলোক

এই বিশ্বে স্থূল ও সূক্ষ্ম আকারবিশিষ্ট বস্তুসমূহের দ্রষ্টা বা জ্ঞাতারূপে বিভিন্ন প্রাণী বিচরণ করে। প্রাণিগণের পাঁচটী জ্ঞানেন্দ্রিয় ও মন আছে। এই ইন্দ্রিয়গণের সাহায্যে যাহা উপলব্ধ হয়, তাহাকেই ইহলোক বলে। জীবগণ ইন্দ্রিয়-সাহায্যে যে জ্ঞান লাভ করেন, তাহা অক্ষজ জ্ঞানমাত্র। ইন্দ্রিয়ের অবঘাতে, অভাবে ও বিকারে পরিদৃশ্যমান জগতের অনেকাংশ পরিলক্ষিত হয় না। আবার, নানাপ্রকারে ইন্দ্রিয়-চালনাদ্বারা অনুমানাদির সাহায্যে দৃশ্যবস্তুর সম্বন্ধে অনেকটা অভিজ্ঞতা জন্মে। এই অক্ষজ জ্ঞানেন্দ্রিয়গুলি চারিপ্রকার দোষে দুষ্ট হইবার যোগ্য। শাস্ত্রে এই দোষচতুষ্টয়কে ভ্রম, প্রমাদ, বিপ্রলিপ্সা ও করণাপাটব বলে। জগতের প্রাণিগণ এই চারিপ্রকার দোষে বিজড়িত হইয়া প্রত্যক্ষ ও অনুমানাদি অক্ষ-সাপেক্ষ ধারণায় দৃশ্যজগৎ ভোগ করেন। যাঁহারা ভোগপরায়ণ, তাঁহারাই ইন্দ্রিয়গণের সাহায্যে ঐহিক ও লৌকিক জ্ঞানদৃপ্ত হইয়া নিজ নিজ ইন্দ্রিয়তর্পণে সমর্থ হন। যেখানে ইন্দ্রিয়-তৃপ্তির ব্যাঘাত ঘটে, সেখানে ইন্দ্রিয় পরিচালনার সঙ্কোচ দেখিতে পাওয়া যায়। ইহলোকে কর্ম্মের কর্ত্তা ইন্দ্রিয়তর্পণে অকৃতকার্য্য হইয়া দৃশ্যজগতের প্রতি বিরাগ-ভাবের পোষণ করেন। ভোগিগণের ইন্দ্রিয়তর্পণে ব্যাঘাত ঘটিলেই তাঁহারা ব্রতপরায়ণ কৃচ্ছ্রসাধন, কর্ম্মফলভোগ-বিরত সন্ন্যাস ও বাহ্যবস্তু-গ্রহণে বৈরাগ্য প্রদর্শন করেন। জগৎ দুঃখময়—কতিপয় কর্ম্মীর এই ধারণা, আর কতকগুলি লোক ইন্দ্রিয়তর্পণের আদর্শকে সৎকর্ম্ম-প্রাপ্য জ্ঞান করেন। ইহলোকে ইন্দ্রিয়গুলি নশ্বর, ইন্দ্রিয়তৃপ্তির বিষয়গুলিও চিরস্থায়ী নহে। সুতরাং, ইহলোকে বিচরণকালে প্রাণিগণ সুখার্থী হইয়া ইন্দ্রিয় পরিচালনা করেন, কিন্তু বিধির কঠিন নিয়তিবলে তাঁহাদের কপালে "সে গুড়ে বালিই" হইয়া যায়। বৈষ্ণব-কবি জ্ঞানদাস বলেন,—

> "সুখের লাগিয়া, এ ঘর বাঁধিনু, অনলে পুড়িয়া গেল।
> অমিয় সাগরে, সিনান করিতে, সকলি গরল ভেল॥
> শীতল বলিয়া, ও চাঁদ সেবিনু, রবির কিরণ দেখি।"

ইহলোকে কর্ম্মবীরসমূহ নানাপ্রকার আকাশকুসুমের পশ্চাতে পশ্চাতে ধাবমান হইয়া কতই না তাণ্ডব নৃত্য করিতে থাকেন, কিন্তু পরিশেষে বঞ্চিত হইয়া কর্ম্মফল-ভোগপ্রবৃত্তি হইতে বিরত হন। বিজ্ঞান, শিল্প, জ্যোতিষ, চিকিৎসা ও রসায়নশাস্ত্র ধর্ম্মার্থকাম, প্রত্নতত্ত্ব, উদ্ভিদ্ ও প্রাণীবিদ্যা, গৃহ্যসূত্র, সমাজনীতি,

শুক্রনীতি প্রভৃতি নানাবিধ "দিল্লীর লাড্ডু" আমাদিগকে ঐহিক সুখের পশ্চাৎ পশ্চাৎ নাসিকাবিদ্ধ বলদের ন্যায় ধাবিত করায়। এই ভ্রমণভূমিই ইহলোক। আমরা এক মুহূর্ত্তের জন্যও মনে করি না যে, এইসকল লইয়া আমরা কতদিন আর ইন্দ্রিয়তৃপ্তি করিতে পারিব! আমাদের ইন্দ্রিয়তৃপ্তির ব্যাঘাত ত' পদে পদে! স্ত্রীবিয়োগ, পুত্র বিয়োগ, শারীরিক অস্বাস্থ্য, মরণভীতি, অস্ত্রোপচারের ক্লেশ, বন্ধুবিচ্ছেদ, নৈরাশ্য, কপটের হস্তে নিষ্পেষণ, সুখৈষণা প্রভৃতি নানাবিধ উদ্দাম ক্রিয়াকলাপ ও বৃত্তিসমূহ আমাদিগের ইহলোক-বাসের দুরন্ত বাসনা হ্রাস করাইয়া দেয়। ইহলোকে এই আগমাপায়ীর অধিকার ও অনধিকার-বিচার আমাদিগকে নানাপ্রকার ক্লেশ-জলধিতে তরঙ্গায়িত করে। 'কেনই বা আমি ইহলোকের অধিবাসী হইলাম—যে ইহলোকে নশ্বরতা-ধর্ম্ম, অবচ্ছেদ-ধর্ম্ম, অপূর্ণ ধর্ম্ম আমাদিগকে খেলার পুতুল করিয়া তুলিতেছে, পদগোলকের (Foot ball) ন্যায় এখানে সেখানে বিক্ষিপ্ত করিতেছে—এক মুহূর্ত্তের জন্যও স্থির থাকিতে দেয় না।' সুতরাং ইহলোকের আশা-ভরসা নিতান্তই রুদ্ধ। যে ইন্দ্রিয়গুলিকে আমরা ইহলোকেই ভোগায়তন মনে করি, সেগুলি আমাদের স্থায়ী সম্পত্তি নহে। আবার, স্থূলবস্তুজ্ঞানে যে-সকল দ্রব্য আমাদের অধিকারে আসে, তাহাদেরও কর্পূরের ন্যায় উৎক্ষেপযোগ্যতা এবং গ্রহণকারী আমাদেরও অনিচ্ছা-সত্ত্বে অসময়ে স্থানান্তরে প্রেরিত হইবার যোগ্যতা থাকায় এই ভোগের বস্তুগুলি এবং ভোগের যন্ত্রগুলির উপর আমরা আদৌ আস্থা স্থাপন করিতে পারি না।

অনেকে বলেন,—'ইহলোকে অবস্থানকালে আমরা যতটুকু ইন্দ্রিয়তর্পণ করিতে অধিকারী হই, ততটুকুই আমরা পাইলাম! বিরাগবিশিষ্ট হইলে উহা হইতে বঞ্চিত হইতে হয়। সেজন্য ইন্দ্রিয় পরিচালনা-ক্ষণিক জানিয়াও তদ্দ্বারা সুখান্বেষণই আমাদের শ্রেয়ঃ।' এই আশা-ভরসায় আমাদিগের পুত্রকন্যাদিগের ভাবী উন্নতির উদ্দেশ করিয়া সুশিক্ষা প্রদান করি। যখন যাহা প্রয়োজন, সেইরূপই করিবার জন্য ব্যগ্র হই, ইন্দ্রিয়দ্বারা যে সময় ক্লেশ সমাগত হয়, তাহা তখন পরিহার করিবার জন্য নানাপ্রকার চেষ্টা করি এবং ইহলোকে ইহাই কর্ত্তব্য বলিয়া বুঝিয়া রাখি। আমরা আরও বুঝি এই যে, ইহলোকের পরে এই ইন্দ্রিয়গুলির অভাবে এবং আমাদের প্রাণের অভাবে ভোগময় জগতের অস্তিত্ব আমরা এইভাবে ধারণা করিতে পারিব না। লোকান্তরিত হইলে আমাদিগের এই প্রকার ইন্দ্রিয়ের অভাবে, দৃশ্য জগতের পরিবর্ত্তন ঘটিবে। ইহলোকে থাকিয়া কল্পনাদ্বারা পরলোকের দৃশ্য জগৎ ও আমাদিগের অধিষ্ঠান আমরা ধারণা করিতে পারি না। ঐহিক বিচার অবলম্বন করিয়া যদি আমরা

পরলোকের বিচার কল্পনা করি, তবে তাহা বাস্তব সত্য নাও হইতে পারে। ইহলোকে যে কয়েকটী ইন্দ্রিয়ের সমাবেশ আছে, তাহার কি পরিমাণ সমাবেশ আমরা পরলোকে পাইব, ঐহিক চেষ্টাদ্বারা তাহা নিরূপণ করিতে গেলে আমরা যে ভ্রমে পতিত হইব না, তাহা কিরূপে জানা গেল? পরলোকের বিষয় ঐহিক ধারণায় প্রমত্ত ব্যক্তিগণের নিরন্তর ইন্দ্রিয়তর্পণে পর্য্যবসিত; কিন্তু তাহাও নশ্বর বলিয়া বিচারশাস্ত্রে লিখিত আছে। গীতাপাঠকালে "ক্ষীণে পুণ্যে মর্ত্ত্যলোকং বিশন্তি" অর্থাৎ ত্রিদশপুর বাস স্থূল-ইন্দ্রিয় পরিহার করিয়া সূক্ষ্মেন্দ্রিয়-দ্বারা সম্ভবপর হইলেও নিত্য নহে, নশ্বর মাত্র—এই কথা বেশ উপলব্ধি হয়।

পরলোকের স্বর্গাদি-সুখভোগ বা নরকাদি দুঃখভোগ নিত্য নহে। কিন্তু আত্মার ধর্ম্ম অপরিবর্ত্তনীয় ও নিত্য, সুতরাং অনাত্মবৃত্তিতে অবস্থিতিকালে পরলোকের ধারণায় ইহলোকে কতকটা হেয়াংশ না থাকিলেও স্বর্গাদিতে নশ্বরাদিরূপ হেয়াংশ সর্ব্বদা বর্ত্তমান। এই স্বর্গসুখের ভোক্তা ইহলোকের কর্ম্মী প্রভৃতি প্রাণিগণ; নরকাদির ভোক্তাও তাঁহারা। যে উপাদান অবলম্বন করিয়া নশ্বর সুখ-দুঃখাদি ভোগ হয়, তাহা উপাধি মাত্র। বস্তুর নিত্যশক্তির উহা পরিচয় নহে। কতকগুলি ব্যক্তি স্বর্গসুখাদির হেয়তা উপলব্ধি করিয়া আপনাদিগকে নির্ব্বেদব্রহ্মানুসন্ধানে রত জানেন, তাহাও বদ্ধ ও মুক্ত অবস্থা-ভেদে দ্বিবিধ হওয়ায় সেই লোকে নিত্যত্বের ব্যাঘাত আছে। নির্ব্বেদব্রহ্ম কেনই বা ইহলোকে বিভিন্ন হইয়া জীব-উপাধিতে অনর্থক কষ্ট পাইবেন? আর যিনি তাদৃশ কষ্ট পান, তাঁহার বন্ধনমোচনই বা কেন নিত্যত্বের ব্যাঘাত করিবে?—এই সকল কথার সুমীমাংসা ঐহিক যুক্তিদ্বারা নানাপ্রকারে বিপন্ন হয়। ইহলোকে প্রত্যক্ষ বা স্থূল-ইন্দ্রিয়জ্ঞান প্রবল, স্বর্লোকে পরোক্ষ বা সূক্ষ্ম ভোগ প্রবল এবং তাহাও বালকদিগের অনুশাসন মাত্র। এইরূপ জানিয়া অপরোক্ষ পরলোকবাদী প্রাকৃত ও অপ্রাকৃত উভয় ইন্দ্রিয়ের বিনাশ-সাধনপূর্ব্বক জ্ঞান, জ্ঞেয় ও জ্ঞাতার সম্মেলন আকাঙ্ক্ষা করেন। তাঁহাদের তাদৃশ ঐহিক সম্মেলনাকাঙ্ক্ষা পরলোক সম্বন্ধীয় জ্ঞানপথের আদৌ নির্দ্দেশক নাও হইতে পারে। যেখানে ঐহিক জ্ঞানের প্রবলতাক্রমে বিচিত্রতা একেবারেই বিনষ্ট হইল, সেখানে 'চিন্মাত্র' শব্দ অচিৎ এর অপসারক হইলেও কেবল-চিৎ এর বাক্যমাত্রে নির্দ্দেশক হইয়া অচিৎএর সহিত সমন্বয়-ভাববিশিষ্ট অর্থাৎ 'চিদচিৎ-সমন্বয়' এই ঐহিক ধারণা তাঁহাদের পরলোকের ধারণা করিতে দেয় না।

—জগদ্গুরু শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর

শ্রীল ঠাকুর সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ

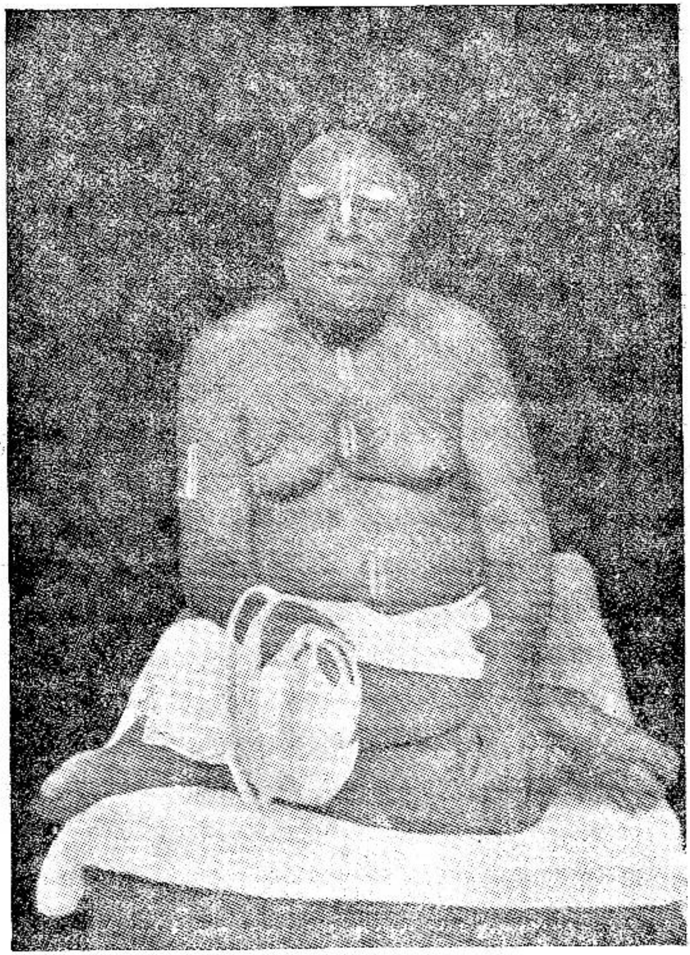

ঠাকুরের বিরহ-স্মরণে প্রবৃত্তি

সচ্চিদানন্দ বস্তু লোকলোচনের অন্তরালে থাকিলে আমরা তাঁহার প্রকাশের বিষয় ধারণা করিতে পারি না। যাহা চক্ষুর অন্তরালে থাকে, তাহাকেই আমারা অপ্রকটিত অবস্থা বলি। বস্তুতঃ শুদ্ধসত্ত্ব বস্তুর অভাব বলিয়া কোন ব্যাপার নাই। অভাবের অভাবদ্বারা যখন সাধ্যবস্তুর প্রতীতি হয়,

তখনই তাহাকে আমরা নিত্য সনাতন বলিয়া আখ্যা দিয়া থাকি। সুতরাং সচ্চিদানন্দ বস্তু নিত্য ও সনাতন। সচ্চিদানন্দ-অনুবাদের ঠাকুর ভক্তিবিনোদই বিধেয়। তাঁহার সম্বন্ধে প্রতি-নিয়তই বিভিন্নভাবে আলোচনা হইলেও, অন্য সচ্চিদানন্দের বিরহে তাঁহার লীলার কয়েকটী বৈশিষ্ট্যকে আশ্রয় করিয়া আমরা তাঁহার পাদসেবনরূপ স্মরণে প্রবৃত্ত হইয়াছি।

অপ্রাকৃত সচ্চিদানন্দ-বস্তু-বিচারে শব্দই সমর্থ

আমরা চিরদিনই শুনিয়া আসিতেছি ও আলোচনা করিতেছি—"অপ্রাকৃত বস্তু নহে প্রাকৃতগোচর।" "যাঁহা কৃষ্ণ, তাঁহা নাহি মায়ার অধিকার।" এই সকল বাক্য আমাদের মানসক্ষেত্রে গ্রথিত থাকিলেও হৃদ্গত অভিব্যক্তি নাই। যে সাধনে সনাতন বস্তুর হৃদয়-প্রাকট্য হয়, সে সাধনের প্রথম ইঙ্গিতই উক্ত বাক্যদ্বারাই আমাদিগকে সাবধান করিতেছে। শ্রীল ঠাকুরের বিষয় আলোচকসূত্রে আকাশোত্থ শব্দ বা বাক্যসমূহকে আশ্রয় করিয়া আলোচনা করিতে প্রবৃত্ত হওয়া 'সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের' শিক্ষার সম্পূর্ণ বিরুদ্ধ হইতেছে। আমার ইদম্ জ্ঞান তদ্জ্ঞানের দ্বারা বিদমিত না হইলে আমার চিত্তগত ভাষা কখনই শ্রীল ঠাকুরকে প্রকাশ করিতে পারিবে না। সুতরাং এক্ষেত্রে স্তব্ধ হইয়া থাকাই আমার পক্ষে মঙ্গলদায়ক হইলেও শ্রীল ঠাকুরের আশ্বাসবাণী আমাদিগকে অনুপ্রাণিত করিতেছে। তিনি বলেন, অপ্রাকৃত-তত্ত্ব-বিচারে শব্দই একমাত্র সমর্থ।

ঠাকুরের কথিত শব্দ-তত্ত্বের স্বরূপ

শব্দ বলিতে আকাশোত্থ শব্দ নহে, বৈয়াকরণিকগণের ওষ্ঠ, দন্ত বা কণ্ঠোত্থ শব্দ নহে, বৈজ্ঞানিকগণের বায়ুবিলোড়নোত্থ শব্দ নহে, বা সাধারণ দার্শনিক-গণের বিশ্বস্ত লোকের বাক্যরূপ শব্দও নহে। এ শব্দ ভ্রম-চতুষ্টয় হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্—নিত্য, শুদ্ধ, পূর্ণ, মুক্ত, অতিমর্ত্ত্য, বেদ ও আম্নায়-বাণী। এই বাণী-পরম্পরা বদ্ধজীবগণের উদ্ধারকল্পে তাহাদের বিশুদ্ধ-চিত্তে প্রকাশিতা হন। এই বাণী যাঁহার ভাগ্যে উদিতা হইয়াছেন তিনিই সকল সিদ্ধান্তে প্রতিষ্ঠিত হইতে সক্ষম হইয়াছেন। সিদ্ধান্তবাণীর প্রকাশই শ্রীল ঠাকুরের আবির্ভাবের প্রধান বৈশিষ্ট্য। যিনি নদীয়া-প্রকাশ, তিনিই সিদ্ধান্তবাণী-প্রকাশ।

ঠাকুর প্রাচীন-নদীয়ার প্রকাশক-সূত্রে অর্চ্চনীয়

শ্রীল ঠাকুর মহাশয় নদীয়া-শশী শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাব ও আদি লীলাক্ষেত্র নদীয়ার প্রকাশক-সূত্রে তিনিই নদীয়া-প্রকাশ। তাই আমরা নদীয়া-প্রকাশের সেবা, পূজা ও তাঁহার বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করিয়া অর্চ্চন করিয়া

থাকি। শ্রীনাম-হট্টে বা অপ্রাকৃত স্বরূপ-গঞ্জে স্বানন্দ-সুখদ-কুঞ্জে নিত্য বিগ্রহে ঠাকুর সেব্য-সেবকভাবে বর্ত্তমান আছেন এবং "মুক্তা অপি লীলয়া বিগ্রহং কৃত্বা ভগবন্তং ভজন্তে" বাক্যটী স্মরণ করাইয়া দিতেছেন।

ঠাকুর ভক্তিবিনোদ সিদ্ধান্ত-বাণীর জনক

তিনিই সরস্বতীরূপা যে বাণী প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাই সিদ্ধান্তবাণী বা সিদ্ধান্ত-সরস্বতী। আমরা ঠাকুরের জীবনী হইতে, তাঁহার নিখিল গ্রন্থাদি হইতে এবং তাঁহার সাক্ষাৎ বাণী-পরম্পরা হইতে ইহাই জানিয়াছি যে, আম্নায়-বাণীর আশ্রয় ব্যতীত বা শব্দ-প্রমাণ ব্যতীত সচ্চিদানন্দ-ভক্তির বিনোদন হইতে পারে না। তাই শ্রীল ঠাকুরের পূজা—অর্থাৎ তৃপ্তিসাধনকে লক্ষ্য করিয়া সিদ্ধান্তবাণীরই পাদপদ্মে অর্ঘ্য বিস্তরণ করি।

"তাতে কৃষ্ণ ভজে, করে গুরুর সেবন।
মায়াজাল ছুটে, পায় কৃষ্ণের চরণ॥ (চৈঃ চঃ মঃ ২২।২৫)

ঠাকুরের আত্মীয় ও পরিচিতের লক্ষণ

শ্রীল ঠাকুরের দ্বিতীয়াশ্রমের অতি নিকট-আত্মীয় পরিচয়াকাঙ্ক্ষী ব্যক্তিগণের মুখে অনেক সময় শুনিয়াছি—তাঁহারা শ্রীল ঠাকুরের কাছে অতি নিকটে ছিলেন এবং তাঁহার পরিচয় সম্বন্ধেও তাঁহারা অভিজ্ঞ। এইরূপ কথা মদীয় পরমারাধ্য আচার্য্যদেব শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর শুনিবামাত্রই বলিতেন—"তাঁহার নিকটে থাকা বা তাঁহার পরিচয় সম্বন্ধে জানা দূরের কথা, তাঁহারা তাঁহাকে দেখিতেও পান নাই।"—এই সমস্ত বাক্যের সফলতা ও সার্থকতা আমরা শ্রীল ঠাকুরের নিজ-লিখিত "জৈবধর্ম্ম" গ্রন্থের প্রমেয়ান্তর্গত জীব-বিচারের অধ্যায়ে ২৭০ পৃষ্ঠায় এইরূপ দেখিতে পাই—"বাক্য ও মন উভয়ই জড়-সম্বন্ধে উৎপন্ন। তাহারা অধিক চেষ্টা করিয়াও চিদ্বস্তু স্পর্শ করিতে পারে না। যথা, বেদ বলিয়াছেন,—"যতো বাচো নিবর্ত্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ।" ঠাকুর সর্ব্বদাই আমাদিগকে সাবধান করিয়াছেন—স্থূল-ইন্দ্রিয় ও সূক্ষ্ম-ইন্দ্রিয়ের দ্বারা চিদ্বস্তুর জ্ঞান অসম্ভব। শ্রীল ঠাকুর স্বয়ং সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ। তাহাতে অচিদ্বস্তুর আচ্ছাদন কোথায়? সুতরাং বাহ্য-ইন্দ্রিয়-সমষ্টিযুক্ত স্থূল-শরীর বা সূক্ষ্ম-শরীর তাঁহার নিকটে থাকিতে পারে না বা তথা হইতে তাঁহার পরিচয় জানাও যুক্তিবিরুদ্ধ; সুতরাং অত্যন্ত অসম্ভব। তিনি নিত্য-মুক্ত, অতিমর্ত্ত্য মহাপুরুষ, তাঁহার সম্বন্ধে মায়াবদ্ধ মর্ত্ত্যজীব ধারণা করিতে সম্পূর্ণ অক্ষম।

ঠাকুরের অতিমর্ত্ত্যত্বের অনুভূতি

শ্রীল ঠাকুর উক্ত গ্রন্থে উক্ত অধ্যায়ে জীব-বিচার সম্বন্ধে যে বিচার প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহাতে তাঁহার অতিমর্ত্ত্যতা ও সর্ব্বজ্ঞতা প্রকাশ পায়। জড়-বিলাসে ভীত হইয়া চেতন-বিলাস হইতে নিরস্ত থাকার অযৌক্তিকতা তিনি বিভিন্নভাবে প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি জানাইয়াছেন—অনুমিতিকার্য্যে হেতুত্ব বিষয়ে 'ব্যাপ্তিজ্ঞান' ও 'পরামর্শ' উভয়ই প্রয়োজন। এরূপক্ষেত্রে শুক্তিতে রজত ও রজ্জুতে সর্পভ্রমদ্বারা জৈব-জগতের মিথ্যাত্ব প্রতিপাদনের যুক্তিও ন্যায়-বিরুদ্ধ হইতেছে। শ্রীল ঠাকুরের উক্ত বিচারের চমৎকারিতা হইতে তাঁহার অতিমর্ত্ত্য আচার্য্যত্ব অনুভব করিতেছি।

শ্রীল ভক্তিবিনোদের আচার্য্যত্ব

দার্শনিক বিচার-জগতে 'আচার্য্য' বলিলে আমরা যাহা বুঝিয়া থাকি, শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ তদ্‌হিসাবেও আচার্য্য। তাঁহার বেদান্তভাষ্য, উপনিষদ্‌ভাষ্য, সহস্র-নাম-ভাষ্য, গীতাভাষ্য প্রভৃতি ভাষ্যসমূহ হইতে তিনি আচার্য্য সমাজে নিঃসন্দেহে শীর্ষস্থানে অধিষ্ঠিত আছেন, ইহা আমরা সহজে অনুভব করিতে পারি। গৌড়ীয়-বৈষ্ণবগণের বৈদান্তিক সামাজিকতা লইয়া যে অমূলক বিবাদ উত্থাপিত হইয়াছিল, তাহা শ্রীল আচার্য্য বলদেব বিদ্যাভূষণ প্রভু বিনষ্ট করিয়াছেন; তাহার পর ঠাকুর ভক্তিবিনোদই সমাজ-সংস্কারের শ্রেষ্ঠ মহা-পুরুষ। শ্রীল ঠাকুরের বহু গ্রন্থ অপ্রকাশিত থাকায় তাঁহার লেখনীর পূর্ণ অভিব্যক্তি আমরা দেখিতে পাইতেছি না। সজ্জনগণ তদ্বিষয়ে যত্ন করিলে জগতের বহুল পরিমাণে হিত সাধন হইবে।

শ্রীল সচ্চিদানন্দের পরোপকার বিচার

আচার্য্যের শিক্ষা হইতে আমরা পরোপকার সম্বন্ধে যে জ্ঞান লাভ করিয়াছি, তাহা সদসদ্-বিলক্ষণ অনির্ব্বচনীয় বস্তুদ্বারা আচ্ছাদিত বা বিম্বিত বস্তু হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্। জীবকে সত্যে প্রতিষ্ঠিত করিয়া তাহার নিত্য সত্তায় আস্থা স্থাপন করানই ঠাকুরের ভাষ্যসমূহের উদ্দেশ্য। 'পর'-শব্দে অনাদি শ্রেষ্ঠ বস্তুকে লক্ষ্য করে। যে-কার্য্যের দ্বারা আমাদের শ্রেষ্ঠতা বিনষ্ট হয়, তাহাকে পর-উপকার বলা যায় না। নিত্যানন্দময় বস্তুই শ্রেষ্ঠ। জীব নিত্যানন্দে প্রতিষ্ঠিত হইলেই পর-উপকারের ফল লাভ করিল। জ্ঞাতার অভাবে জ্ঞান স্বীকারের সার্থকতা কি, এবং জীবের পক্ষে তাহা কি-প্রকারে মঙ্গলদায়ক হয়? আনন্দস্বরূপ বলিয়া স্তব্ধ হইয়া উহার প্রাপ্য-প্রাপকের বিনাশ-সাধনে আনন্দ

কাহার? উপকারই বা কাহার? সুতরাং শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ উক্ত প্রকার কোন উপকারকে উপকার না বলিয়া অপকার আখ্যা প্রদান করিয়াছেন। ব্যবহারিক মিথ্যা বস্তু হইতে পারমার্থিক সত্যানন্দ মিথ্যা নিরানন্দের প্রতীক।

পরিবর্ত্তনশীল ফল-লাভ পর-উপকারের লক্ষ্য নহে

যাহার ফলের স্থায়িত্ব সম্বন্ধে নিঃসন্দেহে পরিবর্ত্তন-যোগ্যতা লক্ষ্য করা যায়, তাহার অনুসন্ধিৎসা বা আনুগত্য করা শ্রীল ঠাকুরের শিক্ষা বা 'পরোপকার'-সংজ্ঞা হইতে বিলক্ষণ। ফল-বিচারে তিনি আনন্দের প্রাপক-স্বরূপে তত্ত্ব-বস্তুকেই জ্ঞাপন করিয়াছেন। জীব তাহাতে অভিলাষ করিয়াই স্থূল-সূক্ষ্ম-প্রাকৃতিক তত্ত্বকে অঙ্গীকার করায় প্রয়োজন-বিচারে যে অনিত্যতা আনয়ন করিয়াছে তাহা শ্রীল ঠাকুরের পরোপকার সম্বন্ধে শিক্ষার বহির্ভূত হইতেছে। ঐ প্রকার ফল ক্রমশঃ সূক্ষ্ম হইতেও সূক্ষ্মতাপ্রাপ্ত হইয়া ক্ষীণভাব ধারণ করে। এমন কি, পরে অনুশোচনাদ্বারা প্রাপ্য নষ্ট হইয়া যাওয়ায় উহা হেয় বলিয়া প্রতিপন্ন হয়।

প্রয়োজন-বস্তু সাধনাধীন নহে—কিন্তু কৃপাধীন

ঠাকুরের যাহা প্রয়োজন বিচার, তাহা যে-সাধনে লাভ করা যায় তাহা সাধন ও সাধ্য উভয় পর্য্যায়-ভুক্ত। যাহা সাধনের দ্বারা লাভ করা যায় তাহাই সাধ্য অর্থাৎ সাধনাধীন। কিন্তু ঠাকুরের শিক্ষা হইতে আমরা সাধ্য বস্তু সম্বন্ধে যে কথা সিদ্ধান্ত-বাণীমুখে শ্রবণ করিয়াছি তাহা সাধনাতিরিক্ত বস্তু হওয়ায় তত্ত্ববস্তুর কৃপা-সাপেক্ষ হইতেছে। অথচ তাঁহাকে ব্যক্ত করিতে গেলে 'সাধ্য'-শব্দরূপ ভাষামল প্রবিষ্ট হইবেই। সুতরাং ইহা সম্যগ্‌রূপে আরাধনায় প্রকাশ পায়। বেদান্তসূত্র বলেন,—"অপি সংরাধনে প্রত্যক্ষানুমানাভ্যাম্"—অর্থাৎ সম্যগ্‌রূপে শ্রীমতী রাধারাণীর আনুগত্য প্রভাবে তত্ত্ববস্তু বিশুদ্ধসত্ত্বে প্রতিষ্ঠিত জীবসমূহের প্রত্যক্ষ ও অনুমানের অর্থাৎ অনুশীলন ও ধ্যানের বস্তু হইয়া থাকে। যেখানে জড়-প্রতীতি ও মিথ্যাজ্ঞান, সেখানেই চেতনের ইচ্ছাশক্তির অপব্যবহার বিধায় তত্ত্ববস্তুর সম্যক্ আরাধনা বা শুদ্ধভক্তির অভাব।

তত্ত্ব-বস্তুর অনুশীলনই অভিধেয়

বেদান্তের 'প্রকাশশ্চ কর্ম্মণ্যভ্যাসাৎ' সূত্র হইতে আমরা যে অনুশীলনের কথা জানিতে পারি তাহা কর্ম্ম বা অধ্যাস প্রভৃতি বৃত্তি হইতে সম্পূর্ণরূপে পৃথক্। উক্ত সূত্র জ্ঞানমাত্রই ফলপ্রাপ্তির উপায়চ্ছেদ মন্ত্র। আমরা কোন

বিষয়ে জ্ঞান-কুশলতা লাভ করিলেই যেরূপ ফললাভ করিতে পারি না অর্থাৎ তাহার প্রকৃষ্ট অনুশীলনই ফল লাভের উপায় হয়, তদ্রূপ জ্ঞানই আমাদিগকে তত্ত্ববস্তুর কাছে লইয়া যাইবে না ; তাহার সুষ্ঠু ও পুনঃ পুনঃ অনুশীলনেই তত্ত্ব-বস্তু প্রকাশিত হন। এইজন্যই উক্ত সূত্রে 'প্রকাশশ্চ'-অর্থে তত্ত্ববস্তুর প্রকাশ। 'কর্ম্মণ্যভ্যাসাৎ' অর্থাৎ পুনঃ পুনঃ অনুশীলন হইতে ফলপ্রাপ্তি—এইরূপ বুঝিতে হইবে। ঠাকুর ভক্তিবিনোদের প্রতি গ্রন্থের অভিধেয়-অধ্যায় বিচার করিলে আমরা উক্ত তত্ত্বের অনুসন্ধান পাইব।

বীরনগরে ঠাকুরের আবির্ভাব

শ্রীল ঠাকুর সচ্চিদানন্দ সম্বন্ধে আমাদের কোন বিষয় বলিতে যাওয়া অপেক্ষা আমরা যদি সিদ্ধান্তবাণী প্রকাশের আশ্রয় গ্রহণ করি তাহা হইলেই আমরা শ্রীল ঠাকুর সম্বন্ধে সমস্ত বিষয় অবগত হইতে পারিব। জগদ্‌গুরু শ্রীল প্রভুপাদ তাঁহার সম্বন্ধে জৈবধর্ম্ম-গ্রন্থের উপোদ্ঘাতে যাহা প্রকাশ করিয়াছেন তাহাই শ্রীল ঠাকুর সম্বন্ধে আমাদের জানিবার বিষয়। তিনি জানাইয়াছেন—চৈতন্যবস্তু (মহাপ্রভু) ও অদ্বৈতবস্তুর (অদ্বৈতপ্রভুর) আবির্ভাব-ক্ষেত্রই সচ্চিদানন্দ বস্তুর আবির্ভাবক্ষেত্র। আম্নতত্ত্বে এই প্রকার আশ্চর্য্যজনক বৈশিষ্ট্যময় একত্ব সর্ব্বদাই লক্ষ্য করা যায়। বলহীন স্থলে আত্মপ্রকাশ অসম্ভব বিধায় বীরনগরে তিনি আবির্ভাব-লীলা প্রকাশ করিয়াছিলেন।

অপ্রাকৃত তত্ত্বেই বিরুদ্ধ ধর্ম্মের সামঞ্জস্য

প্রবন্ধ বিস্তারের ভয়ে আমরা তাঁহার সম্বন্ধে আরও অধিক কথা আলোচনা করিয়া আত্মশোধন করিবার ইচ্ছা থাকিলেও অদ্য তিরোভাব-দিবসে তাঁহার আবির্ভাবের উল্লেখমাত্র করিয়াই নিরস্ত হইলাম। ইহা প্রাকৃত-বিচারে অসামঞ্জস্য হইলেও ঠাকুরের লিখিত তত্ত্বসূত্রের "বিরুদ্ধধর্ম্মং তস্মিন্ ন চিত্রম্" সূত্র আলোচনা করিলে জানিতে পারি যে অপ্রাকৃত সচ্চিদানন্দ বস্তুতে বিরুদ্ধ-ধর্ম্মের সুষ্ঠুরূপ সামঞ্জস্য নিত্য বর্ত্তমান। এতদ্ব্যতীত মহাজনগণের আবির্ভাব-তিরোভাব একই উদ্দেশ্যে হইয়া থাকে। তাই বিরহ-দিবসও উৎসব দিবস ; মঙ্গল বিধানের জন্য মঙ্গলময়ী তিথি—অমাবস্যা।

নমো ভক্তিবিনোদায় সচ্চিদানন্দনামিনে।
গৌরশক্তিস্বরূপায় রূপানুগবরায় তে॥

—জগদ্‌গুরু শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী

জীবের স্বরূপ হয় কৃষ্ণের নিত্যদাস

[পূর্ব্ব প্রকাশিত ৪৩শ বর্ষ, ৩য় সংখ্যা, ১১৩ পৃষ্ঠার পর]

এবার আমরা মহাপ্রভুর কৃপায় কৃষ্ণের শক্তি বুঝিবার চেষ্টা করি, তাহা হইলে স্বরূপে ফিরিয়া যাইতে পারিব। শক্তির প্রকাশেই শক্তিমানের প্রকাশ। তাই মহাপ্রভু বলিয়াছেন,—

"সূর্য্যাংশু-কিরণ যেন অগ্নিজ্বালাচয়।
স্বাভাবিক কৃষ্ণের তিনপ্রকার 'শক্তি' হয়॥
কৃষ্ণের স্বাভাবিক তিন শক্তি পরিণতি।
চিচ্ছক্তি, জীবশক্তি, আর মায়াশক্তি॥"

(১) চিচ্ছক্তি বা স্বরূপশক্তি বা অন্তরঙ্গাশক্তি—এই শক্তিকে প্রজ্জ্বলিত বহ্নির সহিত তুলনা করা যায়। স্বরূপশক্তিই মূল বা প্রধানা শক্তি। এই শক্তিদ্বারা চিজ্জগৎ চালিত। এই স্বরূপশক্তিকে আশ্রয় করিয়া শ্রীভগবান্ অনন্ত লীলা সম্পাদন করিয়া থাকেন।

(২) বহিরঙ্গাশক্তি বা ছায়াশক্তি বা মায়াশক্তি—এই শক্তিকে ভস্মাচ্ছাদিত অগ্নির সহিত তুলনা করা যায়। এই শক্তির দ্বারা চালিত মায়িক জগৎ বা অনন্ত নিখিল বিশ্বব্রহ্মাণ্ড মায়াশক্তি চিচ্ছক্তির ছায়াস্বরূপ হওয়ায় এজগতের সবই বিপরীতমুখী। পুকরিণীর সমীপে বৃক্ষের ছায়া যেমন বিপরীত দেখায়, এজগতের অবস্থাও তদ্রূপ।

(৩) জীবশক্তি বা তটস্থা শক্তি—ইহাকে ধূমায়িত অগ্নির সহিত তুলনা করা যায়। চিজ্জগৎ ও মায়িক জগতের তটভূমিতে এই শক্তির অবস্থান। একারণে তটস্থা শক্তি। উৎপত্তির সময়ে জীবশক্তি চিজ্জগতে বা মায়িক জগতে কোনটিতেই থাকে না। ফলে স্বতন্ত্র ইচ্ছাশক্তিবলে জীব যে কোন জগতে প্রবেশ করিতে পারে। জীবশক্তি নিত্য স্বতন্ত্র। এই স্বতন্ত্রতার উপর ভগবান্ কখনও হস্তক্ষেপ করেন না। ইহাতে ভাল করিবার ও মন্দ করিবার উভয়বিধ যোগ্যতা নিত্যই বিদ্যমান্। তটভূমিতে অবস্থানকালে যদি জীব স্বতন্ত্র শক্তির সদ্ব্যবহার করে, তাহা হইলে তাহার মধ্যে সেবাবৃত্তি জাগে এবং চিজ্জগতে প্রবেশ করে। কিন্তু জীব যদি ভোগাকাঙ্ক্ষী হইয়া কৃষ্ণকে ভুলিয়া যায়, তাহা হইলে সে স্বতন্ত্র শক্তির অপব্যবহার করিয়া মায়াতে আকৃষ্ট

হয় ও মায়িক জগতে প্রবেশ করে। এখন প্রশ্ন আসিয়া যায়, তটভূমিতে থাকাকালীন জীবস্বরূপের ধাম নিত্যধাম, চিজ্জগতে প্রবেশ না করিয়া, অনিত্য জগৎ মায়িক ব্রহ্মাণ্ডে অনিত্য বিষয়লাভের প্রত্যাশায় নিত্যবস্তু শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের সেবা পরিত্যাগ করিয়া কেন প্রবেশ করিল আর কেনই বা ত্রিতাপ জ্বালায় পিষ্ট হইতেছে ?

চিচ্ছক্তি কৃষ্ণের পরিপূর্ণ শক্তি। তিনি যাহা উদ্ভব করেন সে সমস্ত নিত্যসিদ্ধ বস্তু। জীব নিত্যসিদ্ধ নয়। সঙ্কর্ষণের অবতাররূপ মহাবিষ্ণু জীবশক্তির অধিষ্ঠান হইয়া পরমাত্মা স্বরূপে জগদ্গত জীবাত্মা সকলকে প্রকট করেন। চিচ্ছক্তি হইতে প্রকট না হওয়ায় প্রকটকালে জীবের মধ্যে হ্লাদিনী বৃত্তি থাকে না এবং জীব অণুচৈতন্যবিশিষ্ট হওয়ায় মায়ার বশীভূত হইবার সম্ভাবনা তাহার থাকিয়া যায়। কিন্তু জীব সাধনদ্বারা সাধনসিদ্ধ হইয়া নিত্যসিদ্ধের সমান আনন্দভোগ করিতে পারেন। যে-পর্য্যন্ত ভগবৎকৃপা-বলে চিচ্ছক্তিগত হ্লাদিনীর আশ্রয় না পান, ততদিন তাহাদের মায়াকর্ত্তৃক পরাজিত হইবার সম্ভাবনা। কারণ জীবশক্তিই জীবকে প্রকট করেন, চিচ্ছক্তি জীবকে প্রকট করেন না। কিন্তু সাধনদ্বারা জীব সাধনসিদ্ধ হইয়া নিত্য-সিদ্ধের সমান আনন্দ ভোগ করিতে পারেন। চিচ্ছক্তি হইতে জীবের উদ্ভব না হওয়ায় হ্লাদিনীশক্তির বৃত্তি ভক্তি জীবের মধ্যে থাকে না। কিন্তু জীবের স্বরূপের ধর্ম্মই ভক্তি লাভ করা।

মহাপ্রভু জীবকে কৃষ্ণের ভেদাভেদপ্রকাশ বলিয়াছেন। অভেদ-অর্থে জীব অণুচৈতন্যবিশিষ্ট, অর্থাৎ অণুমাত্রায় কৃষ্ণের গুণসকল জীবে বিদ্যমান্। অণুচৈতন্যবিশিষ্ট হওয়ায় 'মায়া' অপেক্ষা জীব শ্রেষ্ঠ হইলেও অণুত্বহেতু জীব মায়াবশীভূত হয়। তটভূমিতে জীবের মধ্যে হ্লাদিনীর বৃত্তি ভক্তি না থাকায় চিজ্জগতের বৈচিত্রী জীবের হৃদয়ে প্রকটিত থাকে না। কিন্তু মায়িক জগতের বৈচিত্রী তটভূমি হইতে জীব দর্শন করে এবং আকৃষ্ট হইয়া তাহার মধ্যে ভোগ-বাসনা জাগে। ফলে মায়াবশীভূত হইয়া মায়িক রাজত্বে প্রবেশ করে। কিন্তু 'কৃষ্ণ মায়ার ঈশ্বর।'—এই স্থানেই জীবে কৃষ্ণে ভেদ বর্ত্তমান।

কিন্তু জীবের ও জগতের সহিত কৃষ্ণের নিত্য, অবিচ্ছেদ্য, অন্তরঙ্গ সম্বন্ধ থাকায় 'কৃষ্ণ' সম্বন্ধ তত্ত্ব। "সকল বেদের হয় ভগবান্ সে সম্বন্ধ।" কৃষ্ণের সহিত জীবের এই সম্বন্ধ হইল—"জীব নিত্য কৃষ্ণদাস।" কৃষ্ণ প্রভু, জীব দাস। কৃষ্ণসেবাই দাসের ধর্ম্ম।

জীবের তটভূমিতে আকাঙ্ক্ষা জাগিল কর্ত্তা সাজিয়া ভোগবাসনা চরিতার্থ

করিবার। ফলে জীবের মায়িক রাজত্বে প্রবেশ ঘটিল সেই ভোগবাসনা চরিতার্থ করিবার জন্য, জীব স্বতন্ত্র শক্তির অপব্যবহার করিয়া, কৃষ্ণদাসত্ব ভুলিয়া মায়ার দাসত্ব স্বীকার করিল ও তাহার দ্বিতীয় অভিনিবেশ আসিয়া হাজির হইল। মহাপ্রভু বলিয়াছেন,—

"কৃষ্ণ ভুলি সেই জীব অনাদি বহির্ম্মুখ।
অতএব মায়া তারে দেয় সংসার দুঃখ ॥"

তটভূমিতে বসিয়া জীব অপরাধ করিল। তাহার স্বরূপের ধর্ম্ম সেবা ছাড়িয়া কর্ত্তা সাজিয়া ভোগ করিবার বাসনা জাগিল। মায়িক ব্রহ্মাণ্ডে প্রবেশের পূর্ব্বেই হতভাগ্য জীবের এই বাসনা জন্মিয়াছে এবং মায়িক কাল গণনার পূর্ব্বেই কৃষ্ণকে ভুলিয়াছে। একারণে অনাদি বহির্ম্মুখ কথাটি মহাপ্রভু প্রয়োগ করিয়াছেন।

মায়ার কারাগারই ভোগের রাজত্ব। কৃষ্ণভোলা অপরাধী জীবের স্থান হইল এই মায়ার কারাগারে। মায়াদেবী এই অপরাধী জীবের উপর তাঁহার কৃষ্ণপ্রদত্ত দুইটী শক্তির প্রয়োগ করিলেন। তাঁহার আবরণাত্মিকা শক্তির প্রয়োগে জীবকে স্থূল ও সূক্ষ্মদেহের দুইটী আবরণে তাহার স্বরূপকে আবৃত করিয়া দিলেন। জীব দ্বিতীয় অভিনিবেশে মত্ত হইল। আর বিক্ষেপাত্মিকা শক্তির প্রয়োগে কৃষ্ণকে ভুলাইয়া ভোগবাসনায় লিপ্ত করাইলেন। চতুর্দ্দশ ভূমণ্ডল লইয়া মায়িক ব্রহ্মাণ্ড। ইহার অধিশ্বরী দুর্গাদেবী। এই দুর্গকে দশ হাত দিয়া দশপ্রহরিণী হইয়া দশদিক্ আগলাইয়া রাখিয়াছেন—যাহাতে জীব কোনদিক্ হইতে পলাইতে না পারে।

এইবার চিন্তা করা যাক্ শাস্তির কথা। অপরাধ করিয়া কারাগারে প্রবেশ করিলে অপরাধীর চরিত্র সংশোধনের জন্য শাস্তি ত' থাকিবেই। একারণে মায়াদেবীর রাজত্বে ত্রিতাপের ব্যবস্থা। মহাপ্রভু বলিয়াছেন,—

"কভু স্বর্গে উঠায় কভু নরকে ডুবায়।
দণ্ড্যজনে রাজা যেন নদীতে চুবায় ॥"

গর্ভে হেঁটমুণ্ডে উর্দ্ধপদে অবস্থানকালে ক্রিমিবিষ্ঠার শাস্তি। ভূমিষ্ট হইবার পর ত্রিতাপ জ্বালার একটীর পর একটী হইতে নিস্তার নাই। এবার মৃত্যুর পরেও এত যত্নের দেহের কি নিদারুণ পরিণতি! হয় অগ্নিদগ্ধ, নতুবা শৃগাল বন্যজন্তুর ভোজ্য, অথবা ক্রিমিবিষ্ঠায় পরিণতি। আবার মৃত্যুর পরেও মায়াদেবীর শৃঙ্খল হইতে নিস্তার নাই। কখনও সোনার শৃঙ্খলে বাঁধিয়া স্বর্গে রাখিতেছেন, কখনও লোহার শৃঙ্খলে নরকে ডুবাইতেছেন। কিন্তু মায়াদেবীর

শাস্তিই মায়াদেবীর কৃপা। আমাদের চরিত্রের সংশোধন করিয়া, আবার স্বরূপে ফিরিয়া যাইবার জন্যই এই শাস্তিবিধান।

জীব নিজে ভগবানের অভিমুখী হইতে পারে না। একারণে ভগবান্ নিজে কৃপা করিয়া সাধু-গুরু-শাস্ত্ররূপে মায়িক জগতে জীবকে সম্বন্ধের জ্ঞান দিয়া স্বরূপে ফিরিয়া যাইবার ব্যবস্থা করিয়াছেন। কিন্তু মায়াদেবী শাস্তির মাধ্যমে বা ভগবান্ শাস্ত্রের মাধ্যমে যতই আমাদের কৃপা করুন, যতদিন **শ্রীগৌরভক্তের সঙ্গ না হইবে, ততদিন আমাদের শ্রদ্ধার উদয় হইবে না বা শাস্ত্র-বাক্যে বিশ্বাস আসিবে না।**

"কোন ভাগ্যে কোন জীবের 'শ্রদ্ধা' যদি হয়।
তবে সেই জীব 'সাধুসঙ্গ' করয়॥
'শ্রদ্ধা'-শব্দে বিশ্বাস কহে সুদৃঢ় নিশ্চয়।
কৃষ্ণে ভক্তি কৈলে সর্ব্বকর্ম্ম কৃত হয়॥"

এই শ্রদ্ধা না হওয়া পর্য্যন্ত জীব পাকা চোরের ন্যায় চরিত্র সংশোধনের পরিবর্ত্তে বহির্ম্মুখ কর্ম্ম, যোগ, জ্ঞানপথে পরিভ্রমণ করিয়া ভোগবাসনাকেই নূতনভাবে চরিতার্থ করিবে।

"তাবদ্‌ব্রহ্মকথা বিমুক্তিপদবী তাবন্ন তিক্তীভবে-
ত্তাবচ্চাপি বিশৃঙ্খলত্বময়তে ন লোকবেদস্থিতিঃ।
তাবচ্ছাস্ত্রবিদাং মিথঃ কলকলো নানাবহির্বর্ত্মসু
শ্রীচৈতন্য-পদাম্বুজ-প্রিয়জনো যাবন্ন দৃগ্‌গোচরঃ॥"

(শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্—১৯)

"যে কাল পর্য্যন্ত শ্রীচৈতন্যপদকমলমধু পানে আবিষ্ট ভক্তের দর্শন না হয়, সেই কাল পয্যন্তই নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মবিচার, ঈশ্বর-সাযুজ্যাদি মুক্তিমার্গ তিক্তবোধ হয় না, সেই কাল পর্য্যন্তই লোকমর্য্যাদা, বেদমর্য্যাদা বিশৃঙ্খলতা প্রাপ্ত হয় না, আর সেই কাল পর্য্যন্তই বিবিধ বহির্ম্মুখপথে বিচরণশীল শাস্ত্রবিৎ পণ্ডিতগণের পরস্পর বাদ-বিসম্বাদ চলিতে থাকে।"

শ্রীগুরু-কৃপাতেই স্বরূপ উপলব্ধি হইয়া সম্বন্ধজ্ঞান হইবে। যদি সদ্‌গুরু-কৃপায় স্বরূপের উদয়ে সম্বন্ধজ্ঞান পাকা না হয়, তাহা হইলে ব্যবহার দোষ ঘটিবে। ঘটক সম্বন্ধ করিয়া কন্যার বিবাহ দিলেন। কিন্তু বিবাহকালে যদি তাহাকে শ্বশুর, ভাসুর ও স্বামীকে সঠিকভাবে না চেনান হয়, তাহা হইলে শ্বশুরালয়ে যেমন তাহার ব্যবহার দোষ ঘটা অসম্ভব নয়, তেমনই সদ্‌গুরু আসিয়া যদি স্বরূপকে জানাইয়া শুদ্ধ সঠিক সম্বন্ধ না জানান, তাহা হইলে

জীবেরও সাধনপথে ব্যবহার দোষ ঘটিবে। সেই গুরুদেবই জানাইবেন— কে আমাদের আরাধ্যতম বস্তু।

"আরাধ্যো ভগবান্ ব্রজেশতনয়স্তদ্ধাম বৃন্দাবনং
রম্যা কাচিদুপাসনা ব্রজবধূবর্গেণ যা কল্পিতা।
শ্রীমদ্ভাগবতং প্রমাণমমলং প্রেমা পুমর্থো মহান্
শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভোর্মতমিদং তত্রাদরো নঃ পরঃ॥"

"ব্রজেশতনয় অর্থাৎ নন্দনন্দন শ্রীকৃষ্ণই আরাধ্য। তাঁহার ধাম বৃন্দাবন। ব্রজবধূগণ রাগমার্গে তাঁহার যে উপাসনা করেন, তাহাই পরম রমণীয়। শ্রীমদ্ভাগবত-গ্রন্থই অমল প্রমাণ অর্থাৎ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ শব্দ-প্রমাণ। কৃষ্ণপ্রেমই মহান্ পুরুষার্থ। ইহাই শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভুর মত। সুতরাং ইহাতে আদর করিবে। অন্য প্রমাণের প্রয়োজন নাই।"

—শ্রীমতী মায়া সরকার

শরণাগতি

যে-জন বিজনে, বৈষ্ণব-বিহনে,
করে কৃষ্ণ-আরাধন।
বিফল মনোরথে, নিরঞ্জন সৈকতে,
নিষ্ফল সাগর-লঙ্ঘন!
ওগো দয়াময়! বৈষ্ণব সমুদয়,
ভজনের প্রিয়সাথী।
তোমার চরণ- রেণু-সুচন্দন,
তারই আমি নিত্যপ্রার্থী।
কবে সে সুদিন, হইব আমি দীন,
ভজন-সুখ প্রয়াসী।
আমি অভাজন, করি নিবেদন,
হই যেন তব দাসী॥

—শ্রীপ্রাণকৃষ্ণ দাসাধিকারী
(ডাঃ পরিতোষ রাহা)

আনুগত্য ও স্বতন্ত্রতা

পরমমঙ্গল সঞ্চয়ের জন্যই আমাদের এই দুর্ল্লভ মনুষ্য-জীবন ধারণ। এই পার্থিব জগতে যে-সকল পথ বিদ্যমান্ রহিয়াছে, তাহার কোনটিই মঙ্গলের পথ অর্থাৎ ভগবৎসেবার রাস্তা নহে। মায়ার প্রলোভনে প্রলুব্ধ হইয়া ভোগী হইবার প্রচেষ্টা নিতান্ত ক্ষুদ্র ও অপ্রয়োজনীয়। স্বতন্ত্রতাক্রমেই জীবের বড় অর্থাৎ কর্ত্তা হইবার প্রবৃত্তি হৃদয়কে গ্রাস করিয়া চরম সর্ব্বনাশের পথে ঠেলিয়া দেয়। দাম্ভিক ব্যক্তিমাত্রই স্বতন্ত্রতার অপব্যবহার করিয়া নিজের বাহাদুরির কথা অপরের নিকট প্রকাশ করিতে চাহে। কৃষ্ণের ইন্দ্রিয়তর্পণকারী ব্যতীত স্বসুখবাঞ্ছাকারী কোন ব্যক্তিই কৃষ্ণরাজ্যে প্রবেশ করিবার অধিকার লাভ করিতে পারেন না। স্বসুখবাঞ্ছার তাণ্ডব নৃত্য যাহাদের হৃদয়ে সর্ব্বক্ষণ নৃত্য করিয়া থাকে, তাহাদের কৃষ্ণভক্তি লাভের সম্ভাবনা কোথায়? কৃষ্ণের ইন্দ্রিয়-তর্পণের বিঘ্নকারী যদি আমাদের উপর প্রভুত্ব বিস্তার করে, তবে তাহা হইলে আমাদের কখনও মঙ্গললাভ হইতে পারে না। যাহারা কৃষ্ণবহির্ম্মুখগণের আনুগত্য স্বীকার করিয়া গুরু-বৈষ্ণবগণের উপর আধিপত্য বিস্তার করিতে চাহে, তাহারা কখনও 'ভক্ত' সংজ্ঞায় সংজ্ঞিত হইতে পারে না। আধ্যক্ষিক হওয়া অথবা আধ্যক্ষিকের আনুগত্য স্বীকার করা কাহারও জীবনের উদ্দেশ্য হওয়া উচিত নহে। কৃষ্ণভক্তের আনুগত্য বাদ দিয়া অভক্তগণের আনুগত্য স্বীকার করা উদারতা নহে, উহা অনুদারতারই পরিচয় বহন করে।

আমাদের সকলকেই হরিভজন করিতে হইবে ঠিকই, কিন্তু গুরু-বৈষ্ণবের আনুগত্য ব্যতীত তাহা কিরূপে সম্ভবপর হইতে পারে? শ্রীহরির কথা জানিতে হইলে তর্কপন্থা ছাড়িয়া গুরু-বৈষ্ণবগণের অনুগত হওয়া একান্ত আবশ্যক। স্বতন্ত্র হইলে হরিভজন হয় না, কারণ স্বতন্ত্র ব্যক্তিগণ ভিন্ন ভিন্ন মতের বহুমানন করিয়া থাকে। স্বতন্ত্র ব্যক্তিগণের ভক্তিবিরোধী চিত্তবৃত্তি বা দাম্ভিকতাই সম্বল, তাহারা কখনও কৃষ্ণভক্তের আনুগত্যে কৃষ্ণসেবা করিবার সুবিধা গ্রহণ করিতে সক্ষম হয় না। সুদৃঢ় বেষ্টনী না থাকিলে যেরূপ গরু বা ছাগল আসিয়া চারাগাছ মুড়াইয়া খাইয়া ফেলে, তদ্রূপ গুরু-বৈষ্ণবগণের আনুগত্য স্বীকার না করিলে ভক্তিলতার বীজ কখনও অঙ্কুরোদগম হইবার সুযোগ লাভ করিতে পারে না। হৃদয়ে স্বীয় অযোগ্যতার উপলব্ধিরূপ দৈন্যের উদয় হইলেই

জীবমাত্রেই ভগবদ্ভক্তের অনুগমন অর্থাৎ আনুগত্য স্বীকার করিয়া থাকে। ভগবদ্ভক্তের উপর টেক্কা দিতে গেলে পরকালের পথ রুদ্ধ হইয়া নরকের রাস্তা পরিষ্কার হইয়া যায়। গুরু-বৈষ্ণবগণের অপেক্ষা যাহারা অধিক বোঝেন, তাহাদের কোনকালে মঙ্গললাভ হয় না। ভগবানের পূজা করিতে গিয়া যাহারা ভক্তের পূজায় অনাদর প্রদর্শন করেন, তাহারা ভক্তের চরণে অপরাধবশতঃ নানাপ্রকার অসুবিধা ভোগ করিয়া থাকেন। তাহাদের একদিন না একদিন ভগবৎসেবায় বিতৃষ্ণা আসিয়া অমঙ্গলকে বরণ করিতে হইবে, এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।

কৃষ্ণভক্তের আনুগত্যে বা নির্দ্দেশেই কৃষ্ণানুশীলন সম্ভবপর। যেখানে গুরুর আনুগত্য নাই, সেখানে কৃষ্ণসুখানুসন্ধান থাকিতে পারে না। গুর্ব্বানুগত্যে সেবোন্মুখ হইয়া কৃষ্ণকৃপাপেক্ষাই ভগবদ্দর্শনের রাস্তা। গুরু-বৈষ্ণব সেবার অর্থ—তাঁহাদিগকে সর্ব্বতোভাবে ভগবৎসেবাকার্য্যে সহায়তা করা। তাহা না করিয়া নিজে নিজে কৃষ্ণসেবা করিবার দাম্ভিকতা প্রকাশ করিতে গেলে পতন অবশ্যম্ভাবী। এই প্রসঙ্গে জগদ্গুরু শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী প্রভুপাদ তাঁহার উপদেশাবলীর মধ্যে বলিয়াছেন,—"গুরু-বৈষ্ণবগণ কৃষ্ণসেবা ব্যতীত অন্য কিছু করেন না। গুরু-বৈষ্ণব সেবার অর্থ—তাঁহাদিগকে ভগবৎসেবায় সহায়তা করা—সাধুগুরুর আজ্ঞা নির্ব্বিচারে সানন্দে পালন করা। এজন্য সর্ব্বাবস্থায় গুর্ব্বানুগত্য প্রয়োজন। গুর্ব্বানুগত্য বাদ দিয়া নিজে নিজে কৃষ্ণসেবা করিবার দাম্ভিকতা করিলে অসুবিধাই হয়। গুরুকে অবজ্ঞা বা অস্বীকার করিলে সর্ব্বনাশ হয়। 'আমি হরিসেবা করি'—এটা কেবল দাম্ভিকতা। দাম্ভিকতাই পতনের প্রথম ও প্রধান কারণ।"

যাঁহাদের গুর্ব্বানুগত্য ও দৈন্য নাই, সেই স্বতন্ত্র দাম্ভিকগণের সহিত কৃষ্ণের কোন সম্বন্ধ থাকিতে পারে না। আবার যাহারা দিব্যজ্ঞানের অপব্যবহার করিবার মানসে কপটতার বশবর্ত্তী হইয়া গুরু-বৈষ্ণবগণের আনুগত্যের অভিনয় করে, তাহারা কোনকালেই ভগবৎসেবা লাভ করিতে সক্ষম হন না। গুরু-বৈষ্ণবগণের প্রদর্শিত পথে অনুগমন না করিয়া তাঁহাদের আনুগত্যের অভিনয় করিলে আমাদিগকে মায়ার নফর হইয়া অনন্তকালের জন্য ভবচক্রে ঘুরপাক খাইয়া মরিতে হইবে। সাধুগুরুর আজ্ঞানুবর্ত্তী থাকিলে কখনও কোন বিপদ আক্রমণ করিতে পারিবে না। আত্মেন্দ্রিয়তর্পণে রত না থাকিয়া যিনি গুর্ব্বানুগত্যে সতত ভগবৎসেবা করেন, তিনিই প্রকৃত 'শিষ্য' পদবাচ্য। স্বতন্ত্রতা পরিত্যাগপূর্ব্বক শরণাগত হইয়া গুর্ব্বানুগত্যে নিষ্কপটে ভজন করিলে একজন্মেই

ভগবৎপাদপদ্ম লাভ হইয়া থাকে। গুর্ব্বানুগত্যে অধোক্ষজ পূর্ণপুরুষের অধীনতাই পূর্ণ অর্থাৎ প্রকৃত স্বাধীনতা, তাহাই জীবের নিত্য স্বভাব বা ধর্ম্ম। ভগবানের পাদপদ্মে শরণগ্রহণ ব্যতীত স্বাধীনতা অর্থাৎ শান্তিলাভের অন্য কোন উপায় নাই। মনোধর্ম্মের হস্ত হইতে রক্ষা পাইতে হইলে সাধুগুরুর আনুগত্য একান্ত আবশ্যক। নতুবা কালের করাল গ্রাসের অতল গহ্বরে তলাইয়া গিয়া জীবনের পরিসমাপ্তি ঘটিবে।

ভগবদ্ভক্তমাত্রই গুর্ব্বানুগত্যে প্রত্যহ লক্ষ নাম গ্রহণ করিয়া থাকেন। নামাচার্য্য শ্রীগুরুদেবের নিষ্কপট আনুগত্য ও প্রীতিপূর্ব্বক গুরুসেবা ব্যতীত শ্রীহরিনাম হয় না। "অধোক্ষজ বস্তু কৃষ্ণের সেবা আমার গুরুদেব ব্যতীত আর কেহই করিতে পারেন না"—এই উপলব্ধির অভাব যেখানে, সেইখানেই আনুগত্য বা আত্মসমর্পণ সুষ্ঠুভাবে হয় না। মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তিমাত্রেরই গুর্ব্বানুগত্য বিশেষ প্রয়োজন, এতদ্ব্যতীত মঙ্গললাভের অন্য কোন উপায় নাই।

—শ্রীবলভদ্র দাস ব্রহ্মচারী

পরমপ্রিয়ের সন্ধানে

বিশাল পৃথিবীটাতে সকলে ছুটেছে! গ্রহ, নক্ষত্র, তারা, আলো, বাতাস সবাই ছুটেছে সে অজানার উদ্দেশ্যে—পরমপ্রিয়ের সন্ধানে। লক্ষ লক্ষ গ্রহ, নক্ষত্র অজানাকে না পেয়ে কাঁদতে কাঁদতে সমস্ত অন্ধকারকে চমকিত করে ছুটে চলেছে। আর রক্ত-মাংসের ভক্ত অষ্টসাত্ত্বিক বিকারে ভুগ্‌তে ভুগ্‌তে জীর্ণ-শীর্ণ হয়ে পড়েন। তাই ভক্তকবি জয়দেব গোস্বামী বলে ওঠেন,—

"রতিসুখসারে গতমভিসারে মদনমনোহরবেশম্,
ন কুরু নিতম্বিনি গমনবিলম্বনমনুসর তং হৃদয়েশম্।"

ব্যাকুল প্রচেষ্টার মধ্য দিয়ে পরমপ্রিয়কে পাবার উদ্দেশ্যে নিজেকে বিলীন করবার তীব্র গতিবেগের দরুণ ভক্ত সমস্ত বাধা-বিপত্তিকে সরিয়ে গোধূলির অপেক্ষায় বসে রয়েছেন। কী কঠোর সাধনা!

কণ্টক গাড়ি কমলসম পদতল
মঞ্জীর চীরহি ঝাঁপি।

গাগরি বারি ঢারি করি পীছল
চলতহি অঙ্গুলি চাপি ॥

আবার,—

করযুগ নয়ন মূদি চলু ভামিনী
তিমির পয়ানক আশে।
কর কঙ্কণ পণ ফুণিমুখ বন্ধন
শিখই ভুজগ গুরু পাশে ॥

কিন্তু না, ভক্তের আকুল বিরহী কান্না সইতে না পেরে পরম দয়ালু সে প্রিয়তম ঝড়-ঝঞ্ঝাপূর্ণ রাতের অন্ধকারে ভক্ত-দ্বারে পৌঁছান, যাঁকে পাওয়ার জন্য এমন নির্ভেজাল সাধনা, এতখানি কারুণ্য, এমন বুক-বিদীর্ণকারী প্রচেষ্টা, সেই প্রিয়তমকে আজ আঙ্গিনায় দেখে ভক্ত কেঁদে আকুল হয়ে পড়েন।

"এ ঘোর রজনী, মেঘের ঘটা
কেমনে আইল বাটে ?
আঙ্গিনার কোণে বঁধুয়া তিতিছে,
দেখিয়া পরাণ ফাটে।"

কিন্তু মনের আনন্দের ঢেউকে একেবারে অস্বীকার করতে পারেন না। তাই আনন্দের আতিশয্যে সখীদের, বন্ধুদের ডেকে ভক্ত বলে ওঠেন,—

"সই, কি আর বলিব তোরে,
বহু পুণ্যফলে সে হেন বঁধুয়া
আসিয়া মিলিল মোরে ॥"

ঐ যে, চণ্ডীদাস গেয়েছেন—

"সুখ দুখ দু'টী ভাই,
সুখের লাগিয়া যে করে পিরীতি,
দুখ যায় তার ঠাঁই ॥"

হ্যাঁ, এত সুখ ভক্তের কপালে সহ্য হয় না। আসলে সে পরম প্রিয়তম ত' ভক্তকে কাঁদিয়েই সুখ পান। বুকের মধ্য থেকে গুমরে ওঠা, প্রাণ-নিংড়ানো, বুক নিংড়ানো যন্ত্রণাকে স্বচক্ষে দর্শনেচ্ছায় ভগবান্ সেই পরমপ্রিয় ভক্তের সামনে দিয়ে অপরের বাড়ী যান। বিরহসিক্ত বিদ্রোহে ভক্ত ভেঙ্গে পড়েন। চোখের সামনে কোন অভিশাপ না পেয়ে, চিন্তা করবার অবকাশ না দিয়ে প্রাণের প্রিয়তমকে অভিশপ্ত করেন ভক্তির দাবীতে। বিদ্রোহী গলায় শোনা যায়,—

"আমার পরাণ যেমতি করিছে
তেমতি হউক সে।"

একি অভিশাপ? এতখানি তীব্র অভিশাপ? মর্ম্মভেদী বিরহজ্বালা সইবার অভিশাপ! কিন্তু ভগবান্ পিছিয়ে যান না। ভক্তের মর্য্যাদা, ভক্তের অভিশাপকে মূল্য দেওয়ার জন্য, ভক্তকে ভালবাসার দরুণ, একসময় তিনি ভক্তবেশী ভগবানের রূপ নিয়েছিলেন। তাঁকেও কাঁদতে হয়েছিল এই বলে—

"নয়নং গলদশ্রুধারয়া বদনং গদ্গদরুদ্ধয়া গিরা।
পুলকৈর্নিচিতং বপুঃ কদা তব নামগ্রহণে ভবিষ্যতি॥
যুগায়িতং নিমেষেণ চক্ষুষা প্রাবৃষায়িতম্।
শূন্যায়িতং জগৎ সর্ব্বং গোবিন্দ-বিরহেণ মে॥
(শ্রীচৈতন্য শিক্ষাষ্টক ৬-৭)

কিন্তু এত কাঁদলে কি হবে? সে যে কাছে থেকেও ধরা দেয় না। আর ধরা দেয় না বলেই ক্ষণেকের জন্যও কাছে পেলে করুণস্বরে ভক্ত বলে ওঠেন—

"বঁধু, যদি তুমি মোরে নিদারুণ হও,
মরিব তোমার আগে দাঁড়াইয়া রও।"

বঁধু নিদারুণ না হইতেই যেন ভক্ত সশঙ্কিত। যদি ভক্তকে ছেড়ে পরম প্রিয়তম চলে যান! বঁধুকে কাছে রাখিবার জন্য ভক্ত আবার বলে ওঠেন,—

"তোমারে বুঝাই বঁধু, তোমারে বুঝাই।
ডাকিয়া শুধায় মোরে হেন কেহ নাই॥"

পরকে আপন করতে হলে যে সাধনা করতে হয়, যে কর্কশ তাপস্যা করতে হয়, সে তপস্যা, সাধনা কি এত সহজ? যে তার অধীনই নয়, নিজেকে যার কাছে অধীন করতে হয়, যিনি সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র, ভক্তের নিজেকে তাঁর কাছে পরতন্ত্র করা, যাঁর সকল বিষয়ে স্বাধীন ইচ্ছা আছে, ভক্তের নিজেকে তাঁর আজ্ঞাকারী করা, সে কি কঠোর সাধন! এ যেন দুঃখের পাষাণে ঘর্ষণ করে সুখ-প্রেমের সৌরভ ভক্ত বার করছেন!

এত সবকিছু উপেক্ষা করেই পরমপ্রিয়তম সুদূর দেশে পাড়ি দেন কোন এক অজানা-অচেনা কাজের উদ্দেশ্যে—কোন এক ভক্তের ডাকে। ভক্ত ডুকরে কেঁদে উঠে বলেন,—

"শূন ভেল মন্দির শূন ভেল নগরী।
শূন ভেল দশ দিশ শূন ভেল সগরী॥"

ভক্তবেশী ভগবান্ বলেন,—

"কৃপা করি' কৃষ্ণ মোরে দিয়াছিলা সঙ্গ।
স্বতন্ত্র কৃষ্ণের ইচ্ছা,—কৈল সঙ্গ-ভঙ্গ॥" (চৈঃ চঃ অঃ ১১।৯৪)

অবশেষে ভক্তও ছুটে চলেন। চোখের জল মুছতে মুছতে ভক্ত ছুটে চলেছেন সেই অজানার উদ্দেশ্যে—পরমপ্রিয়ের সান্নিধ্যের জন্য। বন-জঙ্গল, পাহাড়-পর্ব্বত, জল-স্থল, গাছ-পালা সবাইকে আকুল কণ্ঠে জিজ্ঞেস্ করতে করতে রাত-দিন ধরে ছুটে চলেছেন ভক্ত। অজানা-অচেনা বা ক্ষণেকের জানা-শুনা সেই পরমপ্রিয়ের চরম শ্রেষ্ঠত্বকে তিল তিল করে উপলব্ধির দরুণ এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্তে ছুটে চলেছেন, চলেছেন এক জন্ম থেকে অন্য জন্মে, জন্ম হতে জন্মান্তরে। আর ভক্তবেশী ভগবান্‌কে হারিয়ে কেঁদে ওঠেন ভক্তবৃন্দ,—

"কি করিব, কারে কব, বাক্য নাহি স্ফুরে।
গোরাচাঁদে হারাইনু গোপীনাথ-ঘরে॥"

আমার মত নরাধমের প্রার্থনা—

"হৃদয়ে ধরিমু তোমার কমল চরণ।
নয়নে দেখিমু তোমার চাঁদ বদন॥
জিহ্বায় উচ্চারিমু তোমার 'কৃষ্ণচৈতন্য'-নাম।
এইমত মোর ইচ্ছা,—ছাড়িমু পরাণ॥"

(চৈঃ চঃ অঃ ১১।৩৩-৩৪)

—শ্রীমতী কুহু বেরা, অমর্ষি (মেদিনীপুর)

শ্রীল গুরু-মহারাজের বক্তৃতা

[ধুবড়ী, আসাম, তাং ১১/১২/১৯৯০]

দ্বিতীয় অধিবেশন

আপনারা পূজনীয় বৈষ্ণববৃন্দের শ্রীমুখ থেকে ব্যাসপূজা বা শ্রীগুরুপূজা সম্পর্কে বহু তত্ত্ব-সিদ্ধান্ত শ্রবণ করেছেন। গতকাল আমি আমার সংক্ষিপ্ত ভাষণে সামান্য কিছু বক্তব্য রেখেছিলাম। আজ সেই জিনিসগুলোর ব্যাখ্যা করবার ইচ্ছা। সময় কম, এই সংক্ষিপ্ত সময়ের মধ্যেই ব্যাসপূজা বা গুরুপূজা এবং সনাতন ধর্ম্মের অন্যান্য দিক্ নিয়ে আলোচনা করার চেষ্টা করছি।

গতকাল আপনারা শ্রবণ করে থাকবেন, বক্তৃমহোদয়গণের মধ্যে কেউ কেউ জিনিসটা বুঝানোর চেষ্টা করেছেন যে, সনাতন ধর্ম্ম হল গুরুনিষ্ঠ ধর্ম্ম। আবার বলা হয়েছে, সনাতন ধর্ম্ম হল বেদনিষ্ঠ ধর্ম্ম। গুরুনিষ্ঠ ধর্ম্ম কথাটা বুঝাতে গেলে অনেক সময় একটা উদাহরণ দেওয়া হয়—True catholic religion (গুরুবাদী ধর্ম্ম)। যেহেতু Catholic শব্দটা ব্যবহার করা হল, সুতরাং Catholic শব্দটা আগে, গুরুবাদটা পরে, এমন কথা নয়। এটা একটা উদাহরণের কথা। অর্থাৎ সনাতন ধর্ম্মের যা কিছু তত্ত্বদর্শন, এর সবটাই আমাদের পূর্ব্ব পূর্ব্ব গুরুবর্গ থেকেই আসছে এজগতে। সেইটাই বুঝাবার চেষ্টা করা হয়েছে।

স্বয়ং ভগবান্ তিনি এ জগতের স্রষ্টা, পালন-পোষণ কর্ত্তা, রক্ষাকর্ত্তা। তিনিই সবকিছু। সেই ভগবানকে কেউ সৃষ্টি করেন নাই। সনাতন ধর্ম্ম, এমনই একটা জিনিস যেটা ভগবান্‌ও সৃষ্টি করেন নাই। সনাতন ধর্ম্মের Theory-র মধ্যে এটা আমরা পাই। বলছেন সেখানে—"ধর্ম্মন্তু সাক্ষাদ্ ভগবৎপ্রণীতম্।" সনাতন ধর্ম্ম মানে আত্মধর্ম্ম, নিত্যধর্ম্ম। সেই ধর্ম্ম কোন মানুষ সৃষ্টি করে নাই। আজকাল সমাজে ধর্ম্ম সম্বন্ধে একটা মেকী ধারণা লোককে দেওয়া হচ্ছে—ধর্ম্মটা যেন মানুষ সৃষ্টি করেছে, ধর্ম্মটা যেন ভয় থেকে আশঙ্কা থেকে উৎপত্তি হয়েছে। এমন কিছু ব্যাখ্যাদাতা বসে আছেন সমাজে তারা এ জাতীয় ব্যাখ্যা দিচ্ছেন। কিন্তু সনাতন ধর্ম্মে এ ধরণের কোন কথা নাই। সনাতন ধর্ম্মকে যদি কেউ মনে করেন যে, এটা একটা Cultural religion, creedal religion, ভুল করবেন তারা। এটা কোন culture এর কথা নয়, প্রাকৃত জগতের কোন creed-এর কথা নাই এর ভিতরে, caste এর কথা নাই এর ভিতরে। সবটার উর্দ্ধে।

সেই ভগবান্ নিত্যশুদ্ধ সনাতন বস্তু। তিনি পূর্ব্বে ছিলেন, বর্ত্তমানে আছেন এবং পরেও থাকবেন। স্বয়ং বেদোপনিষৎ ইহার প্রমাণ—"সদেব সৌম্যেদমগ্র আসীৎ ন ব্রহ্মা নেশানঃ।" সৃষ্টির পূর্ব্বে আমিই ছিলাম, বর্ত্তমানে আমিই আছি এবং পরে আমিই থাকব। বেদ এটা জানাচ্ছেন, স্বয়ং ভগবান্ নিজে এটা জানাচ্ছেন। তাহলে সেই ভগবানকে কেউ সৃষ্টি করেন নাই; কিন্তু তিনি সকলকে সৃষ্টি করেছেন। অনন্ত জৈব-জগৎ সবকিছু সেই ভগবান্ থেকে সৃষ্টি হয়েছে—এইটাই সব জায়গায় পাওয়া যায়। সনাতন ধর্ম্ম ঐরকম ভগবান্ সৃষ্টি করেন নাই। ভগবান্ যেমন আদি, অনাদি, নিত্যশুদ্ধ সনাতন বস্তু, ধর্ম্মও তদ্রূপ। সেই ধর্ম্মে কিছু প্রকারভেদ আছে। সাধারণ মানুষ মনে

করছেন যে, এটা একটা সামান্যকিছু আনুষ্ঠানিক ব্যাপার। কিন্তু জিনিসটা তা নয়। কেন বলছি? বস্তুর স্বভাবটাকে লক্ষ্য করে ধর্ম-শব্দের উৎপত্তি হয়েছে। বাস্তববস্তু ভগবান্ এবং সেই বাস্তববস্তুর অংশ বা বিভিন্নাংশ জীব বা জীবাত্মা। এই জীবাত্মার স্বরূপ নিয়ে বেদে, বেদান্তে, উপনিষদে—সব জায়গায় ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে। সনাতন হিন্দুশাস্ত্রে সুন্দর ব্যাখ্যা রয়েছে এ সম্বন্ধে। শুধু সনাতন ধর্মের কথা কেন, সনাতন ধর্মের থেকে তত্ত্বদর্শন নিয়ে, যিনি যতটুকু নিতে পেরেছেন তত্ত্বদর্শন, সেই অনুসারে মুসলিম শাস্ত্রের ভিতরে, খৃষ্টধর্মের ভিতরেও এসব নিয়ে আলোচনা আছে। সেগুলো নিয়ে পরস্পর পাশাপাশি আলোচনা করার প্রয়োজন আছে।

গতকাল নিরাকারবাদ নিয়ে আমরা আলোচনা করতে যাচ্ছিলাম। এই নিরাকারবাদ সম্বন্ধে শাস্ত্রে যেখানে যে কথা আছে সেইটুকুই সংক্ষিপ্তভাবে আমি আপনাদের কাছে জানাতে চাই। 'নিরাকার' অর্থ কি? নিরাকার মানে ভগবানের আদৌ কোন আকার নাই, একথা নয়। নির্গুণ মানে ভগবানের কোন গুণ আদৌ নাই, একথা নয়। নিঃশক্তিক মানে ভগবানের কোন শক্তি নাই, একথা আদৌ নয়। সেই জিনিসটা সনাতন শাস্ত্রে বুঝাবার চেষ্টা করা হয়েছে। সেখানে বলছেন—ভগবান্ সাকার, ভগবানের আকার আছে। সে আকারটা কি?—জড় আকার নয়, অনিত্য আকার নয়, মাটিয়া আকার নয়, নিত্য আকার। তাঁর যে রূপ, তাঁর যে গুণ, তাঁর যে লীলা, সবটাই হল অপ্রাকৃত। শাস্ত্রে বুঝানো হয়েছে এটা, আমরা বুঝতে পারি ছাই নাই পারি, জিনিসটা ত' রয়েছে। অনুভবের ব্যাপার এটা। আমরা যদি অনুভূতিটা—Realisation টা বাদ দেই, তাহলে আমাদের কি থাকছে? কিছুই থাকে না। সেই জিনিসটা হল আসল জিনিস।

কাল আমি আমার বক্তব্য শেষ করেছিলাম 'ধর্ম ও বিজ্ঞান' কথাটা আরম্ভ করে। সাধারণ মানুষ বলছেন ধর্ম কিছু নয়। এই হল সাধারণ লোকের ধারণা। আবার সাধারণ কেন বলি! তারা আবার অনেক লেখাপড়া জানা লোক, পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত। তারা বলছে, ধর্মকর্ম বলে কিছু নাই। ওর প্রয়োজন নাই। সেখানে প্রশ্ন হচ্ছে—ধর্মকর্ম কাকে বলি আমরা? ধর্ম-শব্দে শাস্ত্রে যে ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে তার অর্থ কি? আমরা যে সংসারে বসবাস করছি তার কিছু আইনকানুন আছে, Discipline আছে। এই আইনকানুন যদি আমরা না মানি, Discipline যদি আমরা না মানি, তাহলে আমাদিগকে ত' মনুষ্য বলে স্বীকার করা হবে না। এই নীতি-আদর্শের মূল্যায়ন

হচ্ছে ধর্ম্ম, শাস্ত্রের উক্তি। আর তার মূল্যায়ন হচ্ছে সনাতন ধর্ম্মাবলম্বী ব্যক্তি। সুতরাং এটাকে অস্বীকার করে মানুষ চলবে কি করে তার দৈনন্দিন জীবনক্ষেত্রে ?

ভাল-মন্দের বিচারটা এসেছে ত' ভগবান্ থেকে। এটা ত' তিনিই নির্ণয় করেছেন। সেই জীবন আর্য্যঋষিগণ সাধনা করেছেন তাঁদের জীবনে। সাধনায় উপলব্ধ জিনিসটা আবার ব্যাখ্যা দিয়েছেন। তা এই জিনিসটা অস্বীকার করার কি কারণ হচ্ছে ? কিছু ব্যক্তি সমাজে বসে আছেন, তারা মনে করেন যে, আইনকানুন পালন করাটা বোধ হয় অপ্রয়োজনীয় বিষয়। আজকালকার সমাজে দেখা যায়, যিনি যত বেশী নাস্তিক হতে পেরেছেন, তার গৌরব যেন তত পরিমাণে অধিক ! যিনি সবটাকে অস্বীকার করতে পারেন, তিনি সবথেকে বড় বাহাদুর ব্যক্তি আজ সমাজে। আজ তথাকথিত সমাজজীবন পর্য্যুদস্ত—বিপর্য্যস্ত হয়ে পড়েছে। ধর্মকর্ম সম্বন্ধে কোন বাস্তব সুষ্ঠু ধারণা নাই তাদের। তাই তারা ঐ কথা বলতে যাচ্ছেন—ধর্ম্মের প্রয়োজন নাই।

ধর্ম্মের নিশ্চয় প্রয়োজন আছে। সেই ধর্ম্মকে তিনভাগে ভাগ করা হয়েছে শাস্ত্রে। প্রথম ধর্ম্ম—শারীর ধর্ম্ম, দেহধর্ম্ম। যেমনভাবে চললে, যেমন ভাবে খেলে-পরলে, আইনকানুন পালন করলে আমাদের শরীরটা সুস্থ থাকবে, এটা হল শারীর ধর্ম্ম। যেমনভাবে চললে পরে আমাদের মনটা সুস্থ থাকবে, মনটা প্রসন্নতা লাভ করবে, তাকে বলে মনোধর্ম্ম। কিন্তু দেহধর্ম্ম এবং মনোধর্ম্ম আত্মধর্ম্ম থেকে পৃথক্ বস্তু। জড়ীয় জিনিস এটা। আত্মধর্ম্মের যে চিন্তা, আর্য্যঋষিগণ সেই চিন্তাটাকে সনাতন ধর্ম্ম নামে প্রচার করেছেন। এটা সার্ব্বজনীন ধর্ম্ম। সেই ধর্ম্মের কথা বেদে, বেদান্তে, উপনিষদে, গীতা, ভাগবতে প্রচারিত হয়েছে এবং এর তাৎপর্য্য যাঁরা উপলব্ধি করেছেন, তাঁরা এ জিনিসটাকে মেনে নিয়েছেন। মেনে না নিয়ে ত' উপায় নাই। বাস্তবসত্য যেটা সেটাকে আমাদের মেনে নিতেই হয়। তাকে অস্বীকার করলে কারও কোন বাহাদুরি থাকছে না। শাস্ত্রের যে তত্ত্বদর্শন—Axiomatic Truth, Universal Truth, সেটাকে সবসময় আমাদের মেতে নিতে হচ্ছে। সুতরাং সনাতন ধর্ম্মের যে Principle—নীতি-আদর্শগুলো আছে, সেগুলো আমরা সবসময় মেনে নিতে বাধ্য আছি। যদি ওটাকে মেনে না নেওয়া হয়, তাহলে মনুষ্য বলে স্বীকৃতি আমাদের আসে না।

উদাহরণ দিয়ে বলা যায়,—ভগবান্ প্রথমমুখে সৃষ্টি করেছেন জল, তারপরে জলচর প্রাণী, তারপরে তিনি সৃষ্টি করেছেন স্থল। তারপরে তিনি বৃক্ষ, তৃণ,

গুল্ম, লতা, উরগ-প্রাণী, পাখী, পশু সৃষ্টি করেছেন। এসব সৃষ্টি করে প্রেমময় ভগবান্ তিনি মনে শান্তিলাভ করছিলেন না। তারপরে তিনি তাঁর নিজের আকার দিয়ে নিজের মত মানুষ সৃষ্টি করলেন। এই ইতিহাস সনাতন শাস্ত্রে রয়েছে, মুসলিম শাস্ত্রে রয়েছে, খৃষ্টধর্মেও রয়েছে। কেন আছে?—বাস্তব সত্য বলে এটাকে মেনে নেওয়া হয়েছে। তাহলে ভগবান্ তাঁর নিজের আকারের মত করে একটা আকার দিয়ে মানুষকে সৃষ্টি করলেন, এটা মেনে নিতে হচ্ছে সকলকে। সেই মানুষকে ভগবান্ কিছু অধিকার, কিছু সম্পদ্ দিয়েছেন। কি সম্পদ্?—জ্ঞান, বুদ্ধি, বিবেক, বিচক্ষণতা, প্রাজ্ঞ প্রভৃতি সবকিছু দিয়ে সৃষ্টি করেছেন।

প্রথম শ্রেণীর মানবকে ভগবান্ জিজ্ঞাসা করেছেন—তোমরা মানুষ? বললেন, আমরা জানি না। তোমরা ধর্ম্ম মান, নীতি-আদর্শ মান? উত্তর এল —আমরা ধর্ম্ম বুঝি না, নীতি-আদর্শ, ভগবান্ টগবান্ কিছু বুঝি না। তাহলে ত' তোমাদের মানব বলে স্বীকৃতি দেওয়া গেল না। দ্বিতীয় পর্য্যায়ের মানব-গোষ্ঠীকে আবার প্রশ্ন করা হয়েছে—তোমরা ধর্ম্ম মান, নীতি-আদর্শ মান? তারা বললেন,—ভগবান্ টগবান্ বুঝি না, তবে নীতি-আদর্শ কিছুটা মেনে নিতে পারি। প্রশ্ন করা হল—ভগবান্ ত' মূল বস্তু, তাঁর থেকে ত' সবকিছু এসেছে। নীতি-আদর্শ যদি মানতে পার, তাহলে ভগবানকে মানতে পার না কেন? তোমাদেরও মনুষ্য বলে স্বীকৃতি দিলাম না। তৃতীয় গোষ্ঠীর মানবকে আবার জিজ্ঞাসা করা হয়েছে—তোমরা মান ধর্ম্ম, মান বিশ্বস্রষ্টা, বিশ্বনিয়ন্তা বলে একজন আছেন?—হ্যাঁ মানি, দুটোই মানি। তাকেই স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে মানব বলে। সুতরাং আজ যে সমাজে খুব ঠেলাঠেলি চলছে, মশায়! আমরা ত' মানুষ, মানুষের মত খেতে, পরতে, বাঁচতে চাই। শাস্ত্র সেখানে বলছেন,—"মানুষ আকার হইলে কি হয়, করহ ভূতের কাম।" চেহারাটা মানুষের মত হলে হয় না, মনুষ্যের যে কর্ত্তব্য সে কর্ত্তব্য আচরণ করা, পালন করা হল মানবোচিত স্বভাব, ধর্ম্ম। এই কথাই বুঝানো হয়েছে। এই সাধারণ মানুষকে বলা হল মুকুলিত চেতন্য মনুষ্য। পরে ভাল-মন্দের বিচার করে সদ্গুরু পদাশ্রয় করে যখন সাধন-ভজন পথে কেউ অগ্রসর হন, তখন তাকে বলা হয় বিকচিত চেতন মনুষ্য। পরে সাধনায় সিদ্ধিলাভ করছেন যাঁরা, তাঁদের বলা হয় পূর্ণ বিকচিত চেতন মনুষ্য। যদি এইখানে এইভাবে Gradation দেখানো হয়েছে, অধিকারভেদ দেখানো হয়েছে, তাহলে একজন সাধারণ মানুষ কি করে দাবী করতে পারে? এ সম্পর্কে যতটুকু নীতি-আদর্শ

পালন না করলে চলবে না, সেটুকু ত' জীবকে দেখাতে হবে। ভাল-মন্দের বিচারটা ত' রাখতে হবে।

গতকাল আলোচনা হয়েছে—আস্তিক আর নাস্তিক। এই দুটো শ্রেণী ভাগ করেছেন স্বয়ং ভগবান্ কৃষ্ণচন্দ্র। আপনারা গীতা আলোচনা করছেন, দেখবেন তার ভিতরে—এক সুর আর এক অসুর, এক আস্তিক আর এক নাস্তিক। সেই দুটো শ্রেণীকে নিয়ে বিচার করা হয়েছে। যাঁরা নীতি-আদর্শের মূল্যায়ন করছেন, মেনে নিয়েছেন, তাঁদের বলা হয়েছে দৈবীভাবাপন্ন ব্যক্তি, আস্তিক। আর যারা সেটাকে অস্বীকার করছেন, তাদের বলা হয়েছে নাস্তিক, অসুর-প্রকৃতিবিশিষ্ট ভগবদ্‌বিরোধী Eliment তারা। এই ত' শাস্ত্রে বুঝানো হয়েছে পরিষ্কার ভাষায়। এর ভিতরে ত' অন্য কোন কথা নাই। আজ সমাজে যে নাস্তিক্যভাব, সেখানে দেখা যাচ্ছে কি?—মানুষ নাস্তিক হয়েই যেন বেশী বাহাদুরি করতে চাচ্ছে। আমি কিছু মানি না, কারও ধার ধারি না—এইটাই যেন সবচেয়ে বাহাদুরি হয়ে দাঁড়িয়েছে আজ। কিন্তু যিনি সবকিছু অস্বীকার করে চলছেন, তার কথাটা কে মানবে? তার কথা কে স্বীকৃতি দেবেন যিনি সকলকে অস্বীকার করেন? যুক্তি বলে, যার যতটুকু অধিকার আছে, তাকে সেটা স্বীকৃতি দিতে হবে।

বিশ্বের যাঁরা চিন্তাশীল মনীষি, বিশ্বজ্জনবরেণ্য আছেন, তাঁদের প্রত্যেকের মধ্যে এই বিচার রয়েছে। একজন বৈজ্ঞানিক দার্শনিক—Scientist Philosopher বললেন যে, ধর্মটা যদি বিজ্ঞান বাদ দিয়ে হয়, তাহলে সেটা ধর্ম্ম নয়, আবার বিজ্ঞান যদি ধর্মকে বাদ দিয়ে হয়, তাহলে সেটা বিজ্ঞান নয়। কথাগুলো চিন্তা করবার বিষয়। যাঁরা উচ্চস্তরে উঠেছেন, তাঁদের ভিতরে বিচারে সামঞ্জস্য এসেছে। গণ্ডগোল করছেন কারা?—যারা মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছেন, তারাই গণ্ডগোল করছেন।

পাশ্চাত্ত্য দেশ থেকে কথা একটা এসেছে, আপনারা প্রত্যেকে শুনেছেন এবং শোনেন—"Science ends in Philosophy and Philosophy ends in Religion." কথাটা আপনারা বিচার করবেন। কথাটা আমাদের দেশের কথা নয়, পাশ্চাত্ত্য দেশের কথা। ব্যাপারটা কি? আমাদের দেশের মনীষিরা বহু ভাল ভাল কথা বলে রেখেছেন। আমাদের দেশের মুনি-ঋষিগণের কথা নিয়েই পাশ্চাত্ত্য দেশ Research করে তারাই আজ বহু বক্তব্য রাখছেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই, আমার দেশের মুনি-ঋষিগণের যে বদান্যতা, তাঁদের যে উদারতা, তাঁদের যে মহান ভাব, সেইগুলোকে আমরা নিতে পারছি না! পাশ্চাত্ত্য দেশ কি বলছে, সেইটার দিকে আমরা তাকিয়ে আছি। তারা কতটুকু কি আমাদের শুনাবেন, জানাবেন, বুঝাবেন? আমাদের দেশের মুনি-ঋষিগণ যে সম্পদ—জ্ঞানভাণ্ডার রেখে গেছেন, তার ত' একটুও নিয়ে আমরা Research—তত্ত্বানুসন্ধান করছি না। দুঃখের বিষয় ত' এইটা।

(ক্রমশঃ)

কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ

(১)

আঁধার প্রাণে চন্দ্রিকা এই নামই ব্রজের বংশীধারী।
অমানিনা মানদেন কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ॥
জ্ঞান-করমের কুহক ভুলে' শ্রীনামে দাও চিত্ত বাঁধা।
নিত্য শুদ্ধা ভক্ত্যুদয়ে যাবে হৃদের নিখিল ধাঁধাঁ॥
দশটী অপরাধকে ছেড়ে, অকৈতবে নাম গাহ।
কৃষ্ণোদ্দেশে অর্পি বিষয় কৃষ্ণ ভজ সকল অহঃ॥
আনুকূল্যে কৃষ্ণভক্তি করলে যাবে ভোগ বাধা।
মায়াবাদীর সঙ্গ ত্যাজ্য—'যাতে করে জীবকে গাধা॥'
একান্তভাব সমাশ্রয়ি জ্ঞান করমে পরিহরি।
অমানিনা মানদেন কীর্ত্তনীয়ঃ সদাঃ হরিঃ॥

(২)

পুণ্য আদি সুখের ধামকে ঘৃণার সহিত তেয়াগিয়া।
কল্মষপাপ পুতিগন্ধ—তার কখনই নাম না নিয়া॥
ভক্ত্যনুকূল গ্রহণ কর প্রাতিকূল্য পরিত্যজি'।
সদ্‌গুরুপাদ কৃতাশ্রয়ে শ্রীনামে হও অনুরাগী॥
যোষিৎসঙ্গী, ভোগপিপাসু, বভুক্ষুদের সঙ্গ ত্যজি'।
শ্রীঅচ্যুতগোত্রীয়দের চরণ ধূলায় রইবে মজি'॥
কৃতে যদ্ধ্যায়তো বিষ্ণুং—ত্রেতাযুগে যজ্ঞবিধি।
দ্বাপরযুগে পরিচর্য্যা, কলির যজ্ঞ শ্রীনামনিধি॥
সর্ব্ব যজ্ঞাৎ মহৎ যজ্ঞ, বিজ্ঞাবিজ্ঞ সবার ইহা।
কেবল চাহি তীব্র নিষ্ঠা, কুণ্ঠাশূন্য প্রাণের স্পৃহা॥
শ্রীসদ্‌গুরুর উদার কৃপায় সম্বন্ধ-বোধ চিত্তে ধরি'।
অমানিনা মানদেন কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ॥

(৩)

মলিন জীবের বদ্ধ প্রাণের ভবরোগের একৌষধি।
প্রাণের শ্রদ্ধা অনুপানে পান করা চাই নিরবধি ॥
সহজিয়া, আউল, বাউল, সখীভেকী, কর্ত্তাভজা।
জাতি গোঁসাই, সাঁই, দরবেশ, নেড়া, স্মার্ত্ত কর্ম্মযাজা ॥
এই প্রকারের সংখ্যাতীত অসৎসঙ্গ দূরে রেখে।
যুক্ত বিরাগ দৃঢ় করি' উচ্চাদর্শ চিত্তে এঁকে ॥
কুটিনাটি, ভক্তিশূন্য মায়িক চেষ্টা আদৌ ছেড়ে।
ভজ কৃষ্ণ কহ কৃষ্ণ, থেকোনা জড় মোহের বেড়ে ॥
আম্নায়াপ্ত তত্ত্বসূত্র মনোমূলে বদ্ধ করি'।
অমানিনা মানদেন কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ ॥

(৪)

নাম গ্রহণই জৈবধর্ম্ম, এই কল্যাণের কল্পতরু।
শিক্ষাষ্টকের সংশাসনে সবাই শ্রীনাম গ্রহণ করু ॥
বিষয়াশ্রয় তত্ত্ব বুঝে নিত্য ভজ নন্দসুতে।
মর্ক্কটীয়া বিরাগ ছেড়ে শ্রীনাম লবে খেতে শুতে ॥
আদৌ শ্রদ্ধা, তাহার পরে সাধুসঙ্গে শ্রবণ ক্রিয়া।
দীক্ষান্তে দ্বিজত্ব লভি' ভজন সেবন অর্পি' হিয়া ॥
নামানন্দে বিভোর থাক—শ্রীকৃষ্ণেচ্ছা বলবতী।
শীঘ্র তোমায় কৃপা হবে থাক্‌লে তোমার শ্রেষ্ঠা রতি ॥
উথলিয়া উঠ্‌বে পুলক—সে কেমন ভাব আহা মরি।
অমানিনা মানদেন কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ ॥

—শ্রীনারায়ণদাস বিদ্যাভূষণ

শ্রীচৈতন্যে মর্ত্ত্যবুদ্ধি—নাস্তিকতা ও অপরাধ

[পূর্ব্বপ্রকাশিত ৪৩শ বর্ষ, ৩য় সংখ্যা, ১২০ পৃষ্ঠার পর]

আর ধর্ম্মের বক্তা স্বয়ং ভগবান্ই—'ধর্ম্মন্তু সাক্ষাৎ ভগবদ্ প্রণীতম্'। শাস্ত্র বাদ দিয়া যে যুক্তি তাহা ভ্রম-প্রমাদাদি দোষদুষ্ট। তদ্দ্বারা পরতত্ত্বকে জানা যায় না। কাজেই শাস্ত্র-যুক্তি অবলম্বন না করিলেই ধর্ম্মহানি ঘটে। গীতায় ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন,—

"তস্মাচ্ছাস্ত্রং প্রমাণন্তে কার্য্যাকার্য্যব্যবস্থিতৌ।
জ্ঞাত্বা শাস্ত্রবিধানোক্তং কর্ম্ম কর্ত্তুমিহার্হসি॥" (গীতা ১৬।২৪)

অর্থাৎ—"অতএব কার্য্যাকার্য্য ব্যবস্থা বিষয়ে শাস্ত্রই তোমার প্রমাণ, এই কর্ত্তব্যবিষয়ে শাস্ত্রবিধানে উপদিষ্ট কর্ম্ম অবগত হইয়া করিবার নিমিত্ত যোগ্য হও অর্থাৎ তোমার করা উচিত।"

চার্ব্বাকের বচন যে যুক্তিহীন, তাহার প্রমাণস্বরূপ শ্রীমদ্ বাদিরাজতীর্থ স্বামিপাদ প্রণীত "যুক্তিমল্লিকা"-গ্রন্থের বাণী উল্লেখ করিতেছি—

"বেদো ন মানমিতি তু দ্বৌ চত্বারোহস্য মানতাম্।
মন্বতে তদ্বহোরেব তন্মতেন্বগ্রহং বুধাঃ॥" (যুঃ মঃ ৬৫)

অর্থাৎ—"বুদ্ধ ও চার্ব্বাক্—এই দুইজন বেদের অপ্রামাণ্য এবং নৈয়ায়িক, মীমাংসক, সাংখ্য ও বৈদান্তিক এই চারিজন প্রামাণ্য স্বীকার করেন, অতএব পণ্ডিতগণ বহুজন-স্বীকৃত পন্থাকেই গ্রহণ করিয়া থাকেন।"

"চার্ব্বাকস্য ন বাক্ চার্ব্বী কুর্ব্বীতাত্মবধং যতঃ।
অক্ষৈকমানতা বাক্কিং রক্ষেদাত্ম প্রমাণতাম্॥" (যুঃ মঃ ৭৪)

অর্থাৎ—"চার্ব্বাকের বচন কোনরূপেই সুচারু নহে, যেহেতু তাদৃশ বচন নিজেরই ব্যাঘাত জন্মাইয়া থাকে; কারণ চার্ব্বাক একমাত্র ইন্দ্রিয়সকলকেই প্রমাণ বলিয়াছেন। অতএব তাঁহার বচন নিজেরই প্রামাণ্য রক্ষা করিতে পারে না। (যেহেতু বাক্য-পদার্থটি ইন্দ্রিয় ব্যতিরিক্ত, যদি ইন্দ্রিয় ভিন্ন সমস্তই অপ্রমাণ হয়, তবে তাহার নিজের বচনও ইন্দ্রিয় ব্যতিরিক্ত বলিয়া অপ্রমাণ)।"

লেখক শাস্ত্রের গূঢ় উদ্দেশ্য বুঝিতে না পারার দরুণ ভ্রান্তমতি নাস্তিক চার্ব্বাকের ভ্রান্ত বিচার লইয়া শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভুর অচিন্ত্যলীলা বুঝিতে প্রয়াসী হইয়াছেন। তাই তাঁহার প্রয়াস ব্যর্থ হইতে বাধ্য। ব্রাহ্মণ চার্ব্বাক্ বেদনিন্দা করিবার

জন্যই বেদ অধ্যয়ন করিয়াছিলেন, এক্ষণে লেখক চৈতন্যদেবের নিন্দা করিবার জন্যই কি চৈতন্য-চরিত অধ্যয়ন করিয়াছেন ও এই পুস্তকখানি লিখিয়াছেন ?

(১২) লেখক ২৫৪ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন,—"রায় রামানন্দ, রূপ (সাকর মল্লিক), সনাতন (দবির খাস) এঁরা সকলেই ছিলেন রাজকর্মচারী।" লেখক রূপ (সাকর মল্লিক) এবং সনাতন (দবির খাস) লিখিয়াছেন। কিন্তু উহা আদৌ সত্য নহে। শ্রীমন্মহাপ্রভু দবির খাস ও সাকর মল্লিকের নাম যথাক্রমে রূপ ও সনাতন নাম প্রদান করেন। চৈতন্যচরিতামৃতে দেখা যায় হুসেন শাহ রূপ গোস্বামীকে দবির খাস নামে সম্বোধন করিতেন,—

"দবির খাসেরে রাজা পুছিল নিভৃতে।
গোসাঞির মহিমা তেঁহো লাগিল কহিতে॥" (চৈঃ চঃ মঃ ১।১৭৫)

শ্রীচৈতন্যভাগবতে আছে,—

"শেষখণ্ডে, শ্রীগৌরসুন্দর মহাশয়।
দবির খাসেরে প্রভু দিলা পরিচয়॥
প্রভু চিনি' দুই ভাইর বন্ধ-বিমোচন।
শেষে নাম থুইলেন 'রূপ'-'সনাতন॥" (চৈঃ ভাঃ আঃ ১।১৭১-১৭২)

'চৈতন্যভাগবতে' অন্ত্যখণ্ডে নবম অধ্যায়ে বর্ণিত আছে রূপ-সনাতনের মহাপ্রভু-পদে নতি ও কাকুর্ব্বাদ—

"সাকর মল্লিক আর রূপ—দুইভাই।
দুই প্রতি কৃপাদৃষ্ট্যে চাহিলা গোসাঞি॥" (চৈঃ ভাঃ অঃ ৯।২৩৯)

সাকর মল্লিককে মহাপ্রভু-কর্ত্তৃক তৃতীয় সংস্কারস্বরূপ 'সনাতন' নাম প্রদান—

"সাকর মল্লিক নাম ঘুচাইয়া তান।
সনাতন অবধূত থুইলেন নাম॥" (চৈঃ ভাঃ অঃ ৯।২৭৩)

সুতরাং সনাতন গোস্বামীর বাদশাহ-প্রদত্ত নাম 'সাকর মল্লিক' এবং রূপ গোস্বামীর বাদশাহ-প্রদত্ত নাম 'দবির খাস'—ইহাই প্রমাণিত হয়।

(১৩) লেখক ১১৩।১১৪ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন,—"কি সেই প্রশ্ন ? না, নিমাই কেন এসেছিলেন গয়াতীর্থে ? পিতৃপিণ্ড দান নিমিত্তার্থে ? ঠিক। কিন্তু সত্যিই তিনি—সত্যিই কি একমাত্র পিতৃপিণ্ড দান নিমিত্তে গয়ায় এসেছিলেন ? জানি, সুদীর্ঘ পাঁচশতাধিক বৎসর পর চৈতন্য গ্রন্থে এর সদুত্তর পাওয়া দুরূহ। আবার দুরূহ নয়ও বলা যায়। দুরূহ বলছি এজন্য যে, এই সুদীর্ঘ পাঁচশো বছরে অতো বড়ো জননেতা চৈতন্যকে কেউ মানুষ হিসাবে ভাবলো না। সন্ন্যাসী হিসাবেও ভাবলো না (সন্ন্যাসীও তো মানুষ),

ভাবলো ভগবান হিসাবে। যদুপতি কৃষ্ণ-বলরামের কল্পিত মূর্তিকে অনুকরণ করে গৌর-নিতাইয়ের বিগ্রহ সৃষ্টি হল মঠে, মন্দিরে। কিন্তু কেন?"

লেখকের জড়বুদ্ধিতে মহাপ্রভুর গয়া যাত্রার উদ্দেশ্য জানা দুরূহ হইতে পারে, কিন্তু মহাভাগবতগণের নিকট তাহা মোটেই দুরূহ নহে; বরং তাঁহারা সহজ ও সরলভাবে মহাপ্রভুর গয়া যাত্রার প্রকৃত উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করিয়াছেন। "এক কার্য্যে সাধেন প্রভু কার্য্য পাঁচ সাত"—ভগবান্ শ্রীচৈতন্যদেব নিজে আচরণ করিয়া আমাদের শিক্ষা দিয়াছেন। শ্রীচৈতন্যদেবের পিতা জগন্নাথ মিশ্র ছিলেন অভিন্ন নন্দ মহারাজ। বিশুদ্ধ সত্ত্ব জগন্নাথ মিশ্রের প্রেতযোনি প্রাপ্তি আদৌ সম্ভব নহে এবং তাঁহাকে প্রেতযোনি হইতে উদ্ধারের জন্য গয়ায় পিণ্ডাদি দেওয়ার প্রয়োজন থাকিতে পারে না। তবে মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেব গয়াক্ষেত্রে গিয়াছিলেন কেন? শাস্ত্রে কথিত আছে,—

"ভবদ্বিধা ভগবতাস্তীর্থীভূতাঃ স্বয়ং প্রভো।
তীর্থী কুর্ব্বন্তি তীর্থানি স্বান্তঃস্থেন গদাভৃতা॥ (ভাঃ ১।১৩।৮)

অর্থাৎ—"আপনার ন্যায় ভাগবতসকল স্বয়ং তীর্থস্বরূপ। আপনারা গদাধর শ্রীকৃষ্ণকে সতত হৃদয়ে ধারণ করেন বলিয়া পাপিগণের পাপমলিন তীর্থসকলকে পবিত্র করিতে সমর্থ।" বহু অতীর্থকে তীর্থীকরণমুখে মহাপ্রভুর গয়াযাত্রা,—

"সর্ব্ব-দেশ-গ্রাম করি' পুণ্যতীর্থময়।
শ্রীচরণ হৈল গয়া দেখিতে বিজয়॥" (চৈঃ ভাঃ আঃ ১৭।১৩)

গয়াতীর্থরাজের আহ্বানে পাপমলিন গয়াক্ষেত্রকে পবিত্র করিবার জন্য শ্রীচৈতন্যদেব গয়াতে গিয়াছিলেন,—তাঁহার গয়াযাত্রার মধ্যে নিজের পাপস্খালন বা পিতৃদেবের পাপস্খালন জন্য পিতৃদেবকে পিণ্ডাদি প্রদান করার মৌলিক হেতু নাই বা থাকিতে পারে না। কর্ম্মকাণ্ডী, স্মার্ত্ত ও পাপিষ্ঠ লোকেদের জন্য গয়া-শ্রাদ্ধের ব্যবস্থা ঋষিগণকর্তৃক নিরূপিত হইয়াছে। কর্ম্মকাণ্ডপর স্মার্ত্তগণকে বঞ্চিত ও মোহিত করিবার জন্য মহাপ্রভু পিতৃ-তর্পণাদি কর্ম্মকাণ্ড-বিধি-পালন লীলাভিনয় করিয়াছিলেন। বিষ্ণুমন্ত্রে দীক্ষিত বৈষ্ণবের জন্য গয়ায় প্রেত-শ্রাদ্ধ বা কুশধারণাদির ব্যবস্থা নাই। ইহা শিক্ষা দিবার জন্য শ্রীচৈতন্যদেব বিষ্ণুমন্ত্রে দীক্ষিত হইবার পূর্ব্বে গয়ায় শ্রাদ্ধ ও পিণ্ডদানের লীলাভিনয় প্রদর্শন করিয়াছেন। তাঁহার দীক্ষাগ্রহণ লীলাও লোকশিক্ষা মাত্র। শ্রীচৈতন্যভাগবতে বর্ণিত আছে,—

"প্রভু বলে—'গয়া-যাত্রা সফল আমার।
যতক্ষণে দেখিলাঙ চরণ তোমার॥

তীর্থে পিণ্ড দিলে সে নিস্তরে পিতৃগণ।
সেহ,—যারে পিণ্ড দেয়, তরে সেই জন॥
তোমা' দেখিলেই মাত্র কোটি-পিতৃগণ।
সেইক্ষণে সর্ব্ববন্ধ পায় বিমোচন॥
অতএব তীর্থ নহে তোমার সমান।
তীর্থেরো পরম তুমি মঙ্গল প্রধান॥
সংসার-সমুদ্র হৈতে উদ্ধারহ মোরে।
এই আমি দেহ সমর্পিলাঙ্ তোমারে॥
'কৃষ্ণপাদপদ্মের অমৃত-রস পান।
আমারে করাও তুমি'—এই চাহি দান॥" (চৈঃ ভাঃ আঃ ১৭।৫০-৫৫)

এক্ষণে মহাপ্রভু স্বয়ং ঈশ্বরপুরীপাদের স্তবোপলক্ষে ভক্ত-মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিয়াছেন এবং লোকশিক্ষার্থ স্বয়ং শিষ্যাভিমানে পুরীপাদের নিকট দীক্ষা-প্রার্থনা লীলাভিনয় করেন। উক্ত শ্লোকের তাৎপর্য্য এই যে, তীর্থে গিয়া ভগবদ্ভক্তের দর্শন না পাইলে তীর্থদর্শন অসম্পূর্ণ থাকিয়া যায়। গয়াতীর্থে যাহার নামে পিণ্ড দেওয়া হয়, কেবলমাত্র সেই উদ্ধার পায়; কিন্তু বৈষ্ণব-দর্শনমাত্রে দ্রষ্টার কোটি কোটি পিতৃমাতৃকুল উদ্ধার লাভ করেন। তীর্থ অপেক্ষা বৈষ্ণবের মহিমা অত্যন্ত অধিক।

মহাপ্রভুকে ঈশ্বর-জ্ঞানে পুরীপাদ স্তুতি করিতেছেন,—

"বলেন ঈশ্বরপুরী,—'শুনহ, পণ্ডিত।
তুমি সে ঈশ্বর-অংশ,—জানিনু নিশ্চিত॥
যে তোমার পাণ্ডিত্য, যে চরিত্র তোমার।
সেহ কি ঈশ্বর-অংশ বই হয় আর?
যেন আজি আমি শুভ স্বপ্ন দেখিলাঙ্।
সাক্ষাতে তাহার ফল এই পাইলাঙ্॥
সত্য কহি, পণ্ডিত! তোমার দরশনে।
পরানন্দ-সুখ যেন পাই অনুক্ষণে॥" (চৈঃ ভাঃ আঃ ১৭।৫৬-৫৯)

মহাপ্রভু তীর্থ ভ্রমণের সার্থকতা সম্বন্ধে বলিয়াছেন,—সাক্ষাৎ তীর্থভূত শ্রীগুরুদেবের পাদপদ্ম দর্শনেই সমগ্র তীর্থদর্শনের ফললাভ ঘটিয়া থাকে।—

"প্রভু বলে—'গয়া করিতে যে আইলাঙ্।
সত্য হৈল,—ঈশ্বরপুরীরে দেখিলাঙ্'॥"

এমতাবস্থায় মহাপ্রভুর গয়াযাত্রার প্রকৃত উদ্দেশ্য সংক্ষেপে বর্ণিত হইল।

লেখক ২৩৩ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছিলেন,—"ইংরাজীতে একটা প্রবাদ আছে—"He prayeth best who loveth best'—অর্থাৎ মানবতামুখীন ও জীব-সেবাই যথার্থ ঈশ্বর সাধনা। অন্যত্র গীতায় নৈরাশ্য, নিশ্চেষ্ট, ও নির্বেদ পীড়িত অর্জুনের উদ্দেশ্যে কম্বুকণ্ঠে পুরুষোত্তম কৃষ্ণ বলেছেন—'উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্ নিবোধত'।"

এক্ষণে লেখক ১১৪ পৃষ্ঠায় প্রশ্ন রাখিয়াছেন—"যদুপতি কৃষ্ণ-বলরামের কল্পিত মূর্তিকে অনুকরণ করে গৌর-নিতাইয়ের বিগ্রহ সৃষ্টি হল মঠে, মন্দিরে। কিন্তু কেন?" আবার লেখক ২৩৩ পৃষ্ঠায় কৃষ্ণকে 'পুরুষোত্তম' বলিয়াছেন। পুরুষোত্তম কে? তদুত্তরে গীতা বলেন,—

"যস্মাৎ ক্ষরমতীতোঽহমক্ষরাদপি চোত্তমঃ।
অতোঽস্মি লোকে বেদে চ প্রথিতঃ পুরুষোত্তমঃ॥" (গীতা ১৫।১৮)

অর্থাৎ—"ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন,—যেহেতু আমি এই ক্ষর-তত্ত্বের অতীত এবং অক্ষর-তত্ত্ব হইতেও উত্তম, সেই হেতু আমি জগতে ও বেদে পুরুষোত্তম নামে প্রসিদ্ধ।"

বেদান্তাচার্য্য শ্রীল বলদেব বিদ্যাভূষণ প্রভুর টীকায় পাই,—"যাবতীয় বিষ্ণু-তত্ত্বই পুরুষ, সেই বিষ্ণুতত্ত্বগণের মধ্যে যিনি উত্তম অর্থাৎ উৎকৃষ্টতম বা পরম, তিনিই—পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণ।" শ্রীমদ্ভাগবতে (৩।৯।১৯) ব্রহ্মার বাক্যে এই 'পুরুষোত্তম' নাম পাওয়া যায়,—"তস্মৈ নমো ভগবতে পুরুষোত্তমায়॥" সুতরাং ব্রহ্ম ও পরমাত্মা হইতে যিনি উত্তম, তিনিই পুরুষোত্তম। শ্রীশ্রীমদ্ সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুর মহাশয় বলিয়াছেন,—"ভগবত্তত্ত্বে যে-পর্য্যন্ত ব্রহ্মবুদ্ধি বা পরমাত্মবুদ্ধি থাকে, সে-পর্য্যন্ত জীব বিশুদ্ধ ভক্তিক্রিয়া লাভ করে না, পুরুষোত্তম-বুদ্ধি হইলেই ভক্তি বিশুদ্ধভাবে পরিচালিত হয়।" (ক্রমশঃ)

—শ্রীচৈতন্যকৃষ্ণ দাসাধিকারী

বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

শ্রীবিনোদবিহারী গৌড়ীয় মঠের ও শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা কার্য্যালয়ের ফোন নং ৫৫-৭২২৭ এর পরিবর্তে ৩৩-৮৯৭৩ হইয়াছে। অতঃপর আপনারা পরিবর্ত্তিত নূতন নম্বরে যোগাযোগ করিবেন। —কার্য্যাধ্যক্ষ

শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের তিরোভাব-তিথিপূজা

ও

শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের রথযাত্রা

মহোৎসবে আহ্বান

(পুরীধামের প্রথানুসারে)

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি
প্রতিষ্ঠাতা-আচার্য্য,
১০৮-শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব
গোস্বামী মহারাজ

শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠ
তেঘরিপাড়া,
পোঃ নবদ্বীপ (নদীয়া)।
৩১শে জ্যৈষ্ঠ, ১৩৯৮ বঙ্গাব্দ

সাদর সম্ভাষণপূর্ব্বক নিবেদন—

অন্যান্য বৎসরের ন্যায় এই বৎসরেও শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির সেবকবৃন্দের উদ্যোগে উক্ত মঠে শ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের তিরোভাব-তিথিপূজা-পালন ও শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের রথযাত্রানুষ্ঠানের আয়োজন করা হইয়াছে। এই উপলক্ষে আগামী ২৬শে আষাঢ়, ১৩৯৮ (ইং ১১।৭।৯১) বৃহস্পতিবার হইতে ৪ঠা শ্রাবণ, ১৩৯৮ (ইং ২১।৭।৯১) রবিবার পর্য্যন্ত একাদশ দিবসব্যাপী পাঠ, কীর্ত্তন, বক্তৃতা, নগর-সঙ্কীর্ত্তন, ইষ্টগোষ্ঠী, শ্রীবিগ্রহের বিশেষ সেবা-পূজা, ভোগরাগ, আরাত্রিক প্রভৃতি বিবিধ ভক্ত্যঙ্গ-যাজনমুখে বিরাট মহোৎসবের অনুষ্ঠান হইবে।

ধর্ম্মপ্রাণ সজ্জন মহোদয়গণ উক্ত শুদ্ধভক্ত্যনুষ্ঠানে যোগদান করিলে সমিতির সদস্যবর্গ পরমানন্দিত ও পরমোৎসাহিত হইবেন। এই মহৎ অনুষ্ঠানে যোগদান করিতে অসমর্থ হইলে প্রাণ, অর্থ, বুদ্ধি ও বাক্যদ্বারা সমিতির সেবাকার্য্যে সহানুভূতি প্রদর্শন করিলেও ভগবৎসেবোন্মুখী সুকৃতি অর্জ্জিত হইবে। পরপৃষ্ঠায় দৈনন্দিন সেবাপঞ্জী প্রদত্ত হইল।

শুদ্ধভক্তকৃপালেশপ্রার্থী—
সভ্যবৃন্দ,
শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি (রেজিঃ)

—ঃ সেবাপঞ্জী ঃ—

১। ২৬শে আষাঢ় (ইং ১১।৭।৯১), বৃহস্পতিবার—অপরাহ্ন ৫টা হইতে রাত্র ১০টা পর্য্যন্ত ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের তিরোভাব উপলক্ষে পাঠ, কীর্ত্তন, আরতি ও বক্তৃতা।

২। ২৭শে আষাঢ় (ইং ১২।৭।৯১), শুক্রবার—পূর্ব্বাহ্ন ৭ ঘটিকায় নগর সঙ্কীর্ত্তনমুখে গুণ্ডিচাবাড়ী গমন ও শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পাঠান্তে গুণ্ডিচামন্দির-মার্জ্জন এবং মঠে প্রত্যাবর্ত্তন।

৩। ২৮শে আষাঢ় (ইং ১৩।৭।৯১), শনিবার—শ্রীজগন্নাথদেবের রথযাত্রা ; অপরাহ্ন ৪টা হইতে সন্ধ্যা ৭টা পর্য্যন্ত সঙ্কীর্ত্তনযোগে শোভাযাত্রাসহ রথারূঢ় শ্রীজগন্নাথদেবের গুণ্ডিচাবাড়ী গমন। পরে শ্রীমঠে সন্ধ্যায় আরাত্রিক, সঙ্কীর্ত্তন ও শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত হইতে রথযাত্রা-প্রসঙ্গ পাঠ।

৪। ২৯শে আষাঢ়, ১৪ই জুলাই রবিবার হইতে ৩১শে আষাঢ়, ১৬ই জুলাই মঙ্গলবার পর্য্যন্ত দিবসত্রয় প্রত্যহ অপরাহ্ন ৫টা হইতে রাত্র ৯টা পর্য্যন্ত সঙ্কীর্ত্তন ও আরাত্রিকান্তে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত হইতে রথযাত্রা-প্রসঙ্গ পাঠ।

৫। ৩২শে আষাঢ় (ইং ১৭।৭।৯১), বুধবার—হেরাপঞ্চমী-দিবসে শ্রীলক্ষ্মী-বিজয় উৎসব। পূর্ব্বাহ্ন ৭টা হইতে মধ্যাহ্ন ১২টা পর্য্যন্ত গুণ্ডিচাবাড়ীতে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পাঠ ও নগর-সঙ্কীর্ত্তন। অপরাহ্ন ৫টা হইতে সঙ্কীর্ত্তন, সন্ধ্যায় আরাত্রিক, তদনন্তর শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ।

৬। ১লা শ্রাবণ, ১৮ই জুলাই বৃহস্পতিবার হইতে ৩রা শ্রাবণ, ২০শে জুলাই শনিবার পর্য্যন্ত শ্রীমঠে সঙ্কীর্ত্তন ও আরাত্রিকান্তে শ্রীমদ্ভাগবত পাঠমুখে বক্তৃতা।

৭। ৪ঠা শ্রাবণ (ইং ২১।৭।৯১), রবিবার—অপরাহ্ন ৩টা হইতে সঙ্কীর্ত্তন ও শোভাযাত্রাযোগে শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের পুনর্যাত্রা। পরে শ্রীমঠে সঙ্কীর্ত্তন, আরতি, শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও সাধারণ মহোৎসব।

দ্রষ্টব্য ঃ—কোন বিষয়ে বিস্তারিত জানিতে বা সাহায্যাদি পাঠাইতে হইলে "সাধারণ-সম্পাদক" শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির নিকট উল্লিখিত ঠিকানায় জ্ঞাতব্য ও প্রেরিতব্য।

॥ শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ ॥

স বৈ পুংসাং পরো ধর্ম্মো যতো ভক্তিরধোক্ষজে।

ধর্ম্মঃ স্বনুষ্ঠিতঃ পুংসাং বিষ্বক্সেন-কথাসু যঃ।

নোৎপাদয়েদ্ যদি রতিং শ্রম এব হি কেবলম্॥

অহৈতুক্যপ্রতিহতা যয়াত্মা সুপ্রসীদতি॥

সেই ধর্ম্ম শ্রেষ্ঠ যাতে আত্ম-পরসন্ন।
অধোক্ষজে অহৈতুকী ভক্তি বিঘ্নশূন্য॥

অন্য ধর্ম্ম সুষ্ঠুরূপে পালে যেই জন।
হরি-কথায় রতি নৈলে পণ্ড সেই শ্রম॥

৪৩শ বর্ষ | ২০ বামন, অনিরুদ্ধ, ৫০৫ শ্রীগৌরাব্দ | ৩২ আষাঢ়, বুধবার, ১৩৯৮, ইং ১৭।৭।৯১ | ৫ম সংখ্যা

চাতুর্ম্মাস্য-ব্রতম্

[স্কন্দ-পুরাণান্তর্গতম্ উৎকলখণ্ডম্ ষট্‌ত্রিংশোঽধ্যায়ে]

১। অতঃপরং প্রবক্ষ্যামি শয়নোৎসবমুত্তমম্।
আষাঢ়ীমবধিং কৃত্বা হরেঃ স্বাপস্তু কর্কটে॥ ১॥

২। বার্ষিকাংশ্চতুরো মাসান্ যাবৎস্যাৎ কার্ত্তিকী দ্বিজাঃ।
অয়ং পুণ্যতমঃ কালো হরেরারাধনং প্রতি॥ ২॥

"(জৈমিনি বলিলেন,—দ্বিজগণ!) অতঃপর ভগবান্ হরির অত্যুত্তম শয়নোৎসবের বিষয় বলি—শুনুন। সূর্য্যের কর্কট-রাশিতে গমনকালে আষাঢ় মাসীয় একাদশী হইতে যাবৎ না কার্ত্তিক মাসের একাদশী উপস্থিত হয়, প্রতি বর্ষে ঐ চারিমাস কাল ভগবান্ হরি নিদ্রিত থাকেন। হরির আরাধনা বিষয়ে ঐ মাসচতুষ্টয় অতি পুণ্যতম কাল জানিবেন॥ ১-২॥

৩। চাতুর্ম্মাস্যে নিবসতি ক্ষেত্রে শ্রীপুরুষোত্তমে।
সাক্ষাদ্দৃষ্টির্ভগবতস্তন্ময়ং ভক্তিসাধনম্‌ ॥ ৭ ॥

মুনিগণ! অধিক কি কহিব, পুরুষোত্তম-ক্ষেত্রে চাতুর্ম্মাস্য ব্রতাচরণ করত বাস করিলে তাহার প্রতি ভগবানের সাক্ষাৎ দৃষ্টি পতিত হইয়া থাকে; কারণ ভগবানের ভক্তি-সাধন ভগবানেরই স্বরূপ জানিবেন ॥ ৭ ॥

৪। ভোগিভোগাসনে সুপ্তশ্চাতুর্ম্মাস্যেষু বৈ বিভুঃ।
সর্ব্বক্ষেত্রেষু সান্নিধ্যং ন করোতি জগদ্গুরুঃ ॥ ৯ ॥

সর্ব্বনিয়ন্তা জগদ্গুরু হরি উক্ত মাস-চতুষ্টয় অনন্ত-শয্যায় নিদ্রিত থাকেন, এজন্য সমুদয় পুণ্যক্ষেত্রে তাঁহার সান্নিধ্য থাকে না ॥ ৯ ॥

৫। মুক্তিদশ্চক্ষুষা দৃষ্টশ্চাতুর্ম্মাস্যে বিশেষতঃ ॥ ১১ ॥

অন্য কাল অপেক্ষা উক্ত চাতুর্ম্মাস্য-কালে তিনি সচক্ষে দৃষ্ট হইলে নিঃসন্দেহ বিশেষরূপে মুক্তিপ্রদ হইয়া থাকেন ॥ ১১ ॥

৬। চাতুর্ম্মাস্যমথৈকং যঃ কুর্য্যাদ্বৈ পাপকৃত্তমঃ।
বিহায় সর্ব্বপাপানি বহিরন্তশ্চ নির্ম্মলঃ।
নরসিংহ-প্রসাদেন বৈকুণ্ঠ-ভবনং ব্রজেৎ ॥ ১৬ ॥

যে ব্যক্তি উক্ত ক্ষেত্রে এক বৎসর কালও চাতুর্ম্মাস্য ব্রতাচরণ করিতে পারে, সে নিরতিশয় পাপী হইলেও সমুদয় পাপপুঞ্জকে বিসর্জ্জন দিয়া বাহ্য ও অন্তঃশুদ্ধি লাভ করত ভগবান্‌ নৃসিংহদেবের প্রসাদে বৈকুণ্ঠে গমন করে ॥ ১৬ ॥

৭। তস্মান্নরঃ সর্ব্বভাবৈর্বিষ্ণোঃ শয়ন-পাবিতান্‌।
বার্ষিকাংশ্চতুরো মাসান্নিবসেৎ পুরুষোত্তমে ॥ ১৭ ॥

সেইজন্যই বলিতেছি, ভগবান্‌ স্বীয় শয়নদ্বারা যে চারিমাসকে পবিত্র করিয়া থাকেন, সেই মাসচতুষ্টয় পুরুষোত্তমে বাস করাই মানবগণের সর্ব্বতোভাবে বিধেয় ॥ ১৭ ॥

৮। কুর্য্যাদন্যন্ন বা কুর্য্যাজ্জন্মসাফল্যমৃচ্ছতি।
আষাঢ়-শুক্লৈকাদশ্যাং কুর্য্যাৎ স্বাপ-মহোৎসবম্‌ ॥ ১৮ ॥

হে তপোধন! যে ব্যক্তি মানব-জন্মের সাফল্য ইচ্ছা করে, সে অপর কোন সৎকর্ম্ম করুক, আর নাই করুক, তাহার পক্ষে পুরুষোত্তমে আষাঢ় মাসের শুক্লৈকাদশীতে ভগবানের শয়ন-মহোৎসব করা একান্ত কর্ত্তব্য ॥ ১৮ ॥

[স্কন্দ-পুরাণান্তর্গতম্ কাশীখণ্ডম্ ষষ্টিতমোঽধ্যায়ে]

৯। সদা কর্ত্তুং ন শক্নোতি ব্রতানি যদি মানবঃ।
চাতুর্ম্মাস্যমনুপ্রাপ্য তদা কুর্য্যাৎ প্রযত্নতঃ ॥ ৮০ ॥

যদি মানব সর্ব্বদা ব্রতানুষ্ঠান করিতে অসমর্থ হয়, তাহা হইলে তাহার যত্ন-সহকারে চাতুর্ম্মাস্য ব্রত করা উচিত ॥ ৮০ ॥

১০। ভূ-শয্যা-ব্রহ্মচর্য্যঞ্চ কিঞ্চিৎ ভক্ষ্য-নিষেধনম্।
এক-ভক্ত্যাদি-নিয়মো নিত্য-দানং স্বশক্তিতঃ ॥ ৮১ ॥

চাতুর্ম্মাস্য-ব্রতশীল ব্যক্তি ভূমিতে শয়ন করিবেন এবং ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিবেন। কিছুমাত্র আহার করিবেন না অথবা একভক্ত্যাদি নিয়ম গ্রহণ করিবেন। প্রত্যহ স্বীয় শক্তি অনুসারে দান করিবেন ॥ ৮১ ॥

১১। পুরাণ-শ্রবণঞ্চৈব তদর্থাচরণং পুনঃ।
অখণ্ড-দীপোদ্বোধঞ্চ মহাপুজেষ্টদৈবতে ॥ ৮২ ॥

ব্রতী পুরাণ-শাস্ত্র শ্রবণ ও তদনুরূপ আচরণ করিবেন, অখণ্ড দীপ প্রদান ও অভীষ্ট দেবতার সবিশেষ পূজা করিবেন ॥ ৮২ ॥

১২। প্রভূতাঙ্কুর-বীজাঢ্যে দেশে চাপি গতাগতম্।
যত্নেন বর্জ্জয়েদ্ধীমান্ মহাধর্ম্ম-বিবৃদ্ধয়ে ॥ ৮৩ ॥

তিনি ধর্ম্মবৃদ্ধির জন্য বহুতর অঙ্কুর ও বীজযুক্ত প্রদেশে গমনাগমন যত্নপূর্ব্বক পরিত্যাগ করিবেন ॥ ৮৩ ॥

১৩। অসম্ভাষ্যা ন সম্ভাষ্যাশ্চাতুর্ম্মাস্য-ব্রতস্থিতৈঃ।
মৌনঞ্চাপি সদা কার্য্যং তথ্যং বক্তব্যমেব বা ॥ ৮৪ ॥

চাতুর্ম্মাস্য-ব্রতশীল ব্যক্তি কখনও 'সম্ভাষণের অযোগ্য' ব্যক্তিগণের সহিত সম্ভাষণ করিবেন না। সর্ব্বদা মৌন অবলম্বন করিয়া থাকিবেন, অথবা সত বাক্যমাত্র কহিবেন ॥ ৮৪ ॥

১৪। নিষ্পাবাংশ্চ মসূরাংশ্চ কোদ্রবান্ বর্জ্জয়েদ্ব্রতী।
সদা শুচিভিরাস্থেয়ং স্প্রষ্টব্যো নাব্রতী জনঃ ॥ ৮৫ ॥

সর্ব্বদা পবিত্র থাকিবেন, অব্রতী ব্যক্তিকে স্পর্শ করিবেন না এবং নিষ্পাব (ধান্যবিশেষ), মসূর ও কোদ্রব (রাজশিম্বী) পরিবর্জ্জন করিবেন ॥ ৮৫ ॥

১৫। দন্ত-কেশাম্বরাদীনি নিত্যং শোধ্যানি যত্নতঃ।
অনিষ্ট-চিন্তা নো কার্য্যা ব্রতিনা হৃদ্যপি কচিৎ ॥ ৮৬ ॥

প্রত্যহ যত্ন-সহকারে দন্ত, কেশ ও বস্ত্রাদি শোধন করিবেন। ব্রতশীল ব্যক্তি কখনও হৃদয়ে কোনরূপ অনিষ্ট চিন্তা করিবেন না ॥ ৮৬ ॥

১৬। দ্বাদশস্বপি মাসেষু ব্রতিনো যৎ ফলং ভবেৎ।
চাতুর্ম্মাস্য-ব্রতভৃতাং তৎফলং স্যাদখণ্ডিতম্ ॥ ৮৭ ॥

দ্বাদশমাস ব্রতশীল ব্যক্তির যে ফললাভ হয়, চাতুর্ম্মাস্য-ব্রতধারী ব্যক্তি-গণেরও অবিকল সেই ফল লাভ হইয়া থাকে ॥ ৮৭ ॥

বৈষ্ণব-সেবা

কুলীনগ্রামী ভক্তদিগের প্রশ্নে গৃহস্থগণের কর্ত্তব্য-বিচারে মহাপ্রভু এই আজ্ঞা করিয়াছিলেন,—

"প্রভু কহে,—বৈষ্ণব-সেবা, নাম-সঙ্কীর্ত্তন।"

এই আজ্ঞা শ্রবণ করিয়া আমরা বিচার করিয়া দেখিতেছি যে, বৈষ্ণব-সেবা গৃহস্থের পক্ষে প্রধান ধর্ম্ম। অতএব বৈষ্ণব-সেবা কিরূপে হয়, তাহা বিচার করা আবশ্যক। আজকাল প্রথা এই যে, যখন যাঁহার বৈষ্ণব-সেবা করিতে ইচ্ছা হয়, তিনি কোন একটী প্রভু-সন্তানকে আনাইয়া তাঁহার পূজারী টহলিয়া-দ্বারা অনেক অন্ন-ব্যঞ্জন, পিঠাপানা প্রস্তুত করাইয়া বৈষ্ণব বলিয়া কতকগুলিকে আমন্ত্রণ করত ভোজন করাইয়া থাকেন। এরূপ কার্য্যকে আমরা বৈষ্ণব-সেবা বলিতে পারি না। নিমন্ত্রণ করিয়া একদল বৈষ্ণব আনা কেবল আত্ম-মর্য্যাদা মাত্র। যে বৈষ্ণবের সেবা করিতে হইবে, তিনি কি-প্রকার বৈষ্ণব, তাহা কুলীনগ্রামী ভক্তের প্রশ্নের উত্তরে প্রভু স্বয়ং বলিয়াছেন। যথা—

প্রভু কহে,—যার মুখে শুনি একবার।
কৃষ্ণনাম, সেই পূজ্য—শ্রেষ্ঠ সবাকার ॥
কৃষ্ণনাম নিরন্তর যাহার বদনে।
সেই সে বৈষ্ণব, ভজ তাঁহার চরণে ॥
যাঁহার দর্শনে মুখে আইসে কৃষ্ণনাম।
তাঁহারে জানিহ তুমি বৈষ্ণব-প্রধান ॥
ক্রম করি' কহে প্রভু বৈষ্ণব-লক্ষণ।
বৈষ্ণব, বৈষ্ণবতর, আর বৈষ্ণবতম ॥

একটী কৃষ্ণনাম লইলে বৈষ্ণব-পদবী প্রাপ্ত হয়। সেই নাম কিরূপ, তাহাও চরিতামৃতে লিখিয়াছেন,—

এক নামাভাসে তোমার পাপ-দোষ যাবে।
আর নাম লইতে কৃষ্ণ চরণ পাইবে॥

এইস্থলে বুঝিতে হইবে, যতদিন নামাপরাধ আছে, ততদিন নাম হয় না; কেবল নামাভাস হয়। নামাভাসের ফলে পাপসকল ক্ষয় হয়। পাপ ক্ষয় হইলে চিত্ত নির্ম্মল হয়। চিত্ত নির্ম্মল হইলে নাম-অপরাধ অবসর পায় না। নামাপরাধ অবসর না পাইলে নিরপরাধ নাম হয়। নিরপরাধে কদাচিৎ নাম হইলে তিনি বৈষ্ণব; সেইরূপ নিরন্তর নাম হইলে বৈষ্ণবতর হয়; হ্লাদিনী-শক্তি উদয় হইলে বৈষ্ণবতম হয়।

এইরূপ বৈষ্ণব লইয়া গৃহস্থগণ বৈষ্ণব-সেবা করিবেন। এরূপ বৈষ্ণব গৃহস্থ বা বৈরাগী হইতে পারেন। বৈষ্ণব-সেবায় আশ্রম-সম্মানের প্রয়োজন নাই। ভক্তির তারতম্যে বৈষ্ণবের তারতম্য। বর্ত্তমান প্রথা নিতান্ত অনিষ্টকর। একজন ছড়িদার গিয়া একশত বৈষ্ণব নিমন্ত্রণ করিয়া আসিল। নিমন্ত্রণ পাইয়া বৈষ্ণবগুলি অপরাপর কার্য্য রহিত করিয়া তিলকাদিদ্বারা সজ্জীভূত হইলেন। 'অদ্য ভরপেট লুচি, মালপোয়া পাইব এবং তাহার সঙ্গে সঙ্গে কিছু কিছু দক্ষিণা মিলিবে'—এই ধনাশায় ভক্তি প্রকাশ করিতে লাগিলেন। শ্রীরূপ গোস্বামী শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধু-গ্রন্থে—"ধন-শিষ্যাদিভির্দ্বারৈর্যা ভক্তিরুপপদ্যতে" ইত্যাদি বাক্যদ্বারা এইসকল কার্য্যকে ভক্তি বলিয়া স্বীকার করেন নাই। এইসকল কার্য্য যদি ভক্তি না হইল, (তবে) অনুষ্ঠাতাদিগকে বৈষ্ণব বলিয়া স্বীকার করা যাইবে না। জীবমাত্রকে যদি বৈষ্ণব বলা যায়, তাহা হইলে তাঁহাদিগকে সেবা করিলে জীব-সেবা হইতে পারে; (কিন্তু তাহাকে) মহাপ্রভুর নির্দ্দিষ্ট নাম-পরায়ণ বৈষ্ণব-সেবা বলা যায় না।

আজকাল ভেকধারী বৈষ্ণবদিগের 'আখড়া' বলিয়া একটী ব্যাপার দেখা যায়। আখড়ায় একটী দেবসেবা থাকে। অভ্যাগত বৈষ্ণবদিগকে দেবতা-প্রসাদ দিয়া তর্পণ করিয়া থাকেন। এ ব্যাপারটী মন্দ নহে, কিন্তু সেই আখড়াধারী বৈষ্ণবদিগকে গৃহস্থগণ নিমন্ত্রণ করিয়া ভোজন ও ভোজন-দক্ষিণা দেওয়ার যে প্রথা হইয়া উঠিতেছে, তাহা অবৈষ্ণব-ব্যবহার। বৈষ্ণব অতিশয় উপাদেয়—বৈষ্ণব জগতের বন্ধু। বৈষ্ণব গৃহে আসিলে তাঁহার সেবা করা গৃহস্থদিগের কর্ত্তব্য। বৈষ্ণবের ভোজন, শয়ন ও গমনাগমনের উপকার করাই বৈষ্ণব-সেবা। অভ্যাগত বৈষ্ণব

আসিলে তাঁহার প্রতি যত্ন করা নিতান্ত উচিত। কিন্তু বৈষ্ণবকে ভোজন করাইয়া তাঁহার দক্ষিণা দেওয়া নিতান্ত কর্ম্মকাণ্ডের মধ্যে পরিগণিত। বৈষ্ণবের দক্ষিণা নাই। বৈষ্ণবের দক্ষিণা-প্রথা—ব্রাহ্মণ-ভোজনের দক্ষিণা-প্রথা হইতে সৃষ্টি হইয়াছে। এই প্রথা পরিত্যাগ করা নিতান্ত আবশ্যক।

হে ভক্তবৃন্দ! শুদ্ধনাম-পরায়ণ বৈষ্ণবকে সর্ব্বপ্রকার তর্পণ করুন। কিন্তু বৈষ্ণবের ভোজন-দক্ষিণা দিয়া বৈষ্ণব-সেবাকে কর্ম্মকাণ্ডের অধম করিবেন না। নিমন্ত্রণ করিয়া অনেকগুলি বৈরাগী-বৈষ্ণবকে ভোজন করান প্রভুর মতে নহে। যথা—

বহুত সন্ন্যাসী যদি আইসে এক ঠাঞি।
সম্মান করিতে নারি, অপরাধ পাই॥

অনিমন্ত্রিত বৈরাগী-বৈষ্ণবের নাম অভ্যাগত। ঘটনাক্রমে সেরূপ বৈষ্ণব দুই-একটী গৃহে আসিলে, তাঁহাদের সেবা করা উচিত। ইহাতেই গৃহস্থের বৈষ্ণব-সেবা হয়। অধিক বৈরাগীকে একত্র করিলে উপযুক্ত সম্মান হয় না, তাহাতে অপরাধ হয়। নিমন্ত্রণ করিবামাত্রই বৈষ্ণবের অভ্যাগত-ধর্ম্ম থাকে না। তাহাতে সন্ন্যাসী-ভিক্ষা হয় বটে, বৈষ্ণব-সেবা হয় না। যত্ন করিয়া কোন বৈষ্ণবকে গৃহে আনিয়া সেবা করিলে কোন অপরাধ হয় না। কিন্তু আড়ম্বরপুর্ব্বক অনেক বৈরাগী-বৈষ্ণবকে নিমন্ত্রণ করিয়া আনিলে অপরাধের অবসর হয়। গৃহস্থ বৈষ্ণবগণ এ বিষয়ে বিশেষ বিচার করিয়া দেখিবেন। বৈষ্ণব-সেবাকে নিত্যধর্ম্ম বলিয়া গণ্য করিবেন। কিন্তু প্রতিষ্ঠার আশায় নিমন্ত্রিত বৈষ্ণবকে সেবা করিয়া দক্ষিণাদি প্রদান করত ভক্তিবিরুদ্ধ কার্য্য করিবেন না। সর্ব্বদা স্মরণ রাখিবেন যে, এ কালটী কলিকাল। যিনি শুদ্ধভক্তির অনুশীলনে প্রবৃত্ত হন, কলি তাঁহার তৎকার্য্যে বাধা দিবার জন্য অনেক কু-পন্থা সৃষ্টি করে। মহাপ্রভুর চরিত্র ও উপদেশে যাহা করিবেন, তাহাতে কলির অধিকার নাই।

—জগদ্‌গুরু শ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুর

পরলোক

আমাদের ইন্দ্রিয়জ-জ্ঞান হইতে আমরা ইহলোকের ধারণা লাভ করি। এই ইন্দ্রিয়জ-জ্ঞানকে সম্বল করিয়া পরলোকের ধারণা কতদূর সম্ভব, তাহাও দেখা আবশ্যক। ঐহিক ইন্দ্রিয়গুলিদ্বারা যে-সকল ঐহিক ধারণা সংগ্রহ করিতে ব্যস্ত, উহার সকলগুলিই আমাদের শরীর পতনে এইখানেই রহিয়া গেল, আর যে জিনিষটা স্থূল শরীর হইতে বিচ্যুত হইল, তাহার কোন সন্ধানই আমাদের ইন্দ্রিয়সমূহ করিতে সমর্থ হইল না। আমাদের ইন্দ্রিয়-জ্ঞান ও তাহার পরিণতি অনুমান—সম্বল করিয়া পরলোকে যাইবার জন্য চেষ্টা হইতে পারে সত্য, কিন্তু তাদৃশ অনুমান সেখানে কতদূর কার্য্যে লাগিবে, সে বিষয়ে নিঃসন্দিগ্ধ প্রমাণ পাওয়া যায় না। লৌকিক প্রমাণ, প্রত্যক্ষ ও তদনুবর্ত্তী অনুমান ইহজীবনেই অসত্য নিরাকরণ করিয়া সত্য ধারণায় উপনীত করায়। যেখানে স্থূল ইন্দ্রিয়গুলি চলচ্ছক্তিরহিত হইল, তথায় ইন্দ্রিয়-পরিচালক মন বাহ্য-করণের অভাবে অন্তঃকরণসমূহকে চালনা করিতে পারে মনে করিয়া যদি আমরা স্থূল উপাধির হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাই, তাহা হইলে সূক্ষ্ম উপাধিতে অন্তঃকরণ লইয়া বিচরণ করি। ইহাও পরলোকের একটী স্তর বলিয়া গৃহীত হইতে পারে।

ইহলোকে পূর্ব্বে বাসনা, পরবর্ত্তিকালে স্থূল জগতের সান্নিধ্যে ক্রিয়া-কলাপ। যেখানে স্থূলের সংস্পর্শ হইল না, তথায় ঘনীভূত করাইয়া, স্থূল-বিষয়ে সংলিপ্ত করে। ইহলোকে স্থূল-সূক্ষ্ম-মিশ্রিত ভাব যে সময়ে স্থূলের সহিত সূক্ষ্ম বিচ্ছিন্ন হয়, তখন দুইটী পৃথক্ বস্তু বলিয়া আমরা বুঝতে পারি। কিন্তু সেই সূক্ষ্ম-প্রতীতি স্থূলের সংমিশ্রণে জাত, সে কারণ সূক্ষ্মও স্থূলাধারে প্রত্যাবর্ত্তিত হইবে,—জন্মান্তরবাদী শাক্যসিংহ, জৈমিনী প্রভৃতি মনীষিগণ এরূপ স্বীকার করেন। স্থূলোপাধির অভাবে সূক্ষ্মোপাধি স্থূল ও সূক্ষ্ম উভয় জগৎ হইতে বিরামলাভ না করিলে ঐহিক অশান্তি নিরাকৃত হয় না। আবার সূক্ষ্মোপাধির উন্নতাংশ স্বর্গাদিকে অনেক বিচারক সম্প্রদায় আকাশ-পুষ্প অর্থাৎ মিথ্যা বলিয়া মনে করেন। মৃত গাভী কখনও ঘাস ভক্ষণ করে না, পিতৃ-উদ্দেশ্যে প্রদত্ত শ্রাদ্ধপিণ্ড ও তর্পণ-জলাদি কিরূপভাবে প্রেতাদি-লোকপ্রাপ্ত পূর্ব্বপুরুষগণ পাইবেন, এ বিষয়েও প্রত্যক্ষবাদিগণের মধ্যে নানা মতভেদ উপস্থিত হয়। পাপপুণ্য-মিশ্র অবস্থায় এই স্থূল-সূক্ষ্ম-উপাধিতে এই জগতে অবস্থান, কেবল পুণ্যপ্রভাবে

স্বর্গাদি-গতি, কেবল পাপ-প্রভাবে নরকাদিই আমাদের গম্যস্থান হয়। স্বর্গ, নিরয় ও কর্ম্মভূমি—এই ত্রিভুবনই অক্ষজ-জ্ঞান ও অনুমানের প্রাপ্য ভূমিকা। অন্য ভাষায় বলিতে গেলে, এই ত্রিভুবনই অথবা সপ্তব্যাহৃতি ও সপ্ত অবর লোকে চতুর্দ্দশ ইন্দ্রাধিষ্ঠিত রাজ্যে জীবের ইন্দ্রিয়-তর্পণ ও ইন্দ্রিয়-তৎপরতাই লক্ষিত হয়।

ইন্দ্রিয়াতীত রাজ্যে অতিন্দ্রিয় পুরুষগণ বাস করেন। সেখানে জীবের ইন্দ্রিয়জ বাসনা নাই। নশ্বর ইন্দ্রিয় তথায় গমন করিতে অসমর্থ। তাদৃশ পরলোক, বিচারকের ভাষায়, পরোক্ষবাদ-লক্ষিত চতুর্দ্দশভুবনাতীত গুণত্রয়-সাম্য-সলিলা বিরজা নদীর অপরপারে স্থিত নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মলোক। কাহারও কাহারও বিবেচনায় এই নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মধামই মুক্তপুরুষগণের লভ্য ভূমিকা। এই ইন্দ্রিয়জ-জ্ঞান স্তব্ধ হওয়ায় ভোগময় বস্তুবিশেষকে পাওয়া যায় না। যাঁহাদের বিচারে ইহাই পরলোক, তাঁহারা ইহ জগতে নির্ভেদ-ব্রহ্মানুসন্ধিৎসু বলিয়া খ্যাত। এইরূপ পরলোক লাভ করাইবার জন্য নাস্তিক, প্রকৃতিবাদী বা মায়াবাদী ব্যস্ত। আর প্রচ্ছন্ন মায়াবাদী, আত্মার নিত্যধর্ম্ম ভক্তি—এই বেদ-প্রতিপাদ্য অভিধেয় বিনষ্ট করিয়া নির্ব্বিশেষ-ধামকেই পরলোক বলিতে পারেন; কিন্তু তাহাও এই পার্থিব জ্ঞানের অতন্নিরসন মাত্র। উহা কখনই 'নিত্যধাম' শব্দবাচ্য হইতে পারে না। যেখানে অনিত্যের উপাধি প্রবল, তাদৃশ অজ্ঞানদৃপ্ত জ্ঞানী যে কাল্পনিক মুক্তধামের কল্পনা করেন, তাহা তাঁহার অধিকৃত বিষয় নহে। সুতরাং অন্ধকারে ঐরূপভাবে হাতড়াইতে গেলে তাহা পরলোক নাও হইতে পারে।

পরলোকে ইহলোক অপেক্ষা এমন একটী স্বতন্ত্র ধর্ম্ম বিদ্যমান—যদ্দ্বারা আমরা ইহলোকের সহিত পরলোকের পার্থক্য উপলব্ধি করিতে পারি। সেই পরলোক-সম্বন্ধীয় আলোচনার আভাস দিবার উদ্দেশে 'শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা' সাময়িক পত্রখানি নানাপ্রকারে সংসারাভিনিবিষ্ট জীবকুলকে বিভিন্ন ভাষায়, বিভিন্নভাবে অনুপ্রাণিত করিবার জন্য বর্ষকাল চেষ্টা করিয়াছেন। আগামী বর্ষেও সেই চেষ্টা আরও সুষ্ঠুভাবে করিবার জন্যই শ্রীগৌরাঙ্গের ঐকান্তিক ভক্তগণ চেষ্টার ত্রুটী করিবেন না। পারলৌকিক জ্ঞানকেই অপর ভাষায় 'পরমার্থ' বলে; আর ঐহিক জ্ঞানকেই পারমার্থিকের ভাষায় 'অনর্থ' বলে।

ঐহিক ইন্দ্রিয়জ-জ্ঞান ইহলোকে জীবকে উদ্দামভাবে নৃত্য করায়। আবার, উদ্দাম নৃত্যের বিশ্রামস্থলী বলিয়া নির্ব্বিশেষ ভাবকেই চরম প্রাপ্য বলিয়া নিরূপণ করে। যাঁহারা পরমার্থে অভিজ্ঞ, তাঁহারা জীবের মুক্ত অবস্থাকে

ভগবানের তটস্থা শক্তি বলিয়া বদ্ধজীবকুলকে বুঝাইয়া থাকেন। ভগবানের পরমাত্ম-ভাব শুদ্ধজীবাত্মার গ্রহণীয় বিষয়-জ্ঞানে বৈদান্তিক অপরোক্ষ-বাদের অবতারণা করেন। ইহাই জীবাত্মার অধোক্ষজ-সেবা। 'শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা' সাময়িক পত্রের কেবল পরমার্থের কথা আলোচনা করিতে গেলে অক্ষজ জ্ঞান-বাদী সন্তুষ্ট হন না বলিয়াই অক্ষজজ্ঞানি-সজ্জায় পারমার্থিকের ইহাই প্রয়াস।

—জগদ্‌গুরু শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর

ব্রহ্ম—খণ্ডবস্তু

জাগতিক বিচারে দেখা যায়, কার্য্যের তারতম্যহেতু কারণের বৈষম্য হয় এবং কারণের তারতম্যহেতু কার্য্যেরও ভেদ লক্ষিত হয়। এই বিচারের সূক্ষ্ম তাৎপর্য্য এই যে, বৃত্তির তারতম্যক্রমে বস্তুর তারতম্য হইয়া থাকে। সুতরাং উপাসকের উপাসনার বৈষম্য হেতু উপাস্য-তত্ত্বের বৈষম্য হইবে। জাগতিক দৃষ্টান্তস্থলে আমরা দেখিতে পাই—কেহ যদি চল্লিশ বৎসর অতিক্রম করে, তাহা হইলে তাহার চক্ষের দৃষ্টিশক্তি কমিয়া যায় এবং সে তাহার খর্ব্বদৃষ্টিতে নিকটস্থ পুঁথির অক্ষরগুলির স্বরূপ দেখিতে পায় না। একারণ তাহার কাছে অক্ষরগুলি নিরাকার, নির্ব্বিশেষ ও আবছায়া বলিয়া জ্যোতিঃস্বরূপ মনে হয়। কিন্তু পূর্ণ দৃষ্টিশক্তিযুক্ত চক্ষুষ্মান্ ব্যক্তি অক্ষরগুলিকে কখনই নিরাকার ও নির্ব্বিশেষ দর্শন করেন না।

আমার উল্লিখিত উদাহরণ হইতে আপনারা স্পষ্টই বুঝিতে পারিতেছেন যে, অক্ষর ব্রহ্মবস্তুর জ্ঞান লাভ করিতে গিয়া শাস্ত্রীয় বিচারযুক্তির রূপ দর্শনের স্বল্পতা হেতুই অক্ষরবস্তু নিরাকার, নির্ব্বিশেষ ও জ্যোতিঃস্বরূপ বলিয়া কাহারও কাহারও নিকট প্রতিভাত হন। কিন্তু তাই বলিয়া চক্ষুষ্মান্ ব্যক্তির পক্ষে অর্থাৎ যাঁহারা শাস্ত্রযুক্তিতে সুনিপুণ ও সুদর্শন-সেবী, তাঁহাদের পক্ষেও কি কুদর্শনকারীর ন্যায় অক্ষর ব্রহ্মবস্তু নিরাকার, নির্ব্বিশেষ, জ্যোতির্ম্ময় হইবে, না বাস্তবিক পক্ষে তত্ত্ববস্তুর পূর্ণ বৈশিষ্ট্যযুক্ত স্বরূপ উপলব্ধ হইবে—ইহা সুধী পাঠক-বর্গ বিচার করিয়া দেখিবেন। পর্ব্বতের উপরে উঠিয়া তাহার পাদদেশস্থ ক্ষুদ্র-বৃহৎ বৃক্ষলতাদি, উচ্চাবচ ভূখণ্ডসমূহ দৃষ্ট না হইলে কি উঁচু-নীচু, ছোট-বড় বস্তু সকলের সত্তাহীনতাই স্বীকার করিতে হইবে? বা তাহাকে সমতল নির্ব্বিশেষ বলিয়াই মানিয়া লইতে হইবে? উচ্চস্থান হইতে নিম্নস্থ দৃশ্যবস্তুর দূরে অবস্থিতি হেতু তাহা আমাদের দর্শনেন্দ্রিয়ের গ্রাহ্য হইতেছে না। কিন্তু সুষ্ঠুদর্শক প্রতি

বস্তুরই ভেদ-বৈশিষ্ট্যাদি সুষ্ঠুভাবে দর্শন করিয়া তৎসম্বন্ধে বাস্তবসত্য জ্ঞান লাভ করিয়া থাকেন। **ইহারই নাম সুদর্শন** বা **বেদান্ত**।

যে বস্তুর যাহা স্বরূপ, তাহাকে তদ্রূপ দেখাই সত্য-দর্শন এবং যে বস্তু যাহা তাহাকে তদ্রূপ না দেখাই ভ্রম-দর্শন। দর্শনের ভ্রান্তিহেতু বস্তু-বিচারেও আমাদের ভ্রান্তি উপস্থিত হয়। প্রবন্ধের প্রারম্ভেই উক্ত হইয়াছে যে, কার্য্যে বৈষম্য থাকিলে কারণেও বৈষম্য আছে প্রমাণিত হয়। এস্থলে স্মরণ রাখিতে হইবে যে, কারণবৈষম্য বলিলে বস্তুবৈষম্য বা বস্তুর নানাত্ব প্রমাণিত হয় না, কিন্তু বস্তুর শক্তির নানাত্ব স্বীকৃত হয়। বস্তুতে অর্থাৎ কারণে যে শক্তি আছে সেই শক্তিরই বিবিধত্ব, নানাত্ব, বিষমত্ব প্রভৃতি স্বীকৃত হইয়া থাকে। তাহাতে বস্তুর কোনপ্রকার বিকার হয় না।

এখন বিচার্য্য এই যে, আমরা ইহজগতে এই যে ভেদ ও বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করিতেছি, তাহার কারণ কি? যাহা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য ও প্রত্যক্ষীভূত বৈশিষ্ট্য তাহাকে কার্য্য বলিয়া স্বীকার করিলে তাহার কারণেও বৈশিষ্ট্যের অধিষ্ঠান যুক্তিবিরুদ্ধ নহে। কার্য্যরূপ জগতে ভেদ থাকিলে কারণেও তাহার ভেদ থাকা সম্ভব। সুতরাং বস্তু কোন প্রকারেই নির্ভেদ, নির্ব্বিশেষ ও নিরাকার প্রতিপন্ন হইতে পারে না। যে বস্তুতে যাহার সত্তা (Potency) নাই, তদ্বস্তু হইতে তাহার উদ্ভব হইতে পারে না। যেমন —জল হইতে ঘৃতের উৎপত্তি ও বালুকা হইতে তৈলের উৎপত্তি কখনই সম্ভব হয় না। তদ্রূপ কারণস্বরূপ ব্রহ্ম যদি নির্ব্বিশেষ হন, তাহা হইলে কার্য্যস্বরূপ জগৎ কোন প্রকারেই সবিশেষ হইতে পারে না। জাগতিক বস্তুতে যদি শক্তি থাকে, তাহা হইলে ব্রহ্মবস্তুতেও শক্তি আছে, ইহা সর্ব্বতোভাবে মানিয়া লইতে হইবে। আচার্য্য শ্রীপাদ শঙ্করও 'অসৎকারণবাদ' নিরাকরণকল্পে উপনিষদের মন্ত্রাদি উদ্ধার করিয়া বেদান্তের (২।১।১৬) সূত্রের ভাষ্যে আম্নায় উল্লিখিত যুক্তির সর্ব্বৈব অনুমোদন করিয়াছেন। পাঠকগণের অবগতির জন্য নিম্নে তাহা উদ্ধার করিলাম,—

"সদেব সৌম্যেদমগ্র আসীৎ', 'আত্মা বা ইদমেক এবাগ্র আসীৎ', ইত্যাদাবিদংশব্দগৃহীতস্য কার্য্যস্য কারণেন সামানাধিকরণ্যাৎ। যচ্চ যদাত্মনা যত্র ন বর্ত্ততে, ন তৎ তত উৎপদ্যতে, যথা সিকতাভ্যস্তৈলম্।" উক্ত ভাষ্যের (কালিবর বেদান্ত-বাগীশ মহাশয়ের) অনুবাদ যথা,—"হে সৌম্য! এসকল অগ্রে সৎ-ই ছিল। অগ্রে অর্থাৎ সৃষ্টির পূর্ব্বে এসকল এক আত্মা ছিল। ইত্যাদি শ্রুতিতে কারণের সহিত ইদম্-শব্দ-বাচ্য জগতের সামানাধিকরণ্য কথিত হওয়াতেও কার্য্য-কারণ ভিন্ন নহে। যাহা যাহাতে তদ্রূপে থাকে না, তাহা হইতে তাহা জন্মেও না। যেমন বালুকা হইতে তৈল জন্মে না।"

সুতরাং শঙ্করের উক্ত যুক্তি অনুসারেও দৃঢ়ভাবে বলা যাইতে পারে, জগৎ-রূপ কার্য্যের ভেদ-বৈশিষ্ট্যাদি তাহাদের কারণ-স্বরূপ ব্রহ্মেতে নিশ্চিতরূপে বর্ত্তমান। কেহ কেহ বলিতে পারেন, ইহ জগতেও আকাশের নিরাকার নির্ব্বিশেষত্ব অনুভূত হইয়া থাকে; সুতরাং কার্য্যস্বরূপ জগতে এবম্প্রকার নির্ব্বিশেষত্বাদি অনুভূত হইলে কারণস্বরূপ বস্তুর নিরাকারত্ব, নির্ব্বিশেষত্ব স্বীকার করিয়া তাহার ব্রহ্মতা সিদ্ধ হইবে না কেন? এইরূপ স্থলে আমার বক্তব্য এই যে, আমার যুক্তিসমূহ পূর্ব্বপক্ষকারী স্বীকার করিয়া লইলে আমি তাহার সিদ্ধান্তকে মানিয়া লইতে পারি। কিন্তু চিন্তা করিয়া দেখিবার বিষয় এই যে, আকাশ নিরাকার হইলেও পাঞ্চভৌতিক জগতের উহা আংশিক উপাদান মাত্র। সুতরাং বস্তুর নির্ব্বিশেষাদি কল্পনা পূর্ব্বপক্ষীর পক্ষে আংশিক জ্ঞান বলিয়া প্রতিপন্ন হইতেছে। কাষ্ঠেতে অগ্নিসত্তা অপ্রকাশিত থাকে বলিয়া তাহাকে তত্ত্বহীন বলিয়া প্রকাশ করিলে কাষ্ঠের অপূর্ণতাই প্রকাশিত হইল। সুতরাং বস্তুকে নির্ব্বিশেষ মাত্র প্রতিপন্ন করিয়া তাহাকে ব্রহ্ম বলিলে বস্তুর অখণ্ডত্ব না হইয়া খণ্ডত্বই স্থাপিত হইতেছে।

—জগদ্গুরু শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী

শ্রীগুরু-চরণে নিবেদন

ওহে, দয়াময় গুরুদেব আমার।
নিবেদন করি আমি চরণে তোমার॥
তোমার চরণ হউক আমার বসতিস্থল।
তোমার সেবা হউক আমার সুখের সম্বল॥
সর্ব্বশাস্ত্রে কয়,—হনু শ্রীরামের দাস।
আমার মনে প্রভু এই মাত্র আশ॥
জনমে-মরণে তব সঙ্গমাত্র চাই।
এই ভিক্ষা ছাড়া যেন কিছু নাহি পাই॥

—শ্রীগোপীকান্তদাস ব্রহ্মচারী, বৃন্দাবন

মানব-জীবনের সার্থকতা কোথায় ?

লক্ষ লক্ষ জন্ম-জন্মান্তরের পর এই সুদুর্ল্লভ মনুষ্যজন্ম লাভ হয়। এই সুদুর্ল্লভ জন্ম লাভ করিয়া যাহারা প্রকৃতপক্ষে সদ্‌গুরু আশ্রয় গ্রহণ করেন না এবং শ্রীহরিভজনে মনোনিবেশ করেন না—কেবল সংসারের সুখ-শান্তিতে নিমগ্ন থাকিয়াই মৃত্যু বরণ করেন, তাহারা সকলেই আত্মঘাতী। যেহেতু তাহারা কেহই আত্মতত্ত্ব অবগত হইতে পারিলেন না অর্থাৎ কে আমি ? কোথায় আমাদের প্রকৃত পূর্ব্ব বাসস্থান ? কোথায় এসেছি ? এখানে আমাদের কর্ত্তব্য কি ? এই সব প্রশ্নের প্রকৃত উত্তর অবগত হইতে পারিলেন না এবং অনিচ্ছাসত্বেও মৃত্যুমুখে পতিত হইলেন। এই সম্বন্ধে ভাগবতে শ্রীকৃষ্ণ উদ্ধবকে লক্ষ্য করিয়া জগজ্জীবগণকে জানাইয়াছেন,—

নৃদেহমাদ্যং সুলভং সুদুর্ল্লভং প্লবং সুকল্পং গুরুকর্ণধারম্।
ময়ানুকূলেন নভস্বতেরিতং পুমান্ ভবাব্ধিং ন তরেৎ স আত্মহা॥
(ভাঃ ১১।২০।১৭)

অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ এবং সুদুর্ল্লভ মনুষ্যজন্ম লাভ করিয়া যে ব্যক্তি সদ্‌গুরু আশ্রয় করেন না এবং পটুতর নৌকাসদৃশ মানবদেহের কর্ণধারস্বরূপে শ্রীগুরুদেবকে আশ্রয় করিয়া এই সংসার-সমুদ্র হইতে উত্তীর্ণ হইতে পারিলেন না, সেই ব্যক্তি আত্মঘাতী ও পাপী।

চৌদ্দভুবনে অর্থাৎ মায়াদেবীর কারাগারে নয়ন-মনোমুগ্ধকর মরীচিকার বিচিত্রতা দর্শনে নিত্যনবনবায়মান ভোগস্পৃহা বদ্ধজীবের হৃদয়-অন্তঃপুরে পূর্ণভাবে বিরাজমান। ঐ প্রকার ভোগস্পৃহা চরিতার্থ করাকেই বদ্ধজীব মনুষ্য-জীবনের সার্থকতা বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে চাহে। এইভাবে ইন্দ্রিয়াধীন মানবসকল একাদশ ইন্দ্রিয়ের দাসত্ব করিতে থাকে। যখনই এইসকল ইন্দ্রিয়-সুখের ব্যাঘাত সৃষ্টি হয়, তখনই বদ্ধজীব ধৈর্য্যচ্যুত হইয়া অসুখী হইয়া পড়ে। যেহেতু ইন্দ্রিয়সকল অনিত্য, তদোত্থ সুখও তদ্রূপ অনিত্য বলিয়া জানিতে হইবে। তথাপি বদ্ধজীব এই অনিত্য ইন্দ্রিয়-সুখকেই প্রকৃত সুখ বলিয়া মনে করে কেন ? এই সম্বন্ধে একটী উদাহরণ দেওয়া যাইতে পারে,—একজন জেলখানার কয়েদী অনেক বৎসর ধরিয়া জেলখানায় আবদ্ধ থাকার পর তাহার জেলখানার প্রতি আসক্তি জন্মে। তখন জেলখানাকেই সে নিজের বাড়ী বলিয়া মনে করে। সেইপ্রকার বদ্ধজীব লক্ষ লক্ষ জন্ম ধরিয়া সংসারে পরিভ্রমণ

করিতে করিতে মায়াময় সংসার কারাগারকেই নিজের ঘর-বাড়ী বলিয়া মনে করিতে থাকে। আপাতরমণীয় ইন্দ্রিয়-সুখকেই জীবনের শ্রেষ্ঠ সুখ মনে করিয়া বদ্ধজীবসকলের মধ্যে কামুকগণ কামিনীর পিছনে, বিষয়ী লোক অন্য বিষয়ী লোকের পিছনে, মাতাল মদ্যপায়ীর পিছনে, প্রতিষ্ঠাকামী জড়ীয় মান-সম্মানের পিছনে ধাবিত হইতে থাকে। চার্ব্বাকের মত—"ঋণং কৃত্বা ঘৃতং পিবেৎ, যাবজ্জীবেৎ সুখং জীবেৎ। ভস্মীভূতস্য দেহস্য পুনরাগমনং কুতঃ?" অর্থাৎ ঋণ করিয়া ঘি খাও এবং সমস্ত জীবন সুখভোগ কর। কারণ দেহ পুড়িয়া ছাই হইলে তাহার আবার পুনরাগমন নাই"—বিচারকে বদ্ধজীব শ্রেষ্ঠ বলিয়া প্রশংসা করে।

বদ্ধজীবের লক্ষণ সম্বন্ধে আবার একটী উদাহরণ দেওয়া যাইতে পারে। যথা,—মাংসলোভী কুক্কুর মাংস খাইবার আশায় একখণ্ড শুষ্ক হাড়কে লইয়া নির্জ্জনে বসিয়া পড়ে। সেই শুষ্ক হাড়খণ্ডকে মাংস বলিয়া মনে করিয়া সে কামড়াইতে থাকে। ফলস্বরূপে কুক্কুরের নিজের জিহ্বাদি কাটিয়া যাওয়ায় রক্তক্ষরণ হইতে থাকে। ঐ কুকুর নিজের রক্ত নিজে পান করিয়া মাংসলোভের স্পৃহা মিটাইতে থাকে। কিন্তু সে বুঝিতে পারে না যে, হাড়খণ্ড মাংস নয়। এইপ্রকার বদ্ধজীবও অসৎ ও অনিত্য মায়ার চাকচিক্যপূর্ণ জিনিসগুলিকেই নিত্য ও সৎ বলিয়া মনে করিয়া কুকুরের মত ইন্দ্রিয়ের অনিত্যসুখকেই প্রকৃত সুখ বলিয়া মনে করিয়া থাকে। তৃষ্ণার্ত্তব্যক্তি মরুভূমিতে জলের সন্ধানের জন্য ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়ে। শেষে মরুভূমির মরীচিকার পিছনে ছুটিতে থাকে জলপানের আশায়। কিন্তু হায়! বহুক্ষণ পরে সে জলের সন্ধান না পাইয়া প্রাণত্যাগ করে। এই প্রকার মায়াবদ্ধজীবও ত্রিতাপজ্বালায় দগ্ধীভূত মায়াময় সংসারে বিভিন্ন প্রকারে সুখের সন্ধান করিতে করিতে শেষে প্রাণত্যাগ করে। কিন্তু হায়! বাস্তব সুখ কোথায়? ইহা মায়ার খেলা!

বদ্ধজীবের ভবরোগের প্রতিকার কি করিয়া হইতে পারে? এই ভবরোগের চিকিৎসক একমাত্র সাধুবৈদ্য। সাধুর সদুপদেশই এই ভবরোগের একমাত্র মহৌষধ।

> 'সাধুসঙ্গ', 'সাধুসঙ্গ'—সর্ব্বশাস্ত্রে কয়।
> লবমাত্র সাধুসঙ্গে সর্ব্বসিদ্ধি হয়॥ (চৈঃ চৈঃ মঃ ২২।৫৪)

এক মুহূর্ত্তকালও যদি কোন ব্যক্তির সাধুসঙ্গলাভ হয়, তাহা হইলে তাহার সর্ব্বসিদ্ধি অর্থাৎ তাহার জীবনের পরাশান্তি লাভ হইয়া থাকে।—

> সাধুসঙ্গে হরিনাম এইমাত্র চাই।
> সংসার জিনিতে আর কোন বস্তু নাই।

মহৎকৃপা বিনা কোন কর্ম্মে ভক্তি নয়।
কৃষ্ণভক্তি দূরে রহু, সংসার নহে ক্ষয়॥
(চৈঃ চৈঃ মঃ ২২।৫১)

বৈষ্ণব-কবি গাহিয়াছেন,—

"এ ঘোর-সংসারে পড়িয়া মানব, না পায় দুঃখের শেষ।
সাধুসঙ্গ করি' হরি ভজে যদি, তবে অন্ত হয় ক্লেশ॥"

ব্রহ্মাণ্ড ভ্রমিতে কোন ভাগ্যবান্ জীব।
গুরু-কৃষ্ণ-প্রসাদে পায় ভক্তিলতা-বীজ॥ (চৈঃ চৈঃ মঃ ১৯।১৫১)

কিন্তু প্রশ্ন হইতেছে,—সাধুসঙ্গ করিবেন কে? সাধুর দর্শনলাভ হইবার পরও সাধুসঙ্গের স্পৃহা বদ্ধজীবের হয় না। কারণ শাস্ত্র বলেন,—

কোন ভাগ্যে কোন জীবের 'শ্রদ্ধা' যদি হয়।
তবে সেই জীব 'সাধুসঙ্গ' করয়॥ (চৈঃ চৈঃ মঃ ২৩।৯)
সাধুসঙ্গ হৈতে হয় 'শ্রবণ-কীর্ত্তন'।
সাধনভক্ত্যে হয় 'সর্ব্বানর্থনিবর্ত্তন'॥
অনর্থ-নিবৃত্তি হৈলে ভক্তি 'নিষ্ঠা' হয়।
নিষ্ঠা হইতে শ্রবণাদ্যে 'রুচি' উপজয়॥
রুচি-ভক্তি হৈতে হয় 'আসক্তি' প্রচুর।
আসক্তি হৈতে চিত্তে জন্মে কৃষ্ণে প্রীত্যঙ্কুর॥
সেই 'রতি' গাঢ় হৈলে ধরে 'প্রেম'-নাম।
সেই প্রেমা—'প্রয়োজন' সর্ব্বানন্দ-ধাম॥
(চৈঃ চঃ মঃ ২৩।১০-১৩)

শাস্ত্র-প্রমাণ,—

আদৌ শ্রদ্ধা ততঃ সাধুসঙ্গোঽথ ভজনক্রিয়া
ততোঽনর্থ নিবৃত্তি স্যাৎ ততো নিষ্ঠা রুচিস্ততঃ।
অথাসক্তিস্ততো ভাবস্ততঃ প্রেমাভ্যুদঞ্চতি
সাধকানাময়ং প্রেম্নঃ প্রাদুর্ভাবে ভবেৎ ক্রমঃ॥
(ভঃ রঃ সিঃ ৪র্থ প্রেমভক্তিলহরী ১১)

অর্থাৎ প্রথমে শ্রদ্ধা, তাহা হইতে সাধুসঙ্গ, তাহা হইতে ভজনক্রিয়া, তাহা হইতে অনর্থ নিবৃত্তি; পরে নিষ্ঠা, তাহা হইতে রুচি ও আসক্তি—এই পর্য্যন্ত সাধন ভক্তি, তাহা হইতে ক্রমশঃ 'ভাব', অবশেষে 'প্রেম' উদিত হয়। সাধকদিগের প্রেমোদয়ের ইহাই ক্রম।

—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত বিষ্ণু মহারাজ

বাঁশী যদি নাহি বাজে !

যমুনার কূলে কদম্বের মূলে
বাঁশী যদি নাহি বাজে !
কেমনে রহিবে ভকতের জন
গুমরি মরিবে লাজে ॥
বাঁশীর মূর্চ্ছনা প্রবেশি' কর্ণে
করিত হৃদয় আকুল ।
এই বুঝি সেই আসিবে আবার
ডাকিবে শুধুই ব্যাকুল ॥
নয়ন বাহিয়া শত অশ্রুধার
পড়িবে পথের ধুলায় ।
মরা ফুলসম ঝরিয়া পড়িবে
খুঁজিবারে শুধু তায় !!
অকাতরে শুধু ডাকিব তখন
কোথা ওগো গুরুদেব ?
তাঁরে খুঁজিবারে দাও হে শকতি
দাও সে ভকতি দেব ॥
কেমনে হইবে ? আমি যে কেবল
জড়ায়েছি কামজালে ।
সে কাম ছাড়িবে তবে ত' পাইব
পা'ব তাঁরে হৃদিস্থলে ॥
গৌরাঙ্গ বলিয়া কাঁদিব শুধুই
বাঁশী যদি নাহি বাজে ।
শুধুই হারিব তবু না পাইব
তাঁহারে পাওয়া কি সাজে ??

—শ্রীমতী কুন্তু বেরা
অমর্ষি (মেদিনীপুর)

"যেই জন কৃষ্ণ ভজে সে বড় চতুর"

প্রবাদবাক্যে পাওয়া যায়,—"বুদ্ধির্যস্য বলং তস্য নির্ব্বুদ্ধেস্তু কুতো বলম্।" অর্থাৎ বুদ্ধি যাহার বল তাহার, নির্ব্বুদ্ধির বল কোথায়? "To be ignorant is to be weak." কিন্তু যাহারা প্রাকৃত দেহ ও বুদ্ধি সম্বল করিয়া প্রাকৃত নশ্বর বস্তুর সেবায় ব্যস্ত, তাহাদিগকে চতুর বা বুদ্ধিমান্ বলা যায় না। কেননা, তাহারা সমগ্র চাতুর্য্যের একমাত্র চরম ফল যে ভগবৎসেবা তাহা লাভ করিতে পারে না। তাহারা অপ্রাকৃত ভগবদ্ভজনশীল 'ভক্ত' নহেন, তাহারা 'প্রাকৃত সাহজিক'। যাহারা ছলে-বলে-কৌশলে নিজাপেক্ষা অধিক ক্ষমতাসম্পন্ন ব্যক্তিকে ধ্বংস করেন, তাহারাই "বুদ্ধির্যস্য বলং" প্রবাদবাক্যে 'বুদ্ধিমান্' বলিয়া চিহ্নিত। ঈশপ-রচিত "খরগোশ ও সিংহ" গল্পের খরগোশ কৌশল করিয়া সিংহকে নিহত করিয়াছিল বলিয়া প্রাকৃত জনগণের নিকট সেই খরগোশ বুদ্ধিমান্ হিসাবে পূজিত হইয়া থাকে। বস্তুতঃ "কৃষ্ণভজন করিলে জীবের সমস্ত মঙ্গল করায়ত্ত হইবে"—এই বুদ্ধি ব্যতীত আর যেইসকল বুদ্ধিমত্তার কথা জগতে প্রচলিত রহিয়াছে, তাহা প্রাকৃত জগতের মধ্যেই সীমাবদ্ধ, ফলে ক্ষণভঙ্গুর ও অমঙ্গলজনক। আর একটী বিখ্যাত প্রবাদবাক্যের 'বুদ্ধিমান্' যথার্থ 'বুদ্ধিমান্' নহে, বুদ্ধিমানের মুখোশে অত্যন্ত মূর্খ। প্রবাদবাক্যটি এই,—

"মূর্খ লোকে কেনে বই জ্ঞানবানে পড়ে।
ধনবানে কেনে ঘোড়া বুদ্ধিমানে চড়ে॥"

"মূর্খ লোক লোকের নিকট পাণ্ডিত্য দেখাইবার জন্য বই কেনে, দেখায় যে, দেখ আমার এত ভাল ভাল বই, সুতরাং আমি কত বড় পণ্ডিত। কিন্তু সে-সব বই তাহার পড়িবার সামর্থ্য নাই, তাই বিদ্বান্ প্রতিবেশী বন্ধুরা তাহার নিকট বই চাহিয়া লইয়া গিয়া পড়ে। আর ধনবান্ ঐশ্বর্য্য দেখাইবার জন্য ঘোড়া কেনে, কিন্তু চড়িতে জানে না। সেই ঘোড়া অশ্বারোহণে দক্ষ বুদ্ধিমান্ লোকে চড়িয়া থাকে।" প্রকৃতপক্ষে জাগতিক পাণ্ডিত্য, দক্ষতা, ঐশ্বর্য্য প্রভৃতি অর্জ্জন করাই জীবের জীবনের প্রকৃত উদ্দেশ্য নহে, তাহাতে কেবল আত্মেন্দ্রিয়-প্রীতিবাঞ্ছার প্রাবল্য অধিক পরিমাণে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া চরম সর্ব্বনাশের পথ পরিষ্কার হয়। কৃষ্ণভক্তগণ মূর্খ লোকদ্বারা সংগৃহীত বিভিন্ন ধর্ম্মগ্রন্থাদি এবং ধনবান্‌দ্বারা সংরক্ষিত প্রচুর অর্থাদি ভগবৎসেবায় নিয়োগ

করিয়া অত্যন্ত বুদ্ধিমানের কাজ করেন। অর্থ ও ধর্ম্মগ্রন্থের সদ্ব্যবহারের ফলে মূর্খ ও ধনবান্ উভয়েরই কল্যাণ সাধিত হয়। ইহা অত্যন্ত আশ্চর্য্যের বিষয়, মূর্খ ব্যক্তিও আপনাকে সাতিশয় বুদ্ধিমান্ জ্ঞান করিয়া অহঙ্কারী হইয়া থাকে। "মূর্খের অভিমান, আমি বড় বুদ্ধিমান্"।

আত্মঘাতী-ব্যক্তিগণ "গাঁয়ে মানে না আপনি মোড়ল" এর ন্যায় মূর্খতাকে জ্ঞানবত্তা মনে করিয়া কেবলাভক্তি পরিত্যাগপূর্ব্বক অশান্তি লাভ করেন। তাহাদের চিত্ত কাম, লোভ, ঈর্ষা ও মোহাদির দ্বারা ভ্রান্ত হইবার ফলে তাহারা ভগবানের মায়ারচিত জগতে গৃহদারাপুত্রাদিতে বাস্তব বুদ্ধিযুক্ত হইয়া ভ্রান্ত হইয়া থাকে। পার্থিব বিচারে ইন্দ্রিয়তর্পণ, পরহিংসাদ্বারা নিজদেহপোষণ ও আত্মবঞ্চনরূপ শাস্ত্র-নিষিদ্ধ বস্তুর সেবন সেইসকল হরিবিমুখ জনগণের একমাত্র কৃত্য হওয়ায় তাহারা বেদপ্রতিপাদ্য ভগবানের কথা শ্রবণ করেন না। অভক্তগণ মাত্রেই মূঢ়, যেহেতু তাহারা রজস্তমোগুণের দ্বারা অভিভূত হইয়া যথেচ্ছাচারপূর্ব্বক জগতে বিচরণ করেন। ফলস্বরূপে তাহারা ভক্তিরহিত হইয়া ধর্ম্ম, অর্থ ও কামরূপ ভোগের অনুসন্ধান করেন এবং আত্মস্বরূপবোধে বঞ্চিত হইয়া নিজেদের সর্ব্বনাশ সাধন করেন। জড় পাণ্ডিত্য ও ধনগর্ব্বে মত্ত ব্যক্তিগণ জাগতিক অভাবগ্রস্ত লোকের দুর্দ্দশা দেখিয়া যে আনন্দপ্রকাশ করেন, তাহা তাহাদের নির্ব্বুদ্ধিতার পরিচয়কেই বহন করিয়া থাকে। কারণ "ঘুঁটে পুড়ে গোবর হাসে"র ন্যায় তাহাদের আনন্দ ক্ষণস্থায়ী, একদিন না একদিন তাহাদের নিজদিগকেই অভাবগ্রস্ত ব্যক্তির ন্যায় চরম দুর্দ্দশা ভোগ করিতে হইবে।

ইন্দ্রিয়সুখতাৎপর্য্যেই যাহাদের সকল সময় অপহৃত হয়, তাহারা জড়ভোগের কার্য্যকেই প্রধান ধর্ম্ম মনে করিয়া আত্মম্ভরিতাপূর্ব্বক বলিয়া থাকেন,—"যাহারা সুন্দরী স্ত্রী, অগাধ ধনসম্পত্তি, অট্টালিকা প্রভৃতি ভোগের বস্তুসকল জীবনে না পাইল, তাহারা ঠকিয়াছেন; আর যাহারা ঐসকল বস্তু লাভ করিয়াছেন, তাহাদের জীবনই ধন্য।" নাস্তিক চার্ব্বাক্‌ও উক্তবাক্যের সমর্থন করিতে গিয়া বলিয়াছেন,—"অঙ্গনাদ্যালিঙ্গনাদিজন্যং সুখমেব পুরুষার্থঃ অর্থাৎ সুন্দরী স্ত্রীর আলিঙ্গনে আনন্দ সম্ভোগ করা পুরুষার্থের ফল।" নাস্তিক চার্ব্বাক্ ঋণ ও পরলোকের কথা বিশ্বাস করেন না। তাঁহার মতে,—"জগতে কে কি লইয়া আসিয়াছে? সুতরাং ঋণ করিয়া হউক, আর যে কোন প্রকারেই হউক, খাইয়া-পরিয়া জীবন কাটাইতে পারিলেই ত' ফুরাইয়া যাইল। ইহাই ত' প্রকৃত বুদ্ধিমানের কার্য্য।" বাস্তবিকপক্ষে "উষ্ট্রের কণ্টক ভক্ষণের চেষ্টার"

ন্যায় চার্ব্বাক্ ও অন্যান্য ভোগিসম্প্রদায়ের জড়ভোগের প্রচেষ্টা অত্যন্ত ক্লেশপ্রদ ও অকল্যাণকর। তাই জড়ভোগবাঞ্ছা পূরণ করিতে যাইয়া চিরকালের জন্য কৃষ্ণসেবাসুখ হইতে বঞ্চিত হওয়াকে তত্ত্বজ্ঞগণ কখনও বুদ্ধিমানের কার্য্য বলেন না। আর যাঁহারা 'অঋণী' থাকিয়া সারা জীবনটি কাটাইয়া দেওয়াকে 'সুচাতুর্য্য' মনে করেন, তাঁহারা প্রকৃতপ্রস্তাবে অত্যন্ত মূর্খ। কারণ, কৃষ্ণ-ভজনকারী ব্যতীত জগতের অন্যান্য সকলেই কোন না কোনপ্রকারে ঋণগ্রস্ত এবং সেই ঋণ পরিশোধ করিবার জন্য তাঁহাদিগকে ভবচক্রে ঘুরপাক খাইতে হইবে। আবার এক একজন বড় বড় বৈজ্ঞানিক, দার্শনিক, সাহিত্যিক, রাজনীতিবিদ্ নিজদিগকে সুচতুর মনে করেন এবং জগতের লোকের নিকটেও খুব বুদ্ধিমান্ বলিয়া পরিচিতও হন। কিন্তু কালের করালচক্রে এক মুহূর্ত্তের মধ্যেই তাঁহাদের অহঙ্কারের সৌধ চূর্ণ-বিচূর্ণ হইয়া যাইবে, তাঁহারা তাহা একবারের জন্যও চিন্তা করিয়া দেখেন না।

কর্ম্মী-জ্ঞানীরা 'সুচতুর' সংজ্ঞায় সংজ্ঞিত হইতে পারে না

নিত্যবস্তুর উদ্দেশ্যে সাধিত অনুষ্ঠানে সর্ব্বপ্রকার মঙ্গল হইয়া থাকে। নিজ নশ্বর কাম-পরিতৃপ্তির জন্য যে-সকল চেষ্টা, উহা বিনাশশীল। লৌকিক ও বৈদিক কর্ম্মসমূহ হরিসেবার অনুকূল না হইলে উহা জীবগণের বন্ধনের কারণ হয় এবং তাহাদিগকে 'কর্ম্মবীর' উপাধি দান করিয়াও 'অত্যন্ত নির্ব্বোধ' উপাধির হস্ত হইতে রক্ষা করিতে পারে না। নির্ব্বোধগণ রাজস ও তামস অহঙ্কারের বশীভূত হইয়া আপনাদিগকে কর্ম্মপটু পণ্ডিতাভিমানী সর্ব্বজ্ঞ মনে করিলেও প্রকৃতপক্ষে তাহাদের ন্যায় ভবিষ্যদ্দর্শনরহিত নির্ব্বোধ প্রাণী জগতে বিরল। তাহারা স্বর্গসুখের মধুর বাক্যে উৎসাহিত হইয়া অক্ষয় স্বর্গসুখ-লাভের আশায় কৃষ্ণভক্তির প্রতিকূল কর্ম্মসমূহ সম্পাদনপূর্ব্বক বৃথাই অমূল্য জীবন নষ্ট করিয়া ফেলে।

ভগবদ্বিমুখতা-ক্রমেই জীবের নশ্বর ভোগপ্রবৃত্তি। জীব বৈকুণ্ঠবস্তুর সেবা-বিমুখ হইয়া কুণ্ঠ ধর্ম্মের আশ্রয়ে স্ত্রী, পুত্র, বন্ধু, গৃহ, দেশ প্রভৃতি নশ্বর বিনাশ-যোগ্য ভোগ্যব্যাপারসমূহ আপাততঃ পরিত্যাগ করিলেও ভগবৎসেবা না করিবার ফলে মায়াবাদাশ্রয়ে অনিচ্ছাসত্ত্বেও অন্ধকারে প্রবিষ্ট হয়। মোটকথা, কর্ম্মী ও জ্ঞানীর ভোগবাঞ্ছা ও ভোগত্যাগের উভয় প্রচেষ্টাই 'কলার ভেলায় সমুদ্র পার হইবার' ন্যায় নিরর্থক ও হাস্যাস্পদ।

ভগবদ্ভজনই জীবের বুদ্ধিমত্তা ও চাতুর্য্যের চরম ফল

অশান্তিপূর্ণ জগতে বর্ণাশ্রমাচার, তপস্যা ও বেদাধ্যয়নাদিতে মহান্ পরিশ্রম

স্বীকার করিয়া যাহা লভ্য হয় তাহা হেয় এবং অর্থই তাহার ফল, নিত্য পরমপুরুষার্থ নহে। কিন্তু শ্রীহরির লীলাকথাশ্রবণাদিতে যে পরিশ্রম, তৎফলে ভগবানের পাদপদ্মের বিস্মৃতির বিনাশ অর্থাৎ নিত্যস্মৃতি প্রকটিত হয়। এই প্রসঙ্গে শ্রীধরস্বামী (ভাঃ ১২।১২।৫৪) শ্লোকের টীকায় লিখিয়াছেন,—"আরও বর্ণাশ্রমাচারাদিতে যে পরম অর্থাৎ মহান্ পরিশ্রম, তাহা কেবল যশোযুক্ত শ্রী অর্থাৎ কীর্ত্তি বা সম্পদেই পর্য্যবসিত—তাহা পরম পুরুষার্থ নহে, কিন্তু ভগবানের লীলাকথনাদিদ্বারা জীবের শ্রীধর-পাদপদ্মদ্বয়ের বিস্মৃতি বিলুপ্তি হয়।"

প্রাপঞ্চিক মনুষ্যদেহ ধারণ করিয়াও অপ্রাকৃত ভগবদ্ভজন বুদ্ধিবলেই পরিবর্ত্তনশীল স্থূল ও সূক্ষ্ম শরীর উপেক্ষা করিয়া সিদ্ধদেহের নিত্য-ইন্দ্রিয়ের দ্বারা ভগবৎসেবা সম্পাদনপূর্ব্বক মানব যে এই জন্মেই সত্য ও অবিনশ্বরস্বরূপ ভগবানকে লাভ করিতে পারেন, ইহাই বুদ্ধিমানের বুদ্ধি ও মনীষা অর্থাৎ বিবেক ও চাতুর্য্যের চরম ফল। এই প্রসঙ্গে ভাঃ ১১।২৯।২২ শ্লোকের টীকায় শ্রীধরস্বামী বলিয়াছেন,—"অতএব আমার ভজনই যে বুদ্ধির অর্থাৎ বিবেকের এবং মনীষার অর্থাৎ চাতুর্য্যের ফল, তাহা বলিতেছেন। সেই বুদ্ধি ও মনীষা প্রদর্শন করিতেছেন—সত্য ও অমৃতস্বরূপ আমাকে জীব অসত্য, মর্ত্ত্য অর্থাৎ বিনাশিমনুষ্যদেহদ্বারা (দেহে অবস্থানকালে) এই জন্মেই যে লাভ করে, তাহাই বুদ্ধি ও মনীষা। 'বুদ্ধি' শব্দে বিবেক এবং 'মনীষা' শব্দে 'চাতুর্য্য'।" উক্ত শ্লোকের বিবৃতিতে জগদ্গুরু শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী প্রভুপাদও বলিয়াছেন,—"ভগবদ্ভক্তিই নিখিল সুচতুরগণের উৎকৃষ্ট চাতুর্য্য, আধ্যক্ষিক-জ্ঞানবিমূঢ় জনগণ আধ্যক্ষিকতাকে আধ্যক্ষিকতার বলে বিনাশ করিয়া কোন ভাগ্যে ভগবদ্ভক্তিতে পর্য্যবসান করিতে পারেন, সুতরাং প্রাকৃতবিচার রহিত হইলেই এই প্রাকৃত রাজ্যে অবস্থানকালেও অপ্রাকৃত ফললাভ সম্ভব হয়।"

'চতুর' অর্থে ধূর্ত্ত নহে—সারগ্রাহী। ধূর্ত্ততা—সারগ্রাহিতা নহে, উহা একপ্রকার ভারবাহিতা বা আত্মবঞ্চনা। কিন্তু সারগ্রাহিগণ জগতের সমস্ত বস্তুর হেয়তার মধ্যে প্রবিষ্ট না হইয়া অনাসক্তভাবে সমস্ত বস্তুর সারভাগ বা উপাদেয়ত্ব চয়নপূর্ব্বক ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের উদ্দেশ্যে তর্পণ করিয়া থাকেন। যিনি সামর্থ্য সত্ত্বেও এই অনিত্য শরীরদ্বারা সাধুজন-সেবিত ভগবানের পাদপদ্মের সেবা করিয়া অবিনশ্বর যশোরাশি উপার্জ্জন না করেন, তিনি জগতে নিন্দনীয় ও শোচনীয়। যাঁহারা ভক্তির কথা বুঝিতে পারেন, তাঁহারা শুদ্ধভক্ত্যালোকে অজ্ঞানান্ধকার বিদূরিত করিতে সমর্থ হন। সেবা-পর হইলেই জীব পরমপবিত্র ও শুচি হন।

আধ্যক্ষিক মরণশীল জীব স্বীয় প্রাপঞ্চিক জ্ঞান ও কর্ম্মের চেষ্টা প্রভৃতি ছাড়িয়া ভগবানে আত্মসমর্পণ করিলে তাঁহার আর কোন অভাব থাকে না। তিনি বৈকুণ্ঠবস্তুর সেবায় বৈকুণ্ঠত্ব লাভ করেন বলিয়া মায়িকভোগে আর তাঁহাকে আবদ্ধ থাকিতে হয় না। ভগবৎপাদপদ্ম লাভ ব্যতীত ইতরবস্তুসকল কখনও মঙ্গলপ্রদ তথা অভয়প্রদ হইতে পারে না। অতএব সকল ইতরধর্ম্ম পরিত্যাগপূর্ব্বক কৃষ্ণের শরণগ্রহণই সকল জীবের একমাত্র অবলম্বনীয়—এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।

—শ্রীবলভদ্র দাস ব্রহ্মচারী

শ্রীল গুরু-মহারাজের বক্তৃতা

[পূর্ব্বপ্রকাশিত ৪৩শ বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা, ১৫১ পৃষ্ঠার পর]

সেই পাশ্চাত্ত্য দেশ বলছেন,—'Science ends in Philosophy'. বিজ্ঞানের কথা যেখানে শেষ হয়েছে, সেইখানে দার্শনিক বিচার আরম্ভ হয়েছে। আবার বলছেন কি ?—Philosophy ends in Religion'. দার্শনিক বিচার —দার্শনিক জগৎ যেখানে শেষ হয়েছে, ধর্ম্মজগৎ সেইখানে আরম্ভ হয়েছে। তাহলে ধর্ম্ম কত বড় জিনিস ! যা নিয়ে আজ বহু গবেষণা—সমালোচনা হচ্ছে। আমরা শুনে ত' অবাক্ হয়ে যাচ্ছি। যেটা ভাল জিনিস, যার মধ্যে উদারতা রয়েছে, যার মধ্যে স্নেহ-মমতা রয়েছে, তাকেই ত' বলে ধর্ম্ম। ধর্ম্ম মানে কি ঈর্ষা, হিংসা, মাৎসর্য্য ? এগুলো কোন ধর্ম্মের অঙ্গ নয়। যদি কেউ মনে করেন, নিশ্চয়ই তাদের ধর্ম্ম সম্বন্ধে Concrete idea—বাস্তব ধারণা নাই। 'ধর্ম্ম' মানে পরোপকার-বৃত্তি, সার্ব্বজনীন কল্যাণ-চিন্তা। সেই কথাই শাস্ত্রে বুঝানো হয়েছে। এ তথ্য শুধু সনাতন ধর্ম্মে বুঝানো হয়েছে তা নয়, অন্যান্য ধর্ম্মেও রয়েছে। যদি কেউ সেটা না মানতে পারছেন, যদি কেউ তার বিরুদ্ধাচরণ করছেন, তাহলে সেই ব্যক্তিবিশেষ সমালোচনার পাত্র, তার জন্য ব্যক্তিবিশেষই দায়ী হবেন। কিন্তু ধর্ম্মীয় নীতি ত' দায়ী হবে না, হতে পারে না। এই জিনিসগুলো বুঝতে হবে আজ আমাদের।

ধর্ম্ম সম্বন্ধে একটা মেকী ধারণা পোষণ করছি আমরা আজ এবং তারই সমালোচনা শুনছি। বাস্তবক্ষেত্রে ধর্ম্ম ত' সমালোচনার বস্তু নয়। ধর্ম্ম সকলকে

রক্ষা করছে—'ধর্ম্মো রক্ষতি রক্ষিতঃ।' সনাতন ধর্ম্ম—আত্মধর্ম্ম একজন মানুষকে যথাযথভাবে এ সংসারে সুপ্রতিষ্ঠিত করছে। এই সনাতন ধর্ম্ম ভগবানেরই দ্বারা সুরক্ষিত ও পরিপুষ্ট। এই ধর্ম্ম সার্ব্বজনীন, এই ধর্ম্ম বিশ্ববাসী সকলের জন্য। এখানে কোন একদেশিক বিচার—Caste, Creed এর কথা নাই। এ ধর্ম্ম জাতি-বর্ণ-নির্ব্বিশেষে সকলে নিতে পারছেন, এতে যোগ্যতা লাভ করছেন, অধিকার অর্জ্জন করছেন। এই আত্মধর্ম্ম, সনাতন ধর্ম্ম সকলে গ্রহণ করতে পারবে না—একথা ত' শাস্ত্রাদিতে কোথাও লেখা নাই।

একজন কবি গাইলেন,—

"হেথা একদিন, বিরামবিহীন মহা ওঁকার-ধ্বনি।
হৃদয়-তন্ত্রে, একের মন্ত্রে, উঠেছিল রণরণি॥"
"শক-হূণদল, পাঠান-মোঘল, একদেহে হল লীন॥"

কথাগুলো কি? কোন্ দেহে লীন হচ্ছেন? সমস্ত পাশ্চাত্য দেশ অধ্যাত্ম-ভারতে আসছেন, তাঁরা সনাতন ধর্ম্ম গ্রহণ করেছেন; আজও তা করছেন, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন। যিনি যতটুকু পরমসত্য বস্তুর সন্ধান পাচ্ছেন, সেই অনুসারে ততটুকু এগিয়ে আসছেন। যে ধর্ম্মের ভিতরে উদারতা আছে, স্নেহ-মমতা আছে, যে আত্মধর্ম্ম পরস্পর পরস্পরকে ভ্রাতৃত্বসূত্রে আবদ্ধ করছে, তাকেই ত' বলা হবে ধর্ম্ম। আত্মধর্ম্মের কথা ত' সেইখানে। এখন সেই সদ্ভাব জিনিসটা আসছে না কেন? আমি গতকাল আপনাদের কাছে নিবেদন করেছিলাম—ধর্ম্ম-সম্প্রদায়ের ভিতরে পরস্পরের মধ্যে যদি কোনরকম মতভেদ থাকে, মনান্তর-মতান্তর হয়, এঁরাই বসে পরস্পর সেটা মীমাংসা করতে পারবেন। কিন্তু যখনই তার ভিতরে রাজনীতি-নামক মহানর্থ প্রবেশ করেছে, তখনই সব সর্ব্বনাশ হয়ে গিয়েছে। সে জিনিস আজও সমানে চলছে।

রাজনীতি মানে কি? যদি আমাকে ব্যাখ্যা করতে বলেন, আমি বলব,—রাজনীতি মানে কূটনীতি। কূটনীতি মানে কোট্নামি, কোট্নামি মানে অসরলতা—কপটতা। এর ত' অন্য কোন অর্থ নাই। সুতরাং আমাদের সহজ-সরল নীতিটাকে বেছে নিতে হবে। আমরা যদি কূটনীতির ভিতরে প্রবেশ করি, তাহলে ত' পরস্পর পরস্পরকে ভুল বুঝব। ভ্রাতৃত্ব, স্বাধীনতা, সাম্য, মৈত্রী যা মুখে বলছি, তা হবে না। অন্তরবৃত্তি, আন্তরদর্শন—এটা ত' প্রমাণ করতে হবে আমাদের পরস্পরকে। সেই জিনিসটা ত' আজ সমাজে নাই। মুখে মুখে বললে ত' কিছু হচ্ছে না। কিন্তু উচ্চাবচ ভাব যেটা আছে, সেটাকে মেনে নিতেই হবে আমাদের। আমরা কখনও 'অ' কে 'আ' বলতে

পারি না, 'অ' কে 'ক' বলতে পারি না। 'অ' কে 'অ' বলতে হবে, 'ক' কে 'ক' বলতে হবে। এই কথার যদি কেউ বাদ-প্রতিবাদ করে বুঝান যে, হ্যাঁ 'অ' কে 'অ' বলতে হবে, 'ক' কে 'ক' বলতে হবে, তাহলে কি মতভেদ, মনান্তর হল? তা ত' নয়। এই জিনিসগুলো বুঝ্‌তে হবে আমাদের। বাস্তবদর্শন যেটা আছে, সেটা আমাদের শিখতে হবে, বুঝ্‌তে হবে। সনাতন ধর্ম্মের মধ্যে এগুলো সুন্দরভাবে বুঝানো আছে।

'নিরাকার' শব্দের কি অর্থ করলেন শাস্ত্রে?—প্রাকৃত আকার ভগবানের নাই, তাঁর অপ্রাকৃত আকার আছে। প্রাকৃত গুণ ভগবানের নাই, অপ্রাকৃত গুণবিশিষ্ট সেই ভগবান্। কে বলল ভগবানের শক্তি নাই, তিনি নিঃশক্তিক্? —সর্ব্বশক্তিমান্ তিনি। সেইজন্য ত'—God is Omnipotent (ভগবান্ সর্ব্বজ্ঞ), God is Omniscient (ভগবান্ সর্ব্বশক্তিমান্), God is Omnipresent (ভগবান্ সর্ব্বব্যাপী) কথাগুলো এসেছে। অস্বীকার করা যাবে না। সে বিশেষণগুলো সাধারণ মানুষের ক্ষেত্রে আসে না, যে বিশেষণগুলো সর্ব্বশক্তিমান্ ভগবানের ক্ষেত্রে প্রযুক্ত হয়েছে। আজকাল মানুষই ভগবান্! আজকাল ভগবানের বাজার এত সস্তা যে সবই ভগবান্। আরে, ভগবানকে ত' মান না, আবার সেই 'ভগবান্' শব্দ আসছে কেন? যদি ভগবান্ বলে কেউ ছিলেন বা আছেন, তাহলে সবই ভগবান্—একথা আসছে কেন? ভগবানকেই ত' মান না, আবার সবই ভগবান্—এসব কথা বলা হচ্ছে কেন? এটা বাজে কথা নয় কি? যদি ভগবান্ বলে কেউ থেকে থাকেন, যদি ভগবান্ বলে কেউ আছেন, তখন ত' একথা আসবে। কিন্তু আমি ভগবানকে মানি না, মানছি না, অথচ আমি ভগবান্ হয়ে বসে আছি! মুস্কিল! অযৌক্তিক কথা এটা, হতে পারে না। নিজের যদি ভগবান্ হতে ইচ্ছা আছে, তাহলে ভগবানকে মেনে নিতে হচ্ছে, ভগবানের যে পারতম্য, শ্রেষ্ঠত্ব, সেটাকে মেনে নিতে হবে। যুক্তি দিয়ে শাস্ত্রে এটা বুঝানো হয়েছে। সুতরাং সেই প্রেমময় ভগবান্, সর্ব্বশক্তিমান্ ভগবান্, সাকার ভগবান্ তিনি জগতের কল্যাণ বিধাতা। এটা অস্বীকার করবার উপায় নাই।

আজকাল কিছু নাস্তিক ব্যক্তি বলছেন,—ধর্ম্ম-কর্ম্ম কিছু লাগবে না মশায়, আমরা ত' মানুষ। একজন কবি বলেছেন,—'সবার উপরে মানুষ সত্য তাহার উপরে নাই।' খুব সুন্দর কথা। 'সবার উপরে মানুষ সত্য' তা বুঝলাম। কিন্তু মানুষের মনুষ্যত্বটা যদি ব্যাখ্যা করা না হয়, মানুষের ভিতরে যদি নীতি-আদর্শের মূল্যায়ন না থাকে, তাকে কি মানুষ বলে মেনে নেওয়া হয়েছে?—

না, হয় নাই ত'। নীতি-আদর্শ বাদ দিয়ে কোন মানুষ মনুষ্যত্বে প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন, এমন উদাহরণ আছে কি কিছু?—কোথাও নাই। বিচারটা বুঝ্‌তে হবে।

অন্ধ ধৃতরাষ্ট্র বসে আছেন। সঞ্জয়কে জিজ্ঞাসা করছেন কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের ইতিহাসটা।

ধর্ম্মক্ষেত্রে কুরুক্ষেত্রে সমবেতা যুযুৎসবঃ।
মামকাঃ পাণ্ডবাশ্চৈব কিমকুর্ব্বত সঞ্জয়॥

ধৃতরাষ্ট্রের মনোগত ভাবটা খুব ভাল নয়। কেন?—তিনি চান যুদ্ধ আরম্ভ হোক, চলুক। কিন্তু যেহেতু পাণ্ডবগণও সেখানে হাজির আছেন সেইজন্য সন্দেহ হচ্ছে অন্ধ ধৃতরাষ্ট্রের। কি সন্দেহ?—যদি এরা মিলমিশ করে ফেলে, সন্ধি-সর্ত করে ফেলে। সেই ভয় তাঁর। আজ দুনিয়া এই ঢঙে চলছে। সন্ধি-সর্ত করে, মিলমিশ করে চলবে, সেটা করতে দেওয়া হচ্ছে না, হবে না। একশ্রেণীর Opportunist—সুবিধাবাদীর যে অসুবিধা হয়ে পড়বে। সেইজন্য ওটা করতে দেওয়া হচ্ছে না। ঠেলাঠেলি, গুঁতোগুঁতি বাঁধিয়ে রাখা হয়েছে। মুখে সাম্য-মৈত্রী বললে হবে? মুখে বললে ত' কিছু হচ্ছে না। এই যে কূটনীতি, এটা আত্মকল্যাণজনক নয়। তাই সেখানে বলছেন,—ওটাকে বাদ দিয়ে সহজ-সরল নীতি নিয়ে চলতে হবে। সহজ-সরল নীতি মানে আত্মকল্যাণ চিন্তা। সে কল্যাণ-চিন্তার ভিতরে ঈর্ষা-হিংসার কোন স্থান নাই।

আপনারা শুনেছেন, গতকাল একজন বক্তা বলেছেন,—'এই সনাতন ধর্ম হচ্ছে নির্ম্মৎসর ধর্ম।' সাধুগণের নির্ম্মৎসর ধর্ম। ঠিক আছে কথাটা, তার ভিতরে আবার মৎসরতা টেনে আনা হচ্ছে কেন? কিছু ব্যক্তি আজ সমাজে বসে আছেন, চরম ফাঁকিবাজ তারা। তারা কি বলছেন?—সব সমান, সব সমান মশায়। বলি, কিরকম সমান? সব ধর্ম্মই যদি সমান হয়, চোরের ধর্ম্ম আর সাধুর ধর্ম্ম যদি সমান—এক হয়, তাহলে কেউ বলছেন চোরকে চুরি করতে, আর গৃহস্থকে জেগে থাকতে। সব ধর্ম্ম সমান নয়। ধর্ম্ম ত' হওয়া চাই সেটা? না, অপধর্ম্ম, বিধর্ম্ম, ছলধর্ম্ম তাকেও ধর্ম্ম বলা হবে? যদি ধর্ম্মের অঙ্গীভূত হয় সেটা তাহলে সেখানে কিছু সমন্বয় হবে, মিলন হবে। আর যদি বাইরে ধর্ম্মের মত একটা কিছু, কিন্তু চরম অধর্ম্ম, তার সঙ্গে ধর্ম্মের মিলন কি করে হতে পারে? এ ব্যাখ্যা কি কেউ চিন্তা করছেন আজ সমাজে? মুখে বলছেন—সব সমান। অথচ বলবার সময় বলছেন,—আমি যা বললাম শ্রেষ্ঠ কথা, এর থেকে আর শ্রেষ্ঠ কথা হয় না। শ্রেষ্ঠ যেটা সেটাকে মেনে

নিতে হবে সকলকে অবিসংবাদিতভাবে। সেটাকে অস্বীকার করবার উপায় আছে কি ?

উদাহরণ দিয়ে আমি বলি বাজারে তিন রকমের মিষ্টি আছে—একটা গুড়, একটা চিনি, আর একটা মিশ্রি। মিষ্টি ত' তিনটেই। আমার যেমন প্রয়োজন আছে, যেমন পয়সা আছে, সঙ্গতি আছে, আমি সেই অনুসারে সেটা সংগ্রহ করি। কিন্তু আমি কি গুড়টাকে বলব চিনি, চিনিটাকে বলব মিশ্রি ? তা ত' বলা চলবে না। মিষ্টি ত' তিনটাই। সমস্ত জিনিসের ঐ রকমের উচ্চাবচ ভাব আছে, বৈশিষ্ট্য আছে, classification আছে। এটাকে মেনে নিতে হবে আমাদের। আমরা 'সব সমান' বলে উড়িয়ে দিলাম, আর যখন ধর্ম্মের কথা আসছে তখনই এই ফাঁকিবাজির আশ্রয়। আর যখনই দৈনন্দিন জীবন-যাত্রার ক্ষেত্রে আমরা চলছি তখন কিন্তু অনেক প্রকার যাচাই। ভাল-মন্দের বিচার। এটা ভাল, ওটা মন্দ, অনেক রকম বিচার। কেন এ ফাঁকিবাজি ? সনাতন শাস্ত্র বলছেন,—তুমি যাচাই করে নাও, বুঝে-সুঝে চল, ভাল-মন্দ বিচার করে চল। খারাপকে খারাপ বলতে শেখ, ভালকে ভাল বলতে শেখ। খারাপটাকে ছেড়ে দিয়ে ভালটাকে গ্রহণ কর। এটা হল ধর্ম্মের নীতি, ধর্ম্মের অঙ্গ। দুঃসঙ্গ বর্জ্জন কর, সাধুসঙ্গ গ্রহণ কর। এটাই ত' সনাতন শাস্ত্রের উক্তি,—'ততো দুঃসঙ্গমুৎসৃজ্য সৎসু সজ্জেত বুদ্ধিমান্।'—বুদ্ধিমান্ মনুষ্যের এইটাই কর্ত্তব্য।

ভাল-মন্দের বিচার নাই আজ সমাজে, মানুষ মানুষের ভাল দেখতে পারছে না। ঈর্ষা, হিংসা, মাৎসর্য্যে দুনিয়াটা শেষ হয়ে যাচ্ছে আজ। এর হাত থেকে রক্ষা করবে কে সমাজকে ? চেষ্টা ত' আমাদেরই করতে হবে। যাতে করে পরস্পরের মধ্যে বিভ্রান্তি সৃষ্টি হয়, বিভেদ সৃষ্টি হয়, আজ সমাজ সেই দিকেই এগোচ্ছে। মানুষ আজ ধ্বংসের দিকেই এগিয়ে যাচ্ছে। এর হাত থেকে রক্ষা করবে কে ? সনাতন ধর্ম্মাবলম্বী ব্যক্তি ত' সকলেরই ভাল দেখতে চান। 'আমি আমার ভাল চাই, অনন্ত বিশ্বের কল্যাণ চাই'—এটাই ত' সদ্ভাব। সদ্ভাব আবার কাকে বলে ? 'সৎ' শব্দের ব্যাখ্যা আছে গীতার মধ্যে। আপনারা ভাল করে দেখুন।—

সদ্ভাবে সাধুভাবে চ সদিত্যেতৎ প্রযুজ্যতে।
প্রশস্তে কর্ম্মণি তথা সচ্ছব্দঃ পার্থ যুজ্যতে॥
যজ্ঞে তপসি দানে চ স্থিতিঃ সদিতি চোচ্যতে।
কর্ম্ম চৈব তদর্থীয়ং সদিত্যেবাভিধীয়তে॥

অনেকে বলছেন,—ধর্ম্ম-কর্ম্ম কিছু নয়, কর্ম্ম কর, কর্ম্ম কর, কর্ম্ম কর ভাই। কি কর্ম্ম করব আমি? কোন্ কর্ম্ম করব? গীতা-ভাগবতে বলছেন—এমন কতকগুলো অনুষ্ঠান করছি আমরা যে কর্ম্মে আমার বন্ধনদশা এসে যাচ্ছে। আবার কিছু কর্ম্ম আছে, যে কর্ম্মে আমার মুক্তিদশা আসছে। তাহলে কোন্ কর্ম্মটা করব? আমি কি গুটীপোকা হব, না মাকড়সা হব? মাকড়সা তার থুথু (লালা) থেকে জাল তৈরী করে। সেই জালেতে অন্য পোকামাকড় ধরা পড়ে। আর গুটীপোকা (পেষস্কৃৎ) সেও তার লালা দিয়ে সুতা বের করে তার ভিতরে বদ্ধ হয়, তাকে সিদ্ধ করে মারা হয়। তাহলে কোন্ কর্ম্ম করব আমরা? শাস্ত্রে বাতলানো আছে—'যজ্ঞার্থাৎ কর্ম্মণঃ'—ভগবানের প্রীতিকামনায় কর্ম্মাচরণ কর, তাহলে তোমার কর্ম্মের দায় নাই। আর যদি সেটাকে বাদ দিয়ে দেওয়া যায়, তাহলে বন্ধনদশা আসছে। সব জিনিসের ঐরকম ব্যাখ্যা দেওয়া আছে। আমি কর্ম্মানুশীলন করি, জ্ঞানানুশীলন করি, আর যোগাচরণ করি, সবটার পিছনে ভগবদ্ভাব মিশ্রিত করতে হবে। ভক্তিভাব না থাকলে কর্ম্মে সিদ্ধিলাভ হবে না। ভক্তিকে বাদ দিয়ে যেখানে কর্ম্ম-প্রচেষ্টা হয়েছে, সেটা বিফল চেষ্টা। সেই কথাই সনাতন শাস্ত্রের সব জায়গায় বুঝানো হয়েছে।

"ভক্ত্যা তুষ্যতি কেবলম্ ন চ গুণৈর্ভক্তিপ্রিয়ো মাধবঃ।"
ভক্ত্যাহমেকয়া গ্রাহ্যঃ শ্রদ্ধয়াত্মা প্রিয়ঃ সতাম্।
ভক্তিঃ পুনাতি মন্নিষ্ঠা শ্বপাকানপি সম্ভবাৎ ॥

'ভক্ত্যাহমেকয়া গ্রাহ্যঃ'—ভক্তির দ্বারা আমি বশীভূত হই, ভগবান্ বলছেন। অথচ বর্ত্তমান দুনিয়ায়, সমাজে এই ভক্তিকে বাদ দিয়েই চলবার চেষ্টা করা হচ্ছে। ভুল Process, ভুল Theory। কিছুই লাভ হবে না। গাছের গোড়াটাকে কেটে, শিকড়টাকে কেটে গাছকে বসান হচ্ছে। সফল হবে না তা কোনদিন। ভক্তিবৃত্তির প্রয়োজন আছে, আমাদের শ্রদ্ধার প্রয়োজন আছে, সাধন-ভজনের প্রয়োজন আছে। তত্ত্বদর্শন জানতে হবে, বুঝতে হবে, শিখতে হবে। প্রয়োজন আছে এটা। এটাকে বাদ দিয়ে নয়। আমি কিছুই জানি না, বুঝি না, কিছুই আলোচনা নাই, কিন্তু বড় তার্কিক আমি। মশায়! এটা কি? ওটা কি? আলোচনা কর ভাই, অল্প-স্বল্প জানলে পরে তর্কের কথা বেশী আসে। তত্ত্বদর্শন ভাল করে যদি শেখা যায়, জানা যায়, তখন আর তর্ক থাকে না; সব তর্ক মিটে যায়।

একটা বাচ্চা ছেলে, তার বাড়ীতে যাগ-যজ্ঞ হচ্ছিল। ছেলেটা সাধারণ

ছেলে ছিলেন না, রাজপুত্র ছিলেন। বহু মুনি-ঋষি এসেছেন। অনেক দান-ধ্যান করছেন তাঁর পিতা। কিন্তু দান করছিলেন সব বুড়ো বুড়ো গাভীগুলোকে। দেখে ছেলেটার সহ্য হয় নাই। ছেলেটা বলে ফেলল—বাবা! এই বুড়ো বুড়ো গাভীগুলোকে দান করছ তুমি, এতে তোমার কি পুণ্য হবে? 'কিং তয়া ক্রিয়তে ধেন্বা যা ন স্যূতে ন দুগ্ধদা।'—এই গাভীগুলো কোনদিন বাচ্চাও দেবে না, দুধও দেবে না। এ দান করে তোমার কি হবে? দু-চার বার জিজ্ঞাসা করবার পর পিতা খুব অসন্তুষ্ট হয়ে বললেন,—চুপ করে থাক্। তখন ছেলেটা বলছে—বাবা! এই বুড়ো গরুগুলোকে দান করে তুমি ত' গোশালা খালি কর্‌লে। আমাকে কাকে দান করছ তুমি? পিতা তখন রাগ করে বলে দিলেন,—যা, যমকে দিলাম। যমকে দিলে, ঠিক আছে। পিতাকে প্রণাম করে তিনি যমালয়ে চললেন। 'যমালয়ে জীবন্ত মানুষ'—আপনারা সিনেমায় দেখে থাকবেন। ছেলে হাজির হয়েছেন যমালয়ে। কিন্তু যমরাজ সেই সময় অনুপস্থিত ছিলেন। সেখানে গিয়ে তিন দিন বসে আছেন। যমরাজের স্ত্রী তাঁকে খাওয়াতে পারেন নাই। তিনদিন পরে যখন যমরাজ ফিরে এসেছেন, তখন দেখেন, তাঁর V. I. P. guest বসে আছেন তাঁর দরজায়। যমরাজ বললেন,—আমি অন্যায় করেছি, আপনি আমার মাননীয় অতিথি, অভুক্ত অবস্থায় আমার এখানে রয়েছেন। আমি আপনাকে তিনটে বর দিতে চাই। নচিকেতা বললেন,—দিন।

প্রথম বর আপনি চেয়ে নিন। 'আমার পিতা আমার উপর অসন্তুষ্ট হয়েছেন, তাঁর ক্রোধ চলে যাক্ আমায় উপর থেকে।' যমরাজ বললেন,—তথাস্তু। দ্বিতীয় বর তুমি চাও। দ্বিতীয় বরে তিনি আত্মতত্ত্ব জানতে চাইলেন। যমরাজ তাঁকে আত্মতত্ত্ব উপদেশ করলেন। তৃতীয় বর চাও তুমি। আমি জন্ম-মৃত্যু-রহস্য জানতে চাই। বললেন,—এটা বলা হবে না, খুব গোপনীয় জিনিস। কিন্তু ছেলে ত' কিছুতেই শুনবে না। পঞ্চমবর্ষীয় বালক হলে কি হবে, সে কিন্তু জ্ঞানবৃদ্ধ। যমরাজ তাঁকে অনেক ধরণের প্রলোভন দিতে লাগলেন—তোমাকে ব্রহ্মত্ব দেব, ইন্দ্রত্ব দেব, সাম্রাজ্যলক্ষ্মী দেব। কোনটাতেই রাজী নয়। আমি যা জানতে চাচ্ছি সেটা বলুন আমাকে। কেন তুমি তর্ক করছ? এক ধমক দিলেন নচিকেতাকে। 'নৈষা তর্কেণ মতিরাপনেয়া'—তর্কের দ্বারা তত্ত্বদর্শন লাভ হয় না। নচিকেতা বললেন,—আপনি ত' আমার গুরু, আপনি ত' আমার পিতা, আপনি ত' আমার Guardian। আমি তর্ক কর্‌তে আসি নাই, তত্ত্বদর্শন জানবার জন্য আপনার কাছে এসেছি। আমাকে দয়া করে বলুন। শেষে

যমরাজ বলতে বাধ্য হয়েছেন। তিনি যদি না বলতেন, তাহলে আজ জগতের লোক কি করে জানতেন সেই জন্ম-মৃত্যু-রহস্য—যা শাস্ত্রে সুন্দরভাবে বিবৃত হয়েছে।

সব জিনিসের মধ্যে তত্ত্বদর্শনটা আছে। আমরা যদি কিছু জানতে চাই, শিখতে চাই, বুঝতে চাই, সবটাই আছে। তার ক্ষেত্র আছে, স্থান আছে, কাল আছে, পাত্র আছে। কিন্তু আমাদের As it is জিনিসটা জানতে, বুঝতে, শিখতে হবে। কিছুটা জানলাম আর কিছুটা জানলাম না, তা হবে না। অর্দ্ধেক জানা না জানার সমান। পূর্ণভাবে জানতে হবে, বুঝতে হবে, শিখতে হবে। সাধন-ভজনের ব্যাপারটা শেষ হয় না কখনও। পরমমুক্তগণও দেহধারণপূর্ব্বক শ্রীভগবানের ভজন করিয়া থাকেন—"মুক্তা অপি লীলয়া বিগ্রহং কৃত্বা ভগবন্তং ভজন্তে।" (ক্রমশঃ)

লীলাপুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের বিপ্রলম্ভ-লীলা

"পুরুষের মধ্যে যিনি উত্তম তিনিই পুরুষোত্তম।" পুরুষ কে? যিনি কর্ত্তা হইয়া ভোগ করেন, তিনিই পুরুষ। এই অর্থে যদি পুরুষকে নির্দ্দেশ করা হয়, তাহা হইলে এজগতের দিকে দৃষ্টিপাত করিলে ত' সকলকেই পুরুষ বলিয়া ভ্রম হইবে। কারণ এ ত' ভোগময় জগৎ। এখানে সকলে কেবল ভোগের লালসা চরিতার্থ করিবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা চালাইতেছে। পুরুষ নারীর মধ্য দিয়া রূপ, রস, গন্ধ, শব্দ ও স্পর্শের দ্বারা জগৎকে ভোগ করিতেছে। আবার নারীও পুরুষকে সঙ্গী করিয়া জগৎকে ভোগ করিতেছে। তাহা হইলে নারী-পুরুষ উভয়ে ভোক্তা এবং ভোক্তা অর্থে পুরুষ হইলে উভয়ে পুরুষ।

এই ভোগের পরিণতি কি? অবশেষে ত্রিতাপজ্বালার দুর্ব্বিসহ যন্ত্রণা। শরীর যদি কণ্ডুরসাক্রান্ত হয়, তাহলে প্রথম অবস্থায় চুলকানিতে দারুণ সুখ ও তৃপ্তি, কিন্তু শেষ পরিণতি—অপরিসীম জ্বালা-যন্ত্রণা।

"জীবের স্বরূপ হয় কৃষ্ণের নিত্যদাস"—ইহাই জীবের স্বরূপ-দেহ। সেই স্বরূপের দেহকে কণ্ডুরসাক্রান্ত করিয়াছে কৃষ্ণকে ভুলিয়া মায়ার কবলে পড়িয়া সূক্ষ্ম ও স্থূলদেহের আবরণে। এই স্বরূপ আবরিত কেন হইয়াছে সূক্ষ্ম ও স্থূল-দেহের কণ্ডুরসা রোগের আবরণে? কারণ, জীব-স্বরূপের ধর্ম্মই কৃষ্ণসেবা।

সেই সেবা ভুলিয়া জীবের কর্ত্তা সাজিয়া ভোগের লালসা জাগিয়াছে। তাই মায়াদেবী জীবের ভোগের লালসা চরিতার্থ করিতে মায়িক জগতে আকৃষ্ট করিয়া আনিয়া জীবকে ক্ষণিক সুখের পরিবর্ত্তে যন্ত্রণায় পিষ্ট করিতেছেন। এই কর্ত্তা সাজিবার ফলে জীব এই জগৎকে জগদীশ্বরের সেবাগার না দেখিয়া নিজসুখের ভোগাগার দর্শন করিতেছে এবং ইহার ফলও লাভ করিতেছে।

সুতরাং দেখা যাইতেছে, এ জগতে নারী-পুরুষ কেহই ভোক্তা বা পুরুষ নহেন। তাহা হইলে প্রশ্ন আসিয়া যায়, পুরুষ বা ভোক্তা তাহা হইলে কে?

বেদে যাঁহাকে 'রসো বৈ সঃ' বলা হইয়াছে এবং যিনি রসিকশেখর কৃষ্ণ—তিনিই একমাত্র ভোক্তা। কারণ, সকলপ্রকার রস পূর্ণমাত্রায় তাঁহাতেই বর্ত্তমান এবং সকলপ্রকার রসে তিনিই পরিপূর্ণ রসময় হইয়া, আবার রসিকশেখর রূপে সেই সকলরসের একমাত্র তিনিই পূর্ণমাত্রায় উপভোগের কর্ত্তা।

এজগতে কিন্তু রস ও রসিক ভিন্ন। ফুল যদিও মধুরসময় হইয়া অবস্থান করে, তথাপি ফুল নিজের মধুকে নিজে উপভোগ করিতে পারে না। মধুমক্ষিকাই রসিকরূপে তাহা উপভোগ করে। কিন্তু কৃষ্ণচন্দ্র পূর্ণরসময় বিগ্রহ হইয়া, পাঁচটী মুখ্য এবং সাতটী গৌণরসের পূর্ণ আকর হইয়াও একমাত্র রসিকশেখর রূপে সমস্ত রসের পূর্ণমাত্রায় ভোগের অধিকারী তিনিই। একারণে একমাত্র পুরুষ তিনিই এবং সকল পুরুষাভিমানী জীবের মধ্যে তিনিই উত্তম পুরুষ। সুতরাং 'পুরুষোত্তম' বলিতে সেই স্বয়ং ভগবান্, ষড়ৈশ্বর্য্যময় ভগবান্, অসমোর্দ্ধ ভগবান্ সেই কৃষ্ণচন্দ্রকেই শাস্ত্র নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

এই পুরুষোত্তমের পূর্ব্বে 'লীলা' শব্দের প্রয়োগ হইয়াছে কেন? চতুঃশ্লোকী ভাগবতের প্রথম শ্লোকে শ্রীভগবান্ ব্রহ্মাকে বলিয়াছেন,—

"অহমেবাসমেবাগ্রে নান্যৎ যৎ সদসৎপরম্।
পশ্চাদহং যদেতচ্চ যোঽবশিষ্যেত সোঽস্ম্যহম্॥"

"ভগবান্ ব্রহ্মাকে বলিতেছেন,—এই জগৎ সৃষ্টির পূর্ব্বে কেবল আমিই ছিলাম। সৎ, অসৎ এবং অনির্ব্বচনীয় ব্রহ্ম পর্য্যন্ত অন্য কিছুই আমা হইতে পৃথগ্‌রূপে ছিল না। সৃষ্টি হইলে পর এ সমুদয় স্বরূপে আমিই আছি এবং সৃষ্টি লয় হইলে একমাত্র আমিই অবশিষ্ট থাকিব।" তাহা হইলে সেই রসময় কৃষ্ণচন্দ্রই একমাত্র সৃষ্টির পূর্ব্বে রসস্বরূপে একলা ঈশ্বররূপে অদ্বয়জ্ঞানতত্ত্বে বিরাজিত ছিলেন।

নিরঙ্কুশ ইচ্ছাময় সেই কৃষ্ণচন্দ্র রসিকশেখররূপে সেই রসকে উপভোগ করিতে লীলাবিলাসের বিস্তার করিলেন এবং ত্রিজগৎ—চিদ্‌জগৎ, পরব্যোম

বা অনন্ত বৈকুণ্ঠজগৎ এবং দেবীধাম বা অনন্ত মায়িক ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি করিলেন। এই ত্রিজগতের ভোক্তা একমাত্র তিনিই। তিনিই পুরুষোত্তম হইয়া লীলাবিলাসের মাধ্যমে সকল রসের ভোগের একমাত্র অধিকারী। 'লীলা' ও 'বিলাস' বলিতে কি বুঝায়? শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ বলিয়াছেন,—"সর্ব্বতন্ত্র, স্বতন্ত্র, স্বরাট্, লীলাপুরুষোত্তমের নিরঙ্কুশ ইচ্ছাপ্রসূত ক্রীড়াই লীলা।" আর বিলাস —"নিত্য নবনবায়মানভাবে চিদ্লীলামিথুনের চিদিন্দ্রিয় তর্পণ-সাধন-বিধানই বিলাস।"

অতএব জীব যদি পুরুষ অভিমানে ভোক্তা সাজিয়া মায়িক জগতের কারাগারে প্রবেশ করিয়া ভোগে লিপ্ত হয়, তাহা জীবের তত্ত্বভ্রম ভিন্ন কিছুই নহে। এই তত্ত্বভ্রমে জীব প্রথমে স্বতত্ত্বে ভ্রম করে। স্বতত্ত্বে ভ্রমের ফলস্বরূপ জীব যে কৃষ্ণের নিত্যদাস, তাহা ভুলিয়া গিয়া কর্ত্তৃত্ব-বুদ্ধিতে ভোগে লিপ্ত হয়। ইহার পর জীবের পরতত্ত্বে ভ্রম হয় অর্থাৎ কৃষ্ণই যে একমাত্র ত্রিজগতের প্রভু, তাহা ভুলিয়া যায়। এই পরতত্ত্ব-ভ্রমের ফলে ভোগে নিজকে সর্ব্বতোভাবে লিপ্ত করিবার উদ্দেশ্যে সাধ্য-সাধন তত্ত্বে ভ্রম করে। সাধ্যবস্তু একমাত্র কৃষ্ণচন্দ্র এবং কৃষ্ণপ্রেমই জীবের একমাত্র প্রয়োজন, তাহা ভুলিয়া ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ-পথে ধাবিত হয়। এই ভ্রমের ফলস্বরূপ আসিয়া যায় ভজনের বিরোধী বিষয়ে ভ্রম অর্থাৎ ভোগকে উত্তমরূপে চরিতার্থ করিতে কৃষ্ণভজন ছাড়িয়া জীব অন্যাভিলাষী হয় এবং কর্ম্ম, যোগ, জ্ঞানপথে পরিভ্রমণ করে। সুতরাং জীব জানিতে পারে না যে, "লীলাপুরুষোত্তম" লীলা বিস্তার করিয়াছেন রসময় কৃষ্ণচন্দ্র রসিকশেখর হইয়া সেই পূর্ণরসকে আস্বাদন করিবার জন্যই।

এবার 'শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য' কে?—শ্রী অর্থাৎ লক্ষ্মী। কিন্তু কৃষ্ণের আগে শ্রী অর্থাৎ সর্ব্বলক্ষ্মীময়ী শ্রীরাধিকা।

"দেবী কৃষ্ণময়ী প্রোক্তা রাধিকা পরদেবতা।
সর্ব্বলক্ষ্মীময়ী সর্ব্বকান্তিঃ সম্মোহিনী পরা॥"

শ্রীরাধারাণী—"সমস্ত লক্ষ্মীগণের অংশিনী বলিয়া এবং শ্রী বা সৌন্দর্য্যের আধার বলিয়া ও সর্ব্বলক্ষ্মী ও শ্রীকৃষ্ণের ষড়্‌বিধ ঐশ্বর্য্যের অধিষ্ঠাত্রী শক্তি বলিয়া সর্ব্বলক্ষ্মীময়ী।" শ্রীকৃষ্ণ অর্থাৎ 'রাধাকৃষ্ণ', আর রাধাকৃষ্ণের মিলিত তনুই—'শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য'। তিনি বিভুচেতন ও অণুচেতন জীবের চৈতন্যের আধার বলিয়া শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য। আবার সম্ভোগময় বিগ্রহরূপে 'শ্রীকৃষ্ণ'।

"রাধাকৃষ্ণ ঐছে সদা একই স্বরূপ।
লীলারস আস্বাদিতে ধরে দুইরূপ॥"

আর শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য হইলেন ঔদার্য্যময় বিগ্রহ, রাধাকৃষ্ণের মিলিত তনু।

"প্রেমরস নির্য্যাস করিতে আস্বাদন।
রাগমার্গ ভক্তিলোকে করিতে প্রচারণ॥
রসিকশেখর কৃষ্ণ পরমকরুণ।
এই দুই হেতু হৈতে ইচ্ছার উদ্গম॥"

সেই সম্ভোগময় কৃষ্ণচন্দ্র পরম করুণাময় ঔদার্য্যবিগ্রহরূপে সর্ব্বজীবকে স্বভক্তিশ্রী—যাহা অনর্পিতচর সেই উন্নত উজ্জ্বলরসের ভাণ্ডার বিলাইতে আসিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন,—'আমি বিনা অন্যে নারে ব্রজপ্রেম দিতে।' এই কারণে শ্রীমায়াপুরচন্দ্রের উদয়। (ক্রমশঃ)

—শ্রীমতী মায়া সরকার

শ্রীচৈতন্যে মর্ত্ত্যবুদ্ধি—নাস্তিকতা ও অপরাধ

[পূর্ব্বপ্রকাশিত ৪৩শ বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা, ১৫৮ পৃষ্ঠার পর]

লেখক নিজেই যখন শ্রীকৃষ্ণকে পুরুষোত্তম অর্থাৎ ভগবান্ বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন, তখন শ্রীকৃষ্ণের মূর্ত্তি পূজাকে তিনি কল্পিত বলিলেন কেন? ভগবানের সবিশেষ বিগ্রহ বাস্তব সত্য, তাহা কি কল্পিত হইতে পারে? শ্রীমূর্ত্তি বা বিগ্রহেরই ধ্যান হয়। স্বামী বিদেশে থাকিলে পতিব্রতা স্ত্রী স্বামীর মূর্ত্তিরই ধ্যান করিয়া থাকে। লেখক কৃষ্ণকে যদুপতি বলিয়াছেন। কাজেই যদুপতি কৃষ্ণের রূপ বা মূর্ত্তি এবং লীলাবৈচিত্র্য লেখক অস্বীকার করিতে পারেন কি? যদুপতি কৃষ্ণের শ্রীমূর্ত্তিকে লেখক কল্পিত বলিলেই কি তাহা কল্পিত হইয়া যাইবে? যে যদুপতি কৃষ্ণ ও বলরাম নররূপে এই জগতে লীলা করিয়াছেন, তাঁহাদের সেইরূপ বা শ্রীমূর্ত্তি বাস্তব সত্য,—তাহা কখনও কল্পিত হইতে পারে না। অনুরূপভাবে নিতাই-গৌরের শ্রীমূর্ত্তি কল্পিত হইতে পারে না। শ্রীবিগ্রহ বা শ্রীমূর্ত্তি ভগবৎস্বরূপের সাক্ষাৎ নিদর্শন—উহা পৌত্তলিক নহে ও কল্পিতও নহে। পরমহংসকুলচূড়ামণি শ্রীশ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুর লিখিয়াছেন—"শ্রীবিগ্রহ ভগবৎস্বরূপের সাক্ষাৎ নিদর্শন বই স্বরূপেতর বস্তু হইতে পারেন না। সমস্ত শিল্প ও বিজ্ঞানে যেরূপ অলক্ষিত-তত্ত্বের স্থূল প্রতিভূ আছে, শ্রীবিগ্রহও সেইরূপ জড় চক্ষের অলক্ষিত ভগবৎস্বরূপের প্রতিভূস্বরূপ। ভক্তদিগের ভগবৎস্বরূপ প্রতিভূ যে যথাযথ, তাহা ভক্তগণ বিশুদ্ধ ভক্তি বৃদ্ধিরূপ

ফলদ্বারা অনুক্ষণ পরীক্ষা করিতেছেন। বিদ্যুৎ-পদার্থের সহিত বিদ্যুৎযন্ত্রের যে প্রকৃত সম্বন্ধ, তাহা কেবল বিদ্যুৎ-ফলকোৎপত্তিরূপ ফলের দ্বারাই লক্ষিত হয়। তদ্বিষয়ে যাহারা অনভিজ্ঞ, তাহারা বিদ্যুৎ যন্ত্র দেখিলে কি বুঝিবে? যাহাদের হৃদয়ে ভক্তি নাই, তাহারা শ্রীবিগ্রহকে পুত্তলিকা বই আর কি বলিতে পারে!" (চৈঃ শিঃ ৫।৩)

মুক্তপুরুষগণও অপ্রাকৃত সিদ্ধদেহে ভগবৎসেবা করেন—

"মুক্তা অপি লীলয়া বিগ্রহং কৃত্বা ভগবন্তং ভজন্তে ॥" (ভাঃ ১০।৮৭।২১)

অর্থাৎ "মুক্তগণও লীলায় বিগ্রহ করিয়া ভগবানকে ভজন করেন।" সুতরাং মুক্তপুরুষগণ-কর্তৃক যখন ভগবানের শ্রীবিগ্রহ সেবিত হন, তখন ভগবানের শ্রীবিগ্রহকে লেখক কল্পিত বলায় তাহা লেখকের পাগলামি ছাড়া আর কি হইতে পারে?

শ্রীকৃষ্ণ, বলরাম, শ্রীচৈতন্য, নিতাই—ইহাঁরা নিত্যবস্তু। ইহাঁদের বিগ্রহপূজা আদৌ কল্পিত হইতে পারে না। লেখক শ্রীকৃষ্ণকে যেমন 'পুরুষোত্তম' বলিয়াছেন, তেমনই শ্রীচৈতন্যলীলাও নিত্য বলিয়া নিবেদনে স্বীকার করিয়াছেন; যথা—নিবেদনের শেষে লিখিয়াছেন,—

'অদ্যাপিও সেই লীলা করে গৌররায়।
কোন কোন ভাগ্যবানে দেখিবারে পায় ॥

তাই নিত্যবস্তুর পূজা কি কল্পিত হইতে পারে? ঈশ্বরের সচ্চিদানন্দময় বিগ্রহ প্রকৃতির অতীত চিন্ময় বিগ্রহ ও নিত্য। মায়াধীশ বিষ্ণুকে মায়িকজ্ঞানই পাষণ্ডতা।

"প্রাকৃত করিয়া মানে বিষ্ণু-কলেবর।
বিষ্ণু নিন্দা আর নাহি ইহার উপর ॥" (চৈঃ চঃ আদি ৭।১১৫)

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে অন্যত্র আছে,—

"শ্রীবিগ্রহ যে না মানে, সেই ত' পাষণ্ডী।
অদৃশ্য অস্পৃশ্য, সেই হয় যমদণ্ডী ॥" (চৈঃ চঃ মধ্য ৬।১৬৭)

শ্রীগৌরপার্ষদপ্রবর শ্রীল রূপ গোস্বামী "শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধুঃ"-নামক গ্রন্থে লিখিয়াছেন,—

"তথাহি শ্রূয়তে শাস্ত্রে কশ্চিৎ কুরুপুরীস্থিতঃ।
নন্দসূনোরধিষ্ঠানং তত্র পুত্রতয়া ভজন্।
নারদস্যোপদেশেন সিদ্ধোঽভূদ্বৃদ্ধবর্দ্ধকিঃ ॥"

(ভঃ রঃ সিঃ পূর্ব্ব ২য় লহরী ৩০৭ শ্লোক)

অর্থাৎ—"শাস্ত্রে শুনা যায় যে, শ্রীহস্তিনাপুরস্থিত কোন এক বৃদ্ধ সূত্রধর শ্রীকৃষ্ণের প্রতিমাকে পুত্রবুদ্ধিতে শ্রীনারদের উপদেশানুসারে ভজন করিয়া সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন।" শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের মধ্যলীলায় পঞ্চম পরিচ্ছেদে 'সাক্ষিগোপাল' আখ্যায়িকায় প্রতিমা যে সাক্ষাৎ ব্রজেন্দ্রনন্দন, তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। শ্রীরূপানুগবর অপ্রাকৃত-কবিকুল-তিলক শ্রীশ্রীমৎ কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী ভক্তবশ সাক্ষিগোপালকে প্রণাম করিয়াছেন,—

"পদ্ভ্যাং চলন্ যঃ প্রতিমা-স্বরূপো
ব্রহ্মণ্যদেবো হি শতাহগম্যম্।
দেশং যযৌ বিপ্রকৃতেঽদ্ভুতেহং
তং সাক্ষিগোপালমহং নতোঽস্মি॥" (চৈঃ চঃ মঃ ৫।১)

অর্থাৎ—"যে ব্রহ্মণ্যদেব প্রতিমারূপ হইয়াও ব্রাহ্মণের উপকারের জন্য শতদিবস চলিলে যে দেশ প্রাপ্ত হওয়া যায়, তথায় পদচালনপূর্ব্বক গমন করিয়াছিলেন, সেই অদ্ভুতচেষ্ট সাক্ষিগোপালকে আমি প্রণাম করি।"

তাই স্পষ্টই বলিতে ইচ্ছা হয় যে, লেখক কৃষ্ণ-বলরাম, গৌর-নিতাইয়ের শ্রীমূর্ত্তিকে কল্পিত বলিয়া তাঁহাদের নিন্দা করিয়াছেন।

লেখক মহাশয় লিখিয়াছেন,—"বিগ্রহ সৃষ্টি হল মঠে-মন্দিরে। কিন্তু কেন?" তদুত্তর এই যে,—মঠ-মন্দির নির্গুণ স্থান। নির্গুণ স্থানে বা অপ্রাকৃত ধামেই ভগবান্ বিরাজ করেন। স্বয়ং ভগবান্ বলিয়াছেন,—"মন্নিকেতন্তু নির্গুণম্" (ভাঃ ১১।২৫।২৫) অর্থাৎ ভগবানের অবস্থিতি-স্থান মঠ-মন্দির—যাহা নির্গুণ বা অপ্রাকৃত। জগদ্গুরু শ্রীল ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজের মঠ-মন্দির সম্পর্কে বক্তৃতার কিয়দংশ এস্থলে উল্লেখ করিতেছি,—যে স্থানে শ্রীবিগ্রহের অবস্থিতি নাই অর্থাৎ উপাস্য তত্ত্বের শ্রীমন্দির প্রতিষ্ঠিত হয় নাই, তাহা কখনও মঠ নহে। মঠ বলিলে শ্রীমন্দিরের অবস্থিতি বুঝাইবে। সুতরাং মঠ-মন্দির এই যৌগিক শব্দ আমাদের 'মঠ' শব্দের প্রকৃত অর্থকে জানাইয়া দেয়। ইংরাজী ভাষার শব্দ বিন্যাসে 'Q' র সঙ্গে 'U' র যে-প্রকার সম্বন্ধ, মঠের সহিত মন্দিরেরও সেই প্রকার সম্বন্ধ। মঠে সন্ন্যাসিগণই শিক্ষক এবং ব্রহ্মচারিগণই ছাত্র। বাণপ্রস্থগণ অধিকার অনুসারে শিক্ষক ও ছাত্র—উভয়বর্ত্তী স্থানে অবস্থিত। সুতরাং মঠ বলিলে ত্যাগিগণের 'আশ্রম' বুঝিতে হইবে। মঠের পরিচালনা গৃহত্যাগী সন্ন্যাসী-ব্রহ্মচারী ও বাণপ্রস্থী—এই আশ্রমবাসিগণের একমাত্র কৃত্য। ত্যাগী বলিতে বিশেষতঃ উক্ত আশ্রমত্রয়ে অবস্থিত ভগবদ্ভক্তগণকে লক্ষ্য করা হয়। ঈশ্বরোপাসনাই ত্যাগের প্রধান

উদ্দেশ্য, ইহা ব্যতীত ত্যাগ নিতান্ত শুষ্ক ও নিরর্থক। শ্রীবিগ্রহের জন্যই মন্দিরের আবশ্যকতা। যাঁহারা বিগ্রহ মানেন না, তাঁহাদের কখনও শ্রীমন্দিরের আবশ্যকতা থাকিতে পারে না।" শ্রীচৈতন্যভাগবতে বর্ণিত আছে যে, ব্রহ্ম-শিবাদি-বন্দ্য শ্রীবিগ্রহকে অস্বীকার করায় সর্ব্বনাশ হয় ;—

"সত্য কহোঁ মুরারি আমার তুমি দাস।
যে না মানে মোর অঙ্গ, সেই যায় নাশ॥
অজ-ভবানন্ত প্রভুর বিগ্রহ সে সেবে।
সে বিগ্রহ প্রাণ করি' পূজে সর্ব্বদেবে॥
পুণ্য পবিত্রতা পায় যে অঙ্গ পরশে।
তাহা মিথ্যা বলে বেটা কেমন সাহসে॥"

(চৈঃ ভাঃ মঃ ২০।৩৬-৩৮)

লেখক শুদ্ধ গৌরভক্তগণের সহিত শাস্ত্র আলোচনা করিলে মঠ-মন্দিরে বিগ্রহ বিরাজিত থাকার কারণ সম্পর্কে আরও জানিতে পারিবে।

লেখক ১১১ পৃষ্ঠায় যেন আক্ষেপের স্বরে লিখিয়াছেন,—"এই সুদীর্ঘ পাঁচশো বছরে অতো বড় জননেতা চৈতন্যকে কেউ মানুষ হিসাবে ভাবলো না। সন্ন্যাসী হিসাবেও ভাবলো না (সন্ন্যাসীও তো মানুষ), ভাবলো ভগবান হিসাবে।"

সত্যই, চৈতন্যকে লোকে ভগবান্ হিসাবে ভাবিতেছে দেখিয়া লেখকের চিত্ত যেন জ্বলিয়া যাইতেছে। আর তাহারই প্রতিফলন লেখকের লেখনীতে প্রকাশ পাইতেছে। লেখক নিবেদনের ২য় পৃষ্ঠায় স্পষ্টাক্ষরে জানাইয়াছেন,—"গীতার সেই অমোঘ বাণী ধর্ম্মসংস্থাপনার্থর উদ্দেশ্যে মানুষ ও তার স্বতোবিরোধী সমাজকে কলুষমুক্ত করতে অবিসম্বাদী চৈতন্যের আবির্ভাব।" ধর্ম্মসংস্থাপনার্থ'র উদ্দেশ্যে মানুষকে কলুষমুক্ত করিতে কি মানুষের তথা বদ্ধজীবের আবির্ভাব হইয়া থাকে? গীতায় কি সেই কথাই উক্ত হইয়াছে? ধর্ম্ম সম্যক্‌প্রকারে স্থাপন করিবার ক্ষমতা কাহার আছে? শ্রীমদ্ভাগবত বলেন,—

"ধর্ম্মন্তু সাক্ষাদ্ভগবৎ প্রণীতং ন বৈ বিদুর্ঋষয়ো নাপি দেবাঃ।
ন সিদ্ধমুখ্যা অসুরা মনুষ্যাঃ কুতো নু বিদ্যাধরচারণাদয়ঃ॥"

(ভাঃ ৬।৩।১৯)

অর্থাৎ—"সত্যধর্ম্মটি সাক্ষাৎ ভগবৎপ্রণীত ; ভৃগু প্রভৃতি সত্ত্বগুণপ্রধান ঋষিগণও ইহা নিশ্চিতরূপে জানেন না, দেবতাগণও জানেন না ; প্রধান প্রধান সিদ্ধগণ, অসুরগণ ও মনুষ্যগণ কেহই জানেন না ; বিদ্যাধর ও

চারণদিগের কথা আর কি বলিব ?" অতএব সাক্ষাৎ ভগবৎপ্রণীত পরধর্ম্ম ভগবান্ ব্যতীত আর কেহই সম্যক্‌প্রকারে স্থাপন করিতে সমর্থ নহে। ধর্ম্ম-সংস্থাপনার্থ চৈতন্যের আবির্ভাব হইয়াছে—ইহা লেখক নিবেদনে স্বীকার করিয়াও পুস্তিকার ১১৪ পৃষ্ঠায় চৈতন্যকে লোকে মানুষ হিসাবে বা সন্ন্যাসী হিসাবে ভাবিল না বলিয়া বিস্ময় প্রকাশ করিতেছেন কেন ? মহাপণ্ডিত বাসুদেব সার্ব্বভৌম জগন্নাথ-মন্দিরে শ্রীচৈতন্যদেবের অষ্টসাত্ত্বিক প্রেমবিকার দর্শন করিয়া তাঁহাকে সাধারণ মানুষ নহেন বলিয়া বুঝিয়াছিলেন, কিন্তু চৈতন্যদেবকে মধ্যম সম্প্রদায়ের সন্ন্যাসী বলিয়া জ্ঞান করিয়াছিলেন। সার্ব্বভৌম গোপীনাথাচার্য্যের নিকট মহাপ্রভুর ভগবত্তা-লক্ষণ শুনিয়াও তাহা মানিতে পারিলেন না। সার্ব্বভৌম মহাপ্রভুকে মহাভাগবত বলিলেও তর্কনিষ্ঠ হৃদয়ে ভগবান্ বলিয়া স্বীকার করিতে পারেন নাই। পরে অবশ্য চৈতন্যদেবের অদ্ভুত পাণ্ডিত্য দর্শনে সার্ব্বভৌম হতচকিত হইয়া পড়েন এবং নিজে পরাজয় স্বীকার করিয়া শ্রীচৈতন্য-চরণে শরণ গ্রহণ করেন। শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু কৃপাপূর্ব্বক সার্ব্বভৌমকে ষড়্‌ভুজ মূর্ত্তি প্রদর্শন করান। তখন সার্ব্বভৌম শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভুকে স্বয়ং ভগবান্ জ্ঞান করিয়া শত শ্লোকে স্তুতি করেন। শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য, কাশীর পণ্ডিত প্রকাশানন্দ, শ্রীরূপ গোস্বামী, সনাতন গোস্বামী, জীব গোস্বামী প্রভৃতি মহা মহাপণ্ডিগতণ শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভুকে ভগবান্ জানিয়া পূজা করিয়াছেন। তাঁহাদের ন্যায় শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিগণের আচরণ ও শিক্ষা সাধারণলোকে অবশ্যই মান্য করিয়া থাকেন। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা বলেন,—

"যদ্ যদাচরতি শ্রেষ্ঠস্তত্তদেবেতরো জনঃ।
স যৎ প্রমাণং কুরুতে লোকস্তদনুবর্ত্ততে॥" (গীতা ৩।২১)

অর্থাৎ—"শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি যেরূপ কর্ম্ম আচরণ করেন, সাধারণ লোক সেইরূপই করিয়া থাকেন। তিনি যাহাকে প্রমাণ বলিয়া স্বীকার করেন, অন্যলোক তাহারই অনুবর্ত্তী হয়।"

চৈতন্যচরিতামৃতে উত্তমাধিকারী বা মহাভাগবতের লক্ষণ-নির্দ্দেশ,—

"যাঁহার দর্শনে মুখে আইসে কৃষ্ণনাম।
তাঁহারে জানিহ তুমি 'বৈষ্ণব-প্রধান॥" (চৈঃ চঃ মঃ ১৬।৭৪)

মহাপ্রভুর দর্শনে লোকের বৈষ্ণবত্ব-লাভ—

"দর্শনে 'বৈষ্ণব' হৈল, বলে 'কৃষ্ণ' 'হরি'।
প্রেমাবেশে নাচে লোক ঊর্দ্ধবাহু করি'॥" (চৈঃ চঃ মঃ ৭।১১৬)

শ্রীরঙ্গনাথধামে জনৈক গীতাপাঠক ব্রাহ্মণকে মহাপ্রভু আলিঙ্গন করিলে মহাপ্রভুকে সেই ব্রাহ্মণের কৃষ্ণ-জ্ঞান হয়,—

"এত বলি' সেই বিপ্রে কৈল আলিঙ্গন।
প্রভু-পদ ধরি' বিপ্র করেন রোদন॥
তোমা দেখি' তাহা হৈতে দ্বিগুণ সুখ হয়।
সেই কৃষ্ণ তুমি,—হেন মোর মনে লয়॥
কৃষ্ণস্ফূর্ত্ত্যে তাঁর মন হঞাছে নির্ম্মল।
অতএব প্রভুর তত্ত্ব জানিল সকল॥" (চৈঃ চঃ মঃ ৯।১০৩-১০৫)

শ্রীরঙ্গক্ষেত্র-নিবাসী বেঙ্কটভট্ট মহাপ্রভুকে কৃষ্ণরূপে দর্শন করেন,—

"ভট্ট কহে—কাঁহা আমি জীব পামর।
কাঁহা তুমি সেই কৃষ্ণ,—সাক্ষাৎ ঈশ্বর॥
অগাধ ঈশ্বর-লীলা কিছুই না জানি।
তুমি যেই কহ, সেই সত্য করি' মানি॥"

(চৈঃ চঃ মঃ ৯।১৫৭-১৫৮)

সাধারণ মানুষ, জ্ঞানী-গুণী, রাজা সকলেই মহাপ্রভুকে মানুষ বা সন্ন্যাসী হিসাবে না ভাবিয়া স্বয়ং ভগবান্‌রূপে ভাবিয়াছেন এবং দর্শন করিয়াছেন—ইহার বহু প্রমাণ শাস্ত্রাদিতে বিদ্যমান্। মহাপ্রভু যুগধর্ম্মের সংরক্ষণ উদ্দেশ্যে এবং মধ্যযুগীয় লৌকিক আচারের জন্য সন্ন্যাসগ্রহণ লীলা করিয়াছিলেন। মহাপ্রভু সন্ন্যাসী হইলেও ত্যাগের Superiority Complex এর ভাব তাঁহার মধ্যে ছিল না। তিনি বারাণসীতে মায়াবাদী সন্ন্যাসীদের দাম্ভিকতা বিনাশ করিবার জন্য নিজে সর্ব্বোত্তম হইয়াও পদপ্রক্ষালন স্থানে উপবেশন করিয়াছিলেন এবং পরিশেষে নিজগুণের দ্বারাই তিনি মায়াবাদী সন্ন্যাসিগণ-কর্ত্তৃক সম্বর্দ্ধিত হইয়াছিলেন। তাই তাঁহার সন্ন্যাস-লীলা সত্যই সার্থক। তাঁহার শিক্ষাষ্টকে সম্বন্ধ-অভিধেয়-প্রয়োজন-তত্ত্বের সমস্ত শিক্ষা সূত্রাকারে বর্ণনা করিয়াছেন। জাগতিক বিচারে একজন খ্যাতনামা ডাক্তারকে লোকে ডাক্তার হিসাবেই ভাবে, তাহাকে সাধারণ মানুষও কোট-টাই-পরা মানুষ হিসাবে ভাবে না। জগতে গুণেরই সমাদর হয়, তাই গুণী ব্যক্তি তাঁর গুণদ্বারাই জগতের লোকের নিকট পরিচিত হন। শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু স্বয়ং ভগবত্তার গুণে সকল লোকের নিকট ভগবান্‌রূপে পূজিত হইয়াছেন, এখনও হইতেছেন এবং ভবিষ্যতেও হইবেন। (ক্রমশঃ)

—শ্রীচৈতন্যকৃষ্ণ দাসাধিকারী

———

শ্রীব্রজমণ্ডলে পুরুষোত্তম-ব্রত-পালন

কলিকল্মষনাশকারিণী অমন্দোদয়দয়া কলিযুগ-পাবনাবতারী শ্রীশচীনন্দন গৌরহরির আবির্ভাব-স্থলীতে যতটা অনুভূত হয়, ঠিক ততটা অনুভব অন্য কোন অবতার বা অবতারীর স্থানে উপলব্ধি হয় না। এই ভারতভূমিতে প্রকৃতি ক্ষণে ক্ষণে তাঁহার রূপ পরিবর্ত্তন করিয়া নিজ অভীষ্টদেবের সেবার জন্য প্রস্তুত। এইরূপে সেবাসুযোগ দানের নিমিত্ত বিশ্ববাসীর নিকট উপস্থিত হলেন সুপ্রতীক্ষিত পুরুষোত্তম-মাস। এই পুরুষোত্তম-মাস বিশ্বব্যাপী পালিত হইলেও, ভারতবর্ষে বিশেষ করিয়া ব্রজভূমিতে যেভাবে পালিত হয়, অন্য কোথাও এরূপ হয় না বলিলেও অত্যুক্তি হইবে না।

বৈষ্ণব-সাত্বত-সম্প্রদায়ে পুরুষোত্তম-ব্রতের বিশেষ মহিমা দেখা যায়। অতএব বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ে পুরুষোত্তম-মাসে বৃষভানুনন্দিনী শ্রীমতী রাধিকাসহ লীলা-পুরুষোত্তম ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণের বিশেষভাবে শ্রবণ-কীর্ত্তন-স্মরণ ও সেবাপূজা প্রভৃতি ভক্ত্যঙ্গ পালন করাই বিধি। ঐকান্তিক ভক্তগণ যেরূপ কার্ত্তিক মাসে নিয়মসেবা পালন করেন, তদ্রূপ পুরুষোত্তম-মাসেও নিয়মসেবা পালন করিয়া থাকেন। পুরুষোত্তম-মাসে শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের যুগল উপাসনাই কর্ত্তব্য। যথা—

আগচ্ছ দেব-দেবেশ শ্রীকৃষ্ণ পুরুষোত্তম।
রাধয়া সহিতশ্চাত্র গৃহাণ পূজনং মম ॥

চান্দ্রমাস ও সৌরমাসে মিল রাখিবার জন্য রবিমাসে ৩২ মাস ১৬ দিন ৪ ঘণ্টা অন্তরে একটী মাস বাদ দিতে হয়। সেই মাসটীর নাম অধিমাস। স্মার্ত্তগণ অধিমাসকে 'মলমাস' বলিয়া পরিত্যাগ করেন। তাহাতে কোন সৎকর্ম্মের বিধান দেন না। কিন্তু পারমার্থিক শাস্ত্রকারগণের বিচারে জীবনের কোন অংশই বৃথা যাপন করা উচিত নয়। সদাসর্ব্বদা হরিভজনে তৎপর থাকাই জীবের কর্ত্তব্য। অধিমাসও হরিভজনের উপযোগী হউক—ইহাই পরমার্থ শাস্ত্রের নিগূঢ় চেষ্টা। তজ্জন্য ইহাঁদের মতে এই মাস কার্ত্তিক, মাঘ ও বৈশাখ মহাপুণ্যমাস অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ। এই মাসের অধিষ্ঠাতৃ দেবতা—লীলা-পুরুষোত্তম নন্দনন্দন স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ।

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির প্রতিষ্ঠাতা অস্মদীয় পরমগুরুদেব নিত্যলীলা-প্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজের

পারমার্থিক মাসিক মুখপত্র "শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকায়" পুরুষোত্তম-মাসের নিয়মাবলী তাঁহারই প্রকটকালে বিশেষভাবে প্রকাশিত হইয়াছিল। তাঁহারই অনুসরণে শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির বর্ত্তমান সভাপতি পরিব্রাজকাচার্য্য ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত বামন গোস্বামী মহারাজের আনুগত্যে সমিতির অধীনস্থ অন্যান্য মঠসমূহে পুরুষোত্তম-ব্রত পালিত হইয়াছে।

এবৎসর ব্রজমণ্ডলের শ্রীধাম মথুরাস্থ শ্রীকেশবজী গৌড়ীয় মঠ, শ্রীধাম বৃন্দাবনস্থ শ্রীরূপ-সনাতন গৌড়ীয় মঠ ও শ্রীগোপীনাথজী গৌড়ীয় মঠ তিনটীতেই সমিতির বর্ত্তমান সহ-সভাপতি ও সাধারণ-সম্পাদক অস্মদীয় শিক্ষাগুরুদেব ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিবেদান্ত নারায়ণ গোস্বামী মহারাজের তত্ত্বাবধানে বিশেষ-ভাবে পালিত হইয়াছে। প্রত্যহ অরুণোদয়ে শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ, চিল্লীলামিথুন শ্রীশ্রীরাধা-বিনোদবিহারীর মঙ্গলারাত্রিক, সঙ্কীর্ত্তনমুখে শ্রীমন্দির পরিক্রমা, কীর্ত্তন, শ্রীমদ্ভাগবত, শ্রীবৃহদ্ভাগবতামৃত পাঠ (প্রত্যহ তিনবার) নিয়মিতরূপে অনুষ্ঠিত হইয়াছে। প্রত্যহ পঞ্চশতাধিক শ্রোতা পাঠ-কীর্ত্তন শ্রবণের জন্য সমবেত হইতেন। উক্ত ব্রতের প্রথমার্দ্ধ পঞ্চদশ দিবস শ্রীধাম মথুরায় ও দ্বিতীয় পঞ্চদশ দিবস বৃন্দাবনে পালন করা হইলেও, ব্রত-সমাপন শ্রীমথুরা মঠেই হইয়াছিল। অস্মদীয় পরমগুরুদেবের সিদ্ধান্তানুযায়ী শ্রীমথুরা মঠ হইল জংশন, এখানে সমস্ত ভক্তগণ সহজেই সমবেত হইতে পারেন। তজ্জন্য ব্রত-সমাপন উৎসব মথুরা মঠেই হইয়াছিল।

এই উপলক্ষে প্রত্যহ দুইবার করিয়া শ্রীমদ্ভাবগত পাঠ সম্পূর্ণ হইয়াছে এবং প্রত্যহ একবার করিয়া 'বৃহদ্ভাগবতামৃতম্' পাঠ হইয়াছে। মথুরায় থাকাকালীন মথুরাধামের পরিক্রমা, বৃন্দাবনে থাকাকালীন বৃন্দাবনধামের পরিক্রমা, মাঝে মাঝে সর্ব্বাভীষ্টপ্রদাতা শ্রীগিরিরাজ-গোবর্দ্ধনের পরিক্রমা করা হইয়াছে। বিশেষ করিয়া কৃষ্ণা-একাদশীতে সামগ্রিকভাবে সঙ্কীর্ত্তনমুখে শ্রীধাম বৃন্দাবন পরিক্রমা ও ত্রয়োদশী-তিথিতে শ্রীগোবর্দ্ধন পরিক্রমা করা হইয়াছে। ব্রত-সমাপ্ত-দিবসে ক্ষৌরকার্য্য করা হয় নাই। গৌড়ীয় সারস্বত বিচারানুযায়ী পূর্ণিমা দিনেই ক্ষৌরকার্য্য অনুষ্ঠিত হইবে। ব্রত-সমাপন উৎসবে দ্বিসহস্রাধিক শ্রদ্ধালু ভক্তগণকে মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হইয়াছে।

—শ্রীনবীনকৃষ্ণদাস ব্রহ্মচারী

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

সাধুসঙ্গে শ্রীকৃষ্ণনাম-কীর্ত্তনসহ শ্রীশ্রীগৌর-নিত্যানন্দ-পদাঙ্কপূত

শ্রীব্রজ ও দ্বারকাধাম-পরিক্রমা

শ্রদ্ধেয় ভক্তবৃন্দ !

আগামী ৩রা কার্ত্তিক (ইং ২১।১০।৯১) শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির বর্ত্তমান সভাপতি-অধ্যক্ষ পরিব্রাজকাচার্য্য ১০৮শ্রী **শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত বামন গোস্বামী মহারাজের** আনুগত্যে ও শ্রীমঠের সাধু-সন্ন্যাসী-ব্রহ্মচারীবৃন্দের পরিচালনায় শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ, তীর্থ-মাহাত্ম্য বর্ণন ও কীর্ত্তনাদিমুখে লাক্সারী সুপার ডিলুক্স বাসযোগে সমিতির মূলকেন্দ্র শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠ, শ্রীধাম নবদ্বীপ (নদীয়া) হইতে ভোর ৫ ঘটিকায় শুভযাত্রা করা হইবে।

অতএব, ধর্ম্মপ্রাণ সজ্জন-ব্যক্তিগণকে এই পরিক্রমায় উল্লিখিত নিয়মাবলী অনুযায়ী যোগদান করিতে অনুরোধ জানান হইতেছে।

—ঃ দর্শনীয় তীর্থস্থানসমূহ ঃ—

শ্রীনবদ্বীপ, গয়া, বুদ্ধগয়া, কাশী, প্রয়াগ, চিত্রকুট, অযোধ্যা, নৈমিষারণ্য, আগ্রা, মথুরা, বৃন্দাবন, গোবর্দ্ধন, রাধাকুণ্ড-শ্যামকুণ্ড, গোকুল, নন্দগ্রাম, বর্ষাণা, করৌলী, জয়পুর, গলতা, পুষ্করতীর্থ, সাবিত্রীদেবী, নাথদ্বার, উদয়পুর, দ্বারকা, বেট্ দ্বারকা, গোপীতলাও, গোমতীগঙ্গা, পোরবন্দর (সুদামাপুরী), সোমনাথ, প্রভাসতীর্থ, বোম্বে (কেবল দর্শন), নাসিক (পঞ্চবটী), উজ্জয়িনী, পুরীধাম, হরিদ্বার, শুকরতল (শ্রীমদ্ভাগবতের ২য় অধিবেশন-ক্ষেত্র) প্রভৃতি।

শুদ্ধভক্তকৃপালেশপ্রার্থী—

সভ্যবৃন্দ,

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি

—ঃ নিয়মাবলী ঃ—

যাত্রিগণের দুইবেলা মহাপ্রসাদ ও বাসভাড়া প্রভৃতির জন্য প্রত্যেককে ২৫০০ টাকা ভিক্ষাস্বরূপ দিতে হইবে। বাসের সামনের ২৫টী আসনের জন্য আসনপ্রতি অতিরিক্ত ২০০ টাকা বেশী দিতে হইবে। এই পরিক্রমায় আনুমানিক ৩০/৩২ দিন সময় লাগিবে। হাল্কা বিছানা, মশারী, থালা, টর্চ্চলাইট সঙ্গে লইবেন। নিজের বিছানাদি নিজকে বহন করিতে হইবে। দুই মাস পূর্ব্ব হইতে যোগাযোগ করিবেন। আসন সংখ্যা সীমিত। ইচ্ছুক যাত্রী সত্বর যথারীতি নাম-ঠিকানা তালিকাভুক্ত করুন।

॥ শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ ॥

ঝুলনযাত্রা ও শ্রীজন্মাষ্টমী উপলক্ষে

সাদর আহ্বান

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি
(রেজিষ্টার্ড)

শ্রীমেঘালয় গৌড়ীয় মঠ,
পোঃ তুরা, পিন্—৭৯৪০০১
জেলা—ওয়েষ্ট গারো হিলস্ (মেঘালয়)

সাদর সম্ভাষণপূর্ব্বক নিবেদন,—

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির সেবকবৃন্দের উদ্যোগে সমিতির সভাপতি-অধ্যক্ষ পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত বামন গোস্বামী মহারাজের আনুগত্যে আগামী ৪ঠা ভাদ্র (ইং ২১।৮।৯১), বুধবার হইতে ৮ই ভাদ্র (ইং ২৫।৮।৯১), রবিবার পর্য্যন্ত পঞ্চদিবসব্যাপী **শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের ঝুলনযাত্রা** ও ১৬ই ভাদ্র (ইং ২।৯।৯১), সোমবার **শ্রীকৃষ্ণের জন্মাষ্টমী** উপলক্ষে শ্রীল আচার্য্যদেবের উপস্থিতিতে উক্ত মঠে শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ, কীর্ত্তন, বক্তৃতা, নগর-সঙ্কীর্ত্তন, ছায়াচিত্র ও বিভিন্ন প্রদর্শনীযোগে স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের জন্মলীলাদি প্রদর্শন এবং বিশেষভাবে শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-রাধা-বিনোদ-বিহারীজীউর মঙ্গলারাত্রিক, ভোগরাগ ও শ্রীনন্দোৎসব-দিবসে সর্ব্বসাধারণকে মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হইবে।

অতএব, ধর্ম্মপ্রাণ সজ্জন মহোদয়গণ উক্ত শুদ্ধভক্ত্যনুষ্ঠানে সবান্ধব যোগদান করিয়া সমিতির সেবকবৃন্দকে পরমানন্দিত ও উৎসাহিত করিবেন। এই মহদনুষ্ঠানের গুরুত্ব উপলব্ধি করিয়া প্রাণ, অর্থ, বুদ্ধি ও বাক্যদ্বারা সমিতির সেবাকার্য্যে সহানুভূতি প্রদর্শন করিলেও ভগবৎ সেবোন্মুখী সুকৃতি অর্জ্জিত হইবে। বিশেষ অনুষ্ঠান-সূচী পরপৃষ্ঠায় প্রদত্ত হইল। ইতি—৩২শে আষাঢ়, ১৩৯৮

শুদ্ধভক্তকৃপালেশপ্রার্থী—

সভ্যবৃন্দ,

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি

দ্রষ্টব্যঃ—কোন বিষয়ে জানিতে হইলে বা আনুকূল্যাদি পাঠাইতে ইচ্ছা করিলে **শ্রীবলভদ্রদাস ব্রহ্মচারী**র নিকট উপরোক্ত ঠিকানায় জ্ঞাতব্য বা প্রেরিতব্য।

—ঃ শ্রীজন্মাষ্টমীর অনুষ্ঠান-সূচী ঃ—

১৫ই ভাদ্র (ইং ১।৯।৯১), রবিবার—

ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে—যথারীতি মঙ্গলারতি ও কীর্ত্তন।

পূর্ব্বাহ্নে—শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও শ্রীনাম সঙ্কীর্ত্তন।

অপরাহ্নে—মহাজন-পদাবলী কীর্ত্তন।

গোধূলিলগ্নে—সন্ধ্যারতি ও গীতিকীর্ত্তন।

রাত্রে—শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও অধিবাস-কীর্ত্তন।

১৬ই ভাদ্র (ইং ২।৯।৯১), সোমবার—

মঙ্গলারতি—ভোর ৪ টায়।

নগর-সঙ্কীর্ত্তন—মঙ্গলারতি অন্তে প্রাতঃ হইতে পূর্ব্বাহ্ণ ৮টা পর্য্যন্ত নগর-পরিক্রমা।

পূর্ব্বাহ্ণ—৮-৩০টার পর সম্পূর্ণ দিবস শ্রীকৃষ্ণপ্রেমতরঙ্গিণী হইতে শ্রীকৃষ্ণ-জন্মলীলাপ্রসঙ্গ পারায়ণ।

সন্ধ্যায়—আরাত্রিক ও শ্রীহরিনাম কীর্ত্তন।

রাত্রি—৮টা হইতে ধর্ম্মসভা, রামমঙ্গল ও ছায়াচিত্রযোগে শ্রীকৃষ্ণলীলা প্রদর্শন।

১৭ই ভাদ্র (ইং ৩।৯।৯১), মঙ্গলবার—

ভোর ৪টায় মঙ্গলারতি।

পূর্ব্বাহ্নে—শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও কীর্ত্তন।

মধ্যাহ্নে—ভোগারতি ও মহাপ্রসাদ বিতরণ

সন্ধ্যায়—আরাত্রিক ও কীর্ত্তনান্তে ধর্ম্মসভা, পরে ছায়াচিত্রযোগে শ্রীগৌরলীলা প্রদর্শন ও রামমঙ্গল।

বিঃ দ্রঃ—দৈব ও বিশেষ কার্য্যানুরোধে অনুষ্ঠান-সূচী পরিবর্ত্তনযোগ্য।

॥ শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ ॥

স বৈ পুংসাং পরো ধর্ম্মো যতো ভক্তিরধোক্ষজে।

ধর্ম্মঃ স্বনুষ্ঠিতঃ পুংসাং বিষ্বক্সেন-কথাসু যঃ।

গৌড়ীয়-পত্রিকা

নোৎপাদয়েদ্ যদি রতিং শ্রম এব হি কেবলম্॥

অহৈতুক্যপ্রতিহতা যয়াত্মা সুপ্রসীদতি॥

সেই ধর্ম্ম শ্রেষ্ঠ যাতে আত্ম-পরসন্ন।
অধোক্ষজে অহৈতুকী ভক্তি বিঘ্নশূন্য॥

অন্য ধর্ম্ম সুষ্ঠুরূপে পালে যেই জন।
হরি-কথায় রতি নৈলে পণ্ড সেই শ্রম॥

৪৩শ বর্ষ | ২ শ্রীধর, ক্ষীরোদশায়ী, ৫০৫ শ্রীগৌরাব্দ | ৬ষ্ঠ সংখ্যা
৩১ শ্রাবণ, শনিবার, ১৩৯৮, ইং ১৭।৮।৯১

শ্রীশ্রীজন্মাষ্টমী-ব্রত-কৃত্যম্

[শ্রীব্রহ্মবৈবর্ত্ত-পুরাণে শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ডে নারায়ণ-নারদ-সংবাদে জন্মাষ্টমী-ব্রতাদি-নিরূপণ-প্রস্তাবোঽষ্টমোঽধ্যায়ে]

শ্রীনারদ উবাচ,—

১। জন্মাষ্টমী-ব্রতং ব্রূহি ব্রতানাং ব্রতমুত্তমম্।
ব্রত-পূজা-বিধানঞ্চ সংযমস্য চ সাম্প্রতম্।
উপবাস-পারণয়োঃ সুবিচার্য্য বদ প্রভো॥ ১,৩॥

শ্রীনারদ বলিলেন,—মহর্ষে! ব্রতসমূহের মধ্যে সর্ব্বোত্তম জন্মাষ্টমী-ব্রত সম্বন্ধে আমাকে বলুন। প্রভো! সম্প্রতি ব্রত, পূজা-বিধান, সংযম, উপবাস ও পারণের বিধি যাহা আছে, তৎসমস্ত সুন্দররূপে বিচার করিয়া আমাকে বলুন॥ ১,৩॥

শ্রীনারায়ণ উবাচ,—

২। স্নাত্বা নিত্যক্রিয়াং কৃত্বা নির্ম্মায় সূতিকাগৃহম্।
লৌহ-খড়্গং বহ্নিজালৈর্যুক্তং রক্ষকসঞ্চয়ৈঃ ॥ ৮ ॥
৩। তত্র দ্রব্যং বহুবিধং নাড়িচ্ছেদন-কর্ত্তনীম্।
ধাত্রীস্বরূপাং নারীঞ্চ যত্নতঃ স্থাপয়েদ্‌বুধঃ ॥ ৯ ॥

শ্রীনারায়ণ বলিলেন,—ব্রতপালনকারী পণ্ডিত ব্যক্তি জন্মাষ্টমী-দিবসে স্নানান্তে নিত্যক্রিয়া সম্পাদনপূর্ব্বক সূতিকা-গৃহ নির্ম্মাণ করিয়া তাহাতে লৌহ, খড়্গ, অগ্নি ও রক্ষকসমূহ স্থাপন করিবে এবং সেই গৃহে বহুবিধ দ্রব্য, নাড়ী-চ্ছেদনের নিমিত্ত কর্ত্তনী ও ধাত্রীরূপা একটী স্ত্রী যত্নপূর্ব্বক স্থাপন করিবে ॥ ৮-৯ ॥

৪। পূজাদ্রব্যাণি চারূণি সোপচারাণি ষোড়শ।
ফলান্যষ্টৌ চ মিষ্টানি দ্রব্যান্যেব হি নারদ ॥ ১০ ॥

হে নারদ! তৎপরে ষোড়শোপচারে * পূজার যোগ্য সুচারু দ্রব্য, অষ্ট ফল †, সুমিষ্ট দ্রব্যসমূহ সেই গৃহে স্থাপন করিবে ॥ ১০ ॥

৫। ঘটমারোপণং কৃত্বা সম্পূজ্য পঞ্চ দেবতাঃ।
ঘট-আবাহনং কৃত্বা শ্রীকৃষ্ণং পরমেশ্বরম্ ॥ ১৫ ॥

পরে ঘটস্থাপন করত তাহাতে (বিঘ্ন বিনাশের জন্য) পঞ্চ দেবতার পূজা করিয়া সেই ঘটে পরমেশ্বর শ্রীকৃষ্ণকে আহ্বান করিবে ॥ ১৫ ॥

৬। ধ্যানঞ্চ সামবেদোক্তং শৃণু বক্ষ্যামি নারদ।
ব্রহ্মণা কথিতং পূর্ব্বং কুমারায় মহাত্মনে ॥ ১৯ ॥

হে নারদ! সেই সাম-বেদোক্ত ধ্যান প্রথমতঃ ব্রহ্মা সনৎকুমারকে বলিয়াছিলেন, এক্ষণে আমি তোমাকে বলিতেছি, শ্রবণ কর ॥ ১৯ ॥

৭। "বালং নীলাম্বুদাভং অতিশয়-রুচিরং স্মেরবক্ত্রাম্বুজং তং,
ব্রহ্মেশানন্ত-ধর্ম্মৈঃ কতি কতি দিবসৈঃ স্তূয়মানং পরং যৎ।
ধ্যানাসাধ্যং ঋষীন্দ্রৈর্মুনি-মনুজবরৈঃ সিদ্ধসঙ্ঘৈরসাধ্যং,
যোগীন্দ্রাণামচিন্ত্যং অতিশয়মতুলং সাক্ষিরূপং ভজেঽহম্" ॥২০॥

---

* আসন, বস্ত্র, পাদ্য, মধুপর্ক, অর্ঘ্য, আচমনীয়, স্নানীয় জল, শয্যা, গন্ধ, পুষ্প, নৈবেদ্য, তাম্বূল, অনুলেপন, ধূপ, দীপ, ভূষণ—এই ষোড়শোপচার।

† জাতীফল, কঙ্কোল (কাকলা), দাড়িম্ব, শ্রীফল, নারিকেল, জম্বীর, কুষ্মাণ্ড—এই অষ্ট ফল।

শ্রীকৃষ্ণ বালকরূপী, তাঁহার নীলনীরদসদৃশ অতি রুচির কলেবর, মুখমণ্ডল বিকশিত-পদ্মসদৃশ মনোহর; ব্রহ্মা, শিব, অনন্ত প্রভৃতি দেবগণ বহুদিবস নিরন্তর তাঁহাকে স্তব করিতেছেন; তিনি ঋষীন্দ্র, মুনি ও মনুজবর্গের ধ্যানাসাধ্য ও সিদ্ধসমূহের অসাধ্য। তিনি যোগিগণের অচিন্ত্য অতিশয় অতুল ও সাক্ষীরূপ; তাঁহাকে আমি ভজনা করিতেছি ॥ ২০ ॥

৮। ধ্যাত্বা পুষ্পঞ্চ দত্ত্বা তু তৎসর্ব্বং মন্ত্রপূর্ব্বকম্।
দত্ত্বা ব্রতী ব্রতং কুর্য্যাচ্ছৃণু মন্ত্রং যথাক্রমম্ ॥ ২১ ॥

ব্রতী এই ধ্যান করিয়া পুষ্পদান করিবে এবং অন্য সমস্ত যথাক্রমে (ষোড়শোপচারের প্রত্যেকটী) মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া দানপূর্ব্বক ব্রত করিবে ॥২১॥

৯। সুনন্দ-নন্দ-কুমুদান্ গোপান্ গোপীশ্চ রাধিকাম্।
গণেশং কার্ত্তিকেয়ঞ্চ ব্রহ্মাণঞ্চ শিবং শিবাম্ ॥ ৪৩ ॥

১০। লক্ষ্মীং সরস্বতীঞ্চৈব দিক্‌পালাংশ্চ গ্রহাংস্তথা।
শেষং সুদর্শনঞ্চৈবং পার্ষদপ্রবরাংস্তথা ॥ ৪৪ ॥

১১। সম্পুজ্য সর্ব্বদেবাংশ্চ প্রণম্য দণ্ডবদ্‌ভুবি।
ব্রাহ্মণেভ্যশ্চ নৈবেদ্যং দত্ত্বা দদ্যাচ্চ দক্ষিণাম্ ॥ ৪৫ ॥

তৎপরে নন্দ, সুনন্দ, কুমুদ প্রভৃতি গোপগণ, গোপিকাগণ, রাধিকা, গণেশ, কার্ত্তিকেয়, ব্রহ্মা, শিব, শিবা, লক্ষ্মী, সরস্বতী, দিক্‌পাল, গ্রহগণ, অনন্ত, সুদর্শন ও কৃষ্ণপারিষদশ্রেষ্ঠদিগকে যথানিয়মে পূজা করিবে। সকল দেবতাকে পূজা করত ভূমিতে দণ্ডবৎ-প্রণাম করিবে এবং বৈষ্ণব-ব্রাহ্মণদিগকে নৈবেদ্য ও দক্ষিণা প্রদান করিবে ॥ ৪৩-৪৫ ॥

১২। কথাঞ্চ জন্মাধ্যায়োক্তাং (তৃতীয়োঽধ্যায়ং) শৃণুয়াদ্-ভক্তিভাবতঃ।
তদা কুশাসনে স্থিত্বা কুর্য্যাজ্জাগরণং ব্রতী ॥ ৪৬ ॥

১৩। প্রভাতে চাহ্নিকং কৃত্বা সম্পুজ্য শ্রীহরিং সদা।
ব্রাহ্মণান্ ভোজয়িত্বা চ চকার হরিকীর্ত্তনম্ ॥ ৪৭ ॥

তৎপরে ব্রতী ভক্তিভাবে জন্মাধ্যায়োক্ত-কথা (শ্রীমদ্ভাগবতের শ্রীকৃষ্ণের জন্মলীলা-বর্ণিত তৃতীয় অধ্যায়) শ্রবণ করত ব্রত-দিবসে কুশাসনে অবস্থান করিয়া জাগরণ করিবে এবং তাহার পরদিন প্রভাতকালে

আহ্নিকাদি সম্পাদনপূর্ব্বক শ্রীহরির পূজা করিবে, তাহার পর বৈষ্ণব-ব্রাহ্মণ ভোজন করাইয়া হরি-সঙ্কীর্ত্তন করিবে ॥ ৪৬-৪৭ ॥

১৪। 'বর্জ্জনীয়া' প্রযত্নেন 'সপ্তমীসহিতাষ্টমী'।
সা সর্ক্ষাপি ন কর্ত্তব্যা সপ্তমীসহিতাষ্টমী।
অবিদ্ধায়ান্তু সর্ক্ষায়াং জাতো দৈবকীনন্দনঃ ॥ ৫৪ ॥

ব্রতী সপ্তমীযুক্ত অষ্টমী যত্নপূর্ব্বক বর্জ্জন করিবে। সপ্তমীসহ অষ্টমী রোহিণীনক্ষত্রযুক্তা হইলেও সর্ব্বতোভাবে বর্জ্জনীয়া। দৈবকীনন্দন 'সপ্তমী-অবিদ্ধায়' (সপ্তমীবিদ্ধা অষ্টমীতে নহে) রোহিণী নক্ষত্রে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন ॥ ৫৪ ॥

১৫। বেদ-বেদাঙ্গ-গুপ্তেঽতিবিশিষ্টে মঙ্গলে ক্ষণে।
ব্যতীতে পদ্মযোনৌ চ ব্রতী কুর্য্যাচ্চ পারণম্ ॥ ৫৫ ॥
১৬। তিথ্যন্তে চ হরিং স্মৃত্বা কৃত্বা দেবাসুরার্চ্চনম্।
'পারণং' পাবনং পুংসাং সর্ব্বপাপ-প্রণাশনম্ ॥ ৫৬ ॥

ব্রতী বেদ ও বেদার্থাদিতে সুগুপ্ত অতি বিশিষ্ট মঙ্গল-লক্ষণ রোহিণী নক্ষত্র অতীত হইলে 'পারণ' করিবে ; তিথি অন্ত হইলে হরিকে স্মরণ করত দেব-অর্চ্চনা করিয়া 'পারণ' করিবে ॥ ৫৫-৫৬ ॥

হিন্দু

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর ইংরাজী ১৮৭৪ সালে ২৬শে জুন 'অমৃত-বাজার পত্রিকা'য় '**হিন্দু**'-শব্দের তাৎপর্য্য সম্বন্ধে নিম্নলিখিত বিবরণ প্রদান করিয়াছিলেন,—

অনেক দিবস হইল 'হিন্দু'-শব্দের মূল লইয়া পণ্ডিত-মণ্ডলীতে তর্ক-বিতর্ক হইতেছে। কেহ বলেন,—সিন্ধুনদী হইতে, কেহ বলেন,—হিন্দুকুশ পর্ব্বত হইতে, কেহ বলেন,—ইন্দু শব্দ হইতে 'হিন্দু'-শব্দের উৎপত্তি। কেহ কেহ বলেন যে, যবনেরা ঘৃণা করিয়া আমাদিগকে হিন্দু বলিত। কোন কোন পণ্ডিত তন্ত্রশাস্ত্র হইতে এই শ্লোকটী উদ্ধৃত করিয়া হিন্দু-শব্দের ব্যাখ্যা করেন। "হীনান্ ধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য হিন্দুঃ স পরিকীর্ত্তিতঃ।" ইহাতেও সন্দেহ দূর হয়

না। সম্প্রতি আমরা নিম্নলিখিত চারিটী শ্লোকে হিন্দু শব্দের অর্থ দেখিয়া সন্তুষ্ট হইলাম।

উত্তরে ভারতস্যাস্য হিমাদ্রি দিব্যদর্শনঃ।
দক্ষিণে বর্ত্ততে বিন্দুসরস্তীর্থো মনোহরঃ॥
এতয়োর্ম্মধ্যভাগে যো বসতিং কুরুতে নরঃ।
আদ্যন্তবর্ণ-সংযোগাৎ হিন্দুনাম্না মহীয়তে॥
শুদ্ধার্য্যকুলসম্ভূতঃ শুদ্ধাচারপরায়ণঃ।
ভারতে বর্ত্ততে হিন্দুর্বর্ণাশ্রমবিভাগশঃ॥
পূজনীয়ঃ সদা হিন্দুঃ সর্ব্বেষাং দ্বিপদামপি।
শিক্ষকঃ সর্ব্বজাতীনাং মহীতল-নিবাসিনাম্॥

অর্থ—

"এই ভারতবর্ষের উত্তরাংশে হিমাদ্রি নামে দিব্যদর্শন পর্ব্বত আছে। দক্ষিণাংশে বিন্দুসর-নামে এক মনোহর তীর্থ আছে। যে ব্যক্তি এই দুইয়ের মধ্যে বাস করেন, তিনি হিমালয়ের আদ্যক্ষর ও বিন্দুর শেষাক্ষর সংযোগদ্বারা হিন্দু নামের মাহাত্ম্য প্রাপ্ত হন। শুদ্ধ আর্য্যকুলসম্ভূত ও শুদ্ধাচারপরায়ণ হিন্দু বর্ণাশ্রম বিভাগ করত ভারতবর্ষে অবস্থিতি করিতেছেন। হিন্দু মনুষ্যমাত্রেরই পূজনীয় এবং সমস্ত জাতির শিক্ষক।"

হিমালয় পর্ব্বত যে-স্থলে আছে, তাহা সকলেই জানেন, কিন্তু বিন্দুসর কোথায় তাহা নির্ণয় করা আবশ্যক। ভাগবতে ৩য় স্কন্ধে ২১শ অধ্যায়ে কর্দ্দম-প্রজাপতি-সংবাদে এরূপ কথিত আছে,—

তস্মিন্ বিন্দুসরো নাম সরস্বত্যা পরিপ্লুতম্।
পুণ্যং শিবামৃতজলং মহর্ষিগণ-সেবিতম্॥ ৩৭॥

এতদ্দৃষ্টে বোধ হয় যে, সরস্বতী নদীর সন্নিকটেই বিন্দুসর। সম্প্রতি গুর্জ্জর রাষ্ট্রদেশে বিন্দুসর দৃষ্ট হয়। আমাদের বিবেচনায় ঐ বিন্দুসরই হিন্দুস্থানের দক্ষিণসীমা। ঐ সীমা ধরিলে আর্য্যাবর্ত্ত ও ব্রহ্মাবর্ত্ত দুই খণ্ডই হিন্দুস্থানের মধ্যবর্ত্তী হয়।

শাস্ত্রে 'হিন্দু'-শব্দের উল্লেখ না থাকার হেতু এই যে, আর্য্যগণ হিন্দুস্থানে আসিবার পূর্ব্বেই বেদসমূহ রচিত হইয়াছিল। যৎকালে পুরাণ ও ধর্ম্ম-শাস্ত্রসকল লিখিত হয়, তখন আর্য্য-বংশীয়েরা আর্য্যাবর্ত্ত ও ব্রহ্মাবর্ত্ত অতিক্রম করিয়া স্থানে স্থানে বাস করিয়াছিলেন। এজন্য তৎপূর্ব্বে নির্ণীত 'হিন্দু'-নামটী অসম্যক্ হইবে বোধ করিয়া পুরাণাদিতে ব্যবহার করেন নাই। এতৎপ্রযুক্ত 'হিন্দু'-নামটী কেবল বাচনিক ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

দর্শন—শাস্ত্র

দর্শন-শাস্ত্র যে ভারতে জন্মগ্রহণ করিয়াছে, ইহাতে সন্দেহ নাই। দর্শন বস্তুতঃ বহুবিধ হইলেও স্থূল-সূক্ষ্ম বিষয় বিচারদ্বারা ছয় শ্রেণীতে বিভক্ত হইয়াছে। ভারতে ষড়্‌দর্শন বলিয়া সেই ছয়টী শ্রেণী দেদীপ্যমান। গ্রীসদেশেও সেই ছয়টী দর্শন সম্মানিত হইয়াছে। সম্প্রতি বিশেষ গবেষণাদ্বারা প্রুশদেশীয় অধ্যাপক গার্ব্ব নির্ণয় করিয়াছেন যে, এরিষ্টটল গৌতমের ন্যায়-শাস্ত্রের শিষ্য, থেলিস কণাদের বৈশেষিক-শাস্ত্রের শিষ্য, সক্রেটিস মীমাংসা-শাস্ত্রে জৈমিনির শিষ্য, প্লেটো বেদান্ত-শাস্ত্রে ব্যাসের শিষ্য, পিথাগোরাস সাংখ্য-শাস্ত্রে কপিলের শিষ্য এবং জিনো যোগশাস্ত্রে পাতঞ্জলির শিষ্য।

ঐ সকল গ্রীক্ পণ্ডিত কোন্ সময়ে ও কি অবস্থায় ভারতে আসিয়া শিক্ষা-লাভ করিয়াছিলেন তাহা ক্রমশঃ জানা যাইবে। তাঁহাদের সাক্ষাৎ গুরুদিগের নামই বা কি, তাহা এখন অনুসন্ধেয়। **পাশ্চাত্ত্যদেশের সর্ব্বপ্রকার জ্ঞান যে ভারত হইতে গিয়াছে, তাহা সকল সহৃদয় পণ্ডিতগণ স্বীকার করেন।** দর্শন-শাস্ত্রের গুরুগণ সময় সময় ম্লেচ্ছশিষ্য স্বীকার করিয়াছিলেন, ইহা অনেক পুরাতন আখ্যায়িকাতে আছে। ঐ সমস্ত আখ্যায়িকা ভাল করিয়া বিচার করিলে অনেক বিষয় জানা যায়।

ছান্দোগ্যে ইন্দ্র ও বিরোচনের প্রজাপতির নিকট তত্ত্বশিক্ষার যে আখ্যায়িকা আছে তাহাতে স্পষ্ট দেখা যায় যে, বিরোচন ম্লেচ্ছ-বুদ্ধির স্থূলতাক্রমে এই জড়দেহকে আত্মা বলিয়া স্থির করত মৃত্যুর পর জড়দেহের সংরক্ষণ-ব্যবস্থা তদীয় ছাত্রদিগকে শিক্ষা দিয়াছিলেন। বোধ হয়, তাঁহার ইজিপ্ট-দেশীয় শিষ্যগণ সেই শিক্ষা-ক্রমে "মামি" অর্থাৎ মৃতদেহ-সংরক্ষণ-প্রথা স্বদেশে প্রচার করিয়াছিলেন। সেই প্রথা একটু পরিবর্ত্তন করিয়া অন্যান্য ম্লেচ্ছখণ্ডে কবর দিবার বিধি হইয়াছে। বিজ্ঞানশাস্ত্র যত উন্নত হইবে, এই সমস্ত ততই স্পষ্ট বোধ হইবে।

—জগদ্‌গুরু শ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুর

চাতুর্ম্মাস্য

সর্ব্ব-শাস্ত্রেই চাতুর্ম্মাস্যের উল্লেখ

বেদ-শাস্ত্রে অনেক স্থলে চাতুর্ম্মাস্য-যাজির কথা এবং চাতুর্ম্মাস্যের কর্ম্মাঙ্গত্ব উল্লিখিত আছে। **ধর্ম্ম-শাস্ত্রেও** সৎকর্ম্মীর চাতুর্ম্মাস্য-ব্যবস্থার অভাব নাই। **পুরাণের** মধ্যেও নানাস্থলে চাতুর্ম্মাস্য ব্রতের কথা দেখিতে পাওয়া যায়।

আধুনিক **স্মৃতি-নিবন্ধেও** চাতুর্ম্মাস্য-বিধান, পরমার্থী ও স্মার্ত্তগণের অপরিচিত নহে। পরমার্থস্মৃতি **শ্রীহরিভক্তিবিলাস** অথবা রঘুনন্দনের **কৃত্য-তত্ত্বেও** আমরা চাতুর্ম্মাস্য-ব্রতের কথা দেখিতে পাই।

কর্ম্মী, জ্ঞানী—একদণ্ডী ও ভক্ত—ত্রিদণ্ডী সকলের জন্যই চাতুর্ম্মাস্য-ব্রত

কর্ম্মকাণ্ডীয় বিচারেই যে কেবল চাতুর্ম্মাস্য-যাজির ফল কথিত হইয়াছে, এরূপ নহে। কাঠক গৃহ্যসূত্রেও আমরা যতিধর্ম্ম নিরূপণে পাঠ করি যে—,

"একরাত্রং বসেদ্ গ্রামে নগরে পঞ্চরাত্রকম্।
বর্ষাভ্যোঽন্যত্র বর্ষাসু মাসাংশ্চ চতুরো বসেৎ॥"

একদণ্ডী জ্ঞানিগণ ও ত্রিদণ্ডী ভক্তগণ উভয়েই চাতুর্ম্মাস্য-ব্রত ধারণ করেন। শ্রীশঙ্কর-মতাবলম্বিগণের মধ্যে চাতুর্ম্মাস্য ব্রতের ব্যবস্থা আছে।

শ্রীগৌরসুন্দরের চাতুর্ম্মাস্য

শ্রীভগবান্ গৌরসুন্দরও চাতুর্ম্মাস্য উপস্থিত হইলে কাবেরীতে শ্রীরঙ্গ-মন্দিরে চারিমাস কাল বাস করিয়াছেন। শ্রীগৌড়ীয় ভক্তগণ চারিমাস কাল শ্রীনীলাচলে শ্রীগৌর-পাদপদ্মে প্রত্যেক বৎসরেই গমন করিতেন ও তথায় তাঁহাদের অবস্থানের কথা লীলা-লেখকগণের গ্রন্থে দেখিতে পাওয়া যায়।

চারি আশ্রমের হিন্দুমাত্রেরই চাতুর্ম্মাস্য-ব্রত

চারিপ্রকার আশ্রমেই চাতুর্ম্মাস্য ব্রত গ্রহণের ব্যবস্থা আছে। কষ্টসাধ্য বলিয়া ঐসকল প্রাচীন রীতি ক্রমশঃ সমাজ-বক্ষ হইতে সুদূরে চলিয়া যাইতেছে। ফলকামী কর্ম্মিগণে অথবা নিষ্কাম ভক্ত-সম্প্রদায়ে ব্রত-পালনের অনুষ্ঠান কিছু কিছু ভিন্ন হইলেও ব্রতের সম্মান হিন্দুমাত্রেই সকলেই করিয়া থাকেন।

চাতুর্ম্মাস্যে ভোগ-পরিত্যাগের আদর্শ

ইহাতে ভোগ-ত্যাগের বিধান পূর্ণমাত্রায় অভিব্যক্ত হইয়াছে। ভোগ-ত্যাগ-বিধান—কর্ম্মী, জ্ঞানী ও ভক্ত ত্রিবিধ সমাজেই সমধিক আদরের বস্তু। সুতরাং ত্রিবিধ পথাবলম্বী আর্য্যগণ সকলেই চারি আশ্রমে চাতুর্ম্মাস্যের সম্মান করেন। যাঁহারা নিতান্ত অসমর্থ, তাঁহারা সুদীর্ঘকাল নিয়মের অধীন হওয়া সুবিধাজনক মনে না করায় ক্রমশঃ ঐসকল ব্রতাদিতে শিথিলভাব প্রদর্শন করিতেছেন।

গৃহস্থের ভোগ,—ত্যাগেরই উদ্দেশ্যে

আশ্রম-চতুষ্টয়ের মধ্যে তিনটী আশ্রমে অর্থাৎ ব্রহ্মচারী, বানপ্রস্থ ও ভিক্ষুর আশ্রমে ভোগ-মাহাত্ম্য নাই। কেবল গৃহস্থের কর্ত্তব্য-পালন-বিষয়ে যে নির্দ্দিষ্ট ভোগের ভাব আদিষ্ট আছে, তাহাও ভোগ-ত্যাগের উদ্দেশ্যে। যাঁহারা আটমাস কালের মধ্যে গৃহধর্ম্ম পালন করিবার মধ্যে মধ্যে অধিকার পান, তাঁহারাও বৎসরের বর্ষাকাল বা চারিমাস ভোগ-ত্যাগ-বিধি পালন করিয়া **অবশিষ্ট আশ্রমিগণের সহ ত্যক্তভোগ হইয়া বাস করেন।**

অসমর্থ-পক্ষে কার্ত্তিক অর্থাৎ ঊর্জ্জা-বিধি পালন কর্ত্তব্য

যিনি চারিমাস কাল নিয়মসেবা পালন করিতে অসমর্থ, তাঁহারও কেবল ঊর্জ্জাবিধি বা কার্ত্তিক মাসে বিশেষভাবে নিয়ম-সেবা পালন করাই বিধি। **ভক্তগণ কেহ কেহ চাতুর্ম্মাস্য-ব্রত গ্রহণ করিতে অসমর্থ হইয়া কেবল দামোদর-ব্রত গ্রহণ করেন, তাহা দেখিয়া কেহ যেন মনে না করেন যে, ভক্তগণের চাতুর্ম্মাস্য-বিধানের আবশ্যকতা নাই।** উহা অসমর্থের অনুকল্প বিধিমাত্র। চারিমাস কাল নিয়মাধীন হইয়া হরিসেবা করিলে নিসর্গতঃ মনের ধর্ম্মে হরিসেবন-প্রবৃত্তি দেখা দিবে। জীব নৈসর্গিক হরি-পরায়ণতা প্রদর্শন করিতে পারিবেন।

চাতুর্ম্মাস্যের কাল নিরূপণ

চাতুর্ম্মাস্যের কাল বরাহ-পুরাণে এইরূপ লিখিত আছে—

"আষাঢ়-শুক্লদ্বাদশ্যাং পৌর্ণমাস্যামথাপি বা।
চাতুর্ম্মাস্য-ব্রতারম্ভং কুর্য্যাৎ কর্কট-সংক্রমে॥
অভাবে তু তুলার্কেঽপি মন্ত্রেণ নিয়মং ব্রতী।
কার্ত্তিকে শুক্লদ্বাদশ্যাং বিধিবত্তৎ সমাপয়েৎ॥"

আষাঢ় মাসে শুক্লা দ্বাদশী-তিথি হইতে কার্ত্তিকের শুক্লাদ্বাদশী পর্য্যন্ত চারিটী

চান্দ্রমাসে এই ব্রত-নিয়ম পালন করিবে। অথবা আষাঢ়-পূর্ণিমা হইতে কার্ত্তিক-পূর্ণিমা পর্য্যন্ত চারিটী চান্দ্রমাস কাল এই ব্রতের সময়। অথবা কর্কট-সংক্রান্তি অর্থাৎ সৌর শ্রাবণ হইতে সৌর কার্ত্তিক শেষ পর্য্যন্ত শ্রীচাতুর্ম্মাস্য ব্রতের কাল। যাঁহারা চারিমাস কাল উপরি লিখিত তিনপ্রকার বিচার অবলম্বনে **চাতুর্ম্মাস্য-ব্রতে অসমর্থ,** তাঁহারা নিয়ম-সেবা-পালনপর হইয়া কার্ত্তিক মাসে স্বীয় মন্ত্র-জপাদিদ্বারা বিধিপূর্ব্বক ব্রত গ্রহণ করিবেন। **উর্জ্জাব্রত বিশেষতঃ কর্ত্তব্য, ইহা চতুঃষষ্টিপ্রকার ভক্ত্যঙ্গের অন্যতম** বলিয়াও উল্লিখিত আছে। কার্ত্তিক শুক্লা দ্বাদশী হইতে ব্রত পরিহার করিতে আরম্ভ করিবেন অর্থাৎ পঞ্চবিংশ দিবস অবশ্যই ব্রত পালন করিবেন।

হরি-শয়নে চাতুর্ম্মাস্য-ব্রতের অকরণে প্রত্যবায়

শ্রীভগবান্ বর্ষার চারিমাস কাল শয়ন করেন। সেই শয়নকালে কৃষ্ণসেবা-প্রবৃত্তি বৃদ্ধির জন্য চাতুর্ম্মাস্য-ব্রত গ্রহণ কর্ত্তব্য। ইহা নিত্য ব্রত। ব্রতের অকরণে প্রত্যবায় আছে। শাস্ত্র বলেন,—

ইত্যাশ্বাস্য প্রভোরগ্রে গৃহ্নীয়ান্নিয়মং ব্রতী।
চতুর্ম্মাসেষু কর্ত্তব্যং কৃষ্ণভক্তিবিবৃদ্ধয়ে॥ (হঃ ভঃ বিঃ ১৫/৫৯)

অর্থাৎ—ব্রতী ব্যক্তি "হে জগন্নাথ! আপনি শয়ন করিলে এই জগৎ সুপ্ত হয় এবং আপনার জাগরণে জগৎ জাগরিত হয়। হে অচ্যুত! আমার প্রতি প্রসন্ন হউন্"—এইরূপ আশ্বাস করিয়া প্রভুর অগ্রে কৃষ্ণভক্তি-বৃদ্ধির নিমিত্ত চারিমাসে কর্ত্তব্য-কার্য্যের নিয়ম গ্রহণ করিবেন।

যো বিনা নিয়মং মর্ত্ত্যো ব্রতং বা জপ্যমেব বা।
চাতুর্ম্মাস্যং নয়েন্মূর্খো জীবন্নপি মৃতো হি সঃ॥
(হঃ ভঃ বিঃ ১৫/৬০ সংখ্যা-ধৃত ভবিষ্যপুরাণ-বচন)

অর্থাৎ যে ব্যক্তি নিয়ম, ব্রত কিংবা জপ ব্যতিরেকে চাতুর্ম্মাস্যাদি যাপন করে, সে মূর্খ এবং জীবিত অবস্থায়ই মৃততুল্য।

ব্রতে গ্রহণীয় ও বর্জ্জনীয়

ব্রতের **গ্রহণীয়** বিধিতে—ভগবানের নিয়ম, সেবা ও জপ-সঙ্কীর্ত্তনাদি। স্কন্দপুরাণ ব্রহ্ম-নারদ-সংবাদে,—

জপ-হোমাদ্যনুষ্ঠানং নাম-সঙ্কীর্ত্তনন্তথা।
স্বীকৃত্য প্রার্থয়েদ্দেবং গৃহীতনিয়মো বুধঃ॥ (হঃ ভঃ বিঃ ১৫/৬৫)

অর্থাৎ নিয়মধারী পণ্ডিত ব্যক্তি জপ, হোমাদির অনুষ্ঠান এবং নাম-সঙ্কীর্ত্তন স্বীকার করিয়া ভগবানের নিকট "হে দেব! আপনার অগ্রে এই ব্রত গ্রহণ

করিলাম, হে কেশব! আপনার অনুগ্রহে ইহা নির্ব্বিঘ্নে সিদ্ধিপ্রাপ্ত হউক"—এইরূপ প্রার্থনা করিবেন।

চাতুর্ম্মাস্য-ব্রতের বর্জ্জনীয়-বিচারে লিখিয়াছেন,—

শ্রাবণে বর্জ্জয়েচ্ছাকং দধি ভাদ্রপদে তথা।
দুগ্ধমাশ্বযুজে মাসি কার্ত্তিকে চামিষং ত্যজেৎ॥
(হঃ ভঃ বিঃ ১৫/৬১ সংখ্যা-ধৃত স্কন্দপুরাণ-বচন)

চাতুর্ম্মাস্যের প্রথম মাস শ্রাবণে শাক, ভাদ্র মাসে দধি, আশ্বিনে দুগ্ধ এবং কার্ত্তিকে আমিষ বর্জ্জন করিবে। শাক বলিতে কেহ কেহ পক্ক ব্যঞ্জনকে বুঝিয়া থাকেন। ভোগত্যাগ করিয়া হরি-সঙ্কীর্ত্তনই উদ্দিষ্ট।

"রুচ্যং তত্তৎকাল-লভ্যং ফল-মূলাদি বর্জ্জয়েৎ।"

কালোচিত ফলমূল যাহার আস্বাদনে জীবের লোভ হয় এবং হরি-বিস্মৃতি ঘটে, তাহা প্রচুর পরিমাণে সেবা করিলে জড়বস্তুতে অতিরিক্ত অভিনিবেশ হয়, সুতরাং তাহা চাতুর্ম্মাস্যে বর্জ্জন করিয়া সংযত হইয়া হরি-কীর্ত্তন করিবে।

হরি-শয়নে নিষ্পাব বা সিম, রাজমাষ বা বরবটী, কলিঙ্গ বা ইন্দ্রযব, পটোল, বেগুন এবং পর্য্যুষিত বা বাসি দ্রব্য গ্রহণ করিবে না। সাদা বেগুন বা সাহেব-বেগুন অশুদ্ধ, তাহাই সর্ব্বতোভাবে পরিত্যাজ্য। সমর্থপক্ষে পটোল, বেগুন প্রভৃতি সুখময় খাদ্যও ত্যাগ করিবে।

অসমর্থ-পক্ষে রুচির অনুকূল বিষয়-সঙ্কোচনই হরিসেবায় উৎসাহ-বর্দ্ধক

নানাপ্রকার ত্যাগ একাধারে সম্ভবপর নহে; তজ্জন্য সমর্থপক্ষে যতগুলি ত্যাগ করিতে পারা যায়, তাহাই ত্যাগ করিতে হইবে। কর্ম্মিগণ ভোগপর, তজ্জন্য ত্যাগের ফল প্রভৃতি রোচনার্থ কথিত হইয়াছে। মোটের উপর, ত্যাগদ্বারা অভিনিবেশ শ্লথ হইলে ভগবদুন্মুখতার সুযোগ উপস্থিত হয়। আত্মধর্ম্ম বা নিত্য হরিসেবন-ধর্ম্ম প্রস্ফুটিত করিতে হইলে রুচির অনুকূল দেহ ও মনের ধর্ম্ম যতটা সঙ্কোচ করিতে পারা যায়, ততই হরিসেবায় উৎসাহ বৃদ্ধি হইবে।

সমর্থ-পক্ষে ব্রত-পালনের বিধিসমূহ

চাতুর্ম্মাস্য-কালে সম্ভবপর হইলে ব্রতী একবার মাত্র প্রসাদ পাইবেন, প্রত্যহ স্নান করিবেন, হরিনিষ্ঠ হইবেন ও চারিমাস হরির অর্চ্চন করিবেন। হরি-শয়ন-কালে বিলাস-শয্যাদি গ্রহণ নিষিদ্ধ, ভূমিশায়ী হওয়াই শ্রেয়ঃ।

ব্রতী যোগাভ্যাস করিবেন। সকল যোগের মধ্যে ভক্তিযোগই প্রশস্ত,

যেহেতু উহাই আত্মার নিত্যবৃত্তি। রাজযোগ বা জ্ঞানযোগ—মনের অনিত্যবৃত্তি এবং কর্ম্মযোগ বা হঠযোগ—দেহ ও কিঞ্চিন্মানস বৃত্তিময় অর্থাৎ অনিত্য।

চারিমাস কাল মৌনব্রত গ্রহণ করিলে কেবল অবিমিশ্র হরি-কীর্ত্তনের সুযোগ পাওয়া যায়। পাত্র-রহিত হইয়া ভূমিতে ভোজন করিলে স্বাভাবিক হরি-সেবনোচিত দৈন্য উপস্থিত হয়। ভজনের সুষ্ঠুতায় ব্যাঘাত হয় না। অনুকূল-জ্ঞানে ভক্তের চাতুর্ম্মাস্য-বিধি ভজনের সহায় জানিতে হইবে। হরিশয়ন কালে নিয়মে অবস্থান করা—বিধিশাস্ত্রের আদেশ।

তস্মিন্ কালে চ মদ্ভক্তো যো মাসাংশ্চতুরঃ ক্ষিপেৎ।
ব্রতৈরনেকৈর্নিয়মৈঃ পাণ্ডব শ্রেষ্ঠমানবঃ॥ (হঃ ভঃ বিঃ ১৫।৭৩)

হে পাণ্ডব! ঐকালে (শ্রীভগবানের চারিমাস কাল শয়ন-সময়ে) আমার যে ভক্ত বহু বহু ব্রত-নিয়মদ্বারা উক্ত চারিমাস কাল ক্ষেপণ করেন, তাঁহারাই মানবশ্রেষ্ঠ।

এতদ্ব্যতীত নক্তভোজন, পঞ্চগব্যাশন, তীর্থস্নান, অযাচিত ভোজন, হরিমন্দিরে গীতবাদ্য, শাস্ত্রামোদদ্বারা লোক-প্রমোদন, অতৈলস্নান প্রভৃতিও চাতুর্ম্মাস্যে নিয়মরূপে গ্রহণ করা যাইতে পারে।

সমর্থবান্‌পক্ষে ব্রত-পালনের নিষেধসমূহ

সমর্থবান্ ব্রতী লবণ, তৈল, মধু, পুষ্পোপভোগ ত্যাগ করিবেন। সকল রস—কটু, অম্ল, তিক্ত, মধুর, ক্ষার, কাষায় বর্জ্জন করিবেন।

চাতুর্ম্মাস্যে তাম্বুল সেবা করা অবিধেয়। সমর্থবান্ পক্বদ্রব্য গ্রহণ করেন না। দধি-দুগ্ধ-তক্র-পরিত্যাগ করিতে পারেন। স্থালীপাক বর্জ্জন চাতুর্ম্মাস্যে বিধেয়। সুরা, মধু, মাংস প্রভৃতি পরিবর্জ্জনীয়। সমর্থবান্ একদিবস অন্তর একদিবস উপবাস করিবেন। নখলোমাদির ক্ষৌরকার্য্য হরিশয়নে করিতে নাই। ক্ষৌরকার্য্যে ভদ্রতা বা বিলাসিতা উপস্থিত হয়।

কৃষ্ণসেবা-তাৎপর্য্যই চাতুর্ম্মাস্যের ফল

ফলসমূহ কামপর কর্ম্মিগণের জন্য; জ্ঞানী বা ভক্তগণের লৌকিক ও পারত্রিক ফলের আবশ্যকতা নাই। মুমুক্ষু জ্ঞানিগণের মুক্তি-ফলও ভক্তের বর্জ্জনীয়। ভগবদ্ভক্তি হইলে মোক্ষবাসনা লঘু হইয়া পড়ে। সর্ব্বতোভাবে কৃষ্ণসেবা-তৎপর হইতে পারিলেই চাতুর্ম্মাস্যের চরম ফল লাভ হয়।

—জগদ্‌গুরু শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর

জীব-সেবা ও জীবে দয়া

('দরিদ্র-নারায়ণ'-শব্দ অযৌক্তিক, অবৈধ ও কল্পিত)

"জীব-সেবা" ও "জীবে দয়া"—এই বিষয় দুইটীর পার্থক্য বোধ হয় অনেকেই তলাইয়া দেখেন না। অধিকাংশ স্থলেই "জীব-সেবা" ও "জীবে দয়া"—এই বিষয়দ্বয়ের বৈশিষ্ট্য বিচারের অভাবে আমরা এক করিতে আর এক করিয়া বসি —'শিব' গড়িতে 'বানর' গড়িয়া থাকি। জগতে অনেকে "মনীষী", "উদারচেতা" "পরোপকারী", "সমাজবন্ধু", "বিশ্ববন্ধু" নামে পরিচিত হইবার বাসনা করেন, কিন্তু বস্তুবিচারের অভাবে তাঁহাদের যাবতীয় কার্য্য পণ্ডশ্রমমাত্রে পর্য্যবসিত হয়। জগতের লোক যেরূপ দেহারামী ও স্ব-সুখ বাঞ্ছায় মগ্ন, তাহাতে যদি কোন ব্যক্তিতে বিন্দুমাত্রও অপরের সেবা-প্রবৃত্তির চেষ্টা পরিলক্ষিত হয়, তাহা হইলে উহাই পরম প্রশংসার বিষয় হইয়া থাকে। 'পর-সেবা' জিনিষটী উত্তম, কিন্তু পরসেবা না হইয়া যদি "পর-ছলনা" হইয়া পড়ে, তাহা কখনও প্রশংসনীয় হইতে পারে না। "ছলনা"র উপর "সেবা"র 'লেবেল' ও 'ট্রেডমার্ক' লাগাইয়া বাজারে কোনপ্রকারে চালাইতে পারিলেই যে তাহা প্রকৃতপ্রস্তাবে "সেবা-" শব্দবাচ্য হইবে, তাহা বিংশ-শতাব্দীর বিচারপরায়ণ সভ্য মানব-সমাজ কি একবার বিচার করিয়া দেখিবেন না ?

"পরসেবা", "পর-উপকার" প্রভৃতি কথার "পর" শব্দে "শ্রেষ্ঠ" বা "পরমাত্মা বিষ্ণু" লক্ষিত হইলে পরাত্মার সেবা বা শ্রেষ্ঠের সেবাই স্বীকৃত হয়। জীব "পর" অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ হইলেও অনর্থযুক্তাবস্থায় ত্রিগুণে আবদ্ধ—

"যয়া সম্মোহিতো জীব আত্মানং ত্রিগুণাত্মকম্।
পরোঽপি মনুতেঽনর্থং তৎকৃতঞ্চাভিপদ্যতে ॥" (ভাঃ ১।৭।৫)

ত্রিগুণাত্মক মায়ার দ্বারা আবৃত ও বিক্ষিপ্ত চিত্ত অনাদি-বদ্ধ জীবের সেবা—অনর্থাবৃতাবস্থারই সেবা অর্থাৎ ভোগ-মাত্র। "সেবা"-শব্দের সহিত কয়েকটী বিষয় অবিচ্ছিন্নরূপে সংশ্লিষ্ট। প্রথমতঃ "সেবা" বলিতেই আদৌ ইহা বিবেচ্য যে, যে-বস্তুর প্রতি সেবা প্রযুক্ত হইবে, সেই বস্তুবিশেষ "সেব্য" বা "প্রভু"-তত্ত্ব কি না ; দ্বিতীয়তঃ "সেবা" বলিতে সেব্যের অনুকূল সুখসাধন ; তৃতীয়তঃ সেবকের অধিষ্ঠান।

ত্রিগুণাত্মক, অনাদি-বহির্ম্মুখ জীব কি প্রভুতত্ত্ব ? অনর্থযুক্তের সুখসাধন কি মঙ্গলপ্রদায়ক ? আর সুখসাধনকারী সেবকেরই বা ঐরূপ কার্য্যে কি লাভ ?

—এ তিনটী প্রশ্নের নিরপেক্ষ উত্তর দিতে হইলে আমরা দেখিতে পাই যে, **"জীব-সেবা" বলিয়া কোন কথাই যুক্তিযুক্ত হইতে পারে না। জীব কখনও প্রভুতত্ত্ব নহেন—"মায়াধীশ মায়াবশ, ঈশ্বরে জীবে ভেদ।"** মায়াবশের সেবায় অর্থাৎ ইন্দ্রিয়-তর্পণে সেব্যাভিমান, সেবকাভিমান ও সেবাভিমান, কোনটিরই সার্থকতা নাই। লম্পট, দস্যু, জুয়াচোর, গাধা, ঘোড়া, বৃক্ষ-লতা প্রভৃতির সেবা-কল্পনা—মায়াবশ-জীবের ভোগমাত্র। সেইসকল বস্তু সেব্য বা প্রভুতত্ত্ব নহেন ; মায়াবশ লম্পটকে পরস্ত্রী, দস্যুকে পরের অর্থাদি যোগাইতে পারিলে তাহাদের সুখসাধনরূপ সেবা বা 'ভোগ' হয় বটে, অর্থাৎ সেরূপ ভোগে দস্যু-লম্পটাদির প্রীতি হইলেও তাহাদের চিরকালের অকল্যাণ এবং তৎসঙ্গে অন্যান্য জীবের পীড়ন অনিবার্য্য। সুতরাং মায়াবশ জীবের সেবা বা ভোগ যতই মনোরম পোষাকে সুসজ্জিত থাকুক না কেন, তাহাতে জীবপীড়নই হইয়া থাকে। একটী মায়াবশ জীবের ইন্দ্রিয়-তর্পণ করিতে গিয়া সেই জীববিশেষের অকল্যাণ এবং তৎসঙ্গে-সঙ্গে বহুজীবের পীড়ন হয়।

'জীব-সেবা' কথাটী সম্পূর্ণ অযৌক্তিক, জীবের বদ্ধত্ববিচারে "জীবে দয়া" সম্ভব, এবং তাঁহার মুক্তত্ব-বিচারে "বৈষ্ণব-সেবা" সম্ভব। **অনর্থযুক্ত বদ্ধাবস্থার প্রীতিসাধন প্রকৃতপক্ষে 'সেবা'-শব্দবাচ্য হইতে পারে না ;** তাহার প্রতি 'দয়া' করাই কর্ত্তব্য। **আবার মুক্তপুরুষের প্রতিও 'দয়া'-শব্দ প্রযুক্ত হইতে পারে না,** তাঁহার 'সেবা' করাই কর্ত্তব্য। "জীব-সেবা" কথাটি যুক্তিযুক্ত হয় না, পরন্তু "শিব-সেবা", "গুরু-সেবা" বা "বৈষ্ণব-সেবা" কথাটিই যুক্তিযুক্ত। গুরুবৈষ্ণবের ইন্দ্রিয়তৃপ্তি বা সেবাই কর্ত্তব্য,—মুক্তকুলের সেবা ও বদ্ধকুলের প্রতি দয়াই জীবের শুদ্ধ সনাতন ধর্ম্ম।

মায়াবদ্ধ জীব 'প্রভু' বা 'সেব্যতত্ত্ব' নহেন,—বিচার শ্রবণ করিয়া অনেকে কপটতাক্রমে জীবকে সেব্যতত্ত্বরূপে সজ্জিত করিবার জন্য বাউল-মতের সহিত ন্যূনাধিক মিত্রতা স্থাপনপূর্ব্বক **বদ্ধজীবকে 'নারায়ণ' বলিবার প্রয়াস করেন।** জীব-নারায়ণ, দরিদ্র-নারায়ণ, অশ্ব-নারায়ণ, মৃগ-নারায়ণ, মনুষ্য-নারায়ণ প্রভৃতি নাম প্রদান করিয়া ঐসকল বাউল-মতাবলম্বী ব্যক্তিগণ জীবের মায়াবদ্ধতাকেই মায়াধীশ-নারায়ণত্ব মনে করেন, এবং দেহ ও মন—এই জড়-বস্তুদ্বয়ের তোষণকেই 'নারায়ণ-সেবা' বলিয়া প্রচার করেন। **দরিদ্র-নারায়ণ, মনুষ্য-নারায়ণ, মৃগ-নারায়ণ-শব্দগুলি—সোনার পাথরবাটীর ন্যায় অযৌক্তিক ও অবৈধ।** জীবে 'নারায়ণ' বা 'ঈশ্বর' নাম সংযোগ করিলেই তিনি প্রভুতত্ত্ব হইতে পারেন না, বরং তাহাতে পাষণ্ডতাই হয়—

"যস্তু নারায়ণং দেবং ব্রহ্মরুদ্রাদিদৈবতৈঃ।
সমত্বেনৈব বীক্ষেত সঃ পাষণ্ডী ভবেদ্ধ্রুবম্ ॥"

মহাপ্রভু বলিয়াছেন,—

"যেই মূঢ় কহে 'জীব' 'ঈশ্বর' হয় সম।
সেই ত' পাষণ্ডী হয়, দণ্ডে তারে যম ॥"

দরিদ্রত্ব নারায়ণত্ব নহে, তাহা নারায়ণত্বের অভাব। মৃগত্ব বা মনুষ্যত্ব মায়াধীশত্ব নহে, তাহা মায়াবশ্যতা। দরিদ্রের অন্তর্যামী, পশুর অন্তর্যামী, মানবের অন্তর্যামি-সূত্রে নারায়ণের নিত্য অধিষ্ঠান আছে। কিন্তু দরিদ্রত্ব, পশুত্ব বা মানবত্বের প্রতীতিতে নারায়ণত্ব নাই। দরিদ্রত্ব, পশুত্ব ও মানবত্বরূপ মায়ার আবরণ ও বিক্ষেপ-শক্তির বিক্রম দূরীভূত হইলেই অন্তর্যামী নারায়ণের বাস্তবসত্ত্বা ও তদংশভূত শুদ্ধজীবাত্মস্বরূপ পরিদৃষ্ট হয়। 'গুরু' বা 'বৈষ্ণব' নারায়ণের বহিরঙ্গা-শক্তির বিক্রমে অভিভূত নহেন বলিয়া তিনি মুক্ত, শুদ্ধ ও নিত্য; তাঁহার নিত্য-সেবাই আমাদের নিত্য কর্ত্তব্য। তিনি সাধারণ জীব-শব্দবাচ্য নহেন। যতক্ষণ বদ্ধজীব-দর্শন, ততক্ষণ তাঁহার প্রতি দয়াই কর্ত্তব্য, আর মুক্ত-দর্শনে সেবাই কর্ত্তব্য। মহাভাগবতের গো-অশ্ব-খর-চণ্ডালে সর্ব্বত্র সম বা বৈষ্ণব-দর্শন, তিনি সকলকেই 'বৈষ্ণব' জানিয়া সেবা করিতে ব্যস্ত। তাঁহার দর্শন মায়াবাদী বা বাউলের 'দরিদ্র-নারায়ণ', 'মনুষ্য-নারায়ণ', 'মৃগ-নারায়ণ' প্রভৃতির ন্যায় জড়ে চিদারোপ বা কল্পনামাত্র নহে। তিনি জীবাত্মাকে নারায়ণ কল্পনা করিয়া মায়ার আবরণ ও বিক্ষেপাত্মক-বৃত্তি-পরিণত ব্যাপারের অনিত্য সেবা করেন না। তাঁহার সেব্য—নিত্য, সেবা—নিত্য এবং সেবকাভিমানও—নিত্য।

যাঁহারা "জীব-সেবা" "জীব-সেবা" বলিয়া চীৎকার করেন, যাঁহারা দরিদ্র-নারায়ণ, মনুষ্য-নারায়ণ, মৃগ-নারায়ণের সেবা কল্পনা করিয়া দুনিয়ার অনভিজ্ঞ-সম্প্রদায়ের নিকট মহাপরোপকারী ধর্ম্মবীর বা কর্ম্মবীর বলিয়া প্রতিষ্ঠিত হইতে চাহেন, তাঁহাদের বিদ্যা-বুদ্ধির দৌড় কতদূর, তাহা এইটুকু তলাইয়া দেখিলেই বিচারক-সম্প্রদায় ধরিয়া ফেলিতে পারেন। কিন্তু বিচারপরায়ণ মানব-সমষ্টির মনীষাকেও গতানুগতিক ন্যায় এরূপ নিস্তেজ করিয়া দেয় যে, তাঁহারাও ঐসকল সাধারণ বিচারে ভ্রান্ত হইয়া পড়েন।

শ্রীভাগবতধর্ম্ম জীব-সেবার কোন কথা বলেন নাই; শ্রীভাগবতের বাণী—

"শ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণবের 'সেবা' কর এবং বদ্ধজীবে 'দয়া' কর।" ভাগবত ভরতরাজার আদর্শের দ্বারা জানাইয়াছেন যে, মহর্ষি ভরত মৃগ-জীবের বদ্ধতার সেবা করিতে গিয়া আত্মমঙ্গল ও পরমঙ্গলের পথে অন্তরায় আনয়ন করিবার শিক্ষা প্রচার করিয়াছিলেন। ভাগবত ঐরূপ জীব-সেবা নিরাস করিয়া মধ্যম ও উত্তম-ভাগবতের বিচার জানাইয়াছেন,—

"ঈশ্বরে তদধীনেষু বালিশেষু দ্বিষৎসু চ।
প্রেমমৈত্রীকৃপোপেক্ষা যঃ করোতি স মধ্যমঃ ॥"
"সর্ব্বভূতেষু যঃ পশ্যেদ্ভগবদ্ভাবমাত্মনঃ।
ভূতানি ভগবত্যাত্মন্যেষ ভাগবতোত্তমঃ ॥"
"স্থাবর জঙ্গম দেখে, না দেখে তার মূর্ত্তি।
সর্ব্বত্র স্ফুরয়ে তাঁর ইষ্টদেব-মূর্ত্তি ॥"

মধ্যমাধিকারী উত্তমাধিকারী বৈষ্ণবের 'সেবা' করিবেন, তাঁহার সুখসাধনার্থ 'শুশ্রূষা' করিবেন, বদ্ধজীবের ইন্দ্রিয়-তর্পণ করিতে যাইবেন না, তাহাতে নিজের বা পরের কাহারও নিত্য উপকার বা মঙ্গল হইবে না। অতএব আমাদের স্মরণ রাখিতে হইবে যে, সম্বন্ধজ্ঞানের সহিত আত্মার নিত্য বৃত্তি যে সেবা, উহার একমাত্র পাত্র—শ্রীহরি, গুরু ও বৈষ্ণব অর্থাৎ মুক্ত, শুদ্ধ বৈকুণ্ঠ ভগবৎস্বরূপ ও তদ্রূপবৈভব; 'জীব' বা 'প্রধান' নহে। আর স্বরূপবিস্মৃতি-জন্য বা দেহাত্মবুদ্ধিনিবন্ধন দেহ ও মনের দ্বারা যে 'সেবা', উহা জড়েন্দ্রিয়-তর্পণমূলক ভোগেরই নামান্তর; উহার পাত্র ভগবানে বা তদ্রূপবৈভবে বিমুখ বদ্ধজীব এবং 'প্রধান'; শুদ্ধচেতন বৈকুণ্ঠ-বস্তু নহেন। তাদৃশ কৃষ্ণবিমুখ জীবগণকে কৃষ্ণোন্মুখীকরণই তাহাদের প্রতি পরম 'দয়া'।

'জীব-সেবা' কথাটী হইতে পারে না অর্থাৎ জীবের চিদিন্দ্রিয়-বৃত্তিগুলি অচিদাবৃত-চেতনের সুখ বা ভোগসাধনে কখনই নিযোজ্য নহে, পরন্তু নিখিল চিদচিদ্বস্তুর ঈশ্বর ও ঈশ্বরীর সেবা-সুখ সাধনেই উহাদের সর্ব্বক্ষণ নিয়োগ করিতে হইবে—ইহাই একমাত্র সত্য কথা। "জীবে দয়া" আর "বৈষ্ণব-সেবা" কথাই যুক্তিযুক্ত ও পরমমঙ্গলদায়ক। শ্রীমন্মহাপ্রভু এই "জীবে দয়া" ও "বৈষ্ণব-সেবার" আদর্শ দেখাইয়াছেন। ভগবৎকথা-কীর্ত্তনেই অনন্ত-বদ্ধজীবের প্রতি অমন্দোদয়া দয়া হয় এবং কীর্ত্তনকারী বৈষ্ণবগণের সর্ব্বতোভাবে আনুকূল্য বা সেবা-বিধান করিলেই আমাদের আত্মার বৃত্তি পরিস্ফুট হইয়া থাকে। মহাপ্রভু স্বয়ং গ্রামে গ্রামে ভগবৎকথা প্রচার ও তাঁহার ভক্তগণকে প্রচারক-

রূপে সংস্থান করিয়া জীবের প্রতি অমন্দোদয়া দয়ার আদর্শও দেখাইয়াছেন ; আবার অনুক্ষণ কীর্ত্তনপরায়ণ বৈষ্ণবগণের সেবার আদর্শও শিক্ষা দিয়াছেন। আমরা শ্রীমদ্ভাগবত ও মহাপ্রভুর শিক্ষা উল্লঙ্ঘন করিয়া আধুনিক মনোধর্ম্ম-জাত মতবাদে প্রমত্ত হইয়া যেন ভগবৎ-সেবা হইতে বঞ্চিত না হই,—ইহাই সর্ব্বক্ষণ স্মরণ রাখিতে হইবে। জীব-সেবার লম্বা-চওড়া বক্তৃতা শুনিয়া যেন মায়াবাদী, বাউল, প্রাকৃত-সহজিয়া, চিজ্জড়-সমন্বয়বাদী হইয়া উৎপথগামী না হইয়া পড়ি। "জীবে দয়া" ও "বৈষ্ণব-সেবাই" আমাদের আদর্শ হউক,—**'জীবে-দয়া', 'নামে-রুচি', 'বৈষ্ণব-সেবন'—ইহাই আমাদের মূলমন্ত্র হউক।**

—জগদ্‌গুরু শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী

একালের চৈতন্যের আলোকে অলোক-চৈতন্য-বিগ্রহ শ্রীমন্মহাপ্রভু

গাঁয়ের অতি সাধারণ মানুষ Communist-শব্দের একটী অসাধারণ এবং গভীর তাৎপর্য্যপূর্ণ অর্থ উদ্ধার করেছেন। কমিউনিষ্ট—কমন্ ইষ্ট। অর্থাৎ যে মতবাদে সকল মানুষের কমন্ বা সমান এবং ইষ্ট বা কল্যাণ সাধিত হয়, তাই কমিউনিষ্ট। বস্তুতঃ এই মতবাদের ইহাই সারকথা। এই একটী কথা একটী সমগ্র তত্ত্ব—একটী সামগ্রিক ইতিহাস বহন করে চলেছে। আধুনিক রাষ্ট্র-বিজ্ঞান-বিশেষজ্ঞদের অভিমত—কমিউনিষ্ট শব্দ আধুনিক, এমনকি, এই চিন্তাও আধুনিক। কিন্তু আমাদের বিশ্বাস অন্যরূপ।

সাধারণ মানুষের মর্য্যাদায় পুনর্বাসন, তাদের ক্ষেত্রে সামাজিক মূল্যবোধের উত্তরণ এবং তাদের সামূহিক কল্যাণসাধন আধুনিক সাম্যবাদের ঈপ্সিত ফলশ্রুতি। অথচ এসবই আমাদের দেশের অলোক-চৈতন্য-বিগ্রহ শ্রীমন্মহাপ্রভুর অবদানেরই অবিসংবাদিত পরিণতি বলেই জানি। শ্রীমন্মহাপ্রভুর জীবনেতিহাসের দু'একটী ঘটনা পর্য্যালোচনা করলে এ উক্তির যাথার্থ্য প্রতীয়মান হবে।

জাতপাতের কোন প্রশ্নই শ্রীমন্মহাপ্রভুর মানসপটে কোন রেখাপাত করতে পারেনি। তিনি অসংশয়িতচিত্তে বলেছেন,—

"মোর জাতি, মোর সেবকের জাতি নাই।"

যেদিন জাতিভেদ-প্রথা অত্যন্ত প্রকট ছিল, বর্ণবিদ্বেষ সমাজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে প্রবেশ করে তার অস্তিত্বের মূলে কুঠারাঘাত করছিল, নিম্নবর্ণের মানুষ ব্রাহ্মণের ছায়া মাড়ালে তাঁরা স্নান করে যখন শুদ্ধ হতেন, তখন উচ্চ কুলীন ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত-বংশের দুলালের পক্ষে জাত-পাতের মুখে সম্মার্জনী নিক্ষেপ করা শুধু বিস্ময়কর নয়, দুঃসাহসিকও বটে। শ্রীমন্মহাপ্রভু সেদিন সেই দুঃসাহসই দেখিয়েছিলেন। যবন হরিদাসকে নামাচার্য্যের পদে অভিষিক্ত করলেন। ভুঁইমালী, ঝড়ু কামার, দীন শুক্লাম্বর ছিল তাঁর আত্মার আত্মীয়। সমাজের নিম্নশ্রেণীর এই মানুষগুলোই ছিল তাঁর আপন-জন। আধুনিক রাজনীতি-সচেতন মানুষের ভোটভিক্ষার উদ্দেশ্যে ছোটজাতের মানুষের দ্বারস্থ হওয়া নয়; প্রয়োজনের তাগিদে সেবা-সৌকর্য্যের বাগ্‌বহুল প্রতিশ্রুতি প্রদানও নয়; দৃষ্টির সমক্ষে সমবেদনার কুম্ভীরাশ্রু বিসর্জ্জন, আর দৃষ্টির অন্তরালে বিস্মৃতির অতলতলে তলিয়ে দেওয়া নয়। মানুষের প্রতি শ্রীমন্মহাপ্রভুর ভালবাসা বড় অসাধারণ, বড় মাধুর্য্যময়, বড় প্রাণবন্ত এবং বড় আন্তরিক সম্পদে ঋদ্ধ। ঠাকুর হরিদাসকে শুধু নাম-প্রচারে সর্ব্বাধিনায়কত্ব প্রদান নয়, নীলাচলে তাঁকে প্রতিদিন দর্শন দান, তাঁর শেষ অভিলাষের সম্পূরণ, অপ্রকট হবার পর তাঁর স্মৃতি-স্মারক ভাণ্ডারা প্রদান—এ সবে শ্রীমন্মহাপ্রভুর কৃপা, করুণা, সহানুভূতি-গুণগ্রাহিতা এবং মূল্যবোধ এযুগের মানুষের জন্য শ্রীমন্মহাপ্রভুর অনবদ্য অবদান। এ যুগের মানুষ তার চৈতন্যের আলোকে অলোক-বিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্য-চরিত্রের এই মাধুর্য্য অবলোকন করে ধন্য হতে পারে। সাম্প্রদায়িকতার বিষবাষ্প যখন ভারতের প্রাণবায়ুকে বিষায়িত করে তুলতে চাইছে, তখন শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের এই অসাম্প্রদায়িক মনোভঙ্গি কি পথের আলো হয়ে দাঁড়ায় না?

দান-প্রতিগ্রহ সমাজ-ব্যবস্থার পক্ষে অপরিহার্য্য। পাঁচশত বৎসর পূর্ব্বে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য সমাজের বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষের নিকট হতে যেমন বস্ত্র, বস্তু ইত্যাদি গ্রহণ করেছিলেন, প্রতিদানে দিয়েছিলেন তাদের অপার্থিব প্রেম-সম্পদ, আধ্যাত্মিক রত্নাবলী। শাস্ত্রোত্থ ইতিহাস বলে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য শিক্ষার্থী সমভিব্যাহারে তাঁর এই অপরিমেয় লোকপ্রীতি-প্রদর্শন লীলা করেন। এই লোকপ্রীতিই কি আজকের সাম্যবাদের মৌলনীতি উদ্‌ঘোষণা করে না? শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য গোয়ালার গৃহে দধি-দুগ্ধ আহার্য্যরূপে গ্রহণ করলেন, বিনিময়ে অর্থ দিলেন না ঠিকই, কিন্তু তাঁরা বঞ্চনার বেদনা অনুভব করেননি, বরঞ্চ আনন্দে অভিভূত হয়েছেন। তাঁতি তাঁকে ধুতি-শাড়ী দিয়ে পরম তৃপ্তি পেলেন। মালাকার বিনামূল্যে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যকে মালা পরিয়ে ইষ্টসেবার স্ফূর্তি

লাভ করে ধন্য হলেন। তাম্বুলীর পান-সুপারী নিলেন, মূল্য দিলেন না। তথাপি দাতারা কেউই তাঁকে প্রবঞ্চক বললেন না। দান করে তাঁরা দেব-সেবার নিরাবিল আনন্দ লাভ করে জীবনকে ধন্যাতিধন্য করলেন। একালের মানুষের চৈতন্য শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের এবম্বিধ আচরণের কি ব্যাখ্যা দেবেন? এমনতর লেনদেন ব্যক্তিগত জীবনে তাঁরাই বা কয়টী করতে পেরেছেন? সুলেখক কুমারেশ ঘোষ ঠিকই বলেছেন,—"এমন লেনদেন আজকের স্বপ্নাতীত ব্যাপার। Armchair politician-দের কাছে অচিন্ত্যনীয়।"

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের দৃষ্টিভঙ্গী ছিল অত্যন্ত উদার, বিচার-বুদ্ধি ছিল যেমন সূক্ষ্ম, তেমনই প্রখর। গার্হস্থ্যলীলার এই বিশেষ পর্ব্বে তিনি কোন দাতাকে সাধারণতঃ প্রদত্ত জিনিষের জন্য ব্যবহারিক মূল্য প্রদান করেননি। কিন্তু শ্রীধরের থোড়-মোচার দাম দিয়েছেন। এই লীলার আর একটী দিক্ আছে। দ্রব্যের বিনিময়ে যাঁদের মূল্য প্রতিগ্রহ না করলে তাঁদের আর্থিক সংস্থানের হেরফের হয় না, তাঁদের তিনি মূল্য প্রদান করেননি। সাম্যবাদের মৌলসূত্র এই নির্দ্দেশ দেয় না কি যে,—ঐশ্বর্য্যবান্, বিত্তবান্ ব্যক্তি তাঁর অতিরিক্ত বিত্তের একটা অংশ অন্ততঃ অন্যকে স্বেচ্ছায় দিতে পারেন। নইলে ধন-সঞ্জাত বৈষম্য আরও তীব্র হয়ে উঠবে। পক্ষান্তরে নিঃস্ব-অকিঞ্চনের দ্রব্য বিনামূল্যে গ্রহণ করলে তাঁর জীবনযাত্রার কৃচ্ছ্রতাকে আরও কঠিন এবং দুঃসহ করে তোলা হয়—এই দিব্যদৃষ্টি শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের ছিল। আধুনিক মানবিক চেতনা-বোধ এই চৈতন্যাবদানের কোন্ তাৎপর্য্য খুঁজবে? কমিউনিজম্ তথা সাম্যবাদের সূক্ষ্ম লক্ষণাবলী কি কার্য্যাবলীতে প্রকট নয়? ধর্ম্মজগতের এক সচল বিগ্রহ—শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য, অথচ তাঁর চিন্তা এবং কর্ম্মে পাঁচশত বৎসর পূর্ব্বে অত্যাধুনিক ভাবনার এমন পরিচিতি মিলল কি করে? ব্যবহারিক জগতের এতবড় কল্যাণ-কুঞ্চিকা আর কয়জন প্রদর্শন করেছেন? পণ্ডিতের সঙ্গে তর্ক, সহপাঠীর সঙ্গে বিতণ্ডা, সাধারণের সঙ্গে রসিকতা, স্নানযাত্রীদের নিয়ে রঙ্গ কোন্ ইঙ্গিত বহন করে? এ যুগের শ্রেষ্ঠ কবি প্রতিভা বলেছেন,—

"মোর নাম এই বলে খ্যাত হোক।
আমি তোমাদেরি লোক।"

মহাকবির আগে মহাপ্রভুই প্রথম একথা উদ্‌ঘোষণা করেছেন,—

"আমি তোমাদেরি লোক।"

শুধু মুখের কথা মাত্র নয়, এ তাঁর জীবনসত্য। বস্তুতঃ পাঁচশত বৎসর পূর্ব্বে যাঁর সমগ্র জীবন-সাধনায় এই মহাসত্য বাস্তবরূপ পরিগ্রহ করেছিল,

তিনিই অলোক-চৈতন্য-বিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য। জাতিভেদ, বর্ণভেদ, সামজিক বৈষম্য—সর্ব্বপ্রকার ভেদবুদ্ধির নিরসনের জন্য একটীমাত্র মন্ত্র তিনি নির্দ্দেশ করেছেন,—

চণ্ডাল চণ্ডাল নহে, যদি কৃষ্ণ বোলে।
বিপ্র বিপ্র নহে, যদি অসৎপথে চলে॥ (চৈতন্যভাগবত)

কৃষ্ণ বল, কৃষ্ণ কহ, কৃষ্ণের নাম কর, কৃষ্ণই সাধন, কৃষ্ণই ভজন—মনুষ্যত্বের পারমিতির জন্য এই একটী বাক্যই যথেষ্ট। ভগবৎস্বরূপ কৃষ্ণের ভজনাতেই সর্ব্বপ্রকার ভেদবুদ্ধির নিরসন। চণ্ডালেরও ব্রাহ্মণত্বে উত্তরণ—কৃষ্ণানুশীলনের ফলশ্রুতি। উড়িষ্যার দোর্দ্দণ্ডপ্রতাপ রাজা প্রতাপরুদ্রের হাতে কৃষ্ণনামের মালিকা, ভারতের অদ্বিতীয় নৈয়ায়িক বাসুদেব সার্ব্বভৌমের মুখে কৃষ্ণনামের মহামন্ত্র, পণ্ডিতাগ্রগণ্য অদ্বৈতাচার্য্যের কৃষ্ণভক্তিতে সংসিদ্ধি, যবন হরিদাসের নামাচার্য্যের অভিধা লাভ, পাঠান বিজুলী খাঁর কৃষ্ণনামের গুণে পাঠান-বৈষ্ণবে রূপান্তর, রূপ-সনাতনের কৃষ্ণনামের সরণি বেয়ে ভক্তির সিংহদ্বারে অবতরণ, এ সবই ত' শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যেরই লোকোত্তর চরিত্র-মাধুর্য্যেরই মধুময় পরিণতি। কৃষ্ণনামে রাজার রাজ-অভিমান ধুল্যবলুণ্ঠিত হল, পাণ্ডিত্যের গর্ব্ব চূর্ণ হল। জন্মের কৌলীন্য মুছে গেল, জ্ঞানের শুকতরু মুঞ্জরিত হল, অত্যাচারীর উদ্যত-খড়্গ হস্তচ্যুত হল, আভিজাত্যের মোহ বিদূরিত হল, ঐশ্বর্য্যের বিলাস নিঃশেষিত হল। সকলের সব অহংকার ডুবে গেল। জেগে উঠল একমাত্র পরিচয়—সব মানুষই মানুষ; মানুষ এই তার প্রথম এবং শেষ পরিচয়। "সবার উপরে মানুষ সত্য"—মানব-ধর্ম্ম সকল ধর্ম্মের চূড়ায় অবস্থিত। এই ত' সাম্য, এই ত' কমিউনিজম্। কমিউনিষ্ট না হয়ে এমন তুলনারহিত কমিউনিজমের কথা জগতে দ্বিতীয় কেহ বলেননি। আপন জীবনে আচরণ ত' দূরের কথা।

ঠাকুর হরিদাস-প্রসঙ্গে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের আধুনিক মননের দিব্য-অভিব্যক্তি সংসাধিত হয়েছে। মধ্যযুগের সেই আলো-আঁধারি যুগে মানবতাবাদী কবিকণ্ঠ সোচ্চার হয়েছিল মানুষের জয়গানে, বিশ্বাত্মবোধের আর্ত্তিতে—যখন তিনি বলে উঠেছিলেন,—

"শুনহ মানুষ ভাই,
সবার উপরে মানুষ সত্য,
তাহার উপরে নাই।"

মানুষ যে মানুষের ভাই, মানুষে মানুষে কোন ভেদ নেই—এই গভীর সত্য

উদ্‌ঘাটিত হয়েছিল সেই মধ্যযুগে। মানুষের একমাত্র পরিচয় সে মানুষ—কবির এই উক্তির পশ্চাতে কবির ধ্যান-ধারণা শুধু সংকেতিত ছিল না, ছিল যুগধর্ম্মের প্রবর্ত্তনা, যুগ-চেতনার উন্মেষণা এবং যুগমানসের অভিব্যক্তি। কিন্তু একথা সত্য মানবতাবাদীর এই উপলব্ধি কবির কাব্য সত্য হয়েছিল। তা সকল মানুষের আচরণীয় জীবনসত্য হয়ে উঠেনি। জীবনাচরণের অমোঘ মন্ত্র বীজরূপে দেখা দিল তখন, যখন তা শ্রীমন্মহাপ্রভুর জীবনচর্য্যায় অভিব্যক্ত হল। যবন-কুলোদ্ভব হরিদাস শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের কৃপাপাত্র হয়ে ঠাকুর হরিদাসে রূপান্তরিত হলেন। এ ত' বর্ণ-বৈষম্যের কথা মাত্র নয়। বর্ণ বিলুপ্তির প্রশ্ন মাত্রও নয়, জাতিভেদের মূলোৎপাটন। হিন্দু-মুসলিম দ্বিজাতিতত্ত্ব ভারতে হিন্দু-মুসলিম অনৈক্যের মূলীভূত কারণ। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের প্রেমাদর্শে দ্বিজাতিতত্ত্ব চূর্ণীকৃত হল। তাই বলে হরিদাসের আজন্ম-সংস্কার নিঃশেষে মিলিয়ে যায়নি। শ্রীমন্মহাপ্রভু তা চানও নি। অথচ ভুবনমঙ্গলকর নামপ্রচারে তিনি শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের অন্যতম অধ্যক্ষ—তিনি নামাচার্য্য। বস্তুতঃ প্রেমের পতাকাতলে তিনি (শ্রীমন্মহাপ্রভু) হিন্দু-মুসলিমকে একত্রিত করেছেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু তাঁকে মর্য্যাদায় ভূষিত করেছেন। সামাজিক প্রতিষ্ঠাও দিয়েছেন, আবার বিপুল বিরাট কর্ম্মযজ্ঞে প্রভূত দায়িত্ব অর্পণ করেছেন। ধর্ম্ম নয়, জাতি নয়, বর্ণ নয়, এক্ষেত্রে স্বীকৃতি পেল যোগ্যতমের উদ্বর্তন। হরিদাসের পূর্ব্ব পরিচিতি যাই থাক, চৈতন্যকৃপা-পুষ্ট হরিদাস অবধূত শ্রীনিত্যানন্দের সমপর্য্যায়ে শ্রীমন্মহাপ্রভুর নাম-প্রেম বিতরণে অকুণ্ঠ প্রয়াস রেখেছেন।

শ্রীমন্মহাপ্রভুর কাজীদলন উগ্র সাম্প্রদায়িক ভাবনার ফলশ্রুতি মাত্র নয়। এ হল আপন অধিকার রক্ষার সঙ্ঘবদ্ধ সংগ্রাম। হোক্ না তা ধর্ম্মের ক্ষেত্রের ; হোক না প্রতিপক্ষ অন্য সম্প্রদায়ের। স্বাধিকার রক্ষার প্রশ্নে এ সংগ্রাম আজও অব্যাহত। এ যুগের কবি-কণ্ঠ হতে শ্রীমন্মহাপ্রভুর নীতি এবং আদর্শই প্রতিধ্বনিত হয়েছে ;—

অন্যায় যে করে, আর অন্যায় যে সহে।
তব ঘৃণা তারে যেন তৃণসম দহে ॥

ইষ্টপ্রপত্তি বা পরমাগতি লাভের জন্য সবে মিলিয়া উচ্চৈঃস্বরে যে নামকীর্ত্তন একালের ভাষায় তাকে স্বচ্ছন্দে গণ-সংযোগের অবিস্মরণীয় মাধ্যম বলা যেতে পারে। অবশ্য একথা সত্য শ্রীমন্মহাপ্রভুর এই তথাকথিত গণসংযোগ ছিল ভক্তির সরণি বাহি স্থিরলক্ষ্য অগণিত মানবের পারমার্থিক জয়যাত্রাই। কোনরূপ রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত হয়ে বা আধুনিক সমাজ-মনস্কতায়

প্রভাবিত হয়ে শ্রীমন্মহাপ্রভু এই সংকীর্ত্তনের প্রবর্ত্তনা করেননি, অথচ ভক্তি-সমাশ্রিত এই কীর্ত্তনে রাজনীতি এবং সমাজমনস্কতা বিমিশ্রিত হয়ে গেছে। আলোক-চৈতন্যবিগ্রহ শ্রীমন্মহাপ্রভুর অবদান-বৈশিষ্ট্য মধ্যযুগ পেরিয়ে আধুনিক যুগেও সমান মূল্যবহ, সমান সার্থক এবং সমান ফলপ্রদ। যুগ হতে যুগান্তরে তার জয়যাত্রা অব্যাহত।

ঝারিখণ্ডের বা ঝাড়খণ্ডের পথে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের আগমন এবং তথায় প্রেম-ধর্মের প্রচার একটী নতুন দিগন্তকে উন্মোচিত করেছে। ভারতীয় সংস্কৃতির ইতিহাসে এ ঘটনা সমধিক তাৎপর্য্যপূর্ণ। ঝাড়খণ্ডের পথে যাঁদের তিনি কৃপা করেছিলেন—তাঁরা কেউই সমাজের উচ্চশ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত ছিলেন না। তাঁরা ছিলেন অন্ত্যজ, ব্রাত্য, নিম্নবর্ণের আদিবাসী শ্রেণীর। তাঁরা ছিলেন দ্রাবিড় গোষ্ঠীর অন্তর্ভূক্ত কোরঙ্গা, কাকমারাদেরই পূর্ব্বপুরুষ। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য অর্থনৈতিক সাম্যের কথা অগ্রাধিকার না দিয়ে সামাজিক সাম্যকেই অগ্রাধিকার দিলেন। তিনি বললেন,—"ব্রাহ্মণের চেয়েও চণ্ডাল মহত্তর, যদি তার মধ্যে ঈশ্বর ও সত্যের প্রতি ভালবাসা ও আনুগত্য থাকে।" শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ব্যথিতচিত্তে লক্ষ্য করলেন,—বিভিন্ন জীবিকা ও জাতের ছত্রছায়ায় মানুষ কিভাবে বর্ণাভিজাতদের দ্বারা নিগৃহীত হচ্ছে। একটা ঘৃণা—একটা বিদ্বেষ যেন বর্ণাভিজাত ও তথাকথিত বর্ণহীনদের মধ্যে দুস্তর ব্যবধান সৃষ্টি করে চলেছে। তিনি অনুভব করলেন,—এই ঘৃণা, এই বিদ্বেষ একমাত্র প্রেমধর্ম্মই দূর করতে পারে। বস্তুতঃ ভারতবর্ষের মাটিতে আর্থিক বৈষম্য মানুষে মানুষে মিলনে বড় বাধা কোনদিনই হয়নি। প্রকৃত সাম্যের পথের অন্তরায় হয়ে আছে, দুস্তর বাধার বিন্ধ্যাচল হয়ে দাঁড়িয়েছে—জাতিভেদ-প্রথা ও তার পশ্চাতে প্রবাহিত ঘৃণা এবং বিদ্বেষ। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য তাঁর প্রসারিত বাহুবেষ্টনীতে আকাশের মত উদার বিরাট হৃদয়ে এই সব পীড়িত, নিগৃহীত, বঞ্চিত মানবাত্মাকে স্থান দিলেন। তাঁর ভালবাসাই সে পথ সহজ সরল করে দিল। যদিও তাঁর অপ্রাকৃত প্রেমধর্ম্ম প্রাকৃত জাতিভেদ-প্রথা ও বর্ণ-বৈষম্যের বহু উর্দ্ধে অবস্থিত। সাধারণ মানুষের, অবহেলিত মানুষের, নিপীড়িত মানুষের জীবনাদর্শ নতুন করে রচিত হল। কবিগুরুর "প্রশ্ন" কবিতায় এই মহাসত্যই ত' প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। তিনি বলেছেন,—

তারা বলে গেল—ভালবাসো
অন্তর হতে বিদ্বেষ-বিষ নাশো।

মানুষকে বিদ্বেষ-বিরহিত হৃদয়ে ভালবাসার এই উদাত্ত আহ্বান পাঁচশত বৎসর পূর্ব্বে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য তাঁর নীতি ও আদর্শ-নিষ্ণাত কর্ম্মপন্থার দ্বারা

জনগণমনে সঞ্চারিত করতে চেয়েছিলেন। আজকের মানুষ সেকথা ভাবতে নিশ্চয়ই গৌরব বোধ করবে। ধর্ম্ম-জগতের বিশ্ববিশ্রুত ব্যক্তিত্ব আজ আধুনিক রাষ্ট্রনৈতিক জগতে বিশিষ্ট ধ্যান-ধারণা, চিন্তা-চেতনার কি মহিমময় অত্যাশ্চর্য্য নির্দ্দেশনা রেখে গেলেন, তা ভাবলে অবাক্ হতে হয়।

পৃথিবীর রাষ্ট্রভাবনার উদ্ভবের কাল হতে মানুষের সর্ব্বাঙ্গীণ ব্যবহারিক মঙ্গলের কথাই চিন্তিত হয়ে এসেছে রাষ্ট্রপুরুষদের দ্বারা—বিশেষ করে অনগ্রসর মানুষের জন্য সে ভাবনায় একটী বিশেষ স্থান ছিল। যুগে যুগে অবতার বা অবতার-কল্প মহামানবরূপে যাঁরাই মর্ত্ত্যের ধূলি-সমাকীর্ণ ভূমিতে অবতীর্ণ হয়েছেন, তাঁরা সকলেই মানুষের বিশেষ করে সাধারণ মানুষের সর্ব্বাধিক মঙ্গলের কথাই ত' ভেবেছেন। এই সাধারণ মানুষই হল সমাজের হীন, পতিত, নিগৃহীত, লাঞ্ছিত মানুষ। এই মানুষই হল আজকের মেহনতী মানুষ, এই মানুষই হল আজকের সর্ব্বহারা মানুষ। সাম্যবাদ (Communism) এই মানুষের কল্যাণেই উদ্ভাবিত নবীনতম রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাপনা। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের চিন্তায় ত' এই সাম্যবাদেরই প্রশ্রয় দেখতে পাই। গৌড়ীয় তাঁকেই বলেছেন,—"হীন পতিতের ভগবান্"। একজন সাচ্চা কমিউনিষ্ট শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যকে শুধু সাচ্চা কমিউনিষ্টই ভাবেন না, ইতিহাসের ধারা অনুসরণ করে এও বলেন যে, শ্রীমন্মহাপ্রভু ভারতে কেন পৃথিবীতে সাম্যবাদের আদি-প্রবক্তা।

একথা এখনও সর্ব্ববাদিসম্মত না হলেও প্রমাণিত সত্য যে, একালের চৈতন্যের আলোকে শ্রীমন্মহাপ্রভু অলোক-চৈতন্যবিগ্রহ। তাঁর স্থান তাই কেবলমাত্র নয় ইতিহাসের কালাতিশায়ী পত্রনিকুঞ্জে ; তাঁর স্থান তাই কেবলমাত্র নয় সাহিত্যের সৃষ্টিসম্ভারে ; তাঁর স্থান তাই কেবলমাত্র নয় দর্শনের দিক্-নির্দ্দেশনায় ; তাঁর স্থান শুধুমাত্র নয় শিল্পের চারু ও কারুকলায় ; তাঁর স্থান বিশ্বমানবের চিৎ-প্রকর্ষে—চৈতন্যের আলোকে উদ্দীপিত তার চিৎ-প্রকোষ্ঠে প্রতিষ্ঠিত অলোক-চৈতন্যবিগ্রহ শ্রীমন্মহাপ্রভু। তিনি শুধু আজকের নন, আগামী দিনেরও মাত্র নন, তিনি চিরদিনের। তিনি শুধু আমার নন, আপনাদেরও নন, তিনি বিশ্ব-মানবের। তিনি শুধু বাঙ্গালীর নন, শুধু ভারতীয়ের নন, তিনি নিখিল বিশ্বের। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য চৈতন্যের আলোক-দীপ্ত প্রতিটী সত্তার—তার প্রাণের আরাম, মনের শান্তি, হৃদয়ের স্ফূর্ত্তি, চিত্তের আনন্দ, তার চিন্তার কেন্দ্রবিন্দু, ভাবনার নিঃসীম সিন্ধু, তার চেতনার চিরন্তন চৈতন্য।

—শ্রীঅমূল্যকৃষ্ণ দাস

———

লীলাপুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের বিপ্রলম্ভ-লীলা

[পূর্ব্বপ্রকাশিত ৪৩শ বর্ষ, ৫ম সংখ্যা, ১২০ পৃষ্ঠার পর]

বিভুচেতন শ্রীকৃষ্ণ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যরূপে অণুচেতন জীবকে নিত্য সম্বন্ধ-জ্ঞানদাতা গুরুরূপে আসিলেন নদীয়ায়। কারণ, জীবের সঙ্গে ভগবানের নিত্য সম্বন্ধ বর্ত্তমান। সে সম্বন্ধ অচিন্ত্যভেদাভেদ সম্বন্ধে বর্ত্তমান। সেই সম্বন্ধের জ্ঞানস্বরূপ ব্রজপ্রেম আসিয়া যায়। সেই প্রেমকে মহাবদান্যরূপে, ঔদার্য্যবিগ্রহরূপে সর্ব্বজীবের মধ্যে বিলাইতেই শ্রীনবদ্বীপ-সুধাকরের উদয়। এই উদয়ের তিনটী মুখ্য কারণ প্রদর্শিত হইয়াছে।

"প্রেমরস নির্য্যাস করিতে আস্বাদন।"

এই প্রেমরস নির্য্যাস কি?—তিনটী মুখ্য কারণের প্রথম কারণ:—"আমার প্রেমের আশ্রয়ই রাধিকা; আমি সেই প্রেমের বিষয় হইয়া আশ্রয়জাতীয় সুখকে অনুভব করিতে পারি না; আশ্রয়স্বরূপ রাধিকায় ভাব অবলম্বনপূর্ব্বক তাহা আস্বাদন করিব।" একারণে শ্রীরাধার ভাব ও দ্যুতি লইয়া শ্রীগৌরসুন্দর আবির্ভূত হইলেন।

দ্বিতীয় কারণ:—

"রূপ দেখি আপনার কৃষ্ণের হৈল চমৎকার,
আস্বাদিতে মনে উঠে কাম।"

"আমার নিজ মাধুরী শ্রীমতী রাধিকা আস্বাদন করেন। তাহা জগদাকর্ষক হইলেও আমি তাহা আস্বাদন করিতে পারি না; সুতরাং শ্রীরাধার ভাবকান্তি স্বীকার না করিলে আমার সে প্রয়োজন সিদ্ধ হয় না।"

তৃতীয় কারণ:—"শ্রীরাধিকার সঙ্গসুখ আমি যাহা লাভ করি, তদপেক্ষা রাধিকা আমার সঙ্গে অধিক সুখ লাভ করেন। তবে আমাতে এমন এক অপূর্ব্ব রস আছে, যাহা ভোগ করিয়া রাধিকার সুখ অধিক হইয়াছে। আমার পক্ষে বিজাতীয়ভাবে সেই সুখ অনুভব করা সম্ভব হয় না। রাধিকার ভাবকান্তি অঙ্গীকার করিয়া রাধিকার স্বজাতীয়ভাবে আস্বাদন করিতে পারিব;—এই তিনটী গূঢ় বাঞ্ছাপূরণ করিবার ইচ্ছায়ই চৈতন্যের অবতার।"

"শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য গোসাঞি রসের সদন।
অশেষ বিশেষে কৈল রস আস্বাদন॥"

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিজে কৃষ্ণ হইয়া প্রেমরস নির্য্যাস আস্বাদন করিতে আসিয়া

স্বয়ং আচরণ করিয়া প্রচার করিয়াছেন অপ্রকাশিত কৃষ্ণপ্রেম। আচরণের চরম অভিব্যক্তি তাঁহার বিপ্রলম্ভ-লীলা। শ্রীরাধার ভাবকান্তি, শ্রীরাধাভাবে বিভাবিত হইয়া শ্রীরাধারাণীর কৃষ্ণের প্রতি যে প্রেম, সেই প্রেমকে আস্বাদন করিতে আসিয়া প্রেমের চরম অভিব্যক্তি বিপ্রলম্ভভাবে নীলাচলে শেষবর্ষগুলি অতিবাহিত করিয়াছেন।

"রস আস্বাদিতে আমি কৈল অবতার।
প্রেমরস আস্বাদিব বিবিধ প্রকার॥"
"রাগমার্গে ভক্ত ভক্তি করে যে-প্রকারে।
তাহা শিখাইব লীলা-আচরণদ্বারে॥"

রাগমার্গে ভক্তিই গোপীপ্রেম।—

"কামগন্ধহীন স্বাভাবিক গোপীপ্রেম।
নির্ম্মল উজ্জ্বল শুদ্ধ যেন দগ্ধ হেম॥"
"আত্মেন্দ্রিয়প্রীতি-বাঞ্ছা তারে বলি 'কাম'।
কৃষ্ণেন্দ্রিয়প্রীতি-ইচ্ছা ধরে 'প্রেম' নাম॥"

গোপীগণের নিজের সুখের কোন আকাঙ্ক্ষা নাই, কৃষ্ণের সুখবিধানই তাঁহাদের একমাত্র কৃত্য।

সেই গোপীগণ মধ্যে উত্তমা রাধিকা।
রূপে গুণে সৌভাগ্যে প্রেমে সর্ব্বাধিকা॥
কৃষ্ণবাঞ্ছা-পূর্ত্তিরূপ করে আরাধনে।
অতএব 'রাধিকা' নাম পুরাণে বাখানে॥

সম্ভোগ ও বিপ্রলম্ভ অর্থাৎ মিলনে ও বিরহে দুইভাবে সেই প্রেমকে আস্বাদন করা যায়। কিন্তু সম্ভোগ অপেক্ষা বিপ্রলম্ভে প্রেমের স্ফূর্ত্তি অধিক। অন্ধকার যেমন আলোর গুরুত্বকে অধিকমাত্রায় উপলব্ধি করায়, তেমনই বিপ্রলম্ভেই সম্ভোগের পরিপূর্ণ প্রকাশ; সম্ভোগে বিরহের ভীতি থাকায় মিলনের মধ্যেও বিরহ থাকিয়া যায়। কিন্তু বিপ্রলম্ভে নিরবচ্ছিন্ন সম্ভোগ, বিচ্ছেদের কোন ভীতি নাই। একারণে বিপ্রলম্ভেই অধিক মিলনের সুখ। এই কারণেই শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের বিপ্রলম্ভ-লীলা।

"রাধিকার ভাব-মূর্ত্তি প্রভুর অন্তর।
সেই ভাবে সুখ-দুঃখ উঠে নিরন্তর॥
শেষলীলায় প্রভুর কৃষ্ণবিরহ-উন্মাদ।
ভ্রমময় চেষ্টা, সদা প্রলাপময়-বাদ॥

রাধিকার ভাব হৈছে উদ্ধবদর্শনে ।
সেই ভাবে মত্ত প্রভু রহে রাত্রিদিনে ॥"

এই শেষলীলা প্রভু করিয়াছেন নীলাচলে শ্রীশ্রীজগন্নাথের সন্নিকটে শ্রীশ্রীজগন্নাথদেব ভক্তের বিরহের মূর্ত্ত প্রতীক—অচল জগন্নাথ। দ্বারকায় মহিষীগণ যখন রুদ্ধদ্বারকক্ষে মাতা রোহিণীর নিকট ব্রজের প্রেম-কাহিনী শ্রবণ করিতেছিলেন, তখন শ্রীকৃষ্ণ রুদ্ধদ্বারের বাহিরে দাঁড়াইয়া ব্রজবাসিগণের সেই অনির্ব্বচনীয় প্রেম-কাহিনী শ্রবণ করিতে করিতে ব্রজভক্তগণের বিরহে কাতর হইয়া বিগলিত হইয়া যান এবং শ্রীজগন্নাথে রূপান্তরিত হন। আর শ্রীমন্মহাপ্রভুর কৃষ্ণ-বিরহের রাধাভাবমূর্ত্তি সচল জগন্নাথ। একই কৃষ্ণচন্দ্র দেখাইয়াছেন, ভক্তের বিরহে ভগবানের অবস্থা, আবার ভগবানের বিরহে ভক্তের অবস্থা। শ্রীমন্মহাপ্রভুর এ লীলা একমাত্র শুদ্ধ ভক্তহৃদয়েই স্ফূর্ত্তি লাভ করিতে পারে।

জগদ্‌গুরু শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ জীবের এই লীলায় প্রবেশের অধিকার কখন আসে, সে সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন, তাহা এখানে উদ্ধৃত হইল,—এই লীলায় প্রবেশের জন্য জীবকে "প্রাকৃত বিচার পরিত্যাগ করিতে হইবে। অপ্রাকৃত ব্রজে অপ্রাকৃত জীবাত্মা, অপ্রাকৃত গোপীদেহ লাভ করে, অপ্রাকৃত নিজাভীষ্ট, কৃষ্ণপ্রেষ্ঠা গুরুরূপা সখীর, অপ্রাকৃত কুঞ্জে অবস্থানপূর্ব্বক, বাহ্যে অনুক্ষণ অপ্রাকৃত নামাকৃষ্ট হয়ে, অপ্রাকৃত কৃষ্ণের অপ্রাকৃত অষ্টকালীয় লীলায় অপ্রাকৃত রাধারাণীর পরিচর্য্যা করিয়া থাকেন ; ইহা জীবের পরমপ্রাপ্য ; 'জীবের পরম প্রয়োজন, আকাঙ্ক্ষার শেষ সীমা, চেতন রাজ্যের শেষ কথা।"

—শ্রীমতী মায়া সরকার

শ্রীল গুরু-মহারাজের বক্তৃতা

[পূর্ব্বপ্রকাশিত ৪৩শ বর্ষ, ৫ম সংখ্যা, ১৮৭ পৃষ্ঠার পর]

আপনারা শুনেছেন 'জ্ঞান' একটী শব্দ। 'সত্যং জ্ঞানং যদনন্তং ব্রহ্ম'—জ্ঞান অসীম, অনন্ত। জানবার, বুঝবার কি শেষ আছে এ জগতে আমাদের ?—নাই। কেউ কি বলতে পারেন আমি সব শিখে গেছি, সব জেনে গেছি, সব বুঝে গেছি? যদি কেউ বলেন এটা, তাহলে তাঁকে বলা হবে দাম্ভিক, অহঙ্কারী ব্যক্তি। যিনি যতকিছু জেনেছেন, তিনি ততই বলছেন—আমি

কিছু জানি নাই, কিছু শিখি নাই, কিছুই বুঝি নাই। এটাই হল জানার লক্ষণ। "আমি দেখি নাই কিছু, বুঝি নাই কিছু, দাও হে দেখায়ে বুঝায়ে।" কথাটা হল এই। জানবার আগ্রহ থাকা চাই। সেখানে অহঙ্কার নাই, নিরভিমান, নিরহঙ্কার ভাব ত' থাকবে।

আমরা জগতে বহু রকমের ব্যক্তিকে লক্ষ্য করছি, আজ সমাজে যারা ধর্ম্মতত্ত্বের কোন বিচারই করেন না, ধর্ম্মানুশীলন করেন না, Practice এর মধ্যে কোনরকমই নাই, তারাই সব থেকে বেশী ধর্ম্মের সমালোচনা করতে যাচ্ছেন। তারা ত' কিছুই বোঝেন না, অবুঝ লোক, তাদের কি ধর্ম্ম সম্বন্ধে সমালোচনা করবার অধিকার আছে? যারা সেই লাইনে চলছেন, তারা সেই বিচারে চলতে পারেন, ভাল-মন্দের বিচার দেখাতে পারেন। যারা সে নিয়ে Deal করেন না, আদৌ সে লাইনে নাই, তারা সমালোচনা করবেন কি? কি অধিকার আছে সমালোচনা করবার তাদের? সুতরাং Practice আমাদের করতে হবে, সাধনের প্রয়োজন আছে আমাদের জীবনে এবং এই Practice টা হল বাস্তব। সেই বাস্তবতা সনাতন ধর্ম্মে বুঝানো হয়েছে, শিখানো হয়েছে।

'নিরাকার'-শব্দে যে একটা ধারণা রয়েছে আমাদের —ভগবানের কোন আকার নাই, সেটা একটা ভুল কথা। আমি প্রসঙ্গক্রমে বলতে পারি— মুসলিম ধর্ম্মের ভিতরেও সাকারবাদ আছে। সুফী সম্প্রদায়ের মধ্যে দেখা যাচ্ছে পয়গম্বর সাহেবও খোদার এবাদতকে মেনে নিচ্ছেন। আমাদের শাস্ত্রে যেখানে 'বৈকুণ্ঠ'-শব্দ লেখা আছে, মুসলিম শাস্ত্রে—কোরাণেও 'আলম মিশাল' বলে জায়গাটার কথা বর্ণনা আছে। আমাদের সনাতন শাস্ত্রে যেখানে বদ্ধজীব, মুক্তজীবের কথা লেখা আছে, কোরাণ শরীফের মধ্যে সেখানে দুটো শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে 'রু মুজর্‌রদী', 'রু-তর্‌কীবী'। সুতরাং সব জিনিসগুলো পাশাপাশি রেখে বিচার করতে হবে—ভগবান্ সাকার, না নিরাকার? কোরাণে কেবল খোদার 'জিস্‌মানি'-মূর্ত্তি নিষেধ; শুদ্ধ 'মুজর্‌রদী'-মূর্ত্তির নিষেধ নাই।

তাঁর যদি কোন ক্ষমতাই নাই, যদি তিনি Non-entity, তাহলে অনন্ত বিশ্বজগৎ সৃষ্টি কি করে হয়েছে? কিছু ব্যক্তি বলছেন,—মশায়! সব প্রকৃতি থেকে হচ্ছে। তারা একটা One sided view নিয়েছেন। প্রকৃতি জগৎ সৃষ্টি করতে পারে না পুরুষের সাহায্য ছাড়া। যুক্তির কথা। গীতা-ভাগবত প্রভৃতি শাস্ত্রাদির বিচার রয়েছে—পুরুষের সাহায্য ব্যতীত প্রকৃতি কিছু করতে পারে না। 'ময়াধ্যক্ষেন প্রকৃতি সূয়তে সচরাচরম্।" কৃষ্ণ বলছেন অর্জ্জুনকে—

আমার অধ্যক্ষতায় প্রকৃতি সৃষ্টি করতে পারে। তা না হলে তার কোন ক্ষমতা নাই। সব জিনিসটা ত' এইভাবে বুঝানো হয়েছে।

যদি তত্ত্ববস্তুকে শক্তি বলা হয়, তাহলে ভুল বলা হয়। তত্ত্ববস্তু হলেন শক্তিমান্, এটা দার্শনিক বিচারের মধ্যে বুঝানো হয়েছে। তিনি ক্লীবব্রহ্ম নন, তাঁর সব ক্ষমতা আছে। তিনি পরমপুরুষ বলে বলা হয়েছে। তিনি পুরুষোত্তম, তিনি লীলাপুরুষোত্তম—এসব কথাগুলো বুঝানো হয়েছে। বর্ত্তমানে দেখা যায় কৃষ্ণতত্ত্ব সম্বন্ধে আলোচনা করতে গিয়ে ঐশ্বর্য্যপর বিচার অনেকের মধ্যে রয়েছে, আবার অনেকের মধ্যে মাধুর্য্যপর বিচারও রয়েছে পাশাপাশি। ওটা কিছু নয়, আমি যেটুকু বলছি সেটুকু সব, তা ত' নয়। চরম বিচারটা ত' বুঝতে হবে। সে সম্বন্ধে ত' ধারণা রয়েছে একটা। আমি অনেক সময় জিনিসটা উদাহরণ দিয়ে বুঝাবার চেষ্টা করি। আপনারা গীতা পাঠ করেন অনেকে। গীতা পাঠের শেষে গীতা-মাহাত্ম্য পাঠ করতে হয়, নিয়ম আছে। সেখানে গীতার মহিমা-মাহাত্ম্যের মধ্যে প্রথমে এক জায়গায় বলছেন,—

দেবকীনন্দনঃ কৃষ্ণো গীতাপাঠেন তুষ্যতি।
যথা ন বেদৈর্দানেন যজ্ঞতীর্থব্রতাদিভিঃ॥

দেবকীনন্দন কৃষ্ণের কথা এল বা বসুদেব-নন্দন বাসুদেব কৃষ্ণের কথা এল। ঐশ্বর্য্যপর বিগ্রহ। তারপরে আবার একটা শ্লোক দেখুন,—

গোপালো বালকৃষ্ণোঽপি নারদধ্রুবপার্ষদৈঃ।
সহায়ো জায়তে শীঘ্রং যত্র গীতা প্রবর্ত্ততে॥

যেখানে গীতার কথা আলোচনা হচ্ছে, গোপালকৃষ্ণ হাজির হচ্ছেন সেখানে নারদ, ধ্রুব প্রভৃতি পার্ষদগণকে নিয়ে। তৃতীয় শ্লোক আবার শুনুন,—

যত্র গীতা বিচারশ্চ পঠনং পাঠনং তথা।
মোদতে তত্র শ্রীকৃষ্ণো ভগবান্ রাধয়া সহ॥

শ্রীরাধিকাসহ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ সেখানে হাজির হচ্ছেন। তত্ত্বদর্শনটাকে এইভাবে বুঝানো হয়েছে—ঐশ্বর্য্যপর ভাব, বাৎসল্য-স্নেহপর ভাব ও মধুর রতি। এগুলো উত্তরোত্তর শ্রেষ্ঠ। আমাদের বুঝবার চেষ্টা করতে হবে। সবটাকে একই গোত্রে ফেলে দিয়ে আমরা অঙ্ক কষব, তা হবে না। উচ্চাবচ ভাবটাকে স্বীকার করতে হবে। সাধনার ক্ষেত্র রয়েছে। সিদ্ধির ভূমিকা রয়েছে। আমরা সাধক-সাধিকাকে সিদ্ধ বলতে পারি না। আবার সিদ্ধ মহাত্মা যাঁরা তাঁদেরকে সাধক-সাধিকার Categoryতে নামিয়ে দিতে পারি না। এই

অধিকার নিত্যস্বীকৃত বস্তু। এই অবস্থাটা বুঝতে হবে। সাধনার ক্ষেত্রটা ঐরকম।

প্রত্যেক ধর্ম্মের ভিতরে যতটুকু যতটুকু মিল আছে, দেখবেন সেটুকু Mother tincture। সনাতন ধর্ম্মের Mother tincture থেকে যে Dialution তৈরী হয়েছে, তার থেকে যিনি যতটুকু নিয়েছেন সেই অনুসারে ততটুকু মেনে নেওয়া হচ্ছে, তার বাইরে—Universal Truth এর বাইরে যদি কিছু বলা হচ্ছে, মেনে নেওয়া হয় নাই। ঐখানে ত' ধরা পড়ে যাচ্ছে। আমি যে Algebraর অঙ্কটা কষব তার Formula টা আমাকে Apply কর্‌তে হবে। Process, Procedure টা ঠিক রাখতে হবে। তবে ত' অঙ্কটা ঠিক হবে। আমি Formulaও জানি না, Applyও কর্‌তে জানি না, তাহলে কি করে হবে? শিখতে হবে এগুলো।

সনাতন ধর্ম্মের মধ্যে কিছু বৈশিষ্ট্য আছে, সেটুকু সংক্ষিপ্তভাবে আমি আপনাদের নিবেদন করছি। যদি আপনারা প্রশ্ন করেন—সনাতন ধর্ম্মের মূল Theory কি? আপনি যে সনাতন ধর্ম্ম, সনাতন ধর্ম্ম বলছেন, কি ব্যাপার? শুনুন তাহলে। প্রত্যেকটা ধর্ম্মের ভিতরে মূল নীতি-আদর্শের কথা বলা আছে। প্রথমেই বলেছি সনাতন ধর্ম্ম হল গুরুবাদী ধর্ম্ম। দ্বিতীয়তঃ সনাতন ধর্ম্ম হল বেদনিষ্ঠ ধর্ম্ম—বৈদিক ধর্ম্ম। তৃতীয়তঃ সনাতন ধর্ম্ম মানে একেশ্বরবাদ। একে বলে সনাতন ধর্ম্ম। আপনারা অবাক্ হবেন না। বহু ভগবানের কল্পনা ভুল কথা, ভগবান্ এক। সুতরাং সেখানে Henotheism—পঞ্চোপাসনা, Polytheism—বহ্বীশ্বরবাদ বলুন, এগুলো সনাতন ধর্ম্মের অঙ্গীভূত ব্যাপার নয়। সনাতন ধর্ম্মের বাইরের জিনিস। আজ কিন্তু এগুলোকে সনাতন ধর্ম্ম বলে চালাবার চেষ্টা হচ্ছে সমাজে।

নির্ব্বিশেষবাদ, মায়াবাদকে আজ অনেকে বলতে চাচ্ছেন যে এটা হল বৈদিক ধর্ম্ম। কোথায় লেখা আছে এটা বৈদিক ধর্ম্ম? বহু জায়গায় লেখা আছে এটা অবৈদিক ধর্ম্ম। শিবঠাকুর শিবানীকে এই ধর্ম্মতত্ত্ব বলতে গিয়ে বলছেন,—"বেদার্থবন্মহাশাস্ত্রং মায়াবাদমবৈদিকম্। ময়ৈব কথিতং দেবি! জগতাং নাশকারণাৎ॥" ভগবানের আদেশে শিবঠাকুর শঙ্কর-মূর্ত্তিতে এসে মায়াবাদ, নির্ব্বিশেষবাদ প্রচার করেছেন। এই খবরটা তিনি পার্ব্বতীকে বলছেন,—

মায়াবাদমসচ্ছাস্ত্রং প্রচ্ছন্নং বৌদ্ধমুচ্যতে।
ময়ৈব বিহিতং দেবি! কলৌ ব্রাহ্মণমূর্ত্তিনা॥

মায়াবাদরূপ অসৎ শাস্ত্র আমি প্রচার করব। বেদের কল্পনা করে তার অর্থ করে তার অপব্যাখ্যা দেব। কেন দেবেন আপনি ?—আমার উপরওয়ালা মালিক তিনি বলেছেন। কেন এটা বললেন ভগবান্ ? ভগবান্ যদি ভক্তবৎসল তাহলে তিনি ঐরকম ব্যবস্থা করছেন কেন ?—বললেন,—জগতে কিছু দুষ্টু বদমায়েস্ আছে, এরা আমাকে হিংসা করে, আমার ভক্তকেও হিংসা করে। সেজন্য এদের Divert করতে চাইছি আমি। শিবঠাকুরকে আদেশ দিচ্ছেন স্বয়ং ভগবান্। তাই শিব শঙ্করমূর্ত্তিতে এসে সেই নির্ব্বিশেষবাদ প্রচার করেছেন। ভগবানের কার্য্যে সহায়তা করেছেন তিনি, তাঁর আজ্ঞা পালন করেছেন তিনি। কথাগুলো ঠিক বুঝতে হবে। মতবাদটা ত' ভাল নয়। ঐ মতবাদ যারা নেবেন, তারা ত' সব নির্ব্বিশেষবাদী নাস্তিকের দল। সেই নাস্তিকদের তালিকা গীতার মধ্যে দিয়ে রেখেছেন। সেই নাস্তিক কারা ?—

অসত্যমপ্রতিষ্ঠং তে জগদাহুরনীশ্বরম্।
অপরস্পরসম্ভূতং কিমন্যৎ কামহৈতুকম্॥

'ব্রহ্ম সত্য জগন্মিথ্যা'—এই Theory যারা বলছেন, তাদের বিচার ভ্রান্ত। ব্রহ্ম যদি সত্য হয়, জগৎও তাহলে সত্য। আমি ত' চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছি সব—বৃক্ষ, তৃণ, গুল্ম, লতা, পশু, পক্ষী, মনুষ্যগোষ্ঠী। পরস্পর পরস্পরকে দেখছি, আলাপ করছি। এটাকে আমি অস্বীকার করব কিছু নয়! 'জগদাহুরনীশ্বরম্'—এক নাস্তিক তিনি বলছেন,—এ জগতে কর্ত্তা কেউ নাই, মালিক কেউ নাই। বলি, তাহলে জগৎ চলছে কি করে ? বলে ঐ চলছে। 'অপরস্পরসম্ভূতম্'—Atom Molicules Theory—কণাদের বৈশেষিক দর্শনের একটা অংশ বলছে—অণু-পরমাণুর সংঘাতে জগতের সৃষ্টি হয়েছে। তারপরে আর এক নাস্তিক কি বলছেন ?—'কিমন্যৎ কামহৈতুকম্'—সেই ভগবান্ জগৎ সৃষ্টি করেছেন প্রজাগণের কল্যাণের জন্য নয়, তাঁর কামনা-বাসনা চরিতার্থ করবার জন্য। এই ত' সব নাস্তিকের তালিকা স্বয়ং ভগবান্ কৃষ্ণচন্দ্র গীতার মধ্যে দিয়ে যাচ্ছেন। হাজারও রকমের নাস্তিকের তালিকা রয়েছে। আমরা কি আস্তিক হব না, নাস্তিক হব ? নাস্তিক হলে কি আমাদের বাহাদুরিটা বেশী বাড়বে, না আস্তিক হয়ে, সুসভ্য হয়ে আমরা চলব ? জগৎকে অস্বীকার করলে কি বাহাদুরিটা বেশী হয়ে যাবে ? যার যেটুকু গুণ আছে, সেটুকু কি স্বীকৃতি দেব না আমরা ? এই মনুষ্যগোষ্ঠীর মধ্যে ত' সবকিছু আছে। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন—'Manliness is next to Godliness'—বহু জায়গায় লেখা আছে। আবার 'সবার উপরে মানুষ সত্য

তাহার উপরে নাই।' মেকলের এই কথা—'More than a man you can not be.' ব্যাখ্যা ত' দেওয়া আছে, যিনি যেভাবে নিন না কেন? মানুষের মনুষ্যত্ব মানবত্বের মধ্যে সীমিত, তার বাইরে কিছু করবার নাই। সুতরাং সেই মানুষ ভগবানের ভগবত্তা কেড়ে নিতে চাচ্ছে কেন? কে সেই মানুষ?

অনেকে বলছেন,—ভগবান্ বলে কিছু নাই, মানুষই ভগবান্। কেন এইকথা, এই চালাকি-চাতুরী, ফাজ্‌লামি কেন? ভগবানের ভগবত্তার সঙ্গে কোনটার তুল্যমূল্য কিছু আছে? কোন্ জায়গায়?

ন তস্য কার্য্যং করণঞ্চ বিদ্যতে ন তৎ সমশ্চাভ্যধিকশ্চ দৃশ্যতে।
পরাস্য শক্তির্বিবিধৈব শ্রূয়তে স্বাভাবিকী জ্ঞান-বল-ক্রিয়া চ॥

সেই ভগবানের সমান কেউ নাই, আর তাঁর থেকে উর্দ্ধেও কেউ নাই। সেই তত্ত্ববস্তু হলেন ভগবান্। তবে কেন মানুষের অহঙ্কার? তবে কেন মানুষ সব ব্যাপারে সমান সমান অঙ্ক কষছে—আমিও যা, ভগবান্‌ও তাই? কেন এই সব চালাকি-চাতুরী? সর্ব্বজ্ঞ আর অজ্ঞ—দুটী কি সমানার্থক শব্দ? আজ দুনিয়া বিভ্রান্ত, মানুষের আলোচনা নাই। মানুষের ভিতরে যে একটা আলোচনা থাকবে, সে সুযোগ নাই। আবার সুযোগ থাকলেও সে সুযোগের সদ্ব্যবহার করা হচ্ছে না। তাই মানুষের ভিতরে এক ভুল বুঝাবুঝির—Misunderstanding এর ক্ষেত্র সৃষ্টি হচ্ছে। সমগ্র দুনিয়াটা যদি সনাতন ধর্ম্ম গ্রহণ করে, তাহলে এদের রেহাই। অন্য কোনভাবে রেহাই নাই এদের।

সাম্য—Equality, স্বাধীনতা—Liberty, মৈত্রী—Fraternity মুখে বললে হবে না। রাজনৈতিক ক্ষেত্রে এই জিনিস কখনও হতে পারে না, অসম্ভব। মুখে বলছেন সবাই—Co-existence, Equal distribution। একথাগুলো শুধু মৌখিক কথা, বাস্তবে কখনও রূপায়িত হবে না তাদের দ্বারা। কিন্তু একজন সনাতন ধর্ম্মাবলম্বী আত্মধর্ম্মী ব্যক্তির পক্ষে এটার সত্যতা ও সফলতা আসছে। তিনি সকলকেই মানিয়ে নিয়ে চলতে পারছেন। তিনি নিজের কল্যাণ চান, দশজনের কল্যাণ চান, বিশ্ববাসীর কল্যাণ চান—সেইকথা বলা হয়েছে। 'সকলে আমরা সকলের তরে, প্রত্যেকে আমরা পরের তরে।' —এটা মুখে বললে হবে না, এটা আন্তরদর্শন। অন্তর থেকে বলতে, শিখতে হবে, বুঝতে হবে। তবে ত' কিছু হবে। মানুষ ত' আজ বিভ্রান্ত হয়ে পড়েছে, কোন্‌টা গ্রহণ করবে আর কোন্‌টা ছাড়বে। মুস্কিল্ হয়ে গেছে আজ। এত সুবিধাবাদীর দল জুটে গেছে যে, সবাই বলছে আমারটা নাও,

আমি যা বলছি চরম কথা বলছি। মুস্কিল্ সেখানে। কিন্তু এইসব বিচারের মূলে ত' রয়েছে শাস্ত্র। কোন্‌টা ভাল, কোন্‌টা মন্দ, কোন্‌টা সত্য, কোন্‌টা মিথ্যা, কোন্‌টা কত পরিমাণে সত্য, কোন্‌টা কত পরিমাণে মিথ্যা, এটা বিচার করতে গেলে ত' শাস্ত্র পড়ে রয়েছে। সেই কথা ত' কৃষ্ণও বুঝিয়ে দিচ্ছেন,—"তস্মাৎ শাস্ত্রং প্রমাণন্তে কার্য্যাকার্য্যব্যবস্থিতো।" শাস্ত্রই তোমার ব্যবস্থা দেবে—কোন্‌টা কতটুকু সত্য, আর কতটুকু মিথ্যা। সেটাকে বাদ দিলে ত' হচ্ছে না। সেখানে আবার কথা এনে ফেলেছে নাস্তিকরা—আরে! ও ত' মানুষের কল্পনা। কল্পনা যদি সবই হয়, যে ব্যক্তি বলছেন তিনিও ত' কল্পনায় জন্মগ্রহণ করেছেন। তিনি যাবেন কি করে? যিনি বলছেন সব কল্পনা, সেই ব্যক্তিকে বলা হোক—তুমিও ত' বাবা কল্পনার মনুষ্য। তোমারই বা কি পরিচয়, বাহাদুরি আছে? তোমাকেই বা কে স্বীকার করবে? সব জিনিসটার ভিতরে যুক্তি থাকা চাই।

বাস্তবক্ষেত্রে যদি আমরা বিচার করি, তাহলে বিচারের সামঞ্জস্য খুঁজে পাব এবং সেই সামঞ্জস্য আমরা যখন পেয়ে যাচ্ছি, তখন ঈর্ষা, হিংসা, মাৎসর্য্য থাকে না, থাকবে না। সবটা কেটে যায়। সেই জিনিসটা বুঝতে হবে। সনাতন ধর্ম্মের Theory-র মধ্যে কি বলা হচ্ছে?—ভগবান্ এক, 'একমেবাদ্বিতীয়ম্'। এক অদ্বিতীয় পরব্রহ্ম ভগবান্। 'হরিমিহ পরমম্'—পরমারাধ্য বস্তু সেই ভগবান্—যাঁকে 'খোদা', 'আল্লাহ' বলা হল মুসলিম শাস্ত্রে। 'সর্ব্বশক্তিম্'—তিনি সর্ব্বশক্তিমান্, 'রসাব্ধিম্'—তিনি অখিলরসামৃত মূর্ত্তি। শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য, মধুর—এই পঞ্চ মুখ্যরস, আর সপ্ত গৌণরস—হাস্য, করুণ, বীর, রৌদ্র, অদ্ভুত, ভয়ানক, বীভৎস—এই দ্বাদশ রসের মধ্যে জীবাত্মার যে রসের তারতম্য আছে, তদনুসারে তারা সাধন-ভজন করেন, সেই তত্ত্ববস্তুকে লাভ করেন, তাঁর সাক্ষাৎ দর্শন করেন, তাঁর সাক্ষাৎ সেবার অধিকার পান—একথা বলা হয়েছে। জীব বা জীবাত্মা দুই রকম—বদ্ধজীব ও মুক্তজীব। সাধন করে যাঁরা মুক্ত হচ্ছেন, আর এক নিত্যমুক্ত—যাঁরা প্রথম থেকেই মুক্ত। ভগবত্তত্ত্ব জানবার, বুঝবার উপায় কি আছে? বলছেন,—'সাধনং শুদ্ধভক্তিম্'। ভক্তিবৃত্তি হল সেই ভগবানকে পাওয়ার একমাত্র উপায়। গতকাল সংক্ষিপ্তভাবে সম্বন্ধ-অভিধেয় ও প্রয়োজন-তত্ত্ব সম্বন্ধে আলোচনা হয়েছে। সম্বন্ধ কে?—ভগবান্ শ্রীগোবিন্দ। অভিধেয়—সেই ভগবানকে পাওয়ার উপায়—ভক্তি এবং পরম প্রয়োজন—ভগবৎপ্রেম বা প্রীতি। যেটা পেলে মানুষ কৃতকৃত্য হয়, তার জীবন ধন্য হয়, প্রাকৃত

জগতের ঈর্ষা, হিংসা, মাৎসর্য্য সব চলে যায়। যে জিনিস পেলে এ সংসারের কোন বস্তুতে মানুষের আসক্তি থাকে না, ভগবানকেই ভালবাসতে পারা যায়।

কেন তিনি প্রেমময় ভগবান্? বিচারগুলো ত' দেখানো হয়েছে। কিন্তু সব জিনিস ত' অনুভূতির ব্যাপার। আমি ত' আপনাদের সব জিনিসটা বুঝিয়ে দিতে পারব না। ভাষা প্রকাশ করতে পারে না ও জিনিস। কিন্তু সাধনার ক্ষেত্রে অনুভবের দ্বারা এ জিনিস বুঝতে হয়। সব জিনিসটা সবসময় সকলকে বুঝানো যায় না। সে দিক্ দিয়ে বলছেন সংক্ষিপ্তভাবে,—

আরাধ্যো ভগবান্ ব্রজেশতনয়স্তদ্ধাম বৃন্দাবনং
রম্যা কাচিদুপাসনা ব্রজবধূবর্গেণ যা কল্পিতা।
শ্রীমদ্ভাগবতং প্রমাণমমলং প্রেমা পুমর্থো মহান্
শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভোর্মতমিদং তত্রাদরো নঃ পরঃ ॥

যেটা আপনাদের কাছে সংক্ষিপ্তভাবে বলছি। ভগবানকে ভালবাসতে গেলে কিছু ত্যাগস্বীকারের প্রয়োজন আছে, তা না হলে হবে না। অনেকে বলছেন,—তুমি যা পার কর না, দিনান্তে তাঁকে একবার ডাকলেই হবে। এটা কি এত ফাঁকিবাজি জিনিস যে দিনান্তে একবার ডাকলেই হবে? "ব্রহ্ম-শিবাদি দেবতা যোগে-ধ্যানে যাঁরে নাহি পায়। সে হরি বঞ্চিত হলে কি হবে উপায় ॥" সেই তত্ত্ববস্তুকে লাভ কর্তে গেলে দিনান্তে একবার ডাকলে হয়ে গেল? একি ব্যাগার ঠেলা কাজ?

সাধন-ভজন মানে তত্ত্ববস্তু সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ করে সেই অনুসারে অগ্রসর হওয়া। একে বলে সাধন। সাধন পর্য্যায় যতদিন থাকবে, ততদিন পর্য্যন্ত মানুষের জ্ঞান সুষ্ঠু নয়। যখন তার অনুভূতি আসছে, বাস্তব দর্শন আসছে, Realisation আসছে, তখনই সেখানে 'ভজন' শব্দটা প্রয়োগ করা হয়েছে। আপনারা দেখবেন এসব শব্দগুলোর বৈশিষ্ট্য আছে দার্শনিক পরিভাষার মধ্যে। সাধন-ভজন কথাটা একইসঙ্গে বলা হয়, কিন্তু কথাদুটো এক নয়। সাধন হল প্রাথমিক পর্য্যায়, আর সাধনে যখন সিদ্ধিলাভ হয় তখন আর একটা অবস্থা। এসব কথাগুলো সুন্দরভাবে বুঝিয়েছেন শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু।

স্বয়ং ভগবান্ চৈতন্যমহাপ্রভু জগতে শান্তিস্থাপন করতে এলেন। মারামারি, কাটাকাটি, হানাহানির হাত থেকে রেহাই দেওয়ার জন্য, পরস্পর মিলেমিশে তোমরা চল, সেটা বুঝাবার জন্য এলেন। যদিও তাঁর High ideals গুলো রয়েছে, সেটা সকলের মাথায় ত' ঢুকবে না, সেজন্য সহজ করে কথাটা বলতে হচ্ছে। তিনি জগৎকে শিক্ষা দিতে এলেন—মিলেমিশে চল তোমরা, ঝগড়া,

বিবাদ করো না—মতান্তর-মনান্তর সৃষ্টি করো না। তোমরা সবাই জীবাত্মা, আত্মস্বরূপ। তোমাদের কর্ত্তব্য কি ? —পরম প্রেমময় ভগবান্ তাঁরই সেবা করা, তাঁরই ভজন করা, তাঁকেই তোমরা জান, বোঝ, সেইকথা শিক্ষা দিয়েছেন তিনি। নিজে জীবনে আচরণ করে গুরুরূপে—আচার্য্যরূপে তিনি জগৎকে শিক্ষা দিয়েছেন। এক্ষেত্রে কারও কোন বাহাদুরি নাই। সাধন-ভজনের অর্থ যদি আপনারা জানতে চান, শাস্ত্র বলছেন,—আকুলতা, ব্যাকুলতা। সাধন-ভজন অন্য কোন জিনিস নয়, এটা Practical side, Theoritical কিছু নয়। যারা তত্ত্ববস্তুর দিকে অগ্রসর হচ্ছেন না, তারা এটা Theoritical বলতে পারেন, কিন্তু Line এ চলছেন যাঁরা, Practice করছেন যাঁরা, তাঁরা বুঝতে পারছেন এটা Theoritical নয়, Practical—বাস্তব। বহু বিষয় রয়েছে। রাত অনেক হয়ে যাচ্ছে। আমি এখানে আমার বক্তব্য রাখছি।

আপনাদের যদি ধর্মতত্ত্ব নিয়ে কোনরকম প্রশ্ন থাকে, আমাদের পারমার্থিক মাসিক 'শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা' আছে। তাতে এসব বিষয় নিয়ে আলোচনা হচ্ছে ও হতে পারে। আপনারা প্রশ্ন দিতে পারেন বা এখানে যে-সব প্রচারকগণ আছেন, থাকেন, তাঁদের কাছে জিজ্ঞাসা করে জেনে নিতে পারেন। ভুল বুঝাবুঝি আজ হয়েছে আলোচনার অভাবে আমাদের পরস্পরের মধ্যে। এই আলোচনা যদি সুষ্ঠুভাবে হয় সমাজজীবনে, দেখবেন সব গণ্ডগোল কেটে গেছে। আমরা সেইরকম ধরণের একটা বিশ্বভ্রাতৃত্ব, বিশ্বমিলন চৈতন্য-মহাপ্রভুর আনুগত্যে এবং তদনুগত যাঁরা আচার্য্যবর্গ আছেন, তাঁদের আনুগত্যে দেখতে চাই, বুঝ্‌তে চাই।

বাঞ্ছাকল্পতরুভ্যশ্চ কৃপাসিন্ধুভ্য এব চ।
পতিতানাং পাবনেভ্যো বৈষ্ণবেভ্যো নমো নমঃ॥

শ্রীচৈতন্যে মর্ত্ত্যবুদ্ধি—নাস্তিকতা ও অপরাধ

[পূর্ব্বপ্রকাশিত ৪৩শ বর্ষ, ৫ম সংখ্যা, ১৯৫ পৃষ্ঠার পর]

পুস্তকের ১১৪ পৃষ্ঠায় লেখক চৈতন্যকে বড় জননেতা বলিয়াছেন। কিন্তু চৈতন্যদেব সনাতন ধর্ম্মকে গ্লানিমুক্ত করিবার জন্য নানা মতবাদের বিরুদ্ধে যে বাণী প্রচার করিয়াছিলেন, তাহাতে তখনকার দিনে এক বিপ্লবের সূচনা করিলেও তাঁহার প্রেমবাণীতে সকলে আকৃষ্ট হইয়াছিলেন। তাই তাঁহাকে

সকলে কলহের ঠাকুর না বলিয়া 'প্রেমের ঠাকুর' বলিয়া থাকেন। ইহাতে তাঁহাকে জননেতা বলা যায় না, বরং সনাতন ধর্ম্মের নেতা বা প্রবর্ত্তক বলা যায়।

লেখক ২৩৩ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন,—'মানবতামুখীন ও জীবসেবাই যথার্থ ঈশ্বর সাধনা।' এক্ষণে লেখক বলিতে চাহেন—মানবতা দেখানো ও জীবের সেবার দ্বারাই ঈশ্বরের সাধনা হয়, অর্থাৎ ঈশ্বরকে পৃথক্‌ভাবে সাধনার প্রয়োজন নাই। জীব জড়দেহতে আসক্তিবশতঃ দেহকেই আমি মনে করিয়া দেহের সুখ-দুঃখই আমার সুখ-দুঃখ বলিয়া অভিমান করে। বস্তুতঃ চিৎ ও জড়ের মিশ্রণে জীব গঠিত। জীবাত্মা চিদ্বস্তু, আর দেহটি জড়বস্তু। আত্মা দেহ হইতে চলিয়া গেলে দেহটি পড়িয়া থাকে ও তখন অচেতন দেহকে শ্মশানে লইয়া যাওয়া হয়। চিদ্বস্তু আত্মা যতদিন দেহে থাকে, ততদিন দেহে চেতনা থাকে। আত্মা সৎ-চিৎ-আনন্দময়, আর দেহ অসৎ-অচিৎ-নিরানন্দময়। আত্মা ভগবানের শক্তি, বিভিন্নাংশ ও দাস। আত্মার জন্ম-মৃত্যু নাই। দেহের জন্ম-মৃত্যু আছে। মন-বুদ্ধি-অহঙ্কারাত্মক সূক্ষ্মদেহে বিষয়ভোগ বাসনা থাকে, আর এই পঞ্চভূতাত্মক স্থূল দেহের দ্বারা জীব বিষয় ভোগ করিয়া থাকে। সূক্ষ্মদেহের কামনা-বাসনা নিজকে ও অপরকে দুঃখ দেয়, আর স্থূলদেহের ব্যাধি, জরা, মৃত্যু প্রভৃতি নিজকে ও অন্যকে দুঃখ দিয়া থাকে। কিন্তু আত্মা সচ্চিদানন্দ হওয়ায় উহাতে দুঃখ নাই, বরং আনন্দই বিদ্যমান্। তাই জীবের গঠনে চিৎ ও জড়ের মিশ্রণ থাকায় জীব যেমন আনন্দ পায়, তেমনিই দুঃখও পাইয়া থাকে। তাই জীবসেবায় নিরবচ্ছিন্ন আনন্দ থাকিতে পারে না। লেখকের লিখিত মানবতামুখীন ও জীবসেবা বলিতে দেহ সম্বন্ধে সেবা বুঝায়। মনুষ্যদেহধারিগণের মধ্যে সমজাতীয় পরস্পর দেহ-সম্বন্ধ আছে। মনুষ্যগণের দেহ সম্বন্ধে যে সেবা তাহাতে স্বসুখ বাসনা আছে, তাই ভোগের বস্তু পাইলেই ভোগ করিতে ব্যস্ত হয়।

জীবের গঠনে চিৎ ও জড় উভয়ই থাকায় চিৎ ও জড় উভয়ের সেবাই প্রয়োজন। চিৎস্বরূপ আত্মার সেবা করিতে গেলে আত্মার আহার ভগবানের নাম, লীলা-গুণ-সংকীর্ত্তন, প্রসাদ প্রভৃতি চিন্ময় বস্তু গ্রহণ করিতে হইবে; তজ্জন্য নিষ্কাম সাধুসঙ্গ প্রয়োজন। দেহ সম্বন্ধে জীব-সেবার দ্বারা চিত্তের প্রসারতা হইতে পারে, কিন্তু প্রকৃত জীব-সেবা হইবে না। জীব-সেবা অর্থে জীবকে খাইতে পরিতে দিলে তাহার ভোগবাসনা বাড়িয়া যাইবে, তাহাতে তাহার ভগবৎ উন্মুখতা প্রকাশিত হইবে না; বরং বদ্ধজীব ভগবদ্‌বিমুখ হইয়া পড়িবে। ভগবদুন্মুখতাই ত' ঈশ্বর সাধনা। জীবের মধ্যেই ঈশ্বর

আছেন সত্য, কিন্তু জীব ঈশ্বর নহেন। জীব ঈশ্বরের বিভিন্নাংশ। অংশ কখনও পূর্ণ বস্তুর সহিত সমান হয় না। জ্যামিতির প্রমাণে দেখা যায়—A part can not be equal to the whole. মহাপ্রভু বলিয়াছেন,—জীব কখনও ভগবান্ কৃষ্ণ নহে, তাই জীবে কৃষ্ণ-বুদ্ধি করা উচিত নহে।

"প্রভু কহে—'বিষ্ণু' 'বিষ্ণু' ইহা না কহিবা।
জীবাধমে 'কৃষ্ণ'-জ্ঞান কভু না করিবা !!
সন্ন্যাসী—চিৎকণ জীব, কিরণ-কণ-সম।
ষড়ৈশ্বর্য্যপূর্ণ কৃষ্ণ হয় সূর্য্যোপম ॥
জীব, ঈশ্বর-তত্ত্ব—কভু নহে 'সম'।
জ্বলদগ্নিরাশি যৈছে স্ফুলিঙ্গের 'কণ' ॥"

(চৈঃ চঃ মধ্য ১৮।১১১-১১৩)

ঈশ্বর কোথায় না আছেন? পৃথিবীর সর্ব্বত্রই ঈশ্বর আছেন। কিন্তু তাই বলিয়া সকলকে ঈশ্বর জানিয়া পূজা করা যায় না। চোর, ডাকাত, মদ্যপ, লম্পট হইতে বিষ্ঠার কৃমি-কীট পর্য্যন্ত সকল জীবের মধ্যে ঈশ্বর থাকিলেও তাহারা কখনও পূজার্হ নহে। যে জীব সেবার মধ্যে ভগবৎসেবা বা ভগবানকে সুখ দিবার প্রবৃত্তি নাই, তাহাকে কি ঈশ্বর-সাধনা বলা যায়? 'সেবা' কথাটি জীবে প্রযোজ্য হইতে পারে না। 'সেবা' শব্দের অর্থ সেব্যের অনুকূল সুখ-সাধন। একজন মাতালের সেবা করিতে গেলে তাহাকে মদ্য যোগাইলে তাহার অনুকূল সুখ-সাধন হইবে। একজন চোরকে চৌর্য্যবৃত্তির সন্ধান দিলে ও সাহায্য করিলে তাহার অনুকূল সুখ-সাধন হইবে। তাহাদের খাওয়া-পরা দিলে তাহারা সন্তুষ্ট হইবে না। কাজেই তাহাদের সেবা হইবে না। সেবা আত্মার ধর্ম্ম, দেহ-মনের ধর্ম্ম নহে। তাই সেবা একমাত্র সেব্য বস্তুরই হয়। অনন্তকোটি জীব সেব্যবস্তু হইতে পারে না। ব্রজেন্দ্রনন্দন কৃষ্ণ বা শচীনন্দন শ্রীচৈতন্যদেবই একমাত্র সেব্যবস্তু। তাঁহার সেবাই জীবের নিত্যধর্ম্ম। কোনও মনুষ্য বা জীবের সেবা করিলে অন্য মনুষ্য বা অপর জীব তাহাতে পীড়িত হয়। তাই সকলের প্রীতির জন্য ভগবানের সেবাই প্রয়োজন। কেননা, তাঁহার সেবাতেই তাঁহার অংশ সকলের সেবা হইয়া যায়। জীবে দয়া, নামে রুচি ও বৈষ্ণব সেবন—এই তিনটী শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা। এক্ষণে জীবে দয়া অর্থে জীবকে ভগবানের সেবায় নিযুক্ত করা বা উদ্বুদ্ধ করা। আর যাঁহারা ভগবানের সেবায় নিযুক্ত আছেন, সেই বৈষ্ণবগণের সেবা করিলে ভগবৎপ্রেম লাভ হইয়া থাকে। তাই মানবতামুখীন ও জীবসেবাই যথার্থ ঈশ্বরসাধনা নহে।

(১৪) লেখক ২৮৫ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন,—"কিন্তু তারপরেই আমরা সবিস্ময়ে দেখলাম, 'স্বরূপ দামোদরের কড়চা' নামক অমূল্য পুঁথিখানা হঠাৎ 'বেপাত্তা' হয়ে গেছে। অথচ কোন চৈতন্য চরিতের পুঁথির ক্ষেত্রে এমন সংবাদ আর শোনা যায় নি। একমাত্র 'স্বরূপ-দামোদরের কড়চা' অকস্মাৎ হারিয়ে গেল। অদ্যাবধি তার হদিশ মিললো না। কেন ?"

লেখক 'স্বরূপ দামোদরের কড়চা' প্রসঙ্গে যে প্রশ্ন উত্থাপন করিয়াছেন, তদুত্তরে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত মধ্যলীলা দ্বিতীয় পরিচ্ছেদের লিখিত বাণী স্মরণ করিতেছি,—

"চৈতন্যলীলা-রত্ন-সার স্বরূপের ভাণ্ডার,
তেঁহো থুইলা রঘুনাথের কণ্ঠে।
তাঁহা কিছু যে শুনিলুঁ, তাহা ইহাঁ বিস্তারিলুঁ,
ভক্তগণে দিলুঁ এই ভেটে ॥" (চৈঃ চঃ মধ্য ২।৮৪)

উক্ত শ্লোকের তাৎপর্য্যে পরমহংস ১০৮শ্রী শ্রীমৎ সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুর তাঁহার রচিত 'অমৃতপ্রবাহ-ভাষ্যে' লিখিয়াছেন,—"স্বরূপ গোস্বামী মহাপ্রভুর শেষলীলা কড়চা-সূত্র করিয়া শ্রীরঘুনাথদাস গোস্বামীর কণ্ঠে রাখিয়াছিলেন, অর্থাৎ তাঁহাকে কণ্ঠস্থ করাইয়া কবিরাজ-গোস্বামীর দ্বারা জগতে প্রচার করিয়াছেন। সুতরাং শ্রীস্বরূপকৃত কড়চা পৃথক্ পুস্তকাকারে লিখিত হয় নাই। এই শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতই স্বরূপের কড়চার নিষ্কর্ষ।"

(১৫) লেখক ৩১২ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন,—"অন্যত্র অদ্বৈত আচার্য্যের পুত্রেরা (পাঁচ পুত্র) কেউই চৈতন্যের অবতারত্বকে স্বীকার করেন নি।"

লেখকের ঐ মন্তব্য সম্পূর্ণ অসত্য। চৈতন্যচরিতামৃতে উক্ত আছে,—

"অচ্যুতানন্দ—বড় শাখা, আচার্য্য-নন্দন।
আজন্ম সেবিলা তেঁহো চৈতন্য-চরণ ॥" (চৈঃ চঃ আদি ১২।১৩)
"কৃষ্ণমিশ্র-নাম আর আচার্য্য-তনয়।
চৈতন্য-গোসাঞি বৈসে যাঁহার হৃদয় ॥
শ্রীগোপাল নামে আর আচার্য্যের সুত।
তাঁহার চরিত্র, শুন, অত্যন্ত অদ্ভুত ॥
* * * *
নাচিতে নাচিতে গোপাল হইল মূর্চ্ছিত।
ভূমেতে পড়িল, দেহে নাহিক সম্বিৎ ॥
* * * *

তবে মহাপ্রভু, তাঁর হৃদে হস্ত ধরি'।
'উঠহ, গোপাল,' বল বল 'হরি' 'হরি'॥
উঠিল গোপাল প্রভুর স্পর্শ-ধ্বনি শুনি'।
আনন্দিত হঞা সবে করে হরিধ্বনি॥"

(চৈঃ চঃ আঃ ১২।১৮-১৯, ২২, ২৫-২৬)

শ্রীরূপানুগবর্য্য ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ 'অনুভাষ্যে' লিখিয়াছেন,—"শ্রীঅদ্বৈত প্রভুর ছয়টী পুত্রের মধ্যে—'অচ্যুত, কৃষ্ণমিশ্র ও গোপাল'—এই ভ্রাতৃত্রয় শ্রীগৌরাঙ্গের দাস্যে নিযুক্ত ছিলেন। বলরাম, স্বরূপ ও জগদীশ —ইঁহারা তিনজনেই গৌরবিমুখ স্মার্ত্ত বা মায়াবাদী, সুতরাং অবৈষ্ণব।" (ক্রমশঃ)

—শ্রীচৈতন্যকৃষ্ণ দাসাধিকারী

শ্রীবাসুদেব গৌড়ীয় মঠে

শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের রথযাত্রা-মহোৎসব

শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকার বিশেষ কার্য্যে আমাকে শ্রীগুরুদেব—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত বামন গোস্বামী মহারাজের সহিত সাক্ষাৎ করিবার প্রয়োজন হয়। তজ্জন্য গত ৩রা জুলাই ১৯৯১, বুধবার কলিকাতা হইতে যাত্রা করিয়া ৪ঠা জুলাই শিলিগুড়ি পৌঁছাই। কিন্তু ইতিমধ্যে শ্রীগুরুদেব আসাম-প্রদেশে শুভযাত্রা করেন। ফলে আমাকে শ্রীসমিতির আসামস্থ শ্রীবাসুদেব গৌড়ীয় মঠে তাঁহার নিকট যাইতে হয়। তথায় পৌঁছিয়া দেখি, মঠরক্ষক পরম পূজ্যপাদ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত বিষ্ণু মহারাজ শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের রথযাত্রার বিরাট্ আয়োজন করিতেছেন। সে-কারণে তাঁহারই ইচ্ছায় আমাকে রথযাত্রায় বাসুগাঁও মঠে থাকিতে হইল।

শ্রীজগন্নাথদেবের রথকে সুসজ্জিত করার দায়িত্ব শ্রীপাদ নরনারায়ণ প্রভু, শ্রীপাদ অনঙ্গ প্রভু এবং আমারই উপর ন্যস্ত হইল। আমরা আমাদের যথাসাধ্য রথকে এবং শ্রীগুণ্ডিচা-মন্দির ও শ্রীমন্দির বিচিত্র রঙ্গিন্ কাগজ, ফুলমালা ইত্যাদিদ্বারা সুসজ্জিত করিলাম।

১১ই জুলাই, ২৬শে আষাঢ় ১৩৯৮, বৃহস্পতিবার শ্রীগৌড়ীয়-বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের শুদ্ধভক্তি মন্দাকিনীর মূল ভগীরথ জগদ্গুরু শ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের তিরোভাব-তিথিতে পরম পূজ্যপাদ শ্রীমৎ বিষ্ণু মহারাজ, শ্রীখগপতি ব্রজবাসী, শ্রীশ্যামসুন্দর ব্রহ্মচারী, শ্রীকৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী প্রমুখ বক্তৃগণ তাঁহার অতিমর্ত্ত্য চরিত্রের অবদান-বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে ভাষণ প্রদান করেন।

১২ই জুলাই, ২৭শে আষাঢ় ১৩৯৮ শুক্রবার অর্থাৎ শ্রীগুণ্ডিচা-মন্দির-মার্জ্জন দিবসে অস্মদীয় গুরুপাদপদ্ম তথা শ্রীসমিতির সভাপতি-আচার্য্য স্বয়ং এবং পরম পূজ্যপাদ শ্রীমৎ বিষ্ণু মহারাজ শ্রীগুণ্ডিচা-মন্দির মার্জ্জন করেন। তৎপরে ব্রহ্মচারিগণ ও উপস্থিত ভক্তবৃন্দ শ্রীমন্দির মার্জ্জন করেন। সন্ধ্যায় শ্রীমঠপ্রাঙ্গন ভক্তবৃন্দের সমাগমে মুখরিত হইয়া ওঠে। তখন মনে হচ্ছিল—এ যেন শ্রীনবদ্বীপধাম-পরিক্রমা আরম্ভ হইয়াছে।

২৮শে আষাঢ় ১৩৯৮, শনিবার, রথযাত্রা দিবসে বেলা ৩-৩০ মিনিটে শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবকে রথোপরি সিংহাসনে আরোহন করান হয়। তৎপরে ভক্তবৃন্দ 'জয় জগন্নাথ', 'জয় জগন্নাথ' কীর্ত্তন করিতে করিতে রথারূঢ় শ্রীজগন্নাথদেবকে ধীরে ধীরে সুন্দরাচল হইতে নীলাচলে শ্রীগুণ্ডিচা-মন্দিরের দিকে টানিয়া লইয়া যাইতে থাকেন। শ্রীজগন্নাথদেবের রথ যখন সহরের মধ্য দিয়া যাইতেছিল তখন উপস্থিত দর্শকবৃন্দ ও ভক্তবৃন্দ বিবিধ ফলমূল, বিশেষতঃ আসাম-প্রদেশের প্রচলিত 'লট্কা' ফল চতুর্দ্দিক হইতে রথের উপর এমনভাবে বর্ষণ করিতেছিলেন, তাহা সত্যই যেন শিলাবৃষ্টির ন্যায়। স্বচক্ষে দর্শন করিলে যে কেহ উহাকে শিলাবৃষ্টি বলিবেই।

এইভাবে চলিতে চলিতে সন্ধ্যায় রথ শ্রীগুণ্ডিচা-মন্দিরে পৌঁছায়। তৎপরে পূজ্যপাদ শ্রীমৎ বিষ্ণু মহারাজ শ্রীজগন্নাথদেবের আরতি করেন এবং ভোগ প্রদান করেন। তদনন্তর শ্রীজগন্নাথদেবকে শ্রীগুণ্ডিচা-মন্দিরে লইয়া যাওয়া হয়। শ্রীগুণ্ডিচা-মন্দিরে পৌঁছাইবার পর ভক্তগণকে বিচিত্র প্রসাদ বিতরণ করা হয়।

নবদিনাত্মিকা রথযাত্রার পঞ্চমদিবসে হেরাপঞ্চমীতে যথারীতি শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত হইতে হেরাপঞ্চমী ইতিবৃত্ত আলোচিত হয় এবং উৎসবাদিও অনুষ্ঠিত হয়। সুন্দরাচলে শ্রীজগন্নাথদেব অষ্টদিবস থাকিয়া নবমদিবসে নীলাচলে স্বীয় মন্দিরে প্রত্যাবর্ত্তন করেন।

এই মহোৎসবে আহূত, অনাহূত ও রবাহূত প্রায় দ্বি-সহস্রাধিক ব্যক্তিকে বিচিত্র মহাপ্রসাদ পরিবেশন করা হয়। স্থানীয় প্রশাসন বিভাগের সাহায্যও

বিশেষ ধন্যবাদার্হ। শ্রীমঠের সেবকবৃন্দ অক্লান্ত পরিশ্রম করায় এই মহোৎসব বিশেষ সাফল্যমণ্ডিত হয়।

বলাবাহুল্য, এই রথযাত্রা-মহোৎসব শ্রীসমিতির মূলকেন্দ্র শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠ, শ্রীউদ্ধারণ গৌড়ীয় মঠ, শ্রীকেশব গোস্বামী গৌড়ীয় মঠ, শ্রীগোপালজী গৌড়ীয় প্রচারকেন্দ্র এবং শ্রীনরোত্তম গৌড়ীয় মঠেও বিশেষ মহাসমারোহে অনুষ্ঠিত হইয়াছে।

—শ্রীসত্যানন্দ দাস ব্রহ্মচারী

মহামন্ত্র

আলোর আছে দাহিকা শক্তি,
ভক্তের আছে ঈশ্বরে ভক্তি ;
শ্রীকৃষ্ণ ভজিলে শ্রীমতী রাধা
আসিবে স্মরণ,
রাধাকৃষ্ণ অন্তরে চিন্তন,—
মূলাধার উঠিবে কাঁদিয়া।

কলিতে পাইতে উদ্ধার—
'হরে কৃষ্ণ'-নামে ঘুচিবে আঁধার ;
মুক্তমনে রাধাকৃষ্ণ-নাম—
উঠিবে নাচিয়া।

হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে ॥

মহামন্ত্রের মহাশক্তি-বলে—
সারা জগৎ আছে ব্যাপিয়া ;
এমত মহামূল্য নাম ছাড়িয়া
ওরে মূঢ় মন ! কোন্ আশায়—
হৃদি গৃহে আছিস্ বসিয়া ??

—ডাঃ গৌরীশঙ্কর চক্রবর্ত্তী
ফারাক্কা (মুর্শিদাবাদ)

শ্রীশ্রীরথযাত্রায়

সগণ শ্রীমন্মহাপ্রভুর মহিমা-কীর্ত্তন

জয় জয় জগন্নাথ পতিতপাবন।
নীলাচলচন্দ্র তুমি জগৎজীবন॥
জয় জয় বলদেব-সুভদ্রা-সুদর্শন।
সর্ব্বজীবের কর প্রভো অবিদ্যা-খণ্ডন॥
রথ আরোহণ তব, পরম মোহন।
নীলাচল হ'তে সুন্দরাচলেতে গমন॥
মহাপ্রভু নৃত্য করেন ভক্তগণ-সাথ।
ভক্তগণ বলে সবে—"জয় জগন্নাথ"॥
সাত সম্প্রদায় করে নাম-সংকীর্ত্তন।
ধীরে ধীরে জগন্নাথ করেন গমন॥
সর্ব্ব ভক্তগণ মিলি' করে হরিধ্বনি।
হরিধ্বনি বিনা আর কিছু নাহি শুনি॥
প্রতাপরুদ্ররাজ তব কৃপার ভাজন।
উত্তম হৈয়া যেঁহ কৈল নীচ-সেবন॥
তাঁহার পদারবিন্দে এই নিবেদন।
শ্রীগুরু আশ্রয়ে যেন সেবি ও চরণ॥

—শ্রীগৌরাঙ্গপদ ব্রহ্মচারী

"সাক্ষাৎ ভগবান্‌কে যেরূপ বিচার ক'র্‌বে, গুরুদেবকেও সেরূপ বিচার ক'র্‌বে, কোন অংশে কম মনে ক'র্‌বে না। * * * যদি তা' না করেন তবে শিষ্যস্থান হ'তে ভ্রষ্ট হ'য়ে যাবেন। মহান্ত গুরুদেবকে ভগবান্ হ'তে অভিন্ন—ভগবানের প্রকাশমূর্ত্তি না জান্‌লে কোনদিন ভগবানের নাম মুখে উচ্চারিত হ'বে না।"

—শ্রীল সরস্বতী প্রভুপাদ

॥ শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ ॥

স বৈ পুংসাং পরো ধর্ম্মো যতো ভক্তিরধোক্ষজে ।

ধর্ম্মঃ স্বনুষ্ঠিতঃ পুংসাং বিষ্বক্‌সেন-কথাসু যঃ ।

নোৎপাদয়েদ্ যদি রতিং শ্রম এব হি কেবলম্ ॥

অহৈতুক্যপ্রতিহতা যয়াত্মা সুপ্রসীদতি ॥

সেই ধর্ম্ম শ্রেষ্ঠ যাতে আত্ম-পরসন্ন ।
অধোক্ষজে অহৈতুকী ভক্তি বিঘ্নশূন্য ॥

অন্য ধর্ম্ম সুষ্ঠুরূপে পালে যেই জন ।
হরি-কথায় রতি নৈলে পণ্ড সেই শ্রম ॥

৪৩শ বর্ষ — ২৩ হৃষীকেশ, প্রদ্যুম্ন, ৫০৫ শ্রীগৌরাব্দ, ৩১ ভাদ্র, মঙ্গলবার, ১৩৯৮, ইং ১৭।৯।৯১ — ৭ম সংখ্যা

শ্রীকার্ত্তিক-ব্রত-মাহাত্ম্যম্

[শ্রীহরিভক্তিবিলাসস্য ষোড়শবিলাসে]

১। ব্রতন্তু কার্ত্তিকে মাসে যদা ন কুরুতে গৃহী ।
ইষ্টাপূর্ত্তং বৃথা তস্য যাবদাহূতনারকী ॥

১। গৃহস্থ মনুষ্য যদি কার্ত্তিকমাসে ব্রত না করে, তাহা হইলে তাহার ইষ্টাপূর্ত্ত কর্ম্ম বিফল হইবে এবং সে মহাপ্রলয় পর্য্যন্ত নরকে বাস করিবে ॥

২। ইষ্ট্বা চ বহুভির্যজ্ঞৈঃ কৃত্বা শ্রাদ্ধশতানি চ ।
স্বর্গং নাপ্নোতি বিপ্রেন্দ্র অকৃত্বা কার্ত্তিকে ব্রতম্ ॥

২। হে বিপ্রেন্দ্র ! যদি কোন ব্যক্তি কার্ত্তিকমাসে ব্রত না করিয়া বহু বহু যজ্ঞদ্বারা যাগ এবং শত শত শ্রাদ্ধ করে, তথাপি সে স্বর্গ প্রাপ্ত হয় না ॥

৩। যদ্দত্তঞ্চ পরং জপ্তং কৃতঞ্চ সুমহত্তপঃ।

সর্ব্বং বিফলতামেতি অকৃত্বা কার্ত্তিকে ব্রতম্ ॥ ৭ ॥

৩। যাহা দান করিয়াছে, যাহা জপ করিয়াছে এবং যে কিছু সমহৎ তপস্যা করিয়াছে, কার্ত্তিকমাসে ব্রত না করিলে তৎসমুদয় বিফলতা প্রাপ্ত হয় ॥ ৭ ॥

৪। নিয়মেন বিনা চৈব যো নয়েৎ কার্ত্তিকং মুনে।

চাতুর্ম্মাস্যং তথা চৈব ব্রহ্মহা স কুলাধমঃ ॥ ৮ ॥

ন গৃহে কার্ত্তিকে কুর্য্যাদ্বিশেষেণ তু কার্ত্তিকং।

তীর্থে তু কার্ত্তিকীং কুর্য্যাৎ সর্ব্বযত্নেন ভাবিনি ॥ ১০ ॥

৪। হে মুনে! যে ব্যক্তি বিনা নিয়মে "কার্ত্তিক মাস" অথবা "চাতুর্ম্মাস্য" যাপন করে, সে কুলাঙ্গার ব্রহ্মহত্যাকারী হয় ॥ ৮ ॥

হে ভাবিনি! কার্ত্তিকমাসে বিশেষ করিয়া "কার্ত্তিকব্রত" গৃহে করিবে না, সর্ব্বপ্রকার যত্নসহকারে তীর্থে কার্ত্তিকব্রত করিবে ॥ ১০ ॥

৫। বিষ্ণোঃ পূজা কথা বিষ্ণোর্বৈষ্ণবানাঞ্চ দর্শনম্।

ন ভবেৎ কার্ত্তিকে যস্য হন্তি পুণ্যং দশাব্দিকম্ ॥ ১৪ ॥

৫। যাহার পক্ষে কার্ত্তিকমাসে বিষ্ণুর পূজা, বিষ্ণুর কথা এবং বৈষ্ণবদিগের দর্শন না ঘটে, তাহার দশবৎসরের পুণ্য বিনষ্ট হয় ॥ ১৪ ॥

৬। মেরুতুল্যসুবর্ণানি সর্ব্বদানানি চৈকতঃ।

একতঃ কার্ত্তিকো বৎস সর্ব্বদা কেশবপ্রিয়ঃ ॥ ১৭ ॥

৬। হে বৎস! একদিকে মেরুতুল্য স্বুবর্ণ ও সর্ব্বপ্রকার দান, আর একদিকে সর্ব্বদা কেশবপ্রিয় কার্ত্তিকমাস ॥ ১৭ ॥

৭। ন কার্ত্তিকসমো মাসো ন কৃতেন সমং যুগম্।

ন বেদসদৃশং শাস্ত্রং ন তীর্থং গঙ্গয়া সমম্ ॥ ২১ ॥

৭। (হে ব্রহ্মন্!) কার্ত্তিকের সমান মাস নাই, সত্যযুগের সমান যুগ নাই, বেদের সদৃশ শাস্ত্র নাই, গঙ্গার সমান তীর্থ নাই ॥ ২১ ॥

৮। প্রবৃত্তানাঞ্চ ভক্ষ্যাণাং কার্ত্তিকে নিয়মে কৃতে।

অবশ্যং কৃষ্ণরূপত্বং প্রাপ্যতে মুক্তিদং শুভম্ ॥

৮। যে-সকল দ্রব্য নিত্য ভক্ষণ করে, কার্ত্তিকমাসে যদি তাহার কিছু সঙ্কোচ করা যায়, তাহা হইলে সে অবশ্য মুক্তিপ্রদ পরম মঙ্গল শ্রীকৃষ্ণের সারূপ্য লাভ করিবে ॥

৯। ব্রাহ্মণঃ ক্ষত্রিয়ো বৈশ্যঃ শূদ্রো বা মুনিসত্তম।
বিযোনিং ন ব্রজত্যেব ব্রতং কৃত্বা তু কার্ত্তিকে ॥

৯। হে মুনিসত্তম! ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য অথবা শূদ্র, ইহারা যদি কার্ত্তিক-মাসে ব্রত করে, তাহা হইলে কখনও বিযোনিপ্রাপ্ত হইবে না॥

১০। কার্ত্তিকে মুনিশার্দ্দূল সশক্ত্যা বৈষ্ণবং ব্রতম্।
যঃ করোতি যথোক্তন্তু মুক্তিস্তস্য করে স্থিতা ॥ ২৬ ॥

১০। হে মুনিশার্দ্দূল! যে ব্যক্তি কার্ত্তিকমাসে যথোক্ত বৈষ্ণব-ব্রত ধারণ করে, মুক্তি তাহার করে অবস্থিত হয়॥

১১। প্রদক্ষিণঞ্চ যঃ কুর্য্যাৎ কার্ত্তিকে বিষ্ণুসদ্মনি।
পদে পদেঽশ্বমেধস্য ফলভাগী ভবেন্নরঃ ॥

১১। যে নর কার্ত্তিকমাসে বিষ্ণুমন্দির প্রদক্ষিণ করে, সে পদে পদে অশ্বমেধ যজ্ঞের ফলভাগী হয়॥

১২। গীতং বাদ্যঞ্চ নৃত্যঞ্চ কার্ত্তিকে পুরতো হরেঃ।
যঃ করোতি নরো ভক্ত্যা লভতে চাক্ষয়ং পদম্ ॥ ৩২ ॥

১২। যে মনুষ্য কার্ত্তিকমাসে হরির অগ্রে ভক্তিপূর্ব্বক গীত, বাদ্য ও নৃত্য করে, সে অক্ষয় পদ প্রাপ্ত হয়॥ ৩২॥

১৩। সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য কার্ত্তিকে কেশবাগ্রতঃ।
শাস্ত্রাবতরণং পুণ্যং শ্রোতব্যঞ্চ মহামুনে ॥ ৩৫ ॥
সর্ব্বান্ ধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য ইষ্টাপূর্ত্তাদিকান্নরঃ।
কার্ত্তিকে পরয়া ভক্ত্যা বৈষ্ণবৈঃ সহ সংবসেৎ ॥ ৩৭ ॥

১৩। হে মহামুনে! সর্ব্বধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া কার্ত্তিকমাসে কেশবের অগ্রে পুণ্য-স্বরূপ শাস্ত্রাবতরণ শ্রবণ করিবে॥ ৩৫॥

মনুষ্য ইষ্টাপূর্ত্ত প্রভৃতি সকল ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া কার্ত্তিকমাসে পরম ভক্তিসহকারে বৈষ্ণবগণের সহিত বাস করিবে॥ ৩৭॥

১৪। যঃ পঠেৎ প্রযতো নিত্যং শ্লোকং ভাগবতং মুনে।
অষ্টাদশপুরাণানাং কার্ত্তিকে ফলমাপ্নুয়াৎ ॥ ৩৬ ॥

১৪। হে মুনে! কার্ত্তিকমাসে যে ব্যক্তি যত্নবান্ হইয়া নিত্য ভাগবতের শ্লোক পাঠ করেন, তাঁহার অষ্টাদশ পুরাণ-পাঠের ফল হয়॥ ৩৬॥

১৫। কার্ত্তিকে ভূমিশায়ী যো ব্রহ্মচারী হবিষ্যভুক্।
পলাশপত্রং ভুঞ্জানো দামোদরমথার্চ্চয়েৎ ॥
স সর্ব্বপাতকং হিত্বা বৈকুণ্ঠে হরিসন্নিধৌ।
মোদতে বিষ্ণুসদৃশো ভজনানন্দনির্বৃতঃ ॥ ৩৮ ॥

১৫। যে ব্যক্তি কার্ত্তিকমাসে **ভূমিশায়ী, ব্রহ্মচারী ও হবিষ্যাশী হইয়া পলাশপত্রে ভোজন করত দামোদরের অর্চ্চন করে,** সে সকল পাপ পরিত্যাগ করিয়া বিষ্ণুসদৃশ ও ভজনানন্দে নির্বৃত হওত বৈকুণ্ঠে হরি-সন্নিধানে আনন্দ লাভ করে ॥ ৩৮ ॥

১৬। বিষ্ণোঃ শিবস্য বা কুর্য্যাদালয়ে হরিজাগরম্।
কুর্য্যাদশ্বত্থমূলে বা তুলসীনাং বনেষু চ ॥
আপদ্গতো যদাপ্যম্ভো ন লভেৎ সবনায় সঃ।
ব্যাধিতো বা পুনঃ কুর্য্যাদ্বিষ্ণোর্নামপমার্জ্জনম্ ॥ ৪৩ ॥

১৬। **বিষ্ণু অথবা শিব কিম্বা অশ্বত্থমূল বা তুলসী-কানন—এই-সকল স্থানে হরিজাগরণ করিবে।** যদি আপদ্গত হইয়া স্নানের নিমিত্ত জল প্রাপ্ত না হয় অথবা ব্যাধিগ্রস্ত থাকে, তাহা হইলে বিষ্ণুনামদ্বারা অপমার্জ্জন অর্থাৎ জলস্পর্শ করিবে ॥ ৪৩ ॥

প্রশ্নোত্তর

প্রশ্ন—১। বাল্যকালে পরমার্থের অনুশীলন করা উচিত কি?

উত্তর—বালক-কালে পরমেশ্বরের সাধন হইতে পারে না,—এরূপ মনে করা অনুচিত। আমরা ইতিহাসে দেখিতেছি যে, ধ্রুব ও প্রহ্লাদ অত্যন্ত শৈশব-অবস্থায় পরমেশ্বরের প্রসাদ লাভ করিয়াছিলেন। যদি কোন মানব কোন কার্য্য করিতে সমর্থ হইয়া থাকেন, তবে মানব মাত্রেই যত্ন করিলে সেই কার্য্য সাধন করিতে পারিবেন, ইহাতে সন্দেহ কি? বিশেষতঃ যাহা প্রথম বয়স হইতে অভ্যাস করা যায়, তাহা ক্রমশঃ স্বভাবস্বরূপ হইয়া পড়ে।

(শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত ১/১)

প্রশ্ন—২। মাতা, পিতা প্রভৃতি গুরুজন যদি হরিভজনে বাধা দেন ও অন্যায় উপদেশ করেন, তবে তাহা পালন করা উচিত কি না?

উত্তর—গুরুজনের অন্যায় উপদেশ প্রতিপালন করিবে, এরূপ নয়; কিন্তু রূঢ়বাক্য ও অপমান-সূচক ব্যবহারদ্বারা তাঁহাদিগের প্রতি ঘৃণা প্রকাশ করিবে না। মিষ্ট বচন, নম্রতা, উপযুক্ত সময়ে বিনয়পূর্ণ বিচারদ্বারা তাঁহাদিগের অন্যায়াচরণের অনুমতি স্থগিত করিতে হইবে। (শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত ২/২)

প্রশ্ন—৩। সকলেই কেন ভক্ত হয় না?

উত্তর—সকল আত্মাতেই ভক্তিবীজ আছে। সেই বীজকে অঙ্কুর ও ক্রমে বৃক্ষরূপে পরিণত করিতে হইলে তাহার মালিগিরি করা আবশ্যক। ভক্তি-শাস্ত্রের আলোচনা, পরমেশ্বরের উপাসনা, সাধুসঙ্গ ও ভক্ত-নিষেবিত স্থানে বাস ইত্যাদি কতকগুলি কার্য্যের আবশ্যকতা আছে। ভক্তি-বীজ অঙ্কুরিত হইবার সময় ভূমি পরিষ্কার, কণ্টক, কঙ্করাদি দূরীকরণরূপ কার্য্যসমূহ নিতান্ত প্রয়োজন। ভক্তি-বিজ্ঞান জানিলে ঐ সকল কার্য্য সুচারুরূপে হইতে পারে। (প্রেমপ্রদীপ)

প্রশ্ন—৪। সাম্প্রদায়িক বৈষ্ণব-মতের দ্বারা জীব-জগতের কি উপকার হইতে পারে?

উত্তর—ইতিহাস আলোচনা করিয়া দেখিলে জানা যাইবে যে, এই পবিত্র ভারত-ক্ষেত্রে কখনই সম্প্রদায়-বিরুদ্ধ মত ছিল না। পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিতগণের সহিত যে পর্য্যন্ত ভারতের সংশ্রব হইয়াছে, সেই অবধিই কোন কোন লোক সম্প্রদায়-বিরোধী হইয়া পড়িয়াছেন। সম্প্রদায়-প্রণালী জীবের পক্ষে নিতান্ত হিতকর। *** সম্প্রদায়ে প্রবেশ করিলে সাধু-পদাশ্রয়, সদ্ধর্ম্ম-শিক্ষা, ধর্ম্মালোচন এবং ক্রম-বৈরাগ্য অনায়াসেই লাভ হইবে। যতদিন অসম্প্রদায়-বুদ্ধি প্রবল থাকিবে, ততদিন জীবনান্ত তর্ক-বিতর্ক করিয়াও আত্মপ্রসাদ পাইতে পারিবেন না। সম্প্রদায়স্থ কোন কোন ব্যক্তি স্বার্থপর হইয়া কদাচার করেন দেখিয়া সম্প্রদায়-প্রণালীকে নিন্দা করা অসার লোকের কার্য্য। সম্প্রদায়ে প্রবেশ-পূর্ব্বক সম্প্রদায়কে পবিত্র করিবার চেষ্টা করাই বুদ্ধিমান্ ব্যক্তির কর্ত্তব্য। বাজারে ভালদ্রব্য সর্ব্বদা পাওয়া যায় না এবং অনেক প্রকার কৃত্রিমতা চলিতেছে দেখিয়া বাজার সংস্কার করাই বিধেয়; কিন্তু ঐ সকল কারণের জন্য বাজার-প্রণালী উঠাইয়া দিবার যিনি চেষ্টা করেন, তাঁহার বুদ্ধিকে কোনপ্রকারে প্রশংসা করিতে পারি না। সম্প্রদায়ের প্রথম আচার্য্যগণ জগন্মঙ্গল বিধান করিবার জন্যই সম্প্রদায় নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন।

(সজ্জনতোষণী ৪।৪—'সম্প্রদায়-প্রণালী')

প্রশ্ন—৫। বৈষ্ণব কাহাকে বলে ?

উত্তর—উদিতবিবেক ব্যক্তিদিগের নামান্তর বৈষ্ণব। (জৈবধর্ম্ম ৩য় অঃ)

প্রশ্ন—৬। বৈষ্ণবধর্ম্ম কি ?

উত্তর—এই ধর্ম্ম জীবের নিত্যধর্ম্ম। বৈষ্ণব-জীব জড়মুক্ত-অবস্থায় বিশুদ্ধ চিদাকারে কৃষ্ণপ্রেমের অনুশীলন করেন এবং জড়বদ্ধ-অবস্থায় উদিতবিবেক হইয়া জড় ও জড়-সম্বন্ধের মধ্যে সমস্ত অনুকূল-বিষয় আদরপূর্ব্বক গ্রহণ করেন এবং প্রতিকূল সমস্তই বর্জ্জন করেন ; শাস্ত্রের বিধি-নিষেধের বশীভূত হইয়া কার্য্য করেন না। যে বিধি যখন হরিভজনের অনুকূল, তখনই তাহাকে আদর করেন, যখন প্রতিকূল, তখনই তাহাকে অনাদর করেন। নিষেধ-পক্ষেও বৈষ্ণবের ব্যবহার তদ্রূপ। বৈষ্ণবই জগতের সারপদার্থ। বৈষ্ণবই জগতের বন্ধু। বৈষ্ণবই জগতের মঙ্গল। (জৈবধর্ম্ম ৩য় অঃ)

প্রশ্ন—৭। বৈষ্ণব-ধর্ম্ম এত বড় হইলে ইহাকে লোকে 'নেড়া-নেড়ীর ধর্ম্ম' বলে কেন ?

উত্তর—বাউল, সাঁই, নেড়া, দরবেশ, কর্ত্তাভজা, অতিবাড়ী প্রভৃতির যে-সকল মত আছে, সে সমুদয়ই অবৈষ্ণব-মত। তাহাদের উপদেশ ও কার্য্য অত্যন্ত অসংলগ্ন। অনেকেই তাহাদের মতের আলোচনা করিয়া বৈষ্ণব-ধর্ম্মে অশ্রদ্ধা করেন। কিন্তু বাস্তবিক বৈষ্ণবধর্ম্ম ঐ সকল ধর্ম্মধ্বজীদিগের দোষের জন্য দায়ী হইতে পারে না। (প্রেমপ্রদীপ)

প্রশ্ন—৮। বৈষ্ণবেরা কি মূর্ত্তি-পূজক পৌত্তলিক নহেন ?

উত্তর—বৈষ্ণবেরা যে বিগ্রহ পূজা করেন, সে ঈশ্বরাতিরিক্ত একটী পুত্তলিকা নয়, কিন্তু ঈশ্বর-ভক্তির উদ্দীপক ও নিদর্শন-মাত্র। পরমেশ্বর অদ্বিতীয় পুরুষ, তাঁহার সমান বা অধিক কেহ নাই। সমস্তই তাঁহার অধীন। তাঁহার হিংসা উৎপন্ন করিতে পারে, এমত কিছুই নাই। তাঁহার প্রতি ভক্তি অর্জ্জন করিতে যা-কিছু কার্য্য করা যায়, তিনি হৃদয়নিষ্ঠা লক্ষ্য করিয়া তাহার ফল দান করেন। সমস্ত নিরাকার তত্ত্বেরই নিদর্শন আছে। নিদর্শন যদিও লক্ষিত বস্তু হইতে ভিন্ন বটে, তথাপি তদ্দ্বারা তদ্বস্তুর ভাব উপস্থিত হয়। ঘটিকা-যন্ত্রদ্বারা নিরাকার কাল, প্রবন্ধদ্বারা অতিসূক্ষ্ম জ্ঞান এবং প্রতিকৃতিদ্বারা দয়া-ধর্ম্মাদি নিরাকার বিষয়-সকল যখন পরিজ্ঞাত হইতেছে, তখন ভক্তি-সাধনে আলোচ্যগত লিঙ্গরূপ শ্রীবিগ্রহদ্বারা যে উপকার হয়, তাহাতে সন্দেহ নাই।

(প্রেমপ্রদীপ)

প্রশ্ন—৯। বৈষ্ণবেরা জীবের কি উপকার করেন ? তাঁহাদিগকে ত' জীবসেবা করিতে দেখা যায় না ?

উত্তর—জীবে দয়া বৈষ্ণব-ধর্ম্মের একটী প্রধান অঙ্গ। জীবের প্রতি দয়া করা বৈষ্ণবের একটী স্বভাব। যাঁহাতে এই স্বভাব লক্ষিত না হয়, তিনি সহস্র সহস্র বাহ্য-চিহ্ন ধারণ করিলেও বৈষ্ণব হইতে পারেন না। "জীবে দয়া, নামে রুচি, বৈষ্ণব-সেবা"—ইহাই মাত্র বৈষ্ণবের কর্ত্তব্য বলিয়া শ্রীশচীনন্দন সর্ব্বত্র শিক্ষা প্রচার করিয়াছেন। **** জীবকে কৃষ্ণোন্মুখ করাই বৈষ্ণবের প্রধান কার্য্য। যে-স্থলে স্থূল-শরীরের রোগ-নিবৃত্তি বা ক্ষুন্নিবৃত্তি করাই প্রধান উদ্দেশ্য হয়, সে-স্থলে বৈষ্ণবতা নাই ; যেহেতু তদ্দারা কেবল ক্ষণিক উপকার হয়, কিছু নিত্য উপকার হয় না। তবে যেখানে ঐসব কার্য্যের দ্বারা কৃষ্ণোন্মুখী প্রবৃত্তির সহায়তা করা যাইতে পারে, সেখানে তত্তৎ কার্য্যেও বৈষ্ণবের স্বতঃপ্রবৃত্তি হয়। (সজ্জনতোষণী ৪র্থ বর্ষ—'জীবে দয়া')

প্রশ্ন—১০। যদি শরীর নীরোগ না হয়, তাহা হইলে পরমার্থ লাভ কিরূপে হইবে ?

উত্তর—যদি প্রেম-সম্বন্ধ না থাকে, তবে দীর্ঘজীবন ও রোগ-শূন্যতা কেবল অনর্থের মূল। প্রত্যাহারক্রমে ইন্দ্রিয়-সংযম সাধিত হইলেও প্রেমাভাব হয় ; তবে তাহাকে শুষ্ক ও তুচ্ছ বৈরাগ্য বলি। যেহেতু পরমার্থের জন্য ত্যাগ বা গ্রহণ উভয়ই তুল্য ফলপ্রদ। নিরর্থক ত্যাগ কেবল জীবকে পাষাণবৎ করিয়া ফেলে। (প্রেমপ্রদীপ)

প্রশ্ন—১১। ধর্ম্ম কেন বহুবিধ হইল ?

উত্তর—শুদ্ধ অবস্থায় জীবের ধর্ম্ম একই প্রকার। জড়বদ্ধ হইয়া জীবের ধর্ম্ম আদৌ দুই প্রকার হইয়াছে অর্থাৎ সোপাধিক ও নিরুপাধিক। নিরুপাধিক ধর্ম্ম কখনই দেশভেদে পৃথক্ হয় না। জড়োপাধি-প্রাপ্ত জীবের দেশ-কাল-পাত্রভেদে প্রকৃতি-পার্থক্যক্রমে সোপাধিক ধর্ম্ম দেশ-বিদেশে ও কাল-ভেদে সহজেই পৃথক্ হইয়া পড়ে। উক্ত সোপাধিক ধর্ম্মই ভিন্ন ভিন্ন দেশে ভিন্ন ভিন্ন আকার ও নাম প্রাপ্ত হয়। জীব যত উপাধি হইতে পরিষ্কৃত হন, ততই তাঁহার ধর্ম্ম নিরুপাধিক হয়। নিরুপাধিক অবস্থায় সকল জীবেরই এক নিত্যধর্ম্ম। (সজ্জনতোষণী ৪।৩—'শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা')

প্রশ্ন—১২। কোন্ কোন্ সদ্‌গুণ অর্জ্জন করিতে পারিলে ভক্তি লাভ হয় ?

উত্তর—কৃষ্ণৈকশরণ ব্যতীত অন্য সদ্‌গুণ হইলেও যে-পর্য্যন্ত ভক্তিতে শ্রদ্ধা না হয়, সে পর্য্যন্ত ভক্তি হইবে না। কৃষ্ণ-ভক্তিবিহীন সদ্‌গুণ-সম্পন্ন জীবেরও

জীবন বিফল। কৃষ্ণভক্তির সঙ্গে সঙ্গে সর্ব্বজীবে দয়া, নিষ্পাপতা, সত্যসারতা, সমদর্শিত্ব, দৈন্য, শান্তি, গাম্ভীর্য্য, সরলতা, মৈত্রী, ফলদক্ষতা, অসৎ কথায় ঔদাসীন্য, পবিত্রতা, তুচ্ছকাম-ত্যাগ ইত্যাদি সকল গুণ সহজে উদয় হয়।

(সজ্জনতোষণী ৫।১—'সদ্‌গুণ ও ভক্তি')

প্রশ্ন—১৩। বিশ্বপ্রেম কৃষ্ণপ্রেম হইতেও কি উদার নহে ?

উত্তর—বিশ্বপ্রেম অথবা মানুষে মানুষে প্রেম কেবল আত্মপ্রেমের বিকার মাত্র। আত্মা ও আত্মাতে যে প্রেম, তাহাই একমাত্র আত্মপ্রেমের আদর্শ। প্রীতির স্বরূপ না বুঝিয়া যাঁহারা মনোবিজ্ঞান ও প্রীতিবিজ্ঞান ইত্যাদি লিখিয়াছেন, তাঁহারা যতই যুক্তি যোগ করুন না কেন, কেবল ভস্মে ঘৃত ঢালিয়া বৃথা শ্রম করিয়াছেন; দম্ভে মত্ত হইয়া স্বীয় স্বীয় প্রতিষ্ঠা সংগ্রহ করিয়াছেন মাত্র, জগতের কোন উপকার করা দূরে থাকুক, বহুতর অমঙ্গল সৃজন করিয়াছেন। *** একটী বিস্ফুলিঙ্গ যেরূপ দাহ্য-বিষয় লাভ করিয়া ক্রমশঃ মহাগ্নির পরিচয় দিয়া জগৎকে দহন করিতে সমর্থ হয়, একটী জীবও তদ্রূপ প্রেমের প্রকৃত বিষয় যে কৃষ্ণচন্দ্র, তাঁহাকে লাভ করিয়া প্রেমের মহাবন্যা উদয় করিতে সমর্থ হয়। (জৈবধর্ম্ম ২য় অঃ)

—জগদ্‌গুরু শ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুর

বিষয়ীর কৃষ্ণপ্রেম

মায়াবদ্ধ জীব ইন্দ্রিয়সুখান্বেষণে ব্যস্ত হইয়া বিষয়ের অনুসন্ধান করে। ইন্দ্রিয়ের পরিচালক পঞ্চেন্দ্রিয়ের পাঁচপ্রকার বিষয় প্রাপ্ত হইয়া সুখলাভ করেন। সুখের স্বল্পতা বা সুখের বিপরীত দুঃখ ইন্দ্রিয়-প্রীতিপর বদ্ধজীবের আদরণীয় হয় না। তিনি কৃষ্ণপ্রেমাকে 'বিষয়' বলিয়া গ্রহণ করিতে প্রস্তুত নহেন। কৃষ্ণপ্রেমা তাঁহার আনন্দের উদয় করায় না। যাঁহারা কৃষ্ণপ্রেমের আদর করেন, তাঁহাদিগকে ইন্দ্রিয়পরায়ণ বিষয়ী কোনরূপেই আদর করিতে পারেন না।

বিষয়ী লোভের বশবর্ত্তী হইয়াই স্বীয় নশ্বর ইন্দ্রিয়বৃত্তি চরিতার্থ করিবার জন্য সর্ব্বদা সচেষ্ট থাকায় কৃষ্ণপ্রেমার স্বরূপ উপলব্ধি করিবার বৃত্তিসমূহ রুদ্ধ হয়; কৃষ্ণপ্রেমাকে কোন জাগতিক জড়বিচারের ধ্যেয়বস্তু বলিয়া জ্ঞান হয় এবং নশ্বর ইন্দ্রিয়তর্পণই তাহার বিচারে কৃষ্ণপ্রেমার স্থান অধিকার করে।

প্রাকৃত-সহজিয়া জড়েন্দ্রিয়তর্পণে রত থাকিয়া আপনাকে কৃষ্ণপ্রেমে ডগমগ মনে করে এবং নিরুপাধিক কৃষ্ণপ্রেমার স্বরূপ উপলব্ধি করিতে না পারায় সাধুবৃত্তির বিদ্বেষই কৃষ্ণপ্রেমা বলিয়া তাহার অনুভূত হয়।

কৃষ্ণপ্রেমা তাঁহার বিক্ষেপাত্মিকা ও আবরণী বৃত্তিদ্বারা ভাগ্যহীন ইন্দ্রিয়তর্পণপর ব্যক্তির নিত্যানিত্য বিবেক স্তব্ধ করেন। ইন্দ্রিয়তর্পণপর ভোগী তৎকালে ইন্দ্রিয়তর্পণরহিত ত্যাগীর বিচারকে কোন স্থলে আবাহন ও কোন স্থলে বিসর্জ্জন করাই সুবিধাজনক মনে করেন। সেইজন্য শ্রীগৌরসুন্দর কৃষ্ণসেবোন্মুখ জনগণকে বিষয়ী ও যোষিৎ-লম্পট জনগণের সঙ্গ পরিত্যাগের জন্য উপদেশ করিয়াছেন। জড়বস্তুতে আসক্ত জনগণ অপ্রাকৃত অনুভূতির সহিত ভোগপর অনুভবকে সমজাতীয় জ্ঞান করিয়া সুজনগণের চরণে অপরাধী হন—রাইকানুর গানের ব্যপদেশে আপনাকে প্রেমিক আখ্যায় অভিহিত করেন। তাই কবি গাহিয়াছেন,—

কি আর বলিব তোরে মন।
মুখে বল 'প্রেম প্রেম', বস্তুতঃ ত্যজিয়া হেম,
শূন্যগ্রন্থি অঞ্চলে বন্ধন॥

অভ্যাসিয়া অশ্রুপাত, লম্ফ ঝম্ফ অকস্মাৎ,
মূর্চ্ছাপ্রায় থাকহ পড়িয়া।
এ লোক বঞ্চিতে রঙ্গ, প্রচারিয়া অসৎসঙ্গ,
কামিনী কাঞ্চন লভ গিয়া॥

প্রেমের সাধন ভক্তি, তা'তে নৈল অনুরক্তি,
শুদ্ধপ্রেম কেমনে মিলিবে?
দশ অপরাধ ত্যজি', নিরন্তর নাম ভজি',
কৃপা হলে সুপ্রেম পাইবে॥

না মানিলে সুভজন, সাধুসঙ্গে সঙ্কীর্ত্তন,
না করিলে নির্জ্জনে স্মরণ।
না উঠিয়া বৃক্ষোপরি, টানাটানি ফল ধরি',
দুষ্ট ফল করিলে অর্জ্জন॥

অকৈতব কৃষ্ণপ্রেম, যেন সুবিমল হেম,
এই ফল নৃলোকে দুর্ল্লভ।

কৈতবে বঞ্চনা মাত্র, হও আগে যোগ্য পাত্র,
তবে প্রেম হইবে সুলভ ॥
কামে প্রেমে দেখ ভাই, লক্ষণেতে ভেদ নাই,
তবু কাম প্রেম নাহি হয় ।
তুমি ত' বরিলে—কাম, মিথ্যা তাহে 'প্রেম' নাম,
আরোপিলে কিসে শুভ হয় ॥

বিষয়ীর কৃষ্ণপ্রেমা, আর শুদ্ধ কৃষ্ণভক্তের কৃষ্ণপ্রেমা একজাতীয় পদার্থ নহে। অবিবেকিগণের প্রীতি কখনই 'কৃষ্ণপ্রেমা' শব্দ-বাচ্য হইতে পারে না। অবিবেকিগণ যে সখ্য, বাল্যলীলাত্মক বাৎসল্য ও মধুর রসের চিত্রসম্বলিত গীতির আবাহন করেন, সেইগুলি জড়েন্দ্রিয়-তর্পণ-পরতায় পর্য্যবসিত হয় বলিয়া অপ্রাকৃত কৃষ্ণপ্রেমের অনুরাগিজনগণ উহাকে আদর করেন না। হাটে বাজারে রাইকানুর প্রেম বলিয়া যে কথা বিগীত ও শ্রুত হয়, তাহা কৃষ্ণানুরাগি-জনের নিকট 'মিছাভক্তি' নামে একটা ব্যাপারবিশেষ বলিয়া পরিত্যক্ত হয় মাত্র।

মদ্যপ যেরূপ নিজ রুচিবশে শৌণ্ডিকের পণ্যগ্রহণে দিগ্‌বিদিগ্‌জ্ঞানরহিত হইয়া ব্যস্ত হয়,—কামুক যেরূপ হিতাহিতজ্ঞানশূন্য হইয়া উন্মত্ত হয়, প্রাকৃত সহজিয়াও তদ্রূপ কৃষ্ণপ্রেমের নামে লোক ঠকাইতে গিয়া, মহাজনের গীতির তাৎপর্য্য উপলব্ধি করিতে না পারিয়া নিজের ভোগের সন্ধান লইতে লইতে অমঙ্গলের দিকে ধাবিত হন, জনপ্রীতি ও নিজের হরিবৈমুখ্যকেই কৃষ্ণসেবা বলিয়া বোধ করায় কৃষ্ণেতর বিষয়ে প্রীতিরহিত সাধুজনগণকে অপ্রীতিময় বলিয়া ধারণা করিয়া বসেন। কখনও ম্যাজিক লণ্ঠনে, কখনও বা মহাজন কবিতার সঙ্কলন-কার্য্যে রত থাকিয়া অবিবেচনার উন্নত শিখায় আরোহণ করেন। এরূপ দণ্ডই প্রাকৃত সহজিয়াগণের অনিবার্য্য। ভজনানন্দী জনগণ ইহাদের দুঃসঙ্গ পরিত্যাগ করেন। "**সিদ্ধান্ত বলিয়া চিত্তে না কর অলস। ইহা হইতে কৃষ্ণে লাগে সুদৃঢ় মানস ॥**"—প্রভৃতি বাক্যবিরোধী জনগণ আত্মবঞ্চিত হইয়া অমঙ্গলের পথে ধাবমান হয়। তাহাদের কেশ আকর্ষণ-পূর্ব্বক দুষ্প্রবৃত্তি দমন করাই শুদ্ধভক্তগণের একমাত্র কর্ত্তব্য।

জনসাধারণের দেখিবার ও বুঝিবার ভুল হয়, গ্লোব-ভালক্যানাইজিং কোম্পানীর স্বত্বাধিকারী শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুত ধীরেন্দ্র নাথ বন্দোপাধ্যায় মহাশয়ের ছায়াচিত্র প্রদর্শন ও রাইকানুর গীতিসঙ্কলনকারী চিত্রে প্রদর্শনীয় গোষ্ঠবিহারাদিবিষয়ক মহাজনগীতি-প্রকাশকারী ঘোষ মহাশয় প্রভৃতি ভদ্রগণ প্রাকৃত-সহজিয়াগণের নিকট হইতে বহু দূরে অবস্থান করেন বলিয়াই আমরা

জানি। সাহিত্যিক শ্রীযুত শ্যামলাল গোস্বামী মহাশয়ের ছায়াচিত্রযোগে যে গৌরলীলা প্রদর্শনের বিরুদ্ধে মিছাভক্ত সম্প্রদায়ের পোষণকার্য্যরত কণ্ট্রাক্টর সুবর্ণবণিকরত্ন দত্ত মহাশয় কেবল অর্থসাহায্যে জগতের মঙ্গল করিতে পারিবেন, এরূপ বোধ হয় না। ইঁহারা গৌড়ীয় মঠের প্রচার-প্রণালীর অনুগমন করিলে নিশ্চয়ই জগতের মঙ্গল করিতে পারিতেন।

—জগদ্‌গুরু শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর

বস্তু-বিচারে বৈষ্ণব ও অবৈষ্ণব

বর্ত্তমান বর্ষের প্রথম সংখ্যায় আমরা বস্তুবিষয়ক কথঞ্চিত আলোচনা করিয়াছি। সেই বস্তু বা তত্ত্ব সম্বন্ধে পরিচয় দিতে গিয়া ব্রহ্ম, আত্মা ও ভগবান্ প্রভৃতি শব্দসমূহ শাস্ত্রে পরিলক্ষিত হয়। কোথাও বা তাঁহাকে প্রাণস্বরূপ বা প্রাণময়, কোথাও কোথাও বা মনোময়, কোথাও বা রসস্বরূপ ও আনন্দস্বরূপ বা আনন্দমনোস্বরূপ, কোথাও বা সূর্য্য, বায়ু, ইন্দ্রস্বরূপ, কোথাও বা অন্নস্বরূপ বা অন্নময়স্বরূপ, শূন্য বা আকাশস্বরূপ প্রভৃতি বহু পরিভাষা পরিলক্ষিত হয়। কোথাও বা বিষ্ণু, কৃষ্ণ, চৈতন্য, শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য, নারায়ণ, বাসুদেব প্রভৃতি সংজ্ঞাও পরিলক্ষিত হয়। শাস্ত্রে বস্তুবিচারে বিবিধ আখ্যান লইয়া ভিন্ন ভিন্ন আচার্য্যগণের ভিতরে বিবিধ মতভেদ লক্ষিত হয়। উক্ত মতভেদসমূহের মধ্যে সংক্ষেপতঃ দুইটী শ্রেণী বিভাগ করা যাইতে পারে। এক শ্রেণীর আচার্য্যগণ —তাঁহারা নিজ নিজ স্বরূপকে বৈষ্ণব বলিয়া পরিচয় দেন, আর অন্য শ্রেণীর আচার্য্যগণ নিজদিগকে বৈষ্ণব বলিয়া পরিচয় দিতে কুণ্ঠা বোধ করায় অবৈষ্ণব নামে অভিহিত হইয়া গর্ব্ব অনুভব করিতেছেন। উক্ত বৈষ্ণব ও অবৈষ্ণব শ্রেণীদ্বয়ের মধ্যে প্রত্যেকেরই বিভিন্ন শাখা বর্ত্তমান।

বৈষ্ণব-বিভাগে শাখা বর্ত্তমান থাকিলেও মূলতঃ সকল মতেই উপাস্য-উপাসকের নিত্যভেদ ও উপাসনীয় নিত্যত্ব ও জগতের সত্যতা অঙ্গীকৃত হইয়াছে। এই নিমিত্ত বিষ্ণুস্বামী, রামানুজ, মধ্ব, নিম্বার্ক ও গৌড়ীয়-বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীরূপ, সনাতন ও শ্রীজীব প্রভৃতি গোস্বামিবর্গ সকলেই উক্ত তত্ত্ব-ত্রয়ের নিত্যত্ব স্বীকার করিয়া পরমবৈষ্ণব নামে অভিহিত হইয়াছেন। উক্ত আচার্য্যবর্গের বিচার-নৈপুণ্য ও শাস্ত্রজ্ঞানের মাধুর্য্য এই যে, তাঁহাদের মধ্যে

সমস্ত বিরোধ ও অবিরোধ, ব্যক্ত ও অব্যক্ত তত্ত্বের সর্ব্বাঙ্গসুন্দর চমৎকারিতা-পূর্ণ সঙ্গতি থাকায় এবং একমাত্র ভক্তিকেই উপায়স্বরূপ অঙ্গীকার করায় পরস্পরের মধ্যে কোন ভেদ লক্ষিত হয় না, পরন্তু বৈশিষ্ট্যই লক্ষিত হয়। তাঁহাদের মধ্যে বিচার-বৈশিষ্ট্য থাকায় তারতম্য বিচারে বিবিধ উজ্জ্বলরসের উৎপত্তি হইয়াছে।

অবৈষ্ণব-বিভাগে প্রায় সকলেরই বিচারে উপাস্য-উপাসকের নিত্য অভেদ ও উপাসনার ব্যবহারিকতাহেতু অনিত্যত্ব ও জগৎ মিথ্যা বলিয়া কল্পিত হইয়াছে। এইজন্য শাক্যসিংহ বুদ্ধ, মহাবীর স্বামী, কপিল, পতঞ্জলি, শঙ্কর ও তদনুগ সমন্বয়বাদী পঞ্চোপাসকগণ সকলেই অবৈষ্ণব বলিয়া পরিচিত। উক্ত আচার্য্যবর্গের মধ্যে বিচারের ও শাস্ত্রজ্ঞানের বিশেষ নৈপুণ্য লক্ষিত না হওয়ায় পারমার্থিক হউক বা ব্যবহারিকই হউক কোন বস্তু বিচারেই সঙ্গতি পরিলক্ষিত হয় না। পরন্তু উহাদের প্রত্যেকেরই বিচারের মধ্যে বহু প্রকার ভেদ লক্ষিত হয়। প্রাকৃত বিচারের অনুগত সম্প্রদায়ের মধ্যে এই প্রকার ভেদ স্বতঃসিদ্ধ। উহাদের মধ্যে বস্তু-প্রাপ্তির আশায় কেহ বা বাহ্য-বিজ্ঞানকে, কেহ বা কেবল-জ্ঞানকে, কেহ বা যোগকে, কেহ বা কর্ম্মকে, কেহ বা নানা প্রকার দেবদেবীর পূজাকে উপায়-স্বরূপ অঙ্গীকার করিয়া পরস্পরের মধ্যে বিষম ভেদ বিবাদ স্থাপন করিয়া মহা অশান্তি ও জগজ্জঞ্জাল সৃষ্টি করিয়াছেন।

ভেদ-জগতে মতভেদ অবশ্যম্ভাবী জানিয়া পরস্পর মতবাদিগণের ভিতরে একটা সামঞ্জস্য স্থাপনকল্পে আচার্য্য শঙ্কর জগতের এক নূতন ধারায় মিথ্যাত্বের কল্পনা করিলেন। যে-ভেদ হইতে নানা প্রকার মতভেদ ও জগজ্জঞ্জাল সৃষ্টি হইতেছে সেই ভেদের (তন্মতে) মূলীভূত কারণ, জগৎকে মিথ্যারূপে প্রতিপন্ন করিতে পারিলে ভেদের হস্ত হইতে উদ্ধার লাভ করা যায়। এইরূপ চিন্তা করিয়া আচার্য্য শঙ্কর সমস্ত ভেদের সঙ্গতি করিতে বৃথা চেষ্টা করিয়াছেন।

আচার্য্য শঙ্কর শুধু ভেদমিথ্যাত্ব-স্থাপনের চেষ্টা করিয়াই নিরস্ত হন নাই; পরন্তু তাঁহার ব্যবহারিকতা প্রদর্শনের জন্যও বিশেষ যত্ন করিয়াছেন। ব্যবহারিকতা নিরাকৃত হইলে পারমার্থিকতা প্রকাশ পায়। এই পারমার্থিকতার স্বরূপবর্ণনে তিনি সেই বস্তুতত্ত্বের নির্দ্দেশ করিতে গিয়া তাহা নিরাকার, নির্ব্বিশেষ ও স্ত্রী-পুরুষ হইতে ভিন্ন ক্লীবব্রহ্ম বলিয়া প্রতিপন্ন করিয়াছেন। বস্তুকে রূপবান্ বিশেষযুক্ত পুরুষ বলিয়া স্বীকার করিলে, বস্তুতে ভেদধর্ম্মের ত্যাগ আশঙ্কা করিয়া শঙ্কর তাহা হইতে দূরে অবস্থান করিতে অভিলাষ করিতেছেন। শাঙ্করগণের এবম্প্রকার সিদ্ধান্ত স্থাপনের কারণ অনুসন্ধান করিলে

জানা যায়, শাস্ত্র-বিচারে সঙ্গতিজ্ঞানের অভাবেই তাঁহাদের মধ্যে পরিস্ফুট। বিরুদ্ধ বস্তুর সামঞ্জস্য স্থাপন করা কেবলমাত্র বস্তুগতপ্রাণ ব্যক্তিদিগের মধ্যেই সম্ভবপর এবং বস্তুতে বিরুদ্ধ ধর্ম্মের যুগপৎ সমাবেশই বস্তুর ঐশ্বর্য্য। তাই আচার্য্য শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ বলিয়াছেন,—"বিরুদ্ধধর্ম্মং তস্মিন্ ন চিত্রম্।" (তত্ত্বসূত্র)

—জগদ্‌গুরু শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী

আত্মধর্ম্ম বা সনাতন ধর্ম্মের বৈশিষ্ট্য

জড় জগৎ পরিবর্ত্তনশীল। আজ যে সদ্যপ্রসূত শিশু, কাল সে প্রভুর বদন বালক, পরে সে বীর্য্যবান্ যুবক, ক্রমে সে প্রশান্তমূর্ত্তি প্রৌঢ়, শেষে সে পলিতকেশ, গলিতদন্ত বৃদ্ধ। স্নিগ্ধ প্রভাত কিরণ দেখিতে দেখিতে প্রখর হইতে প্রখরতর হইয়া ক্রমে তমসাচ্ছন্ন হইয়া যায়। আজ যেখানে অত্যুচ্চ পর্ব্বতশ্রেণী বিরাজমান, কাল তথায় গভীরতম সমুদ্র অবস্থিত দেখিতে পাই। সাগর শুকাইয়া যাইতেছে, মরুভূমি জলপ্লাবিত হইতেছে। বহু জনাকীর্ণ রাজধানী কালে শ্মশানে পরিণত হইতেছে, শ্মশান নন্দনকাননে পরিণত হইতেছে। ইতিহাস ইহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ। ইহজগতে হেয়তা ও অনুপাদেয়তা যথেষ্ট পরিমাণে বর্ত্তমান। প্রাণাধিক পুত্র স্বহস্তে বৃদ্ধ পিতাকে বিষপান করাইয়া রাজ্যলাভ করিতেছে, প্রিয়তমা পত্নী উপপতির সাহায্যে স্বামীর বক্ষে অস্ত্রাঘাত করিতেচে, সহোদর ভ্রাতা ভ্রাতার সর্ব্বনাশ সাধনে তৎপর। নির্দ্দোষ দণ্ড পাইতেছে, খুনী আসামী বেকসুর খালাস হইতেছে। ইহা আমরা প্রতিনিয়তই দর্শন করিতেছি। এ রঙ্গমঞ্চে নিত্য ও নির্ম্মল আনন্দের সম্পূর্ণ অভাব। বেশ আছি কোনও অভাব নাই,—সুন্দর রূপ, বহুগুণে গুণী, অদ্ভুত পাণ্ডিত্য, আশ্চর্য্য বুদ্ধি, অতুল ঐশ্বর্য্য, সুবৃহৎ অট্টালিকা, পতিপ্রাণা পত্নী, সোণার চাঁদের মত পুত্র, কন্যা, সবই আছে। হঠাৎ কোথা হইতে এক ভবদাবাগ্নি জ্বলিয়া উঠিল—মুহূর্ত্তমধ্যে সবই ভস্মীভূত হইয়া গেল। পণ্ডিত মূর্খ হইতেছে, জ্ঞানী অজ্ঞানী হইতেছে, অজ্ঞানী জ্ঞানী হইতেছে, ধনবান্ দরিদ্র

হইতেছে, দরিদ্র ধনবান্ হইতেছে। বলবান্ দুর্ব্বল হইতেছে, দুর্ব্বল বলবান্ হইতেছে। এ প্রহেলিকার মধ্যে নিত্যসত্য বস্তুর সংবাদ কি পাওয়া যায়?

রোম গ্রীস ও চীনের মনীষিবৃন্দের এবং ভারতীয় বিদ্বৎসম্প্রদায়ের জড়-বস্তুসমূহে ধারণাগত ইতিহাস পর্য্যালোচনা করিলে দেখিতে পাই যে, তাঁহারা যাহাকে সত্য বলিয়া উপলব্ধি করিয়াছিলেন, কালে তাহার ধারণা শিক্ষাপ্রভাবে পরিবর্ত্তিত হইয়া যায়। কামক্রোধহত ব্যক্তির ধারণা প্রকৃতিস্থ হইলে অন্য আকার ধারণা করে। আমাদের নিজেদের জীবন আলোচনা করিলেও দেখিতে পাই যে, সময়ে সময়ে আমাদের ধারণাসমূহ আশ্চর্য্যরূপে পরিবর্ত্তিত হইয়া যায়। প্রতি বর্ষে, প্রতি মাসে, প্রতি দিনে, প্রতি ঘণ্টায়, প্রতি মিনিটে, প্রতি মুহূর্ত্তে আমাদের এই পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করিয়া থাকি। তবে কি নিত্য, সত্য, উপাদেয়, নির্ম্মল আনন্দ লাভের আশা নাই?

সত্যানুসন্ধিৎসু হইয়া সনাতন ধর্ম্ম বিচার করিলে উক্ত প্রশ্নের যথাযথ উত্তর পাওয়া যায়। সনাতন ধর্ম্ম কি? সনাতন ধর্ম্ম কাহার ধর্ম্ম? সনাতন ধর্ম্মের প্রয়োজন কি? এবং কিরূপেই বা তাহা লাভ করা যায়? —এ সকল বিষয়ে আলোচনা করা প্রত্যেক মনুষ্যেরই কর্ত্তব্য। অনিত্য ও নশ্বর বস্তুতে সনাতন ধর্ম্মের অভাব আছে সত্য, কিন্তু সনাতন অর্থাৎ নিত্য বস্তুতে সনাতন ধর্ম্ম নিত্যকালই বর্ত্তমান। নিত্যানন্দের উৎস এখানেই বিরাজমান।

গীতা বলেন, ক্ষিতি, অপ্, তেজঃ, মরুৎ, ব্যোম্ ও মন, বুদ্ধি ও অহঙ্কার ভগবানের অপরাপ্রকৃতি-প্রসূত অর্থাৎ প্রাকৃত। সুতরাং পঞ্চভূতাত্মক দেহ ও মন প্রাকৃত। প্রাকৃত বস্তুমাত্রেই পরিবর্ত্তনশীল, তাহাদের ধর্ম্মও পরিবর্ত্তনযোগ্য। সুতরাং দেহের ধর্ম্ম ও মনের ধর্ম্ম সনাতন নহে। ভগবানের পরা-প্রকৃতি জীব অপরাপ্রকৃতি হইতে জাত নহে। ভগবান্ প্রকৃতির অন্তর্ভুক্ত বস্তু নহেন, তিনি—অপ্রাকৃত। জীব বলিলে দেহ ও মনকে বুঝায় না, চিৎকণ আত্মাকে নির্দ্দেশ করে।

অসূর্য্যানাম তে লোকা অন্ধেন তমসাবৃতাঃ।
তাং স্তে প্রেত্যাভিগচ্ছন্তি যে কে চাত্মহনো জনাঃ॥

যাহারা আত্মহা, তাহারা আসুরী বৃত্তি অবলম্বন করিয়া অজ্ঞানান্ধ-কারাবৃতচিত্তে নানা প্রকার প্রলাপ দেখিয়া থাকে। আত্মার সন্ধান পাইলেই বিকার কাটিয়া যায়। আত্মা নিত্য, তাহার ধর্ম্মও নিত্য অর্থাৎ সনাতন। আত্মার নিত্যবৃত্তি শুদ্ধভক্তিই সুনির্ম্মল সনাতন ধর্ম্ম। ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষের পরপারে পঞ্চম পুরুষার্থ ভগবৎ-প্রেমাই প্রয়োজন বা ফল। জীবের

স্বরূপ ভগবদ্দাস। আত্মবৃত্তি ভগবদ্দাস্যের আস্বাদন পাইলেই জীব বলিয়া উঠেন,—

নাস্থা ধর্ম্মে ন বসুনিচয়ে নৈব কামোপভোগে।
যদ্‌যদ্ভব্যং ভবতু ভগবন্ পূর্ব্বকর্ম্মানুরূপম্ ॥
এতৎ প্রার্থ্যং মম বহুমতং জন্মজন্মান্তরেঽপি।
ত্বৎ পাদাম্ভোরুহযুগগতা নিশ্চলা ভক্তিরস্তু ॥

তখন জাগতিক কোনও অসুবিধা তাঁহার হৃদয়ে স্থান পায় না। অপ্রাকৃত জীব বন্ধনাবস্থায় স্থূল ও সূক্ষ্ম প্রাকৃতিক উপাধিদ্বয়ে সুদৃঢ়রূপে আবদ্ধ থাকাকালে অপ্রাকৃততত্ত্ব উপলব্ধি করিতে পারে না। জড়দেহের গুণসকল আলোচনা করিতে করিতে মনের ভাবসকল উদয় হয়, এ কারণ মানবগণের কল্পনা-বিভাবনারূপ সমুদয় চিন্তা ও ধারণা প্রকৃতিমূলক, সুতরাং অপ্রাকৃত হইতে পারে না। সনাতন ধর্ম্মে অপ্রাকৃত তত্ত্ব। এই সত্য বস্তু অবরোহপন্থায় শ্রীভগবান্ হইতে ব্রহ্মার হৃদয়ে প্রকটিত হইয়াছিলেন। ব্রহ্মার নিকট হইতে নারদ, নারদ হইতে ব্যাস এবং ব্যাস হইতে আম্নায় পরম্পরায় বৈয়াসিক সম্প্রদায় সেই সমুদয় বস্তু লাভ করিয়াছেন। মহাজন গাহিয়াছেন,—

"ভ্রমিতে ভ্রমিতে যদি সাধুসঙ্গ হয়।
পুনরপি গুপ্ত নিত্য-ধর্ম্মের উদয় ॥"

সূর্য্য যেরূপ মেঘোদয়ে আবৃত হয়, সনাতন ধর্ম্মও সেইরূপ কাল-প্রভাবে আবৃত হইলেও নিত্যকাল বর্ত্তমান। সনাতন ধর্ম্ম অপ্রকাশিত হইলে ভগবান্ কখনও স্বয়ং অবতার হন, কখনও পার্ষদ-ভক্তদিগকে ভক্তাবতাররূপে প্রেরণ করেন। নিত্যযুক্ত ভগবদ্ভক্ত কখনও মায়াদ্বারা অভিভূত হন না। তিনি বদ্ধ-জীবের ন্যায় স্বতন্ত্রতার অসদ্ব্যবহার না করিয়া নিত্যকাল সনাতন ধর্ম্মে অবস্থিত থাকেন। প্রাকৃত ধারণাময়চিত্ত অপ্রাকৃতবস্তু ধারণ করিবার যোগ্য নয়। কায়মনোবাক্যে ভগবান্ ও তদীয় হরিজনের দাসত্বে অবস্থিত হইবার পূর্ব্বে সুনির্ম্মল সনাতন ধর্ম্মের আস্বাদন হইতে পারে না। প্রাকৃত ও অপ্রাকৃত, নিত্য ও অনিত্য, আত্ম ও অনাত্ম, ভক্তি ও ভুক্তি—ইহাদের পার্থক্য সদ্‌গুরু-চরণাশ্রয়ে বিশেষরূপে অভিজ্ঞাত না হইয়া পরমার্থের সহিত শারীরিক, মানসিক, লৌকিক, ব্যবহারিক, নৈতিক ও সামাজিক ইতর ভাবসমূহের গোঁজামিল দিয়া যে অভিনব তত্ত্ব সৃষ্টি করা হয়, তাহা সনাতন নহে। দেহ ও মনের মঙ্গলবিধাতা প্রচারকবৃন্দ অনাত্মপ্রতীতিতে অবস্থিত হইয়া পরমার্থ-স্মৃতির সহিত ইতর স্মৃতির সমন্বয় করিবার প্রয়াস পাইয়া যে কর্ম্মবিদ্ধ ও জ্ঞানবিদ্ধ

ভক্তির প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন, শুদ্ধভক্ত তাহার আদর করেন না। কিন্তু সরল-প্রাণ নিরীহ ব্যক্তিগণ তাহাতে বিষম সমস্যায় পড়িয়াছেন। কেন না, বদ্ধাবস্থায় ভোগপ্রবণতানিবন্ধন বদ্ধচিত্তের অনুকূলে উহাকেই সনাতন ধর্ম্ম মনে করিয়া বিষমভ্রমে অন্ধ হইতেছেন—শুক্তিতে রজতভ্রম হইতেছে। দুগ্ধে ঘৃত আছে বলিয়া প্রজ্জ্বলিত অগ্নিতে দুগ্ধ ঢালিয়া দিলে অগ্নি নির্ব্বাপিত হইয়া যায়, কিন্তু সেই দুগ্ধ হইতে ঘৃত নিষ্কাশিত করিয়া নির্ব্বাণোন্মুখ অগ্নিতে ঢালিয়া দিলে উহা প্রজ্জ্বলিত হইয়া উঠে। বস্তুতঃ শুদ্ধভক্তি বা পরাভক্তিই আত্মধর্ম্মবিকাশের অনুকূল, বিদ্ধভক্তি তাহার প্রতিকূল। শুদ্ধভক্তি বা পরাভক্তিকেই সনাতন ধর্ম্ম, নিত্যধর্ম্ম, আত্মধর্ম্ম বা জৈবধর্ম্ম বলে। ভগবান্ নিত্য, ভক্ত নিত্য ও ভক্তি নিত্য। এই তিন বস্তুই আনন্দময়। তথায় অনিত্যতা, হেয়তা বা অনুপাদেয়তার স্থান নাই।

আমরা যখন ভোগের অনিত্যতা, মায়াবাদীর ঈশবিমুখতা এবং দেহ ও মনের পরিবর্দ্ধনশীলতা উপলব্ধি করিয়া শ্রদ্ধান্বিতচিত্তে সদ্ধর্ম্মাশ্রয়ের জন্য ব্যাকুল হই, তখনই ইহা বুঝিবার অবসর হয় যে, আমরা চিদ্বস্তু এবং বৃন্দাবনেই আমাদের নিত্যবাস। মায়া-প্রসূত এই সংসার-বৃক্ষের কোটরে পক্ষীর ন্যায় কিছুদিনের জন্য বাস করিতেছি মাত্র। জড়মিশ্রিত বুদ্ধিতে ভোক্তার সজ্জায় নশ্বর জড়ের ভোগ অঙ্গীকার করিয়া অনাত্ম দেহ ও মনকে আত্মবস্তুভ্রমে আমাদের সর্ব্বনাশ হইয়াছে।

যাহা নিত্যকাল অবস্থিত তাহাই 'সৎ'। 'অসৎ' পরিবর্ত্তন-ধ্বংসশীল, সদ্গুরুর নিকট হইতে দীক্ষা, সৎসঙ্গ ও সচ্ছাস্ত্র অধ্যয়ন করিতে করিতে অনর্থের অপগমে যাবতীয় অসত্য ধারণা অন্তর্হিত হয়। তখনই নিত্যতত্ত্বের রহস্য উদ্ঘাটিত হইয়া যায়। তখনই "দদামি বুদ্ধিযোগং তং যেন মামুপযান্তি তে॥" —এই শ্লোকের তাৎপর্য্য হৃদয়ঙ্গম হয়। ঘনঘটাচ্ছন্ন মেঘের অপগমে সৌভাগ্যসূর্য্যের রশ্মি তখনই দেখা যায়—চক্ষু ফুটিয়া উঠে এবং বধিরতা নষ্ট হয়। তখনই আমরা শ্রীগুরুদেবের "কোটিচন্দ্র-সুশীতল" পদকমল দর্শন করিয়া অমরত্ব লাভ করিতে পারি। স্বীয় কার্পণ্য ও ভগবৎপ্রীতিহীনতা উপলব্ধি করিয়া চোখের জলে বুক ভাসিয়া যায়।

"অজ্ঞান-তিমিরান্ধস্য জ্ঞানাঞ্জন-শলাকয়া।
চক্ষুরুন্মীলিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ॥"

বলিতে বলিতে তাঁহার চরণপ্রান্তে লুটাইয়া পড়ি। সেই অপ্রাকৃত-চরণাশ্রয়ে

হৃৎকর্ণরসায়না হরিকথা শুনিতে শুনিতে চক্ষু-কর্ণের বিবাদ, মনের সমস্ত সন্দেহ মিটিয়া যায়—মানব-জীবন সার্থক হয়।

সচ্ছাস্ত্র ও অসচ্ছাস্ত্র, সদ্‌গুরু ও অসদ্‌গুরু, সৎসঙ্গ ও অসৎসঙ্গ, আসল ও নকল—সকলই ধরাধামে বর্ত্তমান রহিয়াছে। একটু অসতর্ক হইলেই অসৎকে সৎ বলিয়া প্রতীয়মান হয়, মনকে আত্মা বলিয়া ভ্রম হয়, দেহকে দেহী বলিয়া মনে হয়, অব্রাহ্মণকে ব্রাহ্মণ বা অভক্তকে ভক্ত বলিয়া মনে হয়, নশ্বর জগৎকে নিত্য-বাসোপযোগী স্থান বলিয়া মহাকর্ম্ম-রাজ্যে জীব আবদ্ধ হইয়া যায়—দুর্ল্লভ মানবজন্মটি বৃথাই নষ্ট হইয়া পড়ে। তাই স্বভাবতঃ করুণাময় মহাজনগণ বদ্ধ-জীবের বদ্ধদশা দূরীভূত করিবার জন্য—তাহাদের মোহনিদ্রা ভাঙ্গাইয়া আত্ম-ধর্ম্মের কথা শুনাইবার জন্য "প্রচার"-কার্য্যের ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন—

"প্রতি ঘরে ঘরে গিয়া কর এই ভিক্ষা।
ভজ কৃষ্ণ, বল কৃষ্ণ, কর কৃষ্ণ শিক্ষা॥"

আমরা কিন্তু বহিঃপ্রজ্ঞাদ্বারা পরিচালিত হইয়া ক্ষণে ক্ষণে নিজ নিজ সত্য-প্রতীতিকে বহুমানন করিয়া পরস্পর কলহ করিতেছি, স্বকপোলকল্পিত শাস্ত্র-ব্যাখ্যাবাদে অগ্রসর হইয়া অপেক্ষাকৃত নিম্নতরস্থিত জীবগণের পরমার্থচেষ্টার পথ কণ্টকিত করিতেছি এবং আত্মম্ভরিতার ঘৃণিত জীবন অতিবাহিত করিয়া নরকপথের পথিক হইতেছি। ভ্রম, প্রমাদ, বিপ্রলিপ্সা ও করণাপাটব আমাদের চিত্তে প্রবল ঝঞ্ঝাবাত উপস্থিত করিতেছে, মায়ার তাণ্ডব নৃত্যে প্রতি মুহূর্ত্তে মুগ্ধ হইয়া পড়িতেছি! যথেচ্ছাচারের আশ্রয়ে মনবিমানে আরোহণ করিয়া কতই সুখের কল্পনায় মায়ার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবিত হইতেছি! বার বার ঠকিতেছি, হতাশ হইতেছি, ত্রিতাপজ্বালায় জ্বলিয়া পুড়িয়া ছাই হইয়া যাইতেছি, কিন্তু তথাপি আমার বিরাম নাই—নিত্য নব নব উদ্যমে পুনরায় বুক বাঁধিয়া ছুটিতেছি। কখনও বা ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ফল অনুসন্ধান করিতে গিয়া কনক, কামিনী ও প্রতিষ্ঠার আশায় কার্য্যনিপুণ হইয়া পুণ্যবান্ হওয়াই ধর্ম্ম বলিয়া জানিতেছি, আবার কখনও বা মুমুক্ষু হইবার পিপাসায় অহংগ্রহোপাসক মায়াবাদী হইয়া ঈশবৈমুখ্যের পরাকাষ্ঠা লাভ করিতেছি। স্বতন্ত্রতার অসদ্ব্যবহার করিয়া অক্ষজজ্ঞানের দাস হইয়া দুর্দ্দশার চরম সীমায় উপনীত হইয়াছি—স্বরূপ বিভ্রম হওয়ায় কি ভয়ানক কুৎসিত অবস্থার ক্রীড়াপুত্তলী হইয়া পড়িয়াছি!

হায়, হায়! আমাদের এই ঘোর দুর্দ্দিনে কে আমাদিগকে মায়ার কুহক হইতে মুক্ত করিয়া আমাদের নিত্য পরম আত্মীয় শ্রীভগবানের নিকট লইয়া

যাইবে? কবে আমরা শ্রীহরিকে পরম সত্য বলিয়া জানিতে পারিব? কবে আমরা প্রাকৃত জগতের অন্তরালে বৈকুণ্ঠধামের সংবাদ পাইব? কবে আমরা জড়াত্মক যুক্তিকে তাহার নিজ অধিকারে আবদ্ধ রাখিয়া আত্মপ্রত্যয়স্বরূপ অচ্যুত বিশ্বাসকে হৃদয়ে পোষণ করিতে সমর্থ হইব? কবে আমরা নিজ নিজ ক্ষুদ্রতা ও পাষণ্ডতা উপলব্ধি করিয়া যাবতীয় প্রাকৃত অভিমান বিসর্জ্জন দিয়া নিষ্কপটচিত্তে হরিজনের শরণাপন্ন হইতে পারিব? হায়, হায়! কবে আমরা আত্মপ্রতীতিতে প্রতিষ্ঠিত হইয়া কৃষ্ণেন্দ্রিয়প্রীতিবাঞ্ছায় অনিত্য কামনার বিসর্জ্জন দিতে সমর্থ হইব? হরি, হরি! কবে আমাদের জড়সম্বন্ধ শিথিল হইয়া চিৎসম্বন্ধ প্রবল হইবে? কবে আমাদের সত্তাগত ভগবদ্দাস্যরূপ স্বধর্ম্মটি ফুটিয়া উঠিবে? কবে আমরা ভক্তিকেই জীবের পরম পুরুষার্থ জানিয়া শ্রীগুরুপাদাশ্রয়ে বৃন্দাবনে অপ্রাকৃত কামদেবের উপাসনায় নির্ম্মলানন্দের আস্বাদন পাইব!

—শ্রীউপেন্দ্রকৃষ্ণ দাস ব্রহ্মচারী

সংসার—রঙ্গমঞ্চ

মানুষ জন্মগ্রহণ করে, আবার মৃত্যুকে বরণ করিতেও বাধ্য হয়। জন্মিলে সবাইকে মরিতে হইবে, মৃত্যুর হস্ত হইতে কাহারও রেহাই নাই। জরা! ব্যাধি! মৃত্যু! জরার স্পর্শ কত নির্ম্মম, জরায় রূপ-যৌবন জল-বুদ্বুদের মত শূন্যে মিলাইয়া যায়। ব্যাধির আঘাত কত কঠিন, যে-কোন মুহূর্ত্তে সবাইকে আক্রমণ করিতে পারে। ব্যাধিগ্রস্ত হইলে শরীর ভাঙ্গিয়া যায়, লুপ্ত হইয়া যায় দেহের কমনীয়তা, সমস্ত সৌন্দর্য্য, সমস্ত শক্তি। আমোদ-প্রমোদের অবকাশ, দৃপ্ত যৌবনের আড়ম্বর বলিয়া কোন কিছুই থাকে না। দেহ হয় দুর্ব্বল-নিস্তেজ এবং যষ্ঠি ভর করিয়া চলিতে হয়। মৃত্যুর আলিঙ্গন কত ভয়ঙ্কর! মৃত্যুতে ছিন্নভিন্ন হইয়া যায়—সকল রঙ্গরস, ভাঙ্গিয়া-চুরিয়া যায়—সকল ভোগ-বিলাসের সুখনীড়, শূন্যে মিলাইয়া যায়—সকল ধন-সম্পত্তি। মৃত্যু যেন সমগ্র বিশ্বসংসারকে বেষ্টন করিয়া ভয়ঙ্কর রবে গর্জ্জন করিয়া চলিতেছে। অনন্তকালের তুলনায় জীবনের দিনগুলি কত সামান্য, দেখিতে দেখিতে ফুরাইয়া যায় স্বপ্নের মত।

জন্ম, জরা, ব্যাধি, মৃত্যু, বিচ্ছেদ-বিয়োগ, অপ্রিয়-সংযোগ, ক্ষয়-ক্ষতি, নৈরাশ্য, শোক-সন্তাপ ইত্যাদি কত দুঃখ, কত হাহাকার জীবের জীবনকে অহর্নিশ ছিন্নভিন্ন করিতেছে। দিনের পর দিন চলিতেছে এই দুঃখের বিরুদ্ধে সংগ্রাম। দুঃখকে জয় করিয়া সুখের স্রোতে গাত্র ভাসাইয়া দেওয়ার জন্য মানুষের চেষ্টার অন্ত নাই, কিন্তু মানুষ অসহায়ভাবে সেই দুঃখের কাছেই বারংবার মাথা নত করে। কারণ দুঃখের মূল নষ্ট না হইলে দুঃখ ত' যাইবে না।

মাকড়সা যেমন নিজের জালে জড়াইয়া যায়, ঠিক তেমনই লোক নিজের অন্তরের আশা-তৃষ্ণায় নিজে জড়াইয়া পড়ে। সে কুচিন্তা করিয়া ইন্দ্রিয়পর হয়, তাহার তৃষ্ণার জাল দৃঢ় হইতে দৃঢ়তর হইতে থাকে। মানুষের অন্তরে প্রবাহিত তৃষ্ণারূপা নদী অতিশয় দুস্তর। ইহার প্লাবন অন্তহীন, ইহার কবলে পড়িয়া জীবের দুঃখ-দুর্দ্দশার সীমা থাকে না। মোহের জাল মানুষের মনকে ওতপ্রোতভাবে জড়িত করিয়া ক্ষুদ্র সংসার-সীমায় বাঁধিয়া রাখে। এই মোহ-জাল ছিন্ন করিয়া সে সহজে উদারনৈতিক জগতের অর্থাৎ ভগবৎ-জগতের দিকে অগ্রসর হইতে পারে না। তখন তাহার জন্ম-জন্মান্তর ভ্রমণ অফুরন্ত হয়; ফলে জরা, ব্যাধি, মৃত্যু, শোক, সন্তাপ ইত্যাদি দুঃখরাশি তাহাকে ঘিরিয়া থাকে।

মায়াবদ্ধ জীবগণ সংসার-চক্রে আবদ্ধ হইয়া দুরাকাঙ্ক্ষার তীব্র হলাহলে জর্জ্জরিত। তাহারা চির-অতৃপ্ত কামনা-বাসনার জ্বালাময়ী উত্তাপে দগ্ধ হইয়া চিরবিশ্রাম লাভ করিবার জন্য মৃত্যুর করাল গহ্বরের দিকে অগ্রসর হইতেছে। তথাপি মৃত্যু সন্নিহিত হইলেও দুরাশা পরিত্যাগ করিতে পারিতেছে না—একবারও মৃত্যু-চিন্তা করিতেছে না। তাহারা স্ত্রী-পুত্র-কন্যা-আত্মীয়-স্বজনাদি হারাইবার দুঃখে বৃথা বারংবার অশ্রুপাত করিতেছে। জন্ম-জন্মান্তরের অনন্ত-কালের মধ্যে তাহাদের কত হাজার হাজার পুত্র-কন্যা-স্বজনাদি শ্মশানে ভস্মীভূত হইয়াছে, তাহার কোন ইয়ত্তা নাই। তাহারা জন্ম-জন্মান্তর ধরিয়া এমনইভাবে কত কাঁদিয়াছে। তাহাদের ক্রন্দনে কেহই ত' ফিরিয়া আসে নাই। তবে কেন এই বৃথা কান্না? তাহাদের পুত্র-কন্যাদি হইয়া যাহারা আসিয়াছিল, তাহারা নতুন নতুন জন্মলাভ করিয়া জগতের স্থানে স্থানে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে, কত মাতা-পিতা তাহারা পাইয়াছে, হারাইয়াছে। জীবের যাত্রাপথ অনন্ত, তাই কেহই কাহাকে কখনও স্নেহের শৃঙ্খলে চিরকালের জন্য বাঁধিয়া রাখিতে পারে না।

পথিক যেমন পথ চলিতে চলিতে পান্থশালায় আশ্রয় গ্রহণ করে অল্পক্ষণের

জন্য, তেমনি সংসার-পথের যাত্রী মাতাপিতা-স্ত্রী-পুত্রাদিগণ অল্পকালের জন্য কোথাও আশ্রয় গ্রহণ করে। স্রোতোবেগে বালুকারাশি যেমন একবার বিশ্লিষ্ট হইয়া যায়, আবার আসিয়া মিলিত হয়, তেমনই প্রাণিবর্গও কালের নিয়মানুসারে একবার মিলিত হয়, আবার সব ত্যাগ করিয়া চলিয়া যায়। জীব বৃথাই মায়ামোহে আচ্ছন্ন হইয়া রক্ত-বিষ্ঠা-মূত্রপূর্ণ শৃগাল-কুক্কুরভক্ষ্য দেহকে চিরকালের পুত্র-কন্যাদি আত্মীয় ভাবনা করিয়া মারাত্মক ভুল করে। জন্মান্তরের কথা দূরে থাকুক, ইহজন্মেই এক জীবের সহিত অন্য জীবের সম্বন্ধ অনিত্য। পশ্বাদি জীবের সহিত অন্য জীবের সম্বন্ধ নিত্য দেখা যায় না। যেকাল পর্য্যন্ত যে বস্তুর সহিত সম্বন্ধ থাকে, সেই কাল পর্য্যন্তই সেই বস্তুর প্রতি জীবের মমতা থাকে, সম্বন্ধ তিরোহিত হইলে আর মমতা থাকে না।

মানুষের জীবনের খেলা একটী অভিনয় ছাড়া কিছুই নয়। এই সংসার-রঙ্গমঞ্চে আমরা প্রত্যেকেই অভিনেতা সাজিয়া এক একটী অভিনয় করিতেছি। এই বিশ্ব-নাটকের প্রথম অঙ্ক মাতৃগর্ভে অভিনীত হয়, তৎপর এক অঙ্কের পর আর এক অঙ্কে অভিনয়। অভিনয়ের মত দেখিতে দেখিতে ফুরাইয়া যাইবে জীবন-যৌবন, রঙ্গরসের চিহ্ন কোথাও রহিবে না। বহু অঙ্কে ও দৃশ্যে অভিনয় করিয়া পরিশেষে ইহার যবনিকা পতন হয়। মৃত্যুই এই নাট্য-লীলার যবনিকা।

এই বিশ্ব নাট্যলীলা স্বপ্ন ব্যতীত আর কিছুই নহে। আমরা যখন দেখি, তখন উহা মিথ্যা বলিয়া বোধ হয় না, জাগরিত না হওয়া পর্য্যন্ত উহা সত্যবৎ দেহে ও মনে ক্রিয়া করিয়া থাকে। স্বপ্নাবস্থায় হর্ষ-বিষাদ কিম্বা ভয়ের লক্ষণ দেহে বেশ প্রকাশ পায়, কিন্তু নিদ্রাভঙ্গ হওয়ামাত্র উহা সকলই মিথ্যা হইয়া যায়। সেইরূপ জগতে আমরাও মায়ামোহের নিদ্রায় অভিভূত হইয়া এক একটী সুখের কিম্বা দুঃখের সুদীর্ঘ স্বপ্ন দেখিতেছি।

মহাশক্তিধর ভগবানের কৃপায় কোনরূপে একবার এই মায়ানিদ্রার বিভীষিকা হইতে অব্যাহতি পাইলে এই সংসার-লীলা স্বপ্নবৎ, বিশ্ব নাট্যবৎ প্রতীয়মান হইবে। এইরূপে বিচার করিলে দেখা যাইবে যে, মাতাপিতা, স্ত্রী-পুত্র-আত্মীয়স্বজনকে জীবিত রাখিয়া হয় আমিই পরলোকে চলিয়া যাইব অথবা আমি জীবিত থাকিতেই তাহারা বা তাহাদের কেহ পরলোকে চলিয়া যাইবে। আবার ধনসম্পত্তি এবং ঘরবাড়ী ইত্যাদি হয় আমার বর্ত্তমানেই আংশিক বা পূর্ণভাবে নষ্ট হইয়া যাইবে ; কিম্বা উহাদের স্থিতিকালেই আমাকে নিজ দেহটি

পর্য্যন্ত রাখিয়া চলিয়া যাইতে হইবে। সুতরাং এই তাৎকালিক ক্ষণভঙ্গুর মায়িক সম্বন্ধরূপী বন্ধনকে তত্ত্বজ্ঞানদ্বারা ছিন্ন করিতে হইবে।

সংসারের গণ্ডগোল চিরকালই লাগিয়া থাকিবে, তাহা কখনও মিটিবে না। প্রত্যেকের জীবনেই একটা না একটা কর্ত্তব্য সম্পাদনের গুরুতর দায়িত্ব থাকিবেই থাকিবে—একেবারে নিশ্চিন্ত শান্তি-পরিপূর্ণ অবস্থা সংসারে আদৌ পাওয়া সম্ভব নয়। সুতরাং এই সাংসারিক গোলমাল ও কোলাহলের মধ্যেই ধর্ম্মসাধনের জন্য একটা সময়, শত বাধাবিঘ্ন উল্লঙ্ঘন করিয়াও বলপূর্ব্বক করিয়া লইতে হইবে। নচেৎ এই সাধনযোগ্য দুর্লভ মানব-দেহ লাভ করিয়াও বলীবর্দ্দের ন্যায় কেবল সংসারের বোঝা টানাই সার হইবে। অপূর্ব্ব তত্ত্বপূর্ণ অমূল্য মানব-জীবন পাইয়াও পশু-পক্ষীর ন্যায় অজ্ঞানতম ক্ষুদ্র গণ্ডিতে আবদ্ধ থাকিয়া আমাদিগকে জন্ম-মৃত্যুর অশেষ ক্লেশদায়ক পথেই পুনঃ পুনঃ বিচরণ করিতে হইবে।

—শ্রীবলভদ্র দাস ব্রহ্মচারী

সাধুসঙ্গ ও শ্রীগুরুতত্ত্ব

ধীর বা বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিগণ ক্ষণমাত্র সাধুসঙ্গ লাভ করিয়া চরম কল্যাণ-লাভের চেষ্টা করিয়া থাকেন। শাস্ত্রে আছে,—

লব্ধ্বা সুদুর্লভমিদং বহুসম্ভবান্তে, মানুষ্যমর্থদমনিত্যমপীহ ধীরঃ।
তূর্ণং যতেত ন পতেদনুমৃত্যুযাবন্নিঃশ্রেয়সায় বিষয়ঃ খলু সর্ব্বতঃ স্যাৎ॥
(ভাঃ ১১।৯।২৯)

অর্থাৎ অনেক জন্মের পর এই অত্যন্ত দুর্লভ পরমার্থপ্রদ কিন্তু অনিত্য মানব-জন্ম লাভ করিয়া ধীরব্যক্তি যে-পর্য্যন্ত মৃত্যু পুনরায় নিকটস্থ না হয় তৎকালমধ্যে ক্ষণমাত্র বিলম্ব না করিয়া চরম কল্যাণলাভের চেষ্টা করিবেন।

বহু জন্মের পুঞ্জ পুঞ্জ সুকৃতিফলে সদ্‌গুরু বা বৈষ্ণব-গুরুর দর্শন লাভ হয়। আমাদের সনাতন শাস্ত্র গ্রন্থগুলি সেইজন্য তীর্থদর্শন ও তীর্থক্ষেত্রে বাস করিবার মাহাত্ম্য বিশদভাবে বর্ণনা করিয়াছেন। কল্কি-পুরাণে আছে,—

বহূনাং জন্মনামন্তে তীর্থক্ষেত্রাদি-যোগতঃ।
দৈবাৎ ভবেৎ সাধুসঙ্গস্তমাদীশ্বরদর্শনম্॥

শ্রীমন্মহাপ্রভু গয়াগমনচ্ছলে পুনরায় সেই মাহাত্ম্যই ঘোষণা করিয়া নিখিল জীবকুলের চরম-কল্যাণ সাধন করিয়াছেন।

প্রভু বলে,—"গয়াযাত্রা সফল আমার।
যতক্ষণে দেখিলাঙ্ চরণ তোমার॥
অতএব তীর্থ নহে তোমার সমান।
তীর্থেরও পরম তুমি মঙ্গল-প্রধান॥"

(চৈঃ ভাঃ আঃ ১৭।৫০, ৫৩)

শ্রীগুরুতত্ত্ব সাধারণ প্রাকৃত জীবের নিকট চিরকালই অপ্রকটিত থাকেন। তবে বিশেষ বিশেষ মাঙ্গলিক অনুষ্ঠানে শ্রীগুরুদেব তাঁহার স্বমুখ-নিঃসৃত বাণীরূপা কৃপা প্রকটিত করাইয়া জীবের অজ্ঞান-অন্ধকার দূর করেন। ভক্ত্যনুষ্ঠানে যোগদানের সার্থকতা—সাক্ষাদ্ভাবে শ্রীগুরু-দর্শন-জনিত আনন্দ। সাক্ষাৎ দর্শন হইলেই অন্তর-দর্শন হইবে। বাহ্যদর্শনের আনন্দই হৃদয়ে প্রকাশিত হয়। যেহেতু, হৃদয় বা মনই আনন্দের উৎসস্বরূপ। পারমার্থিক অনুষ্ঠানে যোগদানের পর ভক্তগণ স্ব-স্বস্থানে ফিরিয়া গেলেও শ্রীগুরুদেবের দর্শনজনিত আনন্দে হৃদয় উদ্বেলিত হইয়া উহা বহুপ্রকারে উত্তরোত্তর স্ফূর্ত্তিপ্রাপ্ত হয়।

শ্রীভাগবতামৃতোত্তরখণ্ডে উল্লেখ আছে,—

তৎপ্রসাদোদয়াদ্ যাবৎ সুখং বর্দ্ধেত মানসম্।
তাবদ্বর্দ্ধিতুমীশীত ন চান্তদ্ বাহ্যমিন্দ্রিয়ম্॥

অর্থাৎ মন দৃশ্যবস্তু বিষয়ের আকারতা প্রাপ্ত হইলেই তদ্বিষয়ে জ্ঞানের উদয় হয়, ইহা প্রসিদ্ধ আছে। অন্য ইন্দ্রিয়গণের তাহা নাই; যেহেতু তাহারা বাহ্য, স্থূল ও সীমাবদ্ধ।

ভগবান্ শ্রীগৌর-কৃষ্ণের আচরিত ও প্রচারিত ধর্ম্মের পুনঃ সংস্থাপন করিবার জন্যই সদ্গুরু এই প্রপঞ্চে কৃপা করিয়া অবতীর্ণ হন। এই নিখিল বিশ্বে কৃষ্ণবিমুখ জীবগণ কৃষ্ণসেবা-বঞ্চিত হইয়া বিষয়ভোগের দুর্ব্বাসনা হৃদয়ে পোষণ করেন। ভক্ত-বৎসল ভগবান্ জীবের সুপ্ত ভগবৎসেবা-প্রবৃত্তি উদয় করাইবার জন্যই ভক্তবেশ অঙ্গীকার করেন।

গুরু কৃষ্ণরূপ হন শাস্ত্রের প্রমাণে॥
গুরুরূপে কৃষ্ণ কৃপা করেন ভক্তগণে॥ (চৈঃ চঃ আঃ ১।৪৫)

অতএব, সেই জগৎপিতা কৃষ্ণকে লাভ করিতে হইলে বা তাঁহার সঙ্গে সম্বন্ধ স্থাপন করিতে হইলে, সম্বন্ধজ্ঞানদাতা আশ্রয়বিগ্রহ শ্রীগুরুদেবের শ্রীপাদপদ্মে

শরণাগত হইতেই হইবে। শ্রীগুরুদেবে ভক্তিভাবে আত্মসমর্পণ না করিলে সেই তত্ত্ববস্তু জানিবার কোন উপায়ই নাই।

কৃষ্ণ-ভজনহীন জীবের দুর্গতি সম্বন্ধে বৈষ্ণবকুল-তিলক শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামি-প্রভু ভক্তিরসের আকর শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে অপূর্ব্বভাবে বর্ণনা করিয়াছেন,—

কৃষ্ণ ভুলি' সেই জীব অনাদি-বহির্ম্মুখ।
অতএব মায়া তারে দেয় সংসার-দুঃখ॥
কভু স্বর্গে উঠায়, কভু নরকে ডুবায়।
দণ্ড্যজনে রাজা যেন নদীতে চুবায়॥

(চৈঃ চঃ মঃ ২০।১১৭-১১৮)

পণ্ডিত জগদানন্দ প্রভুও তাঁহার "প্রেমবিবর্ত্ত" গ্রন্থে কৃষ্ণ-বহির্ম্মুখের দুঃখ ও তাহা হইতে উদ্ধারের উপায় বর্ণনা করিয়াছেন—

"কৃষ্ণ-বহির্ম্মুখ হইয়া ভোগবাঞ্ছা করে।
নিকটস্থ মায়া তারে জাপটিয়া ধরে॥
পিশাচী পাইলে যেন মতিচ্ছন্ন হয়।
মায়াগ্রস্ত জীবের হয় সে ভাব উদয়॥
অসাধুসঙ্গে ভাই কৃষ্ণনাম নাহি হয়।
নামাক্ষর বাহিরায় বটে, তবু নাম কভু নয়॥
একান্ত সরলভাবে ভজ গৌরজন।
তবে ত' পাইবে ভাই শ্রীকৃষ্ণ-চরণ॥"

এই সংসার-দুঃখ-সাগর উত্তীর্ণ হইতে হইলে, আচার্য্যের নিকট আশ্রয় লইতেই হইবে এবং গুরু-সেবা-রূপ পাথেয়দ্বারা ভব-সমুদ্র হইতে উত্তীর্ণ হইয়া অগতির গতি, অনাদির আদি, সর্ব্বকারণকারণ, সচ্চিদানন্দ-রসঘন-বিগ্রহ ভক্তবৎসল শ্রীকৃষ্ণের নিত্যপাদপদ্ম-সেবালাভ হইবে।

তস্মাদ্বিষ্ণুপ্রসাদায় বৈষ্ণবান্ পরিতোষয়েদ্।
প্রসাদসুমুখো বিষ্ণুস্তেনৈব স্যান্ন সংশয়ঃ॥ (ইতিহাস-সমুচ্চয়)

অর্থাৎ, এইহেতু শ্রীহরির অনুগ্রহ লাভার্থ বৈষ্ণবগণের তুষ্টিবিধান করিবে, তাহা হইলেই শ্রীহরি প্রসন্নমুখ হইবেন।

হিরণ্যকশিপুর প্রতি শ্রীপ্রহ্লাদ মহারাজের উক্তি এস্থলে প্রণিধানযোগ্য,—

নৈষাং মতিস্তাবদুরুক্রমাঙ্ঘ্রিং স্পৃশত্যনর্থাপগমো যদর্থঃ।
মহীয়সাং পাদরজোঽভিষেকং নিষ্কিঞ্চনানাং ন বৃণীত যাবৎ॥

(ভাঃ ৭।৫।৩২)

অর্থাৎ, যে-কাল পর্য্যন্ত গৃহব্রত মানবগণের মতি নিষ্কিঞ্চন ভগবদ্ভক্তগণের পদরজে অভিষিক্ত না হয় সে-কাল পর্য্যন্ত উহা কখনই উরুক্রম কৃষ্ণের পাদপদ্ম স্পর্শ করিতে পারে না ; যেহেতু কৃষ্ণপাদপদ্ম-স্পর্শই জীবের সমস্ত অনর্থ-নাশের একমাত্র হেতু।

শ্রীগীতাশাস্ত্রে অর্জ্জুনের শরণাগত অবস্থা ও তাঁহার উক্তি হৃদয়ঙ্গম করিলেই আমাদের অক্ষরুঢ়ি বৃত্তিরদ্বারা উপার্জ্জিত যে জ্ঞান, তাহা মুহূর্ত্তের মধ্যে ধূলিসাৎ হইয়া যাইবে।

কার্পণ্য-দোষপহতস্বভাবঃ পৃচ্ছামি ত্বাং ধর্ম্মসংমূঢ়চেতাঃ।
যচ্ছ্রেয়ঃ স্যান্নিশ্চিতং ব্রূহি তন্মে শিষ্যস্তেহহং শাধি মাং ত্বাং প্রপন্নম্ ॥

(গীতা ২।৭)

কার্পণ্য অর্থাৎ চিত্তের দীনতা এবং কুলক্ষয় কৃত দোষ—এই দুইটীর আলোচনায় আমার স্বভাব অভিভূত হইয়াছে ; আমি ধর্ম্মাধর্ম্ম সম্বন্ধে বিমূঢ়-চিত্ত হইয়া তোমায় জিজ্ঞাসা করি, যাহাতে আমার শ্রেয়ঃ হয়, তাহা নিশ্চয় করিয়া বল ; আমি তোমার শিষ্য, তোমার শরণাগত, আমারে শিক্ষা দাও। গীতাশাস্ত্রের এই শিক্ষাই আমাদের ভক্তিপথের প্রথম ও প্রধান সোপান।

কলিযুগে শ্রীমন্মহাপ্রভু সেই শিক্ষাই প্রেমারুরুক্ষু লোকগণের শিক্ষার্থ স্বয়ং শিষ্যাভিমানে লীলাভিনয় করিয়াছেন—

"সংসারসমুদ্র হৈতে উদ্ধারহ মোরে।
এই আমি দেহ সমর্পিলাঙ তোমারে॥
কৃষ্ণপাদপদ্মের অমৃতরস পান।
আমারে করাও তুমি"—এই চাহি দান॥ (চৈঃ ভাঃ আঃ)

"সাধু-শাস্ত্র-গুরু-বাক্য" পুনরায় শিরে ধারণ করিয়া শ্রীগুরুচরণে প্রার্থনা জানাইতেছি,—

"যে-সব অধম লোক কীর্ত্তনেরে হাসে।
তোমা হৈতে তাহারা ডুবুক কৃষ্ণরসে॥
তোমার প্রসাদে যেন আমরা সকল।
সুখে কৃষ্ণ গাই নাচি হইয়া বিহ্বল॥"

(চৈঃ ভাঃ মঃ ২।৬২, ৬৪)

—শ্রীজিতকৃষ্ণ দাসাধিকারী, ভক্তিভূষণ

নাম-মুখে বৈষ্ণব

এ মায়াময় জগতে শব্দময় পরব্রহ্ম বিরাজমান। শব্দগতিতে আপামর জনসাধারণ নামের কাঙাল ; শ্রীনামের নামী আবার নামেই সূচিত, ভূষিত ও নামীত হয়ে যান। নাম বিনা আবার কেহ বহুনামী,—দেবতাদের ক্ষেত্রে যেমন প্রযোজ্য, আবার মরণশীল জগতে মনুষ্য, কীট-পতঙ্গ, জন্তু-জানোয়ারদের ক্ষেত্রে তেমনই প্রযোজ্য।

দার্শনিক সম্প্রদায় তাঁদের অস্তি-নাস্তিবাদ প্রতিষ্ঠাকল্পে একথা সর্ব্বতোভাবে স্বীকার করেছেন। এ তত্ত্বকথা অতি বাস্তবমুখী। দেবতা আদি ব্রহ্ম-বিষয়ে সকলই নামরূপে প্রকট। নাম বিনা গতি নাই ; নামেই গতি ও প্রকাশ ; 'নামৈকা পরমা গতিঃ'—নামই পরম ধন। 'নামৈব কেবলম্'—নামই একমাত্র গতি, নামই শব্দব্রহ্ম।

কলিকালে একমাত্র শ্রীহরির নাম পরম সম্বল ; পাপী-তাপী, আর্ত্ত-পীড়িতের একান্ত কাম্য। সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর, কলি—এ যুগ-চতুষ্টয়ে নামরূপ ব্রহ্মের প্রকাশ অনাদি-অনন্তকাল ধরেই চলে আসছে। এমনকি, স্মরণাতীত কাল ধরেই চলবে।

'হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলম্।'—এ শুধু বৈষ্ণবধর্ম্ম-মতাবলম্বীদের জন্যই নয়। এ নাম বিষ্ণুমায়া-মোহিত জগদ্বাসীর পাপ-তাপ, দুঃখ-দুর্দ্দশা হতে নিরন্তর মুক্তি পাওয়ার মন্ত্রবিশেষ। এ নাম ব্যতীত জীবের গতি, মুক্তি নাই। জীবজগতের উদ্ধার সাধনে তিনি সেই সৎ-চিৎ-আনন্দ—পরমানন্দ, চিদ্ঘনানন্দ-রূপ বিগ্রহ বিষ্ণুর অবতার হয়ে যুগে যুগে অবতীর্ণ হন।

তিনি বহুরূপধারী শ্রীকৃষ্ণ-মুরারি। 'পুরুষেষু বিষ্ণুঃ'—তিনি বহুরূপী বহুনামী ; তিনিই নামী পরব্রহ্ম ; তাঁর নামের অন্ত নেই, রূপের অন্ত নেই। কলিযুগে তিনিই রাধাভাবদ্যুতি কান্তাভাবধারী শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য। তিনি জগতের পাপী-তাপীদের উদ্ধারের জন্য ঘরে ঘরে 'হরিনাম' বিলায়ে মুক্তির পথ-নির্দ্দেশ করেছেন। জগদ্বাসীকে তাঁর একনিষ্ঠ প্রেম ও ভক্তিরসে আপ্লুত হয়ে মুখে হরিনাম কীর্ত্তনে জগৎ মাতাতে উদ্বুদ্ধ করেছিলেন—পতিত উদ্ধারিণী গঙ্গাবিধৌত বঙ্গের নরনারীকে তিনি ধন্য করেছেন।

'হরিবোল' বলে ভিক্ষার থালায় তার মাধুকরী চরিতার্থ ও সার্থক করে

তোলে বিষ্ণুনামের জয়ধ্বনি তুলে। সদাচারী বৈষ্ণবের মুখে তাই সদা নাম 'হরিনাম' ; নামেই প্রেম, নামেই প্রীতি জন্মে। প্রেম-মাহাত্ম্য নামময়—শ্রীনামই জীবন্মুক্তিদাতা—তিনিই একমাত্র গতি—তিনিই ঈশ্বর ; সর্ব্বেশ্বর—'কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ম্।'

'রসো বৈ সঃ'—তিনিই রসময়, রসলাপী। রসিকশেখর রস পরিবেশন করে, তদ্রস-প্রেমিকদের জন্য ভক্তিরসের স্রোতস্বিনী-বন্যা বহিয়ে দিয়ে জগৎকে ভক্তিরসে প্রেমাপ্লুত করেছেন। নবদ্বীপ-কালনা-কাটোয়ায় তিনিই শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্য শ্রীগৌরাঙ্গরূপে পূর্ণ অবতারী। বৈষ্ণবের মন্ত্র ও উপাস্য তিনি, 'হরিবোল, হরিবোল, কৃষ্ণনাম' একই নামের নামী—এক নাম 'কৃষ্ণনাম' স্মরণে নিখিল জগতের পাপী-তাপীর উদ্ধার লাভ।

শ্রীনামের নামী বৈষ্ণবকুলচূড়ামণি দ্বাদশ গোপালসখ দ্বাপরযুগাবতারী শ্রীকৃষ্ণ ভক্তি-প্রীতি-প্রেমের নিদর্শন ও নাম-রসের মাহাত্ম্য প্রকাশজন্য মা-যশোদার দধিভাণ্ড হতে ক্ষীর-সর-নবনী চুরি, অমৃতের রসাস্বাদ বিতরণের উদ্দেশ্যে নামরূপ স্বাদ পরিবেশন করে এক অভিন্নতার পথনির্দ্দেশ করেছেন।

দধিমুখে অব্যক্ত জগতে প্রকটিতরূপ ব্যক্ত করে—প্রাপঞ্চিক জগতে তাঁর বিশ্বরূপ প্রকাশ করে মোহিত করেন নিজ নাম-গুণে ; কেননা, তিনি নামী, বহুনামী, নামের নামী, একনামী শ্রীকৃষ্ণ ; যে নাম শ্রবণে, কীর্ত্তনে ও স্মরণে সর্ব্বপাপ বিনাশ হয়। জীবজগৎ মায়াঘোরে আচ্ছন্ন, মায়াময় বিশ্বে মায়াবৃত। এর থেকে মুক্তি পেতে হলে পরম সাধু-গুরু-বৈষ্ণবের চরণ শরণ অবশ্য কর্ত্তব্য। তত্ত্ববস্তুকে পেতে হলে—কৃপালাভ করতে গেলে সদাচারী, সদালাপী সদ্গুরু-বৈষ্ণবের আশ্রয় প্রয়োজন। ত্রিকালসত্য শ্রীশচী-জগন্নাথসুত—জগন্নিবাস শ্রীগৌরাঙ্গ। আমরা সেই গৌরহরির নাম-রূপ-গুণ-ঔদার্য্যলীলাদি আশ্রয় করে ভবসাগর থেকে উদ্ধার পেতে প্রার্থনা জানাব। তাঁর আনুগত্যে কৃষ্ণার্পণবুদ্ধিতে শ্রীকৃষ্ণনাম কীর্ত্তন করতে করতে আমাদের সর্ব্বার্থ সিদ্ধিলাভ সম্ভব হবে।

—শ্রীশীতল চন্দ্র কোলে, শাস্ত্রী
সুবলচক, পোঃ বলাইচক (হাওড়া)

———

শ্রীগুরুপাদপদ্মে দীনার প্রার্থনা

নমি ওগো গুরুদেব চরণে তোমার।
যাঁহার কৃপাতে পারি তরিতে সংসার॥
দুর্জ্জয়া মায়াকে কেহ না পারে জিনিতে।
হেন মায়া জিত হয় তব করুণাতে॥
মায়া যাঁর দাসী সেই পরমানন্দময়।
তোমার হৃদয়ে সদানন্দে বাঁধা রয়॥
তুমি যারে কর দয়া তার কিবা ভয়।
অজিত কৃষ্ণেরে সে অনায়াসে পায়॥
ভক্তি বিনা শ্রীকৃষ্ণেরে কেহ নাহি পায়।
সেই ভক্তি মিলে প্রভু তোমার কৃপায়॥
তব শাসন—মঙ্গল-কারণ, জানিয়াছি সার।
হরি-আরাধনা, গুরুসেবা-বিনা রক্ষা নাহিক কারো॥
তোমারে সেবিলে কৃষ্ণ হইয়া সদয়।
আপনারে দিয়ে তার কাছে বাঁধা রয়॥
তোমার কৃপার এই নিদর্শন হয়।
জড়মোহ ছাড়ি' কৃষ্ণে রতি উপজয়॥
তরলের ধর্ম্ম হয় সদা নিম্নগতি।
তোমার করুণা যেন দীনহীন-প্রতি॥
মণির পরশে যেমন লোহা সোনা হয়।
তোমার করুণা-বলে নাস্তিক আস্তিক হয়॥
তোমারে চিনিবে এই শক্তি নাহি কারো।
সেইজন জানে—যারে তুমি কৃপা কর॥
তব চরণ-পরশে জীবন করিতে ধন্য।
শুদ্ধভক্তগণ কাঁদে কৃপা লভিবার জন্য॥
সেবাহীন, শ্রদ্ধাহীন—শূন্য এ জীবন।
সেবা দিয়ে ধন্য কর পতিতপাবন॥
তোমার অভয় পদে লইয়া শরণ।
জন্মে জন্মে সেবি যেন তব শ্রীচরণ॥

—কুমারী শিপ্রা রাণী দেবী (কোচবিহার)

শ্রীশ্রীকৃষ্ণ-জন্মাষ্টমী উপলক্ষে

শ্রীল গুরু-মহারাজের বক্তৃতা

(শ্রীমেঘালয় গৌড়ীয় মঠ, তুরা (মেঘালয়), তাং—২৫।৮।১৯৮১)

[তৃতীয় অধিবেশন]

পূজনীয় বৈষ্ণববৃন্দ, শ্রদ্ধেয় সুধী সজ্জনমণ্ডলী, মাতৃমণ্ডলী! আমাদের যে তিনদিবস ধরে সনাতন ধর্ম্মসভা-কথা, আজ তারই তৃতীয় বা অন্তিম দিবস। গত দুদিন ধরে আমরা শ্রবণ করছি—ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের জন্মলীলা-রহস্য, সনাতন ধর্ম্মতত্ত্ব এবং অবতারবাদ প্রভৃতি বিষয়ে। আজ আমাদের আলোচ্য বিষয় হচ্ছে—'ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ এবং ভগবান্ শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু'।

সর্ব্বপ্রথমে আলোচনার ক্ষেত্রে ভগবান্ কৃষ্ণ এবং ভগবান্ চৈতন্যমহাপ্রভুর সঙ্গে কি সম্পর্ক আছে, সেই নিয়ে আজ বিশেষভাবে আলোচনা করবার কথা। দুজনের আগে বিশেষণ আছে Lord। Supreme Lord বা Supreme Command ত' একজনই হন, Superlative degree, কিন্তু দেখা যাচ্ছে এখানে দুজন। চিন্তা করবার বিষয়। Superlative degreeর ক্ষেত্রে এককেই লক্ষ্য করা হয়। Comperative এর ক্ষেত্রে দুজনকে তুলনামূলকভাবে বিচার-বিবেচনা করা হয়। এখানে কিন্তু Supreme Lord শ্রীকৃষ্ণ এবং Supreme Lord শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য। শাস্ত্র আলোচনা করলে আমরা দেখতে পাই ভগবান্ কৃষ্ণকে প্রণাম করেছেন ভাগবতে—

> যং ব্রহ্মা বরুণেন্দ্ররুদ্রমরুতস্তুন্বন্তি দিব্যৈঃ স্তবৈ-
> র্ব্বেদৈঃ সাঙ্গপদক্রমোপনিষদৈর্গায়ন্তি যং সামগাঃ।
> ধ্যানাবস্থিততদ্গতেন মনসা পশ্যন্তি যং যোগিনো,
> যস্যান্তং ন বিদুঃ সুরাসুরগণা দেবায় তস্মৈ নমঃ॥

ব্রহ্ম-রুদ্রাদি দেবতাকর্ত্তৃক সংস্তুত, মুনি-ঋষি-যোগিগণের হৃদয়ে যিনি বাস করেন, সেই ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ সর্ব্বোপরি মালিক, তাঁর কথাই সেখানে বলেছেন। ঠিক সেই কথাই শ্রীমদ্ভাগবতের অন্যত্র প্রকাশিত হয়েছে যেখানে অবতার-সংস্থান বর্ণনা করেছেন। অবতারবাদ বর্ণনা করবার পর শেষে কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস একটী শ্লোক ব্যবহার করলেন,—

> এতে চাংশকলাঃ পুংসঃ কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ম্।
> ইন্দ্রারিব্যাকুলং লোকং মৃড়য়ন্তি যুগে যুগে॥

পূর্ব্বে বিভিন্ন অবতারের কথা বর্ণনা করলেন, তাঁরা কেহ বা আদি-পুরুষাবতার কারণাব্ধিশায়ী বিষ্ণুর অংশ, কেহ বা অংশের অংশ কলা, কেহ বা শক্ত্যাবেশ অবতার। এঁরা সবাই এসেছেন জগতের কল্যাণ বিধানের জন্য। যেকথা শ্রীমদ্ভাগবতে রয়েছে, যেকথা শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার মধ্যে রয়েছে, সেইকথাই এর ভিতরেও রয়েছে—

যদা যদা হি ধর্ম্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত।
অভ্যুত্থানমধর্ম্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্॥

'সম্ভবামি যুগে যুগে'—যুগে যুগে এই অবতারগণ জগতে আবির্ভূত হচ্ছেন জগতের কল্যাণ চিন্তা করে। আসুরিকভাব, নাস্তিক্যভাব জগৎ থেকে হঠিয়ে দিচ্ছেন, সরিয়ে দিচ্ছেন। দিয়ে পুনরায় ধর্ম্মসংস্থাপন করছেন। সেইজন্য এঁদের আসা প্রয়োজন হয়েছে। নাস্তিক্যভাব সমগ্র জগৎকে আক্রমণ করেছে। সেই নাস্তিক্যভাব বহুরূপী। গীতাশাস্ত্রে ভগবান্ কৃষ্ণ নিজেই সেই নাস্তিক্যভাব কত রকমের আছে, সেটা নিজেই বর্ণনা করেছেন তাঁর প্রিয়সখা অর্জ্জুনের নিকট জগদ্বাসীর শিক্ষার জন্য।

নাস্তিক্যবাদের দ্বারা কোনদিনই তত্ত্বদর্শন লাভ হয় না। যদি তত্ত্বদর্শন লাভ করতে হয়, তাহলে আস্তিক হতে হবে। তাই গীতার মধ্যে প্রথম শিক্ষা কৃষ্ণ অর্জ্জুনকে দিচ্ছেন—দেখ অর্জ্জুন! এই সংসারে দুইপ্রকার লোক আছে। 'দ্বৌ ভূতসর্গৌ লোকেঽস্মিন্ দৈব আসুর এব চ।' একশ্রেণী হল দৈবীভাবাপন্ন, আর একশ্রেণী হল আসুরিক ভাবাপন্ন। দৈবীভাবাপন্ন যাঁরা, তাঁরা হলেন আস্তিক; আর আসুরিক ভাবাপন্ন যারা, তারা হলেন নাস্তিক। সেই কথাটী পরিস্কার-ভাবে বুঝিয়েছেন। কে দৈবীভাবাপন্ন?—'দৈবো বিস্তরশঃ প্রোক্ত আসুরং পার্থ মে শৃণু॥' 'বিষ্ণুভক্ত ভবেদ্দৈব আসুরস্তদ্বিপর্য্যয়॥'—ভগবদ্ভক্ত যাঁরা, তাঁরা হলেন দৈবীভাবাপন্ন, আর ভগবদ্বিরোধী Element যারা, তারা হলেন আসুরিক ভাবাপন্ন। ঠিক এইভাবে বিচার-যুক্তি দিয়ে জগৎকে দুইভাগে ভাগ করা হয়েছে।

আজ রাজনৈতিক ক্ষেত্রে আমরা দেখতে পাই, সমাজে দুইশ্রেণীর মানুষ—ধনী আর গরীব। ধনী আর গরীব নিয়ে বর্ত্তমান রাজনীতি। স্বয়ং ভগবান্ কৃষ্ণচন্দ্র এবং তাঁর বিশেষ ভক্তগণ—মুনিঋষিগণের কিন্তু এই বিচার নয়। তাঁরা জগৎকে ভাগ করেছেন দুই শ্রেণীর মনুষ্যে—আস্তিক আর নাস্তিক। ধনী-দরিদ্রের স্থান এখানে হচ্ছে না। এ সমস্যার সমাধান কোনদিন হয় না, হবেও না। স্বয়ং ভগবানকে যদি জিজ্ঞাসা করা যায়, আপনি কি কোন

ব্যবস্থা এর নিতে পারেন ? ভগবান্ও বলবেন—আমিও পারি না। কেন ?—জীবের কর্ম্ম, কর্ম্মফল বলে একটা জিনিস আছে। সেই জিনিস সবসময় ক্রিয়াশীল। যদি আমরা সমগ্র পৃথিবীর মনুষ্য সমাজ চেষ্টা করি যে, একজন মানুষকে আমরা সুখী করব জগতের সর্ব্বপ্রকার ভোগ্যসামগ্রী দিয়ে, তথাপি একজন মানুষকেই সন্তুষ্ট করা যায় না। সেইকথা শাস্ত্র বিচার-যুক্তি দিয়ে বুঝিয়েছেন। 'যৎ পৃথিব্যাং ব্রীহিযবং হিরণ্যং পশবঃ স্ত্রিয়ঃ একস্যাপি ন পর্য্যাপ্তম্।' এ জগতে যত ভোগ্যসামগ্রী আছে, যত ঐশ্বর্য্য আছে, যত সোনাদানা আছে, সব জিনিস যদি একজন লোককে দেওয়া যায়, তাহলেও তাকে সন্তুষ্ট করা যায় না। তিনি বলছেন,—আরও দাও, আরও দাও। The more you give, the more you wants. এই হল জগতের রীতি। কেন ? সংসারটা হল অভাব দিয়ে গড়া, এ জগচ্চক্র অভাব দিয়ে তৈরী করা। সুতরাং এখানে স্বভাব পাচ্ছি কোথায় ? স্বভাবে অভাবই জগতে সৃষ্ট। সুতরাং আমরা যেটা আশা-আকাঙ্ক্ষা করছি, সেটা ত' পরিপূর্ণ হচ্ছে না, হবে না ত'। স্বয়ং ভগবান্ বলছেন, ঋষিগণ বলছেন,—

তস্মাদিদম্ জগদশেষম্ অসৎ স্বরূপম্।
স্বপ্নাভমস্তদজনং কুরু দুঃখদুঃখম্ ॥

দুঃখ দিয়ে গড়া এই সংসার। হে জীব ! তুমি যে সুখ-শান্তি কামনা করছ, তার যে Process, Procedure, সেটা তোমাকে অবশ্যই গ্রহণ করতে হবে। তা না হলে সুখ-শান্তি ঠিক আসছে না, আসবে না। যেটাকে আমরা সুখ-শান্তি বলে মনে করছি, এটা দুঃখের ক্ষণিক নিবৃত্তিমাত্র। সেইকথাই বলেছেন শাস্ত্রে। Contineuously চলছে দুঃখ, তার যদি ক্ষণিক নিবৃত্তি হয়, বিরতি হয়, তাকেই আমরা বলি সুখ-শান্তি।

ভাবিয়া দেখহ ভাই, অমিশ্র আনন্দ নাই,
যে আছে সে দুঃখের কারণ।
সে সুখের তরে তবে, কেন মায়া-দাস হবে,
হারাইবে পরমার্থ-ধন ॥

এই কথাই ভগবান্ কৃষ্ণের শিক্ষা, এই কথা বেদ-বেদান্ত-উপনিষদ্-গীতা-ভাগবতের শিক্ষা। সেইটাই ত' আমাদের বুঝ্‌বার বিষয়। কিসে পরাশান্তি পাওয়া যাবে ?—

তমেব শরণং গচ্ছ সর্ব্বভাবেন ভারত।
তৎপ্রসাদাৎ পরাং শান্তিং স্থানং প্রাপ্যসি শাশ্বতম্ ॥

ভগবান্ যে উপদেশ-নির্দ্দেশ দিচ্ছেন, সেই উপদেশ-নির্দ্দেশ অনুসারে যদি আমরা চলতে পারি, আমাদের জীবনকে যদি বাস্তবে রূপায়িত করতে পারি, তবে সেটা সম্ভব। শান্তি কে পাবেন ?—

আপূর্য্যমাণমচলপ্রতিষ্ঠং সমুদ্রমাপঃ প্রবিশন্তি যদ্বৎ।
তদ্বৎ কামা যং প্রবিশন্তি সর্ব্বে স শান্তিমাপ্নোতি ন কামকামী॥

কামকামী ব্যক্তি—যিনি সবসময় কামনা-বাসনাদ্বারা প্রপীড়িত, তার শান্তি কোথায় ? 'অশান্তস্য কুতঃ সুখম্'—অশান্ত যে তার সুখশান্তি কোথায় ? একজন মানুষ বৃক্ষতলবাসী, কিন্তু তিনি শান্তিলাভ করেছেন। পক্ষান্তরে একজন রাজপ্রাসাদ অট্টালিকাবাসী চরম অশান্তি ভোগ করছেন। সুতরাং এই শান্তি-অশান্তি এটা মানুষের নিজস্ব বৃত্তির মধ্যে আছে। একজন সামান্য কিছুতে সন্তুষ্ট, আর একজনকে পৃথিবীর সমস্তকিছু যদি দেওয়া যায়, তথাপি তিনি সন্তুষ্ট হচ্ছেন না, তার Hankering—আশা-আকাঙ্ক্ষা মিটছে না। আমাদের সনাতন শাস্ত্র এটা শিক্ষা দিয়েছেন। আর সনাতন ধর্ম্ম-সংরক্ষক পরাৎপর গুরু সেই ভগবান্ তিনিও এটা শিক্ষা দিয়েছেন। এই শিক্ষাটা আমাদের নিতে হবে।

কৃষ্ণচন্দ্র স্বয়ং ভগবান্, সর্ব্বাবতারী ভগবান্, সর্ব্বশক্তিমান্ ভগবান্। সেই ভগবানকে যদি মনুষ্যবুদ্ধি করা যায়, তাহলে ভুল হয়, তাঁর প্রতি বাস্তব শ্রদ্ধা অর্পণ করা হয় না। মানুষকে ভগবান্ বললে কি দোষ হয় বা ভগবানকে মানুষ বললে কি দোষ হয়, এ নিয়েও আলোচনা হচ্ছে। এসবগুলো শাস্ত্রে বিচার-যুক্তি দিয়ে বুঝিয়েছেন। যদি ভগবানকে মানুষ বলি, তাহলে কি দোষ হয় ? সেখানে শাস্ত্রে গালাগালি দিচ্ছেন স্বয়ং ভগবান্—এরা 'গোখর'। 'গোখর' মানে গরুর মধ্যে গাধা, অর্থাৎ গরুর তৃণবাহী গর্দ্দভ। এই গরুর তৃণবাহী গর্দ্দভ কারা ?—যারা চার রকমের ভুল করছেন।

যস্যাত্মবুদ্ধিঃ কুণপে ত্রিধাতুকে স্বধীঃ কলত্রাদিষু ভৌম ইজ্যধীঃ।
যত্তীর্থবুদ্ধিঃ সলিলে ন কর্হিচিজ্জনেষ্বভিজ্ঞেষু স এব গোখরঃ॥

এই যে হাড়-মাংসের জড় শরীরটা, এতে যারা আত্মবুদ্ধি করছেন, তারা প্রথম গর্দ্দভ। জড় শরীরটাকে অনেকেই আত্মা বলছেন, কিন্তু এইটাই আত্মা নয়। জড়বাদকে তারা আত্মবাদ বলে বিশ্বাস করতে যাচ্ছে, যার ফলে পাশ্চাত্ত্যের বিভিন্ন দেশে মৃত শবকে কফিনে আবদ্ধ করে রাখা হচ্ছে চিরদিন। সেটাকে Preserve করা হচ্ছে জড়বাদ।

আমাদের দেশের দুই ব্যক্তি, তাঁরা গেছেন Deputationএ। একজন

হলেন ইন্দ্র, দেবতাগণের পক্ষ থেকে, আর অসুরগণের পক্ষ থেকে গেছেন বিরোচন। এই দুজন আত্মতত্ত্ব-ব্রহ্মতত্ত্ব জানতে ও যাচাই করতে গেছেন। উপনিষদে উপাখ্যান আছে। তাঁরা গিয়ে যখন হাজির হয়েছেন, তখন ব্রহ্মা হাজির হয়ে বললেন,—কি বাছা! কি চাই তোমাদের? বললেন,—আমরা আত্মতত্ত্ব অবগত হওয়ার জন্য এসেছি। তাঁদের পরীক্ষা চলছে। অখিল-লোকশিক্ষক ভগবানের বিশেষ ভক্ত ব্রহ্মা পরীক্ষা করছেন। বললেন,—এই জড় শরীরটা হচ্ছে আত্মা। এই কথা শুনবার সঙ্গে সঙ্গে একজন সেখান থেকে চলে গেলেন—যার নাম বিরোচন। অসুরকুল থেকে Deputationএ গিয়েছিলেন তিনি। তিনি তার দেশে ফিরে এসে বললেন,—ঠাকুর বলেছেন এই শরীরটা হল আত্মা। সুতরাং এই শরীরটাকে Preserve করতে হবে সব সময়। একে খাইয়ে পরিয়ে সবসময় ঠিক রাখতে হবে। এটা জড় শরীরবাদ।

সনাতন আর্য্যঋষিগণের বিচারের সঙ্গে এখানে তফাৎ হচ্ছে। কোথায়? —যেখানে ঋষিনীতির মধ্যে পাচ্ছি আমরা 'শরীরমাদ্যং খলুধর্ম্মসাধনম্', দুটো জিনিস কি এক? বিরোচন গিয়ে তার দেশে প্রচার করলেন যে, এই শরীরটা সব কিছু। একে খাওয়াও, পরাও। তাহলে সব হল। আর ঋষিনীতির মধ্যে আমরা দেখছি 'শরীরমাদ্যং খলুধর্ম্মসাধনম্', বিচার কি?—ঋষিগণ বলছেন,—এই শরীরটাকে রক্ষা করতে হবে খাইয়ে পরিয়ে। কেননা, আমরা ধার্ম্মিক হব, সৎপথে চলব, নীতি-আদর্শ মেনে নেব, ধর্ম্মপথে অগ্রসর হব। সেইজন্য আমাদের শরীরটা সুস্থ রাখা প্রয়োজন। যদি সে উদ্দেশ্য না হয়, তাহলে এ শরীর ধারণে কোন সার্থকতা নাই, এই শরীর জীবিত অবস্থায়ই মৃত—'জীবন্নপি মৃতো হি সঃ'। সুতরাং বিচারটা আমাদের নিতে হবে।

Materialist দুনিয়া—ভৌতিকবাদী দুনিয়া সবসময় শুধু জড়শরীরের চিন্তা করছেন। কিন্তু সর্ব্বোপরি যে চিন্তা আছে—আত্মকল্যাণ চিন্তা, ওটা বোঝেন না তারা, ওটা নিয়ে মাথা ঘামাবার কোন প্রয়োজন মনে করছেন না। কিন্তু আর্য্যঋষিগণের বিচার—আমরা সবাই অধ্যাত্মবাদে প্রতিষ্ঠিত হব, আত্মকল্যাণ চিন্তারত হব। সেইজন্য আমাদের শরীরটাকে পালন-পোষণ করা দরকার এবং তাকে সংরক্ষণ করা প্রয়োজন। বিরোচন ওটা বুঝতে পারেন নাই, তিনি জড়বাদ প্রচার করলেন। যার থেকে পাশ্চাত্ত্য দেশে কফিনে মৃতদেহ সংরক্ষণের ব্যবস্থাটা এল।

এদিকে বিরোচনের সঙ্গী যে একজন ছিলেন ইন্দ্রদেব, যিনি দেবগণের পক্ষ থেকে Deputationএ গিয়েছিলেন, তিনি কিন্তু ফিরলেন না। তিনি আবার ধ্যান-তপস্যা শুরু করলেন। কিছুকাল পরে আবার ব্রহ্মা এলেন। কি বাছা! তোমার সঙ্গী চলে গেছে, তুমি কেন বসে আছ? ঠাকুর, আমার অন্তরে দোলা দিচ্ছে না। আপনি যে কথা বললেন আমার মনে হয় এটা পরীক্ষা। কিন্তু পরীক্ষায় ত' একজন ফেল করে চলে গেল, আমাকে কি ফেল করা ছাত্র বলে মনে করছেন। আমি ফেল করব না, আমাকে বলুন দয়া করে। ব্রহ্মা এবারে বললেন,—অণ্ডময় কোষই ব্রহ্ম, অণ্ডময় কোষই আত্মা। এই বলে চলে গেলেন। ইন্দ্র পুনরায় ধ্যানস্থ হলেন। ব্রহ্মা আবার এসে হাজির হয়েছেন। কি বাছা! এখনও বসে আছ? ইন্দ্র বললেন,—আমি এখনও পর্য্যন্ত আমার তত্ত্বদর্শন ঠিক পাই নাই। কেন আমার অন্তরে সাড়া দিচ্ছে না? তখন ব্রহ্মা বললেন,—মন, বুদ্ধি, অহঙ্কারই আত্মা। সন্তুষ্ট হতে পারলেন না ইন্দ্র। সর্ব্বশেষে ব্রহ্মা তাঁকে আত্মতত্ত্ব ঠিক ঠিকভাবে উপদেশ করলেন। দেখ, এই জড়শরীর আত্মা নয়, এই অণ্ডময় কোষও আত্মা নয়। আত্মার স্বরূপ এই—'আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যো মন্তব্য নিদিধ্যাসিতব্যঃ।' সেই তত্ত্বদর্শন হল আত্মা। আত্মা অজর, অমর। আত্মাকে অস্ত্র দিয়ে কাটা যায় না, জলে ভিজানো যায় না, বায়ু ওকে শুষ্ক করতে পারে না। গীতার মধ্যে বলেছেন,—

নৈনং ছিন্দন্তি শস্ত্রাণি নৈনং দহতি পাবকঃ।
ন চৈনং ক্লেদয়ন্ত্যাপো ন শোষয়তি মারুতঃ॥
অচ্ছেদ্যোঽয়মদাহ্যোঽয়মক্লেদ্যোঽশোষ্য এব চ।
নিত্যঃ সর্ব্বগতঃ স্থাণুরচলোঽয়ং সনাতনঃ॥

পরে সন্তুষ্ট হয়ে ইন্দ্রদেব দেবসভায় ফিরে গেলেন। গিয়ে বললেন,—আমি এই আত্মদর্শন পেয়েছি, আপনারা শ্রবণ করুন। সুতরাং ছাত্র ত' আমরা অনেকে হতে চাই, কিন্তু ছাত্রের কাজ ত' ঠিক করতে পারছি না। উৎসাহের অভাব, ধৈর্য্যের অভাব, অধিকারের অভাব। শাস্ত্র ত' বিভিন্ন ভাবে এসব তত্ত্বদর্শনগুলো শিক্ষা দিয়েছেন। অনেকে আজকাল ধর্ম্ম-কর্ম্ম আচরণ সম্বন্ধে বলছেন,—ভগবান্ একদেশদর্শী। এ কথাটা আমরা প্রায়ই শুনতে পাচ্ছি। বলি, কিরকম? প্রমাণ কিসে? তিনি সকলকে সমান অধিকার দেন নাই বা তাঁর ভক্তগণ—মুনি-ঋষিগণও শাস্ত্রে সকলকে সমান অধিকার দেন নাই। আমার পূর্ব্ববর্ত্তী বক্তৃমহোদয়ের কাছে আপনারা একটা কথা

শুনেছেন। তাতে অনেকে হয়ত' একটু চিন্তা-ভাবনা করছেন। কথাটা আমাকে বলতে হচ্ছে—সাধন-ভজনের ব্যাপারে সেখানে কিছু বাধা-বিপত্তি আছে। সে বাধা-বিপত্তির ক্ষেত্রে জড়াসক্তি পরিবর্জ্জন করে চলতে হবে। সেইজন্য কিছু নিয়মকানুন আছে, কিন্তু তজ্জন্য কাকেও অবহেলা করা হয় নাই, অবজ্ঞা করা হয় নাই, উপেক্ষা করা হয় নাই, ঘৃণা করা হয় নাই, কারও অসম্মান করা হয় নাই, কাকেও সমাজ থেকে চ্যুত করা হয় নাই।

(ক্রমশঃ)

শ্রীচৈতন্যে মর্ত্ত্যবুদ্ধি—নাস্তিকতা ও অপরাধ

[পূর্ব্বপ্রকাশিত ৪৩শ বর্ষ, ৬ষ্ঠ সংখ্যা, ২৩৭ পৃষ্ঠার পর]

(১৬) লেখক পুস্তকের ২২ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন,—"যদিও কবিরাজ গোস্বামী তাঁর চরিতামৃতের মধ্যলীলায় তাঁর সেই অতিশয় সত্য কথাটি লিখেই দিয়েছেন,—"আদ্যোপান্ত চৈতন্যলীলা অলৌকিক জান।

শ্রদ্ধা করি শুন ইহা সত্য করি মান॥"

(চৈতন্যচরিতামৃত/মধ্যলীলা/অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ)

কবিরাজ গোস্বামীর এ ধরণের উপদেশ মেনে নিলে চৈতন্যকে ঈশ্বর বা ঐশ্বরিক অবতার ধরে নেওয়ার পিছনে কোন বিতর্ক থাকতে পারে না। কিন্তু চৈতন্য যেহেতু একজন মানুষ, এবং চৈতন্যচরিতামৃত প্রভৃতি গ্রন্থ যেহেতু চৈতন্যের জীবনী ও ইতিহাসের উপাদান, সেহেতু মানুষ চৈতন্যের মানুষী প্রবৃত্তিগুলিকে আমরা নীতিগতভাবে মেনে নেব। তাঁর অলৌকিকতা, তাঁর অতি মানুষতা ধর্মপ্রিয় জাতির স্বার্থে মেনে নিলেও, ইতিহাসের বাস্তবতার স্বার্থে তা গ্রহণীয় অনুচিত হবে।"

এক্ষণে প্রতীয়মান হইতেছে যে, কবিরাজ গোস্বামী উক্ত চৈতন্যচরিতামৃতের শ্লোকে চৈতন্যলীলার আদি হইতে অন্ত (তিরোধান) পর্য্যন্ত যাবতীয় লীলা অলৌকিক ও বাস্তব সত্য বস্তু জ্ঞানে বিশ্বাস করিতে বলিয়াছেন। শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতের মধ্যলীলায় উপরোক্ত শ্লোকটিতে কবিরাজ গোস্বামী অতিশয় সত্য কথাটি লিখিয়া দিয়াছেন বলিয়া লেখকের স্বীকারোক্তি প্রকাশ পাইয়াছে। কিন্তু লেখক ঐ শ্লোকটি অতিশয় সত্য মানিয়া লইয়াও চৈতন্যদেবকে মনুষ্য-

জ্ঞানে তাঁহার অলৌকিক লীলার সত্যতা পরক্ষণেই অস্বীকার করিয়াছেন। লেখক চৈতন্যচরিতামৃতকে চৈতন্যের জীবনী ও ইতিহাসের উপাদান বলিয়াছেন। জীবনী বলিলে শ্রীচৈতন্যের দিব্য জীবনের যাবতীয় লীলাকেই বুঝায়। ইতিহাস বলিতে বুঝায় মানুষ ও তাহার পরিবেশ পরিবর্ত্তনের কাহিনী। লেখক চৈতন্য-দেবকে মানুষ হিসাবে ধরিলেও ইতিহাস লিখিতে গেলে ব্যক্তি, স্থান ও কালের পরিপ্রেক্ষিতে তাঁহার পরিবেশকে বুঝিতে হইবে। ব্যক্তিকে বাদ দিয়া সেই ব্যক্তির ইতিহাস লেখা যায় না। ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব, স্বভাব, কার্য্যাবলী, চরিত্র, পরিবেশ ইত্যাদি যাবতীয় বিষয় লইয়াই ত' ইতিহাস। কবিরাজ গোস্বামী ছিলেন মহান্ পণ্ডিত, সুপ্রসিদ্ধ কবি ও তত্ত্বদর্শী দার্শনিক। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত শুধুমাত্র চৈতন্যের জীবনী ও ইতিহাসের উপাদান নহে, ইহা বহু সংস্কৃত শ্লোক, দার্শনিক ও বৈয়াকরণ-বিচারে পরিপূর্ণ বঙ্গভাষায় লিখিত পরমার্থ সাহিত্য-ভাণ্ডারের অমূল্য গ্রন্থ এবং এই গ্রন্থখানি বঙ্গভাষায় সাহিত্য জগতে অতুলনীয় অবদান রাখিয়াছে। যাঁহার সার্ব্বজনীন প্রেমরসের-বন্যা প্রবলবেগে সমগ্র জগৎকে ডুবাইয়া দিয়াছিল, সেই প্রেমের ঠাকুর শ্রীচৈতন্যদেবকে সামান্য মানুষ জ্ঞান করিয়া লেখক অজ্ঞ ব্যক্তিদের নিকট বাহাদুরি দেখাইয়াছেন, কিন্তু বিজ্ঞ ব্যক্তিদের নিকট বাহাদুরি দেখাইতে পারিবেন না।

চৈতন্যদেবের প্রেমবন্যা সম্পর্কে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত বাণী,—

"উছলিল প্রেমবন্যা চৌদিকে বেড়ায়।
স্ত্রী, বৃদ্ধ, বালক, যুবা, সবারে ডুবায়॥
সজ্জন, দুর্জ্জন, পঙ্গু, জড়, অন্ধগণ।
প্রেমবন্যায় ডুবাইল জগতের জন॥
জগৎ ডুবিল, জীবের হইল বীজ নাশ।
তাহা দেখি' পাঁচ জনের পরম উল্লাস॥"

(চৈঃ চঃ আঃ ৭।২৫-২৭)

যাঁহার প্রেমবন্যায় জগৎ মগ্ন হওয়ায় তাহাতে বদ্ধজীবের কৃষ্ণ-দাস্য বিস্মৃতিরূপ অবিদ্যা-বন্ধন-বীজ নষ্ট হইয়া গেল, তাঁহাকে কি সাধারণ মানুষ বলিয়া ভাবা যায়? শ্রীকৃষ্ণই চৈতন্যদেবরূপে অবতীর্ণ এবং তিনি স্বয়ং সর্ব্বেশ্বর হইয়াও সেবকোচিত লীলা প্রদর্শনকারী। শ্রীচৈতন্যদেব প্রপঞ্চান্তর্গত মনুষ্যমাত্র নহেন এবং সাধক বিগ্রহও নহেন,—তিনি স্বয়ংরূপ বস্তু। যথা—শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত বাণী,—

"সেই কৃষ্ণ অবতীর্ণ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য।
সেই পরিকরগণ সঙ্গে সব ধন্য॥

একলে ঈশ্বর-তত্ত্ব চৈতন্য-ঈশ্বর।
ভক্তভাবময় তাঁর শুদ্ধ কলেবর॥
কৃষ্ণমাধুর্য্যের এক অদ্ভুত স্বভাব।
আপনা আস্বাদিতে কৃষ্ণ করে ভক্তভাব॥"

(চৈঃ চঃ আঃ ৭।৯-১১)

'শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে' বর্ণিত শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীবিগ্রহের বর্ণনা নিম্নরূপ,—

"তপ্ত হেম-সম কান্তি, প্রকাণ্ড শরীর।
নব মেঘ জিনি কণ্ঠধ্বনি যে গম্ভীর॥
দৈর্ঘ্য-বিস্তারে যেই আপনার হাত।
চারি হস্ত হয় 'মহাপুরুষ' বিখ্যাত॥
'ন্যগ্রোধ পরিমণ্ডল' হয় তাঁর নাম।
ন্যগ্রোধ পরিমণ্ডল-তনু চৈতন্য গুণধাম॥
আজানুলম্বিত ভুজ কমললোচন।
তিলফুল-জিনি-নাসা, সুধাংশু-বদন॥
শান্ত, দান্ত, কৃষ্ণভক্তি-নিষ্ঠা পরায়ণ।
ভক্তবৎসল, সুশীল, সর্ব্বভূতে সম॥
চন্দনের অঙ্গদ-বালা, চন্দন-ভূষণ।
নৃত্যকালে পরি' করেন কৃষ্ণ-সংকীর্ত্তন॥"

(চৈঃ চঃ আঃ ৩।৪১-৪৬)

কোনও মানুষের অঙ্গের লক্ষণ কি ঐরূপ হইতে পারে? শ্রীচৈতন্যদেবই পরমতত্ত্ব বলিয়া শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে বর্ণনা আছে ;—

"যদদ্বৈতং ব্রহ্মোপনিষদি তদপ্যস্য তনুভা
য আত্মান্তর্যামী পুরুষ ইতি সোঽস্যাংশ-বিভবঃ।
ষড়ৈশ্বর্য্যৈঃ পূর্ণো য ইহ ভগবান্ স স্বয়ময়ং
ন চৈতন্যাৎ কৃষ্ণাজ্জগতি পরতত্ত্বং পরমিহ॥

(চৈঃ চঃ আঃ ১।৩)

অর্থাৎ, "উপনিষদ্‌গণ যাঁহাকে অদ্বৈতব্রহ্ম বলেন, তিনি আমার প্রভুর অঙ্গ-কান্তি। যাঁহাকে যোগশাস্ত্রে অন্তর্যামী পুরুষ বা পরমাত্মা বলেন, তিনি আমার প্রভুর অংশস্বরূপ। যাঁহাকে ব্রহ্ম ও পরমাত্মার আশ্রয় ও অংশীস্বরূপ ষড়ৈশ্বর্য্যপূর্ণ ভগবান্ বলেন, আমার প্রভু সেই স্বয়ং ভগবান্। অতএব, কৃষ্ণচৈতন্য অপেক্ষা জগতে আর পরতত্ত্ব নাই।"

যাঁহার শ্রীঅঙ্গে ভগবত্তার চিহ্ন, যাঁহার আচার-প্রচার কার্য্যে অলৌকিকত্ব যিনি বয়োজ্যেষ্ঠ সার্ব্বভৌম, অদ্বৈতাচার্য্য প্রভৃতি মহা মহা পণ্ডিতগণ-কর্ত্তৃক ভগবান্ বলিয়া পূজিত, তাঁহাকে লেখক কি যুক্তিতে মানুষ বলিয়া জ্ঞান করিলেন? চৈতন্যদেব মানুষ হইলে ত' তাঁহার মানুষী প্রবৃত্তি থাকিবে? তিনি সমগ্র ভগবত্তার প্রকাশ-বিগ্রহ; তাঁহার কোন কোন ক্ষেত্রে মনুষ্যোচিত ব্যবহার ও প্রবৃত্তি দেখা গেলেও তাহা অপ্রাকৃত। উপরোক্ত কিছু উদাহরণের দ্বারা মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেব যে মানুষ নহেন, তাহার কিঞ্চিৎ দিগ্ দর্শন করিলাম। লেখক চৈতন্যদেবের লীলার অলৌকিকত্ব সম্বন্ধে কবিরাজ গোস্বামীর উক্তির সত্যতা স্বীকার করিয়াও ইতিহাসের বাস্তবতার স্বার্থে তাহা গ্রহণ করা অনুচিত বলিয়াছেন। তবে কি ইতিহাসের বাস্তবতার স্বার্থে সত্য ঘটনাকে গোপন করিয়া মিথ্যার আশ্রয় লইতে হইবে?

লেখক ২৮৪ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন,—"তার কথাবার্ত্তায় বারম্বার প্রকাশ পেয়েছে অন্ত্যলীলার কথা। যেন আদি ও মধ্যলীলার চেয়েও অন্ত্যলীলা বেশী আকর্ষণীয়। কেন? তিনি আদি লীলায় লিখেছেন, চৈতন্যের শেষলীলা রহিল অবশেষ। / সেইসব লীলার শুনিতে বিবরণ। / বৃন্দাবনবাসী ভক্তের উৎকণ্ঠিত মন॥ তারপর গ্রন্থের মাঝামাঝি এসে মধ্যলীলায় বলেছেন,—শেষ লীলার সূত্রগণ / কৈল কিছু বিবরণ / ইহা বিস্তারিতে চিত্ত হয়।' সুতরাং বেশ বোঝা যাচ্ছে, কৃষ্ণদাস বিশ্বস্ত কোন মানুষের কাছ থেকে এমন কিছু চৈতন্যের অন্ত্যলীলা বিষয়ক সূত্র পেয়েছিলেন যার মধ্যে পূর্বসূরী চরিত রচয়িতাদের চেয়ে তার ভিন্নতা ছিল সর্বাধিক। বোধ করি চাঞ্চল্যকর, বিস্ময়কর কিছু সংবাদ লুকিয়ে ছিল এর মধ্যে। কিন্তু অন্ত্যলীলা বিষয়ক তাঁর প্রাপ্ত সূত্রগুলি কি তা তিনি বলি বলি করেও শেষ পর্যন্ত আমাদের বলেন নি। উপরন্তু জরাজীর্ণ বার্ধক্যগ্রস্থের অজুহাত দিয়েছেন।"** "সুতরাং তিনি কেবল শেষ লীলার রচনার ক্ষেত্রে বার্ধক্যের অজুহাত দেবেন, আদি এবং মধ্যলীলার ক্ষেত্রেও তো একথা প্রযোজ্য হতে পারতো। কার্যত তা হয়নি। শেষ লীলা বা অন্ত্যলীলার ক্ষেত্রে বারম্বার এ হেন বাহানা করার কারণ কি খুব গূঢ় ব্যঞ্জক নয়। বিশেষ করে চৈতন্যের মৃত্যুর প্রসঙ্গ যে লীলাখণ্ডে লেখা হয়েছে। বোধ করি কৃষ্ণদাস চৈতন্যের মৃত্যুর প্রসঙ্গে এমন বিস্ময়কর কিছু সূত্র পেয়েছিলেন যাতে করে বার বার তিনি অন্ত্যলীলার প্রাসঙ্গিকীর জের টেনেছেন। না বলতে পারার অব্যক্ত ব্যাকুলতা এই ভাবেই প্রকাশ পেয়েছে বার বার।" (ক্রমশঃ)

—শ্রীচৈতন্যকৃষ্ণ দাসাধিকারী

শ্রীবৈষ্ণব-চরণে প্রার্থনা

বাঞ্ছাকল্পতরু প্রভু, কৃষ্ণসেবা-শিক্ষাগুরু,
এ জগতে হইলে উদয়।
জগৎ পবিত্র কৈলে, প্রেমে জীব ভাসাইলে,
জীব-প্রতি হইয়া সদয়॥ ১॥
শিক্ষা দিলে ভক্তিতত্ত্ব, জ্ঞান কর্ম্ম হইতে শ্রেষ্ঠ,
দেখ ইহা সর্ব্বশাস্ত্রে কয়।
কৃষ্ণ হয় নিত্যতত্ত্ব, দেখাইলে সে মহত্ত্ব,
শ্রীকৃষ্ণের সম কেহ নয়॥ ২॥
ভক্ত-ভক্তি-ভগবান্,— তিন হয় একপ্রাণ,
ভক্তকৃপায় ভক্তি লাভ হয়।
ভক্ত তার ভক্তিবলে, জগৎ পবিত্র করে,
ভক্ত-মহিমা সর্ব্ববেদে গায়॥ ৩॥
কৃষ্ণগত ভক্তগণ, সেবাই তাঁর জীবন,
সেবা ছাড়া কিছু নাহি জানে।
ভক্তবৎসল কৃষ্ণচন্দ্র, সেবাসুখে হয়ে মগ্ন,
নিজ হৈতে শ্রেষ্ঠ বলি মানে॥ ৪॥
ওহে প্রভু দয়াময়, কিসে তব ভক্তি হয়,
সে উপায় কভুনা চিন্তিনু।
গন্ধ-স্পর্শ-রূপ-রস, ইন্দ্রিয়সুখে হই' বশ,
পরমার্থ কভুনা ভাবিনু॥ ৫॥
বিষয়সুখে হয়ে মত্ত, হারাইলাম পরতত্ত্ব,
কৃপা কর বৈষ্ণব ঠাকুর।
তব ভক্ত দাসের দাস, তাঁর ভক্তের চরণে আশ,
এ অভিলাষ জাগুক প্রচুর॥ ৬॥

—শ্রীনিত্যপদ দাস ব্রহ্মচারী

———

॥ শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ ॥

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির প্রতিষ্ঠাতা

আচার্য্যবর্য্য পরমহংস অষ্টোত্তরশতশ্রী

শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজের

২৩শ বার্ষিক বিরহ-মহোৎসব

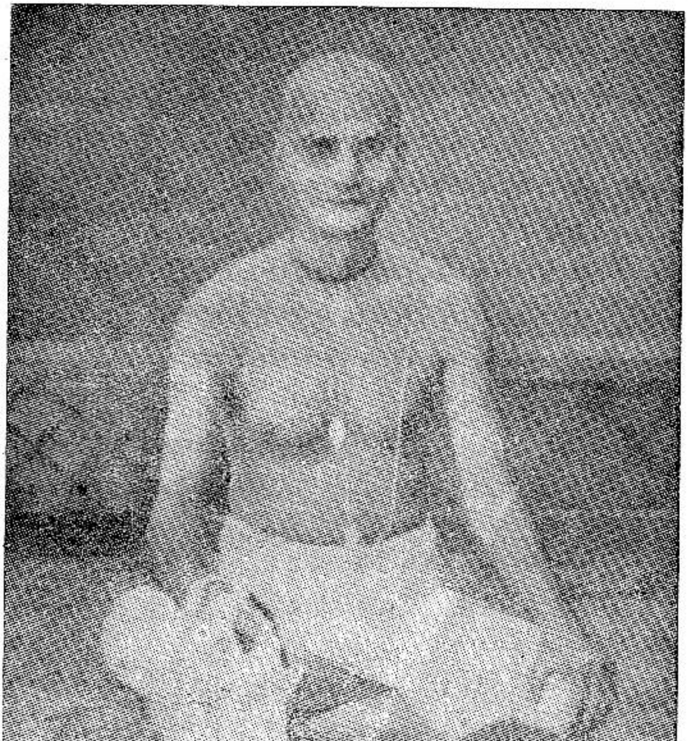

নম ওঁ বিষ্ণুপাদায় আচার্য্য-সিংহরূপিণে।

শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান-কেশব ইতি নামিনে॥

শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠ

শ্রীধাম নবদ্বীপ (নদীয়া)।

॥ শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ ॥

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি
(রেজিষ্টার্ড)
ফোন—২৪৭

শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠ,
পোঃ নবদ্বীপ (নদীয়া)।
২৩ হৃষীকেশ, ৫০৫ শ্রীগৌরাব্দ

শ্রীবৈষ্ণবচরণে দণ্ডবন্নতিপূর্ব্বিকেয়ম্—

সাদর সম্ভাষণপূর্ব্বিকেয়ম্—

আগামী ৩০শে পদ্মনাভ, ৫ই কার্ত্তিক, '৯৮ (২৩।১০।৯১) বুধবার শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি ও তদধীনস্থ ভারতব্যাপী শ্রীগৌড়ীয় মঠসমূহের প্রতিষ্ঠাতা-আচার্য্য অস্মদীয় শ্রীল গুরুপাদপদ্ম ওঁ বিষ্ণুপাদ ১০৮শ্রী **শ্রীমদ্ভক্তি-প্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজের** তিরোভাব-তিথিপূজা উপলক্ষে শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠ এবং তৎশাখা মঠসমূহে ২৩শ বর্ষপূর্ত্তি বিরহ-মহোৎসবের শুভানুষ্ঠান হইবে।

এতদুপলক্ষে উল্লিখিত ঠিকানায় নিম্নবর্ণিত সেবাসূচী অনুসারে আপনি সবান্ধবে যোগদান করত আমাদিগকে বৈষ্ণব-সেবায় অধিকার দানে কৃপাপ্রকাশ করিবেন—ইহাই বিনীত প্রার্থনা। পত্রদ্বারা নিমন্ত্রণের ত্রুটী মার্জ্জনীয়। ইতি—৩১শে ভাদ্র, ১৩৯৮

শুদ্ধভক্ত-কৃপালেশপ্রার্থী—
সভ্যবৃন্দ,
শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি

—ঃ সেবা-সূচী ঃ—

৫ই কার্ত্তিক (ইং ২৩।১০।৯১), বুধবার—

প্রাতে—মহাজন-পদাবলী কীর্ত্তন ও শ্রীগুরুপাদপদ্মের অতিমর্ত্ত্য চরিত্র আলোচনা।

মধ্যাহ্নে—ভোগারতি, বৈষ্ণবসেবা ও মহাপ্রসাদ বিতরণ।

অপরাহ্ণে—৪-৩০ মিনিটে বিরহ-সভার অধিবেশন।

বিঃ দ্রঃ—পত্র অথবা সেবানুকূল্য প্রেরণ করিতে হইলে "সাধারণ-সম্পাদক"-এর নামে শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠ, পোঃ নবদ্বীপ, জেলা নদীয়া (পঃ বঙ্গ)—এই ঠিকানায় প্রেরিতব্য।

॥ শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ ॥

স বৈ পুংসাং পরো ধর্ম্মো যতো ভক্তিরধোক্ষজে ।

ধর্ম্মঃ স্বনুষ্ঠিতঃ পুংসাং বিষ্বক্সেন-কথাসু যঃ ।

গৌড়ীয়-পত্রিকা

নোৎপাদয়েদ্‌যদি রতিং শ্রম এব হি কেবলম্ ॥

অহৈতুক্যপ্রতিহতা যয়াত্মা সুপ্রসীদতি ॥

সেই ধর্ম্ম শ্রেষ্ঠ যাতে আত্ম-পরসন্ন ।
অধোক্ষজে অহৈতুকী ভক্তি বিঘ্নশূন্য ॥

অন্য ধর্ম্ম সুষ্ঠুরূপে পালে যেই জন ।
হরি-কথায় রতি নৈলে পণ্ড সেই শ্রম ॥

৪৩শ বর্ষ — ২৫ পদ্মনাভ, গর্ভোদশায়ী, ৫০৫ শ্রীগৌরাব্দ — ৩১ আশ্বিন, শুক্রবার, ১৩৯৮, ইং ১৮।১০।৯১ — ৮ম সংখ্যা

শ্রীকার্ত্তিকব্রতে বিধিনিষেধাঃ

[শ্রীহরিভক্তিবিলাসস্য পঞ্চদশবিলাসে]

বিধয়ঃ ঃ—১। কার্ত্তিকস্য ব্রতানীহ তস্যাং কুর্য্যাদতন্দ্রিতঃ।
নিত্যং জাগরণায়ান্ত্যে যামে রাত্রেঃ সমুত্থিতঃ।
শুচির্ভূত্বা প্রবোধ্যাথ স্তোত্রৈর্নীরাজয়েৎ প্রভুম্ ॥ ৮১ ॥

১। নিত্য কার্ত্তিকমাসের রাত্রির শেষপ্রহরে জাগরণের নিমিত্ত গাত্রোত্থান করিয়া শুচিপূর্ব্বক স্তোত্র-পাঠ-সহকারে প্রভুকে জাগরিত করত নীরাজন অর্থাৎ আরাত্রিক করিবে ॥ ৮১ ॥

২। নিশম্য বৈষ্ণবান্ ধর্ম্মান্ বৈষ্ণবৈঃ সহ হর্ষিতঃ।
কৃত্বা গীতাদিকং প্রাতর্দেবং নীরাজয়েৎ প্রভুম্ ॥ ৮২ ॥

২। বৈষ্ণবধর্ম্ম-সকল **শ্রবণ** করিয়া বৈষ্ণবগণ-সহ সহর্ষে **গীতাদি** করিয়া প্রাতঃকালে প্রভুকে **নীরাজন** করিবে ॥ ৮২ ॥

৩। নিত্যং বৈষ্ণবসঙ্গত্যা সেবেত ভগবৎকথাম্।
সর্পিষাহর্নিশং দীপং তিলতৈলেন চার্চ্চয়েৎ।
বিশেষতশ্চ নৈবেদ্যান্যর্পয়েদাচরেত্তথা।
প্রণামাংশ্চ যথাশক্ত্যা একভক্ত্যাদিকং ব্রতম্ ॥ ৮৭ ॥

৩। কার্ত্তিকমাসে নিত্য বৈষ্ণবদিগের সহিত ভগবৎকথা সেবন এবং দিবারাত্র ঘৃত বা তিলতৈলদ্বারা প্রদীপ দিয়া অর্চ্চনা করিবে। অন্যান্য মাস অপেক্ষা কার্ত্তিকমাসে বিশেষ করিয়া নৈবেদ্যাদি অর্পণ ও বিশেষরূপে প্রণামাদি করিয়া যথাশক্তি **একভক্তাদি অর্থাৎ একবার মাত্র ভোজনরূপ ব্রত ধারণ** করিবে ॥ ৮৭ ॥

৪। **দামোদরাষ্টকং** নাম স্তোত্রং দামোদরার্চ্চনম্।
নিত্যং দামোদরাকর্ষি পঠেৎ সত্যব্রতোদিতম্ ॥ ৯৬ ॥

৪। কার্ত্তিকমাসে দামোদরের অর্চ্চনপূর্ব্বক **সত্যব্রত নামক মুনি-কথিত 'দামোদরাষ্টক' নামক স্তোত্র নিত্য পাঠ করিবে,** তাহাতেই দামোদর বশীভূত হইয়া থাকেন ॥ ৯৬ ॥

নিষেধাঃ :—৫। কার্ত্তিকে তু বিশেষেণ রাজমাষাংশ্চ ভক্ষয়ন্।
নিষ্পাবান্ মুনিশার্দ্দূল যাবদাহূতনারকী ॥

৫। হে মুনিশ্রেষ্ঠ! যে ব্যক্তি বিশেষতঃ কার্ত্তিকমাসে রাজমাষ (বরবটী কলাই) এবং নিষ্পাব (শিম্বী) ভোজন করে, সে মহাপ্রলয় পর্য্যন্ত নারকী হইবে ॥

৬। কলিঙ্গানি পটোলানি বৃন্তাকং সন্ধিতানি চ।
ন ত্যজেৎ কার্ত্তিকে মাসি যাবদাহূতনারকী ॥ ৯০ ॥

৬। যে মনুষ্য কার্ত্তিকমাসে কলিঙ্গ (কলমীর শাক), পটোল, বৃন্তাক (বার্ত্তাকী) এবং সন্ধিত (আসবাদি) যদি পরিত্যাগ না করে, তাহা হইলে সে মহাপ্রলয় পর্য্যন্ত নারকী হইবে ॥ ৯০ ॥

৭। তৈলাভ্যঙ্গং তথা শয্যাং পরান্নং কাংস্যভোজনম্।
কার্ত্তিকে বর্জ্জয়েদ্যস্তু পরিপূর্ণব্রতী ভবেৎ ॥

৭। যে ব্যক্তি কার্ত্তিকমাসে **তৈলমর্দ্দন, শয্যা, পরান্ন এবং কাংস্য-পাত্রে ভোজন** বর্জ্জন করেন, তাহার ব্রত পরিপূর্ণ হয় ॥

৮। ক্বার্ত্তিকে বর্জ্জয়েত্তৈলং কার্ত্তিকে বর্জ্জয়েন্মধু।
কার্ত্তিকে বর্জ্জয়েৎ কাংস্যং কার্ত্তিকে শুক্ত-সন্ধিতম্॥
ন মাৎস্যং ভক্ষয়েন্মাংসং ন কৌর্ম্মং নান্যদেব হি।
চাণ্ডালঃ স ভবেৎ সুভ্রূ কার্ত্তিকে মাংসভক্ষণাৎ॥ ৯৩॥

৮। হে সুন্দরি! কার্ত্তিকমাসে তৈল, মধু, কাংস্য শুক্ত (কাঞ্জিকাদি পর্য্যুষিত অম্লদ্রব্য), সন্ধিত (আসবাদি মদ্যবিশেষ), মৎস্য, কূর্ম্ম, মাংস এবং অন্য (আমিষতুল্য) দ্রব্য ভোজন করিবে না। যে ব্যক্তি কার্ত্তিকমাসে মাংস ভোজন করে, সে চণ্ডাল হয়॥ ৯৩॥

প্রশ্নোত্তর

প্রশ্ন—১৪। কিরূপভাবে সাম্প্রদায়িক বিবাদ-ভঞ্জন ও প্রকৃত প্রেম-ধর্ম্মের স্থাপন হইতে পারে?

উত্তর—পরমেশ্বরের বিশুদ্ধ গুণগণের কীর্ত্তন ও তাঁহার প্রেমে সকলের ভ্রাতৃত্ব-স্থাপনই বিশুদ্ধ ধর্ম্ম। ক্রমশঃ সংস্থাপিত ধর্ম্মসকলের হেয়াংশ দূরীভূত হইলে সম্প্রদায় বিশেষের ভজন-ভেদ ও সম্প্রদায়ে সম্প্রদায়ে বিবাদ থাকিতে পারে না। তখন সকল বর্ণ, সকল জাতি, সর্ব্বদেশের মনুষ্য একত্রিত হইয়া পরস্পর ভ্রাতৃত্ব-সহকারে পরমারাধ্য পরমেশ্বরের নাম-সংকীর্ত্তন সহজেই করিতে থাকিবেন। তখন কেহ কাহাকে চণ্ডাল বলিয়া ঘৃণা করিবেন না এবং নিজের জাত্যভিমানে মুগ্ধ হইয়া জীবসমূহে সাধারণ ভ্রাতৃত্ব আর ভুলিতে পারিবেন না; তখন হরিদাস প্রেমরসের কলসী লইয়া শ্রীবাসের মুখে ঢালিতে থাকিবেন এবং শ্রীবাস হরিদাসের চরণরেণু সর্ব্বাঙ্গে মাখিয়া 'হা চৈতন্য! হা নিত্যানন্দ!' বলিয়া সহজেই নৃত্য করিবেন। (সজ্জনতোষণী ৪।৩—'নিত্যধর্ম্ম-সূর্য্যোদয়')

প্রশ্ন—১৫। বৈষ্ণবধর্ম্মকেই একমাত্র ধর্ম্ম বলিলে কি তাহাতে গোঁড়ামী হইবে না?

উত্তর—বৈষ্ণবধর্ম্ম ব্যতীত আর ধর্ম্ম নাই, অন্যান্য যতপ্রকার ধর্ম্ম জগতে প্রচারিত হইয়াছে বা হইবে, সমস্তই বৈষ্ণবধর্ম্মের সোপান বা বিকৃতি।

সোপানস্থলে তাহাদিগকে যথাযোগ্য আদর করিবে, বিকৃতিস্থলে অসূয়ারহিত হইয়া নিজে ভক্তিতত্ত্ব আলোচনা করিবে, অন্য কোন পন্থাকে হিংসা করিবে না ; যাঁহার যখন শুভদিন হইবে, সে অনায়াসে বৈষ্ণব হইবে, সন্দেহ নাই।

(জৈবধর্ম্ম ৮ম অঃ)

প্রশ্ন—১৬। বৈষ্ণবধর্ম্ম যে সনাতন ধর্ম্ম, তাহার প্রমাণ কি ?

উত্তর—বৈষ্ণবধর্ম্ম জীবের সঙ্গে সঙ্গে উদিত হইয়াছে। ব্রহ্মা—প্রথম বৈষ্ণব। শ্রীমন্মহাদেব—বৈষ্ণব। আদি প্রজাপতিগণ সকলেই বৈষ্ণব। ব্রহ্মার মানস-পুত্র শ্রীনারদ গোস্বামী বৈষ্ণব। এখন দেখিলেন, বৈষ্ণবধর্ম্ম সৃষ্টির সময় হইতে ছিল কি না ? মূল কথা এই যে, সকলেই নির্গুণ-প্রকৃতি হয় না। যে জীবের প্রকৃতি যতদূর নির্গুণ, সে জীব ততদূর বৈষ্ণব। মহাভারত, রামায়ণ ও পুরাণ—এই সকল গ্রন্থই আর্য্যদিগের ইতিহাস। প্রথম সৃষ্টি-কালের বৈষ্ণবধর্ম্ম দেখিলেন। আবার যখন দেব, নর, দৈত্য প্রভৃতি পৃথক্ পৃথক্ বর্ণিত হইয়াছে, তখন প্রথম হইতেই আমরা প্রহ্লাদ ও ধ্রুবকে পাই। যে-সকল ব্যক্তিরা বিশেষ যশস্বী তাঁহাদেরই নাম ইতিহাসে লিখিত হইয়াছে। বস্তুতঃ প্রহ্লাদ ও ধ্রুবের সময় আরও কতশত বৈষ্ণব ছিলেন, তাহা বলা যায় না। ধ্রুব, মনু-পুত্র এবং প্রহ্লাদ—কশ্যপ প্রজাপতির পৌত্র। ইঁহারা অত্যন্ত আদিকালের লোক, ইহাতে সন্দেহ নাই। ইতিহাসের আরম্ভকালেই শুদ্ধ বৈষ্ণবধর্ম্ম দেখিতে পাইতেছেন। পরে চন্দ্র-সূর্য্যবংশীয় রাজগণ এবং ভাল ভাল মুনি ও ঋষিগণ সকলেই বিষ্ণুপরায়ণ হইয়াছিলেন। সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর—তিন যুগেই এরূপ উল্লেখ আছে। কলিকালে দাক্ষিণাত্য-প্রদেশে শ্রীরামানুজ, শ্রীমধ্বাচার্য্য ও শ্রীবিষ্ণুস্বামী এবং পাশ্চাত্ত্য প্রদেশে শ্রীনিম্বাদিত্য স্বামী বহু সহস্র ব্যক্তিকে বিশুদ্ধ বৈষ্ণবধর্ম্মে আনয়ন করিয়াছিলেন। তাঁহাদের কৃপায় বোধ হয়, ভারতের অর্দ্ধসংখ্যক মনুষ্য মায়াসমুদ্র উত্তীর্ণ হইয়া ভগবচ্চরণাশ্রয় লাভ করিয়াছেন। এই বঙ্গদেশে আমার হৃদয়নাথ শ্রীশচীনন্দন কত দীন ও পতিত লোককে উদ্ধার করিলেন! এই সমস্ত দেখিয়াও আপনার বৈষ্ণবধর্ম্মের মাহাত্ম্য নয়নগোচর হয় না! (জৈবধর্ম্ম ১০ম অঃ)

প্রশ্ন—১৭। বৈষ্ণবধর্ম্ম যদি অনাদিকাল হইতে চলিয়া আসিতেছে, তবে চৈতন্যমহাপ্রভু কি নূতন শিক্ষা দিলেন,—যাহাতে তাঁহাকে বিশেষ শ্রদ্ধা করিতে হইবে ?

উত্তর—বৈষ্ণবধর্ম্ম পদ্মপুষ্পের ন্যায়, কাল-সহকারে ক্রমশঃ প্রস্ফুটিত হইতেছেন। প্রথম—কলিকা। পরে একটু বিকচিতভাবে লক্ষিত। ক্রমশঃ

পূর্ণবিকচিত-ভাবপ্রাপ্ত পুষ্পবৎ প্রকাশিত। ব্রহ্মার সময়ে শ্রীভাগবতের চতুঃশ্লোকীসম্মত ভগবজ্‌জ্ঞান, মায়াবিজ্ঞান, ভক্তিসাধন ও প্রেম কেবল অঙ্কুর-রূপে জীবের হৃদয়ে প্রকাশ পাইতেছিল। প্রহ্লাদাদির সময়ে কলিকা-আকার দেখা গেল। ক্রমশঃ বাদরায়ণ ঋষির কালে কলিকাগুলি বিকচিত হইতে আরম্ভ হইয়া বৈষ্ণবধর্ম্মের আচার্য্যগণের সময়ে পুষ্পাকারে দেখা গেল। শ্রীমন্মহাপ্রভুর উদয় হইলে প্রেমপুষ্প সম্পূর্ণ বিকচিত হইয়া জগজ্জনের হার্দ্দ-নাসিকায় পরম রমণীয় সৌরভ প্রদান করিতে লাগিল। শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীবৈষ্ণব-ধর্ম্মের পরম নিগূঢ়-ভাব যে নাম-প্রেম, তাহাই জগজ্জীবের ভাগ্যে প্রকাশ করিয়াছেন। শ্রীনাম-সংকীর্ত্তন যে পরম আদরের ধন, তাহা কি আর কেহ প্রকাশ করিয়াছিলেন? যদিও শাস্ত্রে ছিল, তথাপি জীব-চরিত্রগত হয় নাই। আহা! শ্রীমন্মহাপ্রভুর উদয় হইবার পূর্ব্বে প্রেমরস-ভাণ্ডার কি এইরূপে কখনও বিতরিত হইয়াছিল? (জৈবধর্ম্ম ১০ম অঃ)

প্রশ্ন—১৮। ভাল, যদি আপনাদের কীর্ত্তনাদি এত উপাদেয় হয়, তাহা হইলে পণ্ডিত-মণ্ডলীতে ইহার আদর নাই কেন?

উত্তর—কলিকালে 'পণ্ডিত'-শব্দের অর্থ-বিপর্য্যয় হইয়াছে। শাস্ত্রে উজ্জ্বলা বুদ্ধির নাম পণ্ডা, তাহা যাঁহাদের আছে, তাঁহাদিগকেই পণ্ডিত বলা হয়। কিন্তু এ সময়ে যিনি ন্যায়ে নিরর্থক ফাঁকি স্মৃতিশাস্ত্রের লোকরঞ্জক অর্থ করিতে পারেন, তাঁহাকেই পণ্ডিত বলে। এরূপ পণ্ডিতগণ কিরূপে ধর্ম্ম-তাৎপর্য্য ও শাস্ত্রের যাথার্থ অর্থ বুঝিতে বা বুঝাইতে পারিবেন? নিরপেক্ষভাবে সর্ব্বশাস্ত্র আলোচনা করিলে যাহা পাওয়া যায়, তাহা কি ন্যায়ের ফাঁকি-সিদ্ধান্তে লাভ হয়? বস্তুতঃ যাঁহারা আত্ম-বঞ্চনায় ও জগৎ-বঞ্চনায় পটু, তাঁহারাই কলিকালে পণ্ডিত! এই সকল পণ্ডিত-মণ্ডলীতে ঘট-পট লইয়া বিতর্ক হয়। বস্তুজ্ঞান ও সম্বন্ধ-জ্ঞানতত্ত্ব এবং জীবের চরম প্রয়োজন ও তাহার উপায় লইয়া কোন বিচার উঠিবার সম্ভাবনা নাই। তত্ত্ব-বিচার হইলে, তবে প্রেম-কীর্ত্তনাদি যে কি বস্তু, তাহা জানা যায়। (জৈবধর্ম্ম ১০ম অঃ)

প্রশ্ন—১৯। বৈষ্ণব-ধর্ম্মের অনুশীলন করিলে কি কোন বৈজ্ঞানিক উন্নতি লাভ হইবে?

উত্তর—বিষয়-জ্ঞানকে তিরস্কারপূর্ব্বক শুদ্ধজ্ঞান স্থাপনের নাম 'বিজ্ঞান'। 'বস্তু' এক হইলেও প্রক্রিয়া পৃথক্ বলিয়া 'জ্ঞান' ও 'বিজ্ঞান' দুইটী পৃথক্ পৃথক্ নাম হইয়াছে। তোমরা বিষয় জ্ঞানকে 'বিজ্ঞান' বল, বৈষ্ণবগণ বিষয়-জ্ঞানকে যথাযথ সংস্থাপন করাকে 'বিজ্ঞান' বলেন। তাঁহারা ধনুর্ব্বেদ, আয়ুর্ব্বেদ,

জ্যোতিষ, রসায়ন—সমস্ত আলোচনাপূর্ব্বক দেখেন, এ সমস্তই জড়জ্ঞান, ইহার সহিত জীবের নিত্য-সম্বন্ধ নাই ; অতএব উহা জীবের নিত্যধর্ম্ম-সম্বন্ধে নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর। যাঁহারা জড়প্রবৃত্তি-অনুসারে জড়জ্ঞানের উন্নতি-সাধনে রত, তাঁহাদিগকে বৈষ্ণবেরা কর্ম্মকাণ্ডগ্রস্ত বলিয়া জানেন—তাঁহাদিগকে নিন্দা করেন না ; কেননা তাঁহারা জড়োন্নতির যত্ন করিয়া বৈষ্ণবের চিত্নন্নতির কিয়ৎ পরিমাণে পরোক্ষভাবে উপকার করেন। তাঁহাদের ক্ষুদ্র জড়ময় জ্ঞানকে আপনারা 'প্রাকৃতিক বিজ্ঞান' বলেন ; তাহাতেই বা আপত্তি কি ? নাম লইয়া বিবাদ করা মূঢ়েরই কর্ম্ম। (জৈবধর্ম্ম ৯ম অঃ)

প্রশ্ন—২০। যদি জড়জ্ঞান ও জড়বিজ্ঞানের উন্নতি না হইত, তবে বৈষ্ণবেরা কিরূপে ভগবানের ভজন করিতেন ?

উত্তর—প্রবৃত্তি-অনুসারে পৃথক্ পৃথক্ লোক পৃথক্ পৃথক্ চেষ্টা করে, কিন্তু সর্ব্বনিয়ন্তা ঈশ্বর সেই সকল চেষ্টার ফলকে যথাযোগ্য অপর জনগণকে ভাগ করিয়া দেন। (জৈবধর্ম্ম ৯ম অঃ)

প্রশ্ন—২১। বৈষ্ণবধর্ম্ম যাজন করিলে কি লোকে অসত্য বলিবে না ?

উত্তর—মনুষ্যজীবন অল্পদিন, তাহাতে আবার উপদ্রব অনেক, এই স্বল্প-জীবনের মধ্যে সরলতার সহিত হরিভজনই কর্ত্তব্য। সভ্যতা শিক্ষা করা কেবল আত্মবঞ্চনা। আমরা জানি, 'শঠতা'র অন্য নাম 'সভ্যতা'। মনুষ্যজীবন যতদিন সত্যপথে থাকে, ততদিন সরল থাকে ; যখন অধিকতর অসত্য-ব্যবহার স্বীকার করে, তখনই ভিতরে শঠ ও কুকার্য্যরত হইয়া বাহিরে মিষ্টবাক্যে লোকরঞ্জন করিয়া সভ্য হইতে চায়। সভ্যতা বলিয়া কোন গুণ নাই ; সত্য ব্যবহার ও সরলতাই গুণ। ভিতরে দুষ্টতা আচ্ছাদন করিবার যে প্রথা, তাহারই বর্ত্তমান নাম 'সভ্যতা'। 'সভ্যতা'-শব্দের অর্থ—সভায় বসিবার যোগ্যতা, তাহা সরল ভদ্রতা। তোমরা ক্রমশঃ শঠতাকেই 'সভ্যতা' বলিতেছ। বস্তুতঃ সভ্যতা যখন নিষ্পাপ, তখন তাহা বৈষ্ণবদের মধ্যেই থাকে ; সভ্যতা যখন পাপপূর্ণ, তখন তাহা অবৈষ্ণবের মধ্যে আদৃত। তুমি যে সভ্যতার কথা বলিলে, তাহার সহিত জীবের নিত্যধর্ম্মের কোন সম্বন্ধ নাই। লোকরঞ্জন-বস্ত্র পরিধান করিলেই যদি সভ্যতা হয়, তবে বেশ্যাগণ তোমাদের অপেক্ষা সভ্য। বস্ত্র-সম্বন্ধে এইমাত্র স্বীকার করা যায় যে, তদ্দ্বারা শরীর আচ্ছাদিত হয় এবং বস্ত্র পরিষ্কার থাকে, দুর্গন্ধ ইত্যাদি দোষ না থাকে। আহারাদি পবিত্র ও উপকারী হয়—ইহাতে দোষ নাই, কিন্তু তোমাদের মতে কেবল খাইতে ভাল হয়, অথচ পবিত্র হউক না হউক, তাহার বিচার নাই। মদ্য-মাংস স্বভাবতঃ অপবিত্র, তাহা ভোজন করিয়া যে 'সভ্যতা' হয়, তাহা কেবল পাপাচার মাত্র। আজকাল যে অবস্থাকে সভ্যতা বলে, তাহা কলিকালের সভ্যতা। (জৈবধর্ম্ম ৯ম অঃ)

—জগদ্গুরু শ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুর

আমি 'এই' নই, আমি 'সেই'

এবংবিৎ বলেন,—আমি 'ইদং'; যেহেতু সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম'। আমি জড়বিচারে উন্মত্ত হইয়া পূর্ণচেতনের আরোপদ্বারা আপনাকে 'ব্রহ্ম' সংজ্ঞায় সংজ্ঞিত করিয়া 'অয়ং', ও 'ইদং' এর ভেদের সংমিশ্রণে একাকার করিয়া ফেলি। কিন্তু প্রকৃতপ্রস্তাবে 'ইদং' বলিতে যে পারিভাষিক জ্ঞানের উদয় হয়, তাহা 'অয়ং'-শব্দের বা 'অসৌ'-শব্দের সহিত 'এক' নহে। বেদমুখ ব্যাকরণাঙ্গে লিঙ্গনির্ণয়ে চেতনলিঙ্গের সহিত অচিৎলিঙ্গের ভেদ বা বৈশিষ্ট্য কল্পিত হয়। যিনি স্বয়ং চিদুদ্ভাসিত হইয়া বলিতে পারেন 'আমি', তাঁহার চেতনের বৃত্তিতে 'আমি' ব্যতীত 'তুমি' ও 'তিনি'র চিদ্‌বৈশিষ্ট্য স্বীকৃত হয়। কিন্তু অচিৎলিঙ্গ-প্রকরণে 'আমি' বলিবার স্বতঃকর্ত্তৃত্ব-ধর্ম্ম লক্ষিত না হওয়ায় তাহার চেতন-ধর্ম্মের পরিচয়াভাবহেতু অচিৎপর্য্যায়ে সেইগুলি পরিগণিত হয়। 'ইদং' শব্দ চিদ্‌প্রকরণের অন্তর্গত নহে,—এরূপ ভাব বুঝাইবার জন্যই তাদৃশ চিদ্-বৈচিত্র্যের প্রাকট্য।

জড়জগতে জড়তা ও গতিশীলতা,—এই দুই প্রকার ধর্ম্ম পরিলক্ষিত হয়। পরমাণুবাদী বলেন,—জড়পরমাণু স্থূলজড়ের হেতু, আবার কেহ কেহ বলেন,—গতিশীল বিদ্যুৎকণ জড়পরমাণুর হেতু। যখন তাহারা ইচ্ছাশক্তির পরিচালনা করিতে স্বীয় নৈসর্গিক বৃত্তি প্রদর্শন করে না, তখনই তাহাদিগকে 'জড়' বলিয়া নির্দ্দেশ করা হয়। যেখানে ইচ্ছাশক্তির ক্রিয়া দেখা যায়, সেখানে যে বল অচিতের স্থাপনে বা বিনাশে যত্নবান্ হয়, তাহার একটীকে 'অচিদ্‌বল' এবং অপরটীকে 'চিদ্‌বল' বলা হয়।

জ্ঞানশক্তির অবলম্বনেই ইচ্ছা ও অনুভাবিনীশক্তি এই শক্তিদ্বয় কার্য্যকরিতে সমর্থ। এজন্যই অদ্বয়জ্ঞানের অন্তর্ভুক্ত ইচ্ছাশক্তির প্রভাবে চিদ্‌বৈচিত্র্যে চিদ্‌বিলাসের নিত্যাবস্থান। জড়জগতে অদ্বয়জ্ঞানের ইচ্ছা-শক্তি ক্রিয়মাণ হইয়া যে উপাদানে জগতের কার্য্যাদির অবতারণা করে, উহা তাঁহার 'প্রকৃতি' বা কার্য্যের কারণরূপে 'প্রধান' সংজ্ঞায় অভিহিত হয়। তজ্জন্যই অদ্বয়জ্ঞানের ইচ্ছা-শক্তিপ্রসূত প্রপঞ্চের উপাদানত্বে কেহ কেহ অদ্বয়জ্ঞানের প্রকৃতিকে অদ্বয়জ্ঞান হইতে ব্যতিরেক-বিচারে পৃথক্‌বস্তু বলিয়া নিরূপণ করেন, কিন্তু প্রকৃতপ্রস্তাবে এই প্রপঞ্চের 'নিমিত্ত' ও 'উপাদান' কারণ, উভয়ই জ্ঞানশক্তি ও

তাহার ক্রিয়ামুখে ইচ্ছা-শক্তিরই কার্য্য। আবার আধ্যক্ষিকজ্ঞানের উপাদান-নিরূপণে যে প্রকৃতির ধারণা হয় তাহাকে জ্ঞানশক্তির সহিত অভিন্ন মনে করিলে জ্ঞানস্বরূপের আলোচনায় প্রেমার পরিবর্ত্তে ভ্রমের উদয় হয়। জীব যখন চেতনবৃত্তি লইয়া স্বীয় স্থূলশরীরের প্রতি দৃষ্টিপাত করেন, তখন তিনি যে 'ইদং' এর ধারণা করেন, সেই ধারণায় যে বৈশিষ্ট্য বর্ত্তমান, তাহা তাঁহাকেই স্বীয় পূর্ণাস্তিত্বে স্থাপন করিতে ইতস্ততঃ করেন। তখনই তিনি জানেন যে, আত্মার ইচ্ছা-শক্তির পরিচালনক্রমে প্রাপঞ্চিক ভূমিকা ইদং-শব্দবাচ্য। উহার সহিত তাঁহার স্বরূপগত নিত্যপার্থক্য আছে বলিয়াই মধ্যে মধ্যে তাঁহার ইচ্ছা-শক্তি পরিচালনে বাধা উপস্থিত হয়। সেই বাধাটী কে দেয়? তাহা আলোচনা করিতে গিয়া তিনি বুঝিতে পারেন যে, তাঁহার জ্ঞানস্বরূপের ইচ্ছার সহিত অন্য জ্ঞানস্বরূপের ইচ্ছায় পরস্পর সংঘর্ষক্রমে বাধা আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। যেখানে ইচ্ছাদ্বয়ের পরস্পর প্রতিকূল সম্বন্ধ, সেখানে অবরতা, হেয়তা, অনুপাদেয়তা, বৈষম্য প্রভৃতি ইচ্ছা-পরিচালনে বাধা-স্বরূপে দণ্ডায়মান হয়।

জ্ঞানেরই ইচ্ছা-শক্তি ও অনুভাবিনী শক্তি অদ্বয়জ্ঞানস্বরূপের নিকট প্রপঞ্চে বাধা প্রাপ্ত হইয়া অভিযোগ উপস্থিত করিলে 'জ্ঞানস্বরূপ ইচ্ছা ও জ্ঞেয় অনুভূতিকে' সুষ্ঠুভাবে যথাস্থানে নিযুক্ত হইবার ব্যবস্থা করেন। এই প্রপঞ্চে অবস্থান-কালে ইচ্ছা-শক্তি জ্ঞেয়বিচারে প্রতিহত হইলে উভয়ের সামঞ্জস্য নিরূপণ কার্য্যে পূর্ণ অদ্বয়জ্ঞানের অভিমুখে যাত্রা করেন। তখনই অণুচিৎ জীব জ্ঞান-স্বরূপ পূর্ণতাভিমুখে ইচ্ছা ও জ্ঞেয়-শক্তি-বিচার স্থাপনাভিপ্রায়ে বলেন,—'আমি ইহা নই' 'আমি তাহাই' অর্থাৎ আমি তখন নিজস্বরূপের শুদ্ধনিত্যপরিচয়ে অবস্থিত। এই সময়ে দুর্দ্দৈববশতঃ জ্ঞানস্বরূপ স্বীয় ইচ্ছা ও জ্ঞেয়ানুভব আনন্দ-বৃত্তি সঙ্কোচ করিবার অভিপ্রায়ে জড়জগতের ত্রিপুটী-বিনাশ কামনায় তমোগুণে আক্রান্ত হয়। তখনই অণুচিৎ জীব 'আমি এই নই, আমি সেই' বলিতে গিয়া অহঙ্কার-বশে অপূর্ণ হইয়া তমোভাবকে পূর্ণ অদ্বয়জ্ঞানবিচারে স্থাপনপূর্ব্বক 'অহং ব্রহ্মাস্মি' প্রভৃতি বিচার-বিবর্ত্তে পতিত হইয়া আত্মহারা হয়। পূর্ণজ্ঞানের মূর্ত্তাশ্রয় শ্রীগুরুদেব তৎকালে তাহাকে রক্ষা করিবার জন্য স্বীয় প্রাকট্য সাধন করিয়া তাহার অণুচিৎএর ইচ্ছা-বৃত্তির দুর্দ্দমনীয় তমোভাব বা অজ্ঞান বিনাশ করিয়া আনন্দময় পূর্ণজ্ঞানস্বরূপ ব্রজেন্দ্রনন্দনের উদ্দেশ বলিয়া দেন। শ্রীগুরু-দেবের সহিত পূর্ণাদ্বয়জ্ঞানের বিষয়াশ্রয়গত বৈশিষ্ট্য থাকায় ঔদার্য্যের প্রকাশ-ভেদ ভেদরাজ্যের অমঙ্গল আনয়ন করিবার পরিবর্ত্তে পরমকল্যাণময় কৃষ্ণাকর্ষণ প্রদর্শন করিতে গিয়া নিজ-সঙ্কর্ষণতা প্রদর্শন করেন এবং কৃষ্ণাকৃষ্ট হওয়ায়

অনুচিৎ এর একমাত্র নিজবৃত্তি জানাইয়া দেন। তখন জীব বলেন,—'আমি এই জড় নই, আমি সেই,'—কৃষ্ণাকৃষ্ট সঙ্কর্ষণ শক্তির পরমাণু জীবশক্তি—অচিৎ জড়শক্তির প্রকারভেদ নই। ইদংবস্তু তদ্‌বস্তুর সেবা-বঞ্চিত ব্যাপার বিশেষের ধারণা নহে, সুতরাং ইদংবস্তুতে যে 'আমার ভোগ্য-জ্ঞান' জড়ইন্দ্রিয়জ-জ্ঞানে আগত হইয়াছে, উহা জড়াবৃত হওয়ায় তাহাতে কৃষ্ণাকর্ষণের পরিচয় পাওয়া যাইতেছে না। সুতরাং 'আমি ইদং নই, আমি সেই বস্তুর শক্তি'। আমি সেই পূর্ণবস্তু যদি হইতাম, তাহা হইলে 'ইদং' জড়ের সহিত আমার সম্বন্ধ হইত না। সুতরাং আমি সেই চিৎ, 'ইদং' নই এবং এই 'ইদং' সেই বস্তুর পৃথক্‌কারিণী হইতে জাত হইয়া বিরুদ্ধশক্তি ধর্ম্মবিশেষ লাভ করিয়া আমাকে তাহার অন্তর্গত জানাইবার জন্য স্বতন্ত্র ইচ্ছা প্রকাশ করিয়া আমার নিত্য ইচ্ছাকে বাধা দিয়াছে, সুতরাং আমি এই পরিচ্ছিন্ন বহুভেদ-ভাবের অসুবিধার মধ্যে অবস্থান করা যুক্তিযুক্ত মনে করিতেছি না। যখন আমি—সেই চিৎ, ইহা নই, তখন আমার ইচ্ছাশক্তি জ্ঞেয়ানুভব আনন্দলাভে কেন বাধাপ্রাপ্ত হইবে? সুতরাং আমার এই জগৎ নহে, এই প্রাপঞ্চিক শরীর নহে, এই প্রাপঞ্চিক শরীরসহ চিদাভাস বৃত্তিতে যে মানসিক ইচ্ছা আমিত্বের সহিত বিরোধ করিতেছে। সেই বিরোধ হইতে মুক্ত হইবার জন্য আমি সেই চিদ্‌বস্তু এবং আমার চিদ্‌বস্তুর জন্য ইচ্ছা কখনই জ্ঞেয়ানুভবে প্রীতির অভাব নিরানন্দ উৎপাদন করিতে পারে না। তখনই আমি ইচ্ছাময়ের অনুকূল প্রকাশবিশেষ গুরুপাদপদ্ম হইতে নিত্যা ইচ্ছা-শক্তির পরিচালন-বিধি অবগত হইয়া তাঁহার সহিত এই শ্রুতিমন্ত্র কীর্ত্তন করিব—,

"যস্য দেবে পরা ভক্তির্যথা দেবে তথা গুরৌ।
তস্যৈতে কথিতা হ্যর্থাঃ প্রকাশন্তে মহাত্মনঃ॥"

তখনই তিনি বলিবেন,—

"হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলম্।"

—জগদ্‌গুরু শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর

শ্রীশ্রীদামোদরাষ্টক সম্বন্ধে দুই একটী কথা

অচিন্ত্যানন্তশক্তিমান্ শ্রীভগবান্ মাতা যশোদার দামবন্ধন স্বীকার করিয়া মাতার বিশুদ্ধবাৎসল্য প্রেমরসনির্য্যাস পূর্ণরূপে আস্বাদন করেন এবং জগতে নিজের ভক্তাধীনতার চরম পরিচয় প্রদান করেন। সেই পরম মনোহর শ্রীদামবন্ধনলীলা তিনি কার্ত্তিক শুক্লা প্রতিপদে প্রকটিত করেন। পরমধন্য কার্ত্তিক মাস দামোদর নামে প্রসিদ্ধি লাভ করিবার ইহাই প্রধান হেতু। বৈষ্ণবস্মৃতিশাস্ত্র শ্রীহরিভক্তিবিলাস-প্রণেতা আচার্য্যপাদ শ্রীগোপালভট্টগোস্বামী কার্ত্তিককৃত্য প্রসঙ্গে কার্ত্তিক মাসে প্রতিদিন শ্রীরাধা-দামোদরের পূজা এবং শ্রীদামোদরাষ্টক-নামক স্তোত্র পাঠের বিধি-নির্দ্দেশ করিয়া বলিয়াছেন,—

রাধিকাং প্রতিমাং বিপ্রাঃ পূজয়েৎ কার্ত্তিকে তু যঃ।
তস্য তুষ্যতি তৎপ্রীত্যৈ শ্রীমান্ দামোদরো হরিরিতি॥

দামোদরাষ্টকং নাম স্তোত্রং দামোদরার্চ্চনম্।
নিত্যং দামোদরাকর্ষি পঠেৎ সত্যব্রতোদিতম্॥

(হঃ ভঃ বিঃ ১৬।৯৫-৯৬)

যিনি কার্ত্তিক মাসে শ্রীরাধিকার প্রীত্যর্থে তাঁহার পূজা বিধান করেন, শ্রীমান্ দামোদর হরি তাঁহার প্রতি প্রসন্ন হন। শ্রীদামোদরাষ্টক স্তোত্র পদ্মপুরাণে শ্রীনারদ-শৌনকাদি সম্বাদে শ্রীসত্যব্রত-মুনিকর্ত্তৃক কথিত হইয়াছে। আচার্য্যপাদ বলিয়াছেন যে, এই স্তোত্র নিত্যসিদ্ধ, ইহা শ্রীসত্যব্রতমুনি হইতে প্রকটিত হইয়াছেন এবং ইহা শ্রীদামোদর কৃষ্ণকেও আকর্ষণ করিতে সমর্থ। তিনি স্বানুভূতিপূর্ণ ব্যাখ্যায় এই স্তোত্রের দামোদরাকর্ষিত্ব প্রকৃষ্টরূপে পরিস্ফুট করিয়াছেন। আমরা সম্পূর্ণ অযোগ্য হইলেও তাঁহার চরণ স্মরণ করিয়া তাঁহার সেই অমৃতময়ী ব্যাখ্যার তাৎপর্য্যানুসারে সংক্ষিপ্ত বঙ্গানুবাদ সহ স্তোত্রটী প্রকাশ করিতে যথাশক্তি চেষ্টা করিতেছি।

শ্রীদামোদরাষ্টক স্তোত্র ভগবান্ শ্রীদামোদরের বশীকরণ-মন্ত্রস্বরূপ। ইহা পাঠ করিলে শ্রীদামোদর হরি তুষ্ট ও বশীভূত হন, সুতরাং ইহা বৈষ্ণব মাত্রেরই নিত্য পাঠ্য। আমরা সর্ব্ব-সাধারণের সুবিধার জন্য সানুবাদ সেই স্তোত্রটী পরপৃষ্ঠায় মুদ্রিত করিয়া এই পুণ্য ঊর্জ্জব্রতকালে প্রত্যহ সকালে পাঠ ও কীর্ত্তনের জন্য এই শুভ কার্ত্তিক মাসে তাঁহাদের সমক্ষে উপস্থিত করিতেছি। শ্রীদামোদর হরির তুষ্টিবিধান এবং তদীয়জনগণের কৃপাকণালাভই আমাদের একমাত্র লালসা।

শ্রীশ্রীদামোদরাষ্টকম্

(১)

নমামীশ্বরং সচ্চিদানন্দরূপং
লসৎ-কুণ্ডলং গোকুলে ভ্রাজমানম্।
যশোদা-ভিয়োলুখলাদ্ধাবমানং
পরামৃষ্টমত্যং ততোদ্রুত্য গোপ্যা ॥

(২)

রুদন্তং মুহুর্নেত্র-যুগ্মং মৃজন্তং
করাম্ভোজ-যুগ্মেন সাতঙ্ক-নেত্রম্।
মুহুঃ শ্বাসকম্প-ত্রিরেখাঙ্ক-কণ্ঠ-
স্থিতগ্রৈব-দামোদরং ভক্তিবদ্ধম্ ॥

(৩)

ইতীদৃক্ স্ব-লীলাভিরানন্দ-কুণ্ডে
স্ব-ঘোষং নিমজ্জন্তমাখ্যাপয়ন্তম্।
তদীয়েশিতজ্ঞেষু ভক্তৈর্জ্জিতত্বং
পুনঃ প্রেমতস্তং শতাবৃত্তি বন্দে ॥

(৪)

বরং দেব! মোক্ষং ন মোক্ষাবধিং বা
ন চান্যং বৃণেঽহং বরেশাদপীহ।
ইদন্তে বপুর্নাথ! গোপাল-বালং
সদা মে মনস্যাবিরাস্তাং কিমন্যৈঃ ॥

(৫)

ইদন্তে মুখাম্ভোজমব্যক্ত-নীলৈ-
র্বৃতং কুন্তলৈঃ স্নিগ্ধ-রক্তৈশ্চ গোপ্যা।
মুহুশ্চুম্বিতং বিম্ব-রক্তাধরং মে
মনস্যাবিরাস্তামলং লক্ষ-লাভৈঃ ॥

(৬)

নমো দেব! দামোদরানন্ত! বিষ্ণো!
প্রসীদ প্রভো! দুঃখ-জালাব্ধি-মগ্নম্।
কৃপাদৃষ্টি-বৃষ্ট্যাতিদীনং বতানু-
গৃহাণেশ! মামজ্ঞমেধ্যক্ষি-দৃশ্যঃ ॥

(৭)

কুবেরাত্মজৌ বদ্ধ-মূর্ত্ত্যৈব যদ্বৎ
ত্বয়া মোচিতৌ ভক্তি-ভাজৌ কৃতৌ চ।
তথা প্রেম-ভক্তিং স্বকাং মে প্রযচ্ছ
ন মোক্ষে গ্রহো মেঽস্তি দামোদরেহ ॥

(৮)

নমস্তেঽস্তু দাম্নে স্ফুরদ্দীপ্তি-ধাম্নে
তদীয়োদরায়াথ বিশ্বস্য ধাম্নে।
নমো রাধিকায়ৈ ত্বদীয়-প্রিয়ায়ৈ
নমোঽনন্ত-লীলায় দেবায় তুভ্যম্ ॥

শ্রীশ্রীদামোদরাষ্টকের বঙ্গানুবাদ

যাঁহার কর্ণে কুণ্ডল দোদুল্যমান, যিনি গোকুলে দীপ্তিমান্, যিনি নবনীত অপহরণ করিয়া মা যশোদার ভয়ে উদূখল হইতে লম্ফ প্রদানপূর্ব্বক ধাবমান, যশোদা অতিশয় বেগে পশ্চাদ্ধাবন করিয়া যাঁহার পৃষ্ঠদেশ ধারণ করিয়াছেন, সেই সচ্চিদানন্দরূপ পরমেশ্বর শ্রীদামোদরের চরণে প্রণত হইতেছি ॥ ১ ॥

মাতৃদেবীকর্ত্তৃক প্রহৃত হইবার আশঙ্কায় যিনি ক্রন্দন করিতে করিতে

করকমলদ্বয়দ্বারা চক্ষুর্দ্বয় পুনঃ পুনঃ মার্জ্জনা করিতেছেন, যাঁহার নেত্রদ্বয় সাতঙ্কদৃষ্টিযুক্ত, মুহুর্মুহু শ্বাস ও কম্প নিবন্ধন যাঁহার মুক্তাময় কণ্ঠহার দোদুল্যমান হইতেছে, এবং যশোদাকর্ত্তৃক যাঁহার উদর রজ্জুদ্বারা আবদ্ধ, আমি সেই ভক্তিবদ্ধ শ্রীদামোদরের পাদপদ্ম বন্দনা করিতেছি ॥ ২ ॥

এই প্রকার বাল্যলীলাসমূহদ্বারা যিনি গোকুলবাসিগণকে আনন্দকুণ্ডে ভাসমান রাখিয়াছেন, "শিথিলৈশ্বর্য্য প্রেমিক ভক্তগণকর্ত্তৃক আমি জিত হইয়াছি," এই উক্তি যিনি ঐশ্বর্য্যপর ভক্তগণের নিকট প্রকাশ করিতেছেন, আমি প্রেমভরে পুনরায় সেই পরমেশ্বর শ্রীদামোদরের পাদপদ্মে শত শত বন্দনা জ্ঞাপন করিতেছি ॥ ৩ ॥

হে মাধুর্য্যলীলাপর দেব ! আপনি সর্ব্বপ্রকার বরপ্রদানে সমর্থ হইলেও আমি আপনার নিকট চতুর্থবর্গ মোক্ষ, মোক্ষের অবধি ঘনসুখ-বিশেষাত্মক শ্রীবৈকুণ্ঠলোক অথবা অন্য কোন বর প্রার্থনা করি না। হে নাথ ! আমার হৃদয়ে যেন আপনার বালগোপাল-বিগ্রহ নিত্য প্রকাশিত থাকেন। এতদ্ব্যতীত অন্য কোনও বরে আমার আবশ্যক নাই ॥ ৪ ॥

হে দেব ! আপনার যে বদনকমল অব্যক্তনীল ও স্নিগ্ধরক্তবর্ণ কুন্তলসমূহদ্বারা বেষ্টিত এবং মা যশোদার মুখপদ্মস্থ লোহিতবর্ণ বিম্বোষ্ঠের পুনঃ পুনঃ চুম্বন প্রাপ্ত, আপনার সেই মুখাম্বুজ আমার হৃদয়ে প্রকাশিত থাকুন। অপর লক্ষ লক্ষ লাভেও আমার প্রয়োজন নাই ॥ ৫ ॥

হে দেব ! হে দামোদর ! হে অনন্ত ! হে বিষ্ণো ! হে প্রভো ! আপনার পাদপদ্মে আমি প্রণত হইতেছি। আপনার সেবাবিমুখতারূপ দুঃখ-পরম্পরা-সমুদ্রে নিমগ্ন আমার প্রতি প্রসন্ন হউন। আপনি কৃপাদৃষ্টি বর্ষণপূর্ব্বক আমাকে উক্ত দুঃখ হইতে উদ্ধার করুন, আমার দর্শনপথে উদিত হউন ॥ ৬ ॥

হে দামোদর ! আপনি যে প্রকার উদূখলে প্রেমরজ্জুবদ্ধ হইয়া নলকুবর ও মণিগ্রীব নামক কুবের-তনয়দ্বয়কে মুক্তি ও ভক্তির পাত্র করিয়াছিলেন, আমাকেও সেইপ্রকার প্রেমভক্তি প্রদান করুন। (কুবেরাত্মজদ্বয়ের ন্যায়) মোক্ষে আমার আগ্রহ নাই। (আপনার প্রকৃষ্ট-আনন্দ-বিধানরূপ প্রেমভক্তিরই প্রার্থী আমি) ॥ ৭ ॥

হে দামোদর ! বিশ্বের এবং নিখিল তেজেরও (ব্রহ্মেরও) আশ্রয়স্বরূপ আপনার উদরের বন্ধন-দামকে আমি নমস্কার করি। আপনার প্রিয়তমা শ্রীরাধিকার পাদপদ্মে প্রণত হইতেছি। হে অনন্তলীল ! হে দেব ! আপনার পাদপদ্মে নমস্কার ॥ ৮ ॥

—জগদ্গুরু শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী

ত্যাগী শুদ্ধভক্তের ভিক্ষাবৃত্তি

আমাদের সাধারণের বিচারে ভিক্ষাবৃত্তির মত হেয়বৃত্তি জগতে আর নাই। ভিক্ষাবৃত্তিতে আর কুক্কুর-বৃত্তিতে কোনও পার্থক্য নাই। ভিক্ষাবৃত্তি লোককে হীন করে, অলস করে, পরমুখাপেক্ষী করে ও স্বাধীনতার অমূল্য রত্নকে হরণ করে। কিন্তু আমাদের আচার্য্যগণের বিচার লোকবিচারের সম্পূর্ণ বিপরীত। তাঁহারা বলেন,—ভিক্ষাবৃত্তিই সাত্ত্বিক বৃত্তি। ব্রাহ্মণ উঞ্ছবৃত্তিদ্বারা জীবিকা-নির্ব্বাহ করিবেন। ব্রহ্মচারী গুরুগৃহে বাস করিয়া বেদাধ্যয়ন ও ভিক্ষাদ্বারা গুরুসেবা করিবেন। সন্ন্যাসী ভিক্ষান্ন গ্রহণ করিবেন। বাণপ্রস্থ সম্বন্ধেও সেই ব্যবস্থা। আর গৃহস্থগণ উক্ত তিন আশ্রমকে ভিক্ষাদান করিয়া সুকৃতি অর্জ্জন করিবেন।

শুদ্ধবৈষ্ণবগণ 'তপোবেশোপজীবী' নহেন। তাঁহাদের গুরু-কৃষ্ণসেবা ব্যতীত অন্য কৃত্য নাই। তাঁহাদের জীবন ভোগপর নহে, কেবল সেবাময়; তাঁহারা জগতের লোকের নিত্য মঙ্গল সাধনে সতত ব্যস্ত।

"মহান্তের স্বভাব এই তারিতে পামর।
নিজ কার্য্য নাহি তবু যান তার ঘর॥"

আমি অত্যন্ত ভোগী—কৃষ্ণের বিষয়কে আমি নিজের ভোগে নিযুক্ত করিয়াছি। একমাত্র ভোক্তা কৃষ্ণকে দূরে ফেলিয়া দিয়া আমি তাহার স্থল অধিকার করিতে চেষ্টা করিতেছি। স্থিরচিত্তে ভাবিয়া দেখিলে আমরা কি চোর নহি? আমরা ভগবানের দ্রব্য অপহরণ করিয়াছি বলিয়া এই সংসার-কারাগারে কতই ত্রিতাপ যন্ত্রণায় দিবানিশি দগ্ধ হইতেছি। শ্রুতি বলেন,—

ঈশাবাস্যমিদং সর্ব্বং যৎকিঞ্চ জগত্যাং জগৎ।
তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথা মা গৃধঃ কস্যস্বিদ্ধনম্॥

পরমেশ্বরই বিশ্বের অধিপতি। তাঁহার দ্বারাই বিশ্ব ব্যাপ্ত রহিয়াছে। তাঁহার উচ্ছিষ্টই গ্রহণ কর। অপর বস্তুতে আকাঙ্ক্ষা করিও না। আবার শ্রীগীতা বলিতেছেন,—

তৈর্দত্তানপ্রদায়ৈভ্যো যো ভুঙ্‌তে স্তেন এব সঃ। (গীঃ ৩.১২)
যজ্ঞশিষ্টাশিনঃ সন্তো মুচ্যন্তে সর্ব্বকিল্বিষৈঃ।
ভুঞ্জতে তে ত্বঘং পাপা যে পচন্ত্যাত্মকারণাৎ॥ (গীঃ ৩।১৩)

অন্নাদি যিনি দেবতাদিগকে প্রদান না করিয়া ভোগ করেন তিনি চৌর-স্বরূপ দোষভাক্ হইয়া থাকেন।

যজ্ঞাবশিষ্ট অন্নাদি যাঁহারা গ্রহণ করেন, তাঁহারা উত্তম জন্ত অপরিহার্য্য সমস্ত পাপ হইতে মুক্ত হন। যাহারা কেবল স্বার্থপর হইয়া অন্নাদি ভোগ করে, সেই পাপীসকল সমস্ত পাপ ভোগ করে।

আমরা পাপ ভোজনে রত, চৌর্য্য অপরাধে অপরাধী, শুদ্ধবৈষ্ণব আমাদের ন্যায় দুরাচারকে উদ্ধার করিবার জন্য আমাদের দুঃখে কাতর হইয়া কত কটূক্তি সহ্য করিয়াও আমাদের মঙ্গলসাধনের জন্য আমাদের দ্বারে দণ্ডায়মান। কিন্তু জড়ীয় জ্ঞানে অন্ধ আমি দেখি, শুদ্ধবৈষ্ণব আমার মত একটী মানুষ—আমার মত অভাব আছে—আমার নিকট হইতে তাঁহার কিছু অভাব পূরণ করিয়া নিতে আমার দ্বারে উপস্থিত! কিন্তু বৈষ্ণবের কোনও কালে কোন অভাব নাই, কারণ তিনি সর্ব্বদা স্বভাবে অবস্থিত—তিনি বৈকুণ্ঠবস্তু, তাঁহাতে কুণ্ঠাধর্ম্ম থাকিতে পারে না। ষড়ৈশ্বর্য্যপূর্ণ ভগবান্ যাঁহার হৃদয়ে নিত্যকাল বিশ্রাম লাভ করিতেছেন, তাঁহার কি আর সামান্য ক্ষুধা-তৃষ্ণার জন্য অভাব থাকিতে পারে? তাঁহার ক্ষুধা-তৃষ্ণা স্বীকার ও দ্বারে দ্বারে আগমন কেবল আমার ন্যায় পামরকে উদ্ধার করিবার জন্য। সাক্ষাৎ ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীগৌরহরি নিত্যানন্দ প্রভুসহ দ্বারে দ্বারে যাইয়া হরিনাম-প্রচার ও ভিক্ষান্ন গ্রহণ করিতেন—

'একদিন শুক্লাম্বর ব্রহ্মচারী-স্থানে।
কৃপায় তাহার অন্ন মাগিল আপনে॥' (শ্রীচৈতন্যভাগবত মধ্য)
'দেখ না শূদ্রার পুত্র বিদুরের স্থানে।
অন্ন মাগি খাইলেন ভক্তির কারণে॥' (শ্রীচৈতন্যভাগবত মধ্য)

শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভু—

হেন জাতি নাহি না খাইলা কার ঘরে। (শ্রীচৈতন্যভাগবত মধ্য)

শ্রীগৌরসুন্দর—

'মণ্ডপের ঘরে কৈলা স্নান ও ভোজন॥ (শ্রীচৈতন্যভাগবত মধ্য)

শুদ্ধ বৈষ্ণবের কোন অভাব নাই। তবে—

'যত দেখ বৈষ্ণবের ব্যবহার-দুঃখ।
নিশ্চয় জানিহ সেই পরানন্দ সুখ॥'

কিন্তু—

'বিষয়মদান্ধ সব কিছুই না জানে।
জাতি-বিদ্যা-ধনমদে বৈষ্ণব না চিনে॥'

শুদ্ধবৈষ্ণব গুরু-কৃষ্ণদাস। তিনি যুক্তবৈরাগ্য আশ্রয় করিয়া জীবের মঙ্গলার্থে এ জগতে বিচরণ করেন। তিনি গুরু-কৃষ্ণের অবশেষ মাত্র গ্রহণ করিয়া থাকেন—

'তব নিজ জন　　　প্রসাদ সেবিয়া
উচ্ছিষ্ট রাখিবে যাহা।
আমার ভোজন　　　পরম আনন্দে
প্রতিদিন হবে তাহা॥'

ইহাই শুদ্ধবৈষ্ণবের প্রাণের উক্তি। তাঁহার জিহ্বার লালসা নাই—উদরবেগ নাই।

'জিহ্বার লালসে যেই ইতি উতি ধায়।
শিশ্নোদরপরায়ণ কৃষ্ণ নাহি পায়॥' (চৈঃ চঃ অঃ)

শুদ্ধবৈষ্ণব যদি কৃপা করিয়া আমাদের নিকট হইতে কিছু গ্রহণ করেন, তবে আমরা অনেক সময় মনে করি যে, আমরা তাঁহাকে আমাদের অধিকৃত কোনও বস্তু দিয়া বৈষ্ণবের কিছু উপকার করিয়া দিলাম; বাস্তবিক তাহা নহে। ধন ধনীর নয়, সেই একমাত্র বিশ্বসম্রাটের সমস্ত ধন; আমাদের এক-গাছা তৃণ সৃষ্টি বা বিনাশ করিবার ক্ষমতা নাই। অতএব আমি ধনের মালিক নহি, ভোক্তাও নহি। তোমার আমার বৈষ্ণবের উপকার করিয়া দেওয়ার কিছুই ক্ষমতা নাই। তুমি নিজে উপকৃত হইলে মাত্র। তুমি নিজকে কৃতার্থ মনে কর যে, যাঁহার জিনিষ তাঁহার ভোগে দিতে পারিলে। বৈষ্ণব গাহিয়াছেন, 'তোমার কনক, ভোগের জনক, কনকের দ্বারে সেবহ মাধব।' তুমি আমি বলিতে পারি যে, আমরা কি নিজে নিজে ভগবানের সেবার জিনিষ লাগাইতে পারি না যে, আবার বৈষ্ণবের হাত দিয়া দিতে হইবে? তদুত্তরে শাস্ত্র বলিতেছেন,—ভগবান্ শুদ্ধভক্ত ব্যতীত অপরের হস্তে দ্রব্য গ্রহণ করেন না—

পত্রং পুষ্পং ফলং তোয়ং যো মে ভক্ত্যা প্রযচ্ছতি।
তদহং ভক্ত্যুপহৃতমশ্নামি প্রযতাত্মনঃ॥ (গীতা ৯।২৬)

ভাড়াটিয়া জ্ঞানী, কর্ম্মী বা মিছাভক্তের নিবেদিত দ্রব্য কৃষ্ণ স্বীকার করেন না; কারণ তাহারা সেবাপরাধী। এ বিষয় একটু অনুধাবন করিলেই বুঝিতে পারা যায়। ভাড়াটিয়া অর্থের দাস, ভগবানের দাস বলিয়া মুখে স্বীকার করে মাত্র; তাহার অনুরাগ নাই, ভক্তির লেশমাত্রও নাই। সে বেতনভোগী, অর্থ দিলে বাহ্যে হরিসেবার অনুষ্ঠান দেখাইবে; বেতন বা অর্থ বন্ধ করিলে অনুষ্ঠানও বন্ধ করিয়া দিতে কুণ্ঠিত হইবে না। ভাড়াটিয়া অর্থের লোভে

ভগবানের কলেবর ভাগবত পাঠনামে বিক্রয় করিয়া থাকে, বিগ্রহ দেখাইয়া ভেট নেয়, দ্রবিণ বা অর্থ লইয়া কাণে ফুঁ দেয়, বেতন লইয়া পূজারীর কাজ স্বীকার করে। অতএব ভাড়াটিয়া কনক, কামিনী ও প্রতিষ্ঠার সেবক। সুতরাং ভগবানের সেবক হইবে কি-প্রকারে? জ্ঞানী—মোক্ষকামী, নিজকেই ব্রহ্ম বলিয়া ধারণা করে, সুতরাং তাহার সেবাবৃত্তি থাকিতে পারে না। সে মোক্ষকামী হইয়া সময় সময় মিছাভক্তির আবাহন করিয়া থাকে। প্রাকৃত লোকে তাহাদের এই মিছাভক্তিকেই সেবা বলিয়া ধারণা করে। তাহার ভক্তির আবাহন কৈতব বা কপটতাপূর্ণ। কিন্তু তাহাদের সেবা করা দূরে থাকুক, তাহারা নিজে সেব্য হইয়া ভগবানকে দিয়া সেবা করিয়া লইতে প্রস্তুত। মোক্ষকামী বাহিরে কোনও কাম যাচ্ঞা না করিয়াও সর্ব্বাপেক্ষা অধিক কামকামী। সে ভগবানের নিকট স্বর্গসুখ, ধন, জন প্রভৃতি অকিঞ্চিৎকর দ্রব্য কামনা করে না সত্য, কিন্তু সে একেবারেই ভগবানের আসন গ্রহণ করিতে চায়। বোকা ভৃত্যই মনিবের নিকট হইতে জল খাবার পয়সা, কাপড়টা, জামাটা প্রভৃতি অকিঞ্চিৎকর ভোগ্য জিনিস চাহিয়া মনিবকে বিরক্ত করিয়া থাকে; কিন্তু যে ভৃত্য মনে ভাবে সে চতুর, সে বলে, যদি একেবারে মনিব হইয়া যাইতে পারি তবে আমার আর কিছুরই অভাব থাকিবে না; সমস্তই আমার করায়ত্ত হইবে, আমি সতত আনন্দে মগ্ন থাকিব। আর প্রভুভক্ত ভৃত্য মনে করে, আমার সুখ হউক, দুঃখ হউক, তাহাতে ক্ষতি নাই, আমি যেন নিত্যকাল আমার মনিবের সেবা করিয়া আমার প্রভুর একমাত্র সুখ উৎপাদন করিতে পারি। শেষোক্ত ভাবটিই সেবকের ভাব। শুদ্ধভক্তের ভাব সম্পূর্ণ কৈতববিরহিত অহৈতুকী সেবা। অতএব মুক্তিকামীর নিবেদিত দ্রব্য ভগবান্ গ্রহণ করেন না।

শ্রীমন্মহাপ্রভু—

মদ্যপের ঘরে কৈলা স্নান ভোজন।
নিন্দুক বেদান্তী বা পাইল দরশন॥ (চৈঃ ভাঃ)
ধিক্ তার কৃষ্ণসেবা শ্রবণ-কীর্ত্তন।
কৃষ্ণ অঙ্গে বজ্র হানে তাহার স্তবন॥ (শরণাগতি)

তাহার ভক্তিচেষ্টা ভগবৎপ্রীতির জন্য নহে। কেবল স্বার্থসিদ্ধি বা নিজ মুক্তির জন্য। তাহার দ্রব্য ভগবান্ গ্রহণ করেন না, কারণ তাহার ভক্তিতে কপটতা বা অবান্তর উদ্দেশ্য আছে।

যে কর্ম্মে ভুক্তি বা স্বর্গসুখাদি কামনা বিদ্যমান, সেখানেও ভগবৎসেবা

হইতে পারে না। নিষ্কাম কর্ম্মও যদি অচ্যুতভাববর্জ্জিত হয়, তাহাও কর্ম্মের শৃঙ্খল। শ্রীভাগবত বলিতেছেন,—

নেহ যৎ কর্ম্ম ধর্ম্মায় ন বিরাগায় কল্পতে।
ন তীর্থপাদসেবায়ৈ জীবন্নপি মৃতো হি সঃ॥
নৈষ্কর্ম্ম্যমপচ্যুতভাববর্জ্জিতং ন শোভতে।

যে কর্ম্ম ধর্ম্মের উদ্দেশ্যে সম্পাদিত না হয়, যে ধর্ম্মে বিরাগ না জন্মে এবং যে বিরাগে তীর্থপাদ ভগবানের প্রীতি বা সেবা উদ্দিষ্ট না থাকে, তাহা বৃথা। এইজন্যই গীতা প্রভৃতি ভগবচ্ছাস্ত্রে কায়িক, বাচিক, মানসিক সমস্ত কর্ম্মই ভগবানে অর্পণের ব্যবস্থা আছে। হরিসেবানুকূল কর্ম্মই ভক্তি। ভগবান্ একমাত্র শুদ্ধভক্তের দ্রব্যই স্বীকার করেন। শুদ্ধভক্তির লক্ষণ শাস্ত্রে এইরূপ বর্ণিত আছে,—

শুদ্ধভক্তি হৈতে হয় প্রেমের উৎপন্ন।
অতএব শুদ্ধভক্তির কহিয়ে লক্ষণ॥
অন্যবাঞ্ছা অন্যপূজা ছাড়ি' জ্ঞানকর্ম্ম।
আনুকূল্যে সর্ব্বেন্দ্রিয়ে কৃষ্ণানুশীলন॥
"সর্ব্বোপাধিবিনির্ম্মুক্তং তৎপরত্বেন নির্ম্মলম্।
হৃষীকেশ হৃষীকেশসেবনং ভক্তিরুচ্যতে॥
ভুক্তিমুক্তিস্পৃহা যাবৎ পিশাচী হৃদি বর্ত্ততে।
তাবদ্ভক্তিসুখস্যাত্র কথমভ্যুদয়ো ভবেৎ॥"

(শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, মধ্য, ১৯শ)

ভুক্তি-মুক্তিস্পৃহা পিশাচী-সদৃশ। ভগবৎসেবার এরূপ প্রতিবন্ধক আর নাই। শুদ্ধভক্তিতে এরূপ মুক্তিস্পৃহার গন্ধও নাই। শুদ্ধবৈষ্ণবের ভিক্ষাবৃত্তি কেবল জীবের প্রতি দয়ার জন্য।

তিনি প্রতিদ্বারে গিয়া বলেন,—'প্রভুর কৃপায় ভাই মাগি এই ভিক্ষা। বল কৃষ্ণ, ভজ কৃষ্ণ, কর কৃষ্ণ শিক্ষা॥' এই কৃষ্ণশিক্ষা জীবকে ভোগের ক্লেশ হইতে মুক্ত করে; তিনি কৃষ্ণ ও তদ্ভক্তগণের উদ্দেশে দ্রব্যাদি অর্থ গ্রহণ করিয়া নিজে ভোগ না করিয়া অন্যের ন্যায় বৃত্তিজীবী মাত্র হন না। নির্ব্বোধ লোক তাঁহার মাধুকরীবৃত্তিকে ভক্তির অনুষ্ঠানবিশেষ বুঝিতে সমর্থ হয় না।

আধুনিক একদল লোকের অভিমত এই যে, ভিক্ষাদ্বারা সংগৃহীত অর্থ যদি দরিদ্রসেবায় বা দেশ ও দশের শারীরিক বা মানসিক অভাবমোচনকল্পে নিযুক্ত হয়, তবেই ভিক্ষা দেওয়া-নেওয়ার সার্থকতা। নতুবা ভিক্ষা গৃহস্থের

উপর করস্বরূপ মাত্র। প্রথম মুখে কথাটা বড়ই ঠিক বোধ হয়। আচ্ছা জিজ্ঞাসা করি, দরিদ্রসেবা বা দেশ ও দশের সেবা তুমি আমি কতটা কতক্ষণের জন্য করিতে পারি ? কোন ধনবান্ ব্যক্তি হয়ত' দশসহস্র দরিদ্রকে একমাস ধরিয়া অন্নদান করিলেন। তাহাতেই বা তাহাদের অভাব মোচন হইল কৈ ? তাহার অন্নের অভাব মোচন করিলে ত' বস্ত্রের অভাব রহিল। অন্নবস্ত্রের অভাব দূর করিলে ত' শারীরিক ব্যাধি হইল। শারীরিক ব্যাধির উপশম করিলে ত' মানসিক অশান্তি, শোক, দুঃখ, ভয়, মৃত্যু কতই না নিত্য নূতন নূতন অভাব একটীর পর আর একটী উপস্থিত হইতে লাগিল। এইজন্য যাঁহারা দূরদর্শী নিত্যানিত্যবিবেকী তাঁহারা বলিলেন,—তুমি জীবের অভাব এমন-ভাবে মোচনে প্রবৃত্ত হও যেন তাহার আর কোনও দিন দ্বিতীয় অভাব উপস্থিত না হয়। তাহাকে স্বভাবে প্রতিষ্ঠিত কর। জীব ভগবানের নিত্যদাস, সে তাহা ভুলিয়া নিজকে মায়ার দাস অভিমান করিতেছে, এইজন্যই তাহার অভাব—

তাবদ্ভয়ং দ্রবিণদেহসুহৃন্নিমিত্তং
শোকঃ স্পৃহাপরিভবো বিপুলশ্চ লোভঃ।
তাবন্মমেত্যসদবগ্রহ-আর্ত্তিমূলং
যাবন্ন তেঽঙ্ঘ্রিমভয়ং প্রবৃণীত লোকঃ॥ (ভাঃ ৩।৯।৬)

এই কথা তাহাকে পুনঃ পুনঃ জানাইতে জানাইতে তাহার সুপ্তচেতনবৃত্তিকে জাগাইয়া দাও। তাহাতে কীর্ত্তনকারী ও শ্রবণকারী উভয়েরই কল্যাণ হইবে। কীর্ত্তন করিতে করিতে তোমার প্রবুদ্ধ আত্মাও জাগ্রত হইবে, অপর জীবও জাগরিত হইবেন।

সুতরাং শুদ্ধবৈষ্ণব ভিক্ষাদ্বারা রিলিফ্ ওয়ার্ক বা সেবাশ্রম খুলিয়া চাক্ষুষ কোনও সাময়িক মঙ্গল দেখাইয়া দেহাসক্ত বহির্ম্মুখ জগতের নিকট হইতে প্রতিষ্ঠা অর্জ্জন করিবার প্রয়াস পান না। জগতের মহত্তম ব্যক্তিগণ চিরদিনই জীবের নিত্যমঙ্গলের জন্য চেষ্টা করিয়াছেন, করিতেছেন ও করিবেন।

—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত বামন মহারাজ

কমিউনিজম্ ও বৈদিক সাম্যবাদ

আজকালকার অধিকাংশ মানুষের খাওয়া, পরা ও বাঁচাটাই জীবনের প্রধান উদ্দেশ্য হইয়া দাঁড়াইয়াছে। অন্ন, বস্ত্র ও বাসস্থানের সমস্যার কিছুটা সমাধান হইলেই তাঁহারা হাতে যেন "স্বর্গের চাঁদ" পাইয়া যান। মানুষের প্রকৃত অভাব অন্ন-বস্ত্রাদির নয়, তাহা সুখ-শান্তি ও আনন্দের। ভগবদ্বিমুখ জড় জগৎ অত্যন্ত দুঃখময়, তাই এই জগতের নিরানন্দময় পরিবেশে কখনও আনন্দ লাভ করা সম্ভবপর নয়। অনেকে বলিতে পারেন,—"অন্ন-বস্ত্রাদির অভাব মিটিলেই মানুষ শান্তি ও আনন্দ লাভ করিতে পারে। কারণ অন্ন-বস্ত্রাদির অভাবের জন্যই ত' মানুষের যত দুঃখ ও অশান্তি। যেমন কেরোসিন, পেট্রোল বা ডিজেলের অভাবে গাড়ী চলিতে পারে না, তেমনই অন্ন-বস্ত্রাদির অভাবে মানুষের জীবনে শান্তি ও আনন্দ আসিতে পারে না।" প্রকৃতপক্ষে অজ্ঞ ব্যক্তিরাই এইরূপ নিরর্থক কষ্টকল্পনা করিয়া থাকেন। প্রকৃত বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি কখনও "ভীমরুলের চাকে মধু অন্বেষণ" করিতে গিয়া নিজের মূর্খামির পরিচয় প্রদান করেন না। অন্ন-বস্ত্রাদির অভাবপূরণে যদি প্রকৃত শান্তি ও আনন্দলাভ হইত, তাহা হইলে পাশ্চাত্যের ধনী দেশগুলিতে ত' আনন্দের জোয়ার বহিয়া যাইত। কিন্তু তাহা না হইয়া সেই দেশগুলির লোকদের মানসিক অশান্তিতে ভুগিতে হইতেছে কেন? খুন, আত্মহত্যার পরিমাণ ঐ দেশগুলিতে অধিক হইবার কারণ কি?

একটী বিশেষ বস্তুর অভাবের জন্যই বাস্তবিকপক্ষে মানুষ শান্তি ও আনন্দ লাভ করিতে পারিতেছে না। সেই বিশেষ বস্তু সম্বন্ধে জড় বিজ্ঞান বা কৃষ্ণ বহির্মুখজনের কোন ধারণা নাই। কেবলমাত্র সনাতন শাস্ত্র বেদই সেই বিশেষ বস্তুর সন্ধান ও পরিচয় দিয়া আমাদিগকে আনন্দসমুদ্রে অবগাহন করিবার সুযোগ করিয়া দিয়াছেন। বিশেষ বস্তুটি হইতেছে—ভগবৎ-সেবা, তাহাতেই সমস্ত আনন্দ লুক্কায়িত—আলোচনায় বিষয়টি পরিষ্কার হইয়া যাইবে।

এই বিশ্ব-চরাচরে যা কিছু আছে, তা সবই পরমেশ্বর ভগবানের সম্পদ এবং তাঁহার নিয়ন্ত্রণাধীন। আমাদের জীবনধারণের জন্য তিনি যেইটুকু বরাদ্দ করিয়া দিয়াছেন, সেইটুকুই গ্রহণ করা উচিত। বরাদ্দের অতিরিক্ত কিছুর আকাঙ্ক্ষা করা উচিত নয়। মূর্খ এবং তথাকথিত সভ্য মানুষেরা ভগবানের

সম্পত্তির উপর "খোদার উপর খোদগিরির" ন্যায় আধিপত্য বিস্তার করিতে গিয়া অন্ন-বস্ত্রাদির কৃত্রিম অভাব সৃষ্টি করিতেছে। অথচ এই অভাব সৃষ্টির জন্য তাঁহারা ভগবানের উপর সমস্ত দোষ আরোপ করিয়া জগতে নিজেদের 'মহান' প্রতিপন্ন করিতে গিয়া 'শাক দিয়ে মাছ ঢাকার' ন্যায় নিজেদের দোষ-গুলি চাপা দেওয়ার চেষ্টা করেন। কিন্তু ভগবানের বহিরঙ্গা শক্তি জড়া-প্রকৃতি "ব্যক্তিগত বা সমষ্টিগতভাবে ভগবানের সম্পত্তি আত্মসাৎকারীদের" কঠোর শাস্তি প্রদান করিয়া থাকেন। যেমন আইনের মাধ্যমে রাজ্যের শান্তি ও শৃঙ্খলা বজায় রাখা হয়, তেমনই ভগবান্ জড়া-প্রকৃতির মাধ্যমে এই সমগ্র বিশ্ব নিয়ন্ত্রণ করেন। ভগবদ্বিমুখ তথা ভগবদ্‌বিহীন সমাজে কাহারও শান্তিলাভের সম্ভাবনা নাই। ভগবানের প্রতি বিশ্বাস না করিয়া একে অপরের উপর বৃথা আধিপত্যের চেষ্টাই জগতে অশান্তি ও পরস্পরের মধ্যে বিভেদের সৃষ্টি করিয়াছে। জীব যতই ভগবদ্বিমুখ হয়, মহামায়া তথা জড়াপ্রকৃতি ততই তাহাদিগকে কারাগারের মধ্যে আবদ্ধ করিয়া কঠোর শাস্তি প্রদান করেন। ভগবানকে না মানিয়া মানুষ যতই বিরুদ্ধাচরণ করে, প্রকৃতির নিয়মে তাঁহাদের দুঃখ-দুর্দ্দশাও ততই বাড়িতে থাকে—তাহার হাজার হাজার প্রমাণ আজ আমরা চোখের সামনে দেখিতে পাইতেছি। মানুষের ভগবদ্বৈমুখ্যতার জন্যই আজ পৃথিবীর সর্ব্বত্র অশান্তির আর্ত্তনাদ শুনা যাইতেছে।

কেবলমাত্র অন্ন ও বস্ত্রাদির সংস্থান করাই মানব জীবনের উদ্দেশ্য নহে। ভগবান্ তাঁহার প্রকৃতিতে শুধু মানুষ কেন প্রত্যেক জীবের জন্যও প্রয়োজনীয় খাদ্য রাখিয়া দিয়াছেন। মানুষের লোভ ও আকাঙ্ক্ষা অসীম হওয়ায় মানব-সমাজে প্রাণী-সমাজ অপেক্ষাও খাদ্যের অভাব দেখা যায়। প্রাণীরা নিজেদের প্রয়োজনীয় খাদ্য পাইলে তাহা লইয়াই সন্তুষ্ট থাকে, কিন্তু মানুষ প্রয়োজনের অতিরিক্ত পাইয়াও আরও অধিক আকাঙ্ক্ষা করে। তাই ভগবন্নিজজন শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর গাহিয়াছেন,—

"একরাজ্য আজ পাও, অন্য রাজ্য কাল চাও,
সর্ব্ব রাজ্য কর যদি লাভ।
তবু আশা নহে শেষ, ইন্দ্রপদ অবশেষ,
ছাড়ি' চাবে ব্রহ্মার প্রভাব॥"

যে মানুষের দিনে একমুষ্টি চাল হইলেই প্রয়োজন মিটিয়া যায়, সে যদি হাজার টন চাল গুদামে মজুত করিয়া রাখে, তখন চালের কৃত্রিম অভাব হওয়া স্বাভাবিক। প্রকৃতির নির্দ্ধারিত বরাদ্দে সন্তুষ্ট না হইয়া নিজের পুঁজি বাড়াইতে

থাকিলে অপরের মুখের গ্রাস অপহরণ করা হয়। ফলে যাহার মুখের গ্রাস কাড়িয়া লওয়া হইল, তাহাকে বাধ্য হইয়া অর্দ্ধাহারে-অনাহারে থাকিতে হয়। তাই কৃত্রিম অভাব সৃষ্টির জন্য সম্পূর্ণরূপে মানুষই দায়ী। মানুষের পুঁজিবাদ প্রবৃত্তিটির আর একটী কারণ অনিশ্চয়তা। 'ভবিষ্যতে কি হইবে'—এই আশঙ্কায় অধিকাংশ মানুষ খাদ্য সঞ্চয় করিয়া রাখিবার জন্য সচেষ্ট হন। প্রকৃতির মাধ্যমে পরমকরুণাময় ভগবান্ তাহাদের জন্য যে খাদ্যের সুবন্দোবস্ত করিয়া রাখিয়াছেন, তাহা তাহারা কিছুতেই বুঝিয়া উঠিতে পারে না। পিতা যেইরূপ তাঁহার সন্তানদের পালন করেন, আমাদের পরমপিতা ভগবান্ সেইরূপ আমাদিগকে প্রতিপালন করিতেছেন। পরমপিতার করুণা উপলব্ধি না করিয়া আমরা নিজেরাই নিজেদের অভাব পূরণের চেষ্টা করিতেছি বলিয়া যত অনর্থ ও গণ্ডগোলের সৃষ্টি হইতেছে। তবে সমষ্টিগতভাবে দেশের উপকারার্থে খাদ্যশস্যাদির মজুতের প্রয়োজন আছে। তাই বলিয়া Food Corporation-এর গুদামে লক্ষ লক্ষ টন খাদ্যশস্যের অপচয় কি সমালোনার যোগ্য নহে?

অভাব পূরণের জন্য ভগবানের কৃপা প্রার্থনা করিয়া নিজেদের চেষ্টা করিতে হইবে। নতুবা শুধু চেষ্টাকেই আসল বলিলে ভুল করা হইবে। প্রকৃতিতে সোডিয়াম ক্লোরিন আছে বলিয়া আমরা উহাদের সহযোগে লবণ তৈয়ারী করিতে পারি। উক্ত মৌলিক পদার্থদ্বয় প্রকৃতিতে না থাকিলে আমাদের হাজার চেষ্টার দ্বারা লবণ তৈয়ারী করা কখনও সম্ভবপর হইত কি? আজ ভগবদ্বিমুখ বিভিন্ন মতবাদিগণ অন্ন-বস্ত্রাদির সমস্যার সমাধানে বিভিন্ন পন্থা বাহির করিয়াছেন। কিন্তু এই সমস্যাগুলির সমাধান না করিয়া 'ভস্মে ঘি ঢালিবার' ন্যায় অনর্থক সমস্যাগুলিকে অধিকপরিমাণে জিয়াইয়া রাখিতেছে।

কমিউনিজম্ প্রকৃতপক্ষে বৈষম্যবাদেরই প্রতীক

প্রচণ্ড অভাব হইতেই কমিউনিজমের সূচনা হয়। পুঁজিবাদিদের শোষণে জনসাধারণকে জর্জ্জরিত হইতে দেখিয়া কার্ল মার্কস রাষ্ট্রের সম্পত্তি সমবণ্টনের মতবাদস্বরূপ কমিউনিজমের পন্থা উদ্ভাবন করেন। মার্কসের মতবাদ,—জর্জ হেগেলের দ্বন্দ্ববাদ-থিসিস্, অ্যান্টিথিসিস্ এবং সিন্‌থেসিস্ (যুক্তি, বিরোধ ও সমন্বয়) এর ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত। তাঁহার এই মতবাদ যখন সমাজ-ব্যবস্থায় আরোপ করা হয়, তখন তাহাকে বলা হয় সাম্যবাদ (কমিউনিজম্)। তাঁহার মতবাদ হইতেছে যে, "বহুকাল ধরিয়া পুরুষানুক্রমে বুর্জোয়া (মালিক সম্প্রদায়) এবং প্রলেটারিয়েটদের (শ্রমিক সম্প্রদায়) মধ্যে সংঘাত হইতেছে এবং

কমিউনিষ্ট সমাজে এই সংঘাতের সমাপ্তি হইবে অর্থাৎ শ্রমিক সম্প্রদায় ধনী সম্প্রদায়কে উচ্ছেদ করিয়া শ্রমিক সম্প্রদায়ের তথাকথিত একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠা করিবে, যাহা অবশেষে এক শ্রেণীবিহীন সমাজে পরিণত হইবে।" মার্কসের আরও ধারণা যে,—"যৌথভাবে সকলেই সমস্ত উৎপাদনের মালিক হইবে। কেহই কাহারও উপর আধিপত্য করিতে পারিবে না এবং মানুষ মানুষকে প্রতারণা করিতে পারিবে না। সকলেই যদি তাঁহাদের যোগ্যতানুসারে উৎপাদন করে এবং সকলেই যদি কেন্দ্রের উদ্দেশ্যে কর্ম্ম করে, তাহা হইলে সকলেরই মনোভাব সমান হইয়া যাইবে। পুঁজিবাদীরা হইতেছে শ্রমিকদের উপর নির্ভরশীল পরগাছা।" কার্ল মার্কস আবার তাঁহার 'The Capital' গ্রন্থে প্রতিষেধের প্রতিষেধ (Negation of the Negation) নিয়মের ক্রিয়া দেখাইতে গিয়া বলিয়াছেন,—"পুঁজিবাদ পৃথক্ পৃথক্ ছোট ব্যবসায়ী এবং কারিগরদের ধ্বংস করিয়া উৎপাদনের হাতিয়ার এবং ব্যবসাকে পুঁজিবাদী সংগঠনের হাতে কেন্দ্রীভূত করিয়াছে। সমাজতন্ত্র পুঁজিবাদকে ধ্বংস করিয়া প্রতিষেধের প্রতিষেধ হইয়াছে। মোটকথা, পুঁজিবাদী সাফল্যের অবস্থায় মুষ্টিমেয় পরস্বত্ব অপহরণকারীর দল জনসাধারণের এক বিরাট্ অংশকে সম্পত্তি হইতে বঞ্চিত করে। সমাজতন্ত্রের সাফল্যের অবস্থায় জনসাধারণের এক বিপুল অংশ মুষ্টিমেয় অপহরণকারীদের সম্পত্তি হইতে বঞ্চিত করে। বিনষ্ট বিলীন বস্তুর (ঘটনা প্রবাহ) উত্তরাধিকারী বা স্থানাভিষিক্তকে প্রতিষেধ বা নেতি (Negation) বলা হয়। প্রতিষেধ-শব্দটি যদিও শ্রুতিকটু কিন্তু তাহার গুরুত্ব অপরিসীম। এই নিয়মের গুরুত্ব তখনই আমরা বুঝিতে পারি যখন দেখি সমগ্র বিশ্বের প্রগতি বা বিকাশে এই নিয়মের অমোঘ অনিবার্য্যতা। এক প্রজন্ম পূর্ব্ব প্রজন্মকে প্রতিষেধ বা বিনাশ করে, আবার এই নতুন পুরুষকে পরবর্ত্তী প্রজন্ম প্রতিষেধ বা বিনাশ করে। বৈজ্ঞানিক বস্তুবাদের দৃষ্টান্ত নিয়েই বিষয়টি পর্য্যালোচনা করা যাউক। প্রাচীন বস্তুবাদ→যান্ত্রিক বস্তুবাদ→ বৈজ্ঞানিক বস্তুবাদ। প্রাচীন বস্তুবাদের প্রতিষেধ বা বিনাশ করিতেছে সপ্তদশ-অষ্টাদশ শতাব্দীর যান্ত্রিক বস্তুবাদ! আবার যান্ত্রিক বস্তুবাদের প্রতিষেধ করিতেছে বৈজ্ঞানিক বস্তুবাদ। সুতরাং বৈজ্ঞানিক বস্তুবাদ হইতেছে প্রতিষেধের প্রতিষেধ।" রাহুল সাংকৃত্যায়নও 'বৈজ্ঞানিক যন্ত্রবাদ' গ্রন্থে বলিয়াছেন,—"বৈজ্ঞানিক বস্তুবাদের পথ গীতার বা বেদের পলায়নবাধ হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্।"

আদর্শগতভাবে মার্কসের মতবাদ সুন্দর হইলেও ব্যবহারিকভাবে তাহাতে

প্রচুর গলদ রহিয়াছে। মার্কসের মতবাদ মানুষের সহিত মানুষের অনৈক্যের সৃষ্টি করিয়া অশান্তির সৃষ্টি করে। কমিউনিষ্টরা বর্ণ-বিহীন সমাজ তৈয়ারী করিতে কখনও সফল হন নাই, ভবিষ্যতেও হইবেন না। পৃথিবীর অন্য কমিউনিষ্ট দেশ ত' দূরের কথা, স্বয়ং লেলিনের দেশ রাশিয়াতেই বর্ণ-বিহীন সমাজ তৈয়ারী সম্ভব হয় নাই। তাই রাশিয়ায় দেখা যায়, একজন দরিদ্র মজুর রাস্তা পরিষ্কার করিতেছে, অথচ উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারীরা তাঁহাদের গাড়ীতে চড়িয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। সমাজ ব্যবস্থা যতদিন থাকিবে উচ্চশ্রেণী ও নিম্নশ্রেণী থাকিতে বাধ্য। কিন্তু সমাজের কেন্দ্রবিন্দু যদি একই হয়, তাহা হইলে কেহ বড় কাজই করুক বা ছোট কাজই করুক, তাহার মধ্যে কোন পার্থক্য থাকে না। সমাজের কেন্দ্রবিন্দুটি হইতেছে স্বয়ং পরমপিতা ভগবান্। তাঁহার খবর মার্কস বা তাঁহার অনুগামীরা জানেন না। 'কেন্দ্রবিন্দু' সঠিক না হওয়ায় ভগবদ্বিমুখ সমাজে অধিক হইতে অধিকতর সমস্যার সৃষ্টি হইতেছে। কমিউনিষ্টরাও শ্রমিকদের উপর নির্ভর করিয়া বাঁচিয়া আছে—ম্যানেজারগণ মোটা টাকা মাহিনাও পাইতেছেন। ইহাতে সাধারণ শ্রমিকরা অসন্তুষ্ট হইতেছে। যতক্ষণ না পর্য্যন্ত সকলেই ভগবানকে একমাত্র ভোক্তা বলিয়া স্বীকার না করিতেছেন, ততক্ষণ সংঘর্ষ থাকিবেই এবং সাম্যবাদ স্থাপন করাও সম্ভব হইবে না।

মার্কসের মতে, সমাজের কেন্দ্রবিন্দুটি হইতেছে রাষ্ট্র। কিন্তু রাষ্ট্র কখনও গলদমুক্ত হইতে পারে না। কমিউনিষ্টরা টাকা-পয়সা, সোনাদানা, যানবাহন সবকিছুই রাষ্ট্রকেন্দ্রিক করিতে চাহেন। কিন্তু তাহাতে লাভের পরিবর্ত্তে লোকসানই বেশী। যখনই সম্পদ কেন্দ্রের আয়ত্তাধীনে আনা হয়, তখন কেন্দ্রীয় সরকারের সদস্যরা অবশ্যই তাহার অপব্যবহার করিবে। রাশিয়ায় ক্রুশ্চেভকে ভোট দিয়া রাষ্ট্রপ্রধান করা হইয়াছিল। পরে সম্পদ আত্মসাতের অজুহাতে তাঁহাকে গদিচ্যুত করা হইয়াছিল। ভগবানের পরিবর্ত্তে যাঁহাকে কেন্দ্রে বসানো হইবে তিনি জনগণকে প্রতারণা করিয়া কেন্দ্রের সম্পত্তি অপব্যবহার করিবার চেষ্টা করিবেন। রাষ্ট্রনেতারা কখনই দেখাইতে পারিবে না, সবকিছুই রাষ্ট্রের সম্পত্তি। এটা কেবল আকাশ-কুসুম কল্পনামাত্র। রাষ্ট্রনেতারা যে জনসাধারণের স্বার্থের দোহাই দিয়া নিজেদের স্বার্থ পূরণে ব্যস্ত থাকেন, তাহার প্রমাণের কোন অভাব নাই। (ক্রমশঃ)

—শ্রীবলভদ্র দাস ব্রহ্মচারী

শ্রীল গুরুপাদপদ্মের বিরহ-তিথিতে

বিরহ-বেদনা

যে আনিল প্রেমধন করুণা প্রচুর।
হেন প্রভু কোথা গেলা শ্রীকেশব ঠাকুর॥

বিশ্ববৈষ্ণব-রাজসভার পাত্ররাজ পরমহংসকুলচূড়ামণি জগদ্গুরু নিত্যলীলা-প্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী প্রভুপাদের বিশুদ্ধ ভক্তি-সিদ্ধান্ত বাণীধারার সংরক্ষক তথা শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির ও শ্রীশ্রীগৌর-রাধা-বিনোদবিহারীজীউর প্রতিষ্ঠাতা বিশ্ববরেণ্য জগদ্গুরু নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী প্রভুবরের নিত্যলীলায় প্রবেশ এবং তাঁহারই অভাবে বিরহ-বেদনার অনুভূতি তদাশ্রিত জনগণকে আজও ব্যাকুলিত করিতেছে।

অস্মদীয় গুরুপাদপদ্ম—আকর মঠরাজ শ্রীচৈতন্যমঠ ও বিশ্বব্যাপী শ্রীগৌড়ীয় মঠসমূহের প্রতিষ্ঠাতা শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুরের অন্তরঙ্গ বিশ্রম্ভ সেবক ছিলেন। পরজগতের সাক্ষাৎ গুরুসেবার মূর্ত্তবিগ্রহরূপে তিনি এ জগতে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। এই মহাপুরুষ ছিলেন পরাবিদ্যা, পরাভক্তি, পরামুক্তি ও পরজ্ঞানপ্রদাতা। তিনি 'তীর্থীকুর্ব্বন্তি তীর্থানি' বাণীর সার্থকতা সম্পাদনের নিমিত্ত সাধুসঙ্গে ধাম ও তীর্থ পরিক্রমাদিতে সুযোগ প্রদান করিয়া সুকৃতিবান্ জনগণের পারমার্থিক কল্যাণ বিধান করিয়াছেন।

এই আচার্য্যকেশরী ছিলেন ব্রজের 'শ্রীবিনোদ-মঞ্জরী। ইনি শ্রীধাম মায়াপুরের সেবা সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করিয়া শ্রীল প্রভুপাদের বহু সহায়তা করিয়াছেন। শ্রীল আচার্য্য শঙ্করপাদকে ভগবান্ মায়াবাদ প্রচার করিতে আদেশ করিয়াছিলেন; কিন্তু প্রভুপাদ শ্রীল সরস্বতী ঠাকুর এই মহাপুরুষকে মায়াবাদ উচ্ছেদ করিতে আদেশ করিয়াছিলেন। সুতরাং 'গুরোরাজ্ঞাহ্যবিচারণীয়া' বিচারে মায়াবাদরূপ কুসিদ্ধান্ত খণ্ডনপূর্ব্বক বিশুদ্ধ ভক্তিসিদ্ধান্ত জগতে প্রচার করিয়াছেন। তাঁহার লিখিত 'মায়াবাদের জীবনী বা বৈষ্ণব-বিজয়' গ্রন্থ মায়াবাদী সম্প্রদায়ে বিশেষ আলোড়ন সৃষ্টি করিয়াছে। তিনি তৎকালীন ভারতের প্রধানমন্ত্রী জহরলাল নেহরুর সাধু-নিয়ন্ত্রণ আইনের প্রবল প্রতিবাদ করিয়া ধর্ম্মনীতি বর্জ্জিত রাজনীতির অকিঞ্চিৎকরতা প্রদর্শনপূর্ব্বক সনাতন ধর্ম্মের যথার্থ মহিমা প্রকাশ ও প্রচার করিয়াছেন।

কুলিয়া সহরবাসী ঈর্ষাপরায়ণ কতিপয় ব্যক্তি অবৈধভাবে সহর নবদ্বীপকেই শ্রীগৌরের জন্মস্থান "প্রাচীন মায়াপুর" বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে চাহিলে এবং তাহাদের প্রচ্ছন্ন ভোগবাদের বাধাসৃষ্টি হওয়ায় শ্রীধামনবদ্বীপ-পরিক্রমাকালে সগণ শ্রীল প্রভুপাদ আক্রান্ত হইলে তিনি নিজজীবন বিপন্ন করিয়াও শিষ্য কুরেশের শ্রীরামানুজাচার্য্যকে রক্ষার ন্যায় তাঁহার গুরুপাদপদ্মের বিশ্রম্ভ সেবা সম্পাদন করিয়াছেন। সতীর্থ বৈষ্ণবগণের প্রতি অমানী মানদ ধর্ম্মের আদর্শ স্থাপন করিয়াছেন। জাগতিক বিদ্যা, বুদ্ধি, জ্ঞান, পাণ্ডিত্য প্রভৃতিদ্বারা কিভাবে শ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণবের সেবা করিতে হয়, তাহা নিজজীবনে আচরণ-পূর্ব্বক জগদ্বাসীকে শিক্ষা দিয়াছেন। এই মহাপুরুষের প্রতিটি কার্য্য বৈশিষ্ট্যপূর্ণ ছিল। তাঁহার প্রত্যেকটী শব্দ, প্রত্যেকটী সিদ্ধান্ত অকাট্য ও অলৌকিক ছিল। তাহাতে সাধারণ মানুষের প্রবেশ করা ত' দূরের কথা, বিদ্বজ্জন ও মনীষিগণ তাহা সকল সময়ে অনুধাবনে অসমর্থ ছিলেন। বেদান্তের তাৎপর্য্য যে একমাত্র ভক্তি, তাহা শিক্ষা দেওয়ার জন্যই তিনি শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি স্থাপন করিয়াছেন।

গুরু-বৈষ্ণব সেবা পরিত্যাগ করিয়া ক্ষণকালের জন্যও মায়িক সম্পর্কযুক্ত আত্মীয়-স্বজনগণের সান্নিধ্য কাম্য নহে—ইহাই তাঁহার জীবনের একটী বিশেষ আদর্শ। গুরু-বৈষ্ণব স্বভাবতঃই পরদুঃখদুঃখী।

এই অতিমর্ত্ত্য মহাপুরুষের অমন্দোদয়দয়ার সাগরের বিন্দুমাত্র কীর্ত্তন করার ক্ষমতা আমার নাই। যতটুকু প্রকাশিত হইল, ইহা তাঁহারই কৃপাপ্রভাবে জানিতে হইবে। এই মহাপুরুষের অতিমর্ত্ত্য চরিত্র স্মরণ ও গুণকীর্ত্তন করিলে মায়া-পিশাচীর হস্ত হইতে অব্যাহতি হয়। তাঁহার অতিমর্ত্ত্য চরিত্র আলোচনা করিলে আমাদের সুকৃতি অর্জ্জিত হইবে। সুকৃতির ফলে সাধুসঙ্গ, সাধুসঙ্গ-প্রভাবে ভগবানে পরাভক্তি এবং পরাভক্তির দ্বারা ভগবানকে লাভ করিতে পারিব। সকল বৈষ্ণবগণ আমার মস্তকে লক্ষ লক্ষ পদাঘাত করুন—যেন আমি হরি-গুরু-বৈষ্ণবসেবা ও স্মরণ থেকে কথনও বঞ্চিত না হই। ইহা আমার একমাত্র প্রার্থনা।

—শ্রীভগবান্ দাসাধিকারী
আগরপাড়া (২৪ পরগণা উঃ)

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য গৌরহরি

এ জগৎ মায়াময়। মায়াময় বিশ্বে মায়ায় বশীভূত সকল জীব-জগৎ। দৈবীমায়া অতিক্রম করা আমাদের দুঃসাধ্য। তাই মায়ার অধীন সকল পাপী-তাপী, দীন-দুঃখী, অনাথ-আতুর, ধনী-দরিদ্র।

মায়া-নদী কালস্রোতে প্রবহমানা। এ মায়া-নদী পারের জন্য চাই মায়াধীশ অবতার—যিনি ধরাধামে অবতীর্ণ হন যুগে যুগে ধরার ভার-হরণে, জীব-জগতের উদ্ধার-সাধনে।

মায়া—প্রকৃতি; প্রকৃতি ও পুরুষের সংসর্গে আসে সৃষ্টি। সৃষ্ট জগতের নিয়ন্তা একমাত্র বিষ্ণু। 'মায়াং তু প্রকৃতিং বিদ্যাৎ, মায়িনং তু মহেশ্বরম্,' 'পুরুষাৎ প্রকৃতিঃ', 'প্রকৃতেঃ পরঃ পুরুষঃ।' সেই পুরুষই অনাদি-অনন্তকাল ধরে 'একোঽহং বহুস্যামঃ' রূপে নানা সত্তায় বিরাজমান।

তিনি আদি, অনাদি। তিনিই ওঁঙ্কার, 'সর্ব্ববেদময়ো হরিঃ'। পরমপুরুষ যোগমায়া আশ্রয় করে নানা লীলাস্থলে অপ্রকটলীলা প্রকটজন্য নানা অবতারে যুগে যুগে ধরায় অবতীর্ণ। তিনি গোপ্য—গোপনীয়—গুপ্ত, ব্যাপী—ব্যাপ্য—ব্যাপবান্—বহুরূপধারী শ্রীকৃষ্ণ-মুরারি দশ-অবতারধৃক্। শাস্ত্রজ্ঞানে বোধপ্রতীতি জন্মে—"অস্তি ভাতি প্রিয়ং নাম রূপং চেতৎ পঞ্চকম্।" শ্রীনামরূপেই তাঁহার প্রকাশ। তিনি নামের নামী, বহুনামী; শ্রীনামেই তাঁকে লাভ করা যায়। সেই নাম প্রেমনাম, নামব্রহ্ম, শব্দব্রহ্ম, মধুমাখা হরিনাম; সেই প্রেমনাম রসনায় প্রকাশ ঘটে। তিনি অরূপ হইয়াও স্বরূপ। তিনি রূপবান্ হইয়াই ধরা দেন—নামময় জগতে নিতি নিতি।

তিনি যুগাবতার, যুগাচার্য্য। যুগচতুষ্টয়ে—সর্ব্বকালে তিনি আবির্ভূত। সত্যেতে শ্রীহরি, দ্বাপরেতে শ্রীকৃষ্ণ, ত্রেতাতে দাশরথি-রাম রঘুকুলমণি, কলিতে বিপ্রলম্ভ-রসময়বিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য; তিনি শ্রীগৌরাঙ্গ, গৌরগুণমণি, গোরা 'গৌরহরি'। একাধারে তিনিই 'চৈতন্যচন্দ্রোদয়', তিনিই 'ষোড়শকলং ব্রহ্ম', সচ্চিদানন্দ প্রেমঘন শচীসুত-জগন্নাথনন্দন জগন্নিবাস শ্রীগৌরাঙ্গ, গৌররায়।

সদাই প্রশ্ন জাগে,—কেন তিনি ধরাধামে আসেন বারে বারে? একবার এলেই ত' চলতো। উত্তরে শাস্ত্রকার নিবেদন করেছেন,—"পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্। ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে॥" পরক্ষণে

জিজ্ঞাসেন,—কেন অবতারে আসেন? স্বভাবতঃ উত্তরও আসে,—তিনি সর্ব্ব-শক্তিমান্, নিয়ন্তা-নিবন্ধন শ্রীকৃষ্ণাবতার, স্বয়ং ভগবান্। "শ্রীকৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ম্" ইতি শ্রুতৌ। "যদা যদা হি ধর্ম্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত। অভ্যুত্থানম-ধর্ম্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্॥"—ইতি গীতায়াম্।

এই সর্ব্বসন্দেহের নিরসন করেন,—মুরলীধারী শ্রীমধুসূদন। কলিতে তিনি একই অঙ্গে দুই রূপের সমন্বয়ে কান্তাভাব হ্লাদিনীশক্তি রাধাভাব-দ্যুতি-সুবলিত শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য গৌরাঙ্গ গৌরহরি। অন্তঃকৃষ্ণ ও বহির্গৌররূপে বিরাজমান।

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী লিখলেন,—"স্বয়ং ভগবান্ কৃষ্ণ, কৃষ্ণ সর্ব্বাশ্রয়। পরম-ঈশ্বর কৃষ্ণ—সর্ব্বশাস্ত্রে কয়॥" "ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহঃ। অনাদিরাদির্গোবিন্দঃ সর্ব্বকারণকারণম্॥"—ইতি ব্রহ্ম-সংহিতায়াম্।

গোপীজনবল্লভ শ্রীকৃষ্ণ প্রেমের গুরু রাধাঠাকুরাণীর সহিত একই অঙ্গে অন্তরঙ্গ-বহিরঙ্গভাব প্রকাশজন্য প্রেমপ্রবাহিনী ভক্তি-রসমন্দাকিনী সুরধনী জাহ্নবী-তীরে সপার্ষদ নবদ্বীপচন্দ্র গৌরহরি—গৌররায়রূপে অবতীর্ণ হলেন কলিযুগে—মায়াময় জগতের পাপী-তাপী উদ্ধারের জন্য। বৈষ্ণব-দর্শনোক্ত ভক্ত-গুরু ভগবান্—এই তিনের স্মরণ সাধন-ভজন পথের সর্ব্ববিঘ্ন-বিদূরণের একমাত্র উপায়। প্রেমময় রসিকেন্দ্রচূড়ামণি ঠাকুরের প্রেমরস আস্বাদনে নিত্যমুক্ত-স্বভাব-সিদ্ধিমানসে আত্মনিবেদনপূর্ব্বক অভিধেয় ভক্তি ও প্রয়োজন প্রেমলাভই একান্ত কাম্য। নিখিল জগৎ উদ্ধারকর্ত্তা সেই 'প্রেমাবতার' 'ভক্তাবতার' শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবই বন্দনীয়। সেই প্রেমিক ও প্রেমরসময় বিগ্রহ জয়যুক্ত হউন।

—শ্রীশীতলচন্দ্র কোলে, শাস্ত্রী
সুবলচক, পোঃ বলাইচক (হাওড়া)

শ্রীল গুরু-মহারাজের বক্তৃতা

[পূর্ব্বপ্রকাশিত ৪৩শ বর্ষ, ৭ম সংখ্যা, ২৭৪ পৃষ্ঠার পর]

ধর্ম্মজগতে সকলেরই সমান অধিকার আছে। সেই অধিকার স্বয়ং কৃষ্ণচন্দ্র প্রমাণ করেছেন, সেই অধিকার স্বয়ং শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু প্রমাণ করেছেন, সেই অধিকার মুনি-ঋষিগণ প্রমাণ করেছেন। তথাপি শাস্ত্রে কোন কোন জায়গায় এমন কথা লিপিবদ্ধ আছে, যাতে ভুলবুঝাবুঝি হতে পারে। এটাকে

আপাতত: Contradictory মনে হয়। এটাকে সমাধান করা মুস্কিল ; কিন্তু তার সমাধান আছে। আমি উদাহরণস্থলে একটা কথা এখানে উত্থাপন করছি। স্মৃতিতে বহু রকমের কথা আছে। যেমন ধরুন মনুসংহিতা, তার ভিতরে একটা জায়গায় বলা আছে—স্ত্রীগণ কখনও স্বাধীনতা পাবেন না। সুতরাং সঙ্গে সঙ্গে আমরা উঠে পড়ে লেগে গেলাম যে, তাহলে মুনি-ঋষিগণ স্ত্রী-স্বাধীনতা স্বীকার করেন নাই। কিন্তু জিনিসটা ভুল। মনুসংহিতার ভিতরে মহর্ষি মনু আমাদের কোন ভুল ধারণা দেন নাই। যথাযথ ধারণা যেটা, সেটা তিনি বিবৃত করেছেন। একটা শ্লোকের মধ্যে বলছেন,—

পিতা রক্ষতি কৌমারে, ভর্ত্তা রক্ষতি যৌবনে।
বার্দ্ধক্যে চ সুত রক্ষেৎ, ন স্ত্রী স্বাতন্ত্র্যমাপ্নুয়াৎ ॥

কথাটায় ভুল নাই কিছু। বাল্যকালে পিতামাতা কন্যাকে রক্ষা করেন, পালন-পোষণ করেন। 'ভর্ত্তা রক্ষতি যৌবনে'—যুবতী বয়সে ভর্ত্তা অর্থাৎ স্বামী তাকে পালন-পোষণ ও রক্ষণাবেক্ষণ করেন। 'বার্দ্ধক্যে চ সুত রক্ষেৎ'—বৃদ্ধকালে তাকে তার পুত্রই পালন-পোষণ করেন, 'ন স্ত্রী স্বাতন্ত্র্যমাপ্নুয়াৎ' সুতরাং স্ত্রী যে স্বাধীনভাবে চলবে, এমন কোন ব্যবস্থা বা পরিবেশ দেখা যাচ্ছে না। সেইকথাই বলা হয়েছে। এখানে ত' স্ত্রী-স্বাধীনতা হরণের কোন কথা নাই। যদি তাই হয়, তাহলে স্বয়ং ভগবান্ কৃষ্ণচন্দ্র গীতার ভিতরে যে কথা বলেছেন, আমরা স্মরণ করতে পারি সেটা। যেখানে বলছেন,—

মাং হি পার্থ ব্যপাশ্রিত্য যেঽপি স্যুঃ পাপযোনয়ঃ।
স্ত্রিয়ো বৈশ্যাস্তথা শূদ্রাস্তেঽপি যান্তি পরাং গতিম্ ॥

অন্ত্যজ ম্লেচ্ছগণ ও বেশ্যাদি পতিতা স্ত্রীসকল তথা বৈশ্য-শূদ্র প্রভৃতি নীচবর্ণের মনুষ্যগণ আমার অনন্যভক্তিকে আশ্রয় করলে অবিলম্বে পরাগতি লাভ করবেন। সমাজের শীর্ষস্থানে অবস্থিত যাঁরা, তাঁদের সম্বন্ধে বললেন,—

কিং পুনর্ব্রাহ্মণাঃ পুণ্যা ভক্তা রাজর্ষয়স্তথা।
অনিত্যমসুখং লোকমিমং প্রাপ্য ভজস্ব মাম্ ॥

'কিং পুনর্ব্রাহ্মণাঃ পুণ্যা'—তাদের কথা আর কি বলব! এদের সকলেরই ব্যবস্থা কৃষ্ণচন্দ্র গীতাশাস্ত্রে দিয়ে রেখেছেন। সকলের সমান অধিকার। ঠিক সেই একই জাতীয় কথা ভাগবতে শ্রীশুকদেব-কৃত হৃষীকেশ স্তবের মধ্যে বিবৃত হয়েছে,—

কিরাতহূনান্ধ্রপুলিন্দপুক্কশা আভীরশুহ্মা যবনাঃ খসাদয়ঃ।
যেঽন্যে চ পাপা যদুপাশ্রয়াশ্রয়াঃ শুদ্ধ্যন্তি তস্মৈ প্রভবিষ্ণবে নমঃ ॥

'যবন' শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে ভাগবতে। খাসিয়া, জয়ন্তিয়া ইত্যাদি পাহাড়বাসী, অরণ্যবাসী ব্যক্তিগণ যারা দুনিয়ার চক্ষে হীনমন্য, কিন্তু ভগবান্ বলছেন—তোমাদের সকলকে আমি সমান অধিকার দিচ্ছি আমাকে প্রাপ্তি করবার জন্য, আমার সাধন-ভজন করবার জন্য, আমার সাক্ষাৎ সেবালাভ করবার জন্য। সুতরাং অধিকার ত' কারও হরণ করা হয় নাই,—ভগবান্ও করেন নাই, আর মুনি-ঋষিগণও করেন নাই। সকলকে সমান অধিকার দিয়েছেন, সেটা শাস্ত্রে প্রমাণিত। শাস্ত্র আলোচনা করলে আমরা তাই দেখতে পাই।

তবে একটা কথা এখানে বিচার্য্য—কাকে বলা হচ্ছে ভগবানের সেব করবার অনধিকারী?—যারা নাস্তিক, যারা আসুরিক ভাবাপন্ন, তারা ভগবানকে পাওয়ার অনধিকারী। আস্তিক যাঁরা, দৈবীভাবাপন্ন যাঁরা, তাঁরা ভগবানকে পাওয়ার পূর্ণতম, যোগ্যতম অধিকারী। শাস্ত্রে ভাগ করেছেন এইভাবে।

ন মাং দুষ্কৃতিনো মূঢ়াঃ প্রপদ্যন্তে নরাধমাঃ।
মায়য়াপহৃতজ্ঞানা আসুরং ভাবমাশ্রিতাঃ॥

যোগ্যতা, অযোগ্যতার মাপকাঠি ঐখানে দেখিয়েছেন। সত্যে নিষ্ঠা, পরমসত্য বস্তু যে ভগবান্, যিনি ধর্ম্মের নিয়ন্তা, পালন-পোষণ কর্ত্তা, তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা-ভক্তি অর্পণ।

যদি বলা যায়, মশায়! ধর্ম্ম ত' সৃষ্টি হয়েছে ভয় থেকে, ভক্তি থেকে। যে Idea আজ Prevail করছে সমাজে, এটা ভুল কথা। ভয় থেকে, ভক্তি থেকে ধর্ম্ম আবির্ভাব হয় নাই। ধর্ম্ম Everlasting, unchangeable; ধর্ম্ম হৃদয়ের সহজ-সরল বৃত্তি। ধর্ম্ম-শব্দে সেই ব্যাখ্যাই করা হয়েছে শাস্ত্রে। একজন ধার্ম্মিক ব্যক্তির যথেষ্ট নীতি-আদর্শ রয়েছে, নৈতিক বল রয়েছে, পরন্তু একজন অধার্ম্মিকের সেভাব নাই। একজন ধার্ম্মিক, তিনি তাঁর জীবন বিপন্ন করতে পারেন একজনের উপকার করবার জন্য, অধার্ম্মিক তা পারেন না। যার নীতি-আদর্শের কোন বালাই নাই, তিনি সে ত্যাগ স্বীকারে সম্মত নয়। সুতরাং ধর্ম্মগ্রহণ করে কেউ কখনও ভীরু, কাপুরুষ হয়েছেন, দেশকে উচ্ছন্নে দিয়েছেন, এমন কোন কথা কোথাও নাই। যাঁরা ধার্ম্মিক তাঁদের শক্তি-সামর্থ্য খুব বেশী, আত্মবল তাঁদের খুব বেশী। তাঁরা দুনিয়ার বিরূপ সমালোচনায় কর্ণপাত করেন না। ধার্ম্মিক কোনদিন ভীরু হবেন না, তাঁরা জানেন ভগবান্ আমাদের সহায়, নীতি-আদর্শ আমাদের সহায়, ধর্ম্ম আমাদের সহায়—এইটাই হল তাঁদের বিচার। ঠিক সেই বিচারে যাঁরা প্রতিষ্ঠিত,

তাঁরাই ভগবদ্ভক্ত নামে পরিচিত। সুতরাং ভগবদ্ভক্তের ভয় কোথায়? 'ন কুতশ্চন বিভ্যতি'—ভগবদ্ভক্তের কোন জায়গা থেকে ভয় নাই, আর সে ভয়ে তাঁরা কাতর নন। তাঁরা জানেন ভগবৎ-কৃপাপ্রভাবে, ভগবানের অহৈতুকী কৃপাপ্রভাবে সবটাই উতরে যাব আমি—এ বিশ্বাস তাঁর আছে। তা না হলে তিনি ভক্ত কিসের?

স্বয়ং কৃষ্ণচন্দ্র তিনি গৌরাঙ্গমূর্ত্তিতে এ জগতে আবির্ভূত হয়েছেন। কথাটা লেখা আছে—'রাধাভাবদ্যুতিসুবলিত নৌমি কৃষ্ণস্বরূপম্।' চৈতন্যমহাপ্রভু সম্বন্ধে বলছেন। অনেকের ভুল ধারণা আছে, তারা বলছেন,—চৈতন্য-মহাপ্রভু একজন Religious reformer—সমাজ-সংস্কারক ছিলেন। একজন রাজাধিরাজ সম্রাট্‌কে যদি একজন কর্ম্মচারী বলেন, তাহলে নিশ্চয়ই তাঁর গুণ-ব্যাখ্যা করা হয় না। তাঁর অবমাননা করা হয়। স্বয়ংরূপ যে ভগবান্ কৃষ্ণ তিনিই চৈতন্যমূর্ত্তিতে জগতে প্রকটিত হয়েছেন—তারই ভুরি ভুরি প্রমাণ শাস্ত্রে রয়েছে। আমরা প্রমাণ ছাড়া কোন কিছু গ্রহণ করতে রাজী নই। তার পিছনে Logic—যুক্তি থাকা দরকার, প্রমাণ থাকা দরকার। আজকাল আমরা মানুষকে ভগবান্ বলতে চাচ্ছি বটে, কিন্তু তার প্রমাণ কোথায়? তার পিছনে যুক্তি কোথায়?

শাস্ত্র কাকে বলেছেন? শাস্ত্র মানে প্রমাণ এবং যুক্তি। যার পিছনে কোন যুক্তি নাই, প্রমাণ নাই, তাকে শাস্ত্রে বলে মানা হয় নাই। ঋষিগণের নিজস্ব বিচার ঋষিগণ বললেন,—

কেবলং শাস্ত্রমাশ্রিত্য ন কর্ত্তব্যোবিনির্ণয়ঃ।
যুক্তিহীনবিচারে তু ধর্ম্মহানিঃ প্রজায়তে॥

সুতরাং যুক্তিহীন বাক্যকে ঋষিগণ শাস্ত্র বলে মানেন নাই। সুযুক্তিপূর্ণ শাসন বাক্য হল শাস্ত্র। শাস্ ধাতুর ষ্ট্রন্ প্রত্যয় করে শাস্ত্র-শব্দ নিষ্পন্ন হয়েছে। কার শাসনবাণী?—ভগবানের। সর্ব্বশক্তিমান্ ভগবান্—যাঁর থেকে অনন্ত বিশ্বজগৎ Generated হচ্ছে, তাঁরই প্রজাগণের কল্যাণের জন্য শাস্ত্র।

ধর্ম্ম কোথা থেকে এল? ধর্ম্ম কি ভগবান্ সৃষ্টি করেছেন?—না, ভগবান্ও ধর্ম্ম সৃষ্টি করেন নাই। যেমন সনাতন ধর্ম্মতত্ত্ব বিশ্লেষণ করতে গিয়ে স্বয়ং ভগবান্ বলছেন, আমাকে কেউ সৃষ্টি করেন নাই। ভগবানকে যেমন কেহ সৃষ্টি করেন নাই, তদ্রূপ সনাতন ধর্ম্মকেও কেউ সৃষ্টি করেন নাই। স্বয়ং-আবির্ভূত তত্ত্ব—Full effulgent বস্তু। সেই কথা শাস্ত্রে বলছেন। স্বতঃ-প্রকাশিত সূর্য্য ভগবান্ কৃষ্ণ নিজমুখে এক জায়গায় বলেছেন যে,—ধর্ম্ম আমি

সৃষ্টি করি নাই। আমি যেমন পরাৎপর তত্ত্ব ভগবান্, সনাতন পুরুষ, সনাতন ধর্ম্মও তদ্রূপ, আমি সৃষ্টি করি নাই। তবে 'ধর্ম্মন্তু সাক্ষাদ্ভগবৎপ্রণীতম্' ধর্ম্ম ভগবৎপ্রণীত। সৃষ্টি করলে ত' ভুল হয়ে যায়। তাহলে ত' কেউ একজন সাধারণ মালিক হয়ে যাচ্ছে। তা নয়। ঠিক এইভাবে শাস্ত্রে ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে।

ভগবানকে কেউ সৃষ্টি করেন নাই। তিনিই নিখিল বিশ্বকে সৃষ্টি করেছেন, "সদেব সৌমেদমগ্র আসীৎ। একমেবাদ্বিতীয়ম্। এক হ বৈ নারায়ণ আসীৎ ন ব্রহ্মা নেশানঃ।" ভগবান্ বলছেন,—সৃষ্টির আদিতে আমি ছিলাম, আমাকে কেউ সৃষ্টি করেন নাই, কিন্তু আমি ব্রহ্ম-শিবাদি দেবতাকে সৃষ্টি করেছি।

অহমেবাসমেবাগ্রে নান্যৎ যৎ সদসৎ পরম্।
পশ্চাদহং যদেতচ্চ যোঽবশিষ্যেত সোঽস্ম্যহম্॥

সৃষ্টির আদিতে আমি ছিলাম, পরে আমিই থাকব এবং বর্ত্তমানে আমিই আছি। এইটাই ত' তত্ত্বদর্শন। সেই ভগবানই বলছেন,—'নারায়ণাদ্ব্রহ্মা জায়তে, নারায়ণাৎ প্রজাপতিঃ প্রজায়তে, নারায়ণাদিন্দ্রো জায়তে, নারায়ণাদষ্টৌ বসবো জায়ন্তে, নারায়ণাদেকাদশ রুদ্রা জায়ন্তে, নারায়ণাদ্বাদশাদিত্যা ইত্যাদি।" বৈদিক মন্ত্র। ভগবান্ থেকে সব Generated হচ্ছেন। ভগবানকে কেউ সৃষ্টি করেন নাই। পরন্তু সেই ভগবান্ বললেন,—

প্রজাপতিঞ্চ রুদ্রঞ্চ অহমেব সৃজামি বৈ।
তৌ হি মাং ন বিজানীতো মম মায়া-বিমোহিতৌ॥

প্রজাপতি ব্রহ্মাকে আমি সৃষ্টি করেছি, শিবকে আমি সৃষ্টি করেছি। আমার মায়ায় বিমোহিত হয়ে সেই ব্রহ্ম-রুদ্রাদি দেবতাগণ আমাকে চিনে উঠতে পারছেন না, বুঝে উঠতে পারছেন না। তাঁরা ভুল করছেন। আমার থেকে তাঁরা Generated, কিন্তু আমাকে চিনতে পারছেন না।

শিবঠাকুরের এক নাম রুদ্র। রুদ্র নাম কেন হয়েছে?—ভগবান্ যখন শিবঠাকুরকে সৃষ্টি করেছেন, শিবঠাকুর তখন কান্নাকাটি শুরু করলেন। তুমি কাঁদছ কেন? আমাকে কেন সৃষ্টি করলেন? আমি সৃষ্টি করেছি, আমি বুঝব তোমার কি কর্ত্তব্য। আমি তোমার কর্ত্তব্য নির্ণয় করব। কিন্তু কান্না-কাটির কি কারণ হয়েছে তোমার? যেহেতু তুমি ক্রন্দন করছ, সেইহেতু তোমার নাম রুদ্র। 'রোদনাৎ ইতি রুদ্রঃ'—যেহেতু তিনি ক্রন্দন করেছিলেন,

সেইহেতু তাঁর নাম রাখা হল রুদ্র। সবটার পিছনে এইরকম ধরণের ইতিহাস আছে।

অনন্তলীল সেই ভগবানের অনন্ত নাম। মুখ্য নাম কয়টা ভগবান্ নিজে Preserve করলেন এবং গৌণনামগুলি সব দেবতাদের বিভাগ করে দিলেন। ভগবানের যে মূলা প্রকৃতি, তাঁর জন্য কয়েকটী নাম Reserve থাকল। বাকী সব নামগুলো দেবীগণকে বিভাগ করা হল। ঠিক এইভাবে বেদের মধ্যে বর্ণনা আছে।

বেদের মধ্যে 'ইন্দ্র' শব্দ আছে। কে ইন্দ্র?—তিনি স্বয়ং নারায়ণ, ভগবান্। 'ইদন্দ্র'—যিনি জগৎকে নিয়মিত—Control করছেন, নিয়ামক, তিনি হলেন ইন্দ্র। সুতরাং ইন্দ্র শব্দের মুখ্যার্থ বিষ্ণু, নারায়ণ। যিনি সমগ্র জগৎকে নিয়মিত করছেন। বেদের মধ্যে সব শব্দগুলো এইভাবে রয়েছে। ভগবানের মুখ্যনাম, গৌণনাম ভেদে সেইগুলো এইভাবে বিভাগ করা হয়েছে। তথাপি মূল বস্তুকে যখন লক্ষ্য করতে চাই, তখন কিছু বিশেষণ বা উপসর্গ প্রয়োগ করতে হয়। এই মুখ্যনামগুলো হল কৃষ্ণ, হরি, মুকুন্দ, মুরারি, ইত্যাদি। সেই মুখ্যনামে আহ্বান করার রীতি আছে শাস্ত্রে। মুখ্যনামে ডাকলে ভগবান্ তাড়াতাড়ি ধরা দেন, দেখা দেন।

শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু জগতে আবির্ভূত হলেন। তাঁর আবির্ভাবের কথা ভাগবতে, পুরাণে, উপনিষদে সর্ব্বত্রই বলা আছে। যারা প্রমাণ করতে চাচ্ছেন যে, মানুষই অবতার, তারা প্রমাণ দিন। প্রমাণ দিতে পারবেন না তারা, প্রমাণ দেওয়ার কোন ক্ষমতা নাই। চৈতন্যমহাপ্রভু যে অবতার, তার ভুরি ভুরি প্রমাণ শাস্ত্রে রয়েছে। উপনিষদের মধ্যেও প্রমাণ রয়েছে।

ব্রহ্মার নিকটে গেছেন তাঁর পুত্র পিপ্পলাদ ব্রহ্মতত্ত্ব জানবার জন্য। ব্রহ্মা তাঁকে ব্রহ্মতত্ত্ব বললেন। তখন পিপ্পলাদ বললেন,—এই যে দারুণ কলিকাল আসছে, এই কলিকালে প্রজারা কিভাবে উদ্ধারলাভ করবেন? প্রশ্ন হয়েছে,—'ভগবন্! কলৌ পাপাচ্ছন্নাঃ প্রজাঃ কথং মুচ্যেরন্নিতি। স হোবাচ। 'রহস্যং তে বদিষ্যামি।' তোমাকে রহস্য বলছি,—'জাহ্নবীতীরে নবদ্বীপে গোলোকাখ্যে ধাম্নি গোবিন্দো দ্বিভুজো গৌরঃ সর্ব্বাত্মা মহাপুরুষো মহাত্মা মহাযোগী ত্রিগুণাতীতঃ সত্ত্বরূপো ভক্তিং লোকে কাশ্যতীতি। তদেতে শ্লোকা ভবন্তি।' ব্রহ্মা তাঁর জ্যেষ্ঠপুত্র অথর্ব্বকে উপদেশ করছেন,—

ব্রহ্মা দেবানাং প্রথমঃ সম্বভূব বিশ্বস্য কর্ত্তা ভুবনস্য গোপ্তা।
স ব্রহ্মবিদ্যাং সর্ব্ববিদ্যাপ্রতিষ্ঠামথর্ব্বায় জ্যেষ্ঠপুত্রায় প্রাহ॥

এইটাই হল ব্রহ্মবিদ্যা। সেই ব্রহ্মবিদ্যা গুরু-পরম্পরাক্রমে এ জগতে আবির্ভূত হয়েছে। সেই কথাই শাস্ত্রে বলা হয়েছে। তার Line আছে, Proper chanel আছে। সেই অনুসারে আমাদের চলতে হয়। ভগবৎকথা ঐভাবে এসেছে।

শ্রুতি কাকে বলে?—বেদের অপর নাম শ্রুতি। কানে কানে—শ্রৌত-পন্থায় এসেছে বলে শ্রুতি নাম হয়েছে। পরে লিপির মধ্যে এসেছে। আগে লিপি ছিল না। শ্রুতি কানে কানে ছিল। পরে যখন লেখঃপ্রণালী সৃষ্টি হয়েছে, তখন তার ভিতরে লিখতে আরম্ভ হয়েছে। লেখঃপ্রণালী এল কোথা থেকে? আপনারা বলবেন, আমাদের দেশে দু-এক হাজার বৎসর আগে বোধ হয় কেউ লেখাপড়া করেছেন ঐভাবে। তা নয়। ভগবান্ থেকে নারায়ণ থেকে এসেছে এই লেখঃপ্রণালী। লেখঃপ্রণালী চার রকমের—বাঁদিক থেকে ডানদিকে, ডানদিক থেকে বাঁদিকে, উপর থেকে নীচে, নীচ থেকে উপরে। উপর থেকে নীচে এবং নীচের থেকে উপরে যে লেখঃপ্রণালী, এটা হল Picture writing। চীন, জাপান প্রভৃতি দেশে এগুলো প্রচলিত আছে। ডানদিক থেকে বাঁদিকে আরবী, ফার্সী, উর্দ্দু লেখা। আর বাঁদিক থেকে ডানদিকে ব্রাহ্মী লেখনী। সংস্কৃত ইত্যাদি ব্রাহ্মী লেখনী। ব্রাহ্মী, খরোষ্ঠী, সান্কী, পুষ্করাসাদি চার রকমের লেখঃপ্রণালী এল কোথা থেকে? এই যে বর্ণমালা—অ, আ, ক, খ কোথা থেকে এল? কে সৃষ্টি করেছেন? কোন মানুষ সৃষ্টি করেছেন?—'নারায়ণাদুদ্ভূতোঽয়ং বর্ণক্রমঃ'—এই বর্ণক্রম নারায়ণ থেকে Generated হয়েছে। ওঁকার এর উৎপত্তি কোথা থেকে হল?—'নারায়ণাৎ'—নারায়ণের থেকে। ওঁকারের ব্যাখ্যা দিয়েছেন। ওঁকারের আজকাল অপব্যাখ্যা চলছে। শাস্ত্রে কি ব্যাখ্যা দিচ্ছেন এই অ, উ, ম তিন অক্ষর নিয়ে?—

> "অ-কারেণোচ্যতে কৃষ্ণঃ সর্ব্বলোকৈকনায়কঃ।
> উ-কারেণোচ্যতে রাধা ম-কারো জীববাচকঃ॥"

শক্তি, শক্তিমান্ তত্ত্ব। তার ব্যাখ্যা দিয়েছেন ওখানে। অর্থাৎ পরমোপাস্য তত্ত্ব হলেন শক্তি-শক্তিমান্ তত্ত্ব। আর যাঁরা উপাসক বা উপাসিকা, তাঁরা হলেন জীবতত্ত্ব। ভক্ত ভক্তিযোগের দ্বারা ভগবানকে লাভ করবেন, সেই রীতি শাস্ত্রে লিপিবদ্ধ হয়েছে। ভগবানকে যদি আমরা পেতে চাই তাহলে সাধন-ভজনের প্রয়োজন আছে। সাধন-ভজন না হলে হবে না। একটা কথা আমরা সবসময় শুনতে পাই—'কষ্ট করলে কেষ্ট পায়।'—যদি কষ্ট করা যায় তবে না তার ফললাভ। সাধন-ভজনের যে ক্লেশ স্বীকার, ওটা করতে হবে, তা না হলে আমরা ভাল কিছু পাচ্ছি না। (ক্রমশঃ)

দামবন্ধন-লীলার তাৎপর্য্য

কত সাধ মনে, মোর বাছাধনে,
সহস্তে খাওয়াব নবনী।
পরের ঘরেতে, প্রতি পরভাতে,
যাইবে না খেতে নীলমণি॥
গোপাল-জননী, নন্দের ঘরণী,
ভাবে মনে মনে যখনি।
বিধাতা সহায়, সবে বাহিরায়,
আন কাজে সাজি তখনি॥
সেইদিন আঙ্গিনাতে, নন্দরাণী পরভাতে,
দধিমন্থন করেন আপনি।
হেনকালে পুত্রলীলা, গাহিতে হৈলা বিহ্বলা,
তালে তালে নাচান মাতনি॥
অঙ্গের আভরণ সব, রুনু ঝুনু করে রব,
তাল মান লয় রসে সবে।
রাগ-রাগিনী মূর্চ্ছনা, আনন্দে পূর্ণ আঙ্গিনা,
নন্দরাণী মনে কত ভাবে॥
আমার পুত্রের কথা, স্মরিলে মনের ব্যাথা,
কভু কারো রহে না, রহে না।
স্মরিলে আনন্দ হয়, দূরে যায় ভবভয়,
যশোদা তাহার নিদর্শনা॥
পরিধানে ক্ষৌমবাস, বদনে অমিয় হাস,
কটিদেশে সুবর্ণ কিঙ্কিনী।
করবী মালতী মালে, ঢাকা কর্ণ কুন্তলে,
শোভিত শ্রীঅঙ্গ মণি জিনি॥
নবনী মন্থন শ্রমে, স্বেদবিন্দু পড়ে ভূমে,
যেন শ্যামনীরে মুক্তা ফল।

সুন্দর কৃষ্ণের মা,　　সুন্দরী কেন বা না,
হইবে সকলি সুমঙ্গল ॥
স্তন্যপান অভিলাষে,　　শ্রীকৃষ্ণ তখন আসে,
মন্থনরতা জননী সকাশে।
উপনীত হইয়া তবে,　　পরমানন্দ স্বভাবে,
ধরে মন্থনদণ্ড একাংশে ॥
দধিমন্থন নিষেধি',　　পাইয়াছে ক্ষুধা বৃদ্ধি,
স্তন্যদুগ্ধ শীঘ্র দেহ মোরে।
বুঝিয়া পুত্র ইঙ্গিত,　　যশোমতী আনন্দিত,
কোলে তুলি' লইলা বাছারে ॥
তবে যশোমতী মাতা,　　পুত্রে আনন্দিত জ্ঞাতা,
হাস্যমুখ করে দরশন।
করি মাতা নিরীক্ষণ,　　ঝরে স্বতঃস্নেহে স্তন,
যতনে করায় দুগ্ধ পান ॥
সেইক্ষণে চুল্লীপর,　　আরোপিত দুগ্ধভার,
অগ্নিতাপে হয় উচ্ছলিত।
দুগ্ধপানে নহে তৃপ্ত,　　পরিত্যাগ করি সুত,
ত্বরা করি চলে হৈয়া ব্যস্ত ॥
ক্রুদ্ধ হইয়া নন্দন,　　বৃথা অশ্রু বরিষণ,
অরুণ অধর কম্পমান।
দন্ত দিয়া ওষ্ঠ দংশে,　　শিলাপুত্র লৈয়া শেষে,
দধিভাণ্ড করেন ভঞ্জন ॥
গৃহমধ্যে অতঃপর,　　যায় অতি শীঘ্রতর,
নিরজনে নবনী ভোজন।
সদ্যজাত নবনীত,　　পাইয়া হৈলা আনন্দিত,
উল্লাসে করয়ে আস্বাদন ॥ (ক্রমশঃ)

—শ্রীনকুলচন্দ্র সাহা
'হা গৌরাঙ্গ কুটীর', তমালতলা, নবদ্বীপ (নদীয়া)

শ্রীশ্রীজন্মাষ্টমী-মহোৎসব

শ্রীমেঘালয় গৌড়ীয় মঠ, তুরা

অখিল লোকশিক্ষক স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের শুভাবির্ভাব-তিথি—শ্রীশ্রীজন্মাষ্টমী উপলক্ষে শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির মেঘালয় প্রদেশান্তর্গত তুরা সহরস্থ অন্যতম প্রচারকেন্দ্র শ্রীমেঘালয় গৌড়ীয় মঠে পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৎসরের ন্যায় বর্ত্তমান বর্ষেও সভাপতি-আচার্য্য ওঁ বিষ্ণুপাদ ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত বামন গোস্বামী মহারাজের আনুগত্যে 'শ্রীশ্রীজন্মাষ্টমী-তিথি' মহাসমারোহে উদ্‌যাপিত হয়। এতদুপলক্ষে শ্রীসমিতির মূলকেন্দ্র শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠ হইতে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত সন্ন্যাসী মহারাজ এবং ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি-বেদান্ত আচার্য্য মহারাজ (যুগ্ম-সম্পাদক) কতিপয় ব্রহ্মচারীসহ উপস্থিত হন।

গত ১৫ই ভাদ্র, ১৩৯৮ (ইং ১।৯।৯১) রবিবার অর্থাৎ শ্রীজন্মাষ্টমীর পূর্ব্ব-দিবস শ্রীমন্দিরসহ শ্রীমঠের প্রবেশদ্বার পূর্ণকুম্ভসহ কদলীবৃক্ষ আম্রপল্লব, বিচিত্র রঙ্গিন কাগজ ও পুষ্পরাজি প্রভৃতি মাঙ্গলিক দ্রব্যসমূহদ্বারা সুসজ্জিত করা হয়। শ্রীমঠের একপার্শ্বে শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের ও শ্রীমন্মহাপ্রভুর বিভিন্ন লীলাসমূহ মৃন্ময়ীমূর্ত্তির সাহায্যে প্রদর্শনী করা হইয়াছিল। উক্ত প্রদর্শনীগুলি বিচিত্র বর্ণের বৈদ্যুতিক আলোর সাহায্যে সজ্জিত করায় উহা দর্শকবৃন্দের অত্যন্ত প্রাণাকর্ষী হইয়াছিল। সন্ধ্যায় শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারী-রাধাবিনোদবিহারীজীউর আরাত্রিকান্তে অধিবাস-কীর্ত্তনপূর্ব্বক শ্রীজন্মাষ্টমী-মহোৎসবের সঙ্কল্প গৃহীত হয়।

পূর্ব্বপ্রচারিত নিমন্ত্রণ-পত্রানুযায়ী ১৬ই ভাদ্র (ইং ২।৯।৯১) সোমবার ভোরে মঙ্গলারাত্রিকান্তে প্রাতঃ ৭-৩০ মিনিটে সুসজ্জিত মোটরগাড়ীতে শ্রীগুরুবর্গের ও শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের অর্চ্চালেখ্য লইয়া শঙ্খ, ঘণ্টা, খোল, করতাল সহযোগে বিরাট্ নগর-সঙ্কীর্ত্তন তুরা-সহরের বিভিন্ন রাজপথ পরিক্রমা করা হয়। নগর-সঙ্কীর্ত্তনে স্থানীয় প্রশাসনের ভূমিকা বিশেষ প্রশংসনীয়।

নগর-পরিক্রমান্তে সারাদিন শ্রীশ্রীকৃষ্ণপ্রেমতরঙ্গিণী পারায়ণ হয়। বৈকাল ৫ ঘটিকায় ব্রহ্মচারিগণ শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীজীউর ও শ্রীনৃসিংহদেবের জয়ধ্বনিপূর্ব্বক শ্রীগুরু-বন্দনা, বৈষ্ণব-বন্দনা, পঞ্চতত্ত্ব, দশাবতার-স্তোত্রম্ প্রভৃতি মহাজন-পদাবলী কীর্ত্তনপূর্ব্বক সভার কার্য্য শুরু করেন। শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত আচার্য্য মহারাজ সভাপতির আসন গ্রহণ করিলে পর প্রধান

অতিথি Prof. T. K. Das (Tura Govt. College, Dept. of Phil.), ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমৎ সন্ন্যাসী মহারাজ, শ্রীমৎ যতি মহারাজ, শ্রীবলভদ্র ব্রহ্মচারী প্রমুখ বক্তৃগণ "ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ এবং তাঁহার দর্শন" প্রসঙ্গে বক্তৃতা প্রদান করেন।

১৭।৫।৯৮ (ইং ৩।৯।৯১) তারিখে অর্থাৎ নন্দোৎসব দিবসে বেলা ১২টা হইতে রাত্রি ৯টা পর্য্যন্ত জাতি-ধর্ম্ম-নির্ব্বিশেষে আহূত, অনাহূত, রবাহূত সকল ভক্তগণকে বিচিত্র মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়।

সন্ধ্যা ৬ ঘটিকায় পূর্ব্বদিবসের ন্যায় ব্রহ্মচারিগণ সুললিত কণ্ঠে মহাজন পদাবলী কীর্ত্তন করেন। তদনন্তর শ্রীমৎ আচার্য্য মহারাজ সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। অতঃপর "শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু এবং সনাতন ধর্ম্ম" বিষয়ে প্রধান-অতিথি Prof. K. P. Chowdhury (Dept. of Phil., Tura Govt. College), শ্রীমৎ সন্ন্যাসী মহারাজ, শ্রীবলভদ্র ব্রহ্মচারী, Mr. R. N. Pandey (Headmaster, Tura Hindi High School), Prof. Girish Kumar (Don Bosco College, Dept. of Phil.) প্রমুখ বক্তৃগণ বক্তৃতা প্রদান করেন।

১৮।৫।৯৮ (ইং ৪।৯।৯১) তারিখে শ্রীসমিতি পরিচালিত শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত বিদ্যাপীঠের (English medium school) ছাত্রছাত্রীগণের বার্ষিক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আরম্ভ হয়। শ্রীমৎ আচার্য্য মহারাজ কৃতি ছাত্রছাত্রীগণকে পুরস্কার বিতরণ করেন। বলাবাহুল্য প্রত্যহ সভাশেষে শ্রীশ্যামলকৃষ্ণ দাসাধিকারী মহোদয় রামায়ণ গান পরিবেশন করেন।

শ্রীবিনোদবিহারী গৌড়ীয় মঠ, কলিকাতা

বর্ত্তমান বর্ষে শ্রীসমিতির সভাপতি-আচার্য্য ওঁ বিষ্ণুপাদ ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তি-বেদান্ত বামন গোস্বামী মহারাজের আনুগত্যে এবং সাক্ষাৎ উপস্থিতিতে কলিকাতাস্থ প্রচারকেন্দ্র শ্রীবিনোদবিহারী গৌড়ীয় মঠে শ্রীশ্রীজন্মাষ্টমী-মহোৎসব মহাসমারোহে উদ্‌যাপিত হয়। এতদুপলক্ষে ব্রহ্মচারিগণ শ্রীমঠপ্রাঙ্গণ ও শ্রীমন্দির বিবিধ রঙ্গিন কাগজ, ফুলমালা, আম্রপল্লব ও কদলীবৃক্ষদ্বারা সুসজ্জিত করেন। শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের বিবিধ লীলাসমূহ—কংস-কারাগারে শ্রীকৃষ্ণের জন্ম, বসুদেবের নন্দালয়ে গমন, পূতনা বধ, ননী চুরি, কালীয় দমন, বকাসুর বধ, কংস বধ ও গিরিগোবর্দ্ধন-ধারণ প্রভৃতির প্রদর্শনী করা হয়।

জন্মাষ্টমী-তিথিতে ব্রহ্মচারিগণ উপবাসমুখে সারাদিন শ্রীশ্রীকৃষ্ণপ্রেমতরঙ্গিণী

পারায়ণ করেন। সন্ধ্যায় শ্রীশ্রীরাধাবিনোদবিহারীজীউ ও শ্রীমন্মহাপ্রভুর আরাত্রিকান্তে ব্রহ্মচারিগণ মহাজন-পদাবলী কীর্ত্তন করেন। কীর্ত্তনান্তে শ্রীল গুরু-মহারাজ 'শ্রীশ্রীজন্মাষ্টমী-তিথি-বিচার' প্রসঙ্গে শাস্ত্রীয় তত্ত্বসিদ্ধান্তপূর্ণ ভাবগম্ভীর বক্তৃতা প্রদান করেন। বক্তৃতান্তে শ্রীকৃষ্ণের শুভাবির্ভাব-মুহূর্ত্তে অর্থাৎ রাত্রি ১২টায় শ্রীকৃষ্ণের মহাভিষেক, ভোগরাগ ও আরতি কীর্ত্তন হয়। তৎপরে উপবাসী ভক্তগণকে বিবিধ ফলমূলাদি অনুকল্প প্রদান করা হয়।

১৭ই ভাদ্র, মঙ্গলবার (ইং ৩।৯।৯১) অর্থাৎ নন্দোৎসব-দিবসে মধ্যাহ্ন ভোগরাগ ও আরাত্রিকের পর আহূত, রবাহূত প্রায় সহস্রাধিক জনসাধারণকে বিচিত্র সুস্বাদু মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়।

এই মহোৎসবে ব্রহ্মচারিগণের সেবাপ্রচেষ্টা বিশেষ প্রশংসনীয়া। এই অনুষ্ঠানে সাহায্যকারী সহৃদয় মহৎ ব্যক্তিগণের নিকট আমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেছি। শ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণবগণের প্রতি তাঁহাদের ভক্তি-শ্রদ্ধা-বিশ্বাস উত্তরোত্তর বৃদ্ধি হউক—ইহাই শ্রীভগবচ্চরণে প্রার্থনা।

বলাবাহুল্য, এই শ্রীজন্মাষ্টমী-মহোৎসব শ্রীসমিতির মূলকেন্দ্র নবদ্বীপস্থ শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠ ও মথুরা-বৃন্দাবনস্থ শাখামঠে বিশেষভাবে এবং অন্যান্য প্রচারকেন্দ্রসমূহে যথারীতি পালিত ও অনুষ্ঠিত হইয়াছে।

—নিজস্ব-সংবাদ

শ্রীচৈতন্যের মর্ত্ত্যবুদ্ধি—নাস্তিকতা ও অপরাধ

(পূর্ব্বপ্রকাশিত ৪৩শ বর্ষ, ৭ম সংখ্যা, ২১১ পৃষ্ঠার পর)

পুস্তকের ২৮৪ পৃষ্ঠায় "শেষলীলা বা অন্ত্যলীলার ক্ষেত্রে"—কথাটিতে প্রতীয়মান হয় যে, লেখক শ্রীচৈতন্যদেবের শেষলীলা বলিতে অন্ত্যলীলাকেই উদ্দেশ করিয়াছেন। কিন্তু শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে স্পষ্ট উল্লেখ আছে যে, মহাপ্রভুর গার্হস্থ্য লীলাই আদিলীলা এবং সন্ন্যাস লীলাই মধ্য ও অন্ত্যলীলা। যথা—শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত বাণী,—

"চব্বিশ বৎসর প্রভুর গৃহে অবস্থান।
তাঁহা যে করিলা লীলা—'আদিলীলা' নাম॥
চব্বিশ বৎসর শেষে যেই মাঘ মাস।
তার শুক্লপক্ষে প্রভু করিলা সন্ন্যাস॥

সন্ন্যাস করিয়া চব্বিশ বৎসর অবস্থান।
তাঁহা যেই লীলা, তার 'শেষলীলা' নাম॥
শেষলীলার 'মধ্য' 'অন্ত্য',—দুই নাম হয়।
লীলাভেদে বৈষ্ণব সব নাম-ভেদ কয়॥
তার মধ্যে ছয় বৎসর—গমনাগমন।
নীলাচল-গৌড়-সেতুবন্ধ-বৃন্দাবন॥
তাঁহা যেই লীলা, তার মধ্যলীলা নাম।
তার পাছে লীলা—'অন্ত্যলীলা' অভিধান॥"

(চৈঃ চঃ মধ্য ১।১৫-২০)

"গার্হস্থ্য প্রভুর লীলা—আদি-লীলাখ্যান।
'মধ্য'-'অন্ত্য'লীলা—শেষলীলার দুই নাম॥

(চৈঃ চঃ আদি ১৩।১৪)

"এই 'মধ্যলীলা' নাম—লীলা-মুখ্যধাম।
শেষ অষ্টাদশ বর্ষ—'অন্ত্যলীলা' নাম॥
তার মধ্যে ছয় বৎসর ভক্তগণ-সঙ্গে।
প্রেমভক্তি লওয়াইল নৃত্য-গীত-রঙ্গে॥
দ্বাদশ বৎসর শেষ রহিলা নীলাচলে।
প্রেমাবস্থা শিখাইলা আস্বাদন-চ্ছলে॥
রাত্রি-দিবসে কৃষ্ণ বিরহ-স্ফুরণ।
উন্মাদের চেষ্টা করে প্রলাপ-বচন॥"

(চৈঃ চঃ আদি ১৩।৩৭-৪০)

সুতরাং মহাপ্রভুর শেষ অষ্টাদশ বর্ষই অন্ত্যলীলা নামে অভিহিত। লেখক 'চৈতন্যচরিতামৃতের' আদিলীলায় 'চৈতন্যের শেষলীলা রহিল অবশেষ"—পয়ারটি পুস্তিকায় লিখিয়াছেন, কিন্তু ইহার পূর্ব্ব পয়ারটি লেখেন নাই। ঐ পূর্ব্ব পয়ারটিতে বর্ণিত আছে যে, বৃন্দাবন দাসের প্রতি নিত্যানন্দের লীলা বর্ণনে আবেশ হওয়ায় শ্রীচৈতন্যের শেষলীলা বর্ণনা 'চৈতন্যভাগবতে' অসম্পূর্ণ থাকিয়া যায়। যথা—

"নিত্যানন্দ-লীলা-বর্ণনে হইল আবেশ।
চৈতন্যের শেষ-লীলা রহিল অবশেষ॥ (চৈঃ চঃ আঃ ৮।৪৮)
"সেই সব লীলার শুনিতে বিবরণ।
বৃন্দাবনবাসী ভক্তের উৎকণ্ঠিত মন॥" (চৈঃ চঃ আঃ ৮।৪৯)

শ্রীমন্মহাপ্রভুর অসম্পূর্ণ শেষলীলা শ্রবণ করিবার জন্য বৃন্দাবনবাসী গৌরগতপ্রাণ ভক্তগণ উৎকণ্ঠিত হন এবং বৈষ্ণবসভায় কবিরাজ গোস্বামীকে শ্রীচৈতন্যের শেষলীলা বর্ণিতে আদেশ হয়। তখন কবিরাজ গোস্বামী বৈষ্ণবাদেশে সসম্ভ্রমে শ্রীমদনগোপালের আজ্ঞা যাজ্ঞা করেন। মদনগোপালের চরণে আজ্ঞা মাগিতেই সর্ব্ব-বৈষ্ণব-সম্মুখে মদনগোপালের কণ্ঠ হইতে মালা খসিয়া পড়ে। সেই আজ্ঞা-মালা পূজারীজী গোসাঞিদাস আনিয়া কবিরাজ গোস্বামিপাদের গলায় পরাইয়া দিলে তিনি আজ্ঞা-মালা পাইয়া পরমানন্দে গ্রন্থ লেখা আরম্ভ করেন। তাঁহার গ্রন্থ-রচনায় মদনমোহনেরই সম্পূর্ণ কর্ত্তৃত্ব বা প্রেরণা :—

"এই গ্রন্থ লেখায় মোরে 'মদনমোহন'।
আমার লিখন যেন শুকের পঠন॥
সেই লিখি, মদনগোপাল যে লিখায়।
কাষ্ঠের পুত্তলী যেন কুহকে নাচায়॥" (চৈঃ চঃ আঃ ৮।৭৮-৭৯)

এমতাবস্থায় বৃন্দাবনদাস ঠাকুর শ্রীচৈতন্যের শেষলীলার অবশেষ রাখিয়াছিলেন এবং সেই অবশিষ্ট লীলা বৃন্দাবনবাসী ভক্তগণ জানিতে উৎকণ্ঠিত হন—ইহা 'শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে' উল্লিখিত আছে। কাজেই 'শ্রীচৈতন্যের শেষলীলা রহিল অবশেষ'—বলিতে 'শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে' কবিরাজ গোস্বামী শেষলীলা অসম্পূর্ণ রাখিয়াছেন—এইরূপ বুঝায় না। ঐ শ্লোকের অর্থে লেখক ধারণা করিয়াছেন যে, কবিরাজ গোস্বামী 'চৈতন্যচরিতামৃতে' মহাপ্রভুর শেষলীলার অবশিষ্ট লেখেন নাই। বস্তুতঃ লেখকের এইরূপ ধারণা সম্পূর্ণ ভ্রমাত্মক।

লেখক ২৮৪ পৃষ্ঠাতে চৈতন্যচরিতামৃতের মধ্যলীলার যে শ্লোকটির উল্লেখ করিয়াছেন, সেই শ্লোকটি নিম্নরূপ হইবে ;—

"শেষ-লীলার সূত্রগণ, কৈলুঁ কিছু বিবরণ,
ইহা বিস্তারিতে চিত্ত হয়।
থাকে যদি আয়ুঃ-শেষ, বিস্তারিব লীলা-শেষ,
যদি মহাপ্রভুর কৃপা হয়॥" (চৈঃ চঃ মধ্য ২।৮৯)

(ক্রমশঃ)

—শ্রীচৈতন্যকৃষ্ণ দাসাধিকারী

॥ শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ ॥

স বৈ পুংসাং পরো ধর্ম্মো যতো ভক্তিরধোক্ষজে ।

ধর্ম্মঃ স্বনুষ্ঠিতঃ পুংসাং বিষ্বক্‌সেন-কথাসু যঃ ।

নোৎপাদয়েদ্‌যদি রতিং শ্রম এব হি কেবলম্‌ ॥

অহৈতুক্যপ্রতিহতা যয়াত্মা সুপ্রসীদতি ॥

সেই ধর্ম্ম শ্রেষ্ঠ যাতে আত্ম-পরসন্ন ।
অধোক্ষজে অহৈতুকী ভক্তি বিঘ্নশূন্য ॥

অন্য ধর্ম্ম সুষ্ঠুরূপে পালে যেই জন ।
হরি-কথায় রতি নৈলে পণ্ড সেই শ্রম ॥

৪৩শ বর্ষ { ২৫ দামোদর, বাসুদেব, ৫০৫ শ্রীগৌরাব্দ
৩০ কার্ত্তিক, রবিবার, ১৩৯৮, ইং ১৭।১১।৯১ } ৯ম সংখ্যা

শ্রীকৃষ্ণ—স্তোত্রম্

[শ্রীনারদপঞ্চরাত্রে প্রথমৈকরাত্রে দ্বাদশোঽধ্যায়ে]

১। বন্দে নবঘন-শ্যামং পীত-কৌষেয়-বাসসম্ ।
সানন্দং সুন্দরং শুদ্ধং শ্রীকৃষ্ণং প্রকৃতেঃ পরম্ ॥ ৬৭ ॥

উপবর্হণ-গন্ধর্ব্ব (শ্রীনারদ) বলিলেন,—নব-ঘনশ্যাম, পীত-কৌষেয়বসনধারী, আনন্দময়, সুন্দর, পরম-পবিত্র, জড়া প্রকৃতির অতীত শ্রীকৃষ্ণকে আমি প্রণাম করি ॥ ৬৭ ॥

২। রাধেশং রাধিকা-প্রাণবল্লভং বল্লবী-সুতম্ ।
রাধা-সেবিত-পাদাব্জং রাধা-বক্ষঃস্থল-স্থিতম্ ॥ ৬৮ ॥

৩। রাধানুগং রাধিকেষ্টং রাধাপহৃত-মানসম্ ।
রাধাধারং ভবাধারং সর্ব্বাধারং নমামি তম্ ॥ ৬৯ ॥

যিনি রাধাকান্ত, রাধিকার প্রাণবল্লভ ও বল্লবী-পুত্র, যাঁহার শ্রীপাদপদ্ম রাধাকর্ত্তৃক নিসেবিত ও তৎবক্ষঃস্থলস্থিত এবং যিনি রাধার অনুগামী, রাধা যাঁহার ধ্যেয়, রাধাকর্ত্তৃক যাঁহার চিত্ত অপহৃত, যিনি রাধার আধার, বিশ্বের আধার ও সকলের আধার, সেই আপনাকে আমি নমস্কার করি ॥ ৬৮-৬৯ ॥

৪। রাধা-হৃৎপদ্ম-মধ্যে চ বসন্তং সন্ততং শুভম্।
রাধা-সহচরং শশ্বৎ রাধাজ্ঞা-পরিপালকম্ ॥ ৭০ ॥

৫। ধ্যায়ন্তে যোগিনো যোগাৎ সিদ্ধাঃ সিদ্ধেশ্চরাশ্চ যম্।
তং ধ্যায়েৎ সততং শুদ্ধং ভগবন্তং সনাতনম্ ॥ ৭১ ॥

যিনি রাধার হৃৎকমলে নিত্য বিরাজমান ও সর্ব্বমঙ্গলদায়ক, যিনি রাধার চির-সহচর ও আজ্ঞা-পালক এবং সিদ্ধ, সিদ্ধেশ্বর ও যোগিগণ সমাধি অবলম্বন-পূর্ব্বক সতত যাঁহার ধ্যানমগ্ন, আমি সেই বিশুদ্ধ-সত্বময় সনাতন ভগবানের ধ্যান করি ॥ ৭০-৭১ ॥

৬। সেবন্তে সততং সন্তো ব্রহ্মেশ-শেষ সংজ্ঞকাঃ।
সেবন্তে নিগুণং ব্রহ্ম ভগবন্তং সনাতনম্ ॥ ৭২ ॥

৭। নির্লিপ্তঞ্চ নিরীহঞ্চ পরমাত্মানমীশ্বরম্।
নিত্যং সত্যঞ্চ পরমং ভগবন্তং সনাতনম্ ॥ ৭৩ ॥

ব্রহ্মা, শিব ও অনন্তদেব যাঁহাকে সর্ব্বদা সেবা করেন, এবং সাধুগণ যাঁহার নির্গুণ (অপ্রাকৃত) সনাতন পরব্রহ্মরূপ ভগবৎ-স্বরূপের সেবা করিয়া থাকেন, যিনি নির্লিপ্ত, নিরীহ, পরমাত্মা ও নিত্য, সত্য, পরমেশ্বর, আমি সেই সনাতন ভগবানের বন্দনা করি ॥ ৭২-৭৩ ॥

৮। যং সৃষ্টেরাদিভূতঞ্চ সর্ব্ববীজং পরাৎপরম্।
বীজং নানাবতারাণাং সর্ব্বকারণ-কারণম্ ॥ ৭৪ ॥

৯। বেদাবেদ্যং বেদ-বীজং বেদ-কারণ-কারণম্।
যোগিনস্তং প্রপদ্যন্তে ভগবন্তং সনাতনম্ ॥ ৭৫ ॥

যিনি সৃষ্টির আদি-কারণ, সর্ব্ব-বীজাধার, পরাৎপর-তত্ত্ব, নিখিল-অবতারাবলীর বীজ-স্বরূপ, সকল কারণের-কারণ, নিখিলদেবের অগোচর, বেদের বীজ-স্বরূপ এবং বেদের মূলীভূত কারণ, (ভক্ত)-যোগিগণ সেই সনাতন ভগবানের ভজনা করেন ॥ ৭৪-৭৫ ॥

১০। ইতি তেন (গন্ধর্ব্বেণ) কৃতং স্তোত্রং য পঠেৎ প্রযতঃ শুচিঃ।
ইহৈব জীবন্মুক্তশ্চ পরে যাতি পরাং গতিম্ ॥ ৭৭ ॥

১১। হরিভক্তিং হরের্দাস্যং গোলোকে চ নিরাময়ঃ।
পার্ষদ-প্রবরত্বঞ্চ লভতে নাত্র সংশয়ঃ ॥ ৭৮ ॥

গন্ধর্ব্ব-(শ্রীনারদ) কৃত এই স্তোত্র যিনি পবিত্রভাবে সংযত-চিত্তে নিত্য পাঠ করেন, তিনি ইহলোকে জীবন্মুক্ত হন এবং প্রাণান্তে নিত্য গোলোকে উত্তমা গতি—হরিভক্তি, শ্রীহরির দাসত্ব ও পার্ষদত্ব লাভ করেন, তাহাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই ॥ ৭৭-৭৮ ॥

প্রশ্নোত্তর

(সম্বন্ধতত্ত্ব, আম্নায় ও গুরুতত্ত্ব)

১। সম্বন্ধতত্ত্ব ও সম্বন্ধজ্ঞান কি ?

"সম্বন্ধতত্ত্বে তিনটী বিষয়ের পৃথক্ পৃথক্ শিক্ষা আছে—জড়জগৎ বা মায়িক তত্ত্ব, জীব বা অধীনতত্ত্ব ও ভগবান্ বা প্রভুতত্ত্ব। ভগবান্ এক ও অদ্বিতীয়, সর্ব্বশক্তিসম্পন্ন, সর্ব্বাকর্ষক, ঐশ্বর্য্য ও মাধুর্য্যের একমাত্র নিলয়, মায়া ও জীবশক্তির একমাত্র আশ্রয়। তিনি মায়া ও জীবের আশ্রয় হইয়াও সর্ব্বদা স্বন্দরূপে একটী স্বতন্ত্র-স্বরূপ। তাঁহার অঙ্গকান্তি সুদূরবর্ত্তী হইয়া নির্ব্বিশেষ-ব্রহ্মরূপে প্রতিভাত। তাঁহার ঐশীশক্তি জগৎ ও জীব সৃষ্টি করিয়া অংশে পরমাত্ম-স্বরূপে জগৎপ্রবিষ্ট ঈশ্বরতত্ত্ব। ঐশ্বর্য্য-প্রধান-প্রকাশে তিনি পরব্যোমে নারায়ণ। মাধুর্য্য-প্রকাশে তিনি গোলোক-বৃন্দাবনে গোপীজনবল্লভ শ্রীশ্রীকৃষ্ণচন্দ্র। তাঁহার প্রকাশ ও বিলাস-সমুদয় নিত্য ও অনন্ত। তাঁহার সমান কেহ বা কিছুই নাই। তাঁহার অধিকের ত' কথাই নাই। তাঁহার পরাশক্তিক্রমে সমস্ত প্রকাশ ও বিলাস। পরাশক্তির বিবিধ বিক্রমের মধ্যে জীবের নিকট তিনটী বিক্রমের পরিচয়মাত্র আছে। একটীর নাম চিদ্বিক্রম—যদ্দ্বারা তাঁহার লীলা-সম্বন্ধে সমস্তই সিদ্ধ হইয়াছে। আর একটীর নাম জীব-বিক্রম বা তটস্থ-বিক্রম—যদ্দ্বারা অনন্ত জীবের উদয় ও অবস্থিতি। তৃতীয় বিক্রমের নাম মায়া-বিক্রম—যদ্দ্বারা জগতের সমস্ত মায়িক বস্তু, কাল ও কর্ম্মের সৃষ্টি হইয়াছে। জীবের সহিত ভগবানের যে সম্বন্ধ, ভগবানের সহিত জীবের ও জড়ের যে সম্বন্ধ এবং জড়ের সহিত ভগবান্ ও

জীবের যে সম্বন্ধ—এই সম্বন্ধের নাম সম্বন্ধতত্ত্ব। সম্বন্ধতত্ত্ব সম্যক্ জানিতে পারিলে সম্বন্ধজ্ঞান হয়। সম্বন্ধজ্ঞানহীন ব্যক্তিগণ কোনপ্রকারেই শুদ্ধবৈষ্ণব হইতে পারেন না।"

—জৈবধর্ম্ম ৪র্থ অঃ

২। সম্বন্ধজ্ঞানযুক্ত 'অহংতা মমতা' হেয় কি ?

"এ ভক্তিবিনোদ কয়, অহংতা মমতা নয়,
শ্রীকৃষ্ণ-সম্বন্ধ-অভিমানে।
সেবায় সম্বন্ধ ধরি, অহংতা-মমতা করি,
তদিতর প্রাকৃত বিধানে॥"

—'যামুনভাবাবলী', গীঃ মাঃ

৩। আম্নায় কি ?

"বিশ্বকর্ত্তা ব্রহ্ম হইতে গুরু-পরম্পরা-প্রাপ্ত ব্রহ্মবিদ্যা নামক শ্রুতি-সকলকে 'আম্নায়' বলা হয়।"

—শ্রীমহাপ্রভুর শিক্ষা, ২য় পঃ

৪। শ্রীচৈতন্যদেবের মূল-শিক্ষা কি ?

"আম্নায়ঃ প্রাহ তত্ত্বং হরিমিহ পরমং সর্ব্বশক্তিং রসাব্ধিম্
তদ্ভিন্নাংশাংশ্চ জীবান্ প্রকৃতি-কবলিতাং তদ্বিমুক্তাংশ্চ ভাবাৎ।
ভেদাভেদপ্রকাশং সকলমপি হরেঃ সাধনং শুদ্ধভক্তিম্
সাধ্যং তৎ-প্রীতিমেবেত্যুপদিশতি জনান্ গৌরচন্দ্রঃ স্বয়ং সঃ॥"

—'দশমূলনির্য্যাস', সজ্জনতোষণী ৯।৯

৫। দশমূল কি ?

"দশমূল এই—প্রমাণ একটী অর্থাৎ আম্নায়-বাক্য এবং প্রমেয় নয়টী—(১) হরিই পরতত্ত্ব; (২) তিনি (শ্যামসুন্দর)—সর্ব্বশক্তিমান্; (৩) সেই শ্যামসুন্দর—পরম-রসময়, সংব্যোম বা পরব্যোমেই তাঁহার ধাম; (৪) জীব অনন্ত, চিৎপরমাণু ও কৃষ্ণের বিভিন্নাংশ এবং নিত্যবদ্ধ ও নিত্যমুক্ত-ভেদে জীব দুইপ্রকার; (৫) কৃষ্ণবহির্ম্মুখ জীবগণ—মায়াবদ্ধ; (৬) শুদ্ধভক্তগণ—মায়ামুক্ত; (৭) জীব ও জড়ময় সমস্ত জগৎ তাঁহার অচিন্ত্যশক্তি-প্রসূত নিত্য-ভেদাভেদ-প্রকাশ; (৮) নববিধ কৃষ্ণভক্তিই অভিধেয়-তত্ত্ব; (৯) কৃষ্ণপ্রেমই প্রয়োজন-তত্ত্ব।"

—'শ্রুতিশাস্ত্রনিন্দা', হরিনাম-চিন্তামণি

৬। তত্ত্ববস্তু এক,—না বহু ?

"তত্ত্বমেকমেবাদ্বিতীয়ম্—তত্ত্ববস্তু এক বই দুই নয়।"

—'শক্তিমত্তত্ত্ব প্রকরণ', আম্নায়সূত্রম্ ২

৭। শ্রীচৈতন্যের শিক্ষা কোথায় লিপিবদ্ধ আছে ?

"শ্রীমহাপ্রভুর যে শিক্ষা, তাহা দুই গ্রন্থে সুষ্ঠু লিখিত হইয়াছে ; তত্ত্ব-শিক্ষাটি —শ্রীব্রহ্মসংহিতায় এবং ভজন-শিক্ষাটি—শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃতে।"

—'বিজ্ঞপ্তি', কৃষ্ণকর্ণামৃত

৮। একমাত্র প্রমাণ কি ? বেদের প্রতিপাদ্য কি ?

"বেদশাস্ত্রে বিশুদ্ধ-ভক্তিই শিক্ষিত আছে। বেদবাদীদিগের প্রকৃতি-দোষে নানাপ্রকার মত ও বহুপ্রকার কর্ম্ম ও জ্ঞানের ব্যবস্থা। বস্তুতঃ বেদই মানবের একমাত্র প্রমাণ ও শিক্ষাগুরু। তাহাতে মতবাদ প্রবেশ করাইয়া শুদ্ধভক্তি-শিক্ষা হইতে পৃথক্ পৃথক্ মত প্রচারিত হইয়াছে।"

—'প্রমাণ-নির্দ্দেশ', ভাগবতার্ক মরীচিমালা ১।৬

৯। সচ্ছাস্ত্র কি ?

"এক অন্ধ অপর অন্ধকে পথ দেখাইলে উভয়ে গিয়া কূপে পতিত হয় ; তদ্রূপ অসচ্ছাস্ত্র-প্রণেতৃগণ ও তাহাদের অনুগামী অন্ধ লোকসকল কুমার্গগত ও শোচনীয়। 'সচ্ছাস্ত্র' বলিলে বেদ ও বেদানুগত শাস্ত্রকে বুঝিতে হইবে।"

—চৈতন্যশিক্ষামৃত ১।২

১০। বেদ কি ?

"যে-সে-স্থানে একখানি বেদ-গ্রন্থ পাইলেই সব স্থানে মানা যাইবে, তাহা নয়। কালে-কালে সৎসম্প্রদায়ের আচার্য্যগণ যাহা স্বীকার করিয়াছেন তাহাই 'বেদ' এবং যাহাকে প্রক্ষিপ্ত বলিয়া পরিত্যাগ করিয়াছেন, তাহা আমাদের অস্বীকার্য্য।" —জৈবধর্ম্ম ১৩শ অঃ

১১। গীতা, ভাগবত, সাত্বত-পঞ্চরাত্রাদি শাস্ত্র ও বেদের সহিত শ্রীচৈতন্য-বাণীর পার্থক্য কি ?

"গীতা শ্রীমুখ-বাক্য বলিয়া তাঁহাকে 'গীতোপনিষদ্ বলা যায় ; অতএব তাহা 'বেদ'। শ্রীগৌরাঙ্গ-শিক্ষিত দশমূলতত্ত্ব—শ্রীমুখ-বাক্য, সুতরাং তাহাও 'বেদ'। সমস্ত বেদার্থসার-সংগ্রহরূপ শ্রীমদ্ভাগবতই প্রমাণচূড়ামণি। অন্যান্য স্মৃতিশাস্ত্রোক্তি যদি বেদানুগা হয়, তাহাও সুতরাং প্রমাণ। তন্ত্রশাস্ত্র ত্রিবিধ অর্থাৎ সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক ; তন্মধ্যে 'পঞ্চরাত্র' প্রভৃতি সাত্ত্বিক তন্ত্রসকল গূঢ় বেদার্থ বিস্তার করায় 'তন্—বিস্তারে' এই ধাতু-ক্রমে তাহারাও প্রমাণ-মধ্যে গণিত।"

—জৈবধর্ম্ম ১৩শ অঃ

১২। সদ্‌গুরুর লক্ষণ কি ? কুলগুরু স্বীকার করিলে কি সদ্‌গুরুর আশ্রয় লাভ হয় না ?

"কালদোষে গুরু-সম্বন্ধে মানবগণের বিচার অত্যন্ত দূষিত হইয়াছে। আজকাল হয় কুলগুরুর নিকট অথবা যে-সে-ব্যক্তির নিকট উপদেশ গ্রহণ করা হয়, তাহাতে পরমারাধ্য গুরুদেবের আশ্রয় হইতে পারে না। শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে যে, শব্দব্রহ্ম ও পরব্রহ্মে নিষ্ঠা ও আশ্রয়-প্রাপ্ত গুরুর নিকট আত্মার সেবা-জিজ্ঞাসু ব্যক্তি গমন করত প্রপত্তি স্বীকার করিবেন।"

—'পঞ্চসংস্কার', সঃ তোঃ ২।১

১৩। কে গুরু-পদের যোগ্য ?

"পরমার্থ-বিষয়ে যিনি কৃতকর্ম্মা, তিনি গুরু হইবার উপযুক্ত।"

—'গুর্ব্ববজ্ঞা', হঃ চিঃ

১৪। উচ্চবর্ণ দেখিয়া কি গুরু করা উচিত নহে ? হরিভক্তিবিলাসে ব্রাহ্মণ ও গৃহস্থকে গুরু-পদে বরণ করিবার কথা বলা হইয়াছে, তাহা কিরূপ ?

"কৃষ্ণতত্ত্বজ্ঞানই সর্ব্বজীবের পরমার্থ। এই তত্ত্বজ্ঞানের গুরু হইবার অধিকার-বিচারে এইমাত্র সিদ্ধান্তিত আছে যে, কৃষ্ণতত্ত্ববেত্তা—বিপ্রই হউন বা শুদ্রজাতিই হউন, গৃহস্থই হউন বা সন্ন্যাসীই হউন, গুরু হইতে পারেন। শ্রীহরিভক্তিবিলাসে উচ্চবর্ণে যোগ্য-পুরুষ থাকিতে হীনবর্ণ ব্যক্তির নিকট হইতে কৃষ্ণমন্ত্র লওয়া উচিত নয়,—এরূপ যে কথা আছে, তাহা লোকাপেক্ষী বৈষ্ণবপর ; অর্থাৎ সংসারে যাঁহারা প্রচলিত বিধি-মতে কথঞ্চিৎ পরমার্থের উদ্দেশ করিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহাদের পক্ষে। পরন্তু যাঁহারা বৈধী ও রাগানুগা ভক্তির তাৎপর্য্য জানিয়া বিশুদ্ধ কৃষ্ণভক্তি পাইতে ইচ্ছা করেন, তাঁহাদের সম্বন্ধে উপযুক্ত কৃষ্ণতত্ত্ববেত্তা যে-বর্ণে বা যে-আশ্রমে পাওয়া যায়, তাঁহাকেই গুরু বলিয়া বরণ করা বিধি।"

—অমৃতপ্রবাহভাষ্য মঃ ৮।১২৭

১৫। গুরুব্রুব ও সদ্গুরু-চরণাশ্রয় কি ?

"গুরু দুই প্রকার অর্থাৎ অন্তরঙ্গ ও বহিরঙ্গ। সমাধিস্থ আত্মাই আত্মার অন্তরঙ্গ গুরু। যিনি যুক্তিকে 'গুরু' বলিয়া তাহার নিকট উপাসনা শিক্ষা করেন, তিনি দুষ্ট গুরু আশ্রয় করিয়াছেন। নিত্যধর্ম্মের পোষকরূপে যুক্তির ছলনা পূতনার ছলনার সহিত তুলনা করা যায়। রাগমার্গের উপাসকগণ পরমার্থ-তত্ত্বে যুক্তিকে বিসর্জ্জন দিয়া আত্ম-সমাধিকে আশ্রয় করিবেন। যে মনুষ্যের নিকট উপাসনা-তত্ত্ব শিক্ষা করা যায়, তিনি বহিরঙ্গ গুরু। যিনি রাগ-মার্গ অবগত হইয়া শিষ্যের অধিকার বিচারপূর্ব্বক পরমার্থ উপদেশ করেন, তিনি সদ্গুরু।"

—শ্রীকৃষ্ণসংহিতা ৮।১৪

(ক্রমশঃ)

—জগদ্গুরু শ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুর

ভাগবত-বিবৃতি

মানবগণের স্বরূপানুভূতিতে যে বৃত্তি নিত্যা, তাহাই হরিভক্তি। বাহ্য জগতের ও খণ্ড বস্তুসমূহের অখণ্ড নিত্য আধার বৈকুণ্ঠ বস্তু ভগবান্। সেই ভগবানে ভক্তিই সকল জীবের একমাত্র প্রয়োজন। প্রত্যক্ষ-ইন্দ্রিয়জ্ঞানে খণ্ড প্রতীতিক্রমে জীবগণ কাল্পনিক মায়াবাদ অথবা ফলভোগবাদে প্রমত্ত হইয়া সত্যবস্তুর ধারণা করিতে অসমর্থ হয়। সেজন্য প্রত্যক্ষবাদিগণের নিত্য মঙ্গলের জন্য তদুপযোগী করিয়া হরিলীলা বর্ণন কর, যাহাতে তাহারা জড়ভোগবাদ ও মায়াবাদ হইতে মুক্ত হইয়া নিত্য হরিসেবাপর হইতে পারে। এই জন্য ভক্তিমান্ বৈষ্ণবের নিকটই ভাগবত পাঠ করা কর্ত্তব্য, নতুবা অক্ষজজ্ঞান-প্রতারিত মায়াগ্রস্ত ভোগী বা ত্যাগী ভক্তিবর্জ্জিত হওয়ায় ভাগবতবর্ণন বা অধ্যাপন করিতে পারে না। (ভাঃ ২।৭।৫১)

ভগবদ্বৈভব দুইপ্রকার—ভক্তিবৈভব বৈকুণ্ঠ ও মায়াবৈভব ব্রহ্মাণ্ড। বৈকুণ্ঠ-কথার বর্ণন শ্রবণ করিলে জীবের মায়িক-বৈভব-মাহাত্ম্য হইতে মুক্তিলাভ ঘটে। জীবের অশুদ্ধচিত্তে বৈকুণ্ঠ-বৈভব-পরিস্ফুট হয় না। তজ্জন্য মায়িক বৈভবমিশ্র পরমাত্মতত্ত্ব-প্রকটিত মায়াশক্তি প্রচুর বিরাট্ প্রভৃতির বর্ণনায় বিপরীতভাবে শুদ্ধ-ভক্তিরাজ্যের উপলব্ধি ঘটে। যাহার ভগবৎসেবাপর নিত্যরুচি প্রকাশিত হয় নাই, তাহাদিগের চিত্তশুদ্ধির জন্য মায়াময়-বৈভব বর্ণনের উপযোগিতা আছে। ভগবল্লীলা কখনই মায়িকী নহে। উহা গুণাতীত অপ্রাকৃত বলিয়া জীবগণ লীলাশ্রবণে মায়িকবোধে লীলার সহিত নশ্বর ক্রিয়ার সাম্যবোধ করেন না। সেবাপর-ভক্ত মায়ায় মুগ্ধ হন না বলিয়া তাঁহারা লীলাকে জড়েন্দ্রিয়গ্রাহ্য ভোগপর অনুষ্ঠান বলিয়া জানেন না। (ভাঃ ২।৭।৫২)

সাধনবিষয়ে পূর্ব্বেই মহাভাগবত পরীক্ষিৎ জানিয়াছেন যে, কর্ম্ম ও জ্ঞানপথে উপায় ও উপেয়ের ভেদ থাকায় উহা নিত্য নহে, ভক্তিই একমাত্র নিত্য। ভক্তির সাধনকে কর্ম্ম জ্ঞানাদিসাধনের ন্যায় অনিত্য জানিয়া ভজনীয় বস্তু কৃষ্ণলীলাকে ভোগ্য জগতের অন্যতম মনে করিতে হইবে না। পরীক্ষিৎ হরিলীলাপ্রবেশকে অপর সাধনজাতীয় জ্ঞানে বলিলেন, আমি নির্জ্জনে সাধুসঙ্গ-বর্জ্জিত হইয়া যে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য দৃশ্যজগতের অন্যতম কৃষ্ণলীলা স্মরণ করিতে করিতে দেহত্যাগ করিব, আপনি তাহাই বর্ণন করুন। তদুত্তরে শুকদেব পরীক্ষিতের তাদৃশ স্মরণপদ্ধতির ধারণা সংশোধনমানসে বলিলেন,—স্মরণ-প্রযত্ন ঐরূপ নহে।

জড়বস্তু বিষয়ক স্মৃতিতে স্মরণীয় বস্তুর স্বতন্ত্রতা ও চিন্মাত্রতা ও চিদ্বিলাসের অযোগ্যতা থাকায় অনুচিত জীব নিজ চেষ্টায় কল্পনাপূর্ব্বক বস্তুনির্দ্দেশ করে, কিন্তু কৃষ্ণ তাদৃশ মায়িকবস্তু না হওয়ায় মায়িক চেষ্টার ন্যায় তাঁহাকে জড়বস্তু মনে করিয়া কল্পনাপূর্ব্বক কৃত্রিমভাবে অষ্টকাল লীলা স্মরণ করিতে হইবে না। তিনি স্বয়ংরূপ এবং স্বয়ংপ্রকাশ-ধর্ম্মবিশিষ্ট।

কৃত্রিম নশ্বর জড়চিন্তার ন্যায় তাঁহার রূপ, গুণ, লীলাদির স্মরণের আবশ্যকতা নাই। প্রাকৃত জড়বুদ্ধি-বিশিষ্ট প্রাকৃত-সহজিয়া-সমাজে যে-প্রকার কৃত্রিম অষ্টকালীয় লীলা-স্মরণ পদ্ধতি প্রচলিত হইতে পারে সেরূপ অপ্রাকৃত হরি-রূপ-গুণ-লীলা না হওয়ায় তদ্বিষয়ে বিশেষ সাবধান হইতে হইবে। ভগবান্ নিত্যকাল স্বতন্ত্র চিন্ময়-লীলাবিশিষ্ট, সুতরাং জড়জগতের নশ্বর বস্তু ধ্যানের ন্যায় তাঁহার চিন্তা করিবার পদ্ধতি সুষ্ঠু নহে। সাধু ও গুরুমুখে সর্ব্বদা ভগবানের নাম শ্রবণ করিলে তাহা সর্ব্বদা গান করিবার চেষ্টা হয়। তাদৃশ নামশ্রবণ ও সেই স্মরণ-প্রভাবে নিত্যকাল কীর্ত্তন-চেষ্টায় অল্পকালের মধ্যেই ভগবান্ কৃপা করিয়া স্ব-স্বরূপ নিত্যগুণ ও নিত্যলীলায় মুক্ত পুরুষকে প্রবেশ-অধিকার প্রদান করেন। হরিশ্রবণ-কীর্ত্তনপর ভক্তের কৃত্রিম স্মরণাদি বিহিত নহে। শ্রদ্ধার সহিত শ্রবণপ্রভাবে নিত্য কীর্ত্তন এবং কীর্ত্তন করিতে করিতে নিত্য স্মরণীয় কৃষ্ণলীলা হৃদয়ে আপনা হইতেই প্রকাশিত হন। কৃত্রিমভাবে নির্জ্জনতা সম্ভবপর নহে। অনর্থমুক্তিতে ভোগময় বাহ্য জগতের সহিত ভোগসঙ্গ আপনা হইতেই বিদূরিত হয়। তাহাকেই নামভজনকারী সাধুগণ নির্জ্জনে হরিনাম কীর্ত্তন বলিয়া থাকেন। নামকীর্ত্তন পরিহার করিয়া স্মরণাঙ্গ যাজন করিবার ছলে যে নির্জ্জন ভজন-প্রয়াস তাহা শ্রীগৌরসুন্দরের অনুমোদিত নহে।

নির্জ্জনে অনেক সময় অনর্থ বৃদ্ধি হইয়া ভগবৎকীর্ত্তনের বাধা উৎপন্ন করে। নিজের কৃত্রিম অনর্থযুক্ত সাধন প্রবল হইয়া শ্রীমহাজন গুরুবর্গের বাক্যাবলীর প্রতিকূল অর্থ সৃষ্ট হয়। শ্রদ্ধাসহ নাম শ্রবণ করিলে অনর্থ নাশ হয়। অনর্থনাশের ফল নামকীর্ত্তন। শ্রদ্ধাসহ নিত্যকালীয় ভজন-জ্ঞানে নামকীর্ত্তন করিলে অনর্থনাশ হয়। অনর্থ নষ্ট হইলে ভগবান্ স্বয়ং ভক্তের হৃদয়ে নিজরূপ-গুণ-লীলা প্রকট করান। এই প্রকট-কার্য্য জড়ভোগসাধ্য ক্রিয়াবিশেষ নহে। জড়বস্তু ধ্যান কাল্পনিক, কিন্তু অপ্রাকৃত স্বতন্ত্র কৃষ্ণ ধ্যেয় জড়বস্তু মাত্র না হওয়ায় নিত্য কীর্ত্তনকারী ভক্তহৃদয়ে স্বয়ং আবির্ভূত হন। শ্রবণ-কীর্ত্তনাভাবে অভক্ত-হৃদয়ে ভগবানের আবির্ভাব হয় না বলিয়া তাহাদের

নামকীর্ত্তনরহিত নশ্বর কৃত্রিম নির্জ্জন ভজন ভাণ। তাহাতে অনর্থবৃদ্ধি ব্যতীত কৃষ্ণস্মৃতির সম্ভাবনা নাই। কীর্ত্তনকালে শ্রদ্ধার অভাব হইলেই জনসঙ্গ, তাহা ভজনের ব্যাঘাতমাত্র। সেজন্য শ্রবণ-কীর্ত্তনকারী ভক্তিমান্ জনগণ দুঃসঙ্গ পরিত্যাগ করিবার উদ্দেশে বহির্ম্মুখ জনসঙ্গে অনবধানদোষে দুষ্ট হইবেন না। নিঃসঙ্গ বা নির্জ্জনে নাম শ্রবণ ও নাম কীর্ত্তনপ্রভাবে ভগবান্ অনর্থমুক্ত জীবহৃদয়ে অচিরেই প্রবেশ করেন। অশ্রদ্দধান জনগণকে নামদান অপরাধ মধ্যে গণ্য। নাম-মহিমা প্রচার অপরাধ-মোচনের একমাত্র পন্থা। যাঁহারা নির্জ্জনে হরিভজন না করিয়া অপরাধ প্রবল করেন, তাঁহাদের হৃদয়ে ভগবান্ প্রবেশ করেন না। দুঃসঙ্গ পরিহারকার্য্য নামশ্রবণ ও কীর্ত্তনে রুচিবিশিষ্ট হইলেই অবশ্যম্ভাবী। জড়চিন্তাপর নির্জ্জনতা ভক্তের বিহিত নহে, বহু ভক্তসঙ্গে কীর্ত্তনই বিহিত। গুরুমুখশ্রুত নির্জ্জনে শ্রদ্ধাপূর্ব্বক নাম-গ্রহণে ব্যক্তিবিশেষের উপকার হয় সত্য, তাহাতে জীবে দয়ার দৃষ্টান্তে সঙ্কীর্ণতা আসিয়া পড়ে। "ভারত ভূমিতে হৈল মনুষ্য জন্ম যা'র। জন্ম সার্থক কর করি' পর-উপকার॥"—এই অমোঘবাণী শুনিয়া নিত্য কৃষ্ণকীর্ত্তন করিলে জীব অনর্থমুক্ত হইয়া পরোপকারফলে ভগবানকে হৃদয়ে অবরোধ করিতে সমর্থ হন। ব্যক্তিগত স্বার্থ নিজাচরণময়। আপনি আচরণশীল হইয়া কীর্ত্তনপ্রচারফলেই জীবের আত্যন্তিক মঙ্গল হয়। শ্রদ্ধাপূর্ব্বক নাম শ্রুত না হইয়া থাকিলে জীবের কীর্ত্তনাধিকার হয় না। যাঁহারা সাধু-গুরু-প্রসাদে শ্রদ্ধাপূর্ব্বক নাম শ্রবণ করিয়াছেন, তাঁহারাই অনন্যশরণ হইয়া কীর্ত্তন করিয়া জীবের উপকার করেন। তাঁহাদের বহির্ম্মুখ-জনসঙ্গ বা অশ্রদ্দধান জনগণের বাধ্য হইতে হয় না। তাঁহারা নৈসর্গিক নির্জ্জনতা সংরক্ষণ করিয়াই ভগবৎসেবা করিয়া থাকেন। (ভাঃ ২।৮।৩)

শ্রবণ ও কীর্ত্তনের বিষয় কৃষ্ণকথা-শব্দাত্মক। উহা কর্ণরন্ধ্রে প্রবিষ্ট হইলে ভোগপরজীবের অবিদ্যা বিনষ্ট হইয়া হৃদ্গত ভোগবাসনাস্থলে হরিসেবা-প্রবৃত্তির উদয় হয়। হরিসেবোন্মুখ হৃদয়ে কোনপ্রকার মলিনতা প্রবেশ করিতে সমর্থ হয় না। জীব অপর ভোগান্ধ জীবের নিকট হইতে নশ্বর অসৎকথা শিক্ষা করিয়া যে ইন্দ্রিয়ের অপব্যবহার করিতে অভ্যস্ত হন, তাহা শারদীয় মেঘবর্ষণে মলিনতা নষ্ট হইবার ন্যায় বিনষ্ট হইয়া নিত্য হরিসেবোন্মুখী চেষ্টায় রুচিলাভ করেন। (ভাঃ ২।৮।৪)

যেমন পথক্লিষ্ট নর গৃহে আগমন করিয়া গৃহসুখ লাভ করিলে ক্লেশের হস্ত হইতে পরিত্রাণ পান এবং গৃহসুখ পরিত্যাগ করেন না, তদ্রূপ হরিকথা শ্রবণে যাবতীয় অভাব বিদূরিত হইয়া সচ্চিদানন্দ কৃষ্ণপাদপদ্মসেবাসুখ ভক্তিমান্ জন কেহই ছাড়িতে চান না। (ভাঃ ২।৮।৫)

স্বেচ্ছাবিহারশীল ভগবান্ পূতনাবধাদি যোগমায়াদ্বারা ক্রীড়া করিয়া থাকেন। মৌষললীলায় ভগবানের অপ্রাকট্য প্রভৃতি মূঢ়বিমোহনার্থ প্রদর্শন করিয়াও প্রকৃতপ্রস্তাবে তাদৃশ প্রলয়যোগ্য কিরূপে হন। (ভাঃ ২।৮।২২)

ব্যাস যেকালে শ্রীগুরুকৃপাবলে শ্রৌত ভক্তিপথ গ্রহণ করিয়া সমাধিলাভ করিয়াছিলেন, তৎকালে মায়াদ্বারাই জীবের ভগবদ্বিমুখতা ও মোহাদি সম্ভব-পরতা জানিয়াছিলেন। জীবাত্মার স্বরূপানুভূতিতে মায়াসম্বন্ধ নাই। ভগবানের সহিতই তাঁহার কেবলানুভব-সম্বন্ধ। মায়ারচিত দেহেন্দ্রিয়াদির সহিত জীবের নিত্য সম্বন্ধ সংঘটিত হয় না। স্বপ্নকালে যেরূপ দ্রষ্টা বা অনুভবকারী জ্ঞাতার কর্ত্তৃসত্ত্বাগত অধিষ্ঠান, কিন্তু দৃশ্যজগতের নশ্বর বাস্তব অধিষ্ঠানের অভাব এবং ইন্দ্রিয়জ্ঞানের অসত্য চালনাহেতু দৃশ্যের অধিষ্ঠান না থাকাকালেও মিথ্যা প্রতীতি, তদ্রূপ প্রকৃতপ্রস্তাবে জীবের দেহেন্দ্রিয়াদিসহ সম্বন্ধ নশ্বর মাত্র। ভগবানের মায়া ভগবদচিন্ত্য-শক্তিপ্রভাবে দুর্ঘটঘটনা-পটীয়সী। তাঁহার দ্বারাই জীবাত্মার দেহসম্বন্ধ ঘটিয়াছে। স্বপ্নোত্থ অসত্য অনুভূতি দৃষ্টান্তের ন্যায় জীবের তত্ত্বজ্ঞানাভাব-জনিত প্রতীতি কৃষ্ণোন্মুখ জীবের নশ্বর দেহেন্দ্রিয়াদির সহিত সম্বন্ধ স্থাপন করিতে অসমর্থ। মুক্তজীব ভগবদনুভবময়, সেখানে মায়া-সম্বন্ধীয় ভোগপর স্থূল-সূক্ষ্ম-দেহেন্দ্রিয়াদির সহিত তাহার নিত্য সম্বন্ধ ঘটে না। (ভাঃ ২।৯।১)

ভগবান্ বাসুদেবে প্রীতি না হওয়া কাল পর্য্যন্ত জীব দেহেন্দ্রিয়াদির ভোগ হইতে বিরত হন না। দৃশ্যজগৎকে ভোগময় বিচার করিয়া হরিসেবাবিমুখ হইয়া মায়িকগুণজাত দেহেন্দ্রিয়াদিতে 'আমি আমার' বুদ্ধি করেন। কাল ও মায়া ভগবদ্বিমুখের উপর আধিপত্য বিস্তার করে। পরতত্ত্বাশ্রিত হরিসেবোন্মুখ নিত্য জীব কাল ও মায়া অতিক্রম করিয়া নিত্যবৈকুণ্ঠরাজ্যে নিত্যকাল অবস্থিত হন। (ভাঃ ২।৯।৩)

—জগদ্গুরু শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী প্রভুপাদ

ভ্রম-সংশোধন

শ্রীগৌড়ীয় পত্রিকার ৭ম সংখ্যা, ২৬৯ পৃষ্ঠায় ২২ পংক্তিতে 'বিষ্ণুভক্ত ভবেদ্বৈব আসুরস্তদ্বিপর্য্যয় ॥' স্থলে 'বিষ্ণুভক্তো ভবেদ্দৈব আসুরস্তদ্বিপর্য্যয়ঃ ॥', ২৭০ পৃষ্ঠায় ১০ পংক্তিতে 'The more you wants.' এর স্থলে 'The more he wants.' এবং ১৫ পংক্তির শ্লোকটী নিম্নরূপ হইবে।—

'তস্মাদিদং জগদশেষমসৎস্বরূপম্
স্বপ্নাভমস্তধীষণং পুরু দুঃখদুঃখম্ ॥'

উত্তমা ভক্তি

কলিযুগপাবনাবতারী শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর মনোঽভীষ্ট-সংস্থাপকবর তদীয় প্রিয়স্বরূপ শ্রীশ্রীল রূপগোস্বামিপ্রভু উত্তমা ভক্তির লক্ষণ বলিতে গিয়া শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধু-গ্রন্থে লিখিয়াছেন,—

"অন্যাভিলাষিতাশূন্যং জ্ঞানকর্ম্মাদ্যনাবৃতম্।
আনুকূল্যেন কৃষ্ণানুশীলনং ভক্তিরুত্তমা॥"

এই শ্লোকটী শ্রীরূপানুগগণের আনুগত্যে পর্য্যালোচনা করিলে সাধকের "ভক্তি" সম্বন্ধে সুস্পষ্ট জ্ঞান ও বিজ্ঞান অর্থাৎ অনুভূতি নিশ্চয়ই লাভ হইবে। "সম্বন্ধ"-তত্ত্ব-বিচারে শ্রীমদ্ভাগবতোক্ত "কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ম্" বাক্যটী যেরূপ পরিভাষা বাক্যরূপে গৃহীত হইয়াছে, সেইরূপ অভিধেয়তত্ত্ব-বিচারে এই শ্লোকটিও পরিভাষারূপে গ্রহণীয়। "সা চানিয়মে নিয়মকারিণী"—ইহাই পরিভাষা অর্থাৎ বহুপ্রকার বিধিবাকের মধ্যে অন্যান্য সমস্ত বাক্যকে উপমর্দ্দন করিয়া যে-বাক্যকে সর্ব্বপ্রাধান্য দেওয়া হয়, তাহাই পরিভাষা। ভক্তির সম্বন্ধে কর্ম্মী, জ্ঞানী, যোগী, কর্ম্মার্পণকারী, বিষয়ী, বিভিন্নমতাবলম্বী, বিভিন্ন সম্প্রদায়ের অনুগামী—সকলের সকল প্রকার ধারণা, জ্ঞান ও অনুভূতিকে উপমর্দ্দন করিয়া অর্থাৎ তদনুভূতিকে খণ্ডিত, দোষদুষ্ট অথবা ভ্রান্ত বলিয়া প্রমাণিত করিয়া ভক্তির নিকৃষ্ট লক্ষণরূপে এই শ্লোকটী উক্ত হইয়াছে।

জ্ঞান ও কর্ম্মদ্বারা অনাবৃত অন্যাভিলাষিতাশূন্য অনুকূলভাবে যে কৃষ্ণানুশীন, তাহাই উত্তমা ভক্তি। "আনুকূল্যেন কৃষ্ণানুশীলনম্"—ইহাতে ভক্তির স্বরূপ-লক্ষণ, "অন্যাভিলাষিতাশূন্যং জ্ঞানকর্ম্মাদ্যনাবৃতম্"—ইহাতে ভক্তির তটস্থ লক্ষণ উক্ত হইয়াছে। উক্ত শ্লোকের ক্রিয়াপদের ব্যবহার না থাকিলেও "কৃষ্ণানুশীলন" এই পদের দ্বারা ধাত্বর্থ উক্ত হইয়াছে। অনুপূর্ব্বক শীল্ ধাতু হইতে অনুশীলন শব্দ উৎপন্ন। চুরাদিগণীয় শীল্ ধাতুর অর্থ অভ্যাস, ইহা প্রবৃত্ত্যাত্মক, আর ভ্বাদিগণীয় শীল্ ধাতুর অর্থ সমাধি, ইহা নিবৃত্ত্যাত্মক। ভক্তি চেষ্টারূপা ও ভাবনারূপা। শীল্ ধাতু প্রয়োগে উভয়বিধা ভক্তির সূচনাই করা হইয়াছে। কৃষ্ণার্থে কায়িক, বাচিক ও মানসিক চেষ্টারূপা ভক্তি আবার প্রবৃত্তিরূপা ও নিবৃত্তিরূপাভেদে প্রত্যেকটী দ্বিবিধা। ভক্তির স্বরূপাকার যে প্রধান নয়টী অঙ্গ তাহার কায়িক-বাচিক-মানসিকানুশীলনই প্রবৃত্ত্যাত্মক-চেষ্টারূপা আর সেবানামাপরাধাদি বর্জ্জন প্রভৃতি নিবৃত্ত্যাত্মক-চেষ্টারূপা।

অনু উপসর্গ 'পশ্চাৎ', 'সহ', পুনঃ পুনঃ নৈরন্তর্য্য প্রভৃতি অর্থে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। শ্রীল জীবগোস্বামিপ্রভু শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণে কৃষ্ণপ্রবচনীয় (কর্ম্মপ্রবচনী) লক্ষণ 'অনু' উপসর্গের প্রয়োগ সম্বন্ধে বলিয়াছেন,—

লক্ষণবীপ্সেত্থম্ভূতেষভির্ভাগে পরিপ্রতী।
'অনু'রেষু সহার্থে চ হীনে তূপশ্চ কথ্যতে॥

এখানে শীল্ ধাতুর পূর্ব্বে 'অনু' উপসর্গটি 'নৈরন্তর্য্য' অর্থেও ব্যবহৃত হইয়াছে। অর্থাৎ সেই অনুশীলন অন্তর রহিত—বাধা রহিত। এই অনুশীলন কৃষ্ণার্থেই করিতে হইবে। কৃষ্ণার্থে চেষ্টারূপা ও ভাবনারূপা উভয়বিধ অনুশীলনই ভক্তি। শ্রীকৃষ্ণে রোচমানা প্রবৃত্তিই ভক্তি। যাঁহার উদ্দেশ্যে অনুশীলন করিতে হইবে, তাঁহার সেই অনুশীলন রুচিকর বা সুখকর হওয়া চাই। সুতরাং কৃষ্ণানুশীলনই ভক্তি—এই পর্য্যন্ত ভক্তির লক্ষণ পাওয়া গেল। কিন্তু তাহাতেও অব্যাপ্তি ও অতিব্যাপ্তি দোষ ঘটে। যে লক্ষণে অব্যাপ্তি অতিব্যাপ্তি ও অসম্ভব দোষ থাকিবে না, তাহাই নিকৃষ্ট লক্ষণ। কৃষ্ণানুশীলন বা কৃষ্ণকে সুখ দেওয়ার নামই ভক্তি—ইহা বলিলে চানুর-মুষ্টিক প্রভৃতি কৃষ্ণ-বিরোধী অসুরগণও ভক্ত ইহা প্রমাণিত হইয়া যায়। তাহাতে লক্ষণে অতিব্যাপ্তি দোষ ঘটে। কারণ কৃষ্ণ যখন কংসের রঙ্গমঞ্চে প্রবেশ করিতে-ছিলেন, তখন চানুর-মুষ্টিকের মল্ল-ক্রীড়ার জন্য আহ্বান শ্রবণ করিয়া তাঁহার বীররসের উদয় হইয়াছিল। কোন বীরের অঙ্গে অন্য বীর আঘাত দিলে তাহাতে আহত বীরের সুখ হয়। চানুর-মুষ্টিক যখন কৃষ্ণের অঙ্গে মুষ্টিপ্রহার করিয়াছিল তখন কৃষ্ণের বীররসানুভব-জনিত সুখ হইয়াছিল; সুতরাং চানুর-মুষ্টিক কৃষ্ণভক্ত। কিন্তু তাহা বলা যায় না। কারণ তাহারা কৃষ্ণকে মারিবার জন্যই তাঁহার অঙ্গে আঘাত করিয়াছিল, কৃষ্ণকে সুখ দেওয়ার উদ্দেশ্যে করে নাই; আবার কৃষ্ণকে সুখী করার নামই ভক্তি—এই কথা বলিলে কোনওপ্রকারে কৃষ্ণকে দুঃখ দেওয়া অভক্তি এবং তদ্রূপ দুঃখপ্রদান-কারী কৃষ্ণের অভক্ত, ইহা প্রমাণিত হয়। কারণ একদা মা যশোদা স্তন্য-পানরত কৃষ্ণকে তাঁহার ইচ্ছার বিরুদ্ধে ক্রোড় হইতে নামাইয়া চুল্লীর উপর স্থাপিত দুগ্ধ রক্ষা করিবার জন্য দৌড়াইয়া গেলেন। কৃষ্ণ ক্রোধান্বিত হইয়া কম্পমান অধর দংশন করিতে করিতে দধিভাণ্ডটী ভাঙ্গিয়া দিয়াছিলেন এবং স্তন্যপানে অতৃপ্তহেতু কাঁদিতে লাগিলেন। মা যশোদা স্তন্যপান না করাইয়া দুগ্ধরক্ষার জন্য গমনরূপ অনুশীলন বা কার্য্যটী কৃষ্ণের আদৌ রুচিকর —সুখজনক হয় নাই। সুতরাং এখানে ভক্তির "কৃষ্ণানুশীলনম্" এই লক্ষণের

অব্যাপ্তি ঘটে। কারণ যিনি বিশুদ্ধ বাৎসল্য-জাতীয় প্রেমভক্তির সাক্ষাৎ অধিষ্ঠাত্রী দেবী, যাঁহার সমগ্র চেষ্টাই কৃষ্ণের জন্য হইয়া থাকে, সেই মা যশোদার—"আমার স্তন্য পান করিয়া কৃষ্ণ রক্ষা পাইবে না, চুল্লীর উপর ঐ দুগ্ধ কৃষ্ণের জীবনস্বরূপ (মা যশোদা রাজরাণী হইয়াও—বহু দাসদাসী পরিবেষ্টিতা হইয়াও কৃষ্ণের জন্য সুলক্ষণযুক্তা গাভীর দুগ্ধ স্বয়ং দোহন করিতেন এবং ঐ দুগ্ধ নিজে জাল দিয়া কৃষ্ণের জন্য প্রস্তুত করিতেন, তাহা হইতে নিজেই মাখন প্রস্তুত করিতেন), সুতরাং সাময়িকভাবে কৃষ্ণকে দুঃখ দিয়াও তাহারই জন্য দুগ্ধ রক্ষা করিতে হইবে"—ইত্যাদি চিন্তাজনিত যে প্রেমভক্তি-বিশেষময় অনুশীলন, তাহা কখনও "অভক্তি" হইতে পারে না। লক্ষণে এই উভয়বিধ দোষ পরিহারের জন্য "আনুকূল্যেন" এই বিশেষণটী দেওয়া হইয়াছে। "আনুকূল্যেন"—এখানে বিশেষণে তৃতীয়া বিভক্তি। যিনি কৃষ্ণানুশীলন করিবেন, তিনি প্রথমেই অনুকূল হইবেন অর্থাৎ 'কৃষ্ণকেই সুখ দিব'—এইরূপ ইচ্ছাবিশিষ্ট হইবেন। তাঁহার চিত্ত সম্পূর্ণ প্রতিকূলতাশূন্য হইবে। আপাততঃ অনুকূল বলিয়া প্রতীয়মান হইলেও সেরূপ অনুশীলন যদি বাস্তবিকপক্ষে প্রতিকূলতাশূন্য না হয়—নিজসুখ বাঞ্ছারহিত না হয়, তবে তাহা ভক্তি হইবে না। অনুশীলনের মধ্যে অভীষ্টদেবের সুখবাঞ্ছা ব্যতীত যদি কোন সুখানুসন্ধান থাকে, সেরূপ অনুশীলন অভীষ্টদেবের সাময়িক সুখকর হইলেও তদ্রূপ অনুশীলনকারী ভক্তির ফল যে প্রেম তাহা লাভ করিতে পারিবেন না। তিনি নিজের বাসনারূপ ফলই লাভ করিবেন। জগদ্‌গুরু পরমারাধ্যতম শ্রীশ্রীল গুরুদেবকে বহু ব্যক্তি কায়মনোবাক্যে ও অর্থাদির দ্বারা তাঁহার মনোঽভীষ্ট পূরণের সহায়তা করিয়াছেন, শ্রীল গুরুদেবও তাহাদের সেই অনুশীলন দেখিয়া সন্তুষ্ট হইয়াছেন; কিন্তু বহুবর্ষ ঐরূপ সেবা করিয়াও অধুনা কাহারও গুরুত্যাগ করার প্রবৃত্তি, কাহারও বা গুরুভোগ করার প্রবৃত্তি অর্থাৎ গুরু-পাদপদ্মের নিরন্তর ভজনময় ব্যক্তিত্বকে অনুসরণ না করিয়া কেবল তাঁহার বাহ্য-ক্রিয়ার অনুকরণ করিয়া গুরু সাজিবার ধৃষ্টতা দেখা যাইতেছে—ভক্তির আবির্ভাবের প্রথম স্তরটীও তাহাদের মধ্যে প্রকাশ পাইতেছে না। ইহার কারণ অনুসন্ধান করিলে দেখা যায়, তাহারা "শ্রীল গুরুদেব আমার সেবা অঙ্গীকার করিয়া সুখী হইবেন, তাঁহার সুখ-সম্পাদনই আমার একমাত্র জীবাতু" এইরূপ ইচ্ছা লইয়া শ্রীগুরুদেবের সেবা করে নাই, কিন্তু তাঁহার একমাত্র সুখকামনা ব্যতীত অন্য কামনা লইয়া তাঁহার সেবা করিয়াছে; ফলে সাধুসেবার মুখ্যফল হইতে বঞ্চিত হইয়া নিজ নিজ অভীষ্টবস্তু লাভ

করিয়াছে। কারণ উদ্দেশ্য সাধু হইলে ভক্তির আবির্ভাবের ফলে চিত্তে শাস্ত্রোক্ত লক্ষণসমূহ নিশ্চয়ই প্রকাশ পাইবে, ভক্তিবিরোধী কামনা-বাসনা ক্রমশঃ ক্ষয়প্রাপ্ত হইবে।

এখন "আনুকূল্য" এই বিশেষণকেই ভক্তি বলা যাইতে পারে না, কারণ "অনুশীলনম্" এই বিশেষ্য পদপ্রয়োগ যে নিরর্থক নহে, তাহা পূর্ব্বে প্রদর্শিত হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণের রুচিকর প্রবৃত্তিও যদি প্রতিকূলতাশূন্য না হয়, তবে তাহাকে ভক্তি বলা যাইবে না, আবার অরুচিকর প্রবৃত্তিও যদি প্রতিকূলতা-শূন্য হয়, তবে তাহাকে ভক্তি বলা যাইবে। সুতরাং কেবল রুচিকর অনুশীলনই ভক্তি নহে, পরন্তু প্রতিকূলতাশূন্য কৃষ্ণানুশীলনই ভক্তি। আবার অনুশীলন শব্দের চেষ্টারূপ বা ভাবরূপ অর্থকে প্রকাশ না করিয়া কেবল প্রতিকূলতার অভাবও ভক্তি হইবে না। কারণ ঘটাদি জড় অচেতন বস্তুতেও প্রতিকূল-শূন্যতা আছে, কিন্তু তাহা অচেতন হওয়াতে তাহাতে চেষ্টারূপ বা ভাবরূপ অনুশীলন নাই। সুতরাং "আনুকূল্যেন কৃষ্ণানুশীলনম্" ইহাই ভক্তির চরম স্বরূপলক্ষণ। "তদভিন্নত্বে সতি তদ্বোধকত্বং স্বরূপলক্ষণম্।" অর্থাৎ যাহা বস্তু হইতে অভিন্ন থাকিয়া বস্তুকে বুঝাইয়া দেয়, তাহা স্বরূপলক্ষণ; যেমন "আনুকূল্যেন কৃষ্ণানুশীলনম্"—এখানে আনুকূল্যবিশিষ্ট কৃষ্ণানুশীলনরূপ অসাধারণ ধর্ম্ম কৃষ্ণভক্তি হইতে অভিন্ন থাকিয়া কৃষ্ণভক্তিকে বুঝাইতেছে, এইজন্য ইহা 'স্বরূপ-লক্ষণ'।

এখন তটস্থ-লক্ষণ দুইটীর বিচার হইতেছে। "তদভিন্নত্বে সতি তদ্বোধকত্বং তটস্থ লক্ষণম্॥" অর্থাৎ যাহা বস্তু হইতে ভিন্ন থাকিয়া বস্তুকে বুঝায়, তাহাই তটস্থ-লক্ষণ। "অন্যাভিলাষিতাশূন্যং জ্ঞানকর্ম্মাদ্যনাবৃতম্"—এই অংশে অন্যাভি-লাষিতা ও জ্ঞানকর্ম্মাদি উত্তমা ভক্তি হইতে ভিন্ন বস্তু হইয়া উত্তমা ভক্তিকে লক্ষ্য করাইতেছে। এজন্য ইহা তটস্থ-লক্ষণ। অন্যাভিলাষিতাশূন্য অর্থাৎ ভক্তিভিন্ন স্বর্গসুখ বা দেহসুখ প্রভৃতি অন্য কোনও অভিলাষ না রাখিয়া নিরন্তর কৃষ্ণসুখানুসন্ধানতৎপর হইতে হইবে। অন্যাভিলাষশূন্য না বলিয়া অন্যা-ভিলাষিতাশূন্য বলিবার তাৎপর্য্য এই যে, কোনও কোনও ভক্তের প্রার্থনার মধ্যে অন্যাভিলাষের আকার দেখা যায়, কিন্তু তাহাদের মধ্যে অন্যাভিলাষ পোষণ করার চিত্তবৃত্তি নাই অর্থাৎ অন্যাভিলাষিতা নাই। যেমন শ্রীযুধিষ্ঠির মহারাজ রাজচক্রবর্ত্তী হইয়া কৃষ্ণের সেবা করিবার জন্য শ্রীকৃষ্ণের নিকট রাজসূয় যজ্ঞ করিবার প্রার্থনা জানাইয়াছিলেন। তাঁহার রাজচক্রবর্ত্তী হওয়ার অভিলাষটী অন্যাভিলাষের আকারমাত্র, বস্তুতঃ ঐ অভিলাষের মধ্যে অন্যা-

ভিলাষিতা নাই। কারণ তিনি কৃষ্ণের মত ঐশ্বর্য্যশালী হইয়া কৃষ্ণের সেবা করিতে চাহিয়াছিলেন। নিজে বড় হওয়ার জন্য রাজচক্রবর্ত্তিত্ব আকাঙ্ক্ষা করেন নাই। অন্যাভিলাষ শব্দের উত্তর শীলার্থে ণিন্ প্রত্যয় করিয়া অন্যা-ভিলাষিতা। অন্যাভিলাষ পোষণ করার স্বভাব বা প্রবৃত্তিই অন্যাভিলাষিতা। আরও কোনও শুদ্ধভক্ত অকস্মাৎ কোনও বিপদ হইতে মুক্তিলাভের জন্য ভগবানের নিকট প্রার্থনা করেন, তাহাও বাহিরে অন্যাভিলাষের মত দেখা গেলেও তাহাতে তাঁহার ভক্তির কোনও ব্যাঘাত হয় না।

'জ্ঞানকর্ম্মাদ্যনাবৃতম্'—জ্ঞান ও কর্ম্ম আবৃত করে না এরূপ যে আনুকূল্য-বিশিষ্ট কৃষ্ণানুশীলন, তাহাই উত্তমা ভক্তি। 'জ্ঞান' বলিতে নির্ভেদব্রহ্মানুসন্ধান, 'কর্ম্ম' বলিতে স্মৃতি-শাস্ত্রোক্ত নিত্যনৈমিত্তিক কর্ম্ম এবং 'আদি' পদে ফল্গু-বৈরাগ্য, অষ্টাঙ্গযোগ ও সাংখ্যশাস্ত্রোক্ত অভ্যাসযোগাদি নিষিদ্ধ করা হইয়াছে। কারণ এগুলি সাধকের ভক্তিকে আবরণ করে, এবং ইহাতে ভগবৎসুখতাৎপর্য্য আদৌ নাই। ঐ সকল অনুষ্ঠানে সাধকের কিছু বিভূতি প্রভৃতি লাভ হয় এবং সেই বিভূতি ভগবৎসুখানুসন্ধান স্পৃহার একান্ত পরিপন্থী। এই সব কারণে ভক্তিকে আবৃত করে এমন জ্ঞান বা কর্ম্মানুষ্ঠান নিষেধ করিয়াছেন, তজ্জন্য 'জ্ঞানকর্ম্মাদ্যনাবৃতম্' বলিয়াছেন, "জ্ঞান-কর্ম্মাদিশূন্য" শব্দ প্রয়োগ করেন নাই। কারণ ভক্তিতে ভজনীয়রূপে অনুসন্ধানাত্মক জ্ঞান ভগবত্তত্ত্বজ্ঞান প্রভৃতি ভক্তির অন্তর্গত বিশুদ্ধজ্ঞান এবং শ্রীমন্দিরমার্জ্জন, ভোগ-রন্ধনাদি ভগবৎপরিচর্য্যা কর্ম্মের আকার নবধা ভক্তির অন্তর্গত, কিন্তু কর্ম্ম নহে। জ্ঞান-কর্ম্মাদিশূন্য বলিলে বিশুদ্ধ ভক্তিতত্ত্বজ্ঞান ও ভগবৎপরিচর্য্যাদিও নিষিদ্ধ হইয়া যাইত। এই জ্ঞান ও কর্ম্ম ভক্তির আবরণ নহে, বরং ভক্তির একান্ত অপরিহার্য্য পরিপোষক।

কৃষ্ণানুশীলন বলিতে কৃষ্ণ ও রাম-নৃসিংহাদি তদীয় অবতার সকলের অনুশীলন বুঝিতে হইবে। এখন প্রশ্ন হইতে পারে, কৃষ্ণানুশীলন বলিতে যদি সকল অবতারের অনুশীলন বুঝায়, তাহা হইলে গৌড়ীয়গণের মূলগুরুপাদপদ্ম শ্রীল রূপগোস্বামিপ্রভুকৃত উত্তমা ভক্তির এই চরম নিকৃষ্ট লক্ষণে গৌড়ীয়গণের চরম ভজনের উত্তমা ভক্তির পরাকাষ্ঠার ইঙ্গিত থাকা অবশ্য বাঞ্ছনীয়। তাই শ্রীল রূপগোস্বামিপ্রভুর একান্ত মর্ম্মী অন্তরঙ্গ পার্ষদ শ্রীল কবিরাজগোস্বামিপ্রভু উক্ত শ্লোকের নিজকৃত অনুবাদ "আনুকূল্যে সর্ব্বেন্দ্রিয়ে কৃষ্ণানুশীলন" এই বাক্যে "সর্ব্বেন্দ্রিয়ে" পদটীর দ্বারা ভক্তির সর্ব্বোত্তম অবস্থার ইঙ্গিত করিয়াছেন। সর্ব্বেন্দ্রিয়ে কৃষ্ণানুশীলন একমাত্র মধুররসে ব্রজগোপীগণের পক্ষেই সম্ভব। বাৎসল্য রসেও সর্ব্বেন্দ্রিয়ে কৃষ্ণানুশীলনের সর্ব্বোত্তমতা সম্ভব নয়।

শ্রবণ-কীর্ত্তন-স্মরণাদি এই উত্তমা ভক্তির আকার। এই সাধনভক্তি একমাত্র ভগবৎ সুখানুসন্ধানতৎপর হইয়া যাজন করিলে সাধক অনায়াসে শীঘ্র সাধনের ফল কৃষ্ণপ্রেম লাভ করিতে পারেন এবং প্রেমপ্রাপ্তির পর উত্তরোত্তর প্রেমের পরবর্ত্তী অবস্থা লাভ করিতে পারেন। এজন্য শ্রীমদ্ভাগবত বলিয়াছেন ;—

ভক্তিযোগো ভগবতি তন্নামগ্রহণাদিভিঃ।

এখানে "ভক্তিযোগো" বলিলেই হয়। "ভগবতি" বলিবার তাৎপর্য্য এই যে, নামগ্রহন-স্মরণাদি ভক্তির যে-সব আকার সেইগুলি যখন একমাত্র ভগবৎসুখের জন্য হয়, তখনই তাহা "ভক্তিযোগ" আখ্যাপ্রাপ্ত হয় এবং এই ভক্তিযোগই প্রেম দিতে সমর্থ হয়। ভগবৎসুখ বিধান ব্যতীত অন্য উদ্দেশ্যে নাম-গ্রহণাদি ভক্ত্যঙ্গ যাজিত হইলেও তাহাকে ভক্তিযোগ বলা যাইবে না এবং তাহার ফলে প্রেম লাভ হইবে না।

—জগদ্‌গুরু শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী

কমিউনিজম্ ও বৈদিক সাম্যবাদ

[পূর্ব্বপ্রকাশিত ৪৩শ বর্ষ, ৮ম সংখ্যা, ৩০৩ পৃষ্ঠার পর]

সাম্প্রতিককালে রুমানিয়ার রাষ্ট্রপ্রধানের পদে চেসেস্কুকে কমিউনিষ্টরা বসাইয়াছিলেন, কিন্তু স্বজন-পোষণের অভিযোগে তাঁহাকে বিপ্লবীদের হাতে নিহত হইতে হইয়াছে। কমিউনিষ্টদের কেন্দ্রবিন্দু যে ভ্রান্ত, এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। যে কমিউনিষ্টরা 'আমরা জনসাধারণ তথা শ্রমিকদের সেবার জন্য জীবন উৎসর্গ করিয়াছি' বলিয়া নিজেদের গুরুত্ব আরোপ করিতে চাহেন, প্রকৃতপক্ষে তাঁহারা জনগণকে বঞ্চনা করিতে সদাই সচেষ্ট। নিজেদের লভ্যাংশ পরিপূর্ণ করিতে পারিলেই যেন তাঁহারা বাঁচিয়া যান, জনগণ তাঁহাদের ধোঁকাবাজী ধরিতে পারেন না।

প্রকৃতপক্ষে সাম্যবাদী আর পুঁজিবাদীদের মধ্যে কোন পার্থক্য নাই। কেননা উভয়েই পরমেশ্বর ভগবানকে পরম ভোক্তারূপে স্বীকার করেন না। প্রকৃতপক্ষে কোন কিছুই পুঁজিবাদী অথবা সাম্যবাদীদের সম্পত্তি নয়। সব-কিছুরই মালিক হইতেছেন—ভগবান্। কমিউনিষ্ট, ক্যাপিটালিস্ট অথবা

অন্য যে কোনও দল প্রকৃতির সম্পদের উপর যদি মালিকানা করিতে চায়, তাহা হইলে মানবসমাজে অশান্তি সৃষ্টি অবশ্যম্ভাবী। ক্যাপিটালিস্টরা রাজনৈতিক কৌশলের দ্বারা কমিউনিষ্টদের দমন করিতে পারিবে না, আর কমিউনিষ্টরা তাহাদের রুটির জন্য লড়াই করিয়া ক্যাপিটালিস্টদের পরাস্ত করিতে পারিবে না। কমিউনিষ্ট ও ক্যাপিটালিস্টদের মধ্যে তখনই ঐক্য হইবে, যখন তাঁহারা উভয়েই ভগবানের মালিকানা স্বীকার করিয়া তাঁহার সম্পত্তি নিজেদের বলিয়া দাবী করিবে না। কমিউনিষ্ট মতবাদ তখনই সার্থক হইতে পারে যখন রাষ্ট্রের পরিবর্ত্তে ভগবানকে কেন্দ্র করিয়া সবকিছু সাধিত হয়। সেটিই হইতেছে ধর্ম। ভগবান্ যদি সমাজের কেন্দ্রবিন্দু হন, তাহা হইলে মানুষ সম্পূর্ণ নিরাপদ হইয়া যথার্থ সমৃদ্ধি অর্জ্জন করিবে। ঈশ্বরবিহীন বৈজ্ঞানিক বস্তুবাদও মানুষকে শান্তি দিতে পারে না। পূর্ব্ববর্ত্তী প্রাচীন বস্তুবাদ ও যান্ত্রিক বস্তুবাদও শান্তির চেষ্টা করিয়া সফল হন নাই, বর্ত্তমানের বৈজ্ঞানিক বস্তুবাদ কি করিয়া সফল হইবে? ভবিষ্যতে কোনও ঈশ্বর-বিশ্বাসবিহীন বস্তুবাদ শান্তি প্রয়াসের চেষ্টা করিলে তাহাও 'অশ্বডিম্ব প্রসবের ন্যায় নিরর্থক হইবে।

শুধু সনাতন বৈদিক শাস্ত্র কেন, পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের মনীষিগণও ধর্ম্মের অপরিসীম গুরুত্বের কথা স্বীকার করিয়া থাকেন। খ্রীষ্টপূর্ব্ব পঞ্চম শতাব্দীতে গ্রীক কবি সোফেক্লিস্ ধর্ম্মের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে বলিয়াছিলেন,—"যদি ধর্ম্ম উঠিয়া যায়, তবে দুনিয়া ধ্বংস হইয়া যাইবে। কারণ আচার ও রাষ্ট্রসম্পর্কিত ব্যবস্থাগুলি ঈশ্বরের ইচ্ছার উপর নির্ভরশীল।" কিন্তু মার্কসবাদীদের নিকট সোফেক্লিসের মতবাদের কোন মূল্য নাই। মার্কসের মতে মানুষই সব, ধর্ম্ম আবার কি? ধর্ম্ম শুধু শোষকশ্রেণীকে বাঁচাইয়া রাখিবার এক অভিনব পদ্ধতি। মার্কস ধর্ম্মকে বিদ্রূপ করিতে গিয়া বলিয়াছেন,—"ভগবান্ মানুষকে সৃষ্টি করেন না, পক্ষান্তরে মানুষ ভগবানকে সৃষ্টি করিয়াছে। ধর্ম্ম হইতেছে শোষিতদের দীর্ঘশ্বাস, এই নির্দ্দয় পৃথিবীর হৃদয়, এটি যেন ঠিক নির্জ্জীব অবস্থার জীবনস্বরূপ। মানুষের পক্ষে এটি আফিংয়ের মতো। দাস ও সামন্তযুগের প্রভু-শ্রেণীরাই ধর্ম্মের পূর্ণ বিকাশ ঘটাইয়াছে। আসলে ধর্ম্মের সমস্ত কল্পনা, দেব-দেবীর উৎপত্তি এই দাস ও সামন্তযুগেরই প্রতিবিম্ব। শ্রেণীস্বার্থকে মজবুত করিবার জন্যই ধর্ম্মের উদ্ভব হইয়াছে। কালের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে ধর্ম্মের বন্ধন যাহাতে শিথিল হইতে না পারে, শোষকশ্রেণীকে বাঁচাইয়া রাখিবার জন্যে ধর্ম্মের নতুন ব্যাখ্যা ও নতুন নতুন অবতার সৃষ্টির প্রয়োজন হয়। ধর্ম্মকে

খণ্ডন করিবার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ শিক্ষা হইতেছে, মানবজাতির কাছে মানুষই চরম সত্য। সুতরাং যে-সব পরিস্থিতি মানুষকে দাস, উপেক্ষিত, ঘৃণাস্পদ প্রাণীতে পরিণত করে, সেগুলিকে ধ্বংস করিতে হইবে।" মার্কসবাদীরা আরও বলেন,—"সমস্ত দেশের, বিশেষ করিয়া ভারতবর্ষের ঘটনা সাক্ষী দেয়, ধর্ম্মই মানুষকে পতিত, দাস, উপেক্ষিত এবং ঘৃণাস্পদ পতিত করিয়াছে। ভারতীয় মানবতাকে ছিন্নভিন্ন করিবার জন্যে কোন কিছুর যদি বেশী নষ্টামি থাকে তবে তা ধর্ম্মের।" এদিকে নৈতিকতা প্রসঙ্গে V. I. Lelin তাঁহার 'On Religion' গ্রন্থে বলিয়াছেন,—"পুঁজিপতিরা রটায়, কমিউনিষ্টরা কোন নৈতিকতা রক্ষা করে না। এ রটনার উদ্দেশ্য মানুষকে বিভ্রান্ত করা। এই প্রচারের মাধ্যমে তাঁহারা শ্রমিক ও কৃষকের চোখে ধূলো দিতে চায়। কি অর্থে আমরা নৈতিক বিধানকে অস্বীকার করি—নৈতিক বিধানগুলি ঈশ্বরসৃষ্টি হিসেবে।"

বাস্তবিকপক্ষে মার্কস, লেনিন ও তাঁহার অনুগামীদের প্রকৃত ধর্ম্ম সম্বন্ধে কোন সঠিক ধারণা ছিল না এবং বর্ত্তমানেও নাই। বেদে বলা হইয়াছে,—"ধর্ম্ম হইতেছে ভগবান্ প্রদত্ত কর্ম্ম করিবার পন্থা। ভগবান্ পরমসত্য এবং তাঁহার প্রদত্ত আইনও সত্য।" ভগবানের আইনানুসারে যদি মানবগণ জীবনযাপন করিত, তাহা হইলে সমাজে মানুষের সহিত মানুষের বিভেদ সৃষ্টির সম্ভাবনা থাকিত না। মানুষের কাছে মানুষ সত্য বলিয়া বিবেচিত হইত। আবার ধর্ম্ম মানুষের কাছে কখনও আফিংয়ের মত হইতে পারে না। কারণ আফিং মানুষের বিবেক-বুদ্ধি-চেতনতা লুপ্ত করিয়া দেয়, কিন্তু 'ধর্ম্ম' ত্রিতাপে দগ্ধীভূত মানুষকে শান্তিবারি ছিটাইয়া চিরকালের জন্য আনন্দসাগরে অবগাহন করান।

শ্রেণীস্বার্থকে মজবুত করিবার জন্য কেন ধর্ম্মের উদ্ভব হইবে? যাঁহারা ঈশ্বরকেন্দ্রিক অর্থাৎ ঈশ্বরসেবাযুক্ত নহে, তাঁহাদের জন্যই ধর্ম্মের অনুশাসন। ঈশ্বরবিমুখ শ্রমিক সম্প্রদায় হউক বা প্রভুশ্রেণী হউক, কেহই ধর্ম্মের অনুশাসনের হাত হইতে রক্ষা পাইতে পারে না। ধর্ম্মবিহীন সমাজ এক অন্ধকারযুগের সৃষ্টি করিতে বাধ্য। ধর্ম্মকে বাদ দিয়া 'স্বার্থবিহীন' সমাজ তৈয়ারী করা অসম্ভব। যেক্ষেত্রে ব্যক্তিস্বার্থের কথা বর্ত্তমান, সেইক্ষেত্রে মানুষই মানুষের পরম শত্রুরূপে গণ্য হয়—ইতিহাস তাহার অনেক সাক্ষ্য দিতেছে। জোসেক স্টালিন্ তাঁহার সমস্ত শত্রুদের হত্যা করিয়া গদি দখল করিয়াছিলেন। তিনি এত মানুষ হত্যা করিয়াছিলেন যে, ইতিহাসের পাতায় তাঁহাকে সবচেয়ে বড় অপরাধী বলিয়া গণ্য করা হইয়াছে। পাশ্চাত্ত্য দেশগুলি কেন ভারতবর্ষের দিকে তাকাইলে কমিউনিজমের ভুল-ভ্রান্তিগুলি পরিষ্কার আমাদের চোখে পড়িবে। শ্রমিক

স্বার্থের কথা চিন্তা করিতে গিয়া শ্রমিকদের সর্ব্বনাশ করাকেই তাঁহারা প্রকৃত জনহিতকর কার্য্য বলিয়া মনে করেন। ভগবদ্‌বিমুখ কমিউনিষ্টরা কল-কারখানাগুলির মালিকদের সঙ্গে সংঘর্ষে লিপ্ত হইয়া পরোক্ষভাবে শ্রমিকদের মুখের অন্ন কাড়িয়া লইতেছে। কমিউনিষ্টদের সঙ্গে সংঘর্ষে মালিকেরা বাধ্য হইয়া কারখানা বন্ধ করিয়া দিতেছেন, ফলস্বরূপে শ্রমিকদের অনাহারে শুকাইয়া মরিতে হইতেছে। প্রকৃতপক্ষে, কমিউনিষ্টরা ক্যাপিটালিস্টদের বুকে কোন দিন কোন কাঁটার আঁচড় বসাইতে পারেন নাই, আর ভবিষ্যতেও পারিবেন না। মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধেই তাঁহাদের যত কিছু হম্বিতম্বি। ধর্ম্মধ্বজীরা ধর্ম্মের অপব্যবহার করিয়া মানুষকে শোষণ করিয়াছেন বলিয়া কমিউনিষ্টদের ধর্ম্মকে উড়াইয়া দেওয়ার মধ্যেও কোন যৌক্তিকতা থাকিতে পারে না। পৃথিবীর এক ব্যক্তি চুরি করিয়াছে বলিয়া সবাইকে কি 'চোর' বলিতে হইবে? আবার ধর্ম্মধ্বজী ও প্রকৃত ধার্ম্মিক এক নহে। প্রকৃত ধার্ম্মিকের উদ্দেশ্য হইতেছে ভগবৎকেন্দ্রিক সমাজ সৃষ্টি করিয়া জগতে শান্তিস্থাপন করা। তাই ধার্ম্মিকের আদর্শই প্রত্যেকের অনুসরণের বিষয়। "ভারতবর্ষে ধর্ম্ম মানুষকে দাস, উপেক্ষিত, বঞ্চনা করিয়াছে"—এই যুক্তিও 'আষাঢ়ে গল্পের' ন্যায় নিরর্থক। তর্কের খাতিরে ধরিয়া লওয়া হইল, ভারতবর্ষে ধর্ম্ম মানুষকে 'দাস' করিয়া পথে বসাইয়াছে; কিন্তু আমেরিকা প্রভৃতি দেশে ত' ধর্ম্মের প্রাধান্য নাই, তবে সেই দেশগুলিতে কেন দাসপ্রথার অধিক প্রচলন ছিল এবং বর্ত্তমানেও রহিয়াছে? মানুষকে দাস, উপেক্ষিত করিবার জন্য দায়ী মানুষই, ধর্ম্ম কিছুতেই নহে। আবার নৈতিক বিধানগুলিকে লেলিনের মতানুসারে 'ঈশ্বর-সৃষ্টি নয়' বলিয়া অস্বীকার করিলে, বিভিন্ন মতবাদিগণের নীতিগুলি পরস্পরের মধ্যে সংঘর্ষ আরম্ভ করিয়া জগতে অশান্তির সৃষ্টি করিবে এবং জগৎ ধ্বংসের কারণ হইবে।

বৈদিক সাম্যবাদই শান্তির জনক

ভগবানকে বাদ দিয়া বা অবমাননা করিয়া যে কোন মতবাদ আমরা স্থাপন করি না কেন, তাহাতে শান্তি আনয়নের পরিবর্ত্তে 'অশ্বডিম্ব প্রসবে'র ন্যায় অশান্তি আনয়ন করিবে। কিন্তু আমরা যদি বেদের নির্দ্দেশ অনুসারে জীবন যাপন করিতে আরম্ভ করি, তাহা হইলে আমরা দেখিতে পাইব, সব কয়টী মতবাদ তাঁহাদের আদর্শরূপ লইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। আদর্শ পরিবারে বড় ভাইয়েরা যেমন ছোট ভাইদের শোষণ না করিয়া তাহাদের ভরণ-পোষণ করেন, তেমনিই বৈদিক সমাজেও উচ্চবর্ণের মানুষেরা নিম্ন-বর্ণের

মানুষদের প্রতিপালন করিতেন। 'সকলে পরমপিতা ভগবানের সন্তান' এই জ্ঞানে উচ্চবর্ণের মানুষরা নিম্নবর্ণের মানুষদের ঘৃণা না করিয়া তাঁহাদিগকে নিজেদের আদরের ভাই হিসাবে আদর করিতেন। সমাজের জ্যেষ্ঠভ্রাতা ব্রাহ্মণেরা ছিলেন ভগবদ্‌তত্ত্ববেত্তা দার্শনিক এবং তাঁহারা তাঁহাদের তত্ত্বজ্ঞান-দ্বারা সমাজকে ভগবন্মুখী হইবার পথপ্রদর্শন করিতেন। ক্ষত্রিয়েরা ভগবানের প্রতিনিধিরূপে রাজ্যশাসন করিতেন, বৈশ্যরা সমাজের প্রয়োজনীয় বস্তুগুলি সরবরাহ করিতেন এবং শূদ্ররা ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় বা বৈশ্যের নির্দ্দেশানুসারে কর্ম্ম করিতেন। সেই সমাজে যেহেতু সকলেই ভগবানের উদ্দেশ্যে তাঁহাদের স্বাভাবিক প্রবণতা অনুসারে কর্ত্তব্যকর্ম্ম সম্পাদন করিতেন, তাই সে সমাজে প্রতারণা বা শোষণ ছিল না। বৈদিক সমাজে বর্ণবিভাগ থাকিলেও ভগবানের সন্তানরূপে সকলেই ছিল সমান।

দুর্ভাগ্যবশতঃ আধুনিক সমাজে মানুষ পরস্পরকে শোষণ করিবার চেষ্টায় মাতিয়া উঠিয়াছে, তাই চতুর্দ্দিকে বৈষম্যের দাবানল জ্বলিয়া উঠিতেছে। এই সর্ব্বগ্রাসী দাবানল হইতে মানবসমাজকে রক্ষা করিতে হইলে এই সমস্যার যথার্থ সমাধানস্বরূপ ভগবৎকেন্দ্রিক বৈদিক সমাজকে আবার ফিরাইয়া আনিতে হইবে। জাগতিক স্তর অতিক্রম করিয়া পারমার্থিক স্তরে অধিষ্ঠিত না হওয়া পর্য্যন্ত মানুষের অভাব মোচন কোনদিন সম্ভবপর নয়। ভগবৎকেন্দ্রিক সমাজ তৈয়ারী করিতে পারিলে আমরা আমাদের অন্বেষিত 'শান্তি ও সমৃদ্ধি' অতি অনায়াসে লাভ করিতে পারিব। রাজনৈতিক, সমাজনৈতিক, ধর্ম্মনৈতিক —যে কোনরূপ মতবাদে স্বার্থপরতাশূন্য ও নিরপেক্ষ হইলে জগতের অশেষ কল্যাণসাধিত হয়—এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।

—শ্রীবলভদ্র দাস ব্রহ্মচারী

"সর্ব্বক্ষণ কৃষ্ণকীর্ত্তন ব্যতীত জীবের অন্য কোন কৃত্য নাই। শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপ, শ্রীনামের স্বরূপ ও নিজের স্বরূপ অবগত হইয়া শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনই শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্যের উদ্দিষ্ট নাম-সঙ্কীর্ত্তন। যে-কাল পর্য্যন্ত বিন্দুমাত্র দেহ-মনের স্মৃতি থাকে, সে-কাল পর্য্যন্ত কৃষ্ণকীর্ত্তন হয় না। সাধু-গুরু-বৈষ্ণবের কৃপায় সম্বন্ধ-জ্ঞানের উদয়ের পরিমাণে দেহ-মনঃ স্মৃতির শৈথিল্যক্রমে শ্রীনাম-প্রভু জীব-হৃদয়ে উদিত হন। তখন 'হৃদয় হইতে বলে, জিহ্বার অগ্রেতে চলে, শব্দরূপে নাম নাচেন অনুক্ষণ'।"

—শ্রীল সরস্বতী প্রভুপাদ

দামবন্ধন-লীলার তাৎপর্য্য

[পূর্ব্বপ্রকাশিত ৪৩শ বর্ষ, ৮ম সংখ্যা, ৩১৫ পৃষ্ঠার পর]

আসি' যশোমতী দেবী, মনেতে বিস্ময় ভাবি',
না দেখি নন্দনরতন।
পূর্ব্বস্থানে দেবী চায়, পুত্র দেখিতে না পায়,
দেখে দধিভাণ্ডের ভঞ্জন ॥
কৃষ্ণকর্ম্ম মনে করি', হাস্য করে ক্রোধ ছাড়ি',
স্নেহপূর্ণ হৈল হৃদয়।
গড়ি' যায় দধি-ঘোল, কার্য্য দেখি' কুতূহল,
পরমানন্দে হৈলা বিস্ময় ॥
গৃহমধ্যে কৃষ্ণ তবে, আছে বিপরীত ভাবে,
বিন্যস্ত উদূখল 'পরে।
উপবিষ্ট হৈয়া তাহে, শিকিস্থিত ননী যাহে,
বিভাগ করি' দেয় বানরে ॥
চৌর্য্যবশতঃ নয়ন, শঙ্কাযুত ঘূর্ণন,
পুত্র চেষ্টা দেখিয়া যশোদা।
ধীরে ধীরে যায় পিছে, যথায় তনয় আছে,
দেবী হৈলা উপস্থিত তথা ॥
মাতা হস্তে যষ্টি দেখি', সত্বরোদূখল ঝুকি,
দৌড়িয়া করিলা পলায়ন।
ভয়েতে বিহ্বল হরি, যায় পলায়ন করি',
যশোদা-জীবন ভগবান্ ॥
যোগিগণে তপোবলে, নাহি পায় কোন কালে,
বেদ যাঁরে করে অন্বেষণা।
সেই হরি ধরিবারে, যত্ন করে শতবারে,
যশোমতী পিছে ধাবমানা ॥

কৃষ্ণ অনুব্রজ্যা হৈয়া, যশোমতী যায় ধাইয়া,
নিতম্বভরে গতি সুচঞ্চলা।
'মন্থরাগতি যশোমতী, দ্রুতগতি বিরতি,
খসে পড়ে কবরীর মালা॥
পুষ্পমালা সকল, যশোদা অনুগা হৈল,
চলিলা কৃষ্ণের পশ্চাতে।
এইরূপে নন্দরাণী, ধরিলেন নীলমণি,
মগ্ন হৈলা বাৎসল্য রসেতে॥
অপরাধের কারণ, ভয়েতে করে রোদন,
দুই হাতে নয়ন যুগল।
কৃষ্ণ করে ঘর্ষণ, বিগলিত নেত্রাঞ্জন,
অশ্রুবারি তিতিল সকল॥
মায়ে দেখি' করে ভয়, ভয়হারি যারে কয়,
সঙ্কুচিত ভয়েতে বিহ্বল।
নন্দনে ধরিয়া করে, ক্রোধে মা ভর্ৎসনা করে,
দেখায় রোষের কুতূহল॥
মাতা যশোদা অত্যন্ত, পুত্র স্নেহে আক্রান্ত,
মাধুর্য্যে ঐশ্বর্য্য না দেখে।
ব্রজবনিতা নাম, মাধুর্য্য-বসতি ধাম,
শুদ্ধ বাৎসল্য-প্রেমে থাকে॥
পুত্র-প্রভাব অসীম, যশোমতী তাহে বাম,
ঐশ্বর্য্য না জানে কোনক্ষণ।
ঐশ্বর্য্যের আচ্ছাদন, ব্রজপুরে সর্ব্বক্ষণ,
মাধুর্য্যমণ্ডিত গোপীগণ॥
পুত্র ভীত দেখি' দেবী, যষ্টি পরিত্যাগে ভাবি',
দড়ি দিয়া করিব বন্ধন।
মানসে বিমর্ষ মানে, বান্ধিব কৃষ্ণ কেমনে,
বাছা যে আমার প্রাণধন॥

নাহি যার বাহ্যান্তর,		সর্ব্বব্যাপী নিরন্তর,
ত্রিজগতের যিনি মহেশ্বর।
পূর্ব্বাপর বর্ত্তমান,		কার্য্য-কারণ আধার,
বেদে-শাস্ত্রে অভেদ বিচার॥
জগতস্বরূপ যিনি,		জগতের উৎস তিনি,
মানব আকৃতি সেই হরি।
নিজপুত্র মনে করি',		যশোদা তাঁহারে ধরি',
উদূখলে বান্ধে জোর করি'॥
রোষ অনুসারে বান্ধে,		স্নেহে যার প্রাণ কান্দে,
বার বার চাহে বাছা মুখ।
ভয়েতে যাদুবাছার,		শুকাইছে ওষ্ঠাধর,
তাহা ভাবি' যশোদার দুঃখ॥
বালক বন্ধনকালে,		দড়ি দাম দু' আঙ্গুলে.
ন্যূন হৈল যশোমতী দেখে।
অন্য রজ্জু যুক্ত করি',		বন্ধন উপায় স্মরি',
অনায়াসে বান্ধি এবে সুখে॥
সেই দড়ি হৈল খর্ব্ব,		ব্যর্থ তাঁর বান্ধা গর্ব্ব,
আনয়ে যতেক রজ্জু আর।
দু' আঙ্গুল সেহ হ্রস্ব,		যশোদা হৈল বিবশ,
মুগ্ধচিত্ত হইল সবার॥
গৃহ-রজ্জু হৈল অন্ত,		যশোমতী পরিশ্রান্ত,
গোপীগণ বলে ওগো রাণী।
কপালে বন্ধন ইহার,		লেখা নাই বিধাতার,
কেমনে বান্ধিবে নীলমণি॥
পরিশ্রমে তৎকালে,		যশোমতী সুবিহ্বলে,
ঘর্ম্মাক্ত সকল কলেবর।
কবরী বন্ধনস্থিত,		হইল মালা স্খলিত,
দেখিয়া পরিশ্রম মায়ের॥

হৈল কৃপার সঞ্চার, প্রেমৈধন্য অবতার,
করিলা বন্ধন অঙ্গীকার।
যশোমতী পরসন্ন, বাৎসল্য স্নেহধন্য,
অদ্বিতীয় নাহি যাঁর ॥
বিশ্ব যাঁর বশীভূত, সেই আজ নন্দসুত,
প্রেমডোরে বান্ধে যাঁরে রাণী।
স্বতন্ত্র হরি শ্রীকৃষ্ণ, শুদ্ধ ভক্তিরসে তৃষ্ণ,
পরিতৃপ্ত গোপীপ্রেমে তিনি ॥
ভক্তিবশ ভগবান্, ভক্তিতে মিলে সন্ধান,
কর্ম্ম-জ্ঞান-যোগে হেন নয়।
ধন্য মাতা যশোমতী, শুদ্ধ বাৎসল্যবতী,
মাধুর্য্যে ঐশ্বর্য্য পরাজয় ॥
মাধুর্য্যমণ্ডিত হয়, ব্রজপুর সমুদয়,
কৃষ্ণ যেথা পায় মহাসুখ।
জঙ্গমাদি পাখী শুক, বৃক্ষলতাদি উন্মুখ,
পরানন্দে প্রফুল্লিত মুখ ॥
জয় যশোদানন্দন, সবার প্রীতিবর্দ্ধন,
করি' কর আকর্ষণ তুমি।
পদারবিন্দে প্রণতি, লৈয়া ঘুচাও দুষ্কৃতি,
ভবকূপে নিমজ্জিত আমি ॥
"তোমার নিত্যদাস মুই তোমা পাসরিয়া।
পড়িয়াছোঁ ভবার্ণবে মায়াবদ্ধ হঞা ॥
কৃপা করি' কর মোরে পদধূলি সম।
তোমার সেবক, করোঁ তোমার সেবন ॥"

—শ্রীনকুল চন্দ্র সাহা
'হা গৌরাঙ্গ কুটীর', তমালতলা, নবদ্বীপ (নদীয়া)

———

শ্রীল গুরু-মহারাজের বক্তৃতা

[পূর্ব্বপ্রকাশিত ৪৩শ বর্ষ, ৮ম সংখ্যা, ৩১৩ পৃষ্ঠার পর]

শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু জগতে এসেছেন দুটো জিনিস বুঝাবার জন্য। তাঁর আসার প্রথম কারণ হল—নামপ্রেম বিতরণ করা এবং দ্বিতীয় কারণ হল—স্বয়ং তাঁর যে মূলাপ্রকৃতির হ্লাদিনীশক্তি, তাঁর ভাব রসাস্বাদন করা। এই দুটো জিনিস তাঁর ভিতরে আছে। সেইকথাই শাস্ত্রে বর্ণিত হয়েছে।

'রাধাভাবদ্যুতিসুবলিত নৌমি কৃষ্ণস্বরূপম্'—এর ভিতরে ঐ কথাগুলি আছে। যে জিনিস কখনও দেওয়া হয় নাই, পূর্ব্বে সমর্পিত হয় নাই, সেই ব্রজপ্রেম জগৎকে জানাবার জন্য তিনি এসেছেন। সনাতন ধর্ম্মতত্ত্ব আলোচনা করতে গিয়ে বলতে হয়,—ধর্ম্ম কোন Cultural religion নয়, ধর্ম্ম কোন creedal religion নয়। এই হল চৈতন্যমহাপ্রভুর Theory। সনাতন ধর্ম্মের Theory হচ্ছে সকলপক্ষে সমান। এটা এর জন্য, ওটা ওর জন্য, এমন কোন কথা নাই। সেখানে কোন নিষেধনামা নাই। সনাতন ধর্ম্ম যাজন করতে গিয়ে সেখানে সমান অধিকার দিয়েছেন সকলকে চৈতন্যমহাপ্রভু।

সত্যযুগের মানুষের হাজার হাজার বৎসর পরমায়ু ছিল। তপস্যাদ্বারা তাঁরা ভগবানকে লাভ করতেন। ত্রেতাযুগে যাগযজ্ঞের দ্বারা, দ্বাপরযুগে পূজা-অর্চ্চনের দ্বারা তাঁরা ভগবানকে লাভ করতেন। 'কলৌ তদ্ধরিকীর্ত্তনাৎ'—কলি-যুগে হরিনাম-সংকীর্ত্তনের কথা আছে। যাগ-যজ্ঞ-তপস্যা ইত্যাদি কলিকালে চলবে না। কেন চলবে না?—স্বল্পায়ু, 'অনন্তপারং কিল শব্দশাস্ত্রম্। স্বল্পং তথায়ুর্বহবশ্চ বিঘ্নাঃ।' অন্যান্য যুগে যেখানে হাজার হাজার বৎসর পরমায়ু, সেখানে কলিযুগের পরমায়ু শাস্ত্রীয় ভাষায় লেখা আছে 'আয়ুঃ বর্ষশতম্'—মাত্র শতবর্ষ পরমায়ু। এই শতবর্ষ পরমায়ুর মধ্যে আমরা কতটুকু কি করতে পারি? আমরা কখনই বা লেখাপড়া শিখি, কখনই বা ব্যবসা-বাণিজ্য করি, কখনই বা আত্মীয়-স্বজনকে পালন-পোষণ করি, আর কখনই বা সাধন-ভজন করি? সময় কৈ? সময় ত' খুব কম। এই Percentageটা কষেছেন ভাগবতে। স্বয়ং প্রহ্লাদ মহারাজ বলছেন,—আমাদের পরমায়ু ত' অতি অল্প। এখনও পৃথিবীর যে Statistics, আপনারা বিচার করুন, দেখবেন তার ভিতরে লেখা আছে—ভারতবাসী আমাদের পরমায়ুর গড় এখন ৩৫%। ৩৫ বৎসরের মধ্যেই আমাদের দেহান্ত হয়ে যাচ্ছে, মারা যাচ্ছি আমরা। বরং আমাদের

থেকে অন্যান্য দেশের লোক বেশীদিন বাঁচছেন। জার্ম্মানী, রাশিয়ার লোক অনেকদিন বাঁচেন। ভারতবাসীর এই গড় হার এত কমে গেল কেন? বোধ হয় তাদের পরস্পরের মধ্যে বিরোধ, ঝগড়া, ঝঞ্ঝা, বিবাদ-বিসম্বাদ এর কারণ। এরা ক্রমশঃ নাস্তিক হয়ে পড়ছে। আর শাস্ত্রীয় যে আইনকানুন—Discipline সেগুলো এরা সব থেকে যেন বেশী ভুলে যাচ্ছে। এটাই এর প্রধান কারণ বলে মনে হয়। রাশিয়ার অন্তর্গত উজবেকিস্তানের মানুষ এখনও ১২৫-১৫০ বৎসর বাঁচে। তাঁদের সমস্ত খাওয়া-দাওয়া, আহার-বিহার সবকিছু নিয়ে আলোচনা করে দেখুন আপনারা, দেখবেন তাঁরা অধিকাংশই নিরামিশাষী—Vegetarian। তাঁরা আমাদের ভারতীয় আর্য্যঋষিগণের দর্শন আলোচনা করেন। ব্যাপার কি? তাঁদের এতদিন বাঁচবার কারণটা কি? আর্য্য-ঋষিগণের নীতি-আদর্শ যদি যথাযথভাবে পালন করা যায়—অনুসরণ করা যায়, তাহলে উন্নতি আছে।

বর্ত্তমানে ওর কোন প্রাধান্য না দিয়ে আমরা ভুলে যেতে চাচ্ছি। পাশ্চাত্ত্য আবহাওয়ায় প্রতিপালিত হতে চাচ্ছি আমরা। আমাদের কল্যাণ কোথায়? আমরা সবসময় তাকিয়ে আছি—পাশ্চাত্ত্য আমাদের কি দিচ্ছে। কিন্তু পাশ্চাত্ত্যের লোকের ত' বক্তব্য তা নয়। তাঁরা ত' বলছেন, আমরা প্রতীচ্য থেকে পেয়েছি এটা, এবং এটাকেই ভাঙ্গিয়ে খাচ্ছি আমরা। যতকিছু Research হচ্ছে তাঁদেরই থেকে নিয়ে research করছি। বেদ থেকে নিয়ে research হচ্ছে। এই যে Atom Molicules আবিষ্কার হয়েছে, এটা কোথা থেকে পেয়েছেন তাঁরা? জিজ্ঞাসা করুন। তাঁরা উত্তর দেবেন—আমরা বেদ থেকে পেয়েছি এটা। আমাদের যে বেদ, আমাদেরই দেশের জিনিস, আমাদের দেশে ত' নাই এখন। সেদেশে নিয়ে গিয়ে research হচ্ছে। তাঁরাই সেগুলো আবিষ্কার করছেন সব। বিজ্ঞানের যা কিছু উন্নতি হচ্ছে জার্ম্মানীতে, বেদ থেকে নিয়েই হয়েছে। আজ যে Spaceship পাঠান হচ্ছে, চন্দ্রযান পাঠান হচ্ছে, তারও প্রথমেই রয়েছে বেদ, বেদের বিচার। ঋষিগণের অবদান নিয়ে ত' তাঁরা research করছেন। সুতরাং ঋষিগণকে ভুললে চলবে না।

আমাদের দেশের ছেলেমেয়েরা আজ এসব চর্চ্চা ভুলে যাচ্ছে, ঋষিগণের অবদান ভুলে যাচ্ছে। যদি পাঁচজন ঋষির নাম জিজ্ঞাসা করা হয়, তারা নাম করতে পারবে না। কিন্তু যদি বলা হয় পাঁচজন পাশ্চাত্ত্য দেশের বৈজ্ঞানিকের নাম কর, তা তারা অনায়াসে বলে দিতে পারবে। কেণ্ট, হেগেল, সক্রেটিস্

থেকে আরম্ভ করে তারা অনেকেরই নাম বলে ফেলবে এক নিঃশ্বাসে। কিন্তু যদি বলা যায় সনাতন আর্য্যঋষিগণের কয়েকজনের নাম বলত, পারবে না। কেন পারবে না?—আমাদেরই ভুল, দোষ-ত্রুটী। যার জন্য এই অবস্থা হয়েছে। আমরা বর্ত্তমানে ঋষিনীতি ভুলতে বসেছি। কে মনু, অত্রি, যাজ্ঞবল্ক, উশনা অঙ্গিরা, যম, আপস্তম্ব, কাত্তায়ন, বৃহস্পতি, ব্যাস, পরাশর, শঙ্খ, দক্ষ, লিখিতা, গৌতম, বশিষ্ট ইত্যাদির নাম জানে? আর এঁদের যে বক্তব্য বিষয়, এঁদের যে Theory, এ নিয়ে কেউ আলোচনা করছে না। কিন্তু পাশ্চাত্ত্য দেশের সেইসব Scientist Philosopher তাঁরা নিজেরা নিজেদের পরিচয় দিয়েছেন আমরা ভারতের আর্য্যঋষিগণের কোন্ ঋষির শিষ্য। পীথাগোরাস থেকে আরম্ভ করে সক্রেটিস্, প্লেটো প্রভৃতি সকলেই নিজেরা নিজেদের পরিচয় দিয়েছেন, কে কার শিষ্য, কে কার অধীনে research করেছেন। কৈ এগুলো ত' আমাদের আলোচনার বিষয় হচ্ছে না! তাঁরা আর্য্যঋষিগণের Theory নিয়ে আলোচনা করে বলছেন, আমরা ওঁর শিষ্য, ওঁর আনুগত্যে আমরা এটা research করেছি। এগুলো ত' আমাদের পড়ানো হচ্ছে না, শিখানো হচ্ছে না। University-তে আমাদের Philosophy—দর্শনশাস্ত্র পড়ানো হয় নামে মাত্র—পাশ্চাত্ত্য দেশের উচ্ছিষ্ট মাত্র। আমাদের দেশের ঋষিগণের দর্শনশাস্ত্র কৈ আলোচনা হচ্ছে আজ? কিছুই হয় না। তাঁরা পাশ্চাত্ত্য থেকে ইংরাজীতে অনুবাদ করে যেটুকু পাঠিয়েছেন, আমাদের ছেলেমেয়েদের সেটুকু পড়ানো হচ্ছে আজ। ষড়্‌দর্শনের আলোচনা কোথায় হচ্ছে? ষড়্‌দর্শন কে আলোচনা করছেন? কপিলমুনির সাংখ্য, পাতঞ্জলির যোগ, গৌতমের ন্যায়, কণাদের বৈশেষিক, জৈমিনীর পূর্ব্ব-মীমাংসা, ব্যাসের উত্তর মীমাংসা, বেদান্ত দর্শন, ব্রহ্মসূত্র-ভাষ্য—এগুলো কে আলোচনা করছেন আজ? কেউ করেন নাই। সুতরাং এখানে কি research হবে! ঋষিগণ আমাদের জন্য কিছুই করেন নাই, তাঁদের কোন অবদান পাচ্ছি না, মিলছে না আমাদের। আসলে এর ত' research নাই, প্রচেষ্টা নাই। এখন Thesis যেটা হচ্ছে, Ph. D. ডিগ্রি যেটা সবাই পাচ্ছেন, আমরা খুব অবাক হয়ে যাই যে কি করে তাঁরা Thesis লিখছেন। কোন একটা বিশেষ বিষয়ে লিখতে গিয়ে ঠিক তার উল্টোটা লিখছেন। এটাকে কি Thesis বলব, Research বলব?

চৈতন্যমহাপ্রভুর সম্বন্ধে research করতে গিয়ে সম্পূর্ণ উল্টো কথাগুলো লিখে দিচ্ছেন, বলে দিচ্ছেন। শ্রীকৃষ্ণতত্ত্ব সম্বন্ধে আলোচনা করতে গিয়ে উল্টো

কথাগুলো সব বলে দিচ্ছেন। এসব বিষবাষ্পোদ্গীরণ করছেন। এই research-এর দরকার কি ? For the betterment হওয়া উচিত সবটাই। দেশে যাতে সেইরকম নীতি-আদর্শের মূল্যায়ন হয়, সেই শিক্ষা আহরণ করা দরকার। সমাজকে সেইভাবে পরিচালিত করা দরকার। সেগুলো হচ্ছে কৈ ? মানুষকে ধীরে ধীরে নাস্তিক বানিয়ে দেওয়া হচ্ছে। তারা যাতে নাস্তিক্যভাব আরও বেশী খুঁজে পায়, সেইদিকে অগ্রসর হয়, সমাজব্যবস্থা আজ সেইপথে এগিয়ে চলেছে।

স্বাধীনতা পেয়েছি শুনি, কিন্তু স্বাধীনতার উপলব্ধি কোথায় আছে ! তাই ত' রহস্য করে একজন কবি বলেছিলেন, মনে আছে আমার কবিতাটা—

"স্বাধীন ভারত আজি,
শতকোটী কণ্ঠে ওঠে জয়হিন্দ ধ্বনি,
আনন্দে প্রমত্ত সবে স্বরূপ ভুলিয়া।
কিন্তু হায় ! কোথা স্বাধীনতা ?
হয়েছে কি জীব মুক্ত ভবকারা হ'তে ?
খসি' কি পড়েছে জীবের মায়াশৃঙ্খল ?"

চিন্তা করবার কথা ! অধ্যাত্ম জগতের প্রশ্ন এগুলো। স্বাধীনতা কাকে বলব ? স্বাধীনতার আস্বাদটা কি ? যাঁরা স্বাধীন, তাঁরা ত' সবদিক্ থেকে উন্নত। সে স্বাধীনতা কৈ ? স্বাধীনতার অর্থ কি Adament—বেপরোয়া হয়ে যাওয়া ? নীতি-আদর্শ বিবর্জ্জিত অবস্থাকে কি স্বাধীনতা বলব ? পরাধীনতার শৃঙ্খল, তারই অন্ধ ভাবায় স্বাধীনতা নিয়ে আমরা চলছি। স্বাধীনতা সেইদিন আমরা পাব, যেইদিন আমরা আমাদের মুনিঋষিগণের যে ভাবধারা, চিন্তাধারা, তাতে উদ্বুদ্ধ ও অনুপ্রাণিত হতে পারব। এই উপলব্ধি ও অনুভব যেদিন আসবে, সেইদিনই যথার্থ স্বাধীন হব আমরা। তার আগে আসতে পারে না। সাম্য, স্বাধীনতা, মৈত্রী—এটা শুধু কথার কথা, গালগল্পের মত আজকাল হয়ে দাঁড়িয়েছে।

আমাদের ঋষিগণের কি অবদান, ঋষিগণ আমাদিগকে কিভাবে তত্ত্বদর্শন জানাতে চেয়েছেন, এটা আমাদের অনুধাবন করা প্রয়োজন আছে। ঋষিনীতি যদি আমরা বুঝ্‌বার চেষ্টা না করি, যদি সেই চেষ্টা না থাকে, তাহলে আমাদের সবটাই বৃথা পণ্ডশ্রম। খাওয়া, থাকা, পরা চিরদিনই আছে আমাদের। আমরা নাস্তিক চার্ব্বাক্ হয়ে যেতে চাই না, চার্ব্বাকের যে উদাহরণ—'Eat, drink and be merry' আমরা সেই দুর্নীতি নিতে চাই না। "ঋণং

কৃত্বা ঘৃতং পিবেৎ। যাবজ্জীবেৎ সুখং জীবেৎ। ভস্মীভূতস্য দেহস্য পুনরাগমনং কুতঃ।"—এই ভৌতিকবাদে আমরা বিশ্বাসী নই। এটা একজাতীয় স্বার্থপরতা ও সুবিধাবাদের কথা। আমরা ওতে সুখী হতে পারি না, আর্য্যঋষিগণও ওতে সুখী হতে পারেন নাই। তাঁরা বলেছেন, এর আগে চল, এটা বড় কথা নয়। জগতে বেঁচে থাকতে গেলে একমুষ্টি খেতে হবে, লজ্জা নিবারণের জন্য একটু বস্ত্র পরিধান করতে হবে, পোশাক-আশাক গ্রহণ করতে হবে। থাকার জন্য একটা কুঁড়ে ঘর প্রয়োজন, কিন্তু মনুষ্য-জীবনে এইটাই যথাসর্ব্বস্ব নয়। খাওয়া, পরা, থাকার থেকে আরও কিছু উন্নততর চিন্তা-ভাবনার কথা আছে, যাতে মানুষের মনুষ্যত্বের বিকাশ সম্ভব। সেটা কি? দেশে দুটো কথা প্রচলিত আছে। খাওয়ার জন্য বাঁচা, আর বাঁচার জন্য খাওয়া—দুটো কথা নিয়ে আমরা আলোচনা করি। তুমি খাওয়ার জন্য বাঁচবে, না বাঁচার জন্য খাবে? খাওয়ার জন্য যে বাঁচে সে ত' জন্তু-জানোয়ার। জন্তু-জানোয়ার ত' খায়-দায়, বাঁচে। মানুষ যখন ভগবানের শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি, তখন আমরা আমাদের পরিচয়টা ঠিক দেব। আমরা বাঁচার জন্যই খাব, খাওয়ার জন্য বাঁচব না। কেন?—মানুষ হয়ে বাঁচতে গেলে যেমন প্রয়োজন, সেইরকম ধরণেরই বাঁচব আমরা। আগে মনুষ্যত্ব, তারপরে বাঁচার কথা। যদি আমাদের Rationality—মনুষ্যত্ব বাদ হয়ে যায়, তাহলে কি পরিচয় থাকল আমাদের? তাহলে ত' জন্তু-জানোয়ারের সামিল হলাম আমরা। কি বাহাদুরি থাকছে আমাদের? সুতরাং আগেই নীতি-আদর্শ আমাদের চাই। নীতি-আদর্শ নিয়ে চলব আমরা—এই প্রতিজ্ঞা আগে চাই, তারপরে খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা হবে। খাওয়া-দাওয়াটা যথাসর্ব্বস্ব নয়।

খেয়ে-পরে ত' অনেকে বেঁচে আছে। তাদের কি ধার্ম্মিক বলা হবে? যাদের দেশে কিছু খাওয়া, পরা, থাকার ব্যবস্থা হয়েছে, কিছু বৈজ্ঞানিক উন্নতি করেছে, তারা কি ধার্ম্মিক, নীতি-আদর্শপরায়ণ? তার কি কোন প্রমাণ মিলছে? Is there any Guarantee? কোনটাই নয়। বরং যারা একটু ব্যবস্থা করেছেন, তাদের ভিতরে দেমাক, অহঙ্কার অধিক। তারা অপর যে-সকল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাষ্ট্র আছে, তাদের পদানত করে রাখতে চাইছেন—তোমরা আমার অধীনেই থাক, তাহলে তোমাদের কিছু সাহায্য দিতে পারি। এই ত' বর্ত্তমান দুনিয়ার অবস্থা। সনাতন আর্য্য-ঋষিগণের যে বিচার, সে বিচার যদি আমরা গ্রহণ করি, তাহলে মানসিক শান্তি হবে। অভাব-অভিযোগ চিরদিন আছে, থাকবে। এর মধ্যেই আমাদের চলতে হবে। এমন কথা

নয় যে আমাদের অভাব-অভিযোগ মিটে যাবে, তারপর আমরা কিছু নীতি-আদর্শ মানব, ধর্ম্ম-কর্ম্ম করব। আগে ধর্ম্ম-কর্ম্ম, নীতি-আদর্শ মানতে হবে, তারপর চল—এই হল ঋষিনীতি। চৈতন্যমহাপ্রভু এই ন্যায়, নীতি-আদর্শের কথা জানিয়েছেন।

মহাত্মা গান্ধী প্রথম Non-co-operation movement (অসহযোগ আন্দোলন) করেছেন। আমরা জানি এর দিশারী মহাত্মা গান্ধী। কিন্তু শাস্ত্র আলোচনা করলে দেখছি আমরা, এর দিশারী হচ্ছেন চৈতন্যমহাপ্রভু। তিনিই Non-violence, Non-co-operation প্রথম দেখিয়েছেন। অসত্যের বিরুদ্ধে, অধর্ম্মের বিরুদ্ধে তিনিই প্রথম জেহাদ ঘোষণা করেছেন। অন্যায় মানব না, অন্যায় করতে দেব না, হাজার হাজার তাঁর ভক্তবর্গ নিয়ে তিনি Governor এর কাছে গিয়েছেন এর প্রতিকার চাই। সুতরাং চৈতন্যমহাপ্রভু ঐ আন্দোলনের প্রথম দিশারী। শাস্ত্র আলোচনা করলে এগুলো দেখছি আমরা। ঠিক এইরকম নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে যদি আমরা আলোচনা করি, তাহলে বহুকিছু জিনিস পাব। Untouchabitity—অস্পৃশ্যতা বর্জ্জন যেভাবে মহাত্মা গান্ধী বলেছেন, একটা রাজনৈতিক Side তার আছে। চৈতন্যমহাপ্রভুর Theoryটা ঠিক যথাযথ অনুসরণ করেছেন—সকলের সমান অধিকার বজায় রেখে অস্পৃশ্যতা বর্জ্জন। যেটা বিজ্ঞান ভিত্তিক, সেইভাবে তিনি অস্পৃশ্যতা বর্জ্জনের কথা বলেছেন। যে বিজ্ঞান, যে ব্যবস্থা গ্রহণ করলে প্রতিটি মানুষ পরস্পর পরস্পরের প্রতি বিভেদ পরিত্যাগ করে ভ্রাতৃত্বসূত্রে আবদ্ধ হতে পারে, চৈতন্যমহাপ্রভু সেই Theoryর কথা বলেছেন, জানিয়েছেন। বিশ্বপ্রেমের কথা—Universal brotherhood এর কথা তিনিই বলেছেন। সুতরাং ঠিক সেইভাবে আমাদের ওটাকে গ্রহণ করতে হবে। কিভাবে সেটা? পারমার্থিক ক্ষেত্রে যে ন্যায়-নীতি-আদর্শের কথা আছে, যে স্বাধীনতা, মৈত্রী, ভ্রাতৃত্বভাব, বিশ্বভ্রাতৃত্বের কথা আছে, সেইভাবে নিতে হবে। এটা শাস্ত্রের অবদান, ঋষিগণের অবদান—আমরা যেন ভুলে না যাই। (ক্রমশঃ)

অপরাধ-ভঞ্জনের পাট ও শ্রীদেবানন্দ পণ্ডিত

নদীয়াবিহারী শ্রীগৌরসুন্দর যখন শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভু ও গদাধরাদি পার্ষদ-বৃন্দের সহিত নবদ্বীপ ভ্রমণ করিতেছিলেন, সেই সময় তথায় দেবানন্দ পণ্ডিত নামে পরম উদাসীন আকুমার-ব্রহ্মচর্য্যপরায়ণ, তপস্বী, ভাগবতের পাঠক বলিয়া বিখ্যাত একজন সুশান্ত ব্রাহ্মণ পণ্ডিত বাস করিতেন। ভাগবত অধ্যাপনাতেই তাঁহার সময়ের অধিকাংশ ব্যয়িত হইত। প্রোজ্ঝিতকৈতব ভাগবতগ্রন্থের অধ্যাপক হইয়াও তাঁহার হৃদয়ে মোক্ষাভিলাষ ও দাম্ভিকতারূপ কৈতব বিদ্যমান ছিল। মোক্ষাভিলাষী দাম্ভিকের হৃদয়ে ভক্তিদেবীর অধিষ্ঠান নাই—তাঁহার ভক্তি মিছাভক্তি—ভক্তির আকার মাত্র।

"সেই স্থানে দেবানন্দ পণ্ডিতের বাস।
পরম সুশান্ত বিপ্র মোক্ষ-অভিলাষ॥
জ্ঞানবন্ত তপস্বী আজন্ম উদাসীন।
ভাগবত পড়ান তথাপি ভক্তিহীন॥
ভাগবতে মহা অধ্যাপক লোকে ঘোষে।
মর্ম্ম অর্থ না জানেন ভক্তিহীন দোষে॥"

"ভক্ত্যা ভাগবতং গ্রাহ্যং ন বুদ্ধ্যা ন চ টীকয়া" একমাত্র ভক্তির দ্বারাই ভাগবতের মর্ম্ম গ্রহণ করা যায়, বুদ্ধিবৃত্তি বা টীকাদ্বারা ভাগবতের মর্ম্মার্থ কেহ বুঝিতে পারেন না।

একদিন শ্রীমন্মহাপ্রভু সেই পথে যাইতে যাইতে দেবানন্দ পণ্ডিতের ভাগবত-ব্যাখ্যা শুনিয়া ক্রোধে মত্তহস্তিপ্রায় হইয়া বলিতে লাগিলেন,—

"কোপে বলে প্রভু—বেটা কি অর্থ বাখানে।
ভাগবত-অর্থ কোন জন্মেও না জানে॥
এ বেটার ভাগবতে কোন্ অধিকার।
গ্রন্থরূপে ভাগবত কৃষ্ণ-অবতার॥
সর্ব্বপুরুষার্থ ভক্তি ভাগবতে হয়।
প্রেমরূপ ভাগবত চারি বেদে কয়॥
চারি বেদ দধি, ভাগবত নবনীত।
মথিলেন শুক, খাইলেন পরীক্ষিত॥

* * * *

মুই, মোর দাস, আর গ্রন্থ-ভাগবতে।
যার ভেদ তার নাশ ভালমতে॥
ভক্তি বিনু ভাগবতে যে আর বাখানে।
প্রভু বলে, সে অধম কিছুই না জানে॥
নিরবধি ভক্তিহীন এবেটা বাখানে।
আজি পুঁথি চিরি এই দেখ বিদ্যমানে॥"

এই বলিয়া দুষ্টের সংহারকারী শ্রীগৌরহরি সিংহের ন্যায় গর্জ্জন করিয়া দেবানন্দ পণ্ডিতের পুঁথি ছিঁড়িতে উদ্যত হইলেন। বৈষ্ণবগণ কোনও প্রকারে নিবারণ করিলেন। প্রভু আরও বলিতে লাগিলেন,—

"মহাচিন্ত্য ভাগবত সর্ব্বশাস্ত্রে কয়।
ইহা না বুঝিয়ে বিদ্যা-তপ-প্রতিষ্ঠায়॥
ভাগবত বুঝি হেন যার আছে জ্ঞান।
সে না জানে কভু ভাগবতের প্রমাণ॥
ভাগবতে অচিন্ত্য ঈশ্বর বুদ্ধি যার।
সে জানয়ে ভাগবত-অর্থ ভক্তিসার॥"

সুতরাং যাঁহারা ভাগবতকে কাব্যবিশেষের ন্যায় জ্ঞান করিয়া অধিকার-বিচারবিহীন হইয়া ভাগবতের কৃষ্ণলীলার পাঠ শ্রবণে ব্রতী হন এবং ভাবে ডগমগ হইয়া আপনাদিগকে "রসিকা ভুবি ভাবুকাঃ" মনে করিয়া জগতের নিকট প্রতিষ্ঠা অর্জ্জন করিতে প্রয়াসী হন; যাঁহারা ভগবানের বিগ্রহ ভাগবতকে বিক্রয় করিয়া বিক্রয়লব্ধ অর্থ দ্বারা নিজের ও স্ত্রী-পুত্রের সেবা করিয়া থাকেন—যাঁহারা ভাগবতের আঠার হাজার শ্লোক কণ্ঠস্থ করিয়াছেন বলিয়াই বড় ভাগবত পাঠক বলিয়া খ্যাতিলাভ করিয়া সমধিক অর্থ উপার্জ্জনের সুবিধা করিয়া নেন—যাঁহারা অন্যাভিলাষ, কর্ম্ম, জ্ঞানদ্বারা ভাগবতের শুদ্ধ-ভক্তিকে আবৃত করিয়া শ্রোতার নিকটে ভাগবত ব্যাখ্যা করিয়া থাকেন—যাঁহারা কুলের বড়াই করেন, নিত্যানন্দসন্তান, অদ্বৈতসন্তান হইলেই ভাগবত পাঠের পক্ষে যথেষ্ট অধিকার হইল বলিয়া মনে করেন, শ্রীমন্মহাপ্রভু তাঁহাদের স্থান কোথায় নির্দ্দেশ করিয়াছেন দেখুন—

"সর্ব্বগুণে দেবানন্দ পণ্ডিত সমান।
পাইতে বিরল বড় হেন জ্ঞানবান্॥
সে সব লোকের যথা ভাগবতে ভ্রম।
তাতে যে অন্যের গর্ব্ব তার শাস্তা যম॥"

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের প্রথমে শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী বলিয়াছেন—

"এক ভাগবত বড়—ভাগবত-শাস্ত্র।
আর এক ভাগবত—ভক্তিরসপাত্র॥"

এক ভাগবত—ভাগবত-শাস্ত্র এবং আর এক ভাগবত—ভক্তিরসের পাত্র ভক্ত-ভাগবত অর্থাৎ বৈষ্ণব। অতএব যাহাদের এই দুই ভাগবতের কোনও একজনের চরণে অপরাধ আছে, তাহাদের মুখে ভাগবতের কথা কীর্ত্তিত হয় না। যাহারা দুইজনের চরণেই অপরাধী, তাহাদের কথা আর বলিবার নহে। আজকালকার ভাগবতবিক্রেতৃগণ দেহে আত্মবুদ্ধিবশতঃ জন্ম প্রভৃতি দ্বারা গর্ব্বান্বিত হইয়া নিষ্কিঞ্চন মহাভাগবতগণকেও উল্লঙ্ঘন করিতে কুণ্ঠিত নহেন। সুতরাং তাহারা দুই ভাগবতচরণেই অপরাধী। প্রথমতঃ তাহারা ভগবানের বিগ্রহ ভাগবতকে নিজ ইন্দ্রিয়তোষণের যন্ত্রস্বরূপে পরিণত করিয়া ভাগবত-শাস্ত্রের নিকট অপরাধী, দ্বিতীয়তঃ দাম্ভিকতাহেতু তাহারা বৈষ্ণব-চরণে অপরাধী। অতএব তাহারা ভাগবত পড়িয়াও ভাগবতের মর্ম্মার্থ বুঝিতে পারে না। তাহাদের মুখে ভাগবত কীর্ত্তিত হইবে কি-প্রকারে? অভিধেয়-শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন অকিঞ্চনেরই গোচরীভূত। নিষ্কিঞ্চন মহাভাগবতই ভাগবত শাস্ত্রের অধ্যাপক হইতে পারেন। সেইরূপ গোস্বামীই ভাগবতের প্রকৃত পাঠক। "গোস্বামী" অভিমানী বা নামধারী "অদান্তগো" বা ইন্দ্রিয়ের দাস যাহারা তাহারা কপট—কনক, কামিনী, প্রতিষ্ঠালোলুপ; তাহাদের ভাগবত পাঠের অধিকার নাই। এই জন্যই শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিলেন,—

"মোর প্রিয় শুক সে জানেন ভাগবত।
ভাগবত কহে মোর তত্ত্ব অভিমত॥"

দেবানন্দ পণ্ডিতের বৈষ্ণবচরণে অপরাধ ছিল। ভাগবতপ্রধান শ্রীবাসকে তিনি সামান্য মনুষ্যজ্ঞানে উল্লঙ্ঘন করিয়াছিলেন। সেইজন্য প্রভু তাহাকে বলিলেন,—

"বুঝিলাম তুমি সে পড়াও ভাগবত।
কোন জন্মে না জানহ গ্রন্থ-অভিমত॥
পরিপূর্ণ করিয়া যে সব জন খায়।
তবে বহির্দ্দেশে গিয়া সে সন্তোষ পায়॥"

যিনি ভাগবত যথার্থ আস্বাদন করিয়াছেন, তিনি ভাগবতরূপ অমৃতফল সর্ব্বজীবে বিতরণ করিবার জন্য উৎকণ্ঠিত হইয়া পড়েন। তিনি আর ঘরে থাকিতে পারেন না। নিজের স্ত্রী-পুত্র লইয়া একটী ক্ষুদ্র গণ্ডীর ভিতরে

চিরকাল আবদ্ধ থাকিতে হইবে ভাবিয়া ভাগবতবিক্রয়লব্ধ অর্থদ্বারা তাহাদের পরিপোষণ চিন্তায় মগ্ন হন না। তিনি অযাচক হইয়া সকলের দুয়ারে দুয়ারে বিনামূল্যে নিঃস্বার্থ হইয়া ভাগবতগীতি গাহিয়া বেড়ান। এইরূপ নিষ্কিঞ্চন মহাভাগবত জগতে বিরল।

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী, ছয় গোস্বামীর অন্যতম শ্রীল রঘুনাথ ভট্ট গোস্বামী, শ্রীল গদাধর পণ্ডিত গোস্বামী, শ্রীমদ্ভাগবতাচার্য্য ভাগবত-অধ্যাপকের দৃষ্টান্ত-স্বরূপ। তাঁহাদের আনুগত্যেই আমাদের শ্রীভাগবত পাঠের অধিকার। তাঁহাদের আনুগত্য ব্যতীত আমাদের ভাগবত পাঠ বা কীর্ত্তন কেবল নিজ ইন্দ্রিয়তোষণের জন্য, তাহা শ্রীরূপ গোস্বামী প্রভুর উপদিষ্ট পঞ্চ প্রধান সাধন ভক্তির অন্যতম নহে—কেবল সেবা-অপরাধ ও নাম-অপরাধ। আর এইরূপ শ্রোতাদেরও তাহাই লভ্য হইয়া থাকে। একজন নামাপরাধ করিবে, আর তাহা শুনিয়া আমার নাম শ্রবণ হইবে, ইহা হইতে পারে না।

"অসাধু সঙ্গে ভাই কৃষ্ণনাম নাহি হয়।
নাম বাহিরায় বটে, নাম কভু নয়॥
কভু নামাভাস, সদা নাম-অপরাধ।
ইহাই জানিবে ভাই কৃষ্ণ-ভক্তির বাধ॥"

তবে নামাপরাধীর মুখে ভাগবত শুনিয়া অপরাধ বর্দ্ধন ছাড়া আর কি ফল হইবে? পয়সা দিয়া বা না দিয়া অপরাধ কিনিয়া লাভ কি?

এই জন্যই শাস্ত্রের আদেশ,—

যাহ ভাগবত পড় বৈষ্ণবের স্থানে।
একান্ত আশ্রয় কর চৈতন্য-চরণে॥
চৈতন্যের ভক্তগণের নিত্য কর সঙ্গ।
তবে ত' জানিবা সিদ্ধান্ত-সমুদ্র-তরঙ্গ॥

—শ্রীউপেন্দ্রকৃষ্ণ দাস ব্রহ্মচারী

শ্রীকেশবজী গৌড়ীয় মঠে

শ্রীঝুলনযাত্রা-শ্রীজন্মাষ্টমী ও শ্রীশ্রীরাধাষ্টমী-মহোৎসব

গৌড়ীয় বৈষ্ণবসমাজ তাঁহাদের আরাধ্যাদেবী ও তাঁর প্রাণেশ্বরের তিথিগুলি সঙ্কীর্ত্তনমুখে পালন ও উদ্‌যাপন করিয়া থাকেন। পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৎসরের ন্যায় এ বৎসরও শ্রীব্রজমণ্ডলস্থ মঠ তিনটীতে—শ্রীকেশবজী গৌড়ীয় মঠ (মথুরা), শ্রীগোপীনাথজী গৌড়ীয় মঠ ও শ্রীরূপ-সনাতন গৌড়ীয় মঠে (বৃন্দাবন) বিপুল সমারোহের সহিত এই তিথি উদ্‌যাপন করা হইয়াছে। এবার ঝুলনের প্রধান আকর্ষণ ছিল বাংলার খ্যাতনামা ডেকরেটার শ্রীরবীন্দ্র ভৌমিকের ভাবগম্ভীর ডেকরেশন্।

স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের শুভাবির্ভাব-তিথিই শ্রীশ্রীজন্মাষ্টমী। অদ্যাপিও সেই তিথি জগদ্বাসী পরমাদরের সহিত পালন করিয়া আসিতেছেন। শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির প্রতিষ্ঠাতা-নিয়ামক অস্মদীয় পরম গুরুদেব জগদ্‌গুরু নিত্য-লীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামি-প্রতিষ্ঠিত শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাবস্থলী মথুরাস্থ শ্রীকেশবজী গৌড়ীয় মঠে বিপুল সমারোহের সহিত শ্রীজন্মাষ্টমী-তিথি পালিত হইয়াছে।

গত ১৫ই ভাদ্র, ১৩৯৮ বঙ্গাব্দ, ইং ১লা সেপ্টেম্বর ১৯৯১, রবিবার অর্থাৎ শ্রীজন্মাষ্টমীর পূর্ব্বদিবস শ্রীমঠের প্রবেশদ্বার পূর্ণকুম্ভসহ কদলীবৃক্ষ, আম্রপল্লব আদি মাঙ্গলিক দ্রব্যদ্বারা সুসজ্জিত করা হয়। সন্ধ্যায় অধিবাস-কীর্ত্তন এবং নগরসঙ্কীর্ত্তনমুখে প্রধান প্রধান রাজপথ পরিক্রমা করা হয়। সংকীর্ত্তনের সর্ব্বাগ্রে সুসজ্জিত হস্তীর উপর রাজচ্ছত্র ও চামরসেবিত অস্মদীয় পরম গুরুদেবের চিত্রপট বিরাজমান ছিল। তৎপশ্চাৎ সুসজ্জিত অশ্বের উপর দুইজন সৈনিক (সাজানো), ক্রমান্বয়ে বৃন্দাবনস্থ ইস্কনের কীর্ত্তনমণ্ডলী, মথুরার মহিলা-কীর্ত্তনমণ্ডলী, শ্রীমঠের কীর্ত্তনমণ্ডলী। সমস্ত মন্দির চলমান বৈদ্যুতিক আলোকসজ্জায় সজ্জিত করা হয়। শ্রীকৃষ্ণের জন্মলীলা সম্বন্ধীয় প্রদর্শনী চলমান বৈদ্যুতিক আলোকে সজ্জিত হওয়ায় দর্শকবৃন্দের প্রাণাকর্ষী হইয়াছিল।

পরদিবস ১৬ই ভাদ্র (ইং ২।৯।৯১) সোমবার শ্রীশ্রীজন্মাষ্টমী-তিথিবাসরে শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ গান্ধার্ব্বিকা-গিরিধারী-রাধাবিনোদবিহারীজীউ ও গিরিরাজ

গোবর্দ্ধনের মঙ্গলারতি অন্তে সারাদিন শ্রীমদ্ভাগবত পারায়ণ হয়। অপরাহ্নে মঠবাসী ব্রহ্মচারিগণ জয়ধ্বনিপূর্ব্বক শ্রীগুরুবন্দনা, বৈষ্ণববন্দনা প্রভৃতি মহাজন পদাবলী কীর্ত্তন মাধ্যমে সভার কার্য্য শুরু করেন। মথুরা ও দিল্লীর আকাশ-বাণীর কলাকারগণ ও দিল্লী-দূরদর্শনের কলাকারগণ কৃষ্ণলীলা সম্বন্ধীয় ব্রজ-ভাষায় কীর্ত্তনের দ্বারা শ্রোতাগণের তথা বৈষ্ণবগণের প্রশংসার্হ হইয়াছেন। পরে অস্মদীয় শিক্ষাগুরুদেব সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করিলে পর 'অবতারী শ্রীকৃষ্ণ' সম্বন্ধে ব্রহ্মচারিগণ বক্তৃতা প্রদান করেন। অতঃপর সভাপতি মহারাজের সাবলীল ভাবগম্ভীর ওজস্বিনী হিন্দী ভাষায় বক্তৃতা শ্রবণ করিয়া শ্রোতৃবৃন্দ ভূয়সী প্রশংসা করেন। মধ্যরাত্রিতে বৈদিক রীতি অনুসারে শ্রীকৃষ্ণের মহাভিষেক করা হয়।

১৭ই ভাদ্র (ইং ৩।৯।৯১) অর্থাৎ নন্দোৎসব-দিবসে দ্বিপ্রহর হইতে রাত্রি ১০টা পর্য্যন্ত জাতি-ধর্ম-নির্ব্বিশেষে আহূত, অনাহূত, রবাহূত প্রায় দ্বিসহস্রাধিক শ্রদ্ধালু ভক্ত ও জনসাধারণকে বিবিধ মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়।

লীলাপুরুষোত্তম আনন্দময়ের জন্মের ১৫ দিন পরেই তদীয় হ্লাদিনী শক্তির আবির্ভাব লীলা ইহজগতে প্রকাশিত হয়। এই বৎসর অস্মদীয় গুরুদেব ওঁ বিষ্ণুপাদ পরিব্রাজকাচার্য্য ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত বামন গোস্বামী মহারাজের উপস্থিতিতে এই অনুষ্ঠান এক বিশেষরূপ ধারণ করে। পূর্ব্বাহ্নে ব্রজের প্রায় দ্বিশতাধিক বালিকা মাথায় 'চাউ' (বিভিন্ন প্রকার উপহার সামগ্রী) লইয়া উপস্থিত হয়। মন্দিরে আসিয়া সকলে 'বধাই' (বড় বড় রাজরাজড়ার বাড়ীতে সন্তানের জন্মোপলক্ষে আনন্দে যে গান করা হয়) গান করিতে থাকে। শ্রীবিগ্রহের সম্মুখে নাট্যমন্দিরে বালিকাগণ সুন্দর নৃত্য করিতে থাকে। তন্মধ্যে কয়েকজন বালিকা নৃত্যে রাষ্ট্রপতি পুরস্কারপ্রাপ্ত ছিল। পরে অস্মদীয় গুরুদেবের আনুগত্যে শ্রীবিগ্রহের মহাভিষেক হয়। শ্রীবিগ্রহের ভোগরাগের পর প্রায় সহস্রাধিক শ্রদ্ধালু জনগণকে মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়। সন্ধ্যায় কীর্ত্তনের মাধ্যমে সভার কার্য্য আরম্ভ হয়। অস্মদীয় গুরুদেব সভাপতির পদ অলঙ্কৃত করিলে পর সমিতির সহ-সভাপতি ও সম্পাদক, শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকার সম্পাদক শ্রীমতী রাধাঠাকুরাণীর সম্বন্ধে সারগর্ভ বক্তৃতা প্রদান করেন। শ্রীগুরুদেব সাবলীল প্রাঞ্জল বাংলা ভাষায় বক্তৃতা প্রদান করেন। পরে সহ-সভাপতি মহারাজ তাহার হিন্দী তর্জ্জমা ও ব্যাখ্যা করিয়া বুঝাইয়া দেন।

—শ্রীনবীনকৃষ্ণ দাস ব্রহ্মচারী

শ্রীচৈতন্যে মর্ত্ত্যবুদ্ধি—নাস্তিকতা ও অপরাধ

[পূর্ব্বপ্রকাশিত ৪৩শ বর্ষ, ৮ম সংখ্যা, ৩২০ পৃষ্ঠার পর]

লেখক ঐ শ্লোকের পরিপ্রেক্ষিতে লিখিয়াছেন—"কিন্তু অন্ত্যলীলা-বিষয়ক তাঁর প্রাপ্ত সূত্রগুলি কি তা তিনি বলি বলি করেও শেষ পর্য্যন্ত আমাদের বলেন নি।" লেখকের উক্ত বক্তব্য ঠিক নহে। শেষলীলা বলিতে শুধুমাত্র অন্ত্যলীলা নহে—ইহা পূর্ব্বেই আলোচিত হইয়াছে। মধ্যলীলা ও অন্ত্যলীলা লইয়াই শেষলীলা। মধ্যলীলার প্রারম্ভে প্রথম পরিচ্ছেদে উক্ত আছে যে, কবিরাজ গোস্বামী শ্রীচৈতন্যদেবের শেষলীলার সূত্রগণের মধ্যে মাত্র মুখ্য সূত্রগণের বর্ণনা করিয়াছেন।

"এবে কহি শেষলীলার মুখ্য সূত্রগণ।
প্রভুর অশেষ লীলা না যায় বর্ণন॥
তার মধ্যে যেই ভাগ দাস-বৃন্দাবন।
'চৈতন্যমঙ্গলে' বিস্তারি' করিলা বর্ণন॥
সেই ভাগের ইহাঁ সূত্রমাত্র লিখিব।
তাহাঁ যে বিশেষ কিছু, ইহাঁ বিস্তারিব॥
চৈতন্যলীলার ব্যাস—দাস বৃন্দাবন।
তাঁর আজ্ঞায় করোঁ তাঁর উচ্ছিষ্ট চর্ব্বণ॥
ভক্তি করি' শিরে ধরি তাঁহার চরণ।
শেষলীলার সূত্রগণ করিয়ে বর্ণন॥"

(চৈঃ চঃ মধ্য ১।১০-১৪)

'শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে' অন্ত্যলীলাতেও দৃষ্ট হয়,—

"বৃন্দাবন-দাস প্রথম যে লীলা বর্ণিল।
সেই সব লীলার আমি সূত্রমাত্র কৈল॥
তাঁর ত্যক্ত 'অবশেষ' সংক্ষেপে কহিল।
লীলার বাহুল্যে গ্রন্থ তথাপি বাড়িল॥
অতএব সেইসব লীলা না পারি বর্ণিবারে।
সমাপ্তি করিলুঁ লীলাকে করি' নমস্কারে॥
যে কিছু কহিলুঁ এই দিগ্‌দরশন।
এই অনুসারে হবে তার আস্বাদন॥"

(চৈঃ চঃ অন্ত্য ২০।৭৩-৭৬)

কবিরাজ গোস্বামী মহাপ্রভুর শেষলীলার সূত্রগণ বর্ণনা করিবার পর তাহা বিস্তারিত লিখিবার ইচ্ছা জাগিয়াছিল।

"এই অন্ত্যলীলা-সার, সূত্রমধ্যে বিস্তার,
করি' কিছু করিলুঁ বর্ণন।
ইহা-মধ্যে মরি যবে, বর্ণিতে না পারি তবে,
এই লীলা ভক্তগণ-ধন॥
সংক্ষেপে এই সূত্র কৈল, যেই ইহাঁ না লিখিল,
আগে তাহা করিব বিস্তার।
যদি ততদিন জিয়ে, মহাপ্রভুর কৃপা হয়ে,
ইচ্ছা ভরি' করিব বিচার॥"

(চৈঃ চঃ মধ্য ২।৯১-৯২)

কবিরাজ গোস্বামী শ্রীমন্মহাপ্রভুর কৃপার উপর ভরসা করিয়া বলিয়াছেন যে, যদি শেষ অবধি তাঁহার আয়ু থাকে, তবে শ্রীমন্মহাপ্রভুর কৃপা হইলে শেষ-লীলা বিস্তারিত লিখিবেন। কারণ তখন তিনি অত্যন্ত বৃদ্ধ ও জরাগ্রস্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন।

লেখক ঐ পৃষ্ঠাতেই জানাইয়াছেন,—"সুতরাং তিনি কেবল শেষ লীলার রচনার ক্ষেত্রে বার্ধক্যের অজুহাত দেবেন, আদি এবং মধ্যলীলার ক্ষেত্রেও তো একথা প্রযোজ্য হতে পারতো। কার্য্যত তা হয়নি।"—লেখকের এইরূপ উক্তিও ঠিক নহে। কেননা, লেখক নিজেই পুস্তকের ২৮৩ পৃষ্ঠায় কবিরাজ গোস্বামী লিখিত বার্দ্ধক্যের কথা প্রসঙ্গে যে শ্লোক উল্লেখ করিয়াছেন, তাহা চৈতন্যচরিতামৃতে মধ্যলীলায় বর্ণিত আছে।—

"আমি বৃদ্ধ জরাতুর, লিখিতে কাঁপয়ে কর,
মনে কিছু স্মরণ না হয়।
না দেখিয়ে নয়নে, না শুনিয়ে শ্রবণে,
তবু লিখি এ বড় বিস্ময়॥
এই অন্ত্যলীলা সার, সূত্রমধ্যে বিস্তার,
করি কিছু করিল বর্ণন।
ইহা মধ্যে মরি যবে, বর্ণিতে না পারি তবে,
এই লীলা ভক্তগণ-ধন॥" (চৈঃ চঃ মধ্য ২।৯০-৯১)

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে অন্ত্যলীলার বিংশ পরিচ্ছেদে উক্ত হইয়াছে,—

"আমি—অতি ক্ষুদ্র জীব, পক্ষী রাঙ্গাটুনি।
সে যৈছে তৃষ্ণায় পিয়ে সমুদ্রের পানী ॥
তৈছে আমি এক কণ ছুঁইলুঁ লীলার।
এই দৃষ্টান্তে জানিহ প্রভুর লীলার বিস্তার ॥
'আমি লিখি'—এহ মিথ্যা করি অনুমান।
আমার শরীর কাষ্ঠপুতলী-সমান ॥
বৃদ্ধ জরাতুর আমি—অন্ধ, বধির।
হস্ত হালে, মনোবুদ্ধি নহে মোর স্থির ॥
নানা-রোগগ্রস্ত,—চলিতে বসিতে না পারি।
পঞ্চরোগ-পীড়া-ব্যাকুল, রাত্রি-দিনে মরি ॥"

(চৈঃ চঃ অন্ত্য ২০।৯০-৯৪)

উপরোক্ত শ্লোকে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, শ্রীচৈতন্যলীলার কণামাত্র কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি বৃদ্ধ, জরাগ্রস্ত, অন্ধ, বধির, হস্তকম্পিত, মন-বুদ্ধি অস্থির,—এইরূপ নানা রোগগ্রস্ত হওয়ায় তাঁহার পক্ষে আর লেখা সম্ভব নহে। লেখক কবিরাজ গোস্বামীর এইরূপ শারীরিক অক্ষম অবস্থাকে 'বার্দ্ধক্যের অজুহাত' বলিয়া গোস্বামীজীর সততার উপর সন্দেহ করিয়া বিদ্রূপাত্মক নিন্দাবাক্য প্রয়োগ করিয়াছেন। লেখক নিজে বৃদ্ধ, জরাগ্রস্ত, অন্ধ ও বধির হইলে তিনি কি আর লিখিতে সমর্থ হইবেন,—ইহা ভাবিয়া দেখিয়াছেন কি ?

লেখক ঐ পৃষ্ঠাতেই লিখিয়াছেন—'বোধ করি কৃষ্ণদাস চৈতন্যের মৃত্যুর প্রসঙ্গে এমন বিস্ময়কর কিছু সূত্র পেয়েছিলেন যাতে করে বার বার তিনি অন্ত্যলীলার প্রাসঙ্গিকী জের টেনেছেন।'

"বোধ করি"—এ শব্দটি লক্ষণীয়। 'বোধ করি', 'মনে হয়', 'হয়তঃ'—এই সমস্ত শব্দ প্রয়োগ করিয়া কোন সিদ্ধান্তে আসা যায় কি ? শ্রীচৈতন্যদেবের সমস্ত লীলাই অলৌকিক। লেখক 'নিবেদনের' শেষে লিখিয়াছেন,—

"অদ্যাপিও সেই লীলা করে গৌর রায়।
কোন কোন ভাগ্যবানে দেখিবারে পায় ॥"

এক্ষণে ঐ শ্লোকটী লেখকের 'নিবেদনে' উদ্ধৃত থাকায় লেখক শ্রীচৈতন্যদেবের লীলার নিত্যত্ব স্বীকার করিয়াছেন বুঝা যায়। আবার লেখক পুস্তকের ২২ পৃষ্ঠায় উল্লিখিত চৈতন্যচরিতামৃতের মধ্যলীলার অষ্টাদশ পরিচ্ছেদের শ্লোকটি কবিরাজ গোস্বামী সত্য কথা লিখিয়াছেন বলিয়া জানাইয়াছেন। এমতে শ্রীচৈতন্যদেবের লীলা নিত্য ও আদ্যোপান্ত অলৌকিক হইলে শ্রীচৈতন্যদেবের অন্তর্দ্ধান প্রসঙ্গও অলৌকিক হয়—তাহা কখনও মরণশীল মানুষের মত মৃত্যু হইতে পারে না। (ক্রমশঃ)

—শ্রীচৈতন্যকৃষ্ণ দাসাধিকারী

শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজের

বিরহ-মহোৎসব

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির প্রতিষ্ঠাতা-নিয়ামক জগদ্‌গুরু নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজের ২৩শ বর্ষপূর্ত্তি বিরহ-মহোৎসব সমিতির মূলকেন্দ্র শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠে গত ৫ই কার্ত্তিক, ১৩৯৮ (ইং ২৩।১০।৯১) বুধবার শারদীয়া-রাসপূর্ণিমাতে মহাসমারোহে উদ্‌যাপিত হয়। এতদুপলক্ষে শ্রীমঠের মন্দিরদ্বয় বিবিধ মাঙ্গলিক দ্রব্যসমূহদ্বারা সুসজ্জিত করা হইয়াছিল।

পূর্ব্বপ্রচারিত নিমন্ত্রণ-পত্রানুযায়ী ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে শ্রীশ্রীগৌর-রাধা-বিনোদবিহারী-জীউর মঙ্গলারতি ও শ্রীমন্দির পরিক্রমান্তে নগর সঙ্কীর্ত্তন করা হয়। তৎপরে ব্রহ্মচারীবৃন্দ বিরহকাতর-হৃদয়ে শ্রীগুর্ব্বষ্টক, বৈষ্ণব-বন্দনা, পঞ্চতত্ত্ব ও শ্রীগুরু-মহিমাসূচক মহাজন-পদাবলী কীর্ত্তন করেন। শ্রীমুকুন্দগোপাল ব্রহ্মচারী শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর-কৃত 'যে আনিল প্রেমধন' বিরহসূচক কীর্ত্তনটী করেন।

বেলা ১১ ঘটিকায় আহূত বিরহ-সভায় শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাচার্য্য পরম পূজ্যপাদ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ, শ্রীমদ্ আচার্য্য মহারাজ, শ্রীগৌড়ীয় পত্রিকার উপ-সম্পাদক শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত পর্য্যটক মহারাজ, শ্রীমৎ সন্ন্যাসী মহারাজ, শ্রীমদ্ আচার্য্য মহারাজ (যুগ্ম-সম্পাদক), শ্রীমৎ দামোদর মহারাজ, শ্রীমৎ যতি মহারাজ প্রমুখ বক্তৃগণ যথাক্রমে শ্রীল কেশব গোস্বামীর অতিমর্ত্ত্য চরিত্র, শ্রীগুরুতত্ত্ব ও গুরুসেবার বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে ভাষণ প্রদান করেন। তদনন্তর উপস্থিত বৈষ্ণববৃন্দ ও ভক্তবৃন্দ শ্রীগুরুপাদপদ্মে পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করেন। দ্বিপ্রহরে ভোগরাগ ও আরাত্রিকান্তে সহস্রাধিক ব্যক্তিকে বিচিত্র মহাপ্রসাদ পরিবেশন করা হয়।

সন্ধ্যায় শ্রীবিগ্রহের আরাত্রিকান্তে রাত্রি ৭টা হইতে বিরহ-সভার দ্বিতীয় অধিবেশন আরম্ভ হয়। এই সভায় প্রথমে শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত আচার্য্য মহারাজ বিভিন্নস্থান হইতে প্রেরিত শ্রীগুরু-বিরহসূচক কবিতা ও প্রবন্ধাদি পাঠ করেন। তৎপরে শ্রীমৎ সন্ন্যাসী মহারাজ, শ্রীমৎ পর্য্যটক মহারাজ, শ্রীমদ্ আচার্য্য মহারাজ 'শ্রীগুরুতত্ত্ব' সম্বন্ধে বক্তৃতা প্রদান করেন। তদনন্তর সভাপতির ভাষণে শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত বামন গোস্বামী মহারাজ 'শ্রীগুরুতত্ত্ব' সম্বন্ধে তাঁহার স্বভাবসুলভ ওজস্বিনী ভাষায় শাস্ত্রীয় তত্ত্বসিদ্ধান্ত আলোচনামুখে বক্তৃতা প্রদান করেন।

বলাবাহুল্য, এই বিরহ-মহোৎসব শ্রীসমিতির অন্যান্য শাখামঠসমূহেও মহাসমারোহে অনুষ্ঠিত হইয়াছে। —নিজস্ব সংবাদ

॥ শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ ॥

স বৈ পুংসাং পরো ধর্ম্মো যতো ভক্তিরধোক্ষজে ।

ধর্ম্মঃ স্বনুষ্ঠিতঃ পুংসাং বিষ্বক্সেন-কথাসু যঃ ।

নোৎপাদয়েদ্যদি রতিং শ্রম এব হি কেবলম্ ॥

অহৈতুক্যপ্রতিহতা যয়াত্মা সুপ্রসীদতি ॥

সেই ধর্ম্ম শ্রেষ্ঠ যাতে আত্ম-পরসন্ন ।
অধোক্ষজে অহৈতুকী ভক্তি বিঘ্নশূন্য ॥

অন্য ধর্ম্ম সুষ্ঠুরূপে পালে যেই জন ।
হরি-কথায় রতি নৈলে পণ্ড সেই শ্রম ॥

৪৩শ বর্ষ — ২৫ কেশব, সঙ্কর্ষণ, ৫০৫ শ্রীগৌরাব্দ; ২৯ অগ্রহায়ণ, সোমবার, ১৩৯৮, ইং ১৬।১২।৯১ — ১০ম সংখ্যা

শ্রীশ্রীকৃষ্ণ-নামাষ্টকম্

[শ্রীমদ্-রূপ-গোস্বামি-বিরচিতম্]

শ্রীকৃষ্ণনাম্নে নমঃ

নিখিল-শ্রুতিমৌলি-রত্নমালা-দ্যুতি-নীরাজিত-পাদপঙ্কজান্ত ।
অয়ি মুক্তকুলৈরুপাস্যমানং পরিতস্ত্বাং হরিনাম সংশ্রয়ামি ॥ ১ ॥

নিখিল বেদের সারভাগ উপনিষদ্-রত্নমালার প্রভা-নিকরদ্বারা তোমার পাদপদ্ম-নখের শেষ-সীমা নীরাজিত হইয়াছে এবং নিবৃত্ততৃষ্ণ মুক্তকুল নিরন্তর তোমার উপাসনা করিতেছেন, অতএব, হে হরিনাম! আমি তোমাকে সর্ব্বতোভাবে আশ্রয় করিতেছি ॥ ১ ॥

জয় নামধেয় মুনিবৃন্দগেয় জনরঞ্জনায় পরমক্ষরাকৃতে ।
ত্বমনাদরাদপি মনাগুদীরিতং নিখিলোগ্রতাপ-পটলীং বিলুম্পসি ॥২॥

মুনিবৃন্দ সর্ব্বদা তোমাকে কীর্ত্তন করিয়া থাকেন, নিখিল লোকরঞ্জনের নিমিত্ত তুমি পরম অক্ষরাকার (অপ্রাকৃত শব্দব্রহ্ম-রূপ) ধারণ করিয়াছ। সাঙ্কেত্য, পরিহাস, স্তোভ, হেলা—এই চারিপ্রকার নামাভাসের সহিতও যদি তোমাকে কেহ উচ্চারণ করেন, তাহা হইলেও তুমি তাঁহার যাবতীয় উৎকট তাপ, (এমন কি লিঙ্গদেহ পর্য্যন্ত) বিনষ্ট করিয়া থাক। অতএব হে নামধেয়! তুমি জয়যুক্ত হও ॥ ২ ॥

যদাভাসোঽপ্যুদ্যন্ কবলিত-ভবধ্বান্তবিভবো
দৃশং তত্ত্বান্ধানামপি দিশতি ভক্তি-প্রণয়িনীম্।
জনস্তস্যোদাত্তং জগতি ভগবন্নাম-তরণে
কৃতী তে নির্ব্বক্তুং ক ইহ মহিমানং প্রভবতি ॥ ৩ ॥

হে ভগবন্নাম-সূর্য্য! তোমার ঈষৎ প্রকাশও (নামাভাসও) সংসারান্ধকার-নিমগ্ন ব্যক্তির অজ্ঞান-তমঃ বিনষ্ট করে, আবার তত্ত্বদৃষ্টিহীন ব্যক্তিকে ভক্তি-বিষয়িণী দৃষ্টিও প্রদান করিয়া থাকে। অতএব এই জগতে কোন্ বিদ্বান্ ব্যক্তিই বা তোমার মহিমা সম্যক্‌রূপে কীর্ত্তন করিতে পারে? ॥ ৩ ॥

যদ্‌ব্রহ্ম সাক্ষাৎকৃতিনিষ্ঠয়াপি বিনাশমায়াতি বিনা ন ভোগৈঃ।
অপৈতি নাম-স্ফুরণেন তত্তে প্রারব্ধ-কর্ম্মেতি বিরৌতি বেদঃ ॥ ৪ ॥

অবিচ্ছিন্ন তৈলধারার ন্যায় ব্রহ্মচিন্তাদ্বারা ব্রহ্ম-সাক্ষাৎকার লাভ করিয়াও যে প্রারব্ধ কর্ম্ম ভোগ ব্যতীত নষ্ট হয় না, কিন্তু হে নাম! জিহ্বাগ্রে তোমার স্ফূর্ত্তিমাত্রেই সেই কর্ম্মবীজ ধ্বংস হইয়া যায়;—বেদ ইহা তারস্বরে কীর্ত্তন করিতেছেন ॥ ৪ ॥

অঘদমন-যশোদানন্দনৌ নন্দসূনো
কমলনয়ন-গোপীচন্দ্র-বৃন্দাবনেন্দ্রাঃ।
প্রণতকরুণ-কৃষ্ণাবিত্যনেকস্বরূপে
ত্বয়ি মম রতিরুচ্চৈর্বর্দ্ধতাং নামধেয় ॥ ৫ ॥

হে অঘদমন, হে যশোদানন্দন, হে নন্দসূনো, হে কমলনয়ন, হে গোপীচন্দ্র, হে বৃন্দাবনেন্দ্র, হে প্রণত-করুণ, হে কৃষ্ণ,—ইত্যাদি বহুস্বরূপে তুমি আবির্ভূত হইয়াছ। অতএব হে নামধেয়! তোমাতে আমার রতি প্রচুর পরিমাণে বর্দ্ধিত হউক ॥ ৫ ॥

বাচ্যং বাচকমিত্যুদেতি ভবতো নাম-স্বরূপদ্বয়ং
পূর্ব্বস্মাৎ পরমেব হন্ত করুণং তত্রাপি জানীমহে।

যতস্মিন্ বিহিতাপরাধ-নিবহঃ প্রাণী সমন্তাদ্ভবে

দাস্যেনেদমুপাস্য সোঽপি হি সদানন্দাম্বুধৌ মজ্জতি ॥ ৬ ॥

হে নাম! 'বাচ্য' অর্থাৎ বিভুচৈতন্য ও আনন্দময়-বিগ্রহ এবং 'বাচক' অর্থাৎ কৃষ্ণ, গোবিন্দ ইত্যাদি বর্ণাত্মক তোমার দুইটী স্বরূপ, কিন্তু আমরা ঐ বাচ্যস্বরূপ হইতে বাচকস্বরূপকে অধিক কৃপাময় বলিয়া মনে করি ; কেননা, জীবসকল তোমার বাচ্যস্বরূপে কৃতাপরাধ (সেবাপরাধী) হইয়া বাচকস্বরূপ তোমার নাম উচ্চারণ করিবামাত্রই (নিরপরাধ হইয়া) ভগবৎপ্রেম-সুখে নিমজ্জিত হন ॥ ৬ ॥

সূদিতাশ্রিত-জনার্ত্তিরাশয়ে রম্যচিদ্ঘন-সুখ-স্বরূপিণে।

নাম গোকুল-মহোৎসবায় তে কৃষ্ণ পূর্ণবপুষে নমো নমঃ ॥ ৭ ॥

হে নাম! হে কৃষ্ণ! তুমি আশ্রিত-জনগণের পীড়া-(নামাপরাধ) সমূহ নাশ কর ; তুমি—পরমসুন্দর চিদ্ঘনস্বরূপ গোকুলবাসিগণের মূর্ত্তিমান আনন্দ-স্বরূপ। অতএব পরিপূর্ণ বৈকুণ্ঠস্বরূপ তোমাকে পুনঃ পুনঃ নমস্কার করি ॥৭॥

নারদবীণোজ্জীবন সুধোর্ম্মিনির্য্যাস-মাধুরীপূর।

ত্বং কৃষ্ণনাম কামং স্ফুর মে রসনে রসেন সদা ॥ ৮ ॥

হে কৃষ্ণনাম! তুমি নারদের বীণার সঞ্জীবন-স্বরূপ এবং মাধুর্য্য-প্রবাহরূপ অমৃত-তরঙ্গের সারাংশ-স্বরূপ। অতএব তুমি আমার জিহ্বাতে সর্ব্বদা অনুরাগের সহিত যথেষ্টরূপে স্ফূর্ত্তিলাভ কর ॥ ৮ ॥

প্রশ্নোত্তর

(পূর্ব্বপ্রকাশিত ৪৩শ বর্ষ, ৯ম সংখ্যা, ৩২৬ পৃষ্ঠার পর)

১৬। বৈষ্ণব-শাস্ত্রমতে কে জগদ্গুরু হইতে পারেন ?

"বৈষ্ণব-ধর্ম্মে ইহাই স্বীকৃত আছে যে, যিনি প্রাকৃত-অপ্রাকৃত তত্ত্বের ভেদ জানিয়া অপ্রাকৃত কৃষ্ণভক্তি শিক্ষা করিয়াছেন, তিনি সর্ব্বজীবের উপদেষ্টা ইহাতে জন্মগত বর্ণাদি ও সংস্কারগত আশ্রমাদির অপেক্ষা নাই।"

—অঃ প্রঃ ভাঃ অঃ ৫।৮৪-৮৫

১৭। গুরুর একমাত্র স্বরূপ-লক্ষণ কি ?

"বর্ণাশ্রম-বিচার পৃথক্ রাখিয়া যেখানে কৃষ্ণতত্ত্ববেত্তা পাওয়া যায়, তাঁহাকেই গুরু বলিয়া গ্রহণ করিতে পারা যায়।"

—জৈবধর্ম্ম ২০শ অঃ

১৮। সদ্গুরু শিষ্যকে কি উপদেশ প্রদান করেন ?

"বৈষ্ণব-গ্রন্থের সর্ব্বত্র শুদ্ধজ্ঞানের প্রশংসা আছে। মহাপ্রভুর সমস্ত শিক্ষাতেই এই তিনটী কথা—সম্বন্ধ-জ্ঞান, অভিধেয়-সাধন ও প্রয়োজন। ভগবান্ কি তত্ত্ব, জীব কি তত্ত্ব ও সমস্ত জড়ব্রহ্মাণ্ড কি তত্ত্ব এবং উক্ত তিন তত্ত্বের পরস্পর কি সম্বন্ধ,—ইহা ভাল করিয়া জানার নাম সম্বন্ধ-জ্ঞান। তিনিই সদ্গুরু, যিনি এই সম্বন্ধ-জ্ঞান শিষ্যকে ভাল করিয়া উপদেশ দিয়া প্রয়োজন-সাধনে অভিধেয় দেখাইয়া দেন। এই সম্বন্ধ-জ্ঞান পাইলে জীবের আর কি কোনপ্রকার জ্ঞান অর্জ্জন করিতে বাকী থাকে ? জড়ব্রহ্মাণ্ডে তোমার যতপ্রকার বিজ্ঞান ও জ্ঞান চলিতেছে, তাহা সকলই জানা যায়।"

—'সমালোচনা', সঃ তোঃ ১১।১০

১৯। দীক্ষামন্ত্র-দাতা গুরু ও হরিনাম-প্রদাতা গুরুতে পার্থক্য কি ?

"যিনি নাম-তত্ত্ব শিক্ষা দেন এবং নামের সর্ব্বোত্তমতা স্থাপনপূর্ব্বক নাম বা নামাত্মক মন্ত্র প্রদান করেন, তিনিই নাম-গুরু। দীক্ষাগুরুই নাম-গুরু। মন্ত্রই নাম। মন্ত্র হইতে নামকে পৃথক্ করিলে মন্ত্রত্ব থাকে না। পক্ষান্তরে কেবল নাম-উচ্চারণেও মন্ত্র-উচ্চারণ হয়।"

—'গুর্ব্ববজ্ঞা', হঃ চিঃ

২০। শিষ্য গুরুকে কিরূপ বিচারে দর্শন করিবেন ?

"গুরুদেবকে মৎস্বরূপ জানিবে, গুরুতে সামান্য-বুদ্ধি করিবে না।"

—অঃ প্রঃ ভাঃ আঃ ১।৪৬

২১। গুরুবর্গ তাঁহাদের অপ্রকট-লীলায় জীবের প্রতি কি কৃপা বিতরণ করেন ?

"The souls of the great thinkers of the by-gone ages, who now live spiritually, often approach our enquiring spirit and assist it in its development."

—The Bhagabat: Its Philosophy, Its Ethics & Its Theology.

২২। কাহাকে 'আচার্য্য' বলা যায় ? গৌড়ীয়-বৈষ্ণবাচার্য্যের কৃত্য কি ?

"যিনি স্বয়ং আচরণ করিয়া ধর্ম্ম শিক্ষা দেন, তিনি আচার্য্য। কেবল

বিতর্ক উৎপন্ন করিয়া সাংসারিক উন্নতি লাভ করিলে আচার্য্যত্ব লাভ হয় না। গৌড়ীয়-সম্প্রদায়ে যাঁহারা আচার্য্য-পদ লাভ করিয়াছেন, তাঁহাদের সম্প্রদায়ের অনর্থসকল দূর করিবার চেষ্টা করা উচিত।"

—'শ্রীমহাপ্রভুর সম্বন্ধে বিতর্ক', সঃ তোঃ ৪।১

২৩। আচার্য্যান্বয়গণের প্রধান কার্য্য কি ?

"গৌড়ীয়-সম্প্রদায়ে চারিশত বৎসরের মধ্যে অনেক প্রকার অনর্থ উদয় হইয়াছে। সেই সকল অনর্থ সম্পূর্ণরূপে উৎপাটন করা আচার্য্যসন্তানদিগের প্রধান কার্য্য।"　—'শ্রীমহাপ্রভুর সম্বন্ধে বিতর্ক', সঃ তোঃ ৪।১

২৪। আচার্য্য কিরূপে জীবের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করেন ?

"যাঁহারা আচার্য্য-পদ গ্রহণ করিবেন, তাঁহারা অবশ্যই প্রথমে স্বয়ং ধর্ম্মপথ অবলম্বনপূর্ব্বক অন্য জীবগণকে স্বীয় সচ্চরিত্র দেখাইয়া শ্রদ্ধা সংগ্রহ করিবেন। আচার্য্য-পুরুষের সদাচারই সকলে আদর করিয়া গ্রহণ করেন।"

—'নামবলে পাপ-প্রবৃত্তি একটী নামাপরাধ', সঃ তোঃ ৮।৯

২৫। কৃষ্ণবহির্ম্মুখ বা কপট ব্যক্তিকে কি বৈষ্ণবাচার্য্য-সন্তান বলা যাইবে ?

"বৈষ্ণব-মাত্রেই আমাদের প্রভু। যেখানে ভক্তি, সেইখানেই প্রভুতা (গুরুত্ব)। বংশ-মর্য্যাদা ভক্তি-তত্ত্বের অঙ্গ নয়। কোন সময়ে এক ব্যক্তি আমাদিগকে এরূপ বলেন যে, শ্রীশ্রীসীতানাথের পুত্র অচ্যুতানন্দ ব্যতীত আর কেহ গোস্বামি-পদবাচ্য ন'ন, যেহেতু স্বয়ং সীতানাথ তাঁহার অন্যান্য পুত্রদিগকে গৌর-বিমুখ বলিয়া ত্যাগ করিয়াছিলেন। কোন সময়ে এক ব্যক্তি বলেন যে, শ্রীশ্রীবীরচন্দ্র প্রভুর ঔরসজাত সন্তান না থাকায় কাহাকেও নিত্যানন্দ-সন্তান বলা যায় না এবং খড়দহের গোস্বামীদিগকে প্রভু বলা উচিত নয়। আবার শুনিতেছি যে, বাঘ্‌নাপাড়ার গোস্বামীদিগকেও প্রভু বলিতে নাই, যেহেতু তাঁহারা শ্রীশ্রীজাহ্নবা-মাতার শিষ্য-মাত্র। এইরূপ কুতর্ক আমরা শুনিতে ইচ্ছা করি না। আমরা সকল বৈষ্ণবকেই কৃষ্ণবিগ্রহ বলিয়া পূজা করি এবং আবশ্যকমত আচার্য্য-বংশের যথাযোগ্য মর্য্যাদা করি। কৃষ্ণ-বহির্ম্মুখ বা ধর্ম্মান্তরগ্রাহী হইলে বংশ-মর্য্যাদা কোনক্রমেই দিতে পারি না। খ্রীষ্টান বন্দ্যোপাধ্যায়কে কি ব্রাহ্মণ-বংশ-মর্য্যাদা দেওয়া কর্ত্তব্য হয়? তদ্রূপ প্রভু-সন্তান যদি স্বধর্ম্ম ত্যাগ করেন, তবে তিনি আর বংশ-মর্য্যাদার আশা করিতে পারেন না।"　—'শ্রীজীবগোস্বামী প্রভু', সঃ তোঃ ২।১২

২৬। ভক্তিসিদ্ধান্তজ্ঞানহীন পণ্ডিত কি আচার্য্য ?

"শ্রীমন্মহাপ্রভুর জন্মের পূর্ব্ব হইতেই দেবানন্দ পণ্ডিত শ্রীভাগবতের ব্যাখ্যা-বিষয়ে 'আচার্য্য' বলিয়া বিখ্যাত ছিলেন। মহাপ্রভু স্বয়ং অধ্যাপক ও ভক্তি-প্রচারক হইয়া দেবানন্দের পাঠ ও অভক্ত-ব্যাখ্যা শ্রবণ করত নিতান্ত অসন্তুষ্ট হইয়াছিলেন। বহুদিন পরে ঐ দেবানন্দ বক্রেশ্বর পণ্ডিতের কৃপায় শুদ্ধভক্তি-তত্ত্ব অবগত হন।" —'শ্রীমদ্ভাগবতাচার্য্য', সঃ তোঃ ৯।১২

২৭। ভক্তিসিদ্ধান্তবিরুদ্ধ আচরণের দ্বারা কি ক্ষতি হয়?

"বৈষ্ণবের মধ্যে যিনি ভক্তিসিদ্ধান্তবিরোধী আচরণ করেন, তিনি সম্প্রদায়ের অনর্থের মূল।"

—'শ্রীমহাপ্রভুর সম্বন্ধে বিতর্ক', সঃ তোঃ ৪।১

২৮। আচার্য্য বা গুরুদেব অসৎসিদ্ধান্তের সমালোচনা করিলে কি তিনি 'প্রজল্পী' বলিয়া গণিত হইবেন না?

"শুকদেব শিষ্যোপদেশ-জন্য এইরূপ বিষয়ীদিগের চর্চ্চা করিয়াও প্রজল্পী হন নাই। সুতরাং এরূপ কার্য্য হিতকর বলিয়া গ্রহণ করিতে হইবে। আবার শ্রীমন্মহাপ্রভু উপদেশের জন্য স্বীয় শিষ্যদিগকে অসৎ বৈরাগীর বিষয় বলিয়াছেন।" —'প্রজল্প', সঃ তোঃ ১০।১০

২৯। আচার্য্যগণের মধ্যে কি মতভেদ আছে?

"স্ব-স্বরূপস্থিত আত্মা ভারতে বসিয়া যাহা বলিবেন, স্ব-স্বরূপস্থিত অন্য আত্মা উত্তরকেন্দ্রে বসিয়া তাহাই বলিবেন। বৈকুণ্ঠস্থিত আত্মা সেই উত্তর দিবেন; কেননা, শুদ্ধ আত্মাদিগের সিদ্ধান্তে মায়িক চিত্রগুণ নাই, অতএব পৃথক্ হইতে পারে না। —তত্ত্ববিবেক, ১ম অনুঃ ২

৩০। আচার্য্য কি নির্ব্বিচারে মন্ত্রদীক্ষা দান করেন?

"পূজ্যপাদ মন্ত্রাচার্য্যগণ যথাশাস্ত্র সৎপাত্র থাকিয়া উপযুক্ত পাত্রকে মন্ত্র দান করিবেন। এতৎসম্বন্ধে পরস্পর পরীক্ষা-বিধি শ্রীহরিভক্তিবিলাসে উল্লিখিত হইলেও কার্য্যে প্রচলিত হয় না। তন্নিবন্ধন গুরু-শিষ্যের উভয়েরই পতন ও তৎসঙ্গে সম্প্রদায়-বিকার অনিবার্য্য হইয়া উঠিয়াছে।"

—'শ্রীমহাপ্রভুর সম্বন্ধে বিতর্ক', সঃ তোঃ ৭।১

৩১। গৃহস্থ-বেষ-ধৃক্ পুরুষ কি আচার্য্য হইতে পারেন?

"গৃহস্থদিগের মধ্যে যাঁহারা নববিধা ভক্তি আচরণে পটু, তাঁহারাই ভক্তি-কাণ্ডের আচার্য্যতা গ্রহণ করিবার যোগ্য।"

—'আচার ও প্রচার,' সঃ তোঃ ৪।২

৩২। গৃহস্থবেষী আচার্য্য কি সন্ন্যাস-প্রদান করিতে পারেন ?

"গৃহস্থ ভক্তগণ যে-স্থলে আচার্য্য হইয়া সন্ন্যাসের লিঙ্গ ও মন্ত্রাদি প্রদান করেন, সে-স্থলে সন্ন্যাস-গ্রহীতার বিশেষ অমঙ্গল হয়।"

—'আচার ও প্রচার,' সঃ তোঃ ৪।২

৩৩। একান্ত সদাচারী আচার্য্যকেও লোকে দোষারোপ করে কেন ?

"সকল আচার্য্যের আচার্য্য শ্রীনিত্যানন্দ-প্রভু অবধূত হইলেও কখনই নিজ-চরিত্রে কোন দুষ্টাচার দেখান নাই। এমন নির্ম্মল চরিত্র প্রভুকে যাহারা দুষ্টাচারী বলিয়া নিন্দা করেন, তাঁহাদের জীবনে ধিক্। অসদাচারী ব্যক্তিগণ আচার্য্য-চরিত্রে মিথ্যা দোষারোপ করিয়া আপনাদের দোষকে গুণ বলিয়া দেখাইতে চেষ্টা করেন। হা কলি! তুমি যাহা প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলে, তাহা করিলে! অনেকগুলি ব্যক্তি কপট-বৈষ্ণব হইয়া শ্রীনিত্যানন্দকে মৎস্য-মাংসাশী বলিয়া নিন্দা করেন, আবার ধর্ম্মমূর্ত্তি শ্রীমহাপ্রভুতে যোষিৎসঙ্গ-দোষারোপ করিয়া তাঁহাকে নব-রসিক মধ্যে গণন করেন! নির্ম্মল-চরিত্র শ্রীরূপ গোস্বামী ও শ্রীরামানন্দ প্রভৃতির সম্বন্ধে মিথ্যা স্ত্রীসঙ্গ-দোষ রচনা করিয়া জগৎকে বঞ্চনা করেন।" —'নামবলে পাপ-প্রবৃত্তি একটী নামাপরাধ,' সঃ তোঃ ৮।৯

—জগদ্গুরু শ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুর

ভোগবাদ ও ভক্তি

শ্রীমদ্ভাগবত নানাস্থানে ভগবদ্-বস্তুর স্বরূপ-বর্ণনে মুখ্য বিচারমুখে যে "অধোক্ষজ" শব্দের প্রয়োগ করিয়াছেন, সেই শব্দটীর সম্যক্ বিশ্লেষণ শ্রীজীব-গোস্বামী প্রভুপাদের সন্দর্ভে উল্লিখিত আছে। যাঁহারা এই প্রধান লক্ষিতব্য বিষয়টির কৃপা লাভ করেন নাই, তাঁহারা স্বীয় অনর্থময় ভোগপরতায় ন্যূনাধিক আবদ্ধ আছেন।

যাঁহাদের সুনির্ম্মল আত্মা ভক্তিবিরোধী জড়শাক্তেয়-মতবাদপূর্ণ বিচারের প্রণালীতে ন্যূনাধিক কলুষিত হইয়াছে, তাঁহারা শ্রীগৌরসুন্দরের পরম নির্ম্মল চরিত্র আলোচনা করিবার যতই না কেন প্রয়াস করুন, হঠাৎ ঈশানকোণের ঝঞ্ঝাবাত তাঁহাদের হৃদয়ের সুকোমল সেবা-প্রবৃত্তি চিরতরে উৎক্ষিপ্ত করিয়া দিবে—ইহা ধ্রুব নিশ্চয়। ভোগপরতাই যাঁহাদের মুখ্য মূল, তাঁহারা ত্যাগ-

পরতাকে প্রতিপক্ষ-জ্ঞানে ভোগোদ্দিষ্ট ব্যাপারকে 'ভক্তি' বলিয়া ভ্রমে পতিত হইবেন। এই জন্যই পরম-করুণাবতারী শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব শ্রীরূপগোস্বামী প্রভুকে ভক্তি-সংজ্ঞা শিক্ষা দিবার কালে অন্যাভিলাষিতাশূন্যা অনুকূল-কৃষ্ণানুশীলনময়ী আত্মবৃত্তিকে 'উত্তমা ভক্তি' বলিয়া সুদৃঢ় ধারণা করাইয়াছিলেন। সেই শ্রীরূপের অনুগ গৌড়ীয়-বৈষ্ণবরাজেন্দ্র আচার্য্যপ্রবর শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভুর সুলেখনী হইতে আমরা শ্রীচৈতন্যদেবের উপদেশ-সমূহের যে সুগভীর তাৎপর্য্য অবগত হই, তাহা পরিণামে ন্যূনাধিক ভোগপরতায় একান্ত আদরের বিষয় হয় না।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের হার্দ্দভাব বুঝিতে অসমর্থ হইয়া শ্রীমায়াপুর-নিবাসী জনৈক বিদ্যার্থী গোপীভজনের কথা বুঝিতে প্রয়াস করিয়াছিল। তৎকালে শ্রীগৌরসুন্দরের বিপুল ক্রোধলীলা নানা সরল-হৃদয় ব্যক্তির পরকালের উন্নতির ব্যাঘ্যাত-স্তম্ভ হইয়াছিল। এই বিদ্যার্থীর অপরাধের মাত্রা অতি অল্প—ইহাই সাধারণের বিশ্বাস ; কিন্তু প্রকৃতপ্রস্তাবে তাহা নহে। যাঁহারা ভগবদ্ভক্তের অধিকারত্রয় আলোচনা করিয়াছেন, তাঁহারাই জানেন যে, সর্ব্বোত্তমতা, মধ্যমতা ও কনিষ্ঠতা—এই তিন প্রকার আধিকারিকতা এক নহে। এজন্যই শাস্ত্র ভগবন্নামাদির ও ভগবদ্ ভজনের উপদেশ দিয়াছেন। এই আপাত-কনিষ্ঠাধিকারোচিত উপদেশকেই অন্তিম উপদেশ মনে করিয়া যাঁহারা বুদ্ধির হঠকারিতা প্রদর্শন করেন, তাঁহাদের বিচার-দৌর্ব্বল্যের ক্ষয়-সাধন করিবার মানসে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব শ্রেষ্ঠ ভজনের বাধার বিরুদ্ধে উপদেশকের অতিমর্ত্ত্য স্বভাব প্রদর্শন করিয়াছেন। সাধারণ অর্ব্বাচীন সম্প্রদায় তাহাদের সঙ্কীর্ণ জ্ঞানদ্বারা বিচার করিলে বিদ্যার্থীর অপরাধের মাত্রা অল্প বলিয়াই বুঝিয়া থাকে। এইরূপ বিচারের অনুকরণকারী অতিক্ষুধী ব্যক্তিগণ ভোগপরতাহেতু গোপাল-চাপালের অপরাধসীমার পরতমতা লক্ষ্য করিতে ঔদাসীন্য প্রকাশ করিলেই তাঁহাদের স্বরূপ ঐকান্তিক ভক্তগণের বিচারে ধরা পড়িয়া যায়। অর্থাৎ ভগবদ্বিমুখ ব্যক্তিসকল ভগবৎপ্রসঙ্গ-বিমুখ হইয়া সংসার-সুখে প্রমত্ত হন এবং তাহাতে বিচরণ করাই তাঁহাদের গবেষণার তাৎপর্য্য বলিয়া মনে হয়।

গোপাল-চাপাল উক্ত বিদ্যার্থী অপেক্ষাও অধিক অপরাধী। বিদ্যার্থী শ্রীগৌরসুন্দরকে আক্রমণ করিতে যায় নাই ; পরন্তু বিদ্যার্থীই শ্রীগৌরসুন্দরকর্ত্তৃক বিতাড়িত হইয়াছিল। পক্ষান্তরে গোপাল-চাপাল শ্রীগৌরসুন্দরের প্রাণাধিক ভক্ত শ্রীবাস পণ্ডিতকে কামভোগপর কুবিলাসী পাষণ্ড সজাতীয়াশয় ভক্তিবিরোধী

জনগণের সহিত সমতাযুক্ত বলিয়া প্রতিপন্ন করিবার জন্য জ্ঞাতসারেই চেষ্টা-পরায়ণ হইয়াছিল, সুতরাং ঐ সকল অপবিত্র দ্রব্য যাহা অন্যাভিলাষিতা-শূন্য শুদ্ধভক্তের স্পর্শমাত্র হইতেও সম্পূর্ণ সুদূরে অবস্থিত—সেইসকল দ্রব্য 'হাড়ি' ডাকাইয়া দূরে নিক্ষেপ করিবার কথা বর্ণনা ভগবদ্ভক্তের ভজনে যে একমাত্র আনুষ্ঠানিক কৃত্য—ইহা জনপ্রিয়তা-ধর্ম্মে আবদ্ধ জনগণের দৃষ্টির বৈষম্য-বিধানকারী।

যাঁহারা নিজে অন্যাভিলাষী বলিয়া অন্যাভিলাষিতার সর্ব্বতোভাবে গর্হণকে অনুমোদন করেন না, তাঁহারা অপ্রিয়সত্য গোপন করিয়া প্রিয়বাক্য-দ্বারা আত্মপ্রতিষ্ঠা স্থাপনে তৎপর হন। তাঁহারা কোনওদিনই উত্তমা ভক্তি কাহাকে বলে বুঝিতে পারিবেন না। তাই বলিয়া আমরা এরূপ বলিতেছি না যে, ভক্তিবিরোধি-জনগণের শাস্তিবিধান-কল্পে অতি পরুষ ভাষায় তাঁহাদিগকে নিরস্ত করা উচিত।

শ্রীকবিরাজ গোস্বামী পরম নিপুণ ভক্তিসিদ্ধান্তচার্য্য শ্রীল সনাতন গোস্বামীর কৃপাভাজন গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্য-শিরোমণি শ্রীরূপেরই অনুগত। সুতরাং তাঁহার লিপি-নৈপুণ্য-সন্দর্শনে যাঁহাদের যোগ্যতা হয় নাই, তাঁহারাই "ছানি" রোগদুষ্ট চক্ষে ঝাপ্‌সা দেখার ন্যায় মনে করিতে পারেন যে, শ্রীল কবিরাজ গোস্বামীতে অনুদারতা প্রবেশ করিয়াছে এবং সম্ভবতঃ উহা কবিরাজ গোস্বামীর লেখা নহে।

জড়শক্তি-পরিণামবাদী ব্যক্তি চিচ্ছক্তি-পরিণামবাদের কথা ধারণা করিতে অসমর্থ। সুতরাং তিনি শাক্তেয় মতবাদের কোনপ্রকার অপ্রয়োজনীয়তা প্রদর্শিত হইতে দেখিলে সেই মতবাদ সংরক্ষণের জন্য নানাপ্রকার উদ্ভাবনী শক্তির দাস্য করিতে সমুৎসুক হইয়া পড়েন।

প্রধান বিচার্য্য বিষয় এই যে—শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভু ভবানীপূজার দ্রব্যগুলি হাড়ির দ্বারা পরিষ্কার করাইবার ব্যবস্থার সত্য ঘটনাটি পরিবর্ত্তন করিয়া অন্যরূপে বর্ণন করিলেন না কেন? তদুত্তরে শ্রীল কৃষ্ণদাসের জনৈক ভৃত্যানুভৃত্য বলিতে চাহেন যে, ভগবদ্ভক্তের প্রতিকূলাচরণ করিবার উদ্দেশ্যে অমেধ্য ও অযোগ্য বস্তুসকল অন্যান্য বস্তুর সংযোগে পবিত্রতার নামে চালাইয়া দিয়া বিশুদ্ধসত্ত্বকে গুণান্তর্গত মিশ্রসত্ত্বে পরিণত করিবার যে আকাঙ্ক্ষা ও চেষ্টা জড়-শাক্তেয়-বিচার-পরায়ণগণ করিয়া থাকেন, তৎসমস্ত সাধারণের চক্ষে অর্থাৎ ভোগপর-দৃষ্টিতে তত অধিক দোষাবহ বলিয়া বোধ হয় না; কিন্তু বস্তুশক্তি-জ্ঞানের প্রধান প্রতিপক্ষরূপ যে অপরাধকে অল্প বলিয়া বোধ হইতেছে, সেই

অপরাধটুকুও অন্যাভিলাষীর উত্তমভক্তি-বিজ্ঞান যাহাতে বাধা দিতে না পারে তজ্জন্য শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভু শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের আদি ১৭শ অধ্যায়ে গোপাল-চাপালের প্রসঙ্গ বর্ণনা করিয়া স্বীয় অহৈতুকী অসীম দয়ারই পরিচয় দিয়াছেন।

কুমিল্লা ভিক্টোরিয়া কলেজের সংস্কৃতাধ্যাপক পণ্ডিত শ্রীযুক্ত * মল্লিক এম্. এ., বি. এল. মহাশয়ের সহিত আমরা একমত হইতে পারিলাম না। জনপ্রিয়তা-হানির আতঙ্কে পীড়িত হইয়া যাহাতে অন্য দেবতার ভক্তগণের কিঞ্চিন্মাত্র দুঃখ না হয়, তজ্জন্য সত্যঘটনাকে আবৃত করিবার চেষ্টা কোনওরূপেই শ্লাঘ্য নহে। যদি আচার্য্যপ্রবর শ্রীকবিরাজ গোস্বামী প্রভু মল্লিক মহাশয়ের ন্যায় ভক্তিসদাচারে অনিপুণ জনগণের নিকট হইতে প্রশংসা লাভের আশায় মল্লিক মহাশয়ের অভিনব প্রস্তাবের অনুমোদন করিতেন, তাহা হইলে আমরা হয়ত মদ্য-মাংস ভিন্ন ভবানী-পূজার অন্য দ্রব্যগুলি শ্রীবাসের দ্বারে রাখিবার পক্ষপাতী হইতাম এবং শাক্তেয়-মতবাদ-বিচারপর ব্রাহ্মণের দ্বারা ঐ পূজা করাইয়া শ্রীবাসের চরণে ন্যূনাধিক অপরাধগ্রস্ত হইতাম। শুদ্ধভক্তি-সংরক্ষণের জন্য শ্রীরূপানুগ কবিরাজ গোস্বামীর যে লিপিনৈপুণ্য, তাহাতে কোন দোষ প্রদর্শন করিতে গেলে আমরা শিহরিয়া উঠি। ভগবদ্ভক্ত লঙ্ঘনের তুল্য অপরাধ আর নাই।

—জগদ্গুরু ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল সরস্বতী ঠাকুর

"যত dear & near ones—সকলেরই সঙ্গ ছেড়ে দিতে হ'বে, যদি তাঁরা চৈতন্যবিমুখ হন। চৈতন্যবিমুখ কিনা, তা' জান্‌বার উপায় প্রকৃত চৈতন্যভক্তের প্রতি মৎসরতা কা'র কতটুকু আছে, তাই দেখে। প্রকৃত চৈতন্যভক্তের প্রতি মৎসর ব্যক্তি চৈতন্য-বিমুখ। আর চৈতন্য-ভক্তের মনোঽভীষ্টপূরণে আনুকূল্যকারী ব্যক্তিই শ্রীচৈতন্যের সেবায় উন্মুখ।"

"একমাত্র ভক্তিবিনোদ-ধারায় শুদ্ধ হরিভজনের কথা অবস্থিত আছে। এই ভক্তিবিনোদ-ধারাকে শ্রৌতবাণী কীর্ত্তনের মধ্যে নিত্য-কাল সঞ্জীবিত রাখতে হবে। সত্য কথার কীর্ত্তন বন্ধ হ'লে আমরা ভক্তিবিনোদ-ধারা হ'তে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাব।"

—শ্রীল সরস্বতী প্রভুপাদ

শিষ্য-বাৎসল্যের নিদর্শন

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠ
পোঃ নবদ্বীপ (নদীয়া)
ইং ১০।৭।৬৪

স্নেহাস্পদেষু—

* *। আপনার M.O. তে * * র ১৫'০০ ও আপনার ৫'০০ এই ২০'০০ টাকা পাইয়াছি। আপনার এখন কোন রোজগার নাই। আপনি টাকা পাঠাইলেন কেন? আপনার অবস্থাপেক্ষা মনের জোর বেশী। আর্থিক অবস্থা খারাপ হইলে মনের জোরে সব কাজ করিতে পারিবেন না। আপনি টাকা এখন পাঠাইবেন না। ভগবদিচ্ছায় আপনার রোজগারের প্রাচুর্য্য হইলে অর্থাদির দ্বারা সেবা করিবেন, নচেৎ নহে। অন্যের দ্বারা সেবা করাইলেও সেবাফল পাইবেন। আর কষ্ট করিবেন না। আপনি কষ্ট পাইলে আমিও কষ্ট পাইব—ইহা স্মরণ রাখিবেন।

আপনার দাদা মাঝে মাঝে এখানে আসেন। তাহার speculationএ আমার ভয় লাগে, কখন তাহারও বিপদ আসিয়া ঘাড়ে চাপে। শ্রীমদ্ ভাগবতের একটী উপদেশ-বাণী স্মরণ রাখিবেন। তাহা এই—"যস্যাহং অনুগৃহ্লামি হরিষ্যে তদ্ধনং শনৈঃ।"

* * * বাবু ও * * *কে সেবায় উৎসাহ দিবেন। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, শ্রীচৈতন্যভাগবত, জৈবধর্ম্ম ও শ্রীমদ্ভাগবত আদি পাঠ করিয়া সকলকে শুনাইবেন। কলিকাতায় * * বাবু আমার সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন। সকলকে আমার আশীর্ব্বাদ জানাইবেন। শ্রীরথযাত্রা-উৎসব আরম্ভ হইয়াছে। আমি নবদ্বীপে আছি ও থাকিব। জলপাইগুড়িতে বর্ষারম্ভ হওয়ায় প্রচারকগণ সেখানে যান নাই। বর্ষা থামিলে যাইবেন। আমার শরীর পুনরায় খারাপ হইয়াছে। Prof. প্রভুকে আমার দণ্ডবৎ জানাইবেন। বোধহয় তাঁহারও শরীর খারাপ। আমার সংবাদ তাঁহাকে দিবেন অথবা এই পত্রখানি তাঁহাকে দেখাইবেন। তাঁহার কাছে হরিকথা শুনিবেন। ইতি—

নিত্যমঙ্গলাকাঙ্ক্ষী—
—শ্রীভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব

আমরা কাহার কিঙ্কর ?

'কিং করোমি ইতি জিজ্ঞাসয়তি যঃ সঃ কিঙ্করঃ'—ইহাই কিঙ্করের প্রকৃতার্থ। যেখানে ক্ষুদ্রবস্তু কোন বৃহদ্বস্তুর অধীনতা স্বীকার করে, নিজের ভালমন্দ বিচার ছাড়িয়া নিজাপেক্ষা শ্রেষ্ঠের উপদেশ বা ইচ্ছাকেই স্বেচ্ছা বলিয়া বরণ করে, প্রত্যেক কার্য্যই যেখানে প্রভু-ইচ্ছানুগত্যে অনুষ্ঠিত, সেইখানেই কিঙ্করের কিঙ্করত্ব। আমরা জীব—আমরা চেতন—পূর্ণচেতনের বিভিন্নাংশ ক্ষুদ্রচেতন। সুতরাং আমাদের অস্তিত্ব যখন বৃহচ্চেতনাধীন বা বৃহচ্চেতন হইত, তখন আমরা যে কাঁহার কিঙ্কর বা অধীন তাহা বোধ হয় বেশী করিয়া বলিতে হইবে না। কিন্তু বরাভয়প্রদ ভগবান্ কৃষ্ণের কিঙ্কর হইয়াও আমরা বর্ত্তমানে নিজেকে তাঁহার কিঙ্করত্বে প্রতিষ্ঠিত রাখিতে চাহি না বলিয়াই কৃষ্ণমায়া উচ্ছৃঙ্খল আমাদিগকে অশান্তি-রাণীর ক্রোড়ে নিক্ষিপ্ত করিয়া শান্তির প্রলোভন-প্রদর্শনমুখে কেবল কষ্টই দিতেছে। যেখানে পিতা-পুত্র বা প্রভু-ভৃত্যের নিত্যসম্বন্ধ স্থিরীকৃত সেখানে ভয়াদির কোন কথা নাই বা থাকিতে পারে না। যেখানে প্রভু নিত্য, প্রভু-ভৃত্যগণ নিত্য এবং প্রভু-সেবাও নিত্যা বা অনন্ত-মুখিনী, সেখানে অনিত্যত্বের অবস্থান না থাকায় তাহা পরমানন্দপ্রদ এবং নিত্য নব-নবায়মানভাবে উল্লাসময়। তাই শ্রীমদ্ভাগবত বলিয়াছেন,—

ভয়ং দ্বিতীয়াভিনিবেশতঃ স্যাদীশাদপেতস্য বিপর্য্যয়োঽস্মৃতিঃ।
তন্মায়য়াতো বুধ আভজেত্তং ভক্ত্যৈকয়েশং গুরুদেবতাত্মা ॥

যেখানে অদ্বয়জ্ঞানের অভাব—কৃষ্ণই একমাত্র প্রভু ও সেব্য এবং আর বাদবাকী সকলেই তাঁর সেবক এবং দৃশাদৃশ্য বস্তুমাত্রেই তাঁহার সেবোপকরণ, এইরূপ কৃষ্ণকার্ষ্ণ-সম্বন্ধ-দর্শনের অভাব পরিলক্ষিত সেইখানেই ভয়োৎপত্তির সম্ভাবনা। যখনই আমরা অসহায়—কৃষ্ণসম্বন্ধবিচ্যুত তখনই আমরা ভয়ের দ্বারা আক্রান্ত। কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে আমরা যখন জানিতে পারি যে, আমরা ভয়েরও ভয় যিনি সেই সর্ব্বশক্তিমান্ বিপদ্বারণ মধুসূদন শ্রীকৃষ্ণের একান্ত প্রেষ্ঠ ভগবান্ শ্রীগুরুদেবের অনুগত বা তিনিই আমাদের একমাত্র সহায়, রক্ষাকর্ত্তা, পালনকর্ত্তা, তখনই আমরা নির্ভয় হতে পারি। যখন আমরা সর্ব্বশক্তিমান্ বলদেবের বা গুরুকৃষ্ণের অনুগত বা কৃপাবর্ম্মে রক্ষিত, লালিত ও পালিত, তখন আর ভয় কিসের ? কিন্তু এই আনুগত্য-ভাবের অভাব যখন হৃদয়ে পরিলক্ষিত হয় অর্থাৎ যখন আমরা গুরুকৃষ্ণের কৃপালাভে পরাঙ্মুখ হই বা

কৃষ্ণবিস্মৃত হই তখনই কৃষ্ণাস্মৃতিহেতু আমাদের বিপর্য্যয় অর্থাৎ দেহ ও মনে আত্মবুদ্ধি আসিয়া উপস্থিত হয়। তাই তখন আমরা নিজদিগকে এদেশের অধিবাসী মনে করিয়া প্রাকৃত অভিমান-তরঙ্গের ঘাত-প্রতিঘাতে পিষ্ট হই। আমরা যে দুঃখ ভোগ করি, তাহার মূল কারণ অনুসন্ধান করিতে পারি না বলিয়া আমরা বিহ্বল হইয়া দুঃখনিবৃত্তির জন্য ইতঃস্ততঃ প্রধাবিত হই; কিন্তু তাহাতে আমাদের কোন ফল হয় না। কিন্তু যাঁহারা বুদ্ধিমান্, তাঁহারা ত্রিতাপজ্বালা নিরাকরণের জন্য সদ্বৈদ্য সাধুর নিকট গমন করেন এবং তাঁহার আদেশ ও উপদেশানুসারে কার্য্য করিয়া থাকেন। কৃষ্ণসেবা-বিস্মৃতিই কৃষ্ণসেবক জীবের ভবরোগের মূল কারণ—একথা তাঁহারা পরমমুক্ত নিত্যসিদ্ধ শ্রীগুরুদেবের শ্রীমুখে অবগত হইয়া সতত অব্যভিচারিণী বা ঐকান্তিকী ভক্তির দ্বারা ভগবানের সেবা সতত করিবার জন্য উদ্‌গ্রীব হন, সেবা-নৈরন্তর্য্যে আত্মনিয়োগ করেন। এই ভাগ্যবান্ ব্যক্তিগণ গুরুদেবতাত্ম বা গুরুদাস, অর্থাৎ শ্রীগুরুদেবই তাঁহাদের হৃদয়দেবতা এবং শ্রীগুরুদেবই তাঁহাদের প্রাণাপেক্ষা প্রিয়তম। তাই বলিতেছিলাম, আমরা গুরুর কিঙ্কর,—গুরুকিঙ্করগণের নিত্য কিঙ্কর বা কৃষ্ণকার্ষ্ণগণের নিত্যকৈঙ্কর্য্যভিক্ষু ব্যতীত আর কি ?

কৃষ্ণই আমার একমাত্র নিত্য-প্রভু এবং আমি তাঁহার ভৃত্য, তাঁহার সেবা ছাড়া আমার কোন কৃত্য নাই, তাঁহার সেবা ব্যতীত আমি যে কোন কার্য্যই করি না কেন তাহা অন্যায় কার্য্য। এ জগতের সহিত আমার কোন সম্পর্ক নাই, এ জগতে গুরু এবং গুরুপ্রেষ্ঠগণ ব্যতীত আমার বলিতে আর কেহ নাই—এতাদৃশ নিখুঁত সত্য কথায় আমরা যখন আস্থা স্থাপন করিতে না পারিয়া সন্দিগ্ধচিত্ত হই তখনই আমরা মায়াকবলিত হইয়া সেবকাভিমান বিস্মৃত হই এবং তৎফলে অকৃষ্ণগণকে—মায়ার মূর্ত্তি পিতা-মাতা, স্ত্রী-পুত্র, বন্ধু-বান্ধবগণকে আত্মীয় মনে করিয়া নিজকে তাঁহাদের সেবক বা কিঙ্করত্বে স্থাপন করিতে অভিলাষী হইয়া পিতৃ-অভিমানমুখে পুত্রের কিঙ্করত্ব, পুত্রাভিমানমুখে মাতা-পিতার কিঙ্করত্ব, পতি-অভিমানে স্ত্রীর কৈঙ্কর্য্য, মানব-বন্ধু-অভিমানে জনৈক মানবাভিমানী বন্ধুর গুপ্ত কৈঙ্কর্য্য প্রভৃতি করিতে যাই; কিন্তু আমাদের এই কৈঙ্কর্য্য প্রভুত্বের আসন গ্রহণ করিতেও দ্বিধাবোধ করে না। কিন্তু আমরা যদি স্থিরচিত্তে সাধুসঙ্গে এসব কথা বিচার করি তাহা হইলে আমরা জানিতে পারি যে, আমরা এ জগতের কোন বস্তু নই। আমাদের গৃহ—শ্রীগুরুপাদপদ্মে—শ্রীকৃষ্ণবাস গোলোক-বৃন্দাবনে—আনন্দরসময়ধাম নিত্য চিজ্জগতে এবং আমরা কৃষ্ণের নিত্য কিঙ্কর। তাই শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিয়াছেন,—

"জীবের স্বরূপ হয় কৃষ্ণের নিত্য-দাস।
কৃষ্ণের তটস্থা শক্তি ভেদাভেদ-প্রকাশ॥
কেহ মানে কেহ না মানে সবে কৃষ্ণদাস।
যে না মানে তার হয় সেই পাপে নাশ॥
একলা ঈশ্বর কৃষ্ণ আর সব ভৃত্য।
যা'রে যৈছে নাচায় সে তৈছে করে নৃত্য॥

তাই বলি, আমরা বুঝি আর নাই বুঝি, আমরা স্বীকার করি আর নাই করি আমরা কৃষ্ণের কিঙ্কর, তাঁহার নিত্যভৃত্য। সুতরাং কৃষ্ণসেবা ছাড়া—"তাতে কৃষ্ণ ভজে করে গুরুর সেবন" ছাড়া আমাদের আর দ্বিতীয় কোন কর্ত্তব্য নাই। এতদ্ব্যতীত আমরা যে কোন কার্য্য করি না কেন, সবই অল্পবিস্তর অন্যায়, অধর্ম্ম বা পাপ। আর ভগবানের জন্য আমরা ধর্ম্মাধর্ম্ম যে কোন কার্য্যই করি না কেন সবই পরম ন্যায়সঙ্গত। শাস্ত্র বলেন,—

"মন্নিমিত্তং কৃতং পাপমপি ধর্ম্মায় কল্পতে।
মামনাদৃত্য ধর্ম্মোঽপি পাপং স্যাৎ মৎপ্রভাবতঃ॥" (পদ্মপুরাণ)
"চারি বর্ণাশ্রমী যদি কৃষ্ণ নাহি ভজে।
স্বকর্ম্ম করিতে সে রৌরবে পড়ি' মজে॥"

বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিগণ এ সকল বিষয় স্থির চিত্তে আলোচনা করিয়া 'আমরা কাহার কিঙ্কর' এ প্রশ্নের সমাধান করিবেন। নচেৎ দুঃখের হস্ত হইতে নিষ্কৃতির আর উপায় নাই। "জগতের পিতা কৃষ্ণ যে না ভজে বাপ। পিতৃদ্রোহী পাতকীর জন্মে জন্মে তাপ॥"—এই জ্বলন্ত শাস্ত্রবাণী আমাদিগকে পুনরায় অল্পাক্ষরে পূর্ব্বোক্ত কথারই মীমাংসা করিয়া দিতেছে। সুতরাং আমরা যখন অমৃতের পুত্র তখন আমরা কেহই যাহাতে মর-জগতের সেবায় ব্যস্ত না থাকিয়া কৃষ্ণকে পুত্র-স্থানে, পতি-স্থানে, প্রভু-স্থানে, বন্ধু-স্থানে বসাইয়া তাঁহার কিঙ্করত্বে নিত্যকাল অতিবাহিত করিতে পারি, তজ্জন্য হরি-গুরু-বৈষ্ণবচরণে প্রার্থনা জানাইতেছি এবং বন্ধুবর্গকেও অনুরোধ করিতেছি।—

"কৃষ্ণনাম ভজ জীব আর সব মিছে।
পলাইতে পথ নাই যম আছে পিছে॥"

(দৈনিক নদীয়াপ্রকাশ ১০।১৪০)

"মহাজনো যেন গতঃ সঃ পন্থাঃ"

রক্ত, মাংসাদি সপ্তধাতুবিশিষ্ট কুণপে 'আত্মবুদ্ধি' ও রুচিবিশিষ্ট ব্যক্তিগণ গড্ডালিকা প্রবাহের ন্যায় অক্ষজ-জ্ঞান-স্রোতে ভাসমান হইয়া কত আধুনিক কল্পিত অবতার, মহাপুরুষ ও মতবাদের প্রচার করিয়া কত লোককে যে বিপথগামী করিয়াছেন ও করিতেছেন, তাহার ইয়ত্তা নাই। তাঁহারা তাঁহাদের ইন্দ্রিয়তর্পণমূলক ধারণানুযায়ী কল্পিত-মহাজন সৃষ্টি করিয়া ব্যভিচার, লাম্পট্য, লাভ, পূজা, প্রতিষ্ঠাশা, কুটীনাটী, জীবহিংসা প্রভৃতি অসংখ্য অপরাধজনক কার্য্যে লিপ্ত হইয়া পড়িতেছেন, ইহা অত্যন্ত দুর্ভাগ্যের বিষয়।

প্রকৃত সত্যপিপাসুগণকে ইহা হইতে সর্ব্বদা সতর্ক থাকিতে হইবে; নতুবা চিরকালের জন্য আত্মবঞ্চিত হইয়া শ্রেয়ঃ পথ হারাইয়া ফেলিতে হইবে। অনাদি-সৎ-পরম্পরা বর্জ্জিত নবীন মত আপাত-শ্রুতিমধুর হইলেও তাহা কখনও গ্রহণ করা উচিত নহে এবং বাস্তব জ্ঞান লাভ করিতে হইলে যে সৎ-সম্প্রদায় আশ্রয়িতব্য, তাহা সুধিগণের বিবেচনার বিষয়। কোন অপরিজ্ঞাত বিষয়ের উপদেশ প্রদান করিতে গেলেই তদ্বিষয়ের প্রাচীনত্ব, স্থায়িত্ব ও মহত্ত্বাদি বিষয়ক সমর্থন, শাস্ত্রবাক্যের দ্বারা ও প্রাচীন মহাজনবাক্যের দ্বারা প্রমাণিত করিতে পারিলে, সেই বিষয়ে বুদ্ধিমান্ লোকের শ্রদ্ধা-ভক্তি আকর্ষণ করা যাইতে পারে।

যাহারা মহাজন-পথ উল্লঙ্ঘন করিয়া নূতন প্রণালী উদ্ভাবন করেন অথবা তদুদ্ভাবনকারীর আনুগত্য স্বীকার করেন, তাঁহারা আত্মতত্ত্ব বিষয়ে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ। তাঁহাদের সঙ্গক্রমে অধঃপতন অবশ্যম্ভাবী। স্বীয় প্রতিষ্ঠালাভের আশায় মহাজন-পথে অসম্পূর্ণতা-জ্ঞানে উহাতে অভিনব ব্যাপার সংযুক্ত করিতে সচেষ্টকারী গুরুলঙ্ঘনকারী ও শুদ্ধ আম্নায়-পারম্পর্য্যেরও উল্লঙ্ঘনকারী। পূর্ব্ব পূর্ব্ব সাধুমহাজনগণ যে পথ অত্যন্ত সুলভ অর্থাৎ অনায়াস বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন, সেই পথই শ্রেয়োলাভের পক্ষে সন্তাপ-বর্জ্জিত, সুতরাং তাহাই একমাত্র আশ্রয়িতব্য। দার্শনিক Confucious কহিয়াছেন,—"Study the past if you would divine the future." বকরূপী ধর্ম্মের "কঃ পন্থা" প্রশ্নের উত্তরে ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির মহারাজ "মহাজন-পথ"কেই অনুসরণ করিবার উপদেশ প্রদান করিয়াছেন। শ্রীল ঠাকুর নরোত্তম গাহিয়াছেন,—

মহাজনের যেই পথ, তাতে হবে অনুরত,
পূর্ব্বাপর করিয়া বিচার॥

কোন এক প্রাকৃত কবিও বলিয়াছেন,—

মহাজ্ঞানী মহাজন, যে পথে করে গমন,
হয়েছেন প্রাতঃস্মরণীয়।
সেই পথ লক্ষ্য করি', স্বীয় কীর্ত্তি-ধ্বজা ধরি',
আমরাও হব বরণীয় ॥

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদও এই প্রসঙ্গে তাঁহার পদাবলীতে গাহিয়াছেন,—

মন, তোরে বলি এ বারতা।
অপক্ব বয়সে হায়, বঞ্চিত বঞ্চক-পা'য়,
বিকাইলে নিজ স্বতন্ত্রতা ॥
সম্প্রদায়-দোষ-বুদ্ধি, জানি' তুমি আত্মশুদ্ধি,
করিবারে হৈলে সাবধান।
না নিলে তিলক-মালা, ত্যজিলে দীক্ষার জ্বালা,
নিজে কৈলে নবীন বিধান ॥
পূর্ব্ব-মতে তালি দিয়া, নিজ-মত প্রচারিয়া,
নিজে অবতার-বুদ্ধি ধরি'।
ব্রতাচার না মানিলে, পূর্ব্ব-পথ জলে দিলে,
মহাজনে ভ্রম-দৃষ্টি করি' ॥

কোন মতবাদী যখন তাঁহার মতবাদ স্থাপন করিতে উদ্যত হন, তখন তিনি শাস্ত্রের স্বাভাবিক অর্থ গ্রহণ না করিয়া স্বীয় মনীষার প্রখরতা ও প্রতিভার ঔজ্জ্বল্যের দ্বারা লোকের বুদ্ধিকে মোহিত করিয়া দেন। বিভিন্ন মতবাদিগণের বিভিন্ন মতবাদ-স্থাপন-চেষ্টার মধ্যে ইহারই প্রকৃষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। তাই মহাজন যাহা বলেন, তাহাই 'সত্য' বলিয়া জানিতে হইবে।

মনোধর্ম্মীদের 'মহাজন' প্রকৃতি-বিমোহিত জীবমাত্র

মহদ্‌ব্যক্তিই 'মহাজন' সংজ্ঞায় সংজ্ঞিত। 'মহতের' ধারণা সম্বন্ধে জাগতিক ও পারমার্থিক বিচারের মধ্যে বিরাট্ পার্থক্য বিদ্যমান। কৃষ্ণভক্তিকেই যিনি জীবন-সর্ব্বস্ব করিয়াছেন, পারমার্থিক বিচারে তিনিই মহৎ, তিনিই মহাজন। বদ্ধজীবের ইন্দ্রিয়জ জ্ঞান বা মনোধর্ম্মের ধারণায় যাহারা তাহার ইন্দ্রিয়ভোগ্য ও ইন্দ্রিয়তর্পণের ইন্ধন-প্রদানকারী, তাহারাই 'মহাজন' বলিয়া তাহার নিকট বিবেচিত হন। কৃষ্ণসম্বন্ধবিহীন 'দার্শনিক', 'বৈজ্ঞানিক', ঐতিহাসিক', 'সাহিত্যিক', 'কবি', 'বাগ্মী', 'সমাজপতি' বা 'দেশনেতা' প্রমুখ আত্মবঞ্চিত প্রকৃতি-কবলিত জীবের নিকট 'মহাজন' বলিয়া সম্মানিত ও পূজিত হন।

প্রকৃতপক্ষে ঐসব নামধারী 'মহাজনেরা' আত্মবঞ্চক, তাহাদের দ্বারা জগতের কোন প্রকৃত মঙ্গল সাধিত হইবার সম্ভাবনা নাই। ভগবদ্ভক্তিহীনের নিকট 'অন্যাভিলাষী', 'কর্ম্মী', শুষ্কজ্ঞানী', 'অভক্ত-যোগী' বা 'কনক-কামিনী-প্রতিষ্ঠা-লোভী' ব্যক্তিগণ মহাজন বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইতে পারেন; কিন্তু পারমার্থিক জগতে তাঁহাদের কানাকড়িও মূল্য নাই। তাই নিরস্তকুহক পরমসত্য বা বাস্তব বস্তুর প্রতিপাদনকারী নির্ম্মৎসর শ্রীমদ্ভাগবত বলেন,—

প্রায়েন বেদ তদিদং ন মহাজনোঽয়ং
দেব্যা বিমোহিত-মতির্বত মায়য়ালম্।
ত্রয্যাং জড়ীকৃতমতির্মধুপুষ্পিতায়াং
বৈতানিকে মহতি কর্ম্মণি যুজ্যমানঃ॥ (ভাঃ ৬।৩।২৫)

"যাহারা মহাজন নহেন, তাহারা দৈবীমায়াদ্বারা বিমোহিত; তাহারা ভগবদ্ভক্তির মাহাত্ম্য জানিতে পারে না। সুতরাং ভক্তি-মাহাত্ম্যে অর্থবুদ্ধি করিয়া জড়বুদ্ধিবশতঃ মধুপুষ্পিত কর্ম্মফল-প্রদর্শক বাক্যসকলে অধিক বিশ্বাস করিয়া প্রকৃতির উপাসনামূলক যজ্ঞসম্বন্ধি-কর্ম্মকাণ্ডে নিযুক্ত হন এবং নাম-অপরাধে অমঙ্গল লাভ করেন। ইঁহারা প্রাকৃত লোকের ধারণায় 'মহাজন' বলিয়া কল্পিত হইলেও পুরুষোত্তম শ্রীভগবানের নিত্যসেবা-বুদ্ধিযুক্ত নহেন।"

বাহ্যজগৎ-দর্শনকারী, প্রকৃত্যাশ্রিত-বুদ্ধিযুক্ত, ইন্দ্রিয়দাস ভবরোগগ্রস্ত জীবের বুদ্ধি সর্ব্বদাই ভ্রম-প্রমাদাদি চারিদোষে দোষযুক্ত হওয়ায় তিনি তাহার বিকৃত বুদ্ধিদ্বারা প্রকৃত মহাজনকে বুঝিয়া বা চিনিয়া লইতে পারেন না। ইন্দ্রিয়তোষণের ইন্ধনপ্রদাতৃগণই অর্থাৎ ইন্দ্রিয়তর্পণ-পোষক-বক্তা, প্রচারক ও শাস্ত্রকারগণই 'মহাজন' বলিয়া জগতে বিখ্যাত, ইহা বড়ই পরিতাপের বিষয়। বস্তুতঃ হরিতোষণের নামই 'সেবা'; আর যে-কর্ম্মে, যে-ধর্ম্মে, যে-ত্যাগে শ্রীকৃষ্ণের কোন প্রীতি বা সম্বন্ধ নাই, তাহা দেশের সেবা, দশের সেবা, সমাজের সেবা, ধনবানের সেবা, স্ত্রী-জাতির সেবা, নানা দেব-সেবা, জাতিগত অদৈব বর্ণাশ্রমের সেবা প্রভৃতি 'প্রাতঃস্মরণীয় কার্য্য' বা 'শ্রেষ্ঠ গুণ-সম্পৎ'-নামে জগতে প্রসিদ্ধি লাভ করিলেও তাহা প্রকৃতপক্ষে 'ভোগ' বা 'ইন্দ্রিয়তোষণ'। জগতে যাঁহারা 'কর্ম্মবীর', 'ধর্ম্মবীর', 'জ্ঞানবীর', 'বৈরাগ্য ও ত্যাগের আদর্শ' বলিয়া পূজিত হন, বাস্তবিকপক্ষে তাহারা ভবরোগগ্রস্ত মায়াবদ্ধ জীব মাত্র। শ্রীমদ্ভাগবত (৩।২৩।৫৬) "নেহ যৎকর্ম্ম ধর্ম্মায়" শ্লোকে তাহাদের নিন্দা করিতে গিয়া বলিয়াছেন,—"বহির্ম্মুখ কর্ম্মমাত্রই নিন্দনীয়। যাঁহার স্বধর্ম্মাশ্রয়-রূপ কর্ম্ম ধর্ম্মের উদ্দেশ্যে কৃত হয় নাই, স্বধর্ম্ম বিরাগ-উদ্দেশ্যে কৃত হয় নাই, আবার স্বধর্ম্মজাত

বিরাগ যে-স্থলে তীর্থপাদ কৃষ্ণসেবার উদ্দেশ্যে কৃত হয় নাই, সে ব্যক্তি জীবিত থাকিয়াও মৃত।"

মনোধর্ম্মিগণের নিকট কাল্পনিক মহাজনেরা কিরূপে সম্মানিত ও পূজিত হন, তাহার একটী তালিকা জগদ্গুরু শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী প্রভুপাদ শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতের মধ্যলীলা ১৭শ পরিচ্ছেদের অনুভাষ্যে সুন্দরভাবে প্রকাশ করিয়াছেন। শ্রীল প্রভুপাদের অনুভাষ্য :—"ব্যবসায়ীর নিকট 'উত্তমর্ণ' মহাজন হন, ভোগপর কর্ম্মীর নিকট 'জৈমিন্যাদি ঋষি' বা বিভিন্ন মতপোষক ধর্ম্মশাস্ত্রকারগণ, চিত্তনিরোধাভিলাষিগণের নিকট 'পতঞ্জল্যাদি ঋষি', শুষ্কজ্ঞান-পন্থিগণের নিকট নিরীশ্বর কপিল, বশিষ্ঠ, দুর্ব্বাসা, দত্তাত্রেয় প্রভৃতি কেবলা-দ্বৈতবাদিগণ, রজস্তমোগুণাশ্রিতের নিকট পাশব-বলদৃপ্ত বিষ্ণুবিরোধকার্য্যে অতুলনীয় অধ্যবসায়ী হিরণ্যাক্ষ, হিরণ্যকশিপু, রাবণ ও তৎপুত্র মেঘনাদ, জরাসন্ধ প্রভৃতি রাজগণ, একলব্য ও কর্ণাদি গুরুভক্তগণ, যোষিৎ-সঙ্গপ্রিয় পুরুষাভিমানিগণের নিকট দক্ষাদি স্ত্রী-পূজক প্রজাপতিগণ, জাগতিক লোকের নিকট দৈহিক ও মানসিক রোগ-শোক-দুঃখ-ভয় বা ফল্গু অভাব-দূরীকরণে অভিলাষী বা অনুরাগি-ব্যক্তিগণ মহাজন বলিয়া বৃত হন। আত্মবঞ্চিত ব্যক্তিগণের নিকট পরমার্থভূত আত্মবৃত্তি ভগবদ্ভক্তিকে শুক্র-শোণিতে আবদ্ধ বলিয়া বিশ্বাসী অর্থাৎ শুধু শৌক্র-বংশের দোহাই দিয়া আত্মজ্ঞান-জননী ভগবদ্ভক্তির বা গুরুত্বের দাবিকারী বঞ্চক ও ভাড়াটিয়া অর্থগৃধ্নুগণ; 'ঢঙ্গ বিপ্রের' ন্যায় শ্রীহরিদাস-তুল্য যথার্থ সাধুর বিরোধী ও তাঁহার অপ্রাকৃত হরিভজন-চেষ্টার কৃত্রিম বহিরনুকরণকারিগণ, বুজ্‌রুকী ও কুহক-বিদ্যাভিজ্ঞগণ, পূতনা, পৌণ্ড্রক, শৃগাল-বাসুদেব, দৈত্যগুরু শুক্র, নাস্তিক চার্ব্বাক, বেণ, সুগত, অর্হৎ, তৃণাবর্ত্ত, বৎস, বক, অঘ, ধেনুক, কালীয়, প্রলম্ব প্রভৃতি বিষ্ণু-বিরোধী অসুরগণ এবং গৌরকৃষ্ণের বাস্তব-সত্যত্বে বা তাঁহার পরমেশ্বরত্বে অবিশ্বাসকারী বঞ্চকগণ তদনুকরণে আপনারাই অথবা বঞ্চিতদিগের বিষ্ণু-বিরোধী মনোধর্ম্মের অনুকূল মনোহর বাক্য প্রয়োগপূর্ব্বক তাহাদের দ্বারা—নিজেদের অবতারত্ব প্রতিপাদন বা ঘোষণা করাইবার ইচ্ছা করিয়া মূর্খ বঞ্চিত দুর্ভাগার নিকট 'মহাজন' বলিয়া কল্পিত হন।"

জৈমিন্যাদি মীমাংসকগণ—তর্কপন্থী, মহাজন নহেন

বেদের মূল তাৎপর্য্য যে ভক্তি তাহা বেদান্তের অকৃত্রিম ভাষ্য অমলপুরাণ শ্রীমদ্ভাগবত পরিষ্কাররূপে আমাদিগকে জানাইয়া দিয়াছেন। কিন্তু ভক্তির গুরুত্ব

অস্বীকার করিয়া জৈমিন্যাদি মীমাংসকগণ ঈশ্বরকে 'কর্ম্মের অঙ্গ' বলিয়া বেদের মূলে কুঠারাঘাত করিয়াছেন। কপিলাদি নিরীশ্বর সাংখ্যকার প্রকৃত বেদার্থ পরিত্যাগপূর্ব্বক প্রকৃতিকে জগৎকারণ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। গৌতম ও কণাদাদি ন্যায় ও বৈশেষিক-দর্শনে জড় অণু-পরমাণুর মিলনকেই জীব ও বিশ্বাদির সৃষ্টির কারণ বলিয়াছেন। অষ্টবক্রাদি মায়াবাদিদের মতে, নির্ব্বিশেষ-ব্রহ্মই জগতের কারণ। পতঞ্জলি প্রভৃতি রাজযোগী তাঁহার যোগ-শাস্ত্রোক্ত কল্পনাময় ঈশ্বরকে 'স্বরূপ তত্ত্ব' বলিয়া স্থাপন করিয়াছেন। দর্শনকারগণ বেদসিদ্ধ স্বয়ং ভগবানকে পরিত্যাগ করিয়া তাঁহারা খণ্ডভাবে এক একটী 'মত' স্থাপন করিয়া প্রকৃত মঙ্গললাভেচ্ছু ব্যক্তিগণকে গোলোকধাঁধার মধ্যে ফেলিয়া দিয়াছেন। পরমকারুণিক শ্রীব্যাসদেব ষড় দর্শনের ছয় মত উত্তমরূপে আলোচনা-পূর্ব্বক তত্তন্মত খণ্ডন করিয়া ভগবৎপ্রতিপাদক বেদসূত্রসকল অবলম্বনপূর্ব্বক বেদান্তসূত্র নির্ম্মাণপূর্ব্বক আমাদিগকে প্রকৃত সত্যের পথ দেখাইয়াছেন। নির্ব্বিশেষবাদিগণ ব্রহ্মকে 'নির্গুণ' এবং বিশেষক্ষেত্রে সগুণ (ত্রিগুণময়) বলিয়া প্রতিপাদন করিলেও, বস্তুতঃ তত্ত্ববস্তু কেবল নির্গুণ বা ত্রিগুণাতীত নহেন; পরন্তু তিনি অনন্ত চিদ্গুণরাশির আধার সচ্চিদানন্দময় সগুণ-বিগ্রহ। নাস্তিক দর্শনকারগণ কেহই ঈশ্বরকে (বিষ্ণুকে) সর্ব্বেশ্বরেশ্বর সর্ব্বকারণ বলিয়া মানেন না, অথচ পরমত খণ্ডনপূর্ব্বক নিজ নিজ মত স্থাপন করিতে প্রয়াস করিয়াছেন। জৈমিন্যাদি দার্শনিকগণ তর্কপন্থী, তর্কের দ্বারা সত্যবস্তুর উদ্ঘাটন অসম্ভব। তাই অনিশ্চয়তামূলক তর্কপথ ত্যাগ করিয়া অবশ্যই শ্রৌতপন্থী মহাজন বা শুদ্ধভক্তই আশ্রয়িতব্য। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে পাওয়া যায়,—

> তাতে ছয় দর্শন হৈতে 'তত্ত্ব' নাহি জানি।
> 'মহাজন' যেই কহে, সেই 'সত্য' মানি ॥ (চৈঃ চঃ মধ্য ২৫।৫৬)

এই প্রসঙ্গে শ্রীচৈতন্যভাগবতে কেশব ভারতী নাস্তিক দর্শনকারীর হেয়তা প্রদর্শন করিতে গিয়া বলিয়াছেন,—

> ভারতী বলেন,—তাঁরা না বুঝে বিচার।
> মহাজন-পথে সে গমন সবাকার ॥
> বেদশাস্ত্রে মহাজন-পথ সে লওয়ায়।
> তাহা ছাড়ি' অবোধে সে অন্ত পথে যায় ॥
> (চৈঃ ভাঃ অন্ত্য ৯।১৩৫-১৩৬)

কৃষ্ণধনে ধনী নিষ্কিঞ্চনজনই—প্রকৃত 'মহাজন'

মহাভাগবত বা পরমহংসেরই অধোক্ষজ-দর্শন বা সুদর্শন, তাই তাঁহারা একমাত্র প্রকৃত 'মহাজন'-সংজ্ঞায় সংজ্ঞিত। মহাজনের পথ ও বেদশাস্ত্রের তাৎপর্য্য—কেবলা ভক্তি। ভাগ্যহীনজন তাহা বুঝিতে না পারিয়া পথভ্রষ্ট হইয়া অবৈদিক হইয়া পড়েন। ব্রহ্মা, শিব, নারদ, শুক, ব্যাস, প্রিয়ব্রত, পৃথু, ধ্রুব, উদ্ধব, অক্রুর, সনকাদি ঋষি, যুধিষ্ঠিরাদি পঞ্চভ্রাতা প্রমুখ সকলেই ভগবানের ভক্ত। যদি ভক্তি অপেক্ষা অন্য কিছুর উৎকর্ষ বিচার থাকিত, তাহা হইলে ঐ সকল মহাজন কখনও ভক্তিপথ আশ্রয় করিতেন না। মহাজনের বিচারে ভক্তিরই শ্রেষ্ঠত্ব লক্ষিত হয়। জ্ঞানিগণের প্রাপ্য মুক্তি পরিহার করিয়া সকল মহাজনই ভক্তিপথ গ্রহণ করিয়াছেন। প্রাকৃত সহজধর্ম্মের চিন্তাস্রোতে নিমগ্ন হইয়া চিজ্জড়-সমন্বয়বাদিগণ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-মহাপ্রভু বা শ্রীমাধবেন্দ্র পুরীপাদকে পূর্ব্বোক্ত কাল্পনিক মহাজনগণের অন্যতম একজন মনে করেন মাত্র। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব—অদ্বিতীয় মহাজন। তিনি আংশিক বা আপেক্ষিক শক্তিসম্পন্ন ঋষি, মহর্ষি, মনীষি বা মহামানব নহেন, তিনি ভ্রম-প্রমাদাদির অতীত সর্ব্ববেদারাধ্য সর্ব্বদেবারাধ্য শ্রীভগবৎপাদপদ্ম। শ্রীমাধবেন্দ্র পুরী গোস্বামীর আচরণে কোনওপ্রকার মৎসরতা বা লোকবঞ্চনা নাই। তিনি আচরণ করিয়া যাহা প্রচার করিয়া গিয়াছেন, তৎপ্রদর্শিত দৈব-বর্ণাশ্রম-ধর্ম্মকে আদর্শ-জ্ঞানে অনুগমন করিলেই যে নিঃশ্রেয়সার্থী জীবের অবশ্যই মঙ্গললাভ ঘটিবে, তাহা মহাপ্রভু দৈব-বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের আদর্শ প্রদর্শনপূর্ব্বক শিক্ষা দিয়াছেন।

জগদ্গুরু শ্রীল সরস্বতী প্রভুপাদ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের মধ্যলীলা ১৭শ পরিচ্ছেদের অনুভাষ্যে প্রকৃত 'মহাজনের' যে তালিকা প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। শ্রীল প্রভুপাদের অনুভাষ্য :—"শ্রীমদ্ভাগবতে (৬।৩।১৯-২১) 'দ্বাদশজন' মহাজনের নাম উল্লিখিত হইয়াছে। কলিযুগে ভগবদ্ভক্তি-প্রচারক শুদ্ধবৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের চারিজন আচার্য্যই 'মহাজন'। অস্মৎসম্প্রদায়ে গৌড়ীয়েশ্বর শ্রীদামোদরস্বরূপই মূল 'মহাজন'। তদভিন্ন-কলেবর পরমতত্ত্ব শ্রীগৌরসুন্দরের প্রিয়তম শ্রীরূপ-সনাতন বা শ্রীরূপানুগ সাধু-জনগণ—সকলেই 'মহাজন'। শ্রীবিষ্ণুস্বামীর অনুগত শুদ্ধাদ্বৈতবাদী শ্রীধরস্বামীও 'মহাজন'। চণ্ডীদাস, বিদ্যাপতি, জয়দেব—ইঁহারা সকলেই মহাজন। কিন্তু যাহারা এই সকল মহাজনে ভোগবুদ্ধিবিশিষ্ট হইয়া অর্থাৎ ইঁহাদিগের সেবা করিবার পরিবর্ত্তে ইঁহাদিগকে স্ব-স্ব স্বার্থসিদ্ধির যন্ত্ররূপে মাপিয়া লইতে বা

'গুরুর উপর গুরুগিরি' করিতে ধাবিত হন, সেই সকল দুর্ভাগা ব্যক্তি ঐ সকল মহাজন হইতে বহুদূরে অবস্থিত। ইন্দ্রিয়তর্পণ বা মায়াদাস্যই তাহাদের নিকট 'কল্পিত মহাজনের' মূর্ত্তি লইয়া উপস্থিত হয় এবং তাহাদিগকে ছলনা করিয়া তাহাদিগের ইন্দ্রিয়কে প্রকৃত সত্যপথ হইতে আবৃত করিয়া বিক্ষিপ্ত করে। সুতরাং শুদ্ধ ভগবদ্ভক্তের চেষ্টা কখনও তাঁহাদিগের প্রাকৃত বুদ্ধির ধারণার বিষয় হয় না।"

পদ্মপুরাণে শ্রীব্যাসদেব "সম্প্রদায়বিহীনাঃ যে মন্ত্রাস্তে বিফলা মতাঃ" শ্লোকে অসৎ-সম্প্রদায়ের নবোদ্ভাবিত কাল্পনিক মত বহুলোকের দ্বারা আদৃত হইলেও, তাহা পরিত্যাগপূর্ব্বক সৎ-সম্প্রদায়ের পরম্পরা স্বীকার বা আশ্রয় করত সনাতন ধর্ম্মের শিক্ষা করিতে উপদেশ করিয়াছেন। তর্ক সহজেই প্রতিষ্ঠাশূন্য, শ্রুতিসকলও ভিন্ন ভিন্ন, নানা মুনিরও নানা মত, এতন্নিবন্ধন ধর্ম্মতত্ত্ব গূঢ়রূপে আচ্ছাদিত অর্থাৎ শাস্ত্রাদি পাঠ করিয়া ধর্ম্মতত্ত্ব পাওয়া কঠিন। অতএব নানা মুনির নানা মত বা নানা মুনির ব্যাখ্যাত নানাপ্রকার দর্শনের নানাপ্রকার মতবাদ এবং নানা মতবাদী আচার্য্যগণের নানাপ্রকার মতবাদপূর্ণ ভাষ্যের প্রস্তাবসমূহ গ্রহণ না করিয়া সর্ব্বজ্ঞশিরোমণি অদ্বিতীয় মহাজন শ্রীচৈতন্য-মহাপ্রভুর পদাঙ্কানুসরণ করিলেই সনাতন ধর্ম্মের নিগূঢ় রহস্য অবগত হওয়া যাইবে। নির্ম্মৎসর সাধুগণ যাঁহাকে 'মহাজন' বলিয়া স্থির করিয়াছেন, তিনি যে পন্থাকে শাস্ত্র-পন্থা বলিয়াছেন, সেই পথেই সকল আত্মকল্যাণাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তিগণের গমন করা অবশ্যই কর্ত্তব্য।

—শ্রীবলভদ্র দাস ব্রহ্মচারী

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি হইতে প্রকাশিত

শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর প্রদত্ত ভাষণ

শ্রীচৈতন্যদেবের বৈশিষ্ট্য

আগ্রহী ব্যক্তিগণ শীঘ্রই সংগ্রহ করুন।

শ্রীশ্রীগুরুদেবের শ্রীপাদপদ্মে আত্মসমর্পণ ও সকাতর প্রার্থনা

অজ্ঞান-তিমিরান্ধস্য জ্ঞানাঞ্জন-শলাকয়া।
চক্ষুরুন্মীলিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ॥
গুরুর্ব্রহ্মা গুরুর্বিষ্ণু গুরুর্দেব মহেশ্বরঃ।
গুরুরেব পরংব্রহ্ম তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ॥
জয় জয় গুরুদেব পতিতপাবন।
কৃপা করি' তুমি মোরে কর পরিত্রাণ॥
তুমি বিনা অধমার কেহ নাহি আর।
এইবার তুমি মোরে করগো উদ্ধার॥
কে আর করিবে দয়া পতিতা দেখিয়া।
পতিতা দেখিয়া কেবা উঠিবে কাঁদিয়া॥
এমন দয়াল আর কেবা কোথা হবে!
মম সম পতিতারে কেবা উদ্ধারিবে??
জন্ম-মৃত্যু নাহি তব সর্ব্বশাস্ত্রে কয়।
আবির্ভাব-তিরোভাব—এইমাত্র হয়॥
পতিত জনের লাগি' আসি' বার বার।
কত পতিতেরে তুমি করিলে উদ্ধার॥
সেই লোভে মুই পাপী লইনু শরণ।
কৃপা করি' এবে মোরে কর পরিত্রাণ॥
সকলে ত' পার হ'ল কৃপার পরশে।
অধমা পড়িয়া রৈল করমের দোষে॥
তব পদে করিয়াছি আত্মসমর্পণ।
তুমি মোরে রক্ষা কর সদা সর্ব্বক্ষণ॥
সর্ব্বহারা হ'য়ে সদা দিশেহারা আমি॥
এ বিপদে একমাত্র রক্ষাকর্ত্তা তুমি॥

কৃপা করি' তুমি মোরে যে পথে চালাবে।
সেই পথে অবশ্যই মোরে যেতে হবে ॥
যে অভয় বাণী তুমি করে গেলে দান।
সেই ভরসায় আমি রেখেছি এ প্রাণ ॥
এ সব যন্ত্রণা আর সহিতে না পারি।
কবে তুমি উদ্ধারিবে মোরে কৃপা করি' ॥
সে দিনের পথ চেয়ে আছি যে বসিয়া।
শীঘ্র মোরে উদ্ধারহ' কৃপাবিন্দু দিয়া ॥
না জানি ভজন আর না জানি পূজন।
কেমনে পূজিব তব ও রাঙ্গাচরণ ॥
কৃপা করি' মোর মাথে রাখহ চরণ।
তবে ত' অভীষ্ট মোর হইবে পূরণ ॥
কৃপা করি' কর মোরে শুদ্ধভক্তি দান।
জন্মে জন্মে পাই যেন ও চরণে স্থান ॥
কি দিয়ে পূজিব প্রভু চরণ তোমার।
কেবল চোখের জল সম্বল আমার ॥
এ ছাড়া ত' আর মোর কিছু মাত্র নাই।
এই জল দানে যেন কৃপা তব পাই ॥
সকলের কাছে আমি ঘৃণ্য যে এখন।
তুমি যেন মোরে ঘৃণা কোরো না কখন ॥
কি আর জানাব প্রভু চরণে তোমার।
সকলি ত' জান তুমি কি ব্যথা আমার ॥
অন্তর্যামী তুমি প্রভু সকলি ত' জান।
সর্ব্বদুঃখ হর' মোর করি' কৃপা দান ॥

শ্রীগুরু-কৃপাপ্রার্থিণী—
—শ্রীযুক্তা উষারাণী দেবী

শ্রীল গুরু-মহারাজের বক্তৃতা

[পূর্ব্বপ্রকাশিত ৪৩শ বর্ষ, ১০ম সংখ্যা, ৩৫০ পৃষ্ঠার পর]

শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু যে Theoryটা জগৎকে জানিয়েছেন সমস্ত শাস্ত্রের সার সঙ্কলন করে একটা শ্লোকের মাধ্যমে, সেই শ্লোকটী আমি ব্যাখ্যা করছি।—

আম্নায়ঃ প্রাহ তত্ত্বং হরিমিহ পরমং সর্ব্বশক্তিং রসাব্ধিম্
তদ্ভিন্নাংশাংশ্চ জীবান্ প্রকৃতি-কবলিতান্ তদ্বিমুক্তাংশ্চ ভাবাৎ।
ভেদাভেদ-প্রকাশং সকলমপি হরেঃ সাধনং শুদ্ধভক্তিম্
সাধ্যং তৎ-প্রীতিমেবত্যুপদিশতি জনান্ গৌরচন্দ্রঃ স্বয়ং সঃ॥

'হরিমিহ পরমম্'—অনন্ত শক্তিমান্ ভগবান্, তিনি সর্ব্বশক্তিমান্, তিনি পরমারাধ্যতত্ত্ব। 'সর্ব্বশক্তিম্'—সেই ভগবান্ সর্ব্বশক্তিমান্। অনন্ত শক্তির মধ্যে তাঁর তিন শক্তি প্রধান—স্বরূপশক্তি, মায়াশক্তি ও জীবশক্তি। এই তিন শক্তি নিয়ে বেদে, বেদান্তে, উপনিষদে, গীতা, ভাগবতে আলোচনা করা হয়েছে। জীবশক্তি থেকে অনন্ত বিশ্বজগৎ সৃষ্টি হয়েছে। 'রসাব্ধিম্'—অখিলরসামৃতমূর্ত্তি সেই ভগবান্। কিরূপ?—'রসো বৈ সঃ'। সেই তত্ত্ববস্তুকে শ্রুতিতে, বেদে, উপনিষদে বলছেন—'রসো বৈ সঃ', তিনি রসস্বরূপ।

যদি প্রশ্ন করা যায়,—আমরা কেন বাঁচতে চাই? কেউই মরতে চাই না কেন? তদুত্তরে বলছেন,—সেই যে রসময়-বিগ্রহ, পরম রসস্বরূপ ভগবান্ তিনি এ জগতে আছেন। তাঁরই অবিচ্ছেদ্য অংশ জীবাত্মা তাঁর দিকে তাকিয়ে বাঁচতে চায়, মরতে চায় না। তিনি পরমরসস্বরূপ—সেইকথা বুঝাচ্ছেন।

'রসং হ্যেবায়ং লব্ধানন্দী ভবতি।' সেই ভগবদ্বস্তুকে প্রাপ্ত হলে মানুষ কৃতকৃত্য হয়, জীবন ধন্য হয়। তিনি কি cipher? 'কো হ্যেবান্যাৎ কঃ প্রাণ্যাৎ। যদেষ আকাশ আনন্দো ন স্যাৎ। এষ হ্যেবানন্দয়াতি।"—সেই ভগবান্ যদি সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ না হতেন, তিনি যদি আনন্দময় বস্তু না হতেন তাহলে জীবাত্মার কোন প্রচেষ্টা থাকত না। যেহেতু প্রচেষ্টা আছে সেই আনন্দকে লাভ করা, সেই আনন্দকে উপলব্ধি করা, সেইজন্য ভগবান্ সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ। চৈতন্যমহাপ্রভুর Theory এইভাবে ব্যাখ্যা করে যাচ্ছেন।

'তদ্ভিন্নাংশাংশ্চ জীবান্'—সেই ভগবানের অবিচ্ছেদ্য অংশ হল জীবাত্মা। জীবাত্মা হল অণুচৈতন্য, আর ভগবান্ হলেন বৃহচ্চৈতন্য। জীব দুইপ্রকার—

(১) নিত্যবদ্ধ ও (২) নিত্যমুক্ত। নিত্যবদ্ধগণ (আমরা) এজগতে এসে কর্ম্মফলানুসারে জন্ম-মৃতুমালার মধ্যে, কর্ম্ম-কর্ম্মফলের মধ্যে পড়ছি। কখনও স্বর্গ; কখনও নরক এই করছি। কৃষ্ণচন্দ্র গীতার মধ্যে এক জায়গায় অর্জ্জুনকে বলছেন,—তুমি যাবে আমার ধামে? যদি যেতে চাও আমি তোমাকে নিয়ে যাচ্ছি।

ন তদ্ভাসয়তে সূর্য্যো ন শশাঙ্কো ন পাবকঃ।
যদ্গত্বা ন নিবর্ত্তন্তে তদ্ধাম পরমং মম॥

যেখানে গেলে আর এই ধরাধামে ফিরে আসতে হবে না, সেইখানে যাবে অর্জ্জুন? সেটা তোমার নিত্য বাসস্থান। সেখানে নিয়ে যাওয়ার জন্য বলছেন, প্রশ্ন করছেন ভগবান্ কৃষ্ণ। সেখানে গেলে আর পুনরাবর্ত্তন হয় না।

আজকাল এখানে ত' অনেক রকম ধরণের Family planning হচ্ছে। আমাদের সরকার family planning এর অনেক ব্যবস্থা করেছেন। তাতে কিছু সুবিধা হচ্ছে না, বরং উত্তরোত্তর দুঃখ-কষ্ট বেড়েই চলেছে। এখন আমরা প্রায় ৬৬ কোটী ভারতবাসী। শাস্ত্র একটা সুন্দর পরিবার পরিকল্পনার কথা বলে দিয়েছেন, স্বয়ং ভগবান্ কৃষ্ণচন্দ্র সেই ব্যবস্থা দিয়েছেন। কি বলছেন?—সবাই মিলে পরমেশ্বরের সাধন-ভজন করলে কিছু ব্যক্তি ত' আমরা চলে যাব ভগবানের কাছে। যারা Survivor—উত্তরসূরী থাকবে এখানে, তারা এখানে থেকে হৈ-হুল্লোড় করুক, চিৎকার করে শ্লোগান দিতে থাকুক—'আমাদের দাবী মানতে হবে।' কিন্তু আমরা চলে গেলাম ওখানে—নিরুপদ্রব শান্তিময় স্থানে। এখানে সংখ্যা কমে যাবে। একটা Group এখান থেকে চলে গেলে সংখ্যা ত' কিছু কমে যাবে। সবাই মিলে এখানে হাবুডুবু খাই, আর ঠেলাঠেলি, গুঁতোগুঁতি লাগিয়ে দিই, তার থেকে 'Back to God and back to Home'—বিচার মেনে নিলে একটা section চলে যাবেন সেখানে। বৈজ্ঞানিক উন্নতিতে নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি—খাবার-দাবার Production যা হচ্ছে এখানে, ওতে একরকম করে চলে যাবে। আমরা বর্ত্তমান অভাবক্লিষ্ট সমাজকে সেটুকু উপকার করি না কেন? শাস্ত্র বলছেন,—যদি আমরা ভগবানের সাধন-ভজন করি, তাহলে "Back to God and back to Home" বিচার মেনে নেওয়া হয়ে যাবে আমাদের। এখানে ঝগড়া-বিবাদ-বিসম্বাদের কি প্রয়োজন আছে? এখানে ভাগ-বাঁটোয়ারায় অংশ কম হয়ে যাচ্ছে আমাদের, সমবণ্টন হচ্ছে না, হওয়ার আদৌ সম্ভাবনাও নাই। সুতরাং কি হবে এখানে থেকে? এখানে থেকে দরকার নাই আমাদের, চলে যাই

সেখানে—শাশ্বত শান্তি আছে যেখানে। নিত্যবদ্ধ জীব যারা আমরা, তারা এখানে হাবুডুবু খাচ্ছি, বিবাদ-বিসম্বাদে মত্ত হয়েছি। আর নিত্যমুক্ত যাঁরা, তাঁরা ভগবানের কাছে থেকে চিরদিন তাঁর সেবায় নিযুক্ত ও নিশ্চিন্ত। তাঁদের কি খাব, কি পরব—ওসব চিন্তা-ভাবনা নাই। সেখানে ক্ষুন্নিবৃত্তির এমন Tablet আবিষ্কৃত হয়েছে, সেই Tablet-এ সব ক্ষুধা-তৃষ্ণা মিটে যাচ্ছে। ভগবানের নামগ্রহণরূপ যে সর্ব্বরোগহর মহৌষধ তাহাই সেখানে আছে। ভক্তগণ তথায় সেবানন্দে বিভোর। ক্ষুধা-তৃষ্ণার জ্বালা-যন্ত্রণা তথায় নাই, তাঁহারা সেবানন্দে-প্রেমানন্দে বিভোর।

এখানকার চন্দ্র-সূর্য্য সেখানে আলো দিচ্ছে না। সেখানকার চন্দ্র-সূর্য্যের আলোয় এখানকার চন্দ্র-সূর্য্য আলোকিত। উপনিষদে সেই কথা বলা হয়েছে,—

ন তত্র সূর্য্যো ভাতি ন চন্দ্রতারকং
নেমা বিদ্যুতো ভান্তি কুতোঽয়মগ্নিঃ।
তমেব ভান্তমনুভাতি সর্ব্বং
তস্য ভাসা সর্ব্বমিদং বিভাতি॥

সুতরাং আমাদের সেখানে March করতে হবে। 'তদ্ভিন্নাংশাংশ্চ জীবান্ প্রকৃতি-কবলিতান্ তদ্বিমুক্তাংশ্চ ভাবাৎ।'—ভগবান্ যে জীব সৃষ্টি করলেন তার ভিতরে এক section হচ্ছেন নিত্যবদ্ধ, আর এক section হচ্ছেন নিত্যমুক্ত। 'ভেদাভেদপ্রকাশম্'—সেই যে জীবাত্মা পরমাত্মার থেকে যুগপৎ ভেদ এবং অভেদ। 'অভেদ' কাকে বলে?—In quality—গুণগত ক্ষেত্রে অভেদ। গুণগত সাম্য আছে সেখানে। কেন? কিরকম?—ভগবান্ নিত্যশুদ্ধ, নিত্য সনাতন বস্তু, অজর, অমর। যে কথা বেদে, উপনিষদে, গীতা, ভাগবতে বলা হয়েছে,—

ন জায়তে ম্রিয়তে বা কদাচিন্নায়ং ভূত্বা ভবিতা বা ন ভূয়ঃ।
অজো নিত্যঃ শাশ্বতোঽয়ং পুরাণো ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে॥

অজ, নিত্য, শাশ্বত, সনাতন বস্তু হলেন ভগবান্। আর তাঁরই অবিচ্ছেদ্য অংশ জীবাত্মা হল অজ, নিত্য, শাশ্বত, সনাতন। সুতরাং এখানে quality তে এক, কিন্তু পার্থক্যটা—ভেদ কোথায়? Quantitative difference—পরিমাণগত ব্যবধান। এজন্য শাস্ত্রে বিচারক্ষেত্রে বৃহচ্চৈতন্য আর অণুচৈতন্য শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। অণুচৈতন্য জীব অবিদ্যা বা মায়ার দ্বারা Over-powered হওয়ার প্রবণতা রাখে; কিন্তু বৃহচ্চৈতন্য যে ভগবান্—তিনি

সবটার অতীত। মায়াধীশ তিনি, মায়াবশ্য নহেন। অপ্রাকৃত, অতীন্দ্রিয় শব্দগুলো ভগবদ্-বিশেষণ ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়েছে।

ভগবানকে পাওয়ার একমাত্র উপায় হচ্ছে—'সাধনং শুদ্ধভক্তিম্'—শুদ্ধভক্তি। শুদ্ধভক্তি বললেন কেন? তাহলে বিদ্ধাভক্তি বলে কিছু নিশ্চয় আছে। শাস্ত্র বলছেন,—এর ভিতরে কিছু বক্তব্য আছে। কর্ম্মমিশ্রা ভক্তি, জ্ঞানমিশ্রা ভক্তিকে বাদ দিয়ে শুদ্ধভক্তি কেবল ঐকান্তিকী ভক্তি। ঐকান্তিকী ভক্তিযোগের দ্বারা ভগবান্ সন্তুষ্ট হন। এই কথা ভগবান্ তাঁর প্রিয়সখা অর্জ্জুনকে বলেছেন,—

> ন সাধয়তি মাং যোগো ন সাংখ্যং ধর্ম্ম উদ্ধব।
> ন সাধ্যায়স্তপস্ত্যাগো যথা ভক্তির্মমোর্জ্জিতা॥

আমি ঐকান্তিকী ভক্তির দ্বারা বশীভূত হই। সুতরাং কর্ম্মমিশ্রা, জ্ঞানমিশ্রা ভক্তির কথা সেখানে Refuted—খণ্ডিত হয়েছে। সেখানে উত্তরোত্তর শ্রেষ্ঠ ভাবটা দেখিয়েছেন।

প্রাপ্তব্য বিষয় কি?—চরম প্রাপ্তব্য বিষয় হল ভগবৎপ্রেম। প্রেম—প্রয়োজন, সেই কথাটা বলছেন। 'সাধনং শুদ্ধভক্তিং সাধ্যং তৎপ্রীতিম্'—সেই ভগবানের প্রীতি বা প্রেমই হল পরম পুরুষার্থ—পঞ্চম পুরুষার্থ। ইহাই জীবের চরম মৃগ্য বস্তু।

জগতের বিচারে পুরুষার্থ চারটী—ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ।—

> "অজ্ঞান-তমের নাম কহিয়ে কৈতব।
> ধর্ম্ম-অর্থ-কামবাঞ্ছা আদি এই সব॥
> তার মধ্যে মোক্ষবাঞ্ছা কৈতব-প্রধান।
> যাহা হৈতে কৃষ্ণভক্তি হয় অন্তর্দ্ধান॥
> কৃষ্ণভক্তির বাধক যত শুভাশুভ কর্ম্ম।
> সেই এক জীবের অজ্ঞান-তমোধর্ম্ম॥
> তত্ত্ববস্তু—কৃষ্ণ, কৃষ্ণভক্তি, প্রেমরূপ।
> নাম-সঙ্কীর্ত্তন—সর্ব্ব-আনন্দস্বরূপ॥"

আনন্দ-চিন্ময়রস-কর্ত্তৃক প্রতিভাবিত স্বীয় চিদ্রূপের অনুরূপ চতুঃষষ্টিকলাযুক্ত হ্লাদিনীশক্তিরূপা শ্রীমতী রাধা ও তৎকায়ব্যূহরূপ সখীবর্গের সহিত যে অখিলাত্মভূত শ্রীগোবিন্দ নিত্য স্বীয় গোলোকধামে বাস করেন, আমি তাঁহাকেই ভজনা করি।

———

শ্রীগুরু-তত্ত্ব

"ভারতভূমিতে হৈল মনুষ্য জন্ম যার।
জন্ম সার্থক করি কর পর-উপকার॥" (চৈঃ চঃ অঃ ৯।৪১)

এই ধর্ম্মক্ষেত্র ভারততীর্থে জন্মগ্রহণ করিয়া মানবমাত্রেরই জীবকে নিত্য দয়া বা কৃষ্ণোন্মুখী করা অবশ্য কর্ত্তব্য। কিন্তু মানবমাত্রেই তাহা করিতে সক্ষম নহে। তাহা হইলে শ্রীমন্মহাপ্রভুর উল্লিখিত বাণী সার্থক করিয়া তুলিবেন কে? এই সংশয় হইতে শ্রীমন্মহাপ্রভু জীবকোটিকে মুক্তি দিয়া বলিলেন,—"আমার আজ্ঞায় গুরু হঞা তার এই দেশ।"

এক্ষণে আমরা জানিতে পারিলাম, শ্রীগুরুদেবই শ্রীকৃষ্ণের অভিন্ন-বিগ্রহ ও শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর আচরিত ও প্রচারিত ধর্ম্ম আচারমুখে প্রচার করিবার একমাত্র অধিকারী। মহাপুরুষগণ জীবকল্যাণের নিমিত্ত বহু শাস্ত্রগ্রন্থ প্রকটিত করিয়াছেন। কিন্তু অনভিজ্ঞতাবশতঃ জীব শাস্ত্রের প্রকৃত তাৎপর্য্য বুঝিতে অক্ষম। সর্ব্বদোষাকর জীবের চারিটী দোষই ইহার মূল কারণ। যথা—

"বিপ্রলিপ্সা প্রমাদশ্চ করণাপাটবং ভ্রমঃ।
মনুষ্যাণাং বিচারেষু স্যাদ্ধি দোষ-চতুষ্টয়ম্॥"

অর্থাৎ বিপ্রলিপ্সা, প্রমাদ, করণাপাটব ও ভ্রম—এই কয়টি দোষ মানবমাত্রেরই বিচারে অবশ্য প্রবেশ করে। শব্দব্রহ্মরূপ বেদবাক্য বা শাস্ত্রগ্রন্থে নিষ্ঠা ব্যতীত আমরা সেই তত্ত্ববস্তুর সন্ধান লাভ করিতে পারি না। প্রাকৃত পাণ্ডিত্যের দ্বারা শাস্ত্রগ্রন্থ পাঠ করা যায় বটে, কিন্তু তাহাদ্বারা তত্ত্ববস্তু হৃদয়ঙ্গম করা যায় না। জড়বিদ্যায় অভিমানী জীবের এই দুরবস্থা দর্শন করিয়া পতিতপাবন শ্রীগৌরহরি শব্দব্রহ্ম বা শাস্ত্রীয় সাধুসঙ্গের উল্লেখ করিয়াছেন।

এক্ষণে "গুরু কি তত্ত্ব" তাহার আলোচনা প্রয়োজন। সম্বন্ধ-জ্ঞানদাতা শ্রীগুরুর তত্ত্ব জানিতে হইলে সর্ব্বাগ্রে শিক্ষাগুরু বা শ্রবণগুরু ভগবৎপার্ষদগণের শ্রীপাদপদ্মে আশ্রয় লইতে হইবে। কারণ শ্রীভগবান্ সদনুগ্রহশীল অর্থাৎ সজ্জনগণের মারফতেই সুকৃতিশালী জীবগণের প্রতি অনুগ্রহ করিয়া থাকেন। এ জন্য সজ্জনগণই শ্রীভগবানের মূর্ত্তিমান্ অনুগ্রহ। অতএব শ্রীগুরুতত্ত্ব জানিবার জন্য সর্ব্বাগ্রে সর্ব্বভূতে প্রীতিসম্পন্ন সাধুগণের শ্রীচরণাশ্রয় করিতেই হইবে।

"বৈষ্ণবের বশ শ্রীকৃষ্ণ—সর্ব্বশাস্ত্রে কয়।
এই তত্ত্ব জানি' লহ বৈষ্ণব-আশ্রয়॥"

মহাভাগবত শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর গাহিয়াছেন,—

"আশ্রয় লঞা ভজে, তাঁরে কৃষ্ণ নাহি ত্যজে,
আর সব মরে অকারণ॥"

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর মহাশয়ের বাণীতে পাই,—

যস্য প্রসাদাৎ ভগবৎপ্রসাদো
যস্যাপ্রসাদান্ন গতিঃ কুতোঽপি।"

আশ্রয়-বিগ্রহ শ্রীগুরুপাদপদ্মের কৃপাতেই বিষয়-বিগ্রহ শ্রীভগবানের কৃপালাভ হয়। শ্রীগুরুদেবের অনুগ্রহ ব্যতীত কোথাও গতি নাই। শ্রীগুরুদেবই আশ্রয়-ভগবান্, তিনিই সেবা-বিগ্রহ বা প্রকাশ-বিগ্রহ। তিনিই "বলদেব-নিত্যানন্দ তত্ত্ব"। আশ্রয়-বিগ্রহের আশ্রয় পরিত্যাগ করিয়া কেহই বিষয়-বিগ্রহের কৃপালাভ করিতে পারে না। ব্রহ্মা হইতে অদ্যাবধি সেই আম্নায়-ধারাই চলিয়া আসিতেছে। ইহাকেই সদ্গুরু-পরম্পরা বা আম্নায়-পরম্পরা বলে। পুরাণ, স্মৃতি প্রভৃতি নিখিল শাস্ত্রগ্রন্থ ইহাই তারস্বরে কীর্ত্তন করিয়াছেন।

যস্য দেবে পরা ভক্তির্যথা দেবে তথা গুরৌ।
তস্যৈতে কথিতা হ্যর্থা প্রকাশন্তে মহাত্মনঃ॥
(শ্বেতাশ্বতর ৬।২৩)

অর্থাৎ বিষয়-বিগ্রহ ভগবানে যেরূপ ভক্তি, সেইরূপ আশ্রয়-বিগ্রহ শ্রীগুরুপাদপদ্মে যাহার পরাভক্তি বর্ত্তমান, তাহার নিকট শ্রুতির প্রকৃত রহস্যসমূহ প্রকাশিত হয়।

"অনুপাস্ব অনুপরস্ব তেভ্যঃ শৃণু হি তে ত্বামবন্তু।"
(ব্রঃ সূত্রের শ্রীমাধ্বভাষ্যধৃত-বচন)

অর্থাৎ আশ্রয়-বিগ্রহগণের (ভগবদ্ভক্তগণের) উপাসনা কর, তাঁহাদিগকে সেবা কর, তাঁহাদের নিকট হইতে শ্রবণ কর, তাঁহারা তোমাকে রক্ষা করিবেন।

শ্রীগীতোপনিষদ্ বলেন,—

তদ্বিদ্ধি প্রণিপাতেন পরিপ্রশ্নেন সেবয়া।
উপদেক্ষ্যন্তি তে জ্ঞানং জ্ঞানিনস্তত্ত্বদর্শিনঃ॥ (গীতা ৪।৩৫)

অর্থাৎ, (হে অর্জ্জুন!) তুমি প্রণিপাত, পরিপ্রশ্ন ও সেবাদ্বারা সেই তত্ত্ব অবগত হও। তত্ত্বদর্শী জ্ঞানিগণ তোমার প্রণিপাত, পরিপ্রশ্ন ও সেবাবৃত্তিতে সন্তুষ্ট হইয়া কৃপাপূর্ব্বক তোমাকে তত্ত্বজ্ঞানোপদেশ করিবেন।

শ্রীভগবানের "বাচ্য-বাচকস্বরূপ"দ্বয়ের নিকট উপস্থিত হইতে হইলে

শ্রীগুরুদেব বা সাধুই একমাত্র দ্বার। বহু সোপান বা মাধ্যমের (দ্বারের) প্রয়োজন নাই। বহুসোপান বা মাধ্যম অবলম্বন করিলে সত্যানুসন্ধিৎসুকে সহজেই বিপথে চালিত করিয়া ধর্ম্মের নামে অধর্ম্মান্ধকারের আবর্ত্তে ফেলিয়া দিবে। ব্যাসাবতার শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর বলিয়াছেন,—"আমার প্রভুর প্রভু শ্রীগৌরসুন্দর।" শ্রীগুরুপাদপদ্মকে আমার প্রভু এবং বিষয়-বিগ্রহকে আমার প্রভুর প্রভু অভিমান করাই ভক্তি।

মাধ্যমকে অস্বীকার করা যায় না। কিন্তু মাধ্যম বা দ্বার স্বীকার করিবার সময় শাস্ত্র একটী বিশেষ বিচার প্রদর্শন করিয়াছেন—অর্থাৎ ইহা Transparent Medium (স্বচ্ছ মাধ্যম) বা Opaque Medium (অনর্থযুক্ত বদ্ধজীব মাধ্যম) কিনা। কারণ, Opaque Medium বস্তুদর্শনের সহজ পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে। আর শ্রীগুরুপাদপদ্মের সহিত সমজাতীয় বৈষ্ণবের আনুগত্য স্বীকার করিলে জীবের অবশ্যই মঙ্গললাভ হয়। কারণ এহেন সমচিত্তবিশিষ্ট কোন স্নিগ্ধবৈষ্ণব স্বচ্ছমাধ্যমরূপে (Transparent Medium) মহাভাগবত শ্রীগুরু-দেবকে জানাইয়া না দিলে, বদ্ধজীব শ্রীগুরুপাদপদ্মের প্রকৃত স্বরূপ উপলব্ধি করিতে পারে না। এরূপভাবে সদ্‌গুরুর আশ্রয় পাইলেই সচ্চিদানন্দবিগ্রহ "শ্রীব্রজেশতনয়" শ্রীকৃষ্ণের কৃপালাভ সম্ভব।

শ্রীগুরুপাদপদ্ম, আচার্য্য ও ভগবৎপার্ষদবৃন্দের জগতে যে আবির্ভাব, তাহা সম্পূর্ণ ভগবদিচ্ছা-প্রসূত। আমাদের মত তাঁহারা কর্ম্মফলবাধ্য হইয়া জন্মগ্রহণ করেন না। আমরা দুষ্কর্ম্মের ফল ভোগ করিবার জন্য জন্মগ্রহণ করি, আর তাঁহারা ভগবল্লীলা-পুষ্টির সহায়ক হইয়া জগজ্জীবকে কৃপা করেন। বাহ্যতঃ বদ্ধজীবের জন্ম ও ভগবৎপার্ষদগণের জন্ম দেখিতে এক, কিন্তু উহা সম্পূর্ণ পৃথক্। ফলভোগী বদ্ধজীবের দুর্দ্দশা বর্ণনা প্রসঙ্গে শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন,—

তাবৎ কর্ম্মাণি কুর্ব্বীত ন নির্ব্বিদ্যেত যাবতা।
মৎকথাশ্রবণাদৌ বা শ্রদ্ধা যাবন্ন জায়তে॥ (ভাঃ ১১।২০।৯)

অর্থাৎ যে কাল পর্য্যন্ত কর্ম্মফলভোগে বিরক্তি না হয়, অথবা ভক্তিমার্গে আমার (ভগবানের) কথায় শ্রদ্ধা না জন্মে, তৎকাল পর্য্যন্ত জীবের কর্ম্ম-সকলের অনুষ্ঠান কর্ত্তব্য।

কিন্তু ভগবদ্ভক্তের আবির্ভাবের কারণ,—

"মহান্ত-স্বভাব এই তারিতে পামর।
নিজ কার্য্য নাহি তবু যান তার ঘর॥"
(চৈঃ চঃ মঃ ৮।৩৯)

জনস্য কৃষ্ণাদ্বিমুখস্য দৈবাদধর্ম্মশীলস্য সুদুঃখিতস্য।
অনুগ্রহায়েহচরন্তি নূনং ভূতানি ভব্যানি জনার্দ্দনস্য॥
(ভাঃ ৩।৫।৩)

অর্থাৎ প্রাক্তন কর্ম্মবশতঃ শ্রীকৃষ্ণ-বহির্ম্মুখ, অধর্ম্মনিরত ও অত্যন্ত ক্লেশতপ্ত জনগণকে অনুগ্রহ করিবার জন্য নিশ্চয়ই শ্রীকৃষ্ণের মঙ্গলময় ভক্তপুরুষগণ মর্ত্ত্যলোকে পরিভ্রমণ করেন।

তাঁহাদের এই আবির্ভাব-লীলা ভুবনমঙ্গলবিধায়িনী ও পতিতপাবনী। এখানে "ভুবনমঙ্গল" শব্দকে বর্ত্তমান রাজনৈতিক নেতাদের "বিশ্বশান্তি" শব্দের সমতুল্য জ্ঞান করিলে চলিবে না। কারণ রাজনৈতিক নেতাদের যে বিশ্বশান্তি তাহা দেহ-মনের ভোগসুখ ইত্যাদিকে লক্ষ্য করে। উহাতে নৈমিত্তিক ধর্ম্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষের প্রার্থনা আছে, কিন্তু নিত্যমঙ্গল লাভের কোনই সম্ভাবনা নাই। এ জগতে মঙ্গলের নামে অমঙ্গল আনয়নকারী কর্ম্মি-জ্ঞানীর অভাব নাই। তাঁহারাই আজকাল রাষ্ট্রনেতা, দেশনেতা, সমাজনেতা প্রভৃতি নাম গ্রহণ করিয়া তথাকথিত "বাণী" প্রদান করিয়া জগতে "নিত্য ধর্ম্মের" পরিবর্ত্তে "জুগুপ্সিত ধর্ম্মের" ধারক ও বাহক হইয়াছেন। আজকাল যাহারা জগতে শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি বলিয়া পূজিত হন, তাহারা সকলেই নশ্বর, ভোগবাদী কর্ম্মি-জ্ঞানী। এরূপ বীর বা নায়কের আনুগত্যের দ্বারা জীবের নিত্যমঙ্গল লাভ হয় না।

"মুক্তানামপি সিদ্ধানাং নারায়ণপরায়ণঃ।
সুদুর্ল্লভঃ প্রশান্তাত্মা কোটিষ্বপি মহামুনেঃ॥ (ভাঃ ৬।১৪।৪)

অর্থাৎ কৈবল্য-মুক্তিকামী, সিদ্ধিকামী কোটি অপেক্ষা নারায়ণপরায়ণ ভক্ত দুর্ল্লভ।

শ্রীগুরুদেব, আচার্য্য বা বৈষ্ণব তাহাদের মত নশ্বর বস্তু নহেন। তাঁহারা নশ্বর মঙ্গলদান করিতে এ জগতে আসেন না ; তাঁহারা ভগবৎ-প্রেরিত নিজজন। তাঁহারা জগজ্জীবকে যে সম্পত্তি দান করেন, তাহা নিত্য, অব্যয় ও পরম মঙ্গলপ্রদ। অতএব, বীরপূজা বা নায়কপূজা হইতে কোটিগুণে শ্রেষ্ঠ জগদ্গুরু আচার্য্যের পূজা। প্রকৃত মঙ্গলদাতা, পতিতপাবন কৃষ্ণৈকশরণ গুরু জগতে দুর্ল্লভ।

এই ধর্ম্মক্ষেত্র ভারতভূমিতে নাস্তিকতা ও পাশ্চাত্ত্য শিক্ষাদীক্ষার অনুশীলনের ফলে শ্রুতি-স্মৃতি-কথিত সদ্ধর্ম্ম যে-প্রকারে ক্রমশঃ লুপ্ত হইতে চলিয়াছে, তাহাতে গুরুপূজা বা আচার্য্যপূজার কথা বলিলে গণতন্ত্র ভারতের গণদেবতারা

মানুষপূজা বা নায়কপূজাই বুঝিয়া থাকেন। আজকাল প্রাচ্য-পাশ্চাত্ত্য উভয়-দেশের সর্ব্বত্রই এরূপ মানুষপূজা বা নায়কপূজা দৃষ্ট হয়। গুরুপূজা সম্বন্ধে মোহগ্রস্ত ভোগী জীবকুলের যে বিকৃতধারণা আছে, তাহা খণ্ডন করিবার জন্য শ্রুতি-স্মৃতি হইতে দু' একটী প্রসঙ্গ এ স্থলে উল্লেখ করিলাম। শাস্ত্র বলেন,—"আদৌ গুরুপূজা।"

আচার্য্যাদ্ধ্যেব বিদ্যা বিদিতা সাধিষ্ঠং প্রাপয়তীতি।

(ছাঃ উঃ ৪।৯।৩)

তস্মাদ্ গুরুং প্রপদ্যেত জিজ্ঞাসুঃ শ্রেয় উত্তমম্।
শাব্দে পরে চ নিষ্ণাতং ব্রহ্মণ্যুপশমাশ্রয়ম্ ॥ (ভাঃ ১১।৩।২১)

ঈশ্বরের পূজা হইতেও ঈশ্বরের ভক্ত গুরু বা আচার্য্যের পূজা বড়। ভগবান্ নিজেই উদ্ধবকে বলিয়াছেন,—

আচার্য্যং মাং বিজানীয়ান্নাবমন্যেত কর্হিচিৎ।
ন মর্ত্ত্যবুদ্ধ্যাসূয়েত সর্ব্বদেবময়ো গুরুঃ ॥ (ভাঃ ১১। ৭।২৭)

শ্রীমন্মহাপ্রভুর আদেশও তাহাই—

"আমার ভক্তের পূজা আমা হইতে বড়।
সেই প্রভু বেদে ভাগবতে কৈলা দৃঢ় ॥"

গুরুদেবকে দেখিতে মানুষের মত হইলেও তিনি ভগবৎস্বরূপ; তিনি সর্ব্বদেবময়। অতএব গুরু-পূজা এবং নায়কপূজা বা Hero worship কখনই এক নহে।

শ্রীল সরস্বতী প্রভুপাদের প্রকট-লীলা-কালের একটী ঘটনা বর্ত্তমান আলোচনা প্রসঙ্গে বিশেষ সহায়তা করিবে মনে করিয়া এখানে সংক্ষেপে ঘটনাটি লিপিবদ্ধ করিলাম—অস্মদীয় পরম গুরুদেব শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের ব্যাসপূজার আয়োজন হইয়াছে। এই ব্যাসপূজা উপলক্ষে বহু বৈষ্ণব-সজ্জন শ্রীল প্রভুপাদের স্তবস্তুতি, পূজা-বন্দনাদি করেন, যেরূপ আমরা শ্রীগুরুপূজায় বা ব্যাসপূজায় করিয়া থাকি। সেই ব্যাসপূজাবাসরে উপস্থিত কোন এক বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ণধার শ্রীল প্রভুপাদকে একজন লৌকিক শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিজ্ঞানে তাঁহার স্তবস্তুতি-পূজাদি গ্রহণকার্য্য দেখিয়া—"আপনি কি করে বসে বসে এতগুলি স্তবস্তুতি শুনিলেন?" পরমগুরুদেব শ্রীল প্রভুপাদ উত্তরে বলিলেন,—

"শ্রীগুরুদেব যখন শিষ্যদের থেকে পূজা গ্রহণ করেন, তখন তিনি মনে করেন না যে, তিনি গুরু। তিনি নিজকে একজন নগন্য ভৃত্যজ্ঞানে গুরুপূজার

সকল উপকরণ শ্রীগুরুপাদপদ্মে পৌঁছিয়ে দেন। লোককে গুরুপূজা শিক্ষা দিবার জন্য গুরুদেব নিজে পূজা গ্রহণ করেন, গুরুপূজার মন্ত্র প্রদান করেন। শ্রীকৃষ্ণ যখন গীতায় অমায়িকভাবে বললেন,—

সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।
অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ॥ (১৮।৬৬)

তখন জগতের বহির্ম্মুখ লোক মনে করল—কৃষ্ণ কি স্বার্থপর, কি দাম্ভিক! নিজের পূজা নিজেই চাচ্ছে। আবার কৃষ্ণ বললেন,—"আচার্য্যং মাং বিজানীয়াৎ" —এতে নিজের পূজা অপরের মধ্য দিয়ে। স্বার্থগতি শ্রীহরির অভিন্ন-বিগ্রহ শ্রীগুরুদেবের পূজাই যে সর্ব্বজীবের নিত্যমঙ্গলের হেতু ও জীবের স্বার্থ, তা অজ্ঞান জীব মোটেই বুঝতে পারে না।··· ·····।"

শ্রীল প্রভুপাদের এ সকল উক্তির মধ্যে গুরু বা আচার্য্যের দায়িত্ব বা কর্ত্তব্য কত বড়, তাহা গুহ্যভাবে নিহিত আছে। মহাবদান্যের এই অমোঘ-বাণী কি ভুক্তি-মুক্তি-স্পৃহাকামী লোক বুঝিতে সক্ষম হইবে? শ্রীল প্রভুপাদ যে কত বড় মহান্ এবং শ্রীমন্মহাপ্রভুর কত বড় মৃদঙ্গ, তাহা ভাষায় ব্যক্ত করা যায় না। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত লিখিত ভাষায় তিনি "প্রতি সম্ভাষণে" তাঁহার নিজের পরিচয় দিয়াছেন,—

"জগাই-মাধাই হৈতে মুই সে পাপিষ্ঠ।
পুরীষের কীট হৈতে মুই সে লঘিষ্ঠ॥
মোর নাম শুনে যেই, তার পুণ্যক্ষয়।
মোর নাম লয় যেই, তার পাপ হয়॥
এমন নির্ঘৃণ্য মোরে কেবা কৃপা করে।
এক নিত্যানন্দ বিনু জগৎ ভিতরে॥"

শ্রীগুরুদেব শ্রীহরির প্রকাশ-বিগ্রহ। তিনি শুশ্রূষু জীবের নিকট শাস্ত্রের গুহ্যতম তাত্ত্বিক বিষয়সমূহ প্রকাশিত করেন। শিষ্যের যাহা কিছু করণীয় তাহাও শ্রীগুরুদেবই কৃপাপূর্ব্বক তাহাকে উপদেশ দিয়া থাকেন।

আজকাল একটা কথা প্রচলিত আছে—"যার যার গুরু তার তার কাছে বড়।" ইহার উত্তরে বলা যায় যে, গুরুদেব মানুষের কল্পিত প্রাকৃত বস্তু নহেন। লোকের ভ্রান্ত ধারণা,—শিষ্যের কল্যাণে গুরু বড়। এইরূপ একটা মনগড়া Ism বা বাদ সমন্বয়বাদী সম্প্রদায়ের মধ্যে গড়িয়া উঠিয়াছে। এ হেন ঘৃণ্য চিন্তাস্রোতের উত্তর শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত দিয়াছেন,—

"পৃথিবীতে যত কথা ধর্ম্ম নামে চলে।
ভাগবত কহে তাহা পরিপূর্ণ ছলে॥"

ভাগবত ধর্ম্মকে বাদ দিয়া যে-সকল কথা বা মতবাদ জগতে প্রচলিত আছে, তাহা সর্ব্বৈব মিথ্যা এবং দুরভিসন্ধিপূর্ণ।

কতকগুলি অপসম্প্রদায় আবার শ্রীগুরুদেবকে শ্রীকৃষ্ণের আসনে বসাইয়া পূজার ছলনা করেন। এ সকল তত্ত্বানভিজ্ঞ কর্ত্তাভজা মায়াবাদীর দল জানে না, কোন্‌টি "শক্তিতত্ত্ব" এবং কোন্‌টি "শক্তিমত্তত্ত্ব"। সমাজে আজকাল এমন পাষণ্ডের সৃষ্টি হইয়াছে যে, তাহারা গুরুদেবকে বিষয়-বিগ্রহ জ্ঞান করিয়া তাহার চরণে তুলসী পর্য্যন্ত প্রদান করেন। এ হেন সম্প্রদায়ে শিষ্যের মনঃকল্পিত গুরুর অভাব হয় না। গুরুনামধারী ভোগি-গোস্বামিব্রুবের বর্ত্তমান কালে অভাব নাই, তাহারাই তাহাদের অসদাচার-কদাচারদ্বারা সমাজকে ধর্ম্মের নামে পঙ্কিলতার আবর্ত্তে নিক্ষেপ করিতেছে। গুরু কখনই গণ-গড্ডলিকার নিন্দা-বন্দনার কোন অপেক্ষা রাখেন না। তিনি সত্যই "গুরুতত্ত্ব", লঘু নহেন। তিনি সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ, সত্যে সুপ্রতিষ্ঠিত এবং সত্যের নির্ভীক বক্তা।

গুরুতত্ত্ব জানিতে হইলে বা বিচার করিতে হইলে শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভুর সাবধান বাণী স্মরণ করিতে হইবে,—

"সিদ্ধান্ত বলিয়া চিত্তে না কর অলস।
ইহা হইতে কৃষ্ণে লাগে সুদৃঢ় মানস॥"

অর্থাৎ সৎ-সিদ্ধান্ত জানিতে হইলে আলস্য করিলে চলিবে না। আলস্য বা জাড্যই সকল দোষের আকর।

শ্রীল সরস্বতী প্রভুপাদের একটী বাণী উল্লেখ করিয়া এস্থলে আমি শ্রীগুরু-মহিমা-কীর্ত্তন শেষ করিতেছি। তিনি বলিতেন,—"বৈষ্ণবকে চোখ দিয়ে দেখতে হয় না। তাঁকে কান দিয়ে দেখতে হয়। বাণীর দ্বারাই বৈষ্ণবের দর্শন পাওয়া যায়। দিব্যজ্ঞানদ্বারাই অপ্রাকৃত গুরু-বৈষ্ণবের দর্শন হয়।"

অস্মদীয় শ্রীগুরুপাদপদ্ম শ্রীস্বরূপ-রূপানুগ-ভক্তিবিনোদ-গৌর-সরস্বতীর বাণীর মন্দাকিনী ধারা সমগ্র পৃথিবীতে প্রবাহিত করিয়া পতিতপাবন বৈষ্ণব-গুরুর লীলা প্রচার করিতেছেন। শ্রীগুরুদেব পর-দুঃখদুঃখী। জীবে দয়া তাঁহার নিত্য স্বভাব। সরলতা বা নিষ্কপটতা ও সদ্ধর্ম্মপৃচ্ছা-এই দুইটীই শ্রীগুরুপাদপদ্মে বা আশ্রয়-বিগ্রহগণের নিকট উপনীত হইবার যোগ্যতা—

"কল্পে কল্পে ভ্রমে জীব এ ঘোর সংসারে।
ভক্তিযোগ বিনে কেহো সংসার না তরে॥

ভক্তিযোগ নহে কভু গুরুকৃপা বিনে।
তে কারণে গুরুসেবা কহে শ্রুতিগণে॥"

(শ্রীকৃষ্ণপ্রেমতরঙ্গিণী)

শ্রীশ্রীমদ্ আচার্য্যপাদপদ্মে প্রার্থনা, যেন অকপটে তাঁহার এবং তাঁহার স্নিগ্ধপার্ষদগণের কৃপাকণার কাঙ্গাল হইতে পারি। তাঁহারা যেন তাঁহাদের শ্রীপাদপদ্মে আকর্ষণ করেন—আত্মসাৎ করেন।

বাঞ্ছাকল্পতরুভ্যশ্চ কৃপাসিন্ধুভ্য এব চ।
পতিতানাং পাবনেভ্যো বৈষ্ণবেভ্যো নমো নমঃ॥

শ্রীগুরুকৃপাকণাপ্রার্থী—
—শ্রীজিতকৃষ্ণ দাসাধিকারী, ভক্তিভূষণ

শ্রীচৈতন্যে মর্ত্ত্যবুদ্ধি—নাস্তিকতা ও অপরাধ

[পূর্ব্বপ্রকাশিত ৪৩শ বর্ষ, ৯ম সংখ্যা, ৩৫৯ পৃষ্ঠার পর]

প্রামাণিক মহাগ্রন্থ কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামি-কৃত 'শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে' শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভুর অন্তর্দ্ধান প্রসঙ্গ স্পষ্টভাবে না থাকিলেও তাঁহার অন্তর্দ্ধানের অলৌকিকত্ব সম্বন্ধে কাহারও সন্দেহ থাকা উচিত নহে। যাঁহার দিব্যজীবনের আবির্ভাব হইতে কোন লীলাই লৌকিক নহে, তাঁহার তিরোভাব কি লৌকিক হইতে পারে?

(১৭) লেখক পুস্তকের ৩১৭ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন,—"যেন জয়ানন্দ আমাদের বুঝিয়ে দিলেন, একটী মানুষ কদাপি নিম্ব কাঠের তৈরি বিগ্রহের সঙ্গে বিলীন হয়ে যেতে পারে না। যে বিগ্রহ নিমকাঠ গঁদ ও ধুনোর আঠা আর পাটের দড়ি দিয়ে তৈরি। আর তর্কের খাতিরে যদি ধরেও নি যে তাঁর দিব্য সত্তা (অর্থাৎ কিনা যাকে আমরা আত্মা বলি) তা দেহ থেকে নির্গত হয়ে ওই বিগ্রহ জগন্নাথেই লীন হয়েছিল, তা'হলে স্বভাবতই প্রশ্ন জাগে, তাঁর পঞ্চভূতের তৈরি শরীর অর্থাৎ শবদেহটা তাহলে গেল কোথায়?"

লেখকের উক্ত বক্তব্যের উত্তরে জানাইতেছি যে, জয়ানন্দ-রচিত 'চৈতন্য-মঙ্গল একখানি তত্ত্ববিদ্বেষী গ্রন্থ। ঐ গ্রন্থের স্তাবক সম্প্রদায় ভক্তি-বিদ্বেষী

সাহিত্য সমর্থন করেন। জয়ানন্দ শ্রীচৈতন্যচরিতের প্রামাণিক লেখক সূত্রে প্রসিদ্ধ নহেন। উক্ত পুস্তকে লেখক শ্রীজগন্নাথ-বিগ্রহকে প্রাকৃত জড়বস্তু মাত্র জ্ঞান করিয়াছেন। ঐরূপ সিদ্ধান্তবিরুদ্ধ কথা এক মূর্খ প্রাকৃত কবির নিকট স্বরূপ দামোদর প্রভু শুনিয়া শাস্ত্র-সিদ্ধান্তাসিদ্বারা কবির কুমত ছেদন করিয়া তাহার প্রতি কৃপা করিয়াছিলেন। যথা—শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতবাণী,—

"আরে মূর্খ, আপনার কৈলি সর্ব্বনাশ।
তুই ত' ঈশ্বরে তোর নাহিক বিশ্বাস ॥
পূর্ণানন্দ-চিৎস্বরূপ জগন্নাথ-রায়।
তাঁরে কৈলি জড়-নশ্বর-প্রাকৃত-কায় !!
পূর্ণ-ষড়ৈশ্বর্য্য চৈতন্য—স্বয়ং ভগবান্।
তাঁরে কৈলি ক্ষুদ্র জীব স্ফুলিঙ্গ-সমান ॥
দুই-ঠাঞি অপরাধে পাইবি দুর্গতি !
অতত্ত্বজ্ঞ 'তত্ত্ব' বর্ণে, তার এই রীতি !!
আর এক করিয়াছ পরম 'প্রমাদ'।
দেহ-দেহি-ভেদ ঈশ্বরে কৈলে 'অপরাধ' !!
ঈশ্বরের নাহি কভু দেহ-দেহি-ভেদ।
স্বরূপ, দেহ,—চিদানন্দ, নাহিক বিভেদ ॥"

(চৈঃ চঃ অন্ত্য ৫।১১৭-১২২)

স্বরূপ দামোদর প্রভুর ঐ শিক্ষা লেখকেরও গ্রহণযোগ্য। মানুষের দেহ-দেহি ভেদ আছে। বদ্ধজীবের নশ্বর অনিত্য দেহ মায়িক বা জড়। কিন্তু ঈশ্বর মায়াতীত নিত্য সবিশেষ বিগ্রহ। এই মায়িক জগতে ঈশ্বর নিজ অচিন্ত্যশক্তিবলে আবির্ভূত হইলেও তাঁহার দেহে মায়িক বা জড়ের ধর্ম্ম নাই। তাঁহার দেহ চিন্ময়। মহাপ্রভু দিব্যোন্মাদ অবস্থায় রাত্রিতে দ্বার উদ্‌ঘাটন না করিয়া তিনটী প্রাচীর উল্লঙ্ঘনপূর্ব্বক সিংহদ্বারে তৈলঙ্গী গাভীদিগের মধ্যে অচেতন হইয়া পড়িয়াছিলেন এবং তখন তাঁহার হস্ত-পদ-সঙ্কুচিত হইয়া কূর্ম্মাকারে অবস্থান সম্পর্কে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের (অন্ত্য ১৭।১৬-১৮) বর্ণনায় পাওয়া যায়,—

"পেটের ভিতর হস্ত-পদ—কূর্ম্মের আকার।
মুখে ফেন, পুলকাঙ্গ, নেত্রে অশ্রুধার ॥
অচেতন পড়িয়াছেন,—যেন কুষ্মাণ্ড-ফল।
বাহিরে জড়িমা, অন্তরে আনন্দ-বিহ্বল ॥

গাভী সব চৌদিকে শুঁকে প্রভুর শ্রীঅঙ্গ।
দূর কৈলে নাহি ছাড়ে প্রভুর শ্রীঅঙ্গ-সঙ্গ ॥"

ভক্তগণ মহাপ্রভুকে তদবস্থায় দেখিয়া বহু যত্নে গৃহে আনিয়া উচ্চৈঃস্বরে নাম-সংকীর্ত্তন করার ফলে প্রভু চেতনতা প্রাপ্ত হন। তখন মহাপ্রভুর হস্ত-পদ বাহিরে আসিয়া যথাযোগ্য শরীর হয়।

"চেতন হইলে হস্ত-পদ বাহিরে আইল।
পূর্ব্ববৎ যথাযোগ্য শরীর হইল ॥"

(চৈঃ চঃ অন্ত্য ১৭।২১)

শ্রীমন্মহাপ্রভুর অধিরূঢ় মহাভাবযুক্ত প্রেমমগ্ন মূর্ত্তিতে তথা কূর্ম্মাকারে অবস্থান তাঁহার স্বয়ং ভগবত্তার পরিচয় প্রকাশ করে। জড়দেহধারী কোন ব্যক্তির পক্ষে এবম্বিধ লীলা সম্ভবপর নহে।

বেদান্তাচার্য্য শ্রীল বলদেব বিদ্যাভূষণপাদ 'সিদ্ধান্তরত্নম্' গ্রন্থে লিখিয়াছেন,—"শ্রীমদ্ভাগবতের একাদশ স্কন্ধে শ্রীহরির নির্য্যাণ ব্যাপার শ্রবণ করিয়া খিদ্যমান রাজা পরীক্ষিৎকে শান্তি প্রদানের নিমিত্ত ভগবান্ শুকদেব বলিয়াছিলেন,—'হে রাজন্! পরমেশ্বরেরও যে মনুষ্যের তুল্য জন্ম-মরণাদি দৃষ্ট হইতেছে, তাহা সত্য নহে। উহা নটের ন্যায় মায়া-বিড়ম্বনই জানিবে।' 'ব্রহ্ম বিগ্রহবিশিষ্ট নহেন, তিনি স্বয়ই বিগ্রহ। যেহেতু তাঁহার ঐ রূপই প্রধান'।"

ত্রিদণ্ডি গোস্বামিকুলমুকুটমণি শ্রীরূপানুগাচার্য্য শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভুর বিচারধারা অনুসরণ করিয়া বলিয়াছেন,—"শ্রীচৈতন্যচন্দ্র জগন্নাথদেবকে সাক্ষাৎ ব্রজেন্দ্রনন্দন দর্শন করিবার লীলা প্রদর্শন করিয়াছেন। নিম্বকাষ্ঠ বা নিম্বকাষ্ঠের ভিতরে ভগবান্ আছেন—পৌত্তলিকের এইরূপ শ্রীবিগ্রহে দেহ-দেহি-ভেদ বিচার তিনি প্রদর্শন করেন নাই। তিনি বলিয়াছেন,—'প্রতিমা নহ, তুমি সাক্ষাৎ ব্রজেন্দ্রনন্দন'।"

শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর "শ্রীচৈতন্যভাগবতে" বিভিন্ন স্থানে জানাইয়াছেন যে, শ্রীচৈতন্যদেব ও শ্রীজগন্নাথদেব—উভয়েই অভিন্নস্বরূপ। শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু অর্চ্চা-মূর্ত্তিতে জগন্নাথরূপে বিরাজ করেন, আবার সন্ন্যাসি-মূর্ত্তিতে ভক্তভাব অঙ্গীকারপূর্ব্বক লোকশিক্ষা প্রদান করেন।

"আপনেই উপাসক, উপাস্য আপনে।
কে বুঝে তাহান মন, তান কৃপা বিনে ॥
এই প্রভু দারুরূপে বৈসে যোগাসনে।
ন্যাসিরূপে ভক্তিযোগ করেন আপনে ॥"

(চৈঃ ভাঃ অন্ত্য ১০।৯৪-৯৫)

প্রসঙ্গতঃ আরও উল্লেখ করিতেছি যে, ওড়নষষ্ঠী উপলক্ষে জগন্নাথদেবের সেবকগণ শ্রীজগন্নাথ ও বলরামকে মাড়যুক্ত কাপড় পরিধান করাইতেন। তাহাতে পুণ্ডরীক বিদ্যানিধি সেবকগণের আচরণে দোষ-দর্শনাভিনয় করিলে ভক্তবৎসল শ্রীচৈতন্যদেব শ্রীপুণ্ডরীক বিদ্যানিধিকে স্বপ্নে দর্শন দিয়া তাঁহার ভ্রান্তি নিরাসকল্পে শাসন করেন এবং এমতে জীবকে শিক্ষা দিলেন যে তিনি বিধি-নিষেধের অতীত।

"সকল জানেন প্রভু চৈতন্য গোসাঞি।
জগন্নাথ-রূপে স্বপ্নে গেলা তান ঠাঞি॥
স্বপনে দেখেন বিদ্যানিধি মহাশয়।
জগন্নাথ বলাই আসি' হৈলা বিজয়॥"

(চৈঃ ভাঃ অন্ত্য ১০।১২৬-১২৭)

ভগবান্ তাঁহার প্রিয়বর্গকে স্বপ্নে অনুগ্রহ করিয়া থাকেন। অলৌকিক পরতত্ত্ব শ্রীচৈতন্যদেবে লৌকিক নিয়ম প্রযোজ্য হয় না। তাঁহার স্বরূপ ও জগন্নাথ-বিগ্রহ একই। সুতরাং জগন্নাথ-অঙ্গে শ্রীচৈতন্যদেব লীন হইয়াছিলেন—ইহাতে আশ্চর্য্য হওয়ার কিছু নাই।

(১৮) লেখক পুস্তকের ২৩ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন,—"বেশি দিনের কথা নয়, মাত্র পাঁচশো বছর আগে এক সাধারণ পরিবারের অতি সাধারণ সাংসারিক মানুষকে নিয়ে কেন এমন আধিদৈবিক গল্প করা হয়েছিল ভাবলে সততই বিস্ময় জাগে। যদি ঈশ্বরবাদীদের ভগবানের মতো চৈতন্য সর্বশক্তিমান পুরুষ হতেন, তাহলে, তাঁকে পুরীর জগন্নাথ মন্দিরে নিষ্ঠুর আততায়ীর হাতে নৃশংস-ভাবে মৃত্যুর সম্মুখীন হতে হতো না। [সদ্য আবিষ্কৃত পুঁথি বৈষ্ণবদাস কৃত 'চৈতন্য চকৃড়া' দ্রষ্টব্য। প্রাপ্তিস্থান—২১/২ বিডন ষ্ট্রীট্। কল-৬] সুতরাং চৈতন্যের ইতিহাস ঐতিহাসিক ভুল না আমাদের বোধগম্যের অজ্ঞতা আগে তার সমুচিত সমাধান হওয়া দরকার।"

এক্ষণে লেখক ১৮ পৃষ্ঠা, ২৯৯ পৃষ্ঠা এবং ৩২২ পৃষ্ঠায় বৈষ্ণবদাসের সদ্য আবিষ্কৃত পুঁথি হইতে যে উদ্ধৃতি দিয়াছেন, তাহা নিম্নরূপ—

"রাত্র দশ দণ্ডে চন্দন বিজয় যখন হ'ল ;
তখন পড়িলা প্রভুর অঙ্গ স্তম্ভ পছ আড়ে।
কান্দিল বৈষ্ণবগণ কুহাতো কুহাড়ে॥"

(চৈতন্য চকৃড়া বা চৈতন্য গৌরাঙ্গ চকৃড়া)

লেখক উক্ত পয়ারছন্দের পদ্যাংশের অর্থ পুস্তিকার ২৯৯ পৃষ্ঠায়

লিখিয়াছেন,—"রাত্রি দশ দণ্ডে (এগারোটা নাগাদ) চন্দন বিজয়ের পর মহাপ্রভুর (চৈতন্যের) দেহ গরুর স্তম্ভের পিছনে পড়ে গেল। উপস্থিত বৈষ্ণবগণ সকলে আকুলি-ব্যাকুলি করে কেঁদে উঠলো। আর লেখক বৈষ্ণবদাস নিজেকে ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী বলে ঘোষণা করেছেন।" কিন্তু উক্ত পদ্যাংশে লেখকের প্রত্যক্ষ দর্শনের কথা উল্লিখিত হয় নাই এবং মহাপ্রভুর অঙ্গ গরুড় স্তম্ভের পিছনে পড়িয়া থাকার অর্থই যে তিনি দেহত্যাগ করিয়াছেন—ইহাও বুঝায় না। 'চৈতন্য চকড়ার' উল্লিখিত পদ্যাংশে মহাপ্রভুর দেহত্যাগের স্পষ্ট বর্ণনা নাই। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করিতেছি যে, মহাপ্রভুর যমুনাজ্ঞানে সমুদ্রে ঝম্প ও মূর্চ্ছা, মূর্চ্ছিতাবস্থায় ভাসিয়া কোনর্কাভিমুখে গমন, ভাবে নিমগ্ন গোপী-কিঙ্করী-অভিমানী প্রভুর উদ্‌ঘূর্ণা, স্বরূপাদিকর্ত্তৃক প্রভুর অন্বেষণ এবং মহাপ্রভুর অপ্রাপ্তিতে তদন্তর্দ্ধানানুমান প্রভৃতি যে সমস্ত লীলা কৃষ্ণদাস কবিরাজ-কৃত শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে অষ্টাদশ পরিচ্ছেদে বর্ণিত আছে, তাহাতেও ত' প্রভুর দেহত্যাগ হয় নাই। প্রভুকে অন্বেষণ করিবার কালে ভক্তবৃন্দের অবস্থা হইয়াছিল,—"বিষাদে বিহ্বল সবে, নাহিক চেতন।" এক অদ্ভুত ভাবাবিষ্ট ধীবরকে দেখিয়া ও ধীবরকর্ত্তৃক প্রভুর সংবাদ ও সন্ধান পাইয়া স্বরূপ গোস্বামী ধীবরকে প্রভুর পরিচয় দিলেন ;—

"স্বরূপ কহে,— যাঁরে তুমি কর 'ভূত'-জ্ঞান।
ভূত নহে—তেঁহো কৃষ্ণচৈতন্য ভগবান্॥
প্রেমাবেশে পড়িলা তেঁহো সমুদ্রের জলে।
তাঁরে তুমি উঠাইলা আপনার জালে॥
তাঁর স্পর্শে হইল তোমার কৃষ্ণ প্রেমোদয়।
ভূত-প্রেত-জ্ঞানে তোমার হৈল মহাভয়॥"

(চৈঃ চঃ অন্ত্য ১৮।৬৪-৬৬)

লেখক উক্ত শ্লোকটির কিয়দংশ পুস্তকের ২৮২ পৃষ্ঠায় উল্লেখ করিয়াছেন এবং ২৮২ পৃষ্ঠাতেই লেখক লিখিয়াছেন—"সুতরাং তাঁর মৃত্যুই হয়েছিল বলা যায়।" কিন্তু বস্তুতঃ শ্রীচৈতন্যদেবের মৃত্যু হয় নাই। সকল ভক্তগণের উচ্চ সংকীর্ত্তনে মহাপ্রভু অর্দ্ধবাহ্যদশায় উপনীত হন। (ক্রমশঃ)

—শ্রীচৈতন্যকৃষ্ণ দাসাধিকারী

———

॥ শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গৌ জয়তঃ ॥

শ্রীশ্রীব্যাসপূজা-মহোৎসব

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি
(রেজিষ্টার্ড)
ফোন—২৪৭

শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠ
তেঘরিপাড়া, পোঃ নবদ্বীপ (নদীয়া।
২৯শে অগ্রহায়ণ, ১৩৯৮ ; ইং ১৬।১২।৯১

নারায়ণং নমস্কৃত্য নরঞ্চৈব নরোত্তমম্।
দেবীং সরস্বতীং ব্যাসং ততো জয়মুদীরয়েৎ ॥

ব্যাসকুল-শ্রবণসজ্জ্যারাধ্য-বেদান্তবিদ্যাশ্রিতেষু—

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির উদ্যোগে নবদ্বীপধামস্থ শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠে আগামী ৩রা গোবিন্দ, ৫০৫ শ্রীগৌরাব্দ ; ৮ই ফাল্গুন, ১৩৯৮ (ইং ২১।২।৯২) শুক্রবার শ্রীল স্বরস্বতী ঠাকুরের অন্তরঙ্গ প্রিয়পার্ষদবর নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজের শুভ আবির্ভাব মাঘী-কৃষ্ণা তৃতীয়া-তিথি হইতে ব্যাসাভিন্ন জগদ্‌গুরু নিত্য-লীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের শুভ প্রকটবাসর মাঘী-কৃষ্ণা পঞ্চমী ৫ই গোবিন্দ, ১০ই ফাল্গুন (ইং ২৩।২।৯১) রবিবার পর্য্যন্ত শ্রীশ্রীব্যাসপূজা ও তদঙ্গীভূত পূজাপঞ্চক অর্থাৎ কৃষ্ণপঞ্চক, ব্যাসপঞ্চক, মধ্বাদি-পঞ্চক, আচার্য্য-পঞ্চক, সনকাদি-পঞ্চক, গুরু-পঞ্চক, তত্ত্বপঞ্চকের পূজা, হোম প্রভৃতি অনুষ্ঠিত হইবেন। প্রত্যহ শ্রীহরিকীর্ত্তন, শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ, বক্তৃতা, স্তব-পাঠ, শ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণব-শংসন ও অঞ্জলি প্রদানাদি এই মহোৎসবের প্রধান ও বিশেষ অঙ্গ।

ধর্ম্মপ্রাণ সজ্জন মহোদয়গণ উক্ত শুদ্ধভক্ত্যনুষ্ঠানে সবান্ধব যোগদান করিলে সমিতির সদস্যবর্গ পরমানন্দিত ও উৎসাহিত হইবেন। এই মহদনুষ্ঠানে যোগদান করিতে অসমর্থ হইলে প্রাণ, অর্থ, বুদ্ধি ও বাক্যদ্বারা সমিতির সেবাকার্য্যে সহানুভূতি প্রদর্শন করিলেও ভগবৎসেবোন্মুখী সুকৃতি অর্জ্জিত হইবে।

বৈয়াসক্যানুগত্যাভিলাষী—
সভ্যবৃন্দ,
শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি

দ্রষ্টব্য ঃ—৮ই ফাল্গুন, শুক্রবার ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে যথারীতি মঙ্গলারতি তদনন্তর শ্রীগুরুমহিমাসূচক বন্দনাদি, মহাজন-গীতি কীর্ত্তন, পূর্ব্বাহ্নে শ্রীশ্রীপূজা-পঞ্চকাদি, অঞ্জলিপ্রদান ও মধ্যাহ্নে বিশেষ ভোগারতি এবং মহাপ্রসাদ বিতরণ ; অপরাহ্নে বিশেষ সভা কীর্ত্তন এবং শ্রীগুরুমহিমাসূচক ভক্ত্যঞ্জলিরূপ-প্রবন্ধাদি পাঠ ও বক্তৃতা।

৯ই ফাল্গুন, শনিবার পূর্ব্বাহ্নে শ্রীগুরুতত্ত্ব ও শ্রীব্যাস-তত্ত্ব সম্বন্ধে আলোচনা এবং সন্ধ্যায় শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের অবদান সম্পর্কে ভাষণ।

১০ই ফাল্গুন, রবিবার পূর্ব্বাহ্নে শ্রীল প্রভুপাদের পাদপদ্মে অঞ্জলি প্রদান ; অপরাহ্নে বিভিন্ন ভাষায় প্রবন্ধাদি পাঠ এবং সন্ধ্যারতি অন্তে শ্রীমদ্ভাগবত হইতে শ্রীশ্রীব্যাসদেবের সম্বন্ধে আলোচনা।

॥ শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ ॥

স বৈ পুংসাং পরো ধর্ম্মো যতো ভক্তিরধোক্ষজে ।

ধর্ম্মঃ স্বনুষ্ঠিতঃ পুংসাং বিষ্বক্‌সেন-কথাসু যঃ ।

নোৎপাদয়েদ্যদি রতিং শ্রম এব হি কেবলম্ ॥

অহৈতুক্যপ্রতিহতা যয়াত্মা সুপ্রসীদতি ॥

সেই ধর্ম্ম শ্রেষ্ঠ যাতে আত্ম-পরসন্ন ।
অধোক্ষজে অহৈতুকী ভক্তি বিঘ্নশূন্য ॥

অন্য ধর্ম্ম সুষ্ঠুরূপে পালে যেই জন ।
হরি-কথায় রতি নৈলে পণ্ড সেই শ্রম ॥

৪৩শ বর্ষ | ২৫ নারায়ণ, অনিরুদ্ধ, ৫০৫ শ্রীগৌরাব্দ
৩০ পৌষ, বুধবার, ১৩৯৮, ইং ১৫/১/৯২ | ১১শ সংখ্যা

শ্রীশ্রীনিত্যানন্দাষ্টকম্

[শ্রীমদ্ বৃন্দাবনদাস-ঠক্কুর-বিরচিতম্]

শরচ্চন্দ্র-ভ্রান্তিং স্ফুরদমল কান্তিং-গজপতিং
হরি-প্রেমোন্মত্তং ধৃত-পরম সত্ত্বং-স্মিতমুখম্ ।
সদা ঘূর্ণন্নেত্রং কর-কলিত-বেত্রং কলিভিদং
ভজে নিত্যানন্দং ভজন-তরু-কন্দং নিরবধি ॥ ১ ॥

যাঁহার শ্রীমুখমণ্ডল শরৎকালীন চন্দ্রের শোভাতিশয়কেও তিরস্কার করিতেছে, যাঁহার সুবিমল অঙ্গকান্তি পরম মনোহররূপে শোভা পাইতেছে, যিনি মত্ত মাতঙ্গের ন্যায় মৃদু-মন্থর গতিতে গমন করেন, যিনি সর্ব্বদা শ্রীকৃষ্ণপ্রেমে উন্মত্ত, যাঁহার কলেবর বিশুদ্ধ-সত্ত্বময়, যিনি নিরন্তর সহাস্য-বদন, যাঁহার নয়ন-যুগল সদাই চঞ্চল,

যাঁহার হস্তে বেত্র শোভা পাইতেছে, যিনি কলিকলুষসমূহ ধ্বংস করেন, শ্রীকৃষ্ণভক্তি-কল্পতরুর মূল-স্বরূপ সেই শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুকে আমি সর্ব্বদা ভজনা করি ॥ ১ ॥

রসানামাগারং স্বজনগণ-সর্ব্বস্বমতুলং
তদীয়ৈক-প্রাণপ্রতিম-বসুধা-জাহ্নবী-পতিম্ ।
সদা প্রেমোন্মাদং পরম বিদিতং মন্দ-মনসাং
ভজে নিত্যানন্দং ভজন-তরু-কন্দং নিরবধি ॥ ২ ॥

যিনি নিখিল রসের আধার, যিনি ভক্তগণের প্রাণধন, ত্রিজগতে কুত্রাপি যাঁহার তুলনা নাই, যিনি প্রাণাপেক্ষা প্রিয়তর শ্রীবসুধা ও জাহ্নবা দেবীর প্রাণপতি, যিনি নিরন্তর প্রেমোন্মত্ত, যিনি সমুদ্ধর্ত্তা-রূপে পাষণ্ডগণের দলনকর্ত্তা, সেই শ্রীকৃষ্ণ-ভক্তি-কল্পবৃক্ষের মূল-স্বরূপ শ্রীনিত্যানন্দ-প্রভুকে আমি সর্ব্বদা ভজনা করি ॥ ২ ॥

শচীসূনু-প্রেষ্ঠং নিখিল-জগদিষ্টং সুখময়ং
কলৌ মজ্জজ্জীবোদ্ধরণ-করণোদ্দাম-করুণম্ ।
হরের্ব্যাখ্যানাদ্বা ভব-জলধি-গর্ব্বোন্নতি-হরং
ভজে নিত্যানন্দং ভজন-তরু-কন্দং নিরবধি ॥ ৩ ॥

যিনি শ্রীগৌরাঙ্গের অতি প্রিয়, যিনি সর্ব্ব জগতের মঙ্গল বিধান করেন, যিনি পরম সুখময়, কলিযুগে পাপহত জীবগণের উদ্ধারের নিমিত্ত যাঁহার করুণার অবধি নাই, যিনি শ্রীহরিনাম-সঙ্কীর্ত্তন-প্রচারদ্বারা দুস্তর ভব-সমুদ্রের গর্ব্ব খর্ব্ব করিয়াছেন অর্থাৎ যিনি সংসার-সাগর অবলীলাক্রমে উত্তীর্ণ হইবার উপায় বিধান করিয়াছেন, শ্রীকৃষ্ণভক্তি-কল্পলতিকার মূল-স্বরূপ সেই শ্রীনিত্যানন্দ-প্রভুকে আমি সর্ব্বদা ভজনা করি ॥ ৩ ॥

অয়ে ভ্রাতর্নৃণাং কলি-কলুষিণাং কিং নু ভবিতা
তথা প্রায়শ্চিত্তং রচয় যদনায়াসত ইমে ।
ব্রজন্তি ত্বামিত্থং সহ ভগবতা মন্ত্রয়তি যো
ভজে নিত্যানন্দং ভজন-তরু-কন্দং নিরবধি ॥ ৪ ॥

"হে ভ্রাতঃ ! কলি-পাপাচ্ছন্ন জীবগণের গতি কি হইবে ? তুমি কৃপা করিয়া ঈদৃশ উপায় বিধান কর, যাহাতে তাহারা তোমার শ্রীচরণ লাভ করিতে পারে"— এইরূপে যিনি শ্রীগৌর-ভগবানের সহিত কথোপকথন ও যুক্তি পরামর্শ করিতেন, শ্রীকৃষ্ণভক্তি-কল্পলতার মূল-স্বরূপ সেই শ্রীনিত্যানন্দ-প্রভুকে আমি ভজনা করি ॥ ৪ ॥

যথেষ্টং যে ভ্রাতঃ ! কুরু হরি-হরি-ধ্বানমনিশং
ততো বঃ সংসারাম্বুধি-তরণ-দায়ো ময়ি লগেৎ ।
ইদং বাহু-স্ফোটৈরটতি রটয়ন্ যঃ প্রতিগৃহং
ভজে নিত্যানন্দং ভজন-তরু-কন্দং নিরবধি ॥ ৫ ॥

"হে ভাই-সকল ! তোমরা নিরন্তর শ্রীহরিনাম যথেষ্টরূপে কীর্ত্তন কর, তাহা হইলে তোমাদের ভব-সমুদ্র পার হইবার জন্য আমি দায়ী রহিলাম"—এইরূপ বলিতে বলিতে যিনি বাহু আস্ফালনপূর্ব্বক গৃহে গৃহে গমন করিতেন, শ্রীকৃষ্ণভক্তি-কল্পতরুর মূল-স্বরূপ সেই শ্রীনিত্যানন্দ-প্রভুকে আমি ভজনা করি ॥ ৫ ॥

বলাৎ সংসারাম্ভোনিধি-হরণ-কুম্ভোদ্ভবমহো
সতাং শ্রেয়ঃ-সিন্ধূন্নতি-কুমুদ-বন্ধুং সমুদিতম্ ।
খলশ্রেণী-স্ফুর্জ্জত্তিমির-হর-সূর্য্য-প্রভমহং
ভজে নিত্যানন্দং ভজন-তরু-কন্দং নিরবধি ॥ ৬ ॥

আহা মরি ! সাধুগণের সংসার-সমুদ্র শোষণ করিতে যিনি কুম্ভ বা কলস-স্বরূপ অর্থাৎ যিনি অনায়াসে শ্রীভগবদ্ভক্তগণের উদ্ধার সাধন করেন, যিনি জীবগণের কল্যাণ-সমুদ্র উদ্বেলিত করিবার জন্য চন্দ্র-রূপে সমুদিত হইয়াছেন অর্থাৎ যিনি অশেষরূপে জীবের মঙ্গল সাধন করেন, যিনি দুর্জ্জনগণের পাপান্ধকার বিনাশ করিতে সূর্য্য-স্বরূপ অর্থাৎ যিনি পাপিগণের পাপরাশি বিধ্বংস করেন, শ্রীকৃষ্ণভক্তি-কল্পলতার মূলস্বরূপ সেই শ্রীনিত্যানন্দ-প্রভুকে আমি সর্ব্বদা ভজনা করি ॥ ৬ ॥

নটন্তং গায়ন্তং হরিমনুবদন্তং পথি পথি
ব্রজন্তং পশ্যন্তং স্বমপি নদয়ন্তং জনগণম্ ।
প্রকুর্ব্বন্তং সন্তং সকরুণ-দৃগন্তং প্রকলনাদ্
ভজে নিত্যানন্দং ভজন-তরু-কন্দং নিরবধি ॥ ৭ ॥

যিনি নৃত্য করিতে করিতে, কীর্ত্তন করিতে করিতে, হরিবোল বলিতে বলিতে ও শ্রীহরিনাম-কীর্ত্তনকারী নিজ ভক্তগণের প্রতি দৃষ্টি করিতে করিতে পথে পথে বিচরণ করিতেন এবং যিনি সজ্জনগণের প্রতি করুণ-নেত্রে ঈক্ষণ করিতেন, শ্রীকৃষ্ণ-ভক্তি-কল্পবৃক্ষের মূল-স্বরূপ সেই শ্রীনিত্যানন্দ-প্রভুকে আমি সর্ব্বদা ভজনা করি ॥ ৭ ॥

সুবিভ্রাণং ভ্রাতুঃ কর-সরসিজং কোমলতরং
মিথো বক্ত্রালোকোচ্ছলিত-পরমানন্দ-হৃদয়ম্ ।

ভ্রমন্তং মাধুর্য্যৈরহহ ! মদয়ন্তং পুরজনান্
ভজে নিত্যানন্দং ভজন-তরু-কন্দং নিরবধি ॥ ৮ ॥

যিনি শ্রীগৌরাঙ্গের সুকোমল কর-কমল ধারণপূর্ব্বক পরস্পরের বদন-চন্দ্র সন্দর্শন-জনিত পরমানন্দে পরিপূর্ণ হইতেন, এবং আহা মরি ! যিনি নগরবাসিগণকে স্বীয় অনির্ব্বচনীয় মাধুর্য্যে উন্মত্ত করিয়া চতুর্দ্দিকে বিচরণ করিতেন, শ্রীকৃষ্ণভক্তি-কল্পলতার মূল-স্বরূপ সেই শ্রীনিত্যানন্দ-প্রভুকে আমি সর্ব্বদা ভজনা করি ॥ ৮ ॥

রসানামাধানং রসিক-বর-সদ্বৈষ্ণব-ধনং
রসাগারং সারং পতিত-ততি-তারং স্মরণতঃ ।
পরং নিত্যানন্দাষ্টকমিদমপূর্ব্বং পঠতি যঃ
স্তদঙ্ঘ্রি-দ্বন্দ্বাব্জং স্ফুরতু নিতরাং তস্য হৃদয়ে ॥ ৯ ॥

যিনি ভক্তিরসসমূহ-প্রদানকারী, যিনি রসিক ভক্তগণের সর্ব্বস্ব-ধন, যিনি নিখিল রসের আধার-ভূত, যিনি ত্রিজগতের সারবস্তু, যাঁহার স্মরণ করিলে পাপি-গণের পরিত্রাণ লাভ হইয়া থাকে, সেই শ্রীনিত্যানন্দ-প্রভুর এই অত্যুত্তম ও অপূর্ব্ব অষ্টক যিনি পাঠ করিবেন, তাঁহার হৃদয়ে তদীয় সুদুর্ল্লভ শ্রীপাদপদ্ম সুচারু-রূপে স্ফুর্ত্তিপ্রাপ্ত হউক ॥ ৯ ॥

প্রশ্নোত্তর

(গৌড়ীয় পূর্ব্বাচার্য্যগণের বৈশিষ্ট্য)

৩৪ । সাত্বত-আচার্য্য-চতুষ্টয়ের বৈশিষ্ট্য কেন ?

"শ্রীরামানুজ, শ্রীমধ্ব, শ্রীবিষ্ণুস্বামী ও শ্রীনিম্বাদিত্য—এই চারিজন বৈষ্ণবাচার্য্য । আরও যত বৈষ্ণবাচার্য্য হইয়াছেন, সকলেই এই চারি আচার্য্যের মধ্যে কোন-না-কোন আচার্য্যের অনুগত । রামানুজ—বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী, মধ্ব—শুদ্ধদ্বৈতবাদী, বিষ্ণুস্বামী—শুদ্ধাদ্বৈতবাদী এবং নিম্বাদিত্য—দ্বৈতাদ্বৈতবাদী ।"

—'শ্রীনিম্বাদিত্যাচার্য্য', সঃ তোঃ ৭।৭'

৩৫ । শ্রীগৌরসুন্দর শ্রীনিত্যানন্দ, শ্রীঅদ্বৈত, শ্রীরূপ, শ্রীসনাতন, শ্রীজীবাদি গোস্বামিবৃন্দকে কি কি প্রচারের ভার দিয়াছেন ?

"শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীনিত্যানন্দ-প্রভু ও শ্রীঅদ্বৈত-প্রভুকে শ্রীনাম-মাহাত্ম্য প্রচার করিতে আজ্ঞা ও শক্তি দান করেন ; শ্রীরূপ গোস্বামীকে তিনি রসতত্ত্ব প্রকাশ

করিতে আজ্ঞা ও শক্তি দান করেন। শ্রীসনাতন গোস্বামীকে বৈধী ভক্তি এবং বৈধী ভক্তি ও রাগভক্তির পরস্পর সম্বন্ধ প্রচার করিতে আজ্ঞা দেন; গোকুলের প্রকটাপ্রকট সম্বন্ধ নির্ণয় করিবার জন্যও শ্রীসনাতন গোস্বামীকে আজ্ঞা দেন। শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু ও শ্রীসনাতনের দ্বারা শ্রীজীবকে সম্বন্ধাভিধেয় প্রয়োজন-তত্ত্ব নির্ণয় করিবার শক্তি দেন।" —জৈবধর্ম্ম ৩৯শ অঃ

৩৬। শ্রীস্বরূপ-দামোদর গোস্বামী প্রভুর উপর কি ভার ছিল?

"শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীস্বরূপ-দামোদরকে রসময়ী উপাসনা প্রচার করিতে আজ্ঞা করেন; সেই আজ্ঞাক্রমে তিনি দুই ভাগে কড়চা রচনা করেন—একভাগে রসোপাসনার অন্তঃপন্থা ও অন্যভাগে রসোপাসনার বহিঃপন্থা লিখিয়াছেন। অন্তঃপন্থা শ্রীদাস গোস্বামীর কণ্ঠে অর্পণ করেন, তাহা শ্রীদাস গোস্বামীর গ্রন্থে পর্য্যবসিত হইয়াছে; বহিঃপন্থা শ্রীমদ্বক্রেশ্বর গোস্বামীকে অর্পণ করেন।" — জৈবধর্ম্ম ৩৯শ অধ্যায়

৩৭। রায় রামানন্দের প্রতি রস-বিস্তারের ভারটী কে সম্পন্ন করিয়াছেন?

"শ্রীমন্মহাপ্রভু রায় রামানন্দকে যে রস-বিস্তারের ভার দিয়াছিলেন, তিনি সে-কার্য্য শ্রীরূপের দ্বারাই করিয়াছেন।" —জৈবধর্ম্ম ৩৯শ অঃ

৩৮। গৌড়ীয়াচার্য্যগণের সেনাপতি কে?

"শ্রীসনাতন গোস্বামী আমাদের গৌড়ীয়াচার্য্যদিগের মধ্যে সেনাপতি।"

—'তাৎপর্য্যানুবাদ', বৃঃ ভাঃ ২।১।১৪

৩৯। শ্রীসনাতনের নিকট বৈষ্ণব-জগৎ চিরবিক্রীত কেন?

শ্রীশ্রীচৈতন্য-মহাপ্রভু-শ্রীসনাতনকে সম্পূর্ণ শক্তি সঞ্চার করিয়া শ্রীবৃন্দাবনের লুপ্ত-তীর্থ-উদ্ধার-জন্য কাশী হইতে তথায় প্রেরণ করিলেন। সনাতন মহাপ্রভুর শক্তি-সঞ্চারে প্রেমানন্দে বৃন্দাবনে গমনপূর্ব্বক স্বীয় ভ্রাতা শ্রীরূপ ও অন্যান্য ভক্তগণের সহিত মিলিত হইয়া তীর্থ উদ্ধার, শ্রীমূর্ত্তি-প্রকাশ ও মহাপ্রভুর আদিষ্ট ভগবদ্ভক্তি-প্রতিপাদ্য, বহু গ্রন্থ প্রকাশ করিলেন। পাঠক! সনাতনাদি গোস্বামিপাদদিগের নিকট বৈষ্ণব-জগৎ সম্পূর্ণ ঋণী হইয়া আছেন।" —'শ্রীশ্রীসনাতন গোস্বামী প্রভু', সঃ তোঃ ২।৭

৪০। শ্রীরূপের আচার-প্রচার কি?

"শ্রীরূপ যে-দিবস শ্রীনবদ্বীপচন্দ্র শ্রীশচীনন্দন মহাপ্রভুর নাম কর্ণে শ্রবণ করেন, সেই দিন হইতেই মহাপ্রভুর দর্শন-লালসা তাঁহার হৃদয়কে ব্যথিত করে। স্বভক্ত-তত্ত্বজ্ঞ সর্ব্বান্তর্যামী শ্রীচৈতন্যদেব শ্রীরূপের অন্তর জানিয়া শ্রীবৃন্দাবনে গমনকালীন রামকেলি-গ্রামে উপস্থিত হইয়া শ্রীরূপকে দর্শন দেন। শ্রীরূপ মহাপ্রভুর দর্শনে

আপনাকে সকল-জীবন মনে করিয়া আনন্দসাগরে নিমগ্ন হইলেন। নিত্যমুক্ত কৃষ্ণভক্তগণকে মায়া কখনই আবদ্ধ করিতে পারে না। অল্পদিন-মধ্যেই শ্রীরূপ বিষয়াদি-সুখের মুখে শতমুখী (অর্থাৎ ঝাঁটা) মারিয়া মহা বৈরাগ্যের সহিত প্রয়াগ-তীর্থে গিয়া মহাপ্রভুর চরণ-প্রান্তে পতিত হইলেন। মহাপ্রভু শ্রীরূপকে যথোচিত কৃপাপূর্ব্বক শক্তি-সঞ্চার করিয়া রসতত্ত্ব-উপদেশ প্রদানান্তর শ্রীবৃন্দাবনের লুপ্ত-তীর্থ-সকল উদ্ধার করিবার জন্য তথায় প্রেরণ করিলেন। শ্রীরূপ মহাপ্রভুর অনুমতি শিরোধার্য্য করত ব্রজধামে গমন করিয়া, অন্যান্য ভক্তগণের সহিত সংযুক্ত হইয়া ব্রজস্থ লুপ্ত-তীর্থোদ্ধার এবং শ্রীমূর্ত্তি-সেবা প্রকাশ করেন। তৎপরে তিনি পাপ-তাপাচ্ছন্ন কলি-জীবের হিতকামনায় শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা-সম্মত শ্রীমদ্ভগবদ্ভক্তি-তত্ত্বপূর্ণ ভক্তিরসামৃতসিন্ধু, লঘুভাগবতামৃত, হংসদূত, উদ্ধব-সন্দেশ, কৃষ্ণ-জন্মতিথি-বিধি, লঘু ও বৃহদ্-গণোদ্দেশদীপিকা, স্তবমালা, বিদগ্ধমাধব, ললিতমাধব,-দানকেলি-কৌমুদী, উজ্জ্বলনীলমণি, প্রযুক্তাখ্য (আখ্যাত) চন্দ্রিকা, মথুরা-মহিমা, পদ্যাবলী, নাটক-চন্দ্রিকা প্রভৃতি গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। পতিতপাবন গৌরাঙ্গদেব রূপ-সনাতনদ্বারা—দৈন্য, স্বরূপ-দামোদরের দ্বারা – নিরপেক্ষতা, ব্রহ্ম-হরিদাসের দ্বারা—সহিষ্ণুতা ও রায় রামানন্দের দ্বারা—জিতেন্দ্রিয়তা-ধর্ম্ম প্রচার করেন। কোন কোন ভক্তের বাক্যে প্রকাশ আছে যে, মহাপ্রভু শ্রীরূপের দ্বারা লীলা-তত্ত্ব, শ্রীসনাতনের দ্বারা ভক্তি-তত্ত্ব, ব্রহ্ম-হরিদাসের দ্বারা নাম-তত্ত্ব ও রায় রামানন্দের দ্বারা প্রেম-তত্ত্ব প্রচার করেন। যাহা হউক, ঐ সম্বন্ধে আমদের কোন তর্ক নাই। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, ন্যাড়া, বাউল, কর্ত্তাভজা, রসিকশেখর, সহজিয়া প্রভৃতিরা মিথ্যা করিয়া ঐ মহাত্মাদিগকে স্বীয় স্বীয় মতের আচার্য্য বলিয়া প্রকাশ করায় মহাপ্রভুর প্রচারিত পরম পবিত্র বৈষ্ণব-ধর্ম্মের প্রতি অধিকাংশ ভদ্র ব্যক্তির অশ্রদ্ধা দেখা দেয়।"

—'শ্রীশ্রীরূপগোস্বামী প্রভু', সঃ তোঃ ২।৮

৪১। শ্রীরূপের সিদ্ধান্ত কি সর্ব্বত্র আদরণীয় ?

"শ্রীরূপ সর্ব্বত্র শাস্ত্র প্রমাণ দিয়া তাঁহার সযুক্তিক সিদ্ধান্তগুলিকে স্থাপন করিয়াছেন। ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়স্থ লোকদিগের মনে অনেকগুলি সিদ্ধান্ত ভাল লাগে না। কিন্তু যাঁহারা শুদ্ধসত্ত্ব পাইবার উদ্দেশে উপাসনা অবলম্বন করেন, তাঁহাদের চিত্তে শ্রীরূপের সিদ্ধান্তগুলি বড় ভাল লাগে।"

—'শ্রীলঘুভাগবতামৃত-সমালোচনা', সঃ তোঃ ১১।৩

৪২। শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামী প্রভু শ্রীরূপানুগবর কেন ?

"সন্ন্যাসের ছল করি', নীলাচলে সেই হরি,
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য যতীশ্বর।

দামোদর রামানন্দ,　　ল'য়ে করি' পরানন্দ,
গূঢ়তত্ত্ব জানায় বিস্তর ॥
রঘুনাথে সেই তত্ত্ব,　　শিখাইয়া পরমার্থ,
পাঠাইল শ্রীরূপের কাছে ।
শ্রীদাস-গোস্বামী ব্রজে,　　রূপসহ কৃষ্ণ ভজে,
মনঃশিক্ষা-শ্লোক লিখিয়াছে ॥"

— 'শ্রীমনঃশিক্ষা', ৫

৪৩। শ্রীরঘুনাথ ভট্ট গোস্বামী প্রভুর প্রতি মহাপ্রভুর কি ভার ছিল ?

"শ্রীমদ্ভাগবত-মাহাত্ম্য প্রচার করাই শ্রীরঘুনাথ ভট্ট গোস্বামীর প্রতি ভার ছিল।" —জৈবধর্ম্ম ৩৯শ অঃ

৪৪। শ্রীগোপাল ভট্ট গোস্বামী প্রভুর প্রতি কি ভার ছিল ?

"শুদ্ধ-শৃঙ্গার রসকে বিকৃত করিতে না পারে এবং বৈধী ভক্তির প্রতি কেহ অযথা অশ্রদ্ধা না করে, ইহার যে ব্যবস্থা করা আবশ্যক, তাহা করার ভার শ্রীভট্ট গোস্বামীর প্রতি ছিল।" —জৈবধর্ম্ম ৩৯শ অঃ

৪৫। শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতীর উপর কি ভার ছিল ?

"ব্রজরসানুরাগমার্গ যে সর্ব্বোপরি, তাহা জগৎকে বুঝাইবার ভার শ্রীসরস্বতী গোস্বামীর উপর ছিল।" —জৈবধর্ম্ম ৩৯শ অঃ

৪৬। সার্ব্বভৌমের উপর কি প্রচার-ভার ছিল ?

"তত্ত্ব-প্রচার-ভার সার্ব্বভৌমের উপর ছিল ; তিনি সে-কার্য্য নিজ কোন শিষ্যের দ্বারা শ্রীজীবে অর্পণ করেন।" —জৈবধর্ম্ম ৩৯শ অঃ

৪৭। গৌড়ীয়-মহান্তদিগের উপর কি ভার ছিল ?

"শ্রীগৌর-তত্ত্ব প্রকাশপূর্ব্বক জীবগণকে শ্রীগৌরোদিত কৃষ্ণরসে শ্রদ্ধা জন্মাইবার ভার গৌড়ীয়-মহান্তদিগের প্রতি ছিল। কতকগুলি মহাত্মাকে রস-কীর্ত্তন-পদ্ধতি সৃষ্টি করিয়া প্রচার করিবার ভারও অর্পণ করিয়াছিলেন।"

—জৈবধর্ম্ম ৩৯শ অঃ

৪৮। গৌড়ীয়-সম্প্রদায়ের তত্ত্বাচার্য্য কে ?

"শ্রীজীব গোস্বামিপাদ আমাদের তত্ত্বাচার্য্য ; সুতরাং শ্রীরূপ-সনাতনের শাসনগর্ভে সর্ব্বদাই বর্ত্তমান।" —ব্রঃ সং ৫।৩৭

—জগদ্গুরু শ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুর

'বড় আমি' ও 'ভাল আমি'

চেতনের ধর্ম্মের নির্ব্বিকাশক্রমে জীবের 'বড় আমি'র প্রগতি লাভজনক বলিয়া শ্রুতিশাস্ত্র গান করেন। আধ্যক্ষিকগণ তাঁহাদের ভোগ বা ত্যাগের বিচারে 'বড় আমি'কে ভোক্তা বা ভোগ-রহিত বলিয়া বিচার করেন। আর নিগমকল্পতরুর গলিত ফল ভাগবতার্কমরীচিমালা 'বড় আমি'র বিচার ভোগে বা ত্যাগে নিযুক্ত না করিয়া 'ভাল আমি'র বিচার ব্যক্ত করেন। সেই বিচার অনুসরণ করিতে গিয়া 'তৃণাদপি সুনীচ আমি' জড়জগতে 'ছোট আমি'র দৌর্ব্বল্য-বাণে বিদ্ধ হয়। প্রাকৃত-বিচারে 'ছোট আমি'র আদর নাই ; 'রহিত আমি'র আদরমূলে অনুভূতি-রাহিত্যই 'ক্লিষ্ট আমি'র পরিণামে কর্ত্তব্য বলিয়া গীত হয়। কিন্তু শ্রীগৌরসুন্দর ঐরূপ 'আর্ত্ত আমি'কে অধোক্ষজ-সেবা-পরায়ণের অনুগমন করিতে সুযোগ দিয়াছেন।

আধ্যক্ষিকতা ও অনাধ্যক্ষিকতা উভয় বিচারই বাস্তব-সত্যজ্ঞানের ব্যাঘাত-কারক বলিয়া অধোক্ষজ ভগবান্ মহাবদান্যরূপে কৃষ্ণপ্রেম প্রদান করিয়াছেন। 'ভাল আমি'র বুদ্ধিদাতা মুণ্ডকশ্রুতি বলেন,— সেই বস্তু বৃহৎ হইতেও অতি বৃহৎ, সূক্ষ্ম হইতেও অতিসূক্ষ্ম। আধ্যক্ষিকের বিচার আত্ম-প্রতারিত হইয়া বৃহত্ত্ব ও পূর্ণত্বের অবৈধ অধিকার-লাভে প্রযত্নবান ; আর 'ভাল আমি'র বিচার-প্রণালীতে তৃণাদপি সুনীচ, তরোরপি সহিষ্ণু, অমানী ও মানদ-ধর্ম্ম জীবের অমঙ্গল নাশ করিয়া বদ্ধ বিচার হইতে মুক্ত করে। এইজন্যই কৃষ্ণ অর্জ্জুনের নিকট গানকালে বলেন যে,— "ভক্ত্যা মামভিজানাতি"। এইজন্যই অজ্ঞতা-পরিহারকল্পে বিজ্ঞম্মন্যের নিকট বেদান্তের প্রকৃত ভাষ্য শ্রীমদ্ভাগবত বলেন,—"তচ্ছৃণ্বন্ সুপঠন্ বিচারণপরো ভক্ত্যা বিমুচ্যেন্নরঃ" এই বিচাররহিত ব্যক্তিগণ বিচারের কৈতব আবাহন করিয়া ও অভক্তিপথে স্বীয় রোচমানা প্রবৃত্তি দেখাইয়া মায়াবাদী সাজেন ; তাঁহারা শ্রীচৈতন্যদেবের চরণাশ্রয়ে বিচরণ করিলে নিজ স্বরূপের সুষ্ঠু উপলব্ধি করিতে পারেন।

কেবল-চেতনের কেবল-চেতনসেবা কেবল-চেতনের সূক্ষ্মানুভূতি হইতে উদিত হয় বলিয়া ইংরাজী ভাষায় "Immanent" শব্দ বা সংস্কৃত ভাষায় "অন্তর্যামী" শব্দ প্রত্যেক অনুচিৎ-এর আশ্রয়ে আত্মস্বরূপ জ্ঞাপন করেন। সুতরাং "ভাল আমি"র পরিবর্ত্তে যদি "বড় আমি"র জন্য জড়ের প্রতি ধাবিত হওয়া যায় তবে আধ্যক্ষিক-জ্ঞান পরবিদ্যার অনুসন্ধান দিবে না।

পরবিদ্যাবধূর জীবনস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণ-সঙ্কীর্ত্তন মুক্তজীব-হৃদয়ে প্রাকট্য-লাভ না করিলে বৈকুণ্ঠ হইতে মধুপুরীর মহিমা অত্যধিক—ইহা বুঝা যাইবে না। 'ভাল আমি' হইতে পারিলে বৈকুণ্ঠ-বাস, নতুবা মায়া-বাস মাত্র লভ্য হইবে। তখন আমাদের মুখে বাক্যবেগের বশবর্ত্তী হইয়া মায়াবাদ-বিচার প্রবল হয়, সুতরাং মনের চাঞ্চল্য বৃদ্ধি পাওয়ায় কায়বেগ আমাদিগকে প্রাকৃত-সহজিয়া করিয়া ফেলে, অবৈদান্তিক করিয়া ফেলে অথবা কর্ম্মরাজ্যের আলানে মনঃকুঞ্জরকে আবদ্ধ থাকিবার জন্য উৎকণ্ঠিত করে। মাপারাণীর মহারাজ হইবার জন্য 'বড় আমি' নিজত্বকে লীন করায়। তখন রাধারাণীকে বড় জড়াভিমানে শূদ্রা-মাত্র-জ্ঞানে তাঁহার সেবিকার বৃত্তি আমাদের ভাল লাগে না বলিয়া 'ভাল আমি'র তদীয় জ্ঞান আমাদিগকে চিরদিনের জন্য পরিত্যাগ করিয়া বিক্ষিপ্ত তারকার ন্যায় তমিস্রভোগের দিকে পরিণামে ত্যাগ-তমিস্রের দিকে ধাবিত করায়। তখন আমরা ঈশো-পনিষদের মন্ত্র পাঠ করিয়া নিজ স্কন্ধারূঢ় ভূতকে তাড়াই।

'বড় আমি'র চাকরাণ ভোগীদিগের বেইমানি-বিচারে নানারূপ বে-আদবী ছাড়িয়া দিয়া যদি রাধারাণীর মন্দিরের সৌন্দর্য্যদর্শনে 'ভাল আমি'র বা আমার চিত্ত আকৃষ্ট হয়, তাহা হইলেই আমি শ্যামসুন্দরের আকর্ষণ অচিরেই লাভ করিব। তখনই আমি 'ভাল আমি' হইবার জন্য 'মাপারাণী'র প্রভু হইবার পরিবর্ত্তে রাধারাণীর দাস্যে আত্মনিয়োগ করিব। অপৌরুষেয় শ্রুতিগুলি আধ্যক্ষিকতার বা প্রচ্ছন্নতর্কের গোলামিতে নিযুক্ত হওয়ায় যে-প্রকার শ্রুতি-ব্যাখ্যাদ্বারা মায়াবাদি-সম্প্রদায় জগজ্জঞ্জাল উপস্থিত করিয়াছেন, নৈমিষারণ্যের আরণ্যকসমূহ আমাদিগকে পরমহংসী-সংহিতার মঠে আশ্রয় দিয়া অধোক্ষজের সেবায় নিযুক্ত করিবে। এজন্যই শ্রীনারদোপদিষ্ট ভক্তিপথাবলম্বী শুনিয়াছেন,—'অনর্থোপশমং সাক্ষাদ্ ভক্তিযোগমধোক্ষজে।"

আমাদের বৈষ্ণববন্ধু **আমার মঙ্গল-বিধানের জন্য শ্রুতিমৌলি-রত্নমালা বা ভাগবতার্ক-মরীচিমালা গাঁথিবার জন্য পরামর্শ দিয়াছেন। কাষ্ঠের মার্জ্জার যেরূপ সেতুবন্ধনে অসমর্থ, বামনের চন্দ্রধারণ যেরূপ অসম্ভব, আমারও শ্রুতিসার-সেবা ভাগবতার্কোদয়-কিরণে আলোকিত হইবার প্রয়াস তদ্রূপ। যাহা হউক, "আজ্ঞা গুরূণাং হ্যবিচারণীয়া" বিচার অনুসরণ করিয়া 'ভাল আমি'র দলের শ্রৌতদর্শন, শ্রৌতশ্রবণ, শ্রৌতঘ্রাণ, শ্রৌত-আস্বাদন, শ্রৌতস্পর্শন ও শ্রৌত-মননের অনুগমন-চেষ্টা করি।

পরম-কারুণিক গৌরসুন্দর জগতে কৃষ্ণপ্রেম প্রদান করিয়াছেন। সেই প্রেমের কথা কি আমাদের কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হইবে না? শুনিয়াছি—কলিকাল দোষসমুদ্র।

কিন্তু এই সমুদ্রের একটী মহাগুণ আছে। কীর্ত্তনবিহারী শুকদেব প্রভু শ্রীসূত-দেবকে ভাগবতী কথা বলিয়াছিলেন। সেই ভাগবতী কথাই তৃতীয় অধিবেশনে নৈমিষারণ্যে—যেস্থানে ব্রহ্মার নেমি বিশীর্ণ হইয়াছিল, সেই অধোক্ষজ ব্রহ্মকুণ্ডে স্নান করিতে গিয়াই শ্রীব্যাসের কৃপা আমরা যাহাতে লাভ করিতে পারি—ইহাই ভরসা।

স্যমন্তপঞ্চকে দিশাহারা ব্রজবাসিগণ দিক্ লাভ করিয়াছিলেন। যোগমায়ার কৃপায় তাঁহার পুরপীঠে কি কীর্ত্তনের অভাব হইবে? গোদ্রুমবিহারী স্বর্ণবিহারে তাঁহার যে রুক্মবর্ণের বিগ্রহলীলা প্রকাশ করিয়াছেন, আমরা কি সেই শ্রুতির ব্যাখ্যায় আলোকিত হইতে পারিব না? "যদা পশ্যঃ পশ্যতে রুক্মবর্ণ কর্ত্তারমীশং পুরুষং ব্রহ্মযোনিম্। তদা বিদ্বান্ পুণ্যপাপে বিধূয় নিরঞ্জনঃ পরমং সাম্যমুপৈতি॥" সেই আধ্যক্ষিকতা ঘুচাইয়া আমরা কি অধোক্ষজ স্বর্ণবিহারীর সেবক হইতে পারিব না? গোদ্রুমবিহারী কি আমাদের শুকমুখে ভাগবতার্থ দিয়া নিগম-কল্পতরুর গলিত-ফলের কথা কর্ণের দ্বারা পান করাইবেন না? অন্তর্দ্বীপে একদিন ব্রহ্মা যে গোবিন্দস্তব করিয়াছিলেন, সেই ব্রহ্ম-সংহিতার গোবিন্দস্তবের গান কি আমাদের কর্ণে প্রবিষ্ট হইবে না? সেই দিন কি আমরা পরমেশ্বরের অনাদিত্ব, আদিত্ব, সর্ব্বকারণ-কারণত্ব, সচ্চিদানন্দবিগ্রহত্ব ও স্বয়ংরূপত্ব উপলব্ধি করিতে পারিব না? কেবলই কি আমরা বৃথা বাগাড়ম্বরে ব্যস্ত থাকিয়া মৌখিক রূপানুগত্য প্রদর্শন করিয়া আত্মবঞ্চনা করিতে থাকিব? শ্রবণাখ্য সীমন্তবিজয় প্রভু কি আমাদিগকে শ্রবণের অধিকার দিবেন না? মধ্যদ্বীপ-বিহারী স্বীয়-রূপমূর্ত্তি অধোক্ষজ-সেব্যমূর্ত্তি দেখাইয়া কি প্রহ্লাদানুগত্যে 'ভাল আমি' হইয়া স্মরণ করিতে দিবেন না? ভক্তবৎসল নৃপঞ্চাস্য আমাদিগকে কি বিষ্ণুস্বামীর আনুগত্য ভুলাইয়া দিবেন? আমরা কি কোলদ্বীপে লক্ষ্মীদেবীর আনুগত্যে শেষশায়ীর পদসেবনে অসমর্থ হইব? মহাকারুণিক শ্রীগৌরসুন্দরের শ্রীরূপানুগ-সেবক আমাদিগকে যে শ্রীগোষ্ঠবিহারীর সেবা করিবার জন্য উপদেশ দিয়াছেন, শ্রীলক্ষ্মীর প্রসাদে আমরা কি তাহাতে প্রবেশ করিতে চিরদিনই বাধাপ্রাপ্ত হইব? দীর্ঘ বকারদ্বয়ের প্রথম বকারে গোলোকোপরিস্থিতি বুঝিতে না পারিয়া কেবল বাধাই পাইতে থাকিব? দ্বিতীয় দীর্ঘ বকারের আঁকশী বা আকর্ষণী আমাদিগের স্কন্ধে আরোপিত হইয়া গরুড়-বাহনের কৃপাক্রমে বাধা অতিক্রম করাইয়া মাপারাণীর প্রভু-সাজ হইতে রাধারাণীর পরম সৌন্দর্য্যময়ী পদনখ-শোভা কৃষ্ণকর্ণামৃতের আদিম শ্লোক কি আমাদের বোধগম্য হইবে না? পদসেবা করিতে করিতেই ত' ঋতুদ্বীপে আমাদের পৃথু মহারাজের গৌরব-পূজন হৃদ্দেশ অধিকার করিবে। তখন

কি আমরা জহ্নুদ্বীপে অক্রূরের পাদপদ্মাশ্রয়ে কৃষ্ণসান্নিধ্য লাভ করিতে পারিব না ? পাদসেবন, অর্চ্চন ও বন্দনপরিণতি কৃষ্ণাপ্তি কি আমাদের সুদূরপরাহত বিষয় হইবে ? মোদদ্রুমদ্বীপে কপিপতির দাস্য ও রুদ্রদ্বীপে দ্বাদশগোপালের সখ্য কি আমাদিগকে অন্তর্দ্বীপে আত্ম-সমর্পণে বলির চরণানুগত্য হইতে বঞ্চিত করিয়া ইতর পিপাসায় ধাবিত করাইবে ? আমরা কি যোগমায়ার পুরপীঠের সন্নিহিত প্রদেশে কুণ্ডতীরবাসে চিরবঞ্চিত হইব ?

শুনিয়াছি—আধ্যক্ষিকগণ-বঞ্চিত ব্যক্তিরই কৃষ্ণপ্রাপ্তি সহজলভ্য। আমরা কি ক্ষেত্রমণ্ডলের শোভায় 'জগন্নাথ-বল্লভের' লেখকের রাধাগোবিন্দ মিলনের কথা বুঝিতে পারিব না ? দৃঢ়ভাবে জানিয়াছি যে,—"অনর্থোপশমং সাক্ষাদ্ ভক্তি-যোগমধোক্ষজে।" সুতরাং শ্রীধামসেবা কি 'শ্রুতিমৌলি-রত্নমালাদ্যুতি-নীরাজিত-পাদপঙ্কজান্ত' হরিনাম হইতে পৃথক্ বস্তু ? তাহা ত' নহে ! নবধাভক্তির অঙ্কুর বিষ্ণুপুরী হইতে মাধবেন্দ্রপুরীর প্রেমাঙ্কুর শ্রীচৈতন্যপাদপদ্ম-কল্পবৃক্ষের প্রপক্ব ফল পাওয়া যায়। অন্যপ্রকারে কৃষ্ণপ্রীতির কোন সুগম পথ বা বর্ত্মের কথা কেহই আবিষ্কার করিতে পারিব না। সুতরাং শ্রীচৈতন্য-চরণাশ্রয়েই শিক্ষা-মন্ত্রের তৃতীয় মন্ত্র লাভ করিয়া ভগবদ্ভজনে আশাবন্ধ-অবস্থা আমাদিগের নিত্যকল্যাণ বিধান করুক্। আমি বড় হ'ব না, ভাল হ'ব ; তবেই ভবমহাদাবাগ্নি নির্ব্বাপণ বুঝিতে পারিব—শ্রীকৃষ্ণ-সঙ্কীর্ত্তনে। সুতরাং সুবর্ণবিহারীর জয়গান—ভাগবতার্কমরীচিমালা আমাদের অবলম্বনীয় হউন।

—জগদ্গুরু শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর

"শত বিপদ, শত গঞ্জনা ও শত লাঞ্ছনায়ও হরিভজন ছাড়বেন না, জগতের অধিকাংশ লোক অকৈতব কৃষ্ণসেবার কথা গ্রহণ করছে না দেখে নিরুৎসাহিত হবেন না, নিজ-ভজন, নিজ-সর্ব্বস্ব কৃষ্ণকথা-শ্রবণ-কীর্ত্তন ছাড়বেন না। 'তৃণাদপি সুনীচ' ও 'তরুর ন্যায় সহিষ্ণু' হ'য়ে সর্ব্বক্ষণ হরিকীর্ত্তন ক'রবেন।"

"আমরা কোনপ্রকার কর্ম্মবীরত্ব বা ধর্ম্মবীরত্বের অভিলাষী নহি, কিন্তু জন্মে জন্মে শ্রীরূপ-প্রভুর পাদপদ্মের ধূলিই আমাদের স্বরূপ—আমাদের সর্ব্বস্ব।"

—শ্রীল সরস্বতী প্রভুপাদ

শ্রীল প্রভুপাদের আবির্ভাব-বাসরে

বিরহ-স্মৃতি

শ্রীব্যাসপূজায় কৃপা-প্রার্থনা

"তাতে কৃষ্ণ ভজে, করে গুরুর সেবন।
মায়াজাল ছুটে, পায় কৃষ্ণের চরণ॥"

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের (মঃ ২২।২৫) এই বাক্যের প্রতিধ্বনি-স্বরূপ দেখিতে পাই – "শ্রীব্যাসপূজাই যুগপৎ গুরু ও কৃষ্ণসেবা" (গৌঃ ৪র্থ বর্ষ, ৫৯০ পৃঃ)। সুতরাং পরমপূজ্য জগদ্গুরু শ্রীল প্রভুপাদের আবির্ভাব-তিথিতেই ব্যাসপূজা অনুষ্ঠিত হওয়ার বিধি গৌড়ীয় আচার্য্যগণের উপদেশ অনুসারে জানিতে পারা যায়। এই ব্যাসপূজা উপলক্ষে গুরুদেবের অঙ্গস্বরূপ পারমার্থিক পত্রিকার সেবার জন্য আদিষ্ট হওয়ায় নিজের নিতান্ত অযোগ্যতার বিষয় সম্পূর্ণরূপে উপলব্ধি করিয়া বিপদ গণিতেছি। মাননীয় গুরুদাসগণই এরূপস্থলে বিপদুদ্ধারণ বান্ধব। গুরুদাস-গণের আনুগত্য করাই গুরুসেবার পরাকাষ্ঠা। গুরুদাসগণের সকলের পাদপদ্মে আমার নিষ্কপট সাষ্টাঙ্গ প্রণতি জ্ঞাপন করিতেছি। তাঁহাদের প্রতি সতীর্থ-ভ্রাতৃবোধে **'সখ্য'** আচরণ করিয়া যে ভ্রাতৃবিরোধের আবাহন করিয়াছি, শ্রীল প্রভুপাদের অপ্রকটের পর হইতেই তাহা মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করিয়া নিজ জীবনকে ধিক্কার দিতেছি। ব্যাসপূজার পূজারী গুরুদাসগণ! আপনারা আমার প্রতি কৃপা-কটাক্ষ নিক্ষেপ করিয়া—আমার অযোগ্যতা দেখিয়া উপেক্ষা না করিয়া গুরু-গৌরাঙ্গ-গুণগানরূপ **'দাস্যে'** নিযুক্ত করুন, ইহাই আপনাদের পাদপদ্মে কাতর প্রার্থনা।

গুরুদেবের স্বরূপ

ব্যাস ও বৈয়াসকির আনুগত্যে গুরুদাসগণ শাস্ত্রের "গৌরজন-সঙ্গ কর গৌরাঙ্গ বলিয়া", "আচার্য্যং মাং বিজানীয়াৎ" প্রভৃতি বাক্যদ্বারা আমাকে শ্রীগুরুপাদপদ্ম সম্বন্ধে "সাক্ষাদ্ধরিত্বেন সমস্তশাস্ত্রৈঃ" জানাইলেও "কিন্তু প্রভোর্যঃ প্রিয় এব তস্য" ইত্যাদি জ্ঞান করিতে উপদেশ দিয়াছেন। কবিরাজ গোস্বামিও "গুরু কৃষ্ণরূপ হন শাস্ত্রের প্রমাণে" বলিয়া জানাইয়া "গুরুরূপে কৃষ্ণ কৃপা করেন ভক্তগণে॥"—উপদেশ করিয়াছেন। মহাজনগণের ও শাস্ত্রের দৃষ্টান্ত অনুসারে গুরুদেব ভগবৎ-স্বরূপেই প্রমাণিত হইতেছেন। এবম্প্রকার শ্রীগুরুদেবের দাসগণকে তদভিন্নজ্ঞানে

শিক্ষাগুরু বলিয়াই মনে হইতেছে। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী —"শিক্ষাগুরুকে ত' জানি কৃষ্ণের স্বরূপ।"—কীর্ত্তন করিয়াছেন। গুরুর নিত্য সেবকগণ! আপনাদের ভৌম-জগতে অবতরণ কেবল মাদৃশ পাপ-পঙ্কিলে পতিত নরাধমকে উদ্ধার করিবার জন্য। আপনাদের অতিমর্ত্ত্যবাণী হইতে শ্রীগুরুদেবের অতিমর্ত্ত্যতার কথা শ্রবণ করিয়াও তাহাতে আমার মর্ত্ত্যবুদ্ধির কিছুমাত্র হ্রাস হয় নাই; বিবর্ত্ত বা অসূয়াই তাহার মূল-কারণ।

বাণী-কীর্ত্তনই প্রভুপাদের মনোঽভীষ্ট

'বাণী' কেবলমাত্র 'কর্ণ'-নামক একটী ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য বলিয়া অন্য ইন্দ্রিয়-চতুষ্টয় এ ক্ষেত্রে হীনবীর্য্য। অতীন্দ্রিয় বস্তুতে ইন্দ্রিয়-সংস্পর্শ সম্ভবপর নহে। ইন্দ্রিয়-সংস্পর্শ যতদূর হ্রাস হইবে, ততদূরই আমাদের পক্ষে মঙ্গল। সেইজন্যই শ্রবণ-কীর্ত্তনের শ্রেষ্ঠতা। আপনাদের শ্রীমুখ-বিগলিত অপ্রাকৃত বাণী-কীর্ত্তন শ্রবণ (?) করিয়াও যখন গুরুদেবের প্রতি মর্ত্ত্যবুদ্ধি নষ্ট হয় নাই, তখন অন্য ইন্দ্রিয়ের দ্বারা ক্রিয়াশীলা ভক্তির অন্য অনুষ্ঠানসমূহ আমার নিকট নিষ্ক্রিয় হইবে, তাহাতে আর সন্দেহ কি? বর্ত্তমান যুগে যে-কোন ভক্ত্যঙ্গই অনুষ্ঠিত হউক না কেন, তাহা কীর্ত্তনাখ্যা-ভক্তি সহযোগেই করা প্রয়োজন এবং শ্রবণ-কীর্ত্তন ব্যতীত অন্য ভক্ত্যঙ্গ থাকিলেও তাহা কীর্ত্তন ব্যতীত সুফলপ্রদ নহে। তাই আপনাদের অপার করুণায় একমাত্র কীর্ত্তনকেই নিরপেক্ষ শ্রেষ্ঠ সাধন বলিয়া বুঝিতে পারিয়াছি। **শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি প্রচারাখ্যা ভক্তিই শ্রীচৈতন্য-মনোঽভীষ্ট 'ভাগবত মত' এবং মঠ-মন্দির নির্ম্মাণ, শ্রীবিগ্রহ-সেবাদি পরিচালন প্রভৃতি অর্চ্চনাখ্যা ভক্তিই 'পাঞ্চরাত্রিক মত'**। ভাগবত-প্রচারই শ্রীল প্রভুপাদের অন্তরুদ্দেশ্য (Ontological aspect) বলিয়া আপনারা আমাকে জানাইয়াছেন। **কীর্ত্তনই কীর্ত্তনের ফল। কীর্ত্তনই সেবা—কীর্ত্তনই প্রেম**। শ্রীল জীবপাদ ক্রমসন্দর্ভে লিখিয়াছেন—"যদ্যপ্যন্যা ভক্তিঃ কলৌ কর্ত্তব্যা তদা কীর্ত্তনাখ্যা ভক্তি-সংযোগেনৈব ইত্যুক্তম্।" শ্রীল প্রভুপাদ স্বয়ং বলিয়াছেন,—"পাঞ্চরাত্রিক Process (প্রণালী) অনুসারে Representative (প্রতিনিধি) থাকেন থাকুন, মন্দির করা হউক, ঠাকুর থাকুন; কিন্তু better class—higher class যাঁহারা, তাঁহাদের প্রচার-কার্য্য। বৈকুণ্ঠনামের সর্ব্বত্র প্রচারই মহাপ্রভুর মনোঽভীষ্ট। * * * * আমাদের প্রচার-প্রণালী এইরূপ হউক্—প্রচুর পরিমাণে Pamphlet করা হউক, মঠ-মন্দির না হয় না-ই হইল।" তিনি তাঁহার শেষ বক্তৃতাতেও আমাদিগকে বিশেষভাবে সাবধান করিয়া জানাইয়াছেন—"আমরা কিছু জগতে কাঠ-পাথরের মিস্ত্রী হইতে

আসি নাই, আমরা শ্রীচৈতন্যদেবের বাণীর পিয়ন মাত্র"। যে-কোনও একাঙ্গ সাধন কিম্বা বহু অঙ্গ সাধন লোকে স্বতন্ত্রভাবে করে করুক্; কিন্তু আমরা একমাত্র কীর্ত্তনাখ্যা ভক্তিই প্রভুপাদের অনুজ্ঞা অনুসারে পালন করিব।

বাণী-শ্রবণের কর্ণ প্রস্তুত প্রয়োজন

শ্রীল প্রভুপাদের প্রতি মনুষ্য-বুদ্ধি থাকার দরুণ তাঁহার কোন কথাই আমার কর্ণে প্রবেশ করে নাই। তাই তিনি প্রায়ই বলিতেন,—"আগে কান তৈয়ারী হউক্, পরে ভাগবত-সিদ্ধান্ত-শ্রবণের যোগ্যতা হইবে।" কথাটা এখন মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করিতেছি। তাঁহার নিকট (১৯৩৭ সাল পর্য্যন্ত) প্রায় অষ্টাদশ-বর্ষকাল থাকিয়াও তাঁহার "শ্রেয়ঃ ও প্রেয়ঃ"; "অনুসরণ ও অনুকরণ"; "আসল ও নকল"; "Ontology ও Morphology"; "পারমার্থিক ও ব্যবহারিক" প্রভৃতি এবং গৌড়ীয়ের "বপু ও বাণী" আমার কর্ণে প্রবেশ করে নাই বা তাহার পার্থক্য উপলব্ধি হয় নাই। তাই গুরুদাসগণের নিকট প্রার্থনা—তাঁহারা সর্ব্বাগ্রে আমার কান প্রস্তুত করিয়া দিন। কান প্রস্তুত না হইলে "উপদেশো হি মূর্খানাং প্রকোপায় ন শান্তয়ে।"—এই বাক্যের বিষয়ীভূত হইয়া পড়িব।

শ্রীল প্রভুপাদের অপ্রাকৃত দেহ

আমার দুর্দ্দৈববশতঃ শ্রীল প্রভুপাদের দেহকে অপ্রাকৃত চিদানন্দময় নিত্য-বিগ্রহরূপে দর্শন করিবার যোগ্যতা আমার কখনও হয় নাই; যদিও আপনারা উহা আমাকে পুনঃ পুনঃ নির্দ্দেশ করিয়াছেন। শ্রীল প্রভুপাদ তাঁহার প্রতি আমার এ-প্রকার প্রাকৃত-বুদ্ধি দেখিয়া সহাস্যে মাঝে মাঝে অসুস্থতার অভিনয় করিতেন। আমি দুর্ব্বুদ্ধি-বিশিষ্ট হইয়া আমার প্রাকৃত হস্ত-পদাদি লইয়া তাঁহার শ্রীঅঙ্গ-সেবার জন্য তাঁহাকে স্পর্শ করিতে গেলেই তিনি স্বতন্ত্রভাবে থাকিয়া তাঁহার মায়া-দেহটী অগ্রসর করিয়া দিয়া আমার আসুরিক প্রবৃত্তিকে মুগ্ধ করিতেন। বস্তুতঃ তাঁহার চিন্ময় দেহে কোনপ্রকার ব্যাধি-বিকার ছিল না। আমি তখন তাহা কিছুমাত্র বুঝিতে পারি নাই। আমার ন্যায় যথাসর্ব্বস্ব কামী, যোগী রাবণের পক্ষে মায়া-সীতা স্পর্শ ব্যতীত চিচ্ছক্তি-স্বরূপিণী রামাঙ্কলক্ষ্মী সীতাদেবীকে স্পর্শ করিবার যোগ্যতা কোথায়? আমি শঙ্করের জীবন সম্বন্ধেও এই প্রকার লীলার কথা শ্রবণ করিয়াছি। শঙ্কর যখন মণ্ডন-মিশ্রের স্ত্রী 'উভয়ভারতী'র নিকট বিচারে পরাস্ত হন, তখন তিনি তাঁহার শরীর পদ্মপাদের নিকট এক পর্ব্বতগুহায় রক্ষা

করিয়া জনৈক রাজার মৃত শরীরে প্রবেশ করিয়াছিলেন। তাই শ্রীল প্রভুপাদের অতিমর্ত্ত্যত্ব সম্বন্ধে কিছুই উপলব্ধি করিতে না পারায়, তাঁহার নিকট হইতে কপট-কৃপা লাভ করিয়া চিরদিনই বঞ্চিত হইয়াছি। ইহা তাঁহার চেতনময়ী বাণীতে কর্ণপাত না করার ফল। ইহাই আমার চরম দুর্ভাগ্য। (**ক্রমশঃ**)

—জগদ্‌গুরু শ্রীল ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী

শ্রীগুরুদেবের চরণে প্রার্থনা

জয় শ্রীল গুরুদেব প্রণমি চরণে।
কৃপা কর দীন-হীন এ অধম জনে ॥ ১ ॥
মর্ত্ত্যবাসী নহ তুমি—আশ্রয় ভগবান্।
প্রভুর যে প্রিয় সখী শাস্ত্রেতে বাখান ॥ ২ ॥
শ্রীমুকুন্দ-প্রেষ্ঠ বলি' যাঁহার আখ্যান।
কৃষ্ণের অচিন্ত্য গুণ তোমাতে বিদ্যমান্ ॥ ৩ ॥
করুণাঘন বিগ্রহ—আচার্য্য প্রবর।
মায়াবদ্ধ জীব লাগি' সর্ব্বদা কাতর ॥ ৪ ॥
শুনিয়াছি সাধুমুখে পতন কারণ।
কৃষ্ণসেবা ত্যাগ, আর ভোগ অভিমান ॥ ৫ ॥
ভোগ করিবারে জীব মায়াপাশে যায়।
মায়ার লাথি খাই' জীব কবে হায়! হায়!! ৬ ॥
সেই জীব নিস্তার লাগি' তব আগমন।
বস্তুতঃ চিন্ময় জীব শুদ্ধ সনাতন ॥ ৭ ॥
ভাগ্যক্রমে কোন জীবে গুরুকৃপা হয়।
সংসার-সমুদ্র তার মিথ্যা হেন ভায় ॥ ৮ ॥
জনম-মরণমালা জীবে নাহি হয়।
গুর্ব্বানুগ্রহে যদি এ তত্ত্বে জ্ঞান উপজয় ॥ ৯ ॥
মায়ায় মোহিত আমি অত্যন্ত দুর্ব্বল।
পাদপদ্মধূলি দিয়া করহ সবল ॥ ১০ ॥

হে গুরুদেব ! তব কৃপায় মায়া হয় দূর ।
শুদ্ধ বৈষ্ণবসেবা হৃদে জাগুক প্রচুর ॥ ১১ ॥
বৈষ্ণবসেবা হয় তব প্রীতির কারণ ।
হরিসেবা, হরিনাম, স্ফুরুক অনুক্ষণ ॥ ১২ ॥
কি হবে আমার গতি না করি ভাবনা ।
হরি-গুরু-বৈষ্ণবসেবায় কেবল বঞ্চনা ॥ ১৩ ॥
সাধুসঙ্গ করিবারে করি মঠবাস ।
বৈষ্ণব অপরাধে হইল সর্ব্বনাশ ॥ ১৪ ॥
দশ অপরাধ নামে করিল বিচার ।
সেইহেতু হরিনামে না হয় বিকার ॥ ১৫ ॥
অপরাধ হেতু মোর অশেষ দুর্গতি ।
তোমা বিনা নিস্তারিতে না দেখি সম্প্রতি ॥ ১৬ ॥
গুরুকৃপায় হয় অপরাধের জ্ঞান ।
স্থানে স্থিতা অপরাধ হয় অবসান ॥ ১৭ ॥
বড় আশা করি প্রভু এসেছি চরণে ।
সেই উদ্দেশ্য সর্ব্বদা জাগে যেন মনে ॥ ১৮ ॥
গুরু বিনা ধন নাহি বুঝিনু এখন ।
কৃপা কর হে গুরুদেব ! লইনু শরণ ॥ ১৯ ॥
শ্রীগুরুচরণ বিনা গতি নাহি আর ।
হৃদয়ে ধরিয়া কাঁন্দে এ কাঙ্গাল ছার ॥ ২০ ॥

—শ্রীনিত্যপদ দাস ব্রহ্মচারী

"গুরুষু নরমতির্যস্য বা নারকী সঃ"

গুরুসেবাই জীবের জীবনের প্রধান কর্ত্তব্য। গুরুর সেবা না করিয়া তাঁহাকে অবজ্ঞা করিলে চিরকালের জন্য অমঙ্গল আসিয়া উপস্থিত হইবে। গুর্ব্ববজ্ঞার ফলে অনর্থের হাত হইতে কাহারও নিস্তার নাই। ক্ষুদ্রজীব নিজের সামান্য জ্ঞান-বুদ্ধির বাহাদুরি দেখাইয়া অর্থাৎ আরোহপন্থাকে আশ্রয় করিয়া যতই উপরে উঠুক না কেন, গুর্ব্ববজ্ঞা করিলে তাহার পতন অবশ্যম্ভাবী। যে-কাল পর্য্যন্ত না জীব শ্রীগুরুদেবের শাসন কায়মনোবাক্যে গ্রহণ করে এবং গুরুদেবের প্রদর্শিত সাধনপথ অনুসরণ করে, সেই কাল পর্য্যন্ত তাহার পরম-মঙ্গল লাভের পথে চলাই শুরু হয় না। গুরুদেব যাহা চান তাঁহার ইচ্ছানুরূপ কার্য্য করাই শিষ্যের গুরুসেবা। যে কার্য্যে গুরুদেবের প্রীতিবিধান হয় না, তাহাকে কখনও সেবা বলা যায় না। এই প্রসঙ্গে পরম গুরুদেব শ্রীল ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজ তাঁহার বক্তৃতার মধ্যে বলিয়াছেন,—"শাস্ত্রে 'গুরোরাজ্ঞাহ্যবিচারনীয়া' উল্লিখিত হইয়াছে। নির্ব্বিচারে গুরুর আজ্ঞপালনই শিষ্যের একমাত্র কর্ত্তব্য। গুরুর প্রীতিবিধানই শিষ্যের একমাত্র কাম্য, তাঁহার প্রীতিবিধানার্থ সৎশিষ্য সকল প্রকার দুর্দ্দশাই বরণ করিতে প্রস্তুত।"

পরম দয়ালু শ্রীগুরুদেব ভবকূপে পতিত আমাদিগের জন্য যে কৃপা-রজ্জু নিক্ষেপ করিয়া রাখিয়াছেন, আমরা যদি হস্ত প্রসারিত করিয়া তাহা না ধরি, অর্থাৎ গুরুদেবে পূর্ণ শরণাগত না হই, তাহা হইলে আমরা এই সংসার-কূপ হইতে কিছুতেই উদ্ধার পাইতে পারি না। পতিতপাবন শ্রীগুরুদেবের অহৈতুকী কৃপাই আমাদের দুর্ল্লভ কৃষ্ণভক্তি লাভের মূলধনস্বরূপ। তাঁহার অহৈতুকী কৃপা ব্যতীত আমাদের শত চেষ্টা বা সাধন সত্ত্বেও আমরা ভবকূপ হইতে উদ্ধার পাইব না। আমাদের সেবাবৃত্তি যতই বৃদ্ধি পাইবে, ততই গুরুকৃপা লাভ করিতে পারিব। সেবাই কৃপা, সেবা করিতে করিতে গুরুকৃপা পাওয়া যাইবে। গুরুসেবায় গুরুদেবকে কৃতার্থ করা হয় না বা তাঁহার কিছু উপকার করা হয় না। গুরুসেবা করিতে গিয়া "শিক্ষককে অঙ্ক কষে দেওয়ার" ন্যায় দুর্ব্বুদ্ধি মনে উপস্থিত হইলে আমাদিগকে চিরকালের জন্য আত্মবঞ্চিত হইয়া ভবকূপে অশেষ যন্ত্রণা ভোগ করিতে হইবে। গুরুসেবা-বঞ্চিত জীবের দুর্দ্দশার সীমা নাই।

গুরুদেব মায়াবদ্ধ জীবের ন্যায় রক্ত-মাংসের শরীরবিশিষ্ট বা জন্ম-মরণশীল বস্তু নহেন। তাঁহাতে মানব, জন্তু বা প্রাকৃত কোন বস্তুর ধর্ম্ম আরোপ বা কল্পনা

করা 'লেপ বিছাইয়া গুণ টানিবার' ন্যায় মূর্খতা। যে স্থলে গুরুত্বের কথা তথায় আর ক্ষুদ্রত্ব, লঘুত্ব বা জাগতিক অভাব নাই। গুরুদেবে মর্ত্ত্যবুদ্ধি থাকিলে শিষ্যের সর্ব্বৈব বৃথা। "গুরুষু নরমতির্যস্য বা নারকী সঃ" (পদ্মপুরাণ) অর্থাৎ "যাহার শ্রীগুরুদেবে মনুষ্যবুদ্ধি বর্ত্তমান, সে ব্যক্তি নারকী।" এই প্রসঙ্গে শ্রীভাগবতে (ভাঃ ৭।১৫।২৬) পাওয়া যায়,—

যস্য সাক্ষাদ্ভগবতি জ্ঞানদীপপ্রদে গুরৌ।
মর্ত্ত্যাসদ্ধীঃ শ্রুতং তস্য সর্ব্বং কুঞ্জরশৌচবৎ॥

"দিব্যজ্ঞানপ্রদাতা সাক্ষাৎ ভগবৎস্বরূপ গুরুতে যাঁহার মর্ত্ত্য-সাধারণ বুদ্ধি হয়, তাঁহার পক্ষে ভগবন্মন্ত্রাদি গ্রহণ ও শ্রবণ-মননাদি সকলই হস্তিস্নানের ন্যায় বৃথা।" এই প্রসঙ্গে ভাগবতে (ভাঃ ১১।১৭।২৭) ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ উদ্ধবকে উপদেশ করিয়াছেন,—

আচার্য্যং মাং বিজানীয়ান্নাবমন্যেত কর্হিচিৎ।
ন মর্ত্ত্যবুদ্ধ্যাসূয়েত সর্ব্বদেবময়ো গুরুঃ॥

"গুরুদেবকে মৎস্বরূপ জানিবে। গুরুতে মর্ত্ত্য সামান্য বুদ্ধি করিয়া তাঁহার অবজ্ঞা করিবে না। গুরুদেব সর্ব্বদেবময়।" নিজের গুরুদেবে মনুষ্যবুদ্ধি করা শিষ্যের পক্ষে চরম পাষণ্ডতারই লক্ষণ। ভবরোগের সদ্বৈদ্য গুরুদেবে মর্ত্ত্যবুদ্ধি করিয়া আমরা যাহাতে নরকের দ্বার পরিষ্কার না করি, তাই জগদ্গুরু শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী প্রভুপাদ উপদেশের মাধ্যমে আমাদিগকে সতর্ক করিতে গিয়া বলিয়াছেন,—"এহেন পাষণ্ড আমি—পামর, অধম, নারকী আমি, আমাকে বুঝাবার জন্য যিনি মনুষ্যাকৃতিতে অবতীর্ণ হয়েছেন, তাঁকে না চিনে—সেই গুরুপাদপদ্ম দর্শন না করে যদি আমি মনে করি—আমি গুরু দেখে ফেলেছি, তাহলে তা'র মত ধৃষ্টতা আর কি আছে? যদি আমার নিষ্কপটতা থাকে, তাহলে আমার পক্ষে যে ধৃষ্টতা হচ্ছে, এ কথা আমার অন্তর্যামী চৈত্ত্যগুরুরূপে আমাকে বুঝিয়ে দেন; বিবেক দেন, শ্রীগুরুপাদপদ্মকে মর্ত্ত্যজ্ঞান করো না। তিনি তোমার অনন্ত জীবনদাতা, তোমার ভবরোগের সদ্বৈদ্য, সর্ব্বতোভাবে তোমার একমাত্র উপকারক। চৈত্ত্যগুরুর এই উপদেশ পালন করলে আমরা শ্রীগুরুপাদপদ্মের নিকট উপনীত হই।"

রাত্রিকালে শত শত কৃত্রিম আলোকের দ্বারা যেরূপ সূর্য্য দর্শন করা যায় না, তদ্রূপ জীবের শত শত ইন্দ্রিয়জ জ্ঞান ও চেষ্টার দ্বারাও গুরুর স্বরূপ দর্শন ঘটে না। যেরূপ সূর্য্যরশ্মির দ্বারা সূর্য্যের দর্শন সম্ভবপর হয়, তদ্রূপ গুরুদেবের কৃপাতেই তাঁহার যথার্থ স্বরূপের উপলব্ধি সম্ভব হয়। লঘু তথা শিষ্য হইয়া কখনও

কৃষ্ণতত্ত্ববিৎ গুরুদেবকে মাপা যায় না বা স্পর্শ করিতে পারা যায় না। ক্ষুদ্র জীব গুরুদেবের শরণাগত থাকিয়া কৃষ্ণভজনে প্রবৃত্ত থাকিলে তবেই তাহার মঙ্গল হয়। নতুবা সর্ব্বোত্তম গুরুদেবের প্রতি কুবাক্য বর্ষণ বা নিন্দাদি করিলে আমাদের ভক্তিরাজ্যের প্রবেশের দ্বার চিরতরে রুদ্ধ হইয়া যাইবে। গুরুদেবের প্রতি কুবাক্যাদি বর্ষণে গুরুর কিছু হয় না, তাহা নিজেরই উপর পতিত হয়। কথায় বলে,—"**Spit against the wind against your own face**" অর্থাৎ "থুথু উপর দিকে ফেলিলে নিজের মুখেই পতিত হয়।" যাহাদিগের নিজেদের অধিকার ও যোগ্যতা উপলব্ধি করিবার কোন ক্ষমতা নাই, তাহারাই গুরুদেবকে উপদেশ প্রদান করিতে প্রবৃত্ত হইয়া আত্মবঞ্চিত হন। জাগতিক দক্ষতা, চতুরতা, বুদ্ধিমত্তা বা পাণ্ডিত্যের দ্বারা গুরুদেবের আত্মমঙ্গলের উপদেশ হৃদয়ঙ্গম করা যায় না, তথায় প্রচ্ছন্নভাবে মায়ার প্রহেলিকা আসিয়া বিপরীত বুদ্ধির উদয় করায়। এই প্রসঙ্গে জগদ্গুরু শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী প্রভুপাদ তাঁহার উপদেশাবলীর মধ্যে বলিয়াছেন,—"যাহারা আমরা অধিক বুঝি, শ্রীগুরুদেব আমাদিগের অপেক্ষা কি আর বেশী বুঝেন এবং তাঁহার নিকট হইতে কি উপদেশ আর শ্রবণ করিব?—এইরূপ অহংকারবশতঃ গুরুদেবের উপদেশ বা আদেশকে অবজ্ঞা করেন, এই অপরাধবশতঃ তাহাদের কৃষ্ণভক্তি অন্তর্হিত হয়।"

কেহ কেহ নিজেদের বুদ্ধিবলে গুরুর ভালমন্দ বিচার করিবার দুরাশা মনের মধ্যে পোষণ করেন। এমন কি, তাঁহারা সদ্গুরু ত্যাগ করিতে পারেন—এইরূপ দাম্ভিকতারও প্রকাশ করিয়া থাকেন। এই সকল বিচার 'গুরুর উপর গুরুগিরি' অর্থাৎ নির্ব্বিশেষবাদ। ইহার ন্যায় পাষণ্ডতা আর কিছুই নাই, ইহাদের কোনকালে মঙ্গল হয় না। বস্তুতঃ গুরু-শব্দের অর্থ ভারী অর্থাৎ যাহা হইতে বেশী ভার আর কিছুই নাই, তিনিই গুরুদেব। আর যাহাকে শাসন করা যায় অর্থাৎ যিনি শাসনের যোগ্য, তিনিই শিষ্য। গুরুদেবকে শাসন করা বা শিক্ষা দেওয়া যায় না। গুরুকে কেহ ত্যাগ করিতে পারে না, লঘুকেই ত্যাগ করিতে হয়। গুরুদেবের কৃপা ও উপদেশকে অগ্রাহ্য করিয়া যাহারা 'গোড়া ডিঙাইয়া ঘাস খাইবার' ন্যায় ভগবানকে লাভ করিবার চেষ্টা করেন, তাঁহাদের চেষ্টাও মূর্খতা ও অসম্ভবতার পরিচায়ক। গুরুর মধ্য দিয়াই ভগবান্ নিজকে প্রকাশ করেন। গুরুকে লঙ্ঘন করিয়া কেহই ভগবানের নিকট যাইতে পারেন না।

যাহারা সদ্গুরুর আসন দখল করিতে চাহেন তাহারা প্রত্যক্ষভাবে গুরুবিদ্বেষী। জড় প্রতিষ্ঠাশা হৃদয়কে গ্রাস করিবার ফলে তাহারা 'গোলোকের দূত' কৃষ্ণপ্রিয়তম সদ্গুরুকে মনুষ্যজ্ঞান করিয়া নিজেদের মনোবাঞ্ছা পূরণ করিবার চেষ্টা করেন।

অপরের মঙ্গল ত' দূরের কথা, গুরুবিদ্বেষীরা নিজেদেরই মঙ্গল করিতে পারে না। প্রকৃত শিষ্য কখনও গুরুবিদ্বেষীর সঙ্গ করেন না। গুরুবিদ্বেষী মাত্রেই জগতের সকলের বিদ্বেষী। এই প্রসঙ্গে শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী প্রভুপাদ তাঁহার বক্তৃতাবলীর মধ্যে বলিয়াছেন,—"আমার গুরু—সমগ্র জগতের গুরু। তিনি গুরুতত্ত্ব—সমগ্র জগতের গুরুতত্ত্ব, আমার গুরুবিদ্বেষী—জগতের সকলের বিদ্বেষী—মনুষ্যমাত্রের বিদ্বেষী—জগদীশের বিদ্বেষী।"

তমী বা তমোময়ী রাত্রিতে নীহারজনিত অন্ধকার যেমন রাত্রির অন্ধকারকে আবরণ করিতে অসমর্থ হইয়া রাত্রির অন্ধকারকে আরও গাঢ় করিয়া তুলিয়া নিজেকেই আবৃত করে, তেমনই যাহারা গুরুর উপদেশ বা আদেশকে অবজ্ঞা করিয়া মঠ-মিশনের উন্নতির চেষ্টা করেন, তাহারা কৃষ্ণবিস্মৃতি-সাগরে নিমজ্জিত হইবে। গুরুর আদেশ-উপদেশ মানি না, অথচ গুরুপ্রদত্ত মন্ত্র জপ ও শ্রীহরিনাম করিয়া যাইতেছি—ইহাতে আত্মমঙ্গলের সম্ভাবনা কোথায়? গুরুবর্গকে মানসিক উদ্বেগ প্রদান করিয়া সাধন-ভজনের চেষ্টা "গাছের গোড়া কেটে ডগায় জল ঢালিবার" ন্যায় নিরর্থক। "কৃষ্ণ রুষ্ট হ'লে গুরু রাখিবার পারে। গুরু রুষ্ট হ'লে কৃষ্ণ রক্ষিবারে নারে॥"—এই বিচার শিষ্যের হৃদয়ে জাগরূক না থাকিলে তাহার কোনকালে মঙ্গল হয় না। প্রকৃত বৈষ্ণব কখনও গুরুর নিন্দা বা বিদ্বেষ করেন না। শাস্ত্রে সমর্থবান্ ব্যক্তির পক্ষে গুরুবিদ্বেষীর জিহ্বা ছেদন বা মস্তকে লাথি মারার কথা উল্লিখিত রহিয়াছে। গুরুবিদ্বেষীর অপমানে প্রকৃত আত্মমঙ্গলাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তি অপমানিত বা হৃদয়ে আহত না হইয়া আনন্দ প্রকাশই করিয়া থাকেন এবং সাধন-ভজনে উৎসাহ, দৃঢ়তা ও ধৈর্য্য লাভ করেন।

অনেকে কেবলমাত্র নিজের গুরুদেবকে 'সাক্ষাদ্ধরিত্বেন' জ্ঞান করিয়া অপর সদ্‌গুরুতে মর্ত্যসামান্য বুদ্ধিপূর্ব্বক বলিয়া থাকেন, "যাহারা বর্ত্তমানে গুরুর আসনে বসিয়াছেন, তাঁহারা সাতসমুদ্রে তেরো নদী পাড়ি দিয়া খানা ডোবার জলে ডুবিয়া মরিয়া যাইবেন।" বস্তুতঃ কর্ম্মফলভোগবাধ্য জীবের ক্ষেত্রে তাহা বলা যাইতে পারে, কিন্তু সদ্‌গুরুর ক্ষেত্রে এই উদ্ধৃতি অপরাধজনক ও আত্মবিনাশক। গুরুদেব প্রাকৃত জীবের ন্যায় কর্ম্মফলভোগবাধ্য মনুষ্যবিশেষ নহেন। প্রাকৃত জীবের আগুনের মধ্যে মৃত্যু না হইয়া একটা ফুলের আঘাতেই মৃত্যু হইতে পারে; আবার আগুনের মধ্যেও ভবলীলা সাঙ্গ হইতে পারে। কিন্তু গুরুদেব শ্রীকৃষ্ণের ইচ্ছায় জগজ্জীবের কল্যাণের জন্য জগতে আসেন এবং তাঁহার ইচ্ছাতেই জগৎ হইতে চলিয়া যান। যেক্ষেত্রে বৈষ্ণবের প্রাকৃত জন্ম-কর্ম্ম নাই, সেক্ষেত্রে বৈষ্ণবশ্রেষ্ঠ গুরুদেবের কর্ম্মফল ভোগ করিবার অবসর কোথায়? গুরুবর্গের কেহ কেহ

সবসময়ে শ্রীমন্দিরে আরাত্রিকাদি দর্শন ও পাঠ-কীর্ত্তনাদিতে যোগদান করিবার সময় সুযোগ পান না বলিয়া শিষ্যস্থানীয় কেহ কেহ গুরুর গুরুত্ব স্বীকার করিতে কুণ্ঠাবোধ করেন। গুরুতত্ত্বে অনভিজ্ঞ ব্যক্তিগণই এইরূপ “অবিবেচনাপ্রসূত ও অকল্যাণকর” কুধারণা পোষণ করেন। শ্রীগুরুদেব—মহাভাগবত। মহাভাগবতগণ সর্ব্বত্রই কৃষ্ণদর্শন করেন। অতএব মন্দিরের সম্মুখে যাইয়া তাঁহারা আরতি দর্শন না করিলে তাঁহাদের কি আরতি দর্শন হয় না? শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর তাঁহার গুর্ব্বষ্টকের “শ্রীরাধিকা-মাধবয়োরপার” শ্লোকে “গুরুদেব প্রতিক্ষণ শ্রীরাধামাধবের নাম-রূপ-গুণ-লীলাদি আস্বাদন করিতেছেন” জানাইয়া আমাদের ভ্রান্ত ধারণার মূলচ্ছেদ করিয়াছেন। তবে কোন কোন ক্ষেত্রে লোকশিক্ষার্থে মন্দিরের সম্মুখে গিয়া গুরুদেব শ্রীবিগ্রহ দর্শনের লীলা প্রদর্শন করিয়া থাকেন।

শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়তম গুরুদেবের যাবতীয় চেষ্টাই কৃষ্ণসেবাপর। তাঁহারা জগজ্জীবের মঙ্গলের জন্য ইহজগতে অবস্থান ও বিচরণ করেন। তাঁহার ত্রিতাপ-জ্বালায় দগ্ধীভূত হইবার কোন সম্ভাবনা নাই। কিন্তু সেবকগণের সেবাপরাধাদির ফল শ্রীগুরুবর্গের উপর বর্ত্তাইয়া থাকে ইহা গুরুবর্গের উক্তি ও উপলব্ধি। তাঁহারা যে অসুস্থাভিনয় প্রদর্শন করেন, তাহা কর্ম্মফলবাধ্য বদ্ধজীবগণের কর্ম্মফল ভোগ বা জড়দেহাবদ্ধ অবস্থায় ভগবৎসেবা হইতে বিচ্যুতি নহে। তাপত্রয়ের অন্যতম আধ্যাত্মিক তাপের অন্তর্গত বিভিন্ন রোগ বা অসুখ। গুরুদেব যেখানে নিত্য কৃষ্ণসেবানন্দ লাভ করিতেছেন, সেখানে অসুস্থতা তাঁহাকে কিভাবে স্পর্শ করিতে পারে? তিনি অত্যন্ত বিমুখ ও অপরাধী ব্যক্তিগণকে সেবাসুযোগ দান হইতে বঞ্চিত করিয়া ভজনের আদর্শ প্রদর্শন করেন এবং সেবোন্মুখ ব্যক্তিগণকে সেবাসুযোগ দান ও জাগতিক ক্লেশের মধ্যেও হরিসেবার উদ্দেশ্যে তীব্র চেষ্টা ও উৎসাহ প্রদর্শনের শিক্ষায় প্রত্যক্ষ আদর্শ প্রচার করিয়া থাকেন। প্রেমকল্পতরুর মধ্যমূল নিত্যসিদ্ধ ভগবৎপার্ষদ মহাভাগবতকুলশিরোমণি শ্রীমন্মাধবেন্দ্রপুরীর অসুস্থাভিনয়ে শ্রীঈশ্বর-পুরীর সেবাবৃত্তিই সম্প্রকাশিত হইয়াছিল কিন্তু গুরু ও ভগবানের চরণে অপরাধীর তাহাতে অন্যরূপ বুদ্ধির উদয় হইয়াছিল। তিনি শ্রীল মাধবেন্দ্রপুরীর বিপ্রলম্ভ বিলাপ ও ক্রন্দন শুনিয়া বিচার করিয়াছিলেন, “ব্রহ্মবিদ্ গুরুদেব কেনই বা ক্রন্দন করিবেন! হয়ত বা রোগের যন্ত্রণায়ই সাধারণ দেহাসক্ত জীবের ন্যায় ক্রন্দন করিতেছেন।”

জীব রোগশোকের মধ্যে জীবনের অনিত্যতা উপলব্ধি করিয়া যাহাতে ভগবৎ-সেবায় অধিকতর তীব্রভাবে উৎসাহিত ও প্রবৃত্ত হয়, তজ্জন্যই গুরুদেব অসুস্থতার অভিনয় করিয়া থাকেন। ভগবানের নিজজন যদি নানা বিপদ-আপদ, ক্লেশ-

সঙ্কট, রোগ-শোকের মধ্যে অবস্থিত হইবার লীলা দেখাইয়াও হরিসেবার জন্য তীব্র চেষ্টা প্রদর্শন না করতেন, তাহা হইলে ত্রিতাপের কারাগারে পতিত ভগবদ্‌ বিমুখ জীবসমূহ কিছুতেই নিজেদের মঙ্গলের প্রতি উন্মুখ হইত না। দুর্ভাগা, বঞ্চিত ও অজ্ঞ লোকই অনুক্ষণ হরিসেবাপরায়ণ গুরুদেবকে রোগ-শোকাদিতে আচ্ছন্ন ও ক্লিষ্ট মনে করে। এমনকি, তাঁহারা শ্রীমন্মহাপ্রভুর জ্বর রোগাভিনয়, শ্রীল সনাতন গোস্বামী প্রভুর অঙ্গে কণ্ডুরসা রোগের অভিনয়, বাসুদেব বিপ্রের কুষ্ঠরোগের অভিনয়, শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামীর জরাতুর হইবার অভিনয় প্রভৃতিকে কর্ম্মফলবাধ্য জীবের প্রাক্তন ভোগসদৃশ মনে করিয়া নরকের দ্বার পরিষ্কার করিতে কুণ্ঠা বোধ করেন না। কেহ কেহ দুর্ব্বুদ্ধিবশতঃ বলিয়া থাকেন,— "ক্লিষ্ট ও আর্ত্তের জন্যই সেবার প্রয়োজনীয়তা; অতএব গুরুদেব যদি প্রকৃতপক্ষে রোগ-শোকাদিদ্বারা ক্লিষ্ট নহেন, তাঁহার সেবা-শুশ্রূষা করিবার আবশ্যক কি?" এইরূপ উক্তি রামচন্দ্রপুরীর দ্বিতীয় সংস্করণ। শ্রীল ঈশ্বরপুরীপাদ অনাসক্ত বিপ্রলম্ভ ভজন তৎপর রোগশোকাচ্ছন্নের অভিনয়কারী নিজ গুরুদেবের মলমূত্র স্বহস্তে মার্জ্জন করিয়া জগজ্জীবকে শিক্ষা দেওয়ার জন্য জানাইলেন,—"শ্রীগুরুদেব রোগের অভিনয় করিয়া বর্ত্তমানে শিষ্যকে যে সেবার সুযোগ প্রদান করিতেছেন, তাহা বরণ না করিলে শিষ্যের পক্ষে সর্ব্বনিরপেক্ষ গুরুদেবের সেবা করিবার অন্য কোন সুযোগ নাই।" মায়ার বন্ধন হইতে পরমমুক্ত নিষ্কিঞ্চন গুরুদেব সর্ব্ববিধ অপেক্ষা রহিত হইয়া রোগ-শোকাভিনয়কালে সেবোন্মুখ জীবগণকে যে সেবানুশীলনের সুযোগ প্রদান করেন, তাহা তাঁহার মহত্ত্বের পরিচয় এবং জগতের প্রতি করুণার নিদর্শন। বদ্ধজীবগণ অনর্থগ্রস্ত আর্ত্তের শুশ্রূষায় বৃথা শ্রম করিয়াও অমঙ্গলকর ফলাকাঙ্ক্ষা বা ফলত্যাগের বিচার হইতে মুক্ত হইতে পারেন না। কেবলমাত্র গুরুদেবের শুশ্রূষা ও ইন্দ্রিয়তর্পণের দ্বারাই জীবের পরম মঙ্গল সাধিত হয়।

গুরুদেবে মর্ত্ত্যবুদ্ধি হইলেই জীবের চরম সর্ব্বনাশ উপস্থিত হয়। গুরুদেবে পূর্ণ শরণাগত হইয়া তাঁহার আদেশ-উপদেশানুসারে সকল কর্ম্ম করিলে জীবের আর চৌরাশীলক্ষ জন্ম পরিভ্রমণের কোন ভয় থাকিবে না। তাই নিম্নোক্ত মহাজন-বাক্য স্মরণপূর্ব্বক জীব গুরুদেবের প্রীতির চেষ্টায় নিত্য তৎপর হইলে তাঁহার প্রকৃত মঙ্গললাভ হইবে—এ বিষয়ে সন্দেহ নাই।

"গুরুকে 'মনুষ্য'-জ্ঞান না কর কখন।
গুরু-নিন্দা কভু কর্ণে না কর শ্রবণ॥
গুরু-নিন্দুকের মুখ কভু না হেরিবে।
যথা হয় গুরুনিন্দা, তথা না যাইবে॥

গুরু-পাদপদ্মে রহে যার নিষ্ঠা-ভক্তি।
জগৎ তারিতে সেই ধরে মহাশক্তি ॥
হেন গুরু-পাদপদ্ম করহ বন্দনা।
যাহা হৈতে ঘুচে ভাই সকল যন্ত্রণা ॥
গুরু-পাদপদ্ম নিত্য যে করে বন্দন।
শিরে ধরি' বন্দি আমি তাহার চরণ ॥"

—**শ্রীবলভদ্র দাস ব্রহ্মচারী**

শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজের বিরহ-তিথিতে

শ্রীল গুরু-মহারাজের বক্তৃতা

শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠ, নবদ্বীপ (নদীয়া), তাং—২৩।১০।১৯৯১

পূজনীয় বৈষ্ণববৃন্দ, শ্রদ্ধেয় সুধী সজ্জনমণ্ডলী! আজ অস্মদীয় গুরুপাদপদ্ম জগদ্গুরু ওঁ বিষ্ণুপাদ ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামীর ২৩শ বর্ষপূর্ত্তি তিরোভাব-তিথি। গতকল্য থেকে গুরুপাদপদ্মের মহিমা-মাহাত্ম্য আপনারা শ্রবণ করছেন। আজ ভোর থেকে পুনরায় সে সমস্ত আলোচনা শুরু হয়েছে। বর্ত্তমানেও আমরা তাঁরই মহিমা-মাহাত্ম্য, তাঁর তত্ত্বদর্শন, বৈশিষ্ট্য আলোচনা করছি।

গৌড়ীয় বৈষ্ণব সাহিত্যে মিলন এবং বিরহ নিয়ে যথেষ্ট আলোচনা আছে। এই মিলন এবং বিরহ কোন্ ক্ষেত্রে উপস্থিত হয়, সেটা নিয়েও বিশেষভাবে আলোচনা রয়েছে। ভগবানের ক্ষেত্রে যেমন মিলন এবং বিরহ দুটো আছে, ভক্তের ক্ষেত্রেও মিলন এবং বিরহ দুটোই আছে।

কর্ম্মবালম্বনা কেচিৎ কেচিজ্ জ্ঞানাবলম্বকাঃ।
বয়ন্তু হরিদাসানাং পাদত্রাণবলম্বকাঃ ॥

বিচারটা আমরা দেখতে পাই। শ্রীমদ্ভাগবতের একটী শ্লোক আমার পূর্ব্ববর্ত্তী বক্তৃমহোদয় উল্লেখ করেছেন,—

যস্য দেবে পরা ভক্তির্যথা দেবে তথা গুরৌ।
তস্যৈতে কথিতা হ্যর্থাঃ প্রকাশন্তে মহাত্মনঃ ॥

আবার আমরা দেখতে পাই রঘুপতি উপাধ্যায়ে,—

শ্রুতিমপরে স্মৃতিমিতরে ভারতমন্যে ভজন্তু ভব-ভীতাঃ।
অহমিহ নন্দং বন্দে যস্যালিন্দে পরং ব্রহ্ম॥

এই তিনটে শ্লোকেরই একই তত্ত্ব—গুরু-বৈষ্ণবকে বাদ দিয়ে গৌরাঙ্গকে পাওয়া যাচ্ছে না, বিষয়-বিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রকে পাওয়া যাচ্ছে না। দুজনকে নিতে হচ্ছে পাশাপাশি। সেই বিচারটা রয়েছে শাস্ত্রে। সাধারণ মানুষ অনেক কিছু জ্ঞান আহরণ করে, কিন্তু বিশেষ জ্ঞান যেটা সে জ্ঞানের কথা অন্যত্র যতটা আছে, তদপেক্ষা খুব পরিষ্কার ভাষায় শ্রীমদ্ভাগবতে বিচারগুলি ব্যক্ত হয়েছে। সেখানে বলছেন,—প্রাকৃত কর্ম্ম, জ্ঞান, যোগ, তপস্যাদি নিষ্ফল হয়, যদি আমরা ভক্তিবৃত্তিকে বাদ দিই। সুতরাং দেখা যায় যে, সনাতন ধর্ম্ম বেদনিষ্ঠ ধর্ম্ম, ভক্তিনিষ্ঠ ধর্ম্ম। আবার দেখা যায়, সনাতন ধর্ম্ম গুরুনিষ্ঠ ধর্ম্ম। এই দুটো বিচারই আমরা পাশাপাশি পাচ্ছি। 'গুরু ছাড়ি' গৌরাঙ্গ ভজে, সে পাপী নরকে মজে।' একথারও একই তাৎপর্য্য। সেখানে Transparent mediumকে বাদ দিয়ে, সদ্‌গুরুর কৃপাকে বাদ দিয়ে কোন কিছু সম্ভব হচ্ছে না সাধন-ভজন ক্ষেত্রে। এই তত্ত্ব-দর্শনটা নিয়ে বিশেষভাবে শাস্ত্রে আলোচনা আছে।

'বিরহ' শব্দটা ব্যাখ্যা করা হয়েছে বিশেষভাবে দুই ক্ষেত্রে—গুরু-বৈষ্ণব তত্ত্বের অভাবে, আবার ভগবানের অভাবে ভক্ত বিরহাক্রান্ত হচ্ছেন। উদ্ধব ভগবান্ কৃষ্ণের সঙ্গেই এসেছেন। কিন্তু যখন ভগবানের এখানকার কাজ সমাপ্ত হয়েছে, দেবতাগণ যখন অনুরোধ করছেন কৃষ্ণকে, প্রভু! আমরা আপনাকে অনেক কষ্ট দিয়েছি, আপনার কাজ শেষ হয়েছে, এখন আপনার স্বধামে যেতে পারেন। সেই কথা শুনে কৃষ্ণ বুঝলেন যে, আমার যাওয়ার সময় এখন হয়েছে। একটু কাজ বাকী ছিল তাঁর। আমার অধীনে থেকে এই যাদবকুল অত্যন্ত দুর্ধর্ষ হয়েছে। সুতরাং কিছুটা বাকী আছে, এইটুকু শেষ করে আমি যাব। ঘটনাটাও তাই ঘটল —মৌষলপর্ব্ব'। কৃষ্ণ চলে যাচ্ছেন। তাঁর যাওয়ার আগে বলদেব প্রভুও চলে যাচ্ছেন। তাঁর যে যান (রথ) Take off করছেন, পৃথিবীর—মাটীর থেকে কিছুটা উপরে উঠে গেছে, সেই সময়ে ভগবানের প্রিয় সখা উদ্ধব কান্নাকাটি আরম্ভ করেছেন। শ্রীমদ্ভাগবতের ১১শ স্কন্ধের ৬ষ্ঠ অধ্যায়ে বর্ণিত হয়েছে বিষয়টা। উদ্ধব কান্নাকাটি আরম্ভ করলেন, তার ভাষা রয়েছে,—

নাহং তবাঙ্‌ঘ্রিকমলং ক্ষণার্দ্ধমপি কেশব।
ত্যক্তুং সমুৎসহে নাথ স্বধাম নয় মামপি॥

তুমি আমাকে ছেড়ে চলে যাচ্ছ, আমাকে সঙ্গে নেবে না মনে হচ্ছে, কিন্তু

আমি ত' তোমা ছাড়া এক মুহূর্ত্তও বাঁচতে পারব না। তোমা ছাড়া আমি থাকতে পারব—এটা আমার বিশ্বাস নাই। সুতরাং আমাকে সঙ্গে নিয়ে চল। আমাকে ফেলে যেও না। এই হল তাঁর কাঁদবার ভাষা। কৃষ্ণ মুস্কিলে পড়লেন। রথ যে অবস্থায় উঠেছিল সেই অবস্থায় দাঁড়িয়ে গেল। কিন্তু ওঁকে ত' সান্ত্বনা দিতে হবে। উদ্ধবকে বললেন,—আমার কাজ শেষ হয়েছে, কিন্তু তোমার কাজ ত' বাকী আছে। তোমার কাজ শেষ হয়েছে, আমার কাজ বাকী আছে! তোমার কাজ কি শেষ হল? কেন, আমি ত' বলে রেখেছি—"পরিত্রাণায় সাধুনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্। ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে॥" আমি আমার কাজ করে ফেলেছি। উদ্ধব জিজ্ঞাসা করলেন,—আমার কি কাজ বাকী আছে?—যেটা আমি এখানে বলে গেলাম, সেটা জগতের লোককে শিক্ষা দিতে হবে, জানাতে হবে, প্রচার করতে হবে। এইজন্য তোমাকে রেখে যাচ্ছি। উদ্ধব বললেন,—কবে তুমি সনাতন ধর্ম্মতত্ত্ব জগৎকে বলেছিলে, ব্রহ্মার সঙ্গে সমগ্র জগৎ তা ভুলে গেছে, আমিও ভুলে গেছি। সুতরাং আমাকে আবার নূতন করে বলতে হবে। সেইখানে আবার বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম থেকে আরম্ভ করে সমস্ত সনাতন ধর্ম্মতত্ত্ব উপদেশ করেছেন ভগবান্। উদ্ধব সব শুনে নিলেন। এবার আমি বুঝতে পেরেছি কেন আমাকে থাকতে হবে। তখন তিনি আবার পড়া দিচ্ছেন—

ত্বয়োপভুক্তস্রগ্‌গন্ধ-বাসোঽলঙ্কারচর্চ্চিতাঃ।
উচ্ছিষ্টভোজিনো দাসাস্তব মায়াং জয়েম হি॥

তোমার উচ্ছিষ্টভোজী ভৃত্য হয়ে, বিঘসাশী ভৃত্য হয়ে আমাকে তোমার কথা বলতে হবে, জগৎকে জানাতে হবে। আমি কখন যাব? তুমি বুঝতে পারবে। 'ভজিতে ভজিতে সময় আসিলে এ দেহ ছাড়িয়া দিব।'—সেই কথাই তিনি ইঙ্গিতে তাঁকে জানিয়ে দিলেন। তুমি বুঝ্‌তে পারবে, তখন তুমি চলে যাবে। তোমার পথ খোলা আছে। সুতরাং দেখা যাচ্ছে, বিরহ ভগবদ্ভক্তের ক্ষেত্রেও রয়েছে এবং ভগবানের অভাবেও বিরহ রয়েছে। দুই ক্ষেত্রেই—আশ্রয়-বিগ্রহ ও বিষয়-বিগ্রহের ক্ষেত্রেই সমানভাবে প্রযুক্ত। সদ্‌গুরুর সদ্‌গুরুত্ব নির্ভর করছে তাঁর গুরুভক্তির উপর, নিষ্ঠার উপর। এটাকে বাদ দিয়ে কিছু নয়। সম্পূর্ণভাবে সদ্‌গুরুর ব্যাখ্যা যা শাস্ত্রে করা আছে, সেখানে দেখা যায়, ভগবানের কৃপাশক্তি গুরুরূপে আবির্ভূত। ভগবানের কৃপাশক্তিই হল গুরুতত্ত্ব। সেই জিনিসটা বিশেষভাবে ব্যাখ্যা করছেন শাস্ত্রে।

জগতে আমরা যে শিক্ষাগুলো পাচ্ছি, এটা তাৎকালিক শিক্ষা এবং শেষ অবস্থাটা হচ্ছে জগতের কিছু পুণ্য কার্য্যাদি করে স্বর্গলাভ পর্য্যন্ত। যদি বলা যায়,

আরও কিছু উপরে আছে। হ্যাঁ, সত্যলোক পর্য্যন্ত আছে। কিন্তু সে পর্য্যন্ত একই ফল— নশ্বর, ক্ষয়িষ্ণু, ধ্বংসশীল। এখন এর থেকে ভাল কিছু আছে কিনা? ভাগবত প্রশ্ন করেছেন সেটা। এই স্বর্গসুখ থেকে আর কিছু বড় কথা আছে কিনা? যে চিন্তা নিয়ে জগতের তথাকথিত শিক্ষিত সমাজ বা মনীষিরাও প্রশ্ন রেখেছেন। দেখা যায় সেখানে স্বর্গ পর্য্যন্ত। শ্রীমদ্ভাগবত ১০ম স্কন্ধ ২৩শ অধ্যায়ে দেখা যাচ্ছে যাজ্ঞিক বিপ্রগণ যজ্ঞ করতে বসেছেন। কি জন্য?— 'স্বর্গকাম্যয়া'—স্বর্গে যাবেন বলে। যারা এতকিছু জানেন, তারা স্বর্গপ্রাপ্তির জন্য যজ্ঞ করছেন এবং সেখানে রহস্য করে বলা হয়েছে, যেহেতু এরা স্বর্গ কামনা করে এখানে যজ্ঞ করতে বসেছেন সেইজন্য এরা অবুঝ, অর্ব্বাচীন। তাহলে ব্যাপারটা কি? পণ্ডিত তাহলে কে? তত্ত্বদর্শী কে? যারা সবকিছু বুঝে, বেদ-বেদান্ত-উপনিষদ্ আলোচনা করে স্বর্গসুখটাকে শ্রেষ্ঠ বলে মনে করছেন, তাদের ত' ঠিকমত তত্ত্বদর্শন জানা হয় নাই। সেইখানেই প্রশ্ন করছেন, এর থেকে আর কিছু শ্রেষ্ঠ অবস্থা আছে কিনা? সত্যলোকের গতি পর্য্যন্ত সবই মহামায়া দুর্গাদেবীর শাসনাধীন। বার বার করে কর্ম্ম-কর্ম্মফল ভোগ করতে হচ্ছে ঘুরে ফিরে এই চতুর্দ্দশ ব্রহ্মাণ্ডে। এটাকে ছাড়িয়ে বিরজা পার হয়ে তারপরে ব্রহ্মলোক, তারপরে বৈকুণ্ঠধাম। এইখানে যে গতি, তাকে বলছেন সদ্গতি। তার আগে জীবের সদ্গতির সম্ভাবনা কোথায়? সদ্গতি বলে ত' কিছু বর্ণনা করা হয় নাই শাস্ত্রে। যে কথা গীতার মধ্যে রয়েছে,– 'তে তং ভুক্ত্বা স্বর্গলোকং বিশালং ক্ষীণে পুণ্যে মর্ত্ত্যলোকং বিশন্তি।' সেইকথা ব্রহ্মসূত্র বেদান্ত দর্শনের মধ্যে রয়েছে— 'কৃতাত্যয়েহনুশয়বান্ দৃষ্টস্মৃতিভ্যাং যথেতমনেবঞ্চ'—জীবের যখন কর্ম্মফল ফুরিয়ে যাচ্ছে, তখন তার অনুশোচনা আসে, একটা চিন্তা-ভাবনা আসে। তার দ্বারা তাকে এ-সংসারে এসে পুনরায় জন্মগ্রহণ করতে হয় এবং কর্ম্ম-কর্ম্মফল ভোগ করতে হয়। যদি এই কথা সত্যই হয়, তাহলে মানুষের সদ্গতি কি? নির্ব্বিশেষ-বাদিগণ বলছেন—'অপুনর্ভব মুক্তি'। 'অপুনর্ভব মুক্তি' কোথায় হবে? তার স্থান কোথায়? যারা ভগবানের সঙ্গে মিশে যেতে চাচ্ছেন, তাদের ত' সদ্গতি বলে কিছু নাই, হয় না। তাদের যে গতি সেটা এই ব্রহ্মলোকের মত একটা গতি। যদিও সেটা বিরজার পরপারে; কিন্তু সেটা কি অবস্থা? শাস্ত্র বর্ণনা করেছেন, সাধু-মহাজনগণ বর্ণনা করেছেন যে এটা ক্লোরোফরম্ করা রোগীর যে অবস্থা সেই অবস্থা।—

সিদ্ধলোকস্তু তমসঃ পারে যত্র বসন্তি হি।
সিদ্ধা ব্রহ্মসুখে মগ্না দৈত্যাশ্চ হরিণা হতাঃ॥

ভগবানের হাতে নিহত অসুরগণের যেখানে গতি হয় বা ভগবদ্বিরোধী **Elements** যেগুলো, তাদের যে অবস্থা হয়, সেটাকে ত' সদ্গতি বলা হবে না। এই কথাই লক্ষ্য করে বলা হচ্ছে, -

যদিচ্ছসি পরং জ্ঞানং জ্ঞানাদ্ যৎ পরমং পদম্।
তদ্দাদরেণ রাজেন্দ্র কুরু গোবিন্দকীর্ত্তনম্॥

যদি পরজ্ঞান — ভক্তি লাভ করতে চাও, সেই ভক্তি ব্যাখ্যা করছেন প্রেমভক্তি, 'জ্ঞানাৎ যৎ পরমং পদম্'—পরম পদ লাভ হবে, পরম পদ মানে ভক্তিপথ, গোলোকগতি, তাহলে গোবিন্দ-কীর্ত্তন করতে হবে। গোবিন্দ-কীর্ত্তনের কথা কে বলবেন? কে শিখাবেন? সাধারণ মানুষ শিখাবেন? প্রাকৃত জগতের কর্ম্মী, জ্ঞানী, যোগী কখনও তারা নাম-কীর্ত্তনের উপর জোর দেবেন না। তারা আবোল-তাবোল উপদেশ করবেন। তাদের বলা হয়েছে — কুকর্ম্মী, কুজ্ঞানী, কুযোগী। হৃষীকেশ-স্তবে ওগুলো খণ্ডন করা আছে। তাহলে আমরা কি করব? ভক্তির কথা সেখানে আসছে। ভক্তিকে বাদ দিয়ে যদি আমরা মনে করি কর্ম্ম, জ্ঞান, যোগকে সফল করব, হবে না তা কোনদিন। সেইজন্যই উদ্ধবকে কৃষ্ণ বলছেন,—

যমাদিভির্যোগপথৈঃ কামলোভহতো মুহুঃ।
মুকুন্দসেবয়া যদ্বৎ তথাদ্ধাত্মা ন শাম্যতি॥

ভক্তিযোগ অবলম্বন করতে হবে। সুতরাং ভক্তিযোগ ছাড়া কোনকিছু সফলতা লাভ করবে না। সদ্গুরুর উপদেশ ছাড়া আমাদের কল্যাণ নাই।

সেদিন এক জায়গায় একটা কথা শুনলাম, কোন এক ব্রাহ্মণকুলজাত সন্তান তিনি বলছেন, কলিকালে কি কেত্তন-টেত্তন আছে? জিজ্ঞাসা করা যায় যে— কলিকালে কি আছে? সত্যযুগের লোকের হাজার হাজার বৎসর পরমায়ু ছিল, তপস্যা করে ভগবানকে লাভ করতেন, ত্রেতাযুগের লোক যাগ-যজ্ঞের দ্বারা এবং দ্বাপরযুগের লোক পূজা-অর্চ্চনের দ্বারা ভগবানকে লাভ করতেন। কলিযুগে 'কলৌ তদ্ধরিকীর্ত্তনাৎ' এই কথা বলা আছে। তাহলে এই কলিকালে অন্যান্য যুগের সাধন-ভজনের যতরকমের প্রকারভেদ আছে, তার সব ফলটাই পাওয়া যাবে কৃষ্ণনাম কীর্ত্তনের দ্বারা। সুতরাং নাম-কীর্ত্তন ত' উপদিষ্ট হয়েছে কলিকালে। আর ভাগবতে ত' সেই কথাই বলছেন। যদি ৬৪ প্রকার ভক্ত্যঙ্গ যাজন করতে ইচ্ছা হয়, তাহলে নবধা ভক্তি—শ্রবণ, কীর্ত্তন, স্মরণ ইত্যাদি তার ভিতরে আছে। সেখানে ত' কীর্ত্তনকে বাদ দিয়ে নয়। নাম-কীর্ত্তনকে নিয়েই ত' সবটা। নাম-কীর্ত্তন এমনই জিনিস ওটাকে যে কোন অনুষ্ঠানের ভিতরে রাখলে পরে সেটা সফলতা লাভ করবে, পূর্ণাঙ্গ হবে। আমরা যদি যাগ-যজ্ঞ করছি, নাম-সঙ্কীর্ত্তন করা

হচ্ছে ; ঠাকুরের পূজা হচ্ছে, নাম-সঙ্কীর্ত্তন করা হচ্ছে ; প্রসাদ পেতে বসেছেন গুরু-বর্গ, বৈষ্ণবগণ, নাম-সঙ্কীর্ত্তন করছেন। প্রত্যেকটা অনুষ্ঠানের ভিতরে নাম-কীর্ত্তনের কথা রয়েছে সফলতার জন্য এবং শাস্ত্রে একথাও বর্ণিত হয়েছে,—'যদ্যপ্যন্যা ভক্তিঃ কলৌ কর্ত্তব্যা তদা কীর্ত্তনাখ্যা ভক্তি-সংযোগেনৈব।" তত্ত্বদর্শনটা ভগবদ্ভক্তকে বাদ দিয়ে নয়। ভগবান্ ভক্ত ছাড়া নয় ভক্তও ভগবান্ ছাড়া নন—এই তত্ত্বদর্শনটা আমাদের বুঝতে হবে। কিন্তু প্রথম মুখে ত' আমি ভগবানকে চিনি না, জানি না। আমি চিনি আমার পাশাপাশি **Nearest guardian** যিনি তাঁকে। একটা বাচ্চা শিশু সে তার মা-বাবাকে ছাড়া জানে না। কোন কিছু বিপদাপদ হলে মা! মা! বলে চিৎকার করে, বাবা! বাবা! বলে চিৎকার করে। সৎ শিষ্যের পক্ষে সদ্গুরু হচ্ছেন তার **Soul guardian**, তার **Nearest spiritual guardian**। তাঁকে বাদ দিয়ে ত' তার কোন অস্তিত্বই নাই, তার রক্ষাকর্ত্তা নাই। সেই কথাই ত' একজন বিশ্রস্ত সেবকের পক্ষে, বিশ্রস্ত শিষ্যের পক্ষে। একমাত্র সদ্গুরু তাকে রক্ষা করছেন। সদ্গুরু তাকে রক্ষা করতে পারেন—সেই বিচারটা তার মধ্যে রয়েছে। যে মুহূর্ত্তে আমরা মনে করি যে, আমার **Guardian** নাই, সেই মুহূর্ত্তে আমার সব শেষ। এই কথাই ত' শাস্ত্রে আছে। "আশ্রয় লইয়া ভজে, তারে কৃষ্ণ নাহি ত্যজে, আর সব মরে অকারণ।"—কথাটা ত' যুক্তি দিয়ে বুঝানো হয়েছে। সদ্গুরু তিনি কখনও ঈশ্বরকে অবিশ্বাস করতে পারেন না, গুরুতত্ত্ব, বৈষ্ণবতত্ত্বকে অস্বীকার করতে পারেন না, ভক্তিধর্ম্মকে ছোট করতে পারেন না। এ লক্ষণগুলো তাঁর মধ্যে আছে। সদ্গুরু কখনও বলবেন না যে ভগবান্ ও জীব দুইই এক—এটা তাঁর স্বভাব-বিরুদ্ধ। ভগবানকে ভালবাসতে গেলে তত্ত্বদর্শনটা জানতে হবে, বুঝতে হবে, শিখতে হবে। যদি আমার তত্ত্বজ্ঞান লাভ না হয়, তাহলে সাধন-ভজন আমি কিছুই করতে পারব না।

সিদ্ধান্ত বলিয়া চিত্তে না কর অলস।
ইহা হৈতে কৃষ্ণে লাগে সুদৃঢ় মানস॥

এটা ত' বুঝতে হবে আমাদের। তত্ত্বসিদ্ধান্ত মাথায় ঢুকছে না, সুতরাং ওটা আমার দরকার নাই, তা হবে না। আমার তত্ত্বসিদ্ধান্ত জানা হল না, সুতরাং আমার সাধন-ভজনক্ষেত্রে যে উন্নতি সেটাও ব্যাহত হল, বাধা পেল—সেই কথাই বলা আছে, বুঝানো আছে। আমি যদি সত্য সত্যই হরিভজন করতে চাই, আত্মকল্যাণ করতে চাই, তাহলে তত্ত্বদর্শন আমাকে শিখতে হবে। কোন্‌টা আমার আত্মকল্যাণজনক অবস্থা, কোন্‌টা তার বিরুদ্ধভাব, সেটা আমাকে জেনে নিতে হবে।

তত্তো দুঃসঙ্গমুৎস্জ্য সৎসু সজ্জেত বুদ্ধিমান্।
সন্ত এবাস্য ছিন্দন্তি মনোব্যাসঙ্গমুক্তিভিঃ ॥

এ বিচারটা আমাকে পাশাপাশি রাখতে হবে। সাধুসঙ্গ দরকার আছে। 'ভক্তিস্তু ভগবদ্ভক্তসঙ্গেন পরিজায়তে।'—ভক্তিলাভ হবে সাধুসঙ্গে। সাধুসঙ্গ কিভাবে হবে?—'সুকৃতৈঃ পূর্ব্বসঞ্চিতৈঃ।' তা পর পর আছে ত' জিনিসটা। আমি যদি কেবল সংসারী জীব হয়ে থাকি, তাহলে সাধন-ভজনের উন্নতি কোথায়? তত্ত্বদর্শন আমাকে জানতে হয়, সে যতই কষ্ট হোক না কেন, অসুবিধা হোক না কেন।

সদ্‌গুরুর যে আচার, নিষ্ঠা, তার মধ্যে একটা জিনিস লক্ষ্য করা যায়, যে জিনিসটা আমরা ভুল করে ফেলি। আমাদের যে Mental speculation, ভুল করে দেয় সবটা। 'বৈষ্ণব চিনিতে নারে দেবের শকতি।' গুরু চিনিতে নারে দেবের শকতি।'—একই কথা। তাহলে চিনবে কে? 'যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যঃ' —তিনি জানবেন। গুরু যদি কাকেও জানান, বৈষ্ণব যদি কাকেও জানান, ভগবান্ যদি কাকেও জানান, তবে ত' সে তত্ত্বদর্শন লাভ হয়। সুতরাং সে জানবার বিষয়টা হচ্ছে সহজ-সরল উপায়। এছাড়া অন্য কোন উপায় নাই এবং এইটাই সব জায়গায় দেখা যাচ্ছে। দ্বিষড়্‌গুণ লক্ষণযুক্ত ব্রাহ্মণের মধ্যেও রয়েছে সরলতা। "আর্জ্জবং ব্রাহ্মণে সাক্ষাৎ শূদ্রোঽনার্জ্জবলক্ষণঃ।" প্রাকৃত শোক-মোহের বশীভূত যিনি তিনি হলেন শূদ্র। আর প্রাকৃত শোক-মোহ বিগত হয়েছে যাঁর, তার থেকে মুক্ত যিনি, তিনি হলেন ব্রাহ্মণ, তিনি হলেন বৈষ্ণব।

বৈষ্ণব কি ব্রাহ্মণ?—এ প্রশ্ন হয়েছে। আবার ব্রাহ্মণ কি বৈষ্ণব?—এ প্রশ্নও রয়েছে শাস্ত্রে। উত্তরটা কি দেওয়া আছে শাস্ত্রে?—বৈষ্ণবের স্বতঃসিদ্ধ হল ব্রাহ্মণত্ব, আর ব্রাহ্মণ গুণজাত। গুণটা কে সৃষ্টি করেছেন? সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ মায়িক গুণ, মায়ার থেকে সৃষ্টি হয়েছে। সেজন্য যখন ভগবানের গুণ নিয়ে আলোচনা হয়, ব্যাখ্যা হয়, তখন আমরা দেখতে পাই একটা আলাদা শব্দ — 'বিশুদ্ধসত্ত্ব' ব্যবহার করা হয়েছে। যেহেতু সত্ত্বগুণ বললে পরে ভগবানকে লক্ষ্য করে না, বিষ্ণুকে লক্ষ্য করে না, বিষয়-বিগ্রহকে লক্ষ্য করে না, সেইহেতু 'বিশুদ্ধ' শব্দ ব্যবহার হচ্ছে। সবটার ভিতরে ত' বৈশিষ্ট্য আছে। 'হরির্হি নির্গুণঃ সাক্ষাৎ'—ভগবান্ হলেন নির্গুণ। তাঁর কি কোন গুণ নাই?—সর্ব্বগুণে গুণান্বিত তত্ত্ব তিনি এবং প্রাকৃত গুণের অতীত তিনি। সেইজন্য নির্গুণ শব্দ সেখানে ব্যবহার করা হয়েছে।

সেই সদ্‌গুরুর কৃপাপ্রভাবে সবকিছু সফলতা লাভ করে। সেই কথা ভাগবতে

বলা হয়েছে।—'গুরোরনুগ্রহেণৈব পুমান্ পূর্ণঃ প্রশান্তয়ে'—সদ্‌গুরুর কৃপাপ্রভাবে শিষ্যের যাবতীয় কল্যাণ লাভ। যাবতীয় কল্যাণ মানে পারমার্থিক কল্যাণের চরমটা লাভ হয়। যা জানলে, যেটা লাভ করলে কোন কিছু আর বাকী থাকে না— 'যস্মিন্ জ্ঞাতে সর্ব্বমিদং জ্ঞাতম্। যস্মিন্ প্রাপ্তে সর্ব্বমিদং প্রাপ্তম্।'—সেই তত্ত্বদর্শন লাভ হয়। তত্ত্বদর্শনটা ত' আমাদের জানা নাই—আমাদের কি দরকার, কি পেলে আত্মা আমাদের সুখী হয়? 'যয়াত্মা সম্প্রসীদতি'। সেটা কি? প্রেমভক্তি লাভ—সেই কথাই শাস্ত্রে বার বার বলেছেন। এই পর্য্যায়ের নীচে যেটা আছে, সেটা ত' আমাদের সদ্‌গতি নয়। যেখানে গেলে আবার পুনরাবর্ত্তন হবে, ফিরে আসতে হবে এই মায়িক ব্রহ্মাণ্ডে, সেটা আবার সদ্‌গতি কি? তাকে সদ্‌গতি শব্দে ব্যাখ্যা করা হয় নাই। সদ্‌গতি মানে কম করেও বৈকুণ্ঠগতি। বৈকুণ্ঠের মধ্যেও বিষ্ণুতত্ত্বের স্থান ব্যতীত প্রকোষ্ঠ আলাদা আছে - ঔদার্য্য প্রকোষ্ঠ ও মাধুর্য্য প্রকোষ্ঠ। সেই বিচারটা আমাকে বুঝতে হবে।

গুরুতত্ত্ব ব্যাখ্যা করতে গিয়ে শাস্ত্র বলছেন,—বাহ্যতঃ বেষ গুরুদেবের হয়ত' পুরুষ শরীর, কিন্তু যখন তাঁর তত্ত্বগত বিচার, তত্ত্বগত পরিচয় জানতে পারা যায়, তখন দেখা যায় তিনি শক্তি। আর সত্যই গুরুকৃপা শক্তি। ভগবৎ-কৃপাশক্তির নামই গুরুশক্তি। আমার পূর্ব্ববর্ত্তী বক্তৃমহোদয়গণের মধ্যে কেউ বলেছেন,—গুরু হচ্ছেন সখী। আমি বলব,—গুরু সখীর অনুগত সখী, মঞ্জরী। সে ব্যাখ্যাও শাস্ত্রে দেওয়া আছে। কেউ কমল-মঞ্জরী, কেউ হচ্ছেন বিনোদ-মঞ্জরী, কেউ হচ্ছেন নয়ন-মঞ্জরী ইত্যাদি সব নাম আছে। শক্তি-শক্তিমানের পরিচয় যিনি বা যাঁরা জেনেছেন, সেই তত্ত্বদর্শনটা যাঁরা জগৎকে জানাচ্ছেন, তাঁরাই সদ্‌গুরু। প্রাকৃত জগতের কর্ম্মী, জ্ঞানী, যোগীগুরু তত্ত্বজ্ঞানী গুরু নন—এটা বুঝানো আছে।

ভক্তিধর্ম্মকে নিয়ে যদি কেউ চলেন, তাহলে তার কল্যাণ আছে, তার বাহাদুরি আছে। আর ভক্তিধর্ম্মকে অস্বীকার করে যদি কোন কিছু জিনিস কেউ বক্তব্য রাখছেন, সে বক্তব্য টিকবে না, সে বক্তব্যের কোন মূল্য নাই। (**ক্রমশঃ**)

মহামিলনের প্রতীক্ষায়

মহামিলন—'মহান্ যে মিলন'। এ মিলন হল ভক্ত ও ভগবানের মিলন। এ এক অপার্থিব মিলন। সেই অপার্থিব মিলনের প্রতীক্ষায় ভক্ত তাঁর বিদগ্ধ প্রাণ নিয়ে অপেক্ষা করছেন। হৃদয়বিদারী মর্ম্মভেদী করুণ কান্নায় ভেঙ্গে পড়েছেন ভক্ত। ভক্ত ত' ভগবানকে—

"হাথক দরপণ মাথক ফুল। নয়নক অঞ্জন মুখক তাম্বুল ॥
হৃদয়ক মৃগমদ গীমক হার। দেহক সরবস গেহক সার ॥"

করে নিয়েছেন তবুও সাড়া মিলছে কই?

ভক্ত তাই কেঁদে বলেন,—

"কত মধু যামিনী রভসে গোঁয়াইলুঁ
না বুঝলুঁ কৈছন কেল।
লাখ লাখ যুগ হিয়ে হিয় রাখলুঁ
তব হিয়া জুড়ন না গেল ॥"

ভগবানের ক্ষণিক মিলনের আশায় ভক্ত কত লক্ষ লক্ষ যুগ হৃদয়ে হৃদয় রেখেছেন। চিরন্তন ভক্ত কোন এক মুহূর্ত্তের জন্য ভগবানের অনাদি রূপ-রহস্য, অনন্ত প্রাণ-বিস্ময়টুকুর নয়নগোচর-হৃদয়গোচর করেছিল, আর পরমপ্রভু কোন এক অনাবিল আস্বাদনে পরিপূর্ণ আলিঙ্গনে জড়িয়ে ধরেছিলেন ভক্তকে। অবাক বিস্ময়ে ভক্ত তাঁর সমস্ত রূপের কামনা, রসের বাসনা, তৃপ্তির নিবিড়তা, তৃষ্ণার বিধুরতাকে ঢেলে দেন পরমপ্রিয়ের দুই বাহুর সুদৃঢ় আলিঙ্গনে। সে আলিঙ্গন ত' এক মুহূর্ত্তের জন্য! তারপরে কোথায় মিলিয়ে গেল সেই মদির আকর্ষণ? কোথায় হারিয়ে গেল সেই অনাবিল ভালোবাসার একটুকরো ক্ষণ? সেই মিলনের আশায় ভক্ত "ঘর কৈনু বাহির, বাহির কৈনু ঘর" করেছেন। কিন্তু কি হবে? যাঁর জন্য এত প্রতীক্ষা, যাঁর জন্য এত করুণার্ত্তি, তাঁর কি এদিকে হুঁশ আছে? ঐতো পরমপ্রিয় হেঁটে চলেছেন অন্যপথে! এত কলঙ্ক, এত গঞ্জনা যাঁর জন্য সওয়া, এত দুঃখ যাঁর জন্য পাওয়া, সে কি একবারও আসবে না? তবুও ভক্ত ডুকরে ডুকরে কেঁদে বলে,—

"কলঙ্কী বলিয়া ডাকে সব লোকে
তাহাতে নাহিক দুখ।
তোমার লাগিয়া কলঙ্কের হার
গলায় পরিতে সুখ ॥

সতী বা অসতী তোমাতে বিদিত
ভালমন্দ নাহি জানি।"

তিরস্কারে ক্ষত-বিক্ষত দেহ তার বেদনায় বিদীর্ণ প্রাণকে নিয়ে ভগবানের কাছে আকুল প্রার্থনা জানিয়ে চলেছে। চারিদিকে অন্ধকার, ঘনঘোর বৃষ্টি আর বাজ পড়ার আতঙ্কিত শব্দে অসহায় ভক্ত ভয় পেয়ে পথ হারিয়ে ফেলেন। ভগবান্ ছাড়া তার যে কেউ নেই। সেই পরমপ্রভু, পরমপিতা ভগবানই ত' তার স্বামী-পুত্র-পরিবার-পরিজন-সখা-বন্ধু-রক্ষাকর্ত্তা। সকলের প্রিয়জন এই ঘনঘোর বর্ষার দিনে রয়েছে তার নিজ নিজ কুলায়, কিন্তু সেই নিঃসঙ্গ একাকী ভক্তের পরমপ্রিয় যে কোন্ সুদূরে রয়েছেন! হায়! কি নিয়ে থাকবে ভক্ত? কি করে সহ্য করবে এই নিঃসঙ্গ জীবনের জ্বালা? যাঁকে ছাড়া জীবনের অস্তিত্বের কথা ভাবা যায় না, যিনি ছাড়া জীবনে আর কেউ নেই, সেই প্রিয়তমকে কাছে না পেয়ে ভক্তের বুকের পাঁজর খসে যায়। তাই যখন—

"মত্ত দাদুরী ডাকে ডাহুকী
(তখন) ফাটি যাওত ছাতিয়া।
তিমির দিগ্ ভরি ঘোর যামিনী
অথির বিজুরিক পাঁতিয়া।"

ঘোর নিশিতে সেই মহামিলনের কথা ভাবতে ভাবতে ভক্তের দিন কেমনভাবে কেটে যায়। কেমন করে রাত্রি অবসান হয়, ভক্তের সেদিকে হুঁশই থাকে না। মাঝে মাঝে যখন সেই মদির আলিঙ্গনের কথা মনে পড়ে, তখন আর স্থির থাকতে পারেন না। তার অস্থির বিক্ষিপ্ত মন কেঁদে উঠে বলে,—

"কৈছে গোঙায়বি, হরি বিনে দিন রাতিয়া॥"

'হরি বিনে দিন রাতিয়া'—লাইনটির মধ্যে যেন ভক্তের প্রাণ নিঙড়ানো, বুক নিঙড়ানো যন্ত্রণার কথা পরিস্ফুট। এ তিন ভুবনে আপনজন বলতে ত' কেউ নাই, তাই পরমপিতাকে আপন বলে ভাবতে কোন দ্বিধা থাকে না ভক্তের। অভিযোগ হানে পরমসখার কাছে,—

"একুলে ওকুলে দুকুলে গোকুলে
আপনা বলিব কায়।
শীতল বলিয়া শরণ লইনু
ও দুটী কমল পায়॥
না ঠেলহ ছলে অবলা অখলে
যে হয় উচিত তোর।

ভাবিয়া দেখিনু　　　　প্রাণনাথ বিনে
গতি যে নাহিক মোর ॥"

মহামিলন ! ভক্ত অপেক্ষা করতে করতে এমন এক অবস্থার মধ্যে পৌঁছান, যখন দেহের প্রতিটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ, প্রতিটি ইন্দ্রিয় ধাবিত হয় সেই চরম আলিঙ্গনের সুদৃঢ় আকর্ষণে। মনের মধ্যে এক আশ্চর্য্য কল্পনার জাল বুনে চলেন ভক্ত। চোখের সামনে স্পষ্ট হয়ে ওঠে সেই মুহূর্ত্তের ছবি। নিজের জীবনকে তিলে তিলে সাজিয়ে প্রিয়তমের জন্য গড়ে তোলেন। চারদিকে গুরুজনের বাধা, লোকচক্ষুর অন্তরালে ভক্ত তাঁকে পেতে চান, কিন্তু সেই পরম নির্জ্জনতার আভাস পাওয়া যায় না কোথাও। কোন বিধান যেন আর মানতে পারছেন না। তাই বলেছেন,—

"সজনি, অব হাম না বুঝি বিধান।
অতিশয় আনন্দে　　　　বিহিনি ঘটাওল
হেরইতে ঝরয়ে নয়ান ॥

চোখের জল আর থামতে চায় না। ভক্ত যে সুরে কথা বলেছেন, তা যেন প্রাণের গভীরতম প্রান্ত থেকে উচ্ছ্বসিত। কল্পনার জালে আকাঙ্ক্ষিত প্রভুজনকে পেয়ে ভক্ত আনন্দে দিশেহারা হয়ে পড়ে। চীৎকারে জর্জ্জরিত করে ফেলেন অন্যদের—

"সোই কোকিল অব　　　　লাখ লাখ ডাকউ
লাখ উদর করু চন্দা।
পাঁচবাণ অব　　　　লাখ বাণ হোউ
মলয় পবন বহু মন্দা ॥"

মানসভোগের অতৃপ্তি এবং সম্ভবতঃ বস্তুভোগের নৈরাশ্য তাঁকে উর্দ্ধ্বতর অনুভূতির জগতে তুলে দিয়েছে। ভক্তের এখানে সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক ভাবের এতটুকু লেশ নাই। মনের মধ্যে সমস্ত অন্ধকার, সমস্ত সংস্কারকে জলাঞ্জলি দিয়ে প্রাণ দিয়ে যাঁকে ভালবেসে ফেলেছেন, তাঁকে যে কিছুতেই ভুলতে পারছেন না। তাঁর একরাস কালো চুল, বাঁশীর মধুর ধ্বনি, পায়ের নূপুরের ধ্বনি ভক্তকে কাঁদায় অবিরত। হঠাৎ ভয় পেয়ে যান ভক্ত। পরমপ্রিয়ের নাম শুনে যদি এমনই আকুলি-বিকুলি অবস্থা হয়, দেহের স্পর্শে তাহলে কি হবে? কে জানে? হয়ত' বা সব ভুলে কোন্ অধর্ম্মে পা দিয়ে বসবেন! কী মধুই না আছে তাতে!—

না জানি কতেক মধু　　　　শ্যাম নামে আছে গো
বদন ছাড়িতে নাহি পারে।

আবার,—

পাসরিতে করি মনে   পাসরা না যায়গো

কি করিব কি হবে উপায় !

"কি করিব কি হবে উপায় !" হায় ! ভক্তকণ্ঠে একি নির্ম্মম বেদনা ভরা উক্তি ? এ কি কৌতূহল ? এ কি প্রশ্ন ! এর উপায় কি ? শুধু এটুকু প্রশ্নের সমাধান করার কথা চিন্তা করতে করতে ভক্ত কেমন যেন উদাসীন হয়ে পড়েন। ভক্ত রূপান্তরিত হয়ে যান রাধায়িত কৃষ্ণ এবং কৃষ্ণায়িত রাধার সংমিশ্রণের অবস্থায়। কোন্ সুদূর মরুভূমির পথ পেরিয়ে, কঠিন আঘাতে ক্ষত-বিক্ষত হয়ে, বেদনাক্লিপ্ত বিদীর্ণ হৃদয় নিয়ে কৃষ্ণায়িত রাধা শ্রীকৃষ্ণের সাথে মহামিলনের প্রতীক্ষায় বসে থাকেন যেন।

প্রতীক্ষা, আর প্রতীক্ষা ! সেই মহামিলনের প্রতীক্ষা ! ভগবানের বুকে মাথা রেখে ভক্ত ডুকরে কাঁদবে, আর ভক্তের একরাস ভক্তির প্রতিদানে তার মাথায় হাত বুলিয়ে দেবেন—এ হল সেই মহামিলনের আকাঙ্ক্ষিত দৃশ্য ! সেই মহামিলনের প্রতীক্ষায় আর কতকাল বসে থাকবেন ভক্ত ? পরমপ্রিয় ভগবান্ ভক্তকে কাঁদিয়ে কাঁদিয়ে শুদ্ধ করে নেন, ভক্ত ত' সে কথার অপেক্ষা রাখেন না। ভক্ত চান ভগবানকে, ভগবান্ সঙ্গ দেবেন ভক্তকে। এর মাঝে কোন কৈফিয়তের ধার ধারেন না ভক্ত।

এমনই করে দিন-রাত, মাস-বছর কেটে যায়। আর ভক্ত এক একটা দিন অপেক্ষা করে আহার অন্বেষণে ক্ষুধার্ত্ত বাঘিনীর সতর্ক দৃষ্টির ন্যায়।

কে জানে, কবে ঘটবে সেই মহামিলন ? কে জানে, কবে ভক্ত-কণ্ঠে শোনা যাবে সেই আনন্দশিহরণের প্রকাশ-গীতি ?

"অব মঝু যব   পিয়া সঙ্গ হোয়ত

তবহুঁ মানব নিজ দেহা ॥"

—**শ্রীমতী কুহু** ব্রহ্মা, অমর্ষি (মেদিনীপুর)

শ্রীচৈতন্যে মর্ত্ত্যবুদ্ধি—নাস্তিকতা ও অপরাধ

[পূর্ব্বপ্রকাশিত ৪৩শ বর্ষ, ১০ম সংখ্যা, ৩৯৯ পৃষ্ঠার পর]

"সবে মিলি উচ্চ করি' করেন সকীর্ত্তনে।
উচ্চ করি' কৃষ্ণনাম কহেন প্রভুর কানে॥
কতক্ষণে প্রভুর কানে শব্দ পরশিল।
হুঙ্কার করিয়া প্রভু তবহি উঠিল॥
উঠিতেই অস্থি সব লাগিল নিজস্থানে।
'অর্দ্ধবাহ্যে', ইতি-উতি করেন দরশনে॥"

(চৈঃ চঃ অন্ত্য ১৮।৭৪-৭৬)

পরে মহাপ্রভু 'অর্দ্ধবাহ্য' হইতে 'বাহ্যদশায়' ফিরিয়া আসেন এবং স্বরূপ গোস্বামী মহাপ্রভুকে স্নানান্তে গৃহে আনয়ন করেন। উপরোক্ত ঘটনায় মহাপ্রভুকে মূর্চ্ছিত অবস্থায় দেখিয়া ভক্তগণ ক্রন্দন করিয়াছিলেন। এক্ষণে 'চৈতন্য চকড়ায়' উল্লিখিত মহাপ্রভুর শ্রীঅঙ্গ মূর্চ্ছিত অবস্থায় পড়িয়া থাকিতে দেখিয়া বৈষ্ণবগণ ক্রন্দন করিতে পারেন —ইহাই স্বাভাবিক।

বৈষ্ণবদাস কৃত 'চৈতন্য চকড়ার' যে প্রাচীনত্ব ও প্রামাণিকতা নাই; তাহা লেখকের পুস্তক আলোচনা করিলেই বুঝা যায়। যেমন পুস্তকের ২২২ পৃষ্ঠায় লেখক লিখিয়াছেন,—"কিন্তু অন্যদিকে এই নব আবিষ্কৃত গ্রন্থ 'চৈতন্য চকড়া' প্রসঙ্গে পণ্ডিত মহলে কিছু প্রশ্ন ইতিমধ্যে উঠেছে। প্রশ্ন উঠেছে এর প্রাচীনত্ব নিয়ে। কেননা, এই গ্রন্থের মূল পুঁথি পাওয়া যায় নি। যা পাওয়া গেছে তা পুঁথি থেকে নকল করা পুঁথি।" * * * * *। "চৈতন্য চকড়া প্রসঙ্গে উৎকলের অন্যতম চৈতন্য গবেষক ডঃ জয়দেব মুখোপাধ্যায়ের সাথে এই গ্রন্থের লেখকের কিছু আলোচনা হয়েছিল। ডঃ মুখোপাধ্যায় চকড়ার প্রামাণ্যতা সম্পর্কে সন্দেহ প্রকাশ করেছিলেন। তিনি এটিকে প্রক্ষিপ্ত রচনা বলেছেন।"

উল্লিখিত 'চৈতন্য চকড়া'র মূল লেখক শ্রীল গোবিন্দদাস বাবাজী। পুস্তকের ২৯৯ পৃষ্ঠায় লেখক লিখিয়াছেন,—"চৈতন্য গৌরাঙ্গ চকড়া" নামক এই পুঁথিটির লেখকের নাম সম্ভবতঃ বৈষ্ণব দাস। সম্ভবত বলছি এজন্য যে, এই প্রাপ্ত পুঁথিটিও পূর্বোক্ত 'চৈতন্য চকড়ার' মতো অনুলিপি করা। তা ছাড়া দীর্ঘকালের অযত্ন বশতঃ পুঁথিটির প্রথম দিককার পাতাগুলো বিশ্রীভাবে জুড়ে যাওয়ার জন্য শেষভাগ ব্যতীত অন্যান্য লিপি উদ্ধার করা সঙ্গত কারণে সম্ভবপর হয় নি।"

অতএব বৈষ্ণবদাস কৃত 'চৈতন্য চকড়া' বা 'চৈতন্য গৌরাঙ্গ চকড়া' নামক পুঁথিটি গোবিন্দদাস কৃত 'চৈতন্য চকড়ার' মতই অনুলিপি হওয়ায় অর্থাৎ আসল

পুঁথি না হওয়ায় তাহাতে প্রক্ষিপ্ত ঘটনা থাকিতে পারে বলিয়া বৈষ্ণবদাসের 'চৈতন্য চকড়ার' প্রামাণিকতা সম্পর্কে সন্দেহ থাকিয়া যায়। সদ্য আবিষ্কৃত বৈষ্ণব দাসের 'চৈতন্য চকড়া' আসল গ্রন্থ না হওয়ায় তাহাতে উল্লিখিত ঘটনাবলীর প্রামাণিকতা স্বীকার করা যায় না। সুতরাং চৈতন্যদেবের জগন্নাথ মন্দিরে নিষ্ঠুর আততায়ীর হাতে মৃত্যু হওয়ার ঘটনা যাহা লেখক পুস্তকের ২৩ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন, তাহা অসত্য ও কাল্পনিক।

শ্রীচৈতন্যদেব স্বয়ং ভগবান্ এবং সর্ব্বশক্তিমান্ পুরুষ। কাজেই এই পৃথিবীতে এমন কোনও আততায়ীর শক্তি নাই যে তাঁহার শ্রীঅঙ্গে অস্ত্রাঘাত করিতে পারে বা তাঁহাকে গলা টিপিয়া মারিতে পারে।

লেখক তাঁহার পুস্তকের ৩২৩ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন,—"পরিশেষে একটা বিস্ময়কর তথ্য পাচ্ছি। এই যে, চৈতন্যকে হত্যা করা হয়েছিল পণ্ডিতেরা বলছেন, স্বভাবতই প্রশ্ন ওঠে কে হত্যা করেছিল চৈতন্যকে? গোবিন্দ বিদ্যাধর চৈতন্যের অপসারণ চেয়েছিলেন। কিন্তু তিনি স্বহস্তে বোধ করি একাজ করেন নি। এই ঘৃণ্য কাজের দায়িত্ব নাকি ছিল জগন্নাথ মন্দিরের দ্বাররক্ষক বাহিনীর প্রধান দলপতির ওপর। তার নাম দীনবন্ধু প্রতিহারী। আমরা ইতিপূর্ব্বে জগন্নাথ মন্দিরের প্রধান দ্বারপাল অনন্ত প্রতিহারীর নাম শুনেছি। অনন্ত চৈতন্যের শিষ্যত্ব গ্রহণ করার পর এই দীনবন্ধু প্রতিহারীকে তার স্থলাভিসিক্ত করা হয়েছিল। জানা যাচ্ছে, এই দীনবন্ধুই নাকি 'বুকের ওপর বসে গলা টিপে শ্বাসরুদ্ধ করে মেরেছিল প্রভুকে।"

লেখকের উক্ত মন্তব্যের সত্যাসত্য নির্দ্ধারণ করা আবশ্যক। প্রথমতঃ লেখক লিখিয়াছেন,—"চৈতন্যকে হত্যা করা হয়েছিল পণ্ডিতেরা বলছেন।" কিন্তু লেখকের বোধগম্য হওয়া উচিত যে, অপ্রাকৃত বস্তু চৈতন্য সম্পর্কে অপ্রাকৃত পণ্ডিতই বলিবার অধিকারী। চৈতন্যদেবকে হত্যা করা সম্পর্কে লেখক কোনও প্রামাণিক গ্রন্থের ও সেই গ্রন্থ-লেখকের প্রমাণ দিতে পারেন নাই। যে কোন ব্যক্তি তু'কলম ইংরাজী, বাংলা, সংস্কৃত প্রভৃতি ভাষা পড়িতে ও লিখিতে শিখিলেই তাহাকে পণ্ডিত বলা যায় না। দ্বিতীয়তঃ লেখক লিখিয়াছেন,—"গোবিন্দ বিদ্যাধর চৈতন্যের অপসারণ চেয়েছিলেন। কিন্তু তিনি স্বহস্তে বোধ করি এ কাজ করেন নি।" এক্ষণে লেখক "বোধ করি"-শব্দটি লেখায় গোবিন্দ বিদ্যাধর চৈতন্যকে হত্যা করিয়াছিলেন কিনা সে সম্বন্ধে লেখক প্রমাণ খুঁজিয়া পান নাই বুঝা যাইতেছে। তাই তিনি "বোধ করি" বা "মনে করি" শব্দটি লিখিয়াছেন। তৃতীয়তঃ লেখক লিখিয়াছেন,—"এই ঘৃণ্য কাজের দায়িত্ব নাকি ছিল জগন্নাথ

মন্দিরের দ্বাররক্ষক বাহিনীর প্রধান দলপতির ওপর। তার নাম দীনবন্ধু প্রতিহারী।" এস্থলে "নাকি"-শব্দটি সংশয় বা সন্দেহ প্রকাশ করিতেছে। দীনবন্ধু প্রতিহারীর উপর এই ঘৃণ্য কাজের দায়িত্ব যদি সত্যই ছিল তাহা হইলে লেখক 'নাকি'-শব্দটি লিখিবেন কেন? দীনবন্ধুর উপর এই ঘৃণ্য কাজের দায়িত্ব ছিল কিনা সে বিষয়ে লেখকের মনে সংশয় হইয়াছে। 'নাকি'-শব্দটি সম্ভবতঃ অর্থেও ধরা যাইতে পারে। চতুর্থতঃ লেখক লিখিয়াছেন,—"জানা যাচ্ছে, এই দীনবন্ধুই নাকি বুকের ওপর বসে গলা টিপে শ্বাসরুদ্ধ করে মেরেছিল প্রভুকে।" লেখকের উক্ত বক্তব্যে 'নাকি'-শব্দটি সংশয়সূচক অব্যয় পদ। 'জানা যাচ্ছে'-কথাটি লেখক লিখিয়াছেন, কিন্তু কোথা হইতে কেমন ভাবে জানা যাইতেছে তাহা উল্লেখ করিলেন না কেন? দীনবন্ধুই প্রভুকে গলা টিপিয়া শ্বাসরুদ্ধ করিয়া মারিয়াছিল—ইহা যদি লেখক জানিয়া থাকেন, তবে 'এই দীনবন্ধুই নাকি'—এমন কথা লিখিলেন কেন? উক্ত বাক্যটিতে 'নাকি' শব্দটি থাকিলে কিরূপ অর্থ বুঝায়; আর 'নাকি' শব্দটি না থাকিলে কিরূপ অর্থ বুঝায়, তাহা লেখক মহাশয় দয়া করিয়া ভাবিয়া দেখিয়াছেন কি? 'এই দীনবন্ধুই নাকি' বলিতে দীনবন্ধু প্রভুকে মারিতেও পারে, বা না মারিতেও পারে—এইরূপ সংশয় বুঝাইতেছে। এমতাবস্থায় দীনবন্ধু-কর্ত্তৃক প্রভুর নিহত হওয়া সম্পর্কে লেখক নিজেই নিশ্চিত হইয়া বক্তব্য রাখেন নাই। অতএব, সন্দেহজনক ধারণা লইয়া লেখকের উপরোক্ত অনুচ্ছেদের বক্তব্য সত্য হইতে পারে না। পরন্তু উহা দায়িত্বজ্ঞানহীনতারই পরিচয় দেওয়া হইয়াছে। কারণ সুনিশ্চিত না হইয়া কোন মন্তব্য প্রকাশ করা অর্ব্বাচীনের পরিচায়ক।

লেখকের পুস্তকের ২৩ পৃষ্ঠার বক্তব্যের কিছু অংশ পুনরায় উদ্ধৃত করিতেছি,—"যদি ঈশ্বরবাদীদের ভগবানের মতো চৈতন্য সর্ব্বশক্তিমান্ পুরুষ হতেন, তাহলে, তাঁকে পুরীর জগন্নাথের মন্দিরে নিষ্ঠুর আততায়ীর হাতে নৃশংসভাবে মৃত্যুর সম্মুখীন হতে হতো না।" লেখকের উক্ত বক্তব্যের উত্তরে নিম্নে কয়েকটি সত্য ঘটনা উত্থাপন করিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভুর ভগবত্তা ও সর্ব্বশক্তিমত্তার বৈশিষ্ট্য এবং তিনি যে কাহারও কর্ত্তৃক হত হইতে পারেন না, তাহার প্রমাণ উল্লেখ করিতেছি,—মাধাই মুটকী তুলিয়া নিত্যানন্দ প্রভুর মস্তকে আঘাত করিলে শ্রীচৈতন্যদেব তাহা লোকমুখে শুনিবামাত্র তৎক্ষণাৎ ঘটনাস্থলে গিয়া নিত্যানন্দের অঙ্গে রক্তধারা পড়িতে দেখিয়া ক্রোধে সুদর্শন চক্রকে আহ্বান করেন এবং সুদর্শন চক্রও আসিয়া উপস্থিত হন। তখন সুদর্শন চক্র দেখিয়া মত্তপ জগাই-মাধাইয়ের ভীতির সঞ্চার হইল। (**ক্রমশঃ**)

—শ্রীচৈতন্যকৃষ্ণ দাসাধিকারী

শ্রীশ্রীগুরুপূজা-মহোৎসব

অজ্ঞান-তিমিরান্ধস্য জ্ঞানাঞ্জন-শলাকয়া।
চক্ষুরুন্মীলিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ॥

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যাম্নায় চতুর্থাধস্তন পুরুষরাজ শ্রীরূপানুগবর অপ্রাকৃত কবিকুলতিলক ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমৎ কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী স্বীয় শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের শুভারম্ভে মঙ্গলাচরণে বর্ণনা করিয়াছেন,—

গ্রন্থের প্রারম্ভে করি মঙ্গলাচরণ।
গুরু, বৈষ্ণব, ভগবান্—তিনের স্মরণ॥
তিনের স্মরণে হয় বিঘ্নবিনাশন।
অনায়াসে হয় নিজ বাঞ্ছিত পূরণ॥

চৈতন্যলীলার ব্যাসাবতার অপ্রাকৃত আদি মহাকবি শ্রীমদ্ বৃন্দাবনদাস ঠাকুর-কৃত শ্রীচৈতন্যভাগবতে বিবৃত হইয়াছে ভগবানের জন্মতিথি যেমন পরম পবিত্র, গুরু-বৈষ্ণবের আবির্ভাব-তিথিও তদ্রূপ পরম পবিত্র।

পরম পবিত্র তিথি ভক্তি-স্বরূপিণী।
যঁহি অবতীর্ণ হইলেন দ্বিজমণি॥
নিত্যানন্দ-জন্ম মাঘী শুক্লা ত্রয়োদশী।
গৌরচন্দ্র-প্রকাশ ফাল্গুনী পৌর্ণমাসী॥
সর্ব্ব যাত্রা মঙ্গল এই দুই পুণ্যতিথি।
সর্ব্ব শুভলগ্ন অধিষ্ঠান হয় ইথি॥
এতেকে এই দুই তিথি করিলে সেবন।
কৃষ্ণভক্তি হয়, খণ্ডে অবিদ্যা-বন্ধন॥
ঈশ্বরের জন্ম-তিথি যে-হেন পবিত্র।
বৈষ্ণবের সেইমত তিথির চরিত্র॥

ঈশ্বরের আবির্ভাব-তিথির ন্যায় ভগবদ্ভক্তের আবির্ভাব-তিথিও পবিত্র। সেইহেতু তত্তদ্ দিবসে উৎসবাদি অবশ্য অনুষ্ঠেয়। শ্রীল সনাতন গোস্বামিপাদ স্বদীয় শ্রীশ্রীহরিভক্তিবিলাসে নির্দ্দেশ করিয়াছেন,—প্রতি বর্ষে শ্রাবণ মাসে রোহিণী বিশিষ্ট কৃষ্ণাষ্টমীর আগমন হয়। ঐ তিথি মানবগণের পক্ষে মুক্তিফল প্রদানকারিণী।

যস্যাং সনাতনঃ সাক্ষাৎ পুরাণঃ পুরুষোত্তমঃ।
অবতীর্ণঃ ক্ষিতৌ সৈষা মুক্তিদেতি কিমদ্ভুতম্॥

ইদমেব পরং শ্রেয় ইদমেব পরন্তপঃ ।
ইদমেব পরো ধর্ম্মো যদ্বিষ্ণুব্রতধারণম্ ॥ (হঃ ভঃ বিঃ ১৫।৩১১-৩১২)

ব্রহ্মপুরাণের পূর্ব্বখণ্ডে শ্রীশুক-জন্মেজয় সংবাদে—যখন প্রত্যক্ষ সনাতন পুরাণ পুরুষ হরি ঐ তিথিতে ভূতলে অবতীর্ণ হইয়াছেন, তখন ঐ তিথি যে মুক্তিদা, ইহাতে আর আশ্চর্য্য কি ? হরিব্রত-ধারণই পরম মঙ্গল, পরম তপস্যা, পরম ধর্ম্ম বলিয়া কীর্ত্তিত ।

শ্রীকৃষ্ণলীলার ব্যাসাবতার শ্রীমদ্ কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস শ্রীমদ্ভাগবতে ব্যাখ্যা দিয়াছেন,—

শ্রদ্ধালুর্মৎকথাঃ শৃণ্বন্ সুভদ্রা লোকপাবনীঃ ।
গায়ন্নুস্মরণ কর্ম্ম জন্ম চাভিনয়ন্ মুহুঃ ॥
মদর্থে ধর্ম্মকামার্থানাচরন্ মদপাশ্রয়ঃ ।
লভতে নিশ্চলাং ভক্তিং ময্যুদ্ধব সনাতন ॥ (ভাঃ ১১।২৩-২৪)

শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন—হে উদ্ধব ! শ্রদ্ধালু ব্যক্তি মদীয় মঙ্গলময় লোকপাবন চরিত-সমূহের শ্রবণ, কীর্ত্তন, অনুক্ষণ ধ্যান এবং পুনঃ পুনঃ জন্মসমূহের অভিনয় করিয়া আমার আশ্রিত হইয়া ধর্ম্ম, অর্থ, কামসকলের অনুষ্ঠান-সহকারে সনাতন পরম-পুরুষ আমার প্রতি ভক্তিলাভ করিয়া থাকেন ।

সাধু-শাস্ত্র-গুরুবাক্য প্রমাণানুযায়ী বৈষ্ণবগণ অস্মদীয় গুরুপাদপদ্ম পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্য ওঁ বিষ্ণুপাদ ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত বামন গোস্বামী মহারাজের আবির্ভাব-তিথি পৌষী-কৃষ্ণা নবমী-তিথিকে ভগবদাবির্ভাব-তিথির ন্যায় বিশেষ সম্মান প্রদর্শন করেন । অস্মদীয় পরম গুরুপাদপদ্ম নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী প্রভুবরের আবির্ভাব-তিথি মাঘী-কৃষ্ণা তৃতীয়া-তিথি এবং পরমেষ্ঠী গুরুপাদপদ্ম শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যাম্নায় নবমাধস্তনান্বয়বর শ্রীব্রহ্ম-মাধ্ব-গৌড়ীয়-সম্প্রদায়ৈক-সংরক্ষকপ্রবর নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের আবির্ভাব-তিথি মাঘী-কৃষ্ণা পঞ্চমী-তিথি এবং আম্নায়-পরম্পরাগত গুরুবর্গের ও মহাজনগণের আবির্ভাব-তিথিকে বৈষ্ণবগণ বিশেষভাবে সম্মানিত করেন এবং প্রতিপালন করেন ।

শ্রীশ্যামসুন্দর গৌড়ীয় মঠে শ্রীগুরুপূজা-মহোৎসব

প্রতি বৎসরের ন্যায় বর্ত্তমান বর্ষেও অস্মদীয় গুরুপাদপদ্ম ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তি-বেদান্ত বামন গোস্বামী প্রভুবরের একসপ্ততিতম শুভাবির্ভাব-তিথি উত্তরবঙ্গের শিলিগুড়ি-সহরস্থ শ্রীশ্যামসুন্দর গৌড়ীয় মঠে বিশেষ সমারোহে উদ্‌যাপিত

হইয়াছিল। এতদুপলক্ষে বহরমপুর, ইসলামপুর, শিবমন্দির প্রভৃতি স্থান হইতে শ্রীচৈতন্য মঠ, শ্রীগৌড়ীয় সঙ্ঘ এবং শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের বিশিষ্ট গৃহস্থ ভক্তগণ উপস্থিত হন।

অধিবাস-দিবসে অর্থাৎ ২৮।১২।৯১ তারিখে শ্রীমন্দির, তোরণদ্বার ও শ্রীগুরুপূজা-মণ্ডপ পূর্ণকুম্ভসহ কদলীবৃক্ষ, আম্রপল্লব, বিচিত্র বর্ণের রঙ্গীন কাগজের পতাকা ও পুষ্প প্রভৃতি মাঙ্গলিক দ্রব্যদ্বারা সুসজ্জিত করা হয়। সন্ধ্যা ৫ ঘটিকায় শ্রীগুরুবর্গের জয়ধ্বনিপূর্ব্বক শ্রীগুরু-মহিমা-মাহাত্ম্যসূচক মহাজন-পদাবলী কীর্ত্তন ও অধিবাস-কীর্ত্তন করত শ্রীগুরুপূজার সঙ্কল্প গ্রহণ করা হয়।

গত ১৩ই পৌষ ১৩৯৮, (ইং ২৯।১২।৯১) রবিবার শ্রীগুরুপূজা-দিবসে ব্রাহ্ম-মুহূর্ত্তে যথারীতি ভোর ৫ ঘটিকায় মঙ্গলারাত্রিকান্তে বিরাট নগরসঙ্কীর্ত্তন শোভাযাত্রা শিলিগুড়ি-সহরের বিভিন্ন রাজপথ পরিক্রমা করেন। নগর-পরিক্রমান্তে শ্রীনবদ্বীপ ব্রহ্মচারী বেলা ৯ ঘটিকায় "শ্রীশ্রীব্যাসপূজা-পদ্ধতিঃ" অনুসারে শ্রীগুরুপঞ্চক, ব্যাস-পঞ্চক প্রভৃতি পঞ্চকের পূজা করেন। তৎপরে শ্রীসমিতির অন্যতম প্রচারক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত ত্রিদণ্ডী মহারাজ শ্রীগুরুবর্গের শ্রীপাদপদ্মে পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করেন। অনন্তর পূজনীয় বৈষ্ণববৃন্দ, বিভিন্ন স্থান হইতে আগত গৃহস্থ ভক্তবৃন্দ ও উপস্থিত শ্রদ্ধালু নরনারী শ্রীগুরুপাদপদ্মে পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করেন।

পুষ্পাঞ্জলি অন্তে পরম পূজ্যপাদ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত ত্রিদণ্ডী মহারাজের সভাপতিত্বে এক মহতী ধর্ম্মসভার আয়োজন করা হয়। উক্ত সভায় শ্রীপাদ রামগোবিন্দ ব্রহ্মচারী এবং বিশিষ্ট গৃহস্থ ভক্তগণ শ্রীগুরুতত্ত্ব ও শ্রীব্যাসপূজা' সম্বন্ধে বক্তৃতা প্রদান করেন।

বেলা ১২ ঘটিকায় শ্রীবিগ্রহগণের বিশেষ ভোগরাগ ও আরতি সম্পন্ন হয়। আরাত্রিকান্তে আহূত, অনাহূত ও রবাহূত প্রায় সহস্রাধিক ব্যক্তিকে বিচিত্র মহাপ্রসাদ পরিবেশন করা হয়। সকলে মহাপ্রসাদ পাইয়া শ্রীগুরুবর্গ, ভগবান্ ও মহাপ্রসাদের জয়গান করিতে থাকেন।

সন্ধ্যায় আয়োজিত ধর্ম্মসভায় বিভিন্ন বক্তাগণ 'ব্যাসতত্ত্ব' ও 'গুরুতত্ত্ব' সম্বন্ধে আলোচনা করেন। তৎপরে বিগত বর্ষে শ্রীল গুরুদেবের উপস্থিতিতে অনুষ্ঠিত ব্যাসপূজার এবং অন্নকূট-মহোৎসবের ভি. ডি. ও. ক্যাসেট প্রদর্শন করান হয়। বহু ভক্তসমাগমে এই শ্রীগুরুপূজা-মহোৎসব সুষ্ঠুভাবে সুসম্পন্ন হয়।

শ্রীগুরুপাদপদ্মে প্রার্থনা রাখি, তিনি যেন এ অধমের প্রতি শুভদৃষ্টিপাত ও কৃপা করেন, যাহাতে আমি গুরু-বৈষ্ণব-ভগবানের সেবা করিয়া যাইতে পারি।

—শ্রীনবদ্বীপচন্দ্র দাস ব্রহ্মচারী

॥ শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ ॥

✻ স বৈ পুংসাং পরো ধর্ম্মো যতো ভক্তিরধোক্ষজে । ✻

ধর্ম্মঃ স্বনুষ্ঠিতঃ পুংসাং বিষ্বক্‌সেন-কথাসু যঃ ।

নোৎপাদয়েদ্যদি রতিং শ্রম এব হি কেবলম্ ॥

✻ অহৈতুক্যপ্রতিহতা যয়াত্মা সুপ্রসীদতি ॥ ✻

সেই ধর্ম্ম শ্রেষ্ঠ যাতে আত্ম-পরসন্ন ।
অধোক্ষজে অহৈতুকী ভক্তি বিঘ্নশূন্য ॥

অন্য ধর্ম্ম সংঠরূপে পালে যেই জন ।
হরি-কথায় রতি নৈলে পণ্ড সেই শ্রম ॥

৪৩শ বর্ষ — ২৫ মাধব, কারণোদশায়ী ৫০৫ শ্রীগৌরাব্দ — ২৯ মাঘ, বৃহস্পতিবার, ১৩৯৮, ইং ১৩/২/৯২ — ১২শ সংখ্যা

শ্রীশ্রীবৃন্দাবনাষ্টকম্

[শ্রীমদ্-রূপ-গোস্বামি-বিরচিতম্]

মুকুন্দ-মুরলীরব-শ্রবণ-ফুল্ল-হৃদ্বল্লবী-
কদম্বক-করম্বিত-প্রতিকদম্ব-কুঞ্জান্তরা ।
কলিন্দগিরিনন্দিনী-কমল-কন্দলান্দোলিনা
সুগন্ধিরনিলেন মে শরণমস্তু বৃন্দাটবী ॥ ১ ॥

শ্রীকৃষ্ণের মুরলী-রব-শ্রবণে উৎফুল্লচিত্তা গোপীগণকর্তৃক যাঁহার কদম্বাদি কুঞ্জমধ্যে পূরিত হইয়াছে এবং কলিন্দগিরি-নন্দিনী যমুনাদেবীর পদ্মবৃন্দ-সঞ্চালক-সমীরণদ্বারা যাঁহার সৌরভ সম্পাদিত হইতেছে, সেই বৃন্দাটবী অর্থাৎ বৃন্দারণ্য আমার আশ্রয় হউন ॥ ১ ॥

বিকুণ্ঠপুর-সংশ্রয়াদ্বিপিনতোঽপি নিঃশ্রেয়সাৎ
সহস্রগুণিতাং শ্রিয়ং প্রদুহতি রস-শ্রেয়সীম্ ।
চতুর্ম্মুখ-মুখৈরপি স্পৃহিত-তার্ণ-দেহোদ্ভবা
জগদ্গুরুভিরগ্রিমৈঃ শরণমস্তু বৃন্দাটবী ॥ ২ ॥

বৈকুণ্ঠপুর হইতেও অর্থাৎ পরব্যোমস্থিত নিঃশ্রেয়স হইতেও সহস্রগুণিত শ্রেয়ঃ (দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য, মধুর) রস-সম্পত্তি যিনি প্রদান করেন, জগদ্গুরু চতুর্ম্মুখ ব্রহ্মাও যে-স্থানের তৃণ-গুল্ম-লতাদিরূপ (হীন) জন্ম প্রার্থনা করেন, সেই বৃন্দাটবী আমার আশ্রয়ণীয়া হউন ॥ ২ ॥

অনারত-বিকস্বর-ব্রততিপুঞ্জ-পুষ্পাবলী-
বিসারি-বরসৌরভোদ্গম-রমা-চমৎকারিণী ।
অমন্দ-মকরন্দভূদ্বিটপিবৃন্দ-বন্দীকৃত-
দ্বিরেফকুল-বন্দিতা শরণমস্তু বৃন্দাটবী ॥ ৩ ॥

যিনি নিয়ত-পুষ্পিত লতাশ্রেণীর দূরগামী সৌরভদ্বারা লক্ষ্মীদেবীরও বিস্ময় সম্পাদন করিতেছেন এবং নিরতিশয় পুষ্পরস-বর্ষণশীল বৃক্ষগণে ভ্রমণকারী সমস্ত ভ্রমরবৃন্দও যাঁহাকে বন্দনা করিতেছেন, সেই বৃন্দাটবী আমার আশ্রয়ীভূতা হউন ॥ ৩ ॥

ক্ষণদ্যুতি-ঘন-শ্রিয়োর্ব্রজনবীনযূনোঃ পদৈঃ
সুবল্গুভিরলঙ্কৃতা ললিত-লক্ষ্ম-লক্ষ্মীভরৈঃ ।
তয়োর্নখরমণ্ডলী শিখর-কেলিচর্য্যোচিতৈ-
র্বৃতা-কিশলয়াঙ্কুরৈঃ শরণমস্তু বৃন্দাটবী ॥ ৪ ॥

যাঁহার সমূহ অবয়ব— সৌদামিনী ও জলধরের ন্যায় সম্মিলিত বৃন্দাবনের নবীন শ্রীরাধাগোবিন্দের অতি মনোহর ও ললিত বজ্রাঙ্কুশাদি-চিহ্নিত পদ-পঙ্‌ক্তিদ্বারা অঙ্কিত রহিয়াছে এবং সেই রাধাকৃষ্ণের নখরশ্রেণী অনুকারী কিশলয় ও অঙ্কুর-দ্বারাও যিনি পরিবৃতা, সেই বৃন্দাটবী আমার আশ্রয়ণীয়া হউন ॥ ৪ ॥

ব্রজেন্দ্রসখনন্দিনী-শুভতরাধিকার-ক্রিয়া-
প্রভাবজ-সুখোৎসব-স্ফুরিত-জঙ্গম-স্থাবরা ।
প্রলম্বদমনানুজ-ধ্বনিত-বংশিকা-কাকলী-
রসজ্ঞ-মৃগমণ্ডলা শরণমস্তু বৃন্দাটবী ॥ ৫ ॥

নন্দরাজের প্রিয়বন্ধু বৃষভানুরাজ-দুহিতা শ্রীরাধিকার অনুমতিবশতঃ

আনন্দোৎসব বৃদ্ধির জন্য বৃন্দা-সখী যে-স্থানের স্থাবর-জঙ্গম (বৃক্ষ-মনুষ্যাদি) উভয়বিধ প্রাণিদিগেরই উল্লাস সম্পাদন করিয়াছেন ও প্রলম্বারি বলদেবের অনুজ শ্রীকৃষ্ণ-বাদিত বংশীকাকলী-রসজ্ঞ মৃগমণ্ডল যে-স্থানে বিচরণ করিতেছে, সেই বৃন্দাটবী আমার আশ্রয়ীভূতা হউন ॥ ৫ ॥

অমন্দ-মুদিরার্ব্বুদাভ্যধিক-মাধুরী-মেদুর-
ব্রজেন্দ্রসুত-বীক্ষণোন্নটিত-নীলকণ্ঠোৎকরা।
দিনেশ-সুহৃদাত্মজাকৃত-নিজাভিমানোল্লস-
ল্লতা-খগ-মৃগাঙ্গনা শরণমস্তু বৃন্দাটবী ॥ ৬ ॥

ময়ূরগণ শ্রীকৃষ্ণের অভিনব জলধরের ন্যায় কান্তি দর্শনপূর্ব্বক যে-স্থানে কৌতূহল-সহকারে নৃত্য করিতেছে এবং সূর্য্যসুহৃদ্ বৃষভানুরাজ-নন্দিনী শ্রীরাধিকার আত্মভিমান অর্থাৎ "এই বৃন্দাটবী আমার"—এই প্রীতিসূচক বাক্যে লতা এবং মৃগ, পক্ষিগণ মিথুন হইয়া যে-স্থানে উল্লসিত হইতেছে, সেই বৃন্দাটবী আমার আশ্রয়ণীয়া হউন ॥ ৬ ॥

অগণ্যগুণ-নাগরীগণ-গরিষ্ঠগান্ধর্ব্বিকা-
মনোজ-রণ চাতুরী-পিশুন-কুঞ্জপুষ্পোজ্জ্বলা।
জগত্রয়-কলাগুরোর্ললিতলাস্য-বল্লৎপদ-
প্রয়োগবিধি-সাক্ষিণী শরণমস্তু বৃন্দাটবী ॥ ৭ ॥

অগণ্যগুণগ্রাম-সম্পন্না শ্রীরাধিকার মনোজ-রণ-চাতুরীকে যাঁহার কুঞ্জসকল সূচিত করিতেছে এবং যিনি ত্রিভুবনের প্রধান কলা-কৌশলের গুরু শ্রীকৃষ্ণের নৃত্য-কার্য্যে পদ-চালনার সাক্ষিস্বরূপা, সেই বৃন্দাটবী আমার আশ্রয়ীভূতা হউন ॥ ৭ ॥

বরিষ্ঠ-হরিদাসতা-পদসমৃদ্ধ-গোবর্দ্ধনা
মধূদ্বহবধূ-চমৎকৃতিনিবাস-রাসস্থলা।
অগূঢ়গহনশ্রিয়ো মধুরিম-ব্রজেনোজ্জ্বলা
ব্রজস্য সহজেন মে শরণমস্তু বৃন্দাটবী ॥ ৮ ॥

জনদুর্ল্লভ হরিদাসত্ব লাভ করিয়া গিরিরাজ গোবর্দ্ধন স্বয়ং যে-স্থানে বাস করিতেছেন, এবং মধুসূদন-বধূ গোপাঙ্গনাদিগের চমৎকারকারী রাসমণ্ডল যে-স্থানে স্থিত রহিয়াছে, সেই অপ্রকট-কাননশোভা-বিধায়ক বৃন্দাবনের মাধুর্য্যকুলদ্বারা উজ্জ্বলকান্তি বৃন্দাটবী স্বভাবতঃ আমার আশ্রয়ণীয়া হউন ॥ ৮ ॥

ইদং নিখিল-নিষ্কুটাবলিবরিষ্ঠ-বৃন্দাটবী-
গুণস্মরণকারি যঃ পঠতি সুষ্ঠু পদ্যাষ্টকম্।
বসন্ ব্যসন-মুক্তধীরনিশমত্র সদ্বাসনঃ
স পীতবসনে বশীরতিমবাপ্য বিক্রীড়তি॥ ৯॥

নিখিল্ বনশ্রেষ্ঠ বৃন্দাটবী-গুণ-স্মরণকারী এই পদ্যাত্মক মনোহর অষ্টক যিনি সুষ্ঠুভাবে পাঠ করেন, তিনি সমূহ দুঃখ হইতে মুক্ত হইয়া এবং সর্ব্বশুভ-কামনায় সিদ্ধিলাভ করিয়া পীতাম্বর শ্রীকৃষ্ণে লব্ধানুরাগপূর্ব্বক সুখে বিহার করেন॥ ৯॥

প্রশ্নোত্তর

(গৌড়ীয় পূর্ব্বাচার্য্যগণের বৈশিষ্ট্য)

৪৮। শ্রীশ্রীজীবগোস্বামী প্রভুর বৈশিষ্ট্য কি ?

শ্রীশ্রীজীবগোস্বামীর নাম শুনিবা-মাত্রই বৈষ্ণব-হৃদয় আনন্দে নৃত্য করিতে থাকে। * * শ্রীজীবগোস্বামী শ্রীরূপের নিকট সমস্ত ভক্তিশাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। কিছুদিনের মধ্যে তত্ত্ব-শাস্ত্রে গৌড়ীয়-সম্প্রদায়ে শ্রীজীবগোস্বামী একমাত্র আচার্য্য বলিয়া গৃহীত হইলেন। তদবধি শ্রীজীবগোস্বামী শ্রীবৃন্দাবন-ধাম পরিত্যাগ করেন নাই। সেই দীর্ঘকালের মধ্যেই শ্রীজীবগোস্বামী পঞ্চবিংশতি সংখ্যক গ্রন্থ রচনা করেন। * * বেদান্তদর্শন-বিদ্যায় শ্রীজীবের ন্যায় তৎকালে আর কেহ ছিলেন না। কথিত আছে যে, **শ্রীবিষ্ণুস্বামি-সম্প্রদায়ের আচার্য্য শ্রীবল্লভ নিজ-কৃত তত্ত্বদীপ-গ্রন্থ শ্রীজীবকে দেখাইয়াছিলেন। তাহাতে শ্রীজীব গোস্বামী অনেক বৈদান্তিক বিচার উত্থাপন করত তাঁহার মতের অসৌন্দর্য্য প্রদর্শন করান। বল্লভাচার্য্যও শ্রীজীবের পরামর্শ-মতে ঐ গ্রন্থের অনেকটা সংশোধন করেন।** * * শ্রীজীবের ষট্সন্দর্ভ-গ্রন্থ জগতে একটী রত্নবিশেষ। ষট্সন্দর্ভ ভালরূপে বুঝিতে পারিলে কোন বেদান্ত-বিচারই অজ্ঞাত থাকে না।"

—'শ্রীশ্রীজীব গোস্বামী প্রভু', সঃ তোঃ ২।১২

৪৯। শ্রীগোপালভট্ট গোস্বামী প্রভুর চরিত্রের বৈশিষ্ট্য কি ?

"গোপালভট্ট গোস্বামী বাল্যকাল হইতেই বৈষ্ণব-ধর্ম্মানুরাগী ছিলেন। তিনি স্বীয় খুল্লতাত পরিব্রাজকাচার্য্য শ্রীপ্রবোধানন্দ সরস্বতীর নিকট যথানিয়মে বেদ-বেদান্তাদি-শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। যৎকালে শ্রীশ্রীমচ্চৈতন্যমহাপ্রভু দাক্ষিণাত্য-

বাসিগণকে কৃপা বিতরণ করিবার জন্য গমন করেন, সেই সময় গোপালভট্টের সহিত তাঁহার সম্মিলন হয়। গোপালভট্ট মহাপ্রভুকে দর্শন করিয়া তাঁহার শ্রীচরণারবিন্দে শরণ গ্রহণ করিয়াছিলেন। কৃপাময় মহাপ্রভু গোপালভট্টকে বিশেষ কৃপাপূর্ব্বক শক্তি সঞ্চার করেন। সেই শক্তিগুণে গোপালভট্ট গৃহ পরিত্যাগ করিয়া শ্রীবৃন্দাবনে গমন করত শ্রীমদ্ রূপাদির সহিত সম্মিলিত হইয়া শ্রীবৃন্দাবনের লুপ্ত-তীর্থ-উদ্ধার ও **ভক্তিস্মৃতি** প্রভৃতি অনেকানেক গ্রন্থ প্রণয়ন করেন এবং শ্রীমদ্ রূপগোস্বামী প্রভুর আদেশক্রমে শ্রীবৃন্দাবনে শ্রীশ্রীরাধারমণের সেবা প্রকাশ করেন।"

—'শ্রীশ্রীগোপালভট্ট গোস্বামী প্রভু,' সঃ তোঃ ২।৭

৫০। শ্রীজাহ্নবাদেবী কি তত্ত্ব? তিনি বৈষ্ণব জগতের কি কার্য্য করিয়াছেন?

"শ্রীশ্রীমতী জাহ্নবাদেবীর জন্মোৎসব। ঐ দিন শ্রীশ্রীচৈতন্যচরণ-পরায়ণ মহাভাগবতদিগের আনন্দের দিন। **আনুমানিক ১৪০৯।১০ শকে জাহ্নবাদেবী অম্বিকা কালনাস্থ মহাপ্রভুর প্রিয়পাত্র শ্রীসূর্য্যদাস পণ্ডিতের সৌভাগ্যশালিনী ভদ্রাবতী নাম্নী পত্নীর গর্ভ হইতে আবির্ভূতা হয়েন।** উপযুক্ত সময়ে শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ-প্রভু সর্ব্বগুণসম্পন্না জাহ্নবার ও তদীয় জ্যেষ্ঠা সহোদরা শ্রীমতী বসুধাদেবীর যথাবিধি পাণিগ্রহণ করেন। * * * **জাহ্নবাদেবী আনুমানিক ১৪৬৫ শকে শ্রীবংশীবদনানন্দ পুত্র শ্রীচৈতন্যাত্মজ রামচন্দ্রকে পাল্যপুত্র গ্রহণান্তর দীক্ষা প্রদান করেন। প্রভু নিত্যানন্দ-শক্তি সাক্ষাৎ আনন্দমঞ্জরী জাহ্নবাদেবী** যে-সকল অদ্ভুত কার্য্য করিয়াছেন, তাহা বৈষ্ণব-মণ্ডলীর প্রায় অবিদিত নাই।" —'শ্রীজাহ্নবাদেবী', সঃ তোঃ ২।৪

৫১। শুদ্ধভক্তি সাহিত্য-সাম্রাজ্যের আদি-কবি-সম্রাট্ কে?

"ঠাকুর বৃন্দাবনদাস কেবল বৈষ্ণব-জগতের রত্ন নন, তিনি বঙ্গীয় সাহিত্য-সমাজের একটী অলঙ্কার-স্বরূপ। ইংরাজী ভাষায় যেরূপ চসার (Chaucer) নামক কবির সম্মান আছে, বঙ্গীয় ভাষায় ঠাকুর বৃন্দাবনদাসেরও তদ্রূপ হওয়া প্রয়োজন। প্রকৃতপ্রস্তাবে ঠাকুর বৃন্দাবনের পূর্ব্বে আর কেহ বঙ্গভাষায় শুদ্ধভক্তির পদ্য-গ্রন্থ রচনা করেন নাই। *** বৃন্দাবনদাস ঠাকুর যে ব্যাসদেবের অবতার, তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। তাঁহার সাধ্বী জননী সমস্ত বৈষ্ণবেরই পূজনীয়া।" —'শ্রীশ্রীবৃন্দাবন দাস ঠাকুর', সঃ তোঃ ২।২

৫২। শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী প্রভু কি জগন্মঙ্গল বিধান করিয়াছেন?

"কবিরাজ গোস্বামী সর্ব্বশাস্ত্রজ্ঞ ছিলেন। ইহা তৎকৃত 'শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত',

'শ্রীগোবিন্দলীলামৃত' ও 'শ্রীশ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃতে'র "সারঙ্গ-রঙ্গদা" টীকা পাঠে সুন্দররূপে উপলব্ধি হইয়া থাকে। * * শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভু চৈতন্য-সম্প্রদায়ের মধ্যে একজন প্রধান পণ্ডিত ও পরমভক্ত ছিলেন। এই বাক্য সপ্রমাণ করিতে আমাদিগের চেষ্টা করার কোন আবশ্যকতা করে না। কবিরাজ গোস্বামীর গ্রন্থাবলীই তাহার সুন্দর প্রমাণ। অপার-মহিম কবিরাজের দয়া দেখিলে বিমোহিত হইতে হয়। তিনি সংস্কৃত-শাস্ত্রজ্ঞানবিহীন জনগণের প্রতি করুণা প্রকাশ করিয়া কি সুন্দর শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন! আমাদের বিবেচনায় যদি কবিরাজ-প্রভু ঐ প্রকার করুণা প্রকাশ না করিতেন, তাহা হইলে দর্শনাদি-শাস্ত্রজ্ঞান-পরিশূন্য মনুষ্যগণ শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভুর উপদিষ্ট সনাতন-বৈষ্ণব-মত জানিতে পারিতেন না এবং তাঁহাদের গতি যে কি হইত, তাহাও বলা যায় না। ধন্য কবিরাজ! তুমি বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ভুক্ত পণ্ডিত ও মূর্খ উভয়কেই ঋণী করিয়া রাখিয়াছ। তোমার গুণ আমরা একমুখে কত গান করিব? শুদ্ধ বৈষ্ণব জগৎ তোমার গুণ সর্ব্বদাই গান করিতেছেন। কবিরাজ! তোমার সিদ্ধ-বাক্য স্মরণ করিলে কোন্ পাষণ্ড তোমার চরণ আশ্রয় করিতে না চাহে? তুমি চরিতামৃতে বলিয়াছ যে,—"যদি বা না জানে কেহ, শুনিতে শুনিতে সেহ" ইত্যাদি তোমার এই সিদ্ধ-বাক্যগুণেই এই বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ভুক্ত (তথাকথিত) বহু মূর্খের চরিতামৃতে উত্তম অধিকার দেখা যাইতেছে। তোমার চরণে অসংখ্য প্রণাম।"

—'শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী', সঃ তোঃ ২।১০-১১

৫৩। শ্রীশ্রীনিবাসাচার্য্য প্রভু গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-জগতের কি উপকার করিয়াছেন?

"শ্রীনিবাস বাল্যকালে শ্রীচৈতন্য-মহাপ্রভুর চরণাশ্রিত স্বীয় পিতার মুখে মহাপ্রভুর গুণ-গান শ্রবণ করিয়া তাঁহার শরণাগত হন এবং যৌবনাবস্থা প্রাপ্তিতেই তিনি পিতা-মাতার আদেশ লইয়া বৈরাগ্যাশ্রম গ্রহণ করেন। শ্রীনিবাসাচার্য্য বৈরাগ্য-পথে পদার্পণ করিয়া সর্ব্বাগ্রে শ্রীশ্রীনবদ্বীপ-ধামে মহাপ্রভুর শক্তি শ্রীশ্রীমতী বিষ্ণুপ্রিয়া ঠাকুরাণীকে ও তাঁহার রক্ষক মহাপ্রভুর অন্তরঙ্গ শ্রীশ্রীবংশীবদনানন্দ প্রভুকে এবং মহাপ্রভুর লীলাস্থান-সকল দর্শনাভিলাষী হইয়া শ্রীনবদ্বীপ-ধামে আগমন করেন। শ্রীনিবাস নবদ্বীপে আগমন করিয়া শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া-মাতার মন্দিরে কয়েকদিবস অবস্থান করিয়া বংশীবদনানন্দের নিকট মহাপ্রভুর লীলা-কথা শ্রবণ ও তাঁহার লীলা-স্থান সমস্ত দর্শন করেন। তদনন্তর বিষ্ণুপ্রিয়া ও বংশীর নিকট বিদায় গ্রহণপূর্ব্বক দ্বাদশ পাট এবং চৈতন্য-ভক্ত-বিরাজিত অন্যান্য পাটসকল দর্শন করেন। এইরূপ কিছুদিন ভক্তমণ্ডলীর সহিত সাক্ষাৎকারাদি করিয়া তিনি

শ্রীপুরুষোত্তম-ধাম গমন করেন। * * * শ্রীনিবাস পুরুষোত্তম হইতে গৌড়মণ্ডলে প্রত্যাগমন করিয়া কিছুদিন অবস্থিতি করেন। তৎপরে শ্রীবৃন্দাবন-ধাম দর্শনার্থ যাত্রা করিলেন। শ্রীনিবাস ব্রজধামে উত্তীর্ণ হইয়া গোস্বামী প্রভুদিগের সংযোগে ব্রজপুর-দর্শন ও নিত্য নব-নব ভাবোপভোগ করিতে লাগিলেন। এই নিয়মে বহুদিন ব্রজে অবস্থান করিয়া চিন্তামণি-ভূমি গৌড়মণ্ডলে প্রত্যাগমনপূর্ব্বক দুর্ম্মতি লোকসকলকে উদ্ধার করেন।" —"শ্রীনিবাসাচার্য্য প্রভু', সঃ তোঃ ২।১০-১১

—জগদ্গুরু শ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুর

বাস্তব-বস্তু

শ্রীমদ্ভাগবত বলেন,—বাস্তব-বস্তুর বিজ্ঞানই পরমধর্ম্ম, নতুবা বস্তু-বিষয়ের আলোচনায় নানা ভ্রম প্রবেশ করিবে। বাস্তব-বস্তুর দুইপ্রকার শক্তি—চিচ্ছক্তি ও মায়া। মায়া-শক্তিকে আশ্রয় করিয়া যাঁহারা বৈকুণ্ঠ-শক্তির পরিচয়-গ্রহণে অসমর্থ, তাঁহারা জড়-নির্ব্বিশেষবাদকেই বাস্তব-বস্তু বলিয়া ভ্রম করেন। তাঁহাদের বেদ্য-বস্তু অবাস্তব-বস্তু মাত্র। বস্তুধর্ম্ম ও বস্তুর শক্তিধর্ম্মে যে ভেদ আছে, সেই ভেদের আলোচনার অভাবে চিচ্ছক্তির সহিত মায়াশক্তিকে অভেদ বলিয়া বিচার করিয়া থাকেন। শক্তিকর্ত্তৃকই পরিমিতি হয়; শক্তি-পরিণত ব্যাপার-সমূহই প্রমেয়। বস্তু প্রমিত হইবার অযোগ্য—এই প্রকার ধারণা অচিচ্ছক্তি-পরিণতি-বিচারে জড়তারই অন্তর্গত। উহাতে চিচ্ছক্তি অবিমিশ্রভাবে ক্রিয়াবতী নহে।

খণ্ডিত পদার্থ খণ্ডজ্ঞানের আরাধ্য; কিন্তু অদ্বয়জ্ঞানে যে বস্তু-বৈচিত্র্য লক্ষিত হয়, তাহা চিচ্ছক্তি-পরিণতি হইতে হইয়া থাকে,—এ কথা জড়-প্রমেয়বাদীর বোধগম্য বিষয় নহে। তাঁহার অভিজ্ঞতায় জাড্য উপস্থিত হওয়ায় জড়তা-ধর্ম্মবশে শক্তিবিজ্ঞানে তাঁহার দারিদ্র্য আসিয়া উপস্থিত হয়। এজন্যই মায়াবাদী ভগবজ্-জ্ঞানস্বরূপ বস্তুর শক্তি-পরিণত বিবিধ প্রকাশভেদকে সমপর্য্যায়ে গণনা করেন। চিচ্ছক্তি-পরিণাম ও অচিচ্ছক্তি-পরিণামের মধ্যে অভেদ-বিচার স্থাপন করিতে গিয়া মায়াবাদী অবাস্তব-বস্তুর পরিচয়গুলিকে 'মিথ্যা' প্রভৃতি সংজ্ঞায় গণনা করেন।

শক্তিস্বরূপ ও বস্তুস্বরূপে বৈচিত্র্যদর্শনে সমর্থ হইলেই বিজ্ঞান-সমন্বিত ভগবজ্‌জ্ঞান-রহস্য ও অঙ্গের পরিচয় দিতে সমর্থ হয়। নতুবা নিরঙ্গ ও বহিঃপ্রজ্ঞা উক্ত রহস্যভেদে অথবা বিজ্ঞানবোধে স্বীয় দৌর্ব্বল্য প্রকাশ করে। এই দুর্ব্বলতার ফলে জীব মৎসরধর্ম্মে অবস্থিত হয়।

মৎসর-ধর্ম্মের বৈশিষ্ট্য এই যে, তাহাতে কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ ও মদ স্ব-স্ব বিক্রম প্রদর্শন করিয়া মৎসররাজের পূজায় যাজ্ঞিকের সজ্জা প্রদর্শন করে। সেইকালে অবাস্তব-বস্তুকে বিকারবাদ বা আরম্ভবাদের সমশ্রেণীস্থ করিবার যত্ন করে। তৎফলে স্বীয় বদ্ধাভিমান মুমুক্ষুতা-ধর্ম্মে আত্মপ্রকাশ করে এবং তদ্বিপরীত ধর্ম্মকেই ধর্ম্ম, অর্থ ও কামরূপ ভোগে আবৃত করায়। সেইকালে পরমধর্ম্ম তাঁহার নিকট দুর্জ্ঞেয় হয় বলিয়াই বিজ্ঞান-সমন্বিত সরহস্য সাঙ্গের পরিচয় রহিত নির্ব্বিশিষ্ট বিচার তাঁহার চেতনধর্ম্মকে বিরাম লাভ করায়। তিনি ভাগবতধর্ম্ম হইতেই মনোধর্ম্মী হইয়া নানাপ্রকার কল্পনার জড়তায় আত্মবোধ-রহিত হইয়া পড়েন। আত্মবোধ-রাহিত্যেই তাঁহাকে স্থূল ও সূক্ষ্ম নিগড়দ্বয় উহাদের স্ব-স্ব শক্তিদ্বারা আবরণ করিয়া ফেলে। অবরধর্ম্ম গ্রহণ করায় তাঁহার নিত্য পরমধর্ম্মের প্রতি ঔদাসীন্য আসিলেই তাহা চতুর্ব্বর্গাভিলাষকেই মুমুক্ষা ও বুভুক্ষা-বৃত্তিতে স্থাপন করে।

বদ্ধজীবের জ্ঞাতৃত্বাভিমান জ্ঞেয়-সাপেক্ষ ও জ্ঞানাধীন। তজ্জন্যই তিনি মুমুক্ষাকে নৈসর্গিক বৃত্তি বলিয়া স্থির করেন। মুমুক্ষু আত্ম-পরিচয়ে ন্যূনাধিক বিস্মৃত হইলেই বুভুক্ষা আসিয়া তাঁহার স্বধর্ম্মের বিপর্য্যয় করায়।

জড়-নির্ব্বিশেষবাদে বিজ্ঞানের অভাবে অনুদ্‌ঘাটিত-রহস্য-জন্য নিরঙ্গত্বের কল্পনাই অঙ্গি-পুরুষোত্তমকে জড়চিন্তায় স্থাপন করে। তখন তিনি চিচ্ছক্তি ও অচিচ্ছক্তির বৈশিষ্ট্যের অভাব আছে, ঐরূপ ভ্রান্ত ধারণায় কবলিত হন। ভগবদনুশীলনের অভাবে প্রতিকূল অনুশীলনে গা ভাসাইয়া জড়স্রোতে স্বীয় জাড্যকেই নির্ব্বিশেষ-ভাবের চরম পরিণতি বলিয়া বিশ্বাস করেন। তাদৃশ বিশ্বাস-ফল আত্মবিনাশ করে; সুতরাং তিনি তমোগুণের বশীভূত হইয়া মায়াবাদী হইয়া পড়েন।

ভগবজ্‌জ্ঞানই বাস্তব-বস্তু-বিজ্ঞান ও রহস্য ভেদ করিয়া শক্তি-পরিণামগত অঙ্গের পরিচয় দিয়া থাকে, সেইকালে ভগবানের বহিরঙ্গা শক্তি ও ভগবানের অন্তরঙ্গা শক্তি অর্থাৎ অচিৎ ও চিচ্ছক্তির বৈশিষ্ট্য উপলব্ধির বিষয় হয়।

চিচ্ছক্তির প্রাবল্যে রজস্তমঃসত্ত্ব-গুণত্রয়ের হস্ত হইতে নির্গুণতা লাভ করিলেই সচ্চিদানন্দ-বস্তু জ্ঞেয়রূপে প্রকাশিত হন। হ্লাদিনী, সন্ধিনী ও সম্বিৎ-শক্তিত্রয়, ভগবৎপ্রকাশসমূহ ও তদেকাত্মতার বিচিত্রতা মুক্ত জ্ঞানের জ্ঞেয় পদার্থরূপে বাস্তব-বস্তু-বিজ্ঞান সাঙ্গরহস্যের সহিত জড়নির্ব্বিশেষ বা প্রমিতিকরণরূপ জড়োন্মুখী বাচালতা জীবের ভক্তিধর্ম্মের ব্যাঘাতকারিণী হয়। চিচ্ছক্তি-পরিণতিতে যে সচ্চিদানন্দ-শক্তিত্রয়ের বিকাশ আছে, তাহাতে অনিত্য গুণত্রয়ের দ্বারা স্বরূপ আবৃত

হয়। অবিদ্বৎ-প্রতীতি সেই কালে বিদ্বান্ কৃষ্ণদ্বৈপায়নের রচিতা সাত্বত-সংহিতার অনুশীলনে বাধা দেয়।

অনিত্য একের উপর অপরে প্রভুত্ব করিয়া অংশীদারগণকে বিদায় দেওয়ারূপ অবরতা সচ্চিদানন্দ বাস্তব-বস্তুর শক্তির প্রকাশত্রয়কে বাধা দিতে পারে না। গুণজাত জগতে অভিজ্ঞতার একগুণ অপর গুণদ্বয়ের উপর আধিপত্য বিস্তার করিয়া অল্পকালের জন্যই বিক্রম প্রকাশ করে। বিক্রমের আয়ুর অল্পতা-নিবন্ধন অপর গুণের প্রাধান্য স্বীকার করিতে গেলেই কালক্ষোভ্য-ধর্ম্মের অবরতা অনুভূত হয়। হ্লাদিনী, সন্ধিনী ও সম্বিৎ-শক্তিত্রয়ের পূর্ণতাহেতু প্রকৃতির বিভাগত্রয়ের হেয়তা বা অপ্রয়োজনীয়তা অনর্থ উৎপাদন করায়।

অর্থের ত্রিবিধ প্রকাশ পরস্পর প্রতিযোগী নহে। কিন্তু গুণত্রয় প্রতিযোগিতা-ধর্ম্মে আবদ্ধ থাকায় দমন, বিনাশ, আঘাত, নিহনন প্রভৃতি ক্রিয়াগুলির তাৎকালিকতা উৎপাদন করায়। সচ্চিদানন্দের প্রাকট্যে গুণত্রয়ের অন্ধকার স্থান পরিত্যাগ করিয়া নিজ নিজ অস্তিত্ব গোপন করে। বাস্তববস্তু-বিজ্ঞানের দ্বারাই পূর্ণপ্রজ্ঞতা জীবকে বুভুক্ষা ও মুমুক্ষা-ধর্ম্ম হইতে অবসর দেয়। এইজন্যই কৈতব-পরিহার সর্ব্বতোভাবে অনুষ্ঠিত না হইলে পরমধর্ম্ম-বিষয়ের ধারণা অবিমিশ্র মুক্ত-পুরুষের প্রাপ্য-বিধয় হয় না। নতুবা অপস্মৃতি আসিয়া বাস্তববস্তু-বিজ্ঞানের দ্বারা অর্থাৎ স্থূল-সূক্ষ্ম দেহদ্বয় জ্ঞেয়-পদার্থের স্থান অধিকার করে। বাস্তব-দেহের স্মরণ-শূন্য অবস্থাই অপস্মৃতি।

—জগদ্গুরু শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর

শ্রীল প্রভুপাদের আবির্ভাব-বাসরে

বিরহ-স্মৃতি

[পূর্ব্বপ্রকাশিত ৪৩শ বর্ষ, ১১শ সংখ্যা, ৪১৫ পৃষ্ঠার পর]

আচার্য্যের নির্য্যাণ-লীলা

শ্রীল প্রভুপাদ যখন দেখিতে পাইলেন—তাঁহার সেবিকাভিমানী এহেন দুর্জ্জন দম্ভে পরিপূর্ণ হইতে লাগিল, প্রতি পদে, প্রতি মুহূর্ত্তে আমার চিত্ত ক্রমশঃ তাঁহার সহিত সমজ্ঞান করিতে করিতে তাঁহারই আসন গ্রহণের জন্য ব্যস্ত হইয়া উঠিল, তখনই মাদৃশ নিত্যবদ্ধ প্রস্তরতুল্য কঠিন, অভ্রের ন্যায় অদাহ্য, অগ্নিতুল্য শুষ্ক

চিত্তবৃত্তি-বিশিষ্ট পাপিষ্ঠকে শিক্ষা দিবার জন্য বজ্রাপেক্ষা কঠিন, অগ্নি অপেক্ষাও দহনশক্তি-বিশিষ্ট আকস্মিক এক মহা নিদারুণ লীলা আবিষ্কার করিলেন। শ্রীল প্রভুপাদ তাঁহার লীলা-সংগোপনের অব্যবহিত পূর্ব্বে ১৯৩৬ খ্রীষ্টাব্দে যখন তাঁহার আবির্ভাব-ক্ষেত্র শ্রীপুরীধামে চটকপর্ব্বতে পুরুষোত্তম মঠে অবস্থান করিতেছিলেন, তখন তিনি আমার বিমুখতা দেখিয়া আমাকে বলিয়াছিলেন,—"আমার কথা আর কেহ বুঝিতেছে না, কেহ গ্রহণ করিতেছে না। সুতরাং **এ জগতে থাকা আর প্রয়োজন নাই—চলিয়া যাওয়াই ভাল।**" তখন তাঁহার করুণার কথা বুঝিতে না পারিয়া প্রতিবাদ করিয়াছিলাম। আমার দুর্ভাগ্য, তাই তিনি ১৩৪৩ সালের ১৬ই পৌষ বৃহস্পতিবার নিশান্তে হঠাৎ বজ্রাঘাত করিলেন। তিনি আমাকে অহং-গ্রহোপাসক ও ভোগী দেখিয়া "বৈরাগ্যযুগ্ ভক্তিরস" শিক্ষা দিবার জন্য 'সন্ন্যাস-বেশ' গ্রহণ করিতে বহুবার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিলেন। আমার দুর্ভাগ্যবশতঃ তখন তাহা ঘটিয়া উঠে নাই। তাই তিনি আমার দৈহিক ও দেহে আত্মবুদ্ধি-বিনাশপর বৈরাগ্য শিক্ষার জন্যই নির্য্যাণ-লীলা প্রদর্শন করিলেন। শ্রীগৌড়ীয়-বেদান্তাচার্য্য শ্রীল বলদেব বিদ্যাভূষণ প্রভু তাঁহার স্বকৃত সিদ্ধান্তরত্নাখ্য ভাষ্যপীঠকের প্রথমপাদের শেষে ভাগবতের ঋষভদেবের নির্য্যাণ-প্রসঙ্গ বিচারকালে "সাম্পরায়বিধিরপি প্রাতীতিক্যেব তাবতৈব তদাবেশপরিক্ষয়াৎ" বাক্যের টিপ্পনীতে লিখিয়াছেন,—"সাম্পরায়বিধির্দেহত্যাগপ্রকারঃ। তাবতৈবেতি। প্রাতীতিকেন তাদৃশানাং দেহত্যাগেন শুশ্রূষূণাং (শিষ্যাণাং) নৃণাং দেহাবেশত্যাগাদিত্যর্থঃ।" অর্থাৎ ঋষভদেব সাক্ষাৎ ভগবান্ হইলেও তিনি পারমহংস্য-ধর্ম্মানুকরণ করেন। তাহাতে তাঁহার দেহত্যাগাদি লীলা—তাঁহার শিষ্য বা সেবকগণের দেহাসক্তি ত্যাগ করাইবার জন্যই জানিতে হইবে।

নির্য্যাণে প্রবোধ-বাক্য

গুরুপ্রেষ্ঠগণ আমাকে প্রবোধ দিবার জন্য শ্রীভাগবতের একাদশ স্কন্ধের একত্রিংশৎ অধ্যায়ে শ্রীহরির নির্য্যাণ-প্রসঙ্গে ব্যাসসূনু শ্রীশুকদেবের উক্তিসমূহ জানাইয়াছেন,—

"রাজন্ পরস্য তনুভৃজ্জননাপ্যয়েহা,
মায়াবিড়ম্বনমবেহি যথা নটস্য।" (ভাঃ ১১।৩১।১১)

আচার্য্যদেবের চিদানন্দময় নিত্যদেহ নট-পুরুষের ন্যায় স্বরূপতঃ অবিকৃত থাকিয়াই জাগতিক রঙ্গমঞ্চে আমাদের জ্ঞানেন্দ্রিয়-গ্রাহ্য জন্ম-মরণাদির অভিনয় করিয়াছেন। সাধারণ জীবের জন্ম-মরণাদি দুঃখময়, কিন্তু অতিমর্ত্ত্য আচার্য্যের

চিন্ময় বিগ্রহের আবির্ভাব-তিরোভাবাদি সুখময়। ঐন্দ্রজালিক দর্শকবৃন্দের (বিস্ময় উৎপাদনের জন্য তাহাদের) সমক্ষেই একটী লোককে অস্ত্রদ্বারা আঘাত করিয়া হত্যা করিতে দেখা গেলেও তাহা সর্ব্বৈব মিথ্যা মনে করিয়া বিজ্ঞগণ তাহার জন্য অনুতাপ ভোগ করেন না। কিন্তু অজ্ঞ বালকগণ তাহা দেখিয়া ক্রন্দন করিয়া থাকে। আচার্য্যের এই নিদারুণ অপ্রকট-লীলা সে-প্রকার হইলেও আমার ন্যায় অজ্ঞ তাহাতে অবিশ্বাস করিয়া সান্ত্বনা লাভ করিতে পারে নাই। তাই তাঁহার এই লীলা সুখময়ী হইলেও আমার নিকট অতীব দুঃখময়ী হৃদয় বিদারক বলিয়া প্রতীতি হইতেছে। গুরুদাসগণ ইহাতে বিরহানুতপ্ত হইলেও আমার তাহাতে শূদ্রের ন্যায় শোকই হইতেছে। আপনাদের নিকট শ্রবণ করিয়াছি, বিচ্ছেদ বা বিরহ সেবা-সৌষ্ঠব বর্দ্ধিত করে এবং উদ্দীপনের বস্তুসকল নয়নপথে আসিলেই উত্তরোত্তর সেব্যের প্রতি আসক্তি দৃঢ়তর হয়। তাহাতে সেব্যের আনন্দের প্রচুর পরাকাষ্ঠাই লক্ষ্য করা যায়। আর শোকে বদ্ধজীব অভিভূত হইয়া নিস্তেজ হইয়া পড়ে—শক্তি-সামর্থ্য লোপ পায়—কাতর হইয়া পড়ে এবং সেবার (?) অভাব-হেতু তাহার আনন্দবর্দ্ধনরূপ কোন ক্রিয়াই দৃষ্ট হয় না। তাই আমি অজ্ঞ মূঢ়ের ন্যায়—শূদ্রের মত শোকে অভিভূত হইয়া পড়িয়াছি। আমার কোনরূপ উৎসাহ হইতেছে না। "হৃষীকেণ হৃষীকেশ-সেবনং" আমার পক্ষে দুরূহ হইয়া পড়িল।

আচার্য্যের ভক্ত-বাৎসল্য

শ্রীল প্রভুপাদের আবির্ভাব-তিথিতে তাঁহার তিরোভাবের কথাই সর্ব্বদা মনে উঠিতেছে। তাই হরিষে বিষাদ গণিতেছি। মঙ্গলময় শ্রীল প্রভুপাদ আমার এইপ্রকার দুরবস্থা দর্শন করিয়া আমাকে উৎসাহিত করিবার জন্যই প্রতিবৎসর বিরহ-তিথি অতিক্রম করিয়াই পুনঃ প্রকট-তিথি প্রদর্শন করিতেছেন। তাঁহার প্রেষ্ঠগণের ভিতর দিয়াই তাঁহার পুনর্দর্শন লাভ করিবার আশায় আপনাদের পাদপদ্মে আসিয়া উপনীত হইয়াছি। মিলন না হইলে হৃদয়ের তীব্র যাতনার অবসান হয় না। তাই শ্রীল প্রভুপাদ ভক্তগণকে কৃপা করিয়া তাঁহাদের বিরহ-কাতরতায় সান্ত্বনা দিবার জন্যই অপ্রকটকালের অনতিকাল পরেই প্রকট-লীলা প্রদর্শন করিলেন। ইহা তাঁহার যে কত বড় দয়া ও ভক্ত-বাৎসল্যের পরিচয়, তাহা ভাষা বর্ণন করিতে অক্ষম।

আচার্য্যের শ্রীধামে আগমন

আমাদের মধ্যে বাণীর অনাদর আশঙ্কা করিয়া অভিমানভরে শ্রীল প্রভুপাদ তাঁহার নিত্যপ্রিয় রাধাকুণ্ড-তীরে চলিয়া আসিবার মানসে গভীর তুষ্ণীম্-ভাব

অবলম্বন করিয়াছিলেন। বিষ্ণুদূত বৈষ্ণবগণ তাঁহার অন্তরুদ্দেশ্য বুঝিতে পারিয়া তাঁহাকে মস্তকে ধারণ করিয়া বহুপ্রকোষ্ঠ-সমন্বিত একটী বিশিষ্ট সুসজ্জিত রথে* আরোহণ করাইয়াছিলেন। প্রভুপাদ সর্ব্বাপেক্ষা উচ্চ ও সুন্দর প্রকোষ্ঠে তাঁহার প্রিয় সেবকগণসহ প্রবেশ করিলে অন্যান্য সেবকগণও তাঁহার অনুগমনে যথাযোগ্য কক্ষে আরোহণ করিয়াছিলেন।

ভূলোকাগত গোলোক-রথ শ্রীকৃষ্ণপ্রেষ্ঠ শ্রীল প্রভুপাদকে পাইয়া অতি দ্রুতবেগে অনিমেষে নিরবচ্ছিন্ন-ভাবে শ্রীকৃষ্ণধামে** আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিলেন। পথে কেবলমাত্র 'বিদ্যা-বেদনের' রণক্ষেত্রে*** সারথি রথের গতি সঙ্গোপন করিলে লব্ধ-বেদনজ্ঞান আচার্য্যপাদের বাল্যলীলার আদি জ্ঞানোন্মেষলীলাক্ষেত্রের কথা স্মরণ করাইয়া দিবার জন্য তিনি আমাকে আহ্বান করিয়া বাধ্ব-ঋষির ন্যায় নিঃশব্দে আমাকে অনেক কথা জানাইয়াছিলেন। কিন্তু আমার অজ্ঞানতাবশতঃ তখন আমি তাহার কিছু বুঝিতে না পারিলেও 'অপ্রাকৃত বাণী-বিগ্রহের বাণী প্রাকৃত কর্ণের দ্বারা শ্রবণ কারবার চেষ্টা বৃথা'—তাহা সম্পূর্ণরূপেই উপলব্ধি করিয়াছিলাম। শ্রীবাণী-বিগ্রহ শ্রীল সরস্বতীপ্রভু কৃষ্ণধাম হইতে তদভিন্ন গৌরধামে শ্রীস্বানন্দ-সুখদ-কুঞ্জে শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সহিত দেখা করিয়া তাঁহাকে তাঁহার আগমন-বার্ত্তা জ্ঞাপন করেন এবং শ্রীধামমায়াপুরে চন্দ্রশেখর-আচার্য্য-ভবনে শ্রীচৈতন্যমঠে আচার্য্য-প্রকটিত শ্রীরাধাকুণ্ড-তীরে আসিয়া শ্রীল বাবাজী মহারাজের সহিত সাক্ষাৎ করেন। তাঁহারই নিকটে কুণ্ডতীরে সেবাকুঞ্জে এ অধমের সংগৃহীত বিবিধ পুষ্পমাল্য-চন্দনাদি উপায়ন-সমভিব্যাহারে হতভাগ্যের দ্বারা লাবণ্যযুক্ত হইয়া শ্রীরাধামদনমোহনের প্রেষ্ঠরূপে সমাধিস্থ হইলেন। এবং আমাকে তাঁহার আনুগত্যে যুগল-সেবা করার অধিকার দিবার জন্য নিত্যকাল তথায় অবস্থান করিতে লাগিলেন। এক্ষণে গুরুদাসগণের নিকট প্রার্থনা, তাঁহারা কৃপা করিয়া যেন গুরুপাদপদ্ম-মনোঽভীষ্ট-সেবার কিঞ্চিন্মাত্রও যোগ্যতা আমায় প্রদান করেন।

নমঃ ওঁ বিষ্ণুপাদায় কৃষ্ণপ্রেষ্ঠায় ভূতলে।
শ্রীমতে ভক্তিসিদ্ধান্ত-সরস্বতীতিনামিনে॥
নমস্তে গৌরবাণী শ্রীমূর্ত্তয়ে দীনতারিণে।
রূপানুগবিরুদ্ধাপসিদ্ধান্তধ্বান্তহারিণে॥

—জগদ্গুরু শ্রীল ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী

---

* Special Trainএ। ** কৃষ্ণনগরে। *** ব্রাহ্মণঘাটে।

সাধনক্ষেত্রে গুরুবাদ ও অবতারবাদ

দুঃখ, দৈন্য, কলুষতাপূর্ণ পৃথিবীর মাঝে সাধকজীবনের প্রথম উচ্চারিত মন্ত্র হল—

অজ্ঞান-তিমিরান্ধস্য জ্ঞানাঞ্জন-শলাকয়া।
চক্ষুরুন্মীলিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ॥

অর্থাৎ—হে গুরুদেব! আমি অজ্ঞান-অন্ধকারের মধ্যে বেঁচে আছি, আপনি জ্ঞানশলাকাদ্বারা আমার চক্ষুদ্বয় উন্মীলিত করুন। হে গুরুদেব! আপনাকে নমস্কার।

কিন্তু—১। গুরু কে?

২। সাধনক্ষেত্রে গুরুবাদের প্রয়োজনীয়তা কতটুকু?

শ্রীমদ্ভাগবতের একাদশ-স্কন্ধ বলেন,—

"আচার্য্যং মাং বিজানীয়ান্নাবমন্যেত কর্হিচিৎ।
ন মর্ত্ত্যবুদ্ধ্যাসূয়েত সর্ব্বদেবময়ো গুরুঃ॥ (ভাঃ ১১।১৭।২৭)

যার সহজ-সরলরূপ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত-গ্রন্থে সম্পূর্ণরূপে উদ্ভাসিত।—

"গুরু কৃষ্ণরূপ হন শাস্ত্রের প্রমাণে।
গুরুরূপে কৃষ্ণ কৃপা করেন ভক্তগণে॥"

গুরু হলেন তিনিই—যিনি আলোকবৃত্তের আলোকে যুগ যুগ ধরে ভারতবর্ষের রসপিপাসু সাধকদের নিয়ে চলেন পরম সাধ্যবস্তুর চরণতলে, চরম কল্যাণের পথে, সঙ্গে সঙ্গে তত্ত্ব-জ্ঞানাভাবরূপ অন্ধকার থেকে ভগবৎ-জ্ঞানালোকে উদ্ভাসিত করেন ভক্তবর্গকে।

'গুরু'-শব্দের অর্থ হল—গরিমায় যিনি অগ্রণী। অর্থাৎ গৌরবে যিনি সর্ব্বোচ্চ, মহিমায় যিনি সাক্ষাৎ পরমব্রহ্ম, করুণায় যিনি মহত্তম এবং বিশালতায় যিনি অপরিমেয়, তিনিই গুরু। সাধকের সমস্ত আশা-ভরসার স্থল হলেন শ্রীগুরুদেব। সাধক-জীবনে তাই গুরুবাদের মূল্য অনেক বেশী। শ্রীগুরুদেব অন্তরঙ্গ এবং বহিরঙ্গ হতে পারেন। রাগমার্গের উপাসকরা সাধনক্ষেত্রে অন্তরঙ্গ গুরুদেবের আশ্রিত হন। অন্যভাবে বলা যায়, শ্রীগুরুদেবও পরম সাধকের জন্য অপেক্ষা করে থাকেন। যখনই ভক্ত কেঁদে বলেন,—

'শিষ্যস্তেঽহং শাধি মাং ত্বাং প্রপন্নম্॥' (গীঃ ২।৭)

তখনই গুরুদেব আকুল আগ্রহে ভক্ত সাধকের জীবন পথের উপর আশীর্ব্বাদী

দৃষ্টি নিক্ষেপ করেন। শ্রীগুরুদেবের অমৃতস্বরূপিণী শুদ্ধ পবিত্র বাণী তথা উপদেশ সাধককে নিয়ে চলে এক অমৃতপথের পানে। ভক্ত পরম শ্রদ্ধার সঙ্গে বলে ওঠেন—

গুরুর্ব্রহ্মা গুরুর্বিষ্ণু গুরুর্দেবো মহেশ্বরঃ।
গুরুরেব পরংব্রহ্ম তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ॥

তখন থেকেই শুরু হয় ভক্তের 'বিশ্রম্ভেন গুরোঃ সেবাঃ।' শাস্ত্র বলেন (শ্রীগুরুবাদের প্রথম কথা হল),—

"যস্য দেবে পরা ভক্তির্যথা দেবে তথা গুরৌ।
তস্যৈতে কথিতা হ্যর্থাঃ প্রকাশন্তে মহাত্মনঃ॥"

এবং সাধনক্ষেত্রে ভক্তঙ্গ্যের প্রথম কথা হল—

"আদৌ গুরুপাদাশ্রয়স্তস্মাৎ কৃষ্ণদীক্ষাদিশিক্ষনং বিশ্রম্ভেন গুরোঃ সেবাঃ।"

শ্রীগুরুদেবকে নিজের এবং জগতের পরম হিতকারী বান্ধব জেনে নিরন্তর নিষ্কপটে তাঁর বাণীর সেবারত হয়ে শ্রীহরির পরিতুষ্টকারী ধর্ম্মানুষ্ঠানের ভাগবত ধর্ম্মে শিক্ষিত হয়ে অন্তরে-বাইরে, জীবনে-মরণে সেই শিক্ষার অনুসরণ করেন ভক্ত। সাধনক্ষেত্র এবং শ্রীগুরুবাদ অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। তাঁরই কৃপায় জীবের অনাদি বিষয়গ্রন্থি ছেদন হয়, দূর হয় সর্ব্ব-সংশয়, লাভ হয় শ্রীকৃষ্ণ-ভক্তি। সাধনক্ষেত্রকে সার্থক করতে হলে গুরুবাদের গূঢ় তত্ত্বকে হৃদয়ের মধ্যে একান্তভাবে গ্রহণ করতে হবে।

এবারে প্রশ্ন :—

১। অবতার কি ?

২। সাধনক্ষেত্রে অবতারবাদের প্রয়োজনীয়তা কতটুকু ?

শাস্ত্র বলেন,—'অগ্রপশ্চাৎ প্রপঞ্চে অবতারণমিতি অবতারঃ।' নিত্য বৈকুণ্ঠাদি ধাম থেকে যে নিত্য বিষ্ণুবিগ্রহ প্রপঞ্চে অবতরণ করেন, তাঁকেই বলে অবতার। অবতারবাদ তথা অবতারতত্ত্ব হল সম্পূর্ণ সত্য, নিত্য, শাশ্বত বস্তু। সাময়িক কোন জীবের কোন প্রতীকই অবতার হতে পারেন না। কলিযুগে কল্কি অবতার এবং শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুই হলেন একমাত্র যুগাবতার। তাঁকে শাস্ত্রে 'ছন্নাবতার' বা 'গূঢ়াবতার' বলেও কোন কোন স্থানে বর্ণনা আছে। যখনই অরাজকতা, সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধি, ধর্ম্মবিদ্বেষ, হীন স্বার্থপরতা, ভগবানে অবিশ্বাস জাতীয় জীবনকে অকর্ম্মণ্য করে ফেলে, বিশ্বমানবগণ যখন বেদের প্রতি, ঈশ্বরের প্রতি, সাধুর প্রতি উপেক্ষার দৃষ্টিতে অবহেলা করে, সেই ভীষণ দুঃসময়ে অবতারগণের আবির্ভাব ঘটে। তখনই আমাদের কর্ণকুহরে বেজে ওঠে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার সেই পবিত্র বাণী—

পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্।
ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে॥ (গীঃ ৪।৮)

সমগ্র বাংলা তথা ভারত যখন তীব্র কলুষতা এবং ঘোর কুসংস্কারে আবদ্ধ হয়ে পড়েছিল তখনই অবতারী শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য প্রেম, মৈত্রী, সাম্য, সেবা ও ঐকান্তিক ভালবাসার দ্বারা সমাজকে দূষণমুক্ত করেন। সাধনক্ষেত্রে সাধকের চোখের সামনে শ্রীগৌরাঙ্গমহাপ্রভু দেখা দেন শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীরাধার মিলিত তনু—রাধায়িত কৃষ্ণ ও কৃষ্ণায়িত রাধারূপে। জনজীবন অবতারতত্ত্বে মোহিত হয়ে পড়ল, আর সাধনক্ষেত্রে অপরূপ অমৃতরসের ধারা বইতে থাকল। ধন্য হল সাধক জীবন। চক্ষু তাঁদের ভরে উঠল শ্যামস্নিগ্ধ-সোনালী দেহের (শ্রীচৈতন্যাবতার) প্রগাঢ় রূপচ্ছটায়, মন ভরে উঠল অবতারবাদের এক ঘন-গহন-মধুর সঙ্কীর্ত্তন রসে, যার ফলস্বরূপ মদ্যপায়ী পাগল জগাই-মাধাই হয়ে উঠলেন পরম ভক্ত, ঘোর গোঁড়া মুসলমান চাঁদ-কাজী হয়ে উঠলেন শ্রীচৈতন্যাবতারের শ্রীপার্ষদ। অবতারতত্ত্বের শুভাগমনের জন্য সৃষ্টি হল অদ্ভুত মিলন!

অবশেষে বলতে হয়, সাধনক্ষেত্রে গুরুবাদ ও অবতারবাদের প্রয়োজনীয়তা অনেক বেশী। দুই-ই এনে দেয় আমাদের মনে এক অনাবিল আস্বাদন, সাহায্য করেন পরম সাধ্যের চরণতলে পৌঁছুতে, মনকে ভরিয়ে তুলেন স্নিগ্ধ-শান্ত হরি-সঙ্কীর্ত্তনরসে। গুরুবাদ যদি সাধনক্ষেত্রে না থাকত, তাহলে সাধকের জীবনে পূর্ণত্ব প্রাপ্তি ঘটত না। এই চরম বস্তুকে পাওয়ার জন্য এত সাধনা, এত ধ্যান-ধারণা-তপস্যা সবই ধূলিস্যাৎ হয়ে যেত। আর সর্ব্বাবতারী শ্রীকৃষ্ণ থেকে মূল সঙ্কর্ষণাদি ক্রমে বিভিন্ন যুগ-কাল প্রয়োজনে জীবের ও জগতের দেশ-কালধর্ম্মী অনন্ত আশ্রিত ভক্ত-হৃদয়কে এত আনন্দে ভরিয়ে তুলত না। পরব্যোমপতি শ্রীগোলোকবিহারী শ্রীকৃষ্ণের সর্ব্ব আদি ও সর্ব্বাশ্রয় পঞ্চরসের সর্ব্বরসাধার শ্রীগোবিন্দ অখিলাত্মভূত। তাই তাঁর কারুণ্য সমস্ত বিশুদ্ধাত্মগণের অন্তরকে পঞ্চরসে ভরপুর করে 'রসো বৈ সঃ' রূপে গড়ে তুলেন।

"এতে চাংশকলাঃ পুংসঃ কৃষ্ণস্তু ভগবান স্বয়ম্।
ইন্দ্রারিব্যাকুলং লোকং মৃড়য়ন্তি যুগে যুগে॥ (ভাঃ ১।৩।২৮)

—**শ্রীমন্তী কুন্তু বেরা,** অমর্ষি (মেদিনীপুর)

শ্রীল গুরু-মহারাজের বক্তৃতা

[পূর্ব্বপ্রকাশিত ৪৩শ বর্ষ, ১১শ সংখ্যা, ৪৩০ পৃষ্ঠার পর]

অনেকে বলছেন, শ্রীমদ্ভাগবত ভক্তদের গ্রন্থ নয়, বৈষ্ণবদের গ্রন্থ। একজন ব্রাহ্মণ তিনি কি বৈষ্ণব নন? যদি কেউ ব্রাহ্মণ বলে নিজেকে দাবী করছেন, তিনি যদি নাম-সংকীর্ত্তন না বুঝছেন, ওটা তার প্রয়োজনীয়তা নাই বা তিনি দেবদেবীর পূজা করছেন; তিনি নিজকে ব্রাহ্মণ বলে পরিচয় দিতে পারবেন ত'? স্বীকৃতি পাবেন কি জগতে সামগ্রিকভাবে?—পাবেন না। কেন?—যিনি ব্রাহ্মণ তিনি কোন দেবদেবীর পূজা করবেন না, তিনি নিশ্চয় অখাদ্য-কুখাদ্য গ্রহণ করবেন না। এরকম বহু কথা লেখা আছে স্মৃতিশাস্ত্রে। সেগুলো নিয়ে ত' বিচার করতে হবে।

"মৎস্য মাংসে সদা লুব্ধো বিপ্রো নিষাদ উচ্যতে॥
ব্রহ্মতত্ত্বং ন জানাতি ব্রহ্মসূত্রেণ গর্ব্বিতঃ।
তেনৈব স চ পাপেন বিপ্রঃ পশুরুদাহৃতঃ॥

তাহলে শিক্ষাটা কি?—

বাসুদেবং পরিত্যজ্য যোহন্যদেবমুপাসতে।
ত্যক্ত্বামৃতং স মূঢ়াত্মা ভুঙ্‌ক্তে হলাহলং বিষম্॥

এসব কথাগুলো ত' বলা আছে। তাহলে আমি আমার ব্রাহ্মণত্ব রক্ষা করব কি করে? "স্বরূপে সবার হয় গোলোকেতে স্থিতি।" স্বরূপে, স্বরূপতঃ, কিন্তু যদি সেই চিন্তা না থাকে, তবে জীবাত্মার কল্যাণ কোথায়? আমি কি বস্তু? আমি তত্ত্বতঃ কি? আমার স্বরূপ কি? এই অভিজ্ঞান যদি আমার না থাকে, এই সম্বন্ধ-জ্ঞানোদয় যদি না থাকে, তাহলে আমার পরিচয় ত' যথাযথ আমি জানি না, বুঝি না। "জীবের 'স্বরূপ' হয় কৃষ্ণের 'নিত্যদাস'।" চৈতন্য-মহাপ্রভুর এই যে **Theory**—যা তিনি বুঝাচ্ছেন গোস্বামিগণকে, গোস্বামিগণকে বুঝাবার কোন দরকার ছিল না, তাঁরা ত' নিত্যসিদ্ধ পার্ষদ।

সদ্‌গুরু দুরকম—সাধনসিদ্ধ ও নিত্যসিদ্ধ। নিত্যসিদ্ধ মহাত্মা যিনি, তিনি তাঁর তত্ত্বসিদ্ধান্ত সম্বন্ধে পূর্ণজ্ঞান রাখেন। কিন্তু সাধারণ লোক যারা, তারা জেনেও ত' মনে রাখবে জিনিসটা—ভগবানের সঙ্গে তার কি সম্পর্ক আছে, কি সম্বন্ধ আছে। আমি কি দিয়ে ভগবানকে ডাকব? আমার কি সম্বল আছে?—ভক্তিবৃত্তি আমার সম্বল। সেখানে জ্ঞানবৃত্তি, কর্ম্মবৃত্তি প্রভৃতি কথাগুলো নাই। আর যদি তাই

থাকে, তাহলেও সেখানে বিচার আছে,—"যদিচ্ছসি পরং জ্ঞানং জ্ঞানাদ্ যৎ পরম্পদম্। তদাদরেণ রাজেন্দ্র কুরু গোবিন্দকীর্ত্তনম্ ॥" তাহলে সর্ব্বোপরি কথাটা হল ভক্তিবৃত্তি। এই ভক্তিবৃত্তিকে বাদ দিয়ে কারও কোন পরিচয় থাকে না। সদ্গুরু এসব কথাগুলো সুন্দরভাবে বুঝিয়ে দিচ্ছেন। যে যা বলল তাই মেনে নেব, হবে না ওটা। সেখানে যুক্তির, বিচারের যে সামঞ্জস্য রয়েছে, সেগুলো মেনে নিতে হবে। যেমন আমার পূর্ব্ববর্ত্তী বক্তৃমহোদয় বলেছেন,—'পূর্ব্ব-পরয়োঃ পরবিধিঃ বলবান্।' শেষ কথা যেটা, চরম কথা যেটা, সেটা হয় নাই, সেটাকে মেনে নিতে হবে। যেমন বলা আছে ব্রহ্মসূত্রের প্রথমেই—'অথাতো ব্রহ্মজিজ্ঞাসা'। 'অথ' বলতে কর্ম্ম, জ্ঞান, যোগাদি নিরাস হয়ে গেছে। 'অতঃ'—এখন শোন ব্রহ্মজিজ্ঞাসা—ভগবান্ সম্বন্ধে তত্ত্বজিজ্ঞাসা। কে তিনি? তিনি কি ঠুঁটোরাম, তিনি কি নির্ব্বিশেষ, নিঃশক্তিক, নিষ্ক্রিয়?—না, 'জন্মাদ্যস্য যতঃ' যাঁর সব শক্তি আছে, সব ক্ষমতা আছে, যাঁর থেকে চরাচর বিশ্বজগৎ সৃষ্টি হচ্ছে, সেই সর্ব্ব-শক্তিমান্ ব্রহ্ম পরব্রহ্ম ভগবান্। কি করে জানব তিনি সর্ব্বশক্তিমান্?—'শাস্ত্রযোনিত্বাৎ'—শাস্ত্র থেকে জানতে পারবে তুমি। শাস্ত্র আলোচনা কর, সদ্গুরুর আশ্রয় গ্রহণ কর, তিনি তোমায় জানিয়ে দেবেন। শাস্ত্রের মাধ্যমে তুমি ওটা জানবে। পর পর সমস্ত জিনিসটার ব্যাখ্যা দেওয়া আছে শাস্ত্রে। যেখানে ব্রহ্মসূত্র, বেদান্ত দর্শন শেষ হচ্ছে, সকলের শেষে নামের প্রশংসা, শেষ সূত্র তাই 'অনাবৃত্তি শব্দাদনাবৃত্তি শব্দাৎ'। শব্দব্রহ্ম, নামব্রহ্ম, নাদব্রহ্মের আরাধনা, উপাসনার দ্বারাই তোমার অনাবৃত্তি হবে, অর্থাৎ এ সংসারে আর ফিরে আসতে হবে না, ভগবানকে লাভ করবে।

'নাম-নামী ভিন্ন নয়রে' বলি আমরা। বাচ্য-বাচক দুই-ই অভিন্ন। সেই নামব্রহ্মের সাধনার দ্বারা অনাবৃত্তি হয়। গীতা, ভাগবতে, উপনিষদে, বেদে, বেদান্তে সর্ব্বত্র সেই একই কথা বলা আছে।

বেদে রামায়ণে চৈব পুরাণে ভারতে তথা।
আদাবন্তে চ মধ্যে চ হরিঃ সর্ব্বত্র গীয়তে ॥

ভগবান্ শ্রীহরির আরাধনা কর—একথা বলা হল, কিন্তু কৈ অন্যের আরাধনার কথা কি কিছু বলা হয়েছে? ভক্তি কাকে বলে? 'ভক্তিরস্য ভজনম্'—ভগবানে ভক্তি, ভগবানের ভজন, তাকে বলে ভক্তি। অন্য কারও ভজনকে কি ভক্তি বলেছে শাস্ত্রে? কোন জায়গায় লেখা আছে শাস্ত্রে?

সর্ব্বোপাধিবিনির্ম্মুক্তং তৎপরত্বেন নির্ম্মলম্।
হৃষীকেণ হৃষীকেশ-সেবনং ভক্তিরুচ্যতে ॥

'হৃষীকেশ-সেবনম্', অন্য কোন কথা লেখা নাই শাস্ত্রে। ভক্তি কাকে বলে? —'হৃষীকেশ-সেবনং ভক্তিরুচ্যতে'। "হৃষীকে গোবিন্দ-সেবা, না পূজিব দেবী-দেবা, ইহ ভক্তি পরম কারণ।"—নরোত্তম ঠাকুর বললেন। শাস্ত্রের এই কথার পদ্যানুবাদ করেছেন তিনি। সুতরাং কার ভজন করব? কার ভজন হবে? কোন দেবদেবীর ভজন হবে? কোন দেবদেবীর আরাধনা শব্দ লেখা আছে কোথাও? সাধন-ভজন, উপাসনা লেখা আছে ভগবানের এবং শব্দগুলো সেইভাবেই এসেছে। অন্য কাকেও লক্ষ্য করে আসে নাই। গীতা যদি সর্ব্বজনগ্রাহ্য হন, তাহলে গীতার ভিতরে অন্য দেবদেবীর উপাসনার কথা খণ্ডন করা আছে।

অন্তবত্তু ফলং তেষাং তদ্ভবত্যল্পমেধসাম্।
দেবান্ দেবযজো যান্তি মদ্ভক্তা যান্তি মামপি॥
কামৈস্তৈস্তৈর্হৃতজ্ঞানাঃ প্রপদ্যন্তেঽন্যদেবতাঃ।
তং তং নিয়মমাস্থায় প্রকৃত্যা নিয়তাঃ স্বয়া॥

মশায়! সাধন-ভজনের ফল সব এক কোথায় লেখা আছে? বরং উল্টোকথা লেখা আছে। আমি যার উপাসনা করব, যার আরাধনা করব, ফলটা সেরকম পাব। তার বেশী ত' আর আমি কিছু পাচ্ছি না। দেবযাজিগণ দেবলোকে যাবেন। 'মদ্ভক্তা যান্তি মামপি॥' কৃষ্ণ বলছেন,—আমার ভক্তগণ আমার অবিনাশী লোকে—নিত্যধামে গমন করবেন। তাহলে দুটোর ফল এক হল কি করে? দুটো ফল ত' এক হচ্ছে না। এগুলো বুঝতে কষ্ট হয় কেন আমাদের? ভগবানের ভজনের ফল বৈকুণ্ঠগতি, গোলোকগতি, বৃন্দাবনগতি। শাস্ত্রে যুক্তি দিয়ে কথাগুলো বুঝানো আছে। যুক্তি ছাড়া আমরা কোন কথা মানব না। সেইজন্য শাস্ত্রে এই শ্লোকটাও এসেছে,—

কেবলং শাস্ত্রমাশ্রিত্য ন কর্ত্তব্যোবিনির্ণয়ঃ।
যুক্তিহীনবিচারে তু ধর্ম্মহানিঃ প্রজায়তে॥

যুক্তিকে বাদ দিয়ে যদি কেউ কিছু বলতে চান, মানব না আমরা। নিশ্চয় প্রত্যেকটা বক্তব্যের ভিতরে যুক্তি থাকবে, সৎসিদ্ধান্ত থাকবে, তবে সেই জিনিসটাকে মেনে নেওয়া হবে। **Logic** ছাড়া কিছু মানব না আমরা। তবে **Logic**ও দুইরকম—নাস্তিক্য **Logic** ও আস্তিক্য **Logic**। দুটো জেনে রাখা ভাল। কিন্তু আস্তিক্য **Logic—positive**টা মেনে নিতে হচ্ছে, যদিও **negativity** আছে তাকে তুলনামূলক আলোচনা করার জন্য, জানার জন্য। ভগবান্ আছেন, এটা মূল সূত্র। ভগবান্ নাই, এটা লোককে বুঝাবার দরকার হয় না। ভগবান্ আছেন, এটা নিত্যসিদ্ধ প্রমাণ। সেই নিয়ে কথাটা এসেছে এবং যুক্তির ক্ষেত্রে বলা

হয়েছে ভগবান্ নাই। সুতরাং আমরা আস্তিক হব, না নাস্তিক হব। বর্ত্তমান দুনিয়াতে নাস্তিকের প্রশংসা খুব বেশী। যিনি খুব নাস্তিক হতে পেরেছেন, তিনি বড় সাধু!

বড় নাস্তিক হতে পেরেছেন, এ আবার কেন বলছেন? হ্যাঁ, বলবার তাৎপর্য্য আছে। বর্ত্তমানে যারা বলছেন—কিছু নাই, কিছু নাই, নির্ব্বিশেষ, নিঃশক্তিক, নির্গুণ—এইরকম ধরণের কথাগুলো যারা লুফে নিয়েছেন, তাদের কথাই বলা হয়েছে এখানে। তারা **Positivity** মেনে নিতে নারাজ। কিন্তু **Positivity** ছাড়া **negativity** কি প্রমাণিত হয়? **Without Positivity negativity can never be prove.** আগে মেনে নিতে হয়েছে অস্তি—ভগবান্ আছেন, ভগবান্ নিত্যসত্য, ভক্ত নিত্যসত্য, ভক্তি নিত্যসত্য, তারপর আমি যুক্তির ক্ষেত্রে অস্বীকার করতে পারি, কিন্তু মেনে নেওয়া হয়েছে আগে। সুতরাং আমি নাস্তিক হতে যাচ্ছি কেন? নাস্তিককে গালাগালি দিয়েছেন ভগবান্ নিজে গীতার মধ্যে।—

দ্বৌ ভূতস্বর্গৌ লোকেঽস্মিন্ দৈব আসুর এব চ।
বিষ্ণুভক্তঃ স্মৃতো দৈব আসুরস্তদ্বিপর্য্যয়ঃ॥

দৈবীভাবাপন্ন যাঁরা, তাঁরা আস্তিক, আর অদৈব যারা, ভগবদ্বিরোধী যারা, তারা হলেন নাস্তিক। নাস্তিককে সেখানে প্রশংসা করা হয় নাই। কিন্তু বর্ত্তমানে সবাই নাস্তিক হতে চাচ্ছি। চোখের সামনে যে ঘটনা ঘটছে তাকে অস্বীকার করতে চাচ্ছি। ভগবান্ ঠুঁটোরাম, তাঁর রূপ, গুণ, লীলা, পরিকর কিছুই নাই—এটা বললে বর্ত্তমান নাস্তিক্য-সমাজে বাহাদুরি বেশী এবং যিনি এরূপ বলবেন, তিনি খুব বাহাদুর ব্যক্তি। বাহাদুরি খ্যাপনের জন্য এসব ব্যবস্থা হচ্ছে বর্ত্তমানে। ঠিক যেমন বর্ত্তমানে কমিউনিজমে কমিউনিজমে ঠেলাঠেলি আরম্ভ হয়ে গেছে। কাকেও মানতে হবে না, কাকেও মানার দরকার নাই, মা-বাবা ওঁদের মেনে কি হবে? **Guardian**দের মেনে কি হবে? মুনিঋষিগণ কি দরকার? ধর্ম্ম-কর্ম্ম ওসব মশায় রেখে দেন ডগ্‌মা। তাহলে আছে কোন্‌টা? সত্য কোন্‌টা? কোন্ জিনিসটা নিয়ে চলব আমরা?

ধর্ম্ম মানে কোন বিশেষ ডগ্‌মা নয়, ধর্ম্ম মানে কোন বিশেষ **Cult, Creed**-এর কথা বলা হয় নাই। ধর্ম্ম হল নীতি-আদর্শ। নীতি-আদর্শের মূল্যায়নকারীকে বলে ধার্ম্মিক। এই ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে শাস্ত্রে। কিন্তু এই ব্যাখ্যা আজ দুনিয়া নিতে চাচ্ছে না। তত্ত্বদর্শনটাকে অস্বীকার করাটা আজকাল বাহাদুরির মধ্যে এসে গেছে।

যারা বলছেন কেউ কিছু নয়, সাধু-গুরু-ভগবান্ কিছু নয়, ভক্তি কিছু নয়, ধর্ম্ম-কর্ম্ম হল আফিম, লোককে আফিম খাওয়ানো হয়েছে, তাদের অজ্ঞান করে দেওয়া হয়েছে, তারাই আবার বলছেন,—আমাদের দাবী মানতে হবে, আমাদের দাবী মানতে হবে। কেন গো? তোমাদের কি দাবী? কেন মানতে হবে? কে মানবে? তুমিও ত' একজন সাধারণ মানুষ—**Layman**। তোমার দাবী আমি মানব কেন? তোমাকে আমি নেতা বলে মানব কেন? সকলের অধিকার, সকলের **status, standard** ত' সমান। তুমি ব্যক্তিপূজার বিশেষ সম্মানের অধিকারী হতে চাচ্ছ কেন? ব্রহ্মবাদীরা বলছেন,—আমরা সবাই ব্রহ্ম। তখন আমার গুরুদেব বললেন,—আরে, সব যদি ব্রহ্ম হয়, তাহলে 'আপনি ব্রহ্ম' 'আমি ব্রহ্মের' পরে রাগ করছেন কেন? চটছেন কেন? সব ব্রহ্ম ত' সমান। তাহলে আর আমার পরে রাগ কেন? আপনিও ব্রহ্ম, আমিও ব্রহ্ম, অতএব চুপ করে বসে থাকুন, কোন কথা বলবেন না। যুক্তি ত', সবটা যুক্তির পরে প্রতিষ্ঠিত কথাগুলো। এক করলে ত' হবে না। সবাই যদি আমরা সমান, সবাই যদি ক্যাডার, সমান অধিকার, তাহলে একজনের আবার আর একজনের উপর আধিপত্য কেন? এমনকি, যুক্তির ক্ষেত্রে আমি বলব বড়দা, ছোটদাও বলা চলবে না। কেন? **All of the men are of equal status.** সকলের সমান অধিকার, **Equal in all respect.** সুতরাং কে কাকে উপদেশ করবে? কে কার উপদেশ গ্রহণ করবে? সবাই ত' সমান অধিকারী। ও কথাও আসবে। সুতরাং বুঝিয়ে দিতে হবে বিচারগুলো তাদের।

এ ভাগ থাকবে, এ **Classification** থাকবে, উচ্চাবচ ভাব থাকবে, শিক্ষক এবং শিক্ষার্থী থাকবে, বিচারক এবং বিচারাধীন আসামী আলাদা থাকবে। এ শ্রেণীভেদ কখনও বিলুপ্ত হবে না। সাধু-অসাধু, ধনী-দরিদ্র ভেদ থাকবে। কারও ক্ষমতা নাই, পৃথিবীর কোন শক্তি নাই যে এটা ভেঙ্গে গুঁড়িয়ে দিয়ে এক করে দেবে। এ নিয়ে আলোচনা যথেষ্ট হচ্ছে সমাজনৈতিক, রাজনৈতিক ও অর্থ নৈতিক ক্ষেত্রে। কিন্তু ধর্ম্মজগৎ নিয়ে যখন কথা হয়, তখন বলা হয় সব সমান। কেমন ফাঁকিবাজি কথা বলুন ত' আপনারা! বুদ্ধিমান্ নাকি সকলে! এটা কি বুদ্ধির পরিচয়? সবটার ক্ষেত্রে **Classification** রাখছি আমরা, কিন্তু ধর্ম্মের কথা যখন আলোচনা হবে, তখন বলা হচ্ছে সব সমান। 'সর্ব্বধর্ম্ম সমন্বয়' কেমন ফাঁকিবাজি কথা বলুন। ধর্ম্ম যদি হয় তাহলে ত' সমন্বয়, আর ধর্ম্মের নামে যদি অধর্ম্ম হয়, ধর্ম্মের নামে যদি বিধর্ম্ম হয়, ছলধর্ম্ম হয়, তাহলে কি তার সঙ্গেও **Compromise** বা আপোস হবে? চোরের ধর্ম্ম চুরি করে সে খাবে, পরবে, বাঁচবে; আর সাধুর ধর্ম্ম

চুরি না করে আমি বাঁচব, খাব, পরব। দুজনের নীতি কি এক হবে? এ দুজনের নীতি কোথায় এসে মিলছে? মিলবে না কখনও। একেবারে **Diametrically opposite**। সুতরাং আমরা এখানে সমন্বয় আনব কি করে? গীতার সমন্বয় ভাষ্য, ভাগবতের সমন্বয় ভাষ্য। সমন্বয় মানে কি মূর্খের সঙ্গে পণ্ডিতের মিল, তত্ত্বদর্শীর সঙ্গে অতত্ত্বদর্শীর মিল? কি করে হবে? মুখে বলা চলবে, কাজে হবে না, যুক্তিতে আসবে না কথাটা। যুক্তি মানতে হবে। সেইজন্য বলছেন,—'যুক্তিহীনবিচারে তু ধর্ম্মহানিঃ প্রজায়তে॥' যুক্তিহীন বাক্য নিশ্চয় ধর্ম্মবিরোধী বাক্য, নীতি-আদর্শ বিরোধী বাক্য। বহু কথা রয়েছে। শাস্ত্র আলোচনা করতে হবে আমাদের **Positive side** নিয়ে, যুক্তির ক্ষেত্রে **Negative side**-এর আলোচনাও আমাদের জেনে রাখতে হবে। ভাল-মন্দটা আমাদের জেনে রাখতে হবে। কিন্তু **Positive side** নিয়েই ত' আমাদের আলোচনা, তাকে বাদ দিয়ে নয়।

আমরা কিছু মানব না, আমরা কিছু তত্ত্বদর্শন শিখব না—এমন ধরণের বিচার নিয়ে নিশ্চয় শিক্ষাবিভাগ খোলা হয় নাই। তত্ত্বদর্শনটা জানাবার জন্য এই শিক্ষাবিভাগ। অশিক্ষা, কুশিক্ষা যেগুলো সে শিক্ষা পরিত্যাগ করতে হবে। শিষ্টাচার আমাদের শিখতে হবে, তা না হলে আমাদের কল্যাণ নাই। সাধু-গুরু-বৈষ্ণবের কাছে বহু কিছু শিখবার আছে, জানবার আছে। শাস্ত্রের কাছে আমরা ঋণী আছি। ঋণ আছে আমাদের সংসারে, সমাজে—অস্বীকার করবার উপায় নাই। সরকারও মানছেন, বুদ্ধিজীবিরাও মানছেন, সকলকে মানতে হচ্ছে।

সমাজে আমরা বাস করি, ছয় রকমের ঋণ হয়। আর এই ছয় রকমের ঋণ শোধ করে, এখানকার দাবীদাওয়া মিটিয়ে চলে যাব, এমন অবস্থা কি সকলের পক্ষে সম্ভব হচ্ছে?—হবে না। কিন্তু শাস্ত্র বুঝিয়ে দিচ্ছেন—তোমার সব ঋণ মুকুব করা হবে, যদি তুমি অখিললোকশরণ্য শ্রীমুকুন্দপাদপদ্মে সর্ব্বান্তঃকরণে শরণ গ্রহণ কর।

দেবর্ষিভূতাপ্তনৃণাং পিতৃণাং ন কিঙ্করো নায়মৃণী চ রাজন্।
সর্ব্বাত্মনা যঃ শরণং শরণ্যং গতো মুকুন্দং পরিহৃত্য কর্ত্তম্॥

শাস্ত্রের এ বিচারটা মানতে হবে আমাদের, যদি আমরা ঋণ মুকুব হতে চাই, যদি কিছু সুবিধার পথ জানতে চাই, বুঝতে চাই, তাহলে **March** করতে হবে একটা অন্য sideএ। কি সেটা?—"**Back to God and back to Home. Our eternal Home—Our Permanent Abode; Baikuntha is our heritage, earth's but a players' stage.**"—একথা বহু কবি, বহু সাহিত্যিক, বহু ঐতিহাসিক বলেছেন। শাস্ত্রে বলা আছে, **Universal**

Truth, অস্বীকার করবার উপায় নাই। তত্ত্বদর্শনটা আমাদের বুঝতে হবে, সত্যই বৈকুণ্ঠ আমাদের Heritage কিনা। কৃষ্ণ অর্জ্জুনকে বলছেন,—"ন তদ্ভাসয়তে সূর্য্যো ন শশাঙ্কো ন পাবকঃ। যদ্গত্বা ন নিবর্ত্তন্তে তদ্ধাম পরমং মম॥" যেখানে গেলে আর ফিরে আসতে হয় না, সেখানে যাবে অর্জ্জুন? ওটা আমার এবং তোমার বাড়ী। ওটাই তোমার আদি বাসস্থান। ঐখানেই ফিরে চল, তোমার কোন অভাব থাকবে না, আর এখানে যতদিন থাকবে ততদিন তোমার অভাব ঘুচবে না, অভাব মিটবে না—এটা অভাবের রাজ্য।

আপনারা একজন লোককে কি সন্তুষ্ট করতে পারেন সমগ্র দুনিয়া দিয়ে? শাস্ত্র **Challenge** জানিয়েছেন। পৃথিবীতে যত সোনাদানা আছে, ভোগ্যসামগ্রী আছে, যত ঐশ্বর্য্য আছে, সব জিনিস যদি একজন লোককে দেওয়া যায়, তাহলেও তাকে সন্তুষ্ট করা যায় না। "যৎ পৃথিব্যাং ব্রীহিযবং হিরণ্য পশবঃ স্ত্রিয়ঃ একস্যাপি ন পর্য্যাপ্তম্।" সুতরাং যেটা অসম্ভব সেটাকে সম্ভব করার জন্য অপচেষ্টা, দুশ্চেষ্টা কেন? কি প্রয়োজন আছে? সেইজন্য বলছেন—আশা-আকাঙ্ক্ষা সীমিত কর, শান্তি পাবে। অর্থশাস্ত্রে, অর্থনীতিতে বলা আছে ওটা। আমাদের আশা-আকাঙ্ক্ষা সীমিত করতে হবে। যতই বাড়িয়ে দেব ততই দুঃখ-কষ্ট, ততই মানসিক অশান্তি।

শ্রীচৈতন্যে মর্ত্ত্যবুদ্ধি—নাস্তিকতা ও অপরাধ

[পূর্ব্বপ্রকাশিত ৪৩শ বর্ষ, ১১শ সংখ্যা, ৪৩৭ পৃষ্ঠার পর]

"রক্ত দেখি' ক্রোধে প্রভু বাহ্য নাহি জানে।
'চক্র, চক্র, চক্র'—প্রভু ডাকে ঘনে ঘনে॥
আথে ব্যথে চক্র আসি' উপসন্ন হৈলা।
জগাই মাধাই তাহা নয়নে দেখিলা॥"

(চৈঃ ভাঃ মধ্য ১৩।১৮৫-১৮৬)

অবশ্য নিত্যানন্দ প্রভুর প্রার্থনায় মাতাল জগাই-মাধাইয়ের প্রতি শ্রীমন্মহাপ্রভুর দয়া হইল এবং শ্রীমন্মহাপ্রভুর আজ্ঞায় সুদর্শন চক্র নিবৃত্ত হইয়া স্বস্থানে প্রত্যাবর্ত্তন করিল। যিনি ভক্ত নিত্যানন্দকে রক্ষা করিতে এবং নিত্যানন্দের আঘাতকারীর নিধনের জন্য সুদর্শন চক্রকে স্মরণ করিতে পারেন, তিনি কি নিজকে রক্ষা করিতে ও তাঁহার শত্রু আততায়ীকে বধ করিতে সমর্থ

হইবেন না ? এমন ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতেও কি মহাপ্রভুকে সর্ব্বশক্তিমান্ ভগবান্ বলিয়া লেখকের বিশ্বাস হইতেছে না ?

চাঁদকাজী (মৌলানা সিরাজুদ্দীন) হিন্দুদের খোল ভাঙিয়া দিয়া আসিলে শ্রীচৈতন্যদেব চাঁদকাজীকে স্বপ্নে নৃসিংহ মূর্ত্তি ধারণপূর্ব্বক কাজীর বক্ষের উপর বসিয়া নখাঘাত করিয়া মৃদঙ্গের পরিবর্ত্তে বক্ষ বিদীর্ণ করিবেন বলিলে চাঁদকাজী অত্যন্ত ভীত হইয়া পড়েন এবং তখন তিনি কাজীকে ছাড়িয়া দেন। সেই ভয়ঙ্কর মূর্ত্তির নখচিহ্ন কাজীর বক্ষে বিদ্যমান থাকায় কাজী তাহা সর্ব্বসমক্ষে দেখাইলেন।—

"এত কহি' সিংহ গেল, আমার হৈল ভয়।
এই দেখ নখচিহ্ন আমার হৃদয় ॥
এত বলি' কাজী নিজ-বুক দেখাইল।
শুনি' দেখি' সর্ব্বলোক আশ্চর্য্য মানিল ॥"

(চৈঃ চঃ আদি ১৭।১৮৬-১৮৭)

ভক্তদের খোল ভাঙ্গিয়া দেওয়ার কারণে যিনি নৃসিংহমূর্ত্তি ধারণ করত চাঁদ-কাজীর বক্ষে নখাঘাত করিয়া কাজীর ভীতির সঞ্চার করিতে পারেন, এমন শক্তিধর শ্রীচৈতন্যদেবকে হত্যা করিবার মত কোনও শক্তিধর পুরুষ বা আততায়ী থাকিতে পারে কি ?

শ্রীমন্মহাপ্রভু যখন বৃন্দাবন অভিমুখে যাত্রাকালে ঝারিখণ্ডের অরণ্যপথ দিয়া যাইতেছিলেন, তখন অরণ্যের নরখাদক হিংস্র বন্যজন্তু ব্যাঘ্রও তাঁহাকে আক্রমণ করিতে সাহসী হয় নাই, পরন্তু তাঁহার আদেশে ব্যাঘ্র 'কৃষ্ণ' 'কৃষ্ণ' বলিয়া প্রেমোন্মত্ত হইয়া নৃত্য করিয়াছিল,—

"একদিন পথে ব্যাঘ্র করিয়াছে শয়ন।
আবেশে তার গায়ে প্রভুর লাগিল চরণ ॥
প্রভু কহে,—কহ 'কৃষ্ণ', ব্যাঘ্র উঠিল।
'কৃষ্ণ' 'কৃষ্ণ' কহি' ব্যাঘ্র নাচিতে লাগিল ॥

(চৈঃ চঃ মধ্য ১৭।২৮-২৯)

গভীর অরণ্যের হিংস্র জন্তুও যাঁহাকে দেখিয়া অহিংস মনোভাবাপন্ন হইয়া কৃষ্ণপ্রেমে উন্মত্ত হয় এবং পশু হইয়াও কৃষ্ণনাম উচ্চারণ করিয়া নৃত্য করিতে থাকে, তাঁহাকে কোনও মানুষ আততায়ী নিধন করিয়াছিল—ইহা কি কোনও বুদ্ধিমান্ ও যুক্তিবাদী মানুষ কল্পনা করিতে পারেন ?

শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু অধোক্ষজ হইয়াও জগতের আকর্ষক। যথা, শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত বাণী,—

"অলৌকিক 'প্রকৃতি' তোমার—বুদ্ধি-অগোচর।
তোমা দেখি' কৃষ্ণপ্রেমে জগৎ পাগল॥"

(চৈঃ চঃ মধ্য ১৮।১২০)

শ্রীচৈতন্যদেবের ঐরূপ বহু লীলার বর্ণনা প্রামাণিক গ্রন্থ কৃষ্ণদাস কবিরাজকৃত 'শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে' ও বৃন্দাবনদাস-কৃত 'শ্রীচৈতন্যভাগবতে' বিবৃত থাকা সত্ত্বেও লেখক তাঁহাকে অচিন্ত্যশক্তিমান্ ভগবান্ বলিয়া চিনিতে পারিলেন না। লেখক চৈতন্যদেবকে চিনিবেনই বা কি করিয়া? ভগবান্ চৈতন্যদেবের কৃপা না হইলে কেহ তাঁহাকে চিনিতে পারেন না এবং তাঁহার লীলা বোধগম্যও হয় না। যথা, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত বাণী,—

"অনুমান প্রমাণ নহে ঈশ্বরতত্ত্ব-জ্ঞানে।
কৃপা বিনা ঈশ্বরেরে কেহ নাহি জানে॥
ঈশ্বরের কৃপালেশ হয় ত' যাহারে।
সেই ত' ঈশ্বর-তত্ত্ব জানিবারে পারে॥"

(চৈঃ চঃ মধ্য ৬।৮২-৮৩)

"পাণ্ডিত্যাদ্যে ঈশ্বর-তত্ত্ব-জ্ঞান কভু নহে॥"

(চৈঃ চঃ মধ্য ৬।৮৭)

অপ্রাকৃত তত্ত্ব প্রাকৃত বুদ্ধির অগম্য,—

"অপ্রাকৃত বস্তু নহে প্রাকৃত-গোচর।
বেদ-পুরাণেতে এই কহে নিরন্তর॥" (চৈঃ চঃ মধ্য ৯।১৯৪)

চৈতন্য প্রেমরসে বঞ্চিত কাহারা?—

"মায়াবাদী, কর্ম্মনিষ্ঠ কুতার্কিকগণ।
নিন্দক, পাষণ্ডী, যত পড়ুয়া অধম॥
সেইসব মহাদক্ষ ধাঞা পলাইল।
সেই বন্যা তা-সবারে ছুঁইতে নারিল॥"

(চৈঃ চঃ আদি ৭।২৯-৩০)

এক্ষণে লেখক শ্রীচৈতন্যদেবের কৃপাবঞ্চিত হইয়া তাঁহার স্বরচিত পুস্তকে শ্রীচৈতন্যদেবের আচার-প্রচার লীলা ও ভগবত্তা অনুধাবন করিতে পারেন নাই। শ্রীচৈতন্যদেবই যে পরতত্ত্ব, তৎসম্বন্ধে শ্রীগৌর-পার্ষদ-প্রবর শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতিপাদ "শ্রীশ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্"-গ্রন্থে লিখিয়াছেন,—

"যদি নিগদিত-মীনাদ্যংশবদ্ গৌরচন্দ্রো
ন তদপি স হি কশ্চিচ্ছক্তি লীলা বিকাশঃ।

অতুল সকল শক্ত্যাশ্চর্য্যলীলা প্রকাশৈ-
রনধিগত মহত্ত্বঃ পূর্ণ এবাবতীর্ণঃ ॥"

অর্থাৎ—"যদি বল, গৌরচন্দ্র শ্রুত্যুক্ত মীনাদি অংশাবতারের ন্যায়, বস্তুতঃ তাহা তিনি নহেন ; কেননা, মৎস্যাদি অংশাবতার কোন এক বিশেষ শক্তি ও লীলার প্রকাশ মাত্র। কিন্তু এই অবিদিত-মহিম গৌরচন্দ্র অপ্রতিম-সর্ব্বশক্তিসমন্বিত আশ্চর্য্য লীলা প্রকাশ করিয়া নিশ্চয়ই পরিপূর্ণরূপে অবতীর্ণ।"

প্রসঙ্গতঃ আরও জানাইতেছি যে তথাকথিত ঐতিহাসিকগণ তত্ত্ববস্তু বিচার করিতে পারে না ; কেননা, পার্থিব রাজ্যের বাহিরের কোন কথায় তাহারা আস্থা স্থাপন করিতে সমর্থ হয় না। অচিন্ত্যশক্তিমান্ স্বয়ং ভগবান্ শ্রীচৈতন্যদেবের অতিমর্ত্ত্য অলৌকিক কাহিনী ঐতিহাসিকেরা বুঝিতে পারেন না। ঐতিহাসিকের দৃষ্টিভঙ্গীতে শাস্ত্র বুঝিতে গেলে তাহাদের অসৎবিচারগুলি আমাদের হৃদয়কে কলুষিত করিবে, ফলে তত্ত্ববস্তু বুঝিতে সমর্থ হইব না। তাই লেখক ঐতিহাসিকের দৃষ্টিভঙ্গীতে চৈতন্যতত্ত্ব বুঝিতে গিয়া চৈতন্যবিরোধী হইয়া তাঁহার ভগবত্তায় সন্দেহ পোষণ করিয়াছেন।

(১৯) লেখক পুস্তকের ৩২৪ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন,—"কিন্তু প্রশ্ন হলো, জগন্নাথের দারু অঙ্গে বিলীন হয়ে যাওয়া জনিত চৈতন্যের অন্তর্হিত হবার একটা কারণ আমরা পাচ্ছি। যদিও সেটা অভূতপূর্ব অলৌকিক। কিন্তু গদাধর কোন্ পরিপ্রেক্ষিতে অন্তর্হিত হলেন তা আমরা জান্‌তে পারি না।"

লেখকের উক্ত বক্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে ইহা প্রতীতি হয় যে, লেখক জগন্নাথের শ্রীঅঙ্গে শ্রীচৈতন্যের বিলীন হওয়ার কারণ উপলব্ধি করিয়াছেন ; কিন্তু গদাধরের অন্তর্দ্ধান সম্বন্ধে জানিতে পারেন নাই।

মহাপ্রভু চৈতন্যদেবের অন্তর্দ্ধানের সময় কেহ কেহ তাঁহাকে জগন্নাথদেবের দেহে বিলীন হইতে দেখেন ; আবার সেই একই সময়ে কোন কোন ভক্ত তাঁহাকে গোপীনাথ-মন্দিরে প্রবেশপূর্ব্বক অদর্শন হইতে দেখেন। এইভাবে মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেব জগন্নাথ-দেহে ও গোপীনাথ-দেহে একই সময়ে সেই সেই স্থানের ভক্তবৃন্দের সমক্ষে সশরীরে অদৃশ্য হইয়াছিলেন। শ্রীমহাপ্রভুর অপ্রকট-লীলা সম্পর্কে শ্রীভক্তিরত্নাকরে লিখিত আছে,—

"প্রবেশিলা এই গোপীনাথের মন্দিরে।
হৈলা অদর্শন পুনঃ না আইলা বাহিরে ॥" (ভঃ রঃ ৮।৩৫৭)

লেখক পুস্তকটি লিখিবার সময় 'ভক্তিরত্নাকর' গ্রন্থের সাহায্য লইয়াছেন, কিন্তু উক্ত বিষয় তাঁহার দৃষ্টির আড়ালে থাকিয়া গিয়াছে। ঐ পরিচ্ছেদ পাঠ

করিলে লেখক জানিতে পারিবেন যে, মহাপ্রভুর অন্তর্দ্ধানের পর তাঁহার ইচ্ছামত পণ্ডিত গদাধর গোস্বামী কিছুদিন প্রকট থাকিবার পর অপ্রকট-লীলা প্রকাশ করেন।

"শ্রীনিবাসে বিদায় করিয়া বৃন্দাবনে।
হইয়া ব্যাকুল বসিলেন এইখানে ॥
দিনে দিনে সে কোমল তনু হইল ক্ষীণ।
নেত্রজলে ধরণী সিঞ্চয়ে রাত্রিদিন ॥
অগ্নিশিখা প্রায় দীর্ঘ নিঃশ্বাস সঘনে।
অকস্মাৎ সঙ্গোপন হইলা এইখানে ॥" (ভঃ রঃ ৮।৩৭১-৩৭৩)

আষাঢ় মাসে অমাবস্যা-তিথিতে শ্রীজগন্নাথদেবের রথযাত্রার পূর্ব্বে পুরীধামে শ্রীটোটা গোপীনাথের শ্রীমন্দিরে শ্রীগদাধর পণ্ডিত গোস্বামী প্রভু অপ্রকট হইয়াছিলেন।

এক্ষণে প্রশ্ন হইতে পারে, শ্রীমন্মহাপ্রভু একজন ব্যক্তি হইয়া একই দিনে একই সময়ে জগন্নাথ-মন্দিরে ও গোপীনাথ-মন্দিরে—এই দুই স্থানে কিভাবে বিরাজ করিতে পারেন ? তদুত্তর এই যে, শ্রীমন্মহাপ্রভু স্বয়ং ভগবান্ হওয়ায় তাঁহার পক্ষে সবই সম্ভব। উদাহরণ-স্বরূপে বলা যায়—শ্রীমন্মহাপ্রভু জগন্নাথের রথাগ্রে নর্ত্তনের সময় নিজগণকে সাত সম্প্রদায়ে বিভক্ত করিয়া চৌদ্দ মাদলে কীর্ত্তন আরম্ভ করেন। এই সময় শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু নিজ শক্তিপ্রকাশপূর্ব্বক সপ্তবিগ্রহ হইয়া প্রত্যেক সম্প্রদায়ে আপনাকে প্রকাশ করিয়াছিলেন। প্রত্যেক সম্প্রদায়ের লোকেরা দেখেন যে 'প্রভু আমার সম্প্রদায়েই বিরাজ করিতেছেন, অন্য সম্প্রদায়ে নাই।' যথা, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত-বাণী,—

"সাত ঠাঞি বুলে প্রভু 'হরি' 'হরি' বলি'।
'জয় জগন্নাথ', বলেন হস্তযুগ তুলি' ॥
আর এক শক্তি প্রভু করিল প্রকাশ।
এককালে সাত ঠাঞি করিল বিলাস ॥
সবে কহে,—প্রভু আছেন মোর সম্প্রদায়।
অন্য ঠাঞি নাহি যা'ন আমারে দয়ায় ॥
কেহ লখিতে নারে প্রভুর অচিন্ত্য-শক্তি।
অন্তরঙ্গ-ভক্ত জানে, যাঁর শুদ্ধভক্তি ॥"

(চৈঃ চঃ মধ্য ১৩।৫১-৫৪)

শ্রীমন্মহাপ্রভু যেরূপ সপ্তবিগ্রহ হইয়া সাত সম্প্রদায়ে একই সময়ে প্রকাশ পাইয়াছিলেন, সেইরূপ তিনি দুই বিগ্রহ হইয়া একই সময়ে জগন্নাথ-মন্দিরে ও গোপীনাথ-মন্দিরে বিরাজিত ছিলেন—ইহা নিঃসন্দেহে বলা যায়। শ্রীচৈতন্যদেবের শরীর ভূতাতীত অপ্রাকৃত বলিয়া বিনাশ হইবার সম্ভাবনা নাই এবং তিনি সশরীরেই অদৃশ্য হন বা লোকলোচনের অন্তরালে গমন করেন।

—**শ্রীচৈতন্যকৃষ্ণ দাসাধিকারী**

পাষণ্ডী কে ?

পাষণ্ড ও পাষণ্ডী দুইটী সমার্থক শব্দ। 'পাষণ্ড' শব্দের অর্থ করিতে গিয়া শ্রীভাগবত বলিয়াছেন,—

'তানি পাপস্য ষণ্ডানি লিঙ্গং ষণ্ডমিহোচ্যতে।' (ভাঃ ৪।১৯।২৩)

"শাস্ত্রে 'ষণ্ড' শব্দে 'চিহ্ন'কে লক্ষ্য করে, অতএব 'পাষণ্ড' শব্দে পাপচিহ্নকে নির্দ্দেশ করে।" উপরোক্ত শ্লোকের টীকায় শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর লিখিয়াছেন, —"পাষণ্ড নাম নির্ব্বক্তিঃ—যানীতি। বহুবচনেন বহব এব পাষণ্ড প্রভেদাঃ প্রবৃত্তা ইত্যুক্তম্।" 'পাষণ্ডী' বলিতে বেদবিরুদ্ধ আচারবান্, সদাচারভ্রষ্ট, নাস্তিক, অধার্ম্মিক প্রভৃতিকে বুঝায়। বাস্তবিকপক্ষে পাষণ্ডিগণের দ্বারা অমঙ্গল ব্যতীত জগতের কোন উপকার সাধিত হয় না। কথায় বলে,"—অধর্ম্মবিষবৃক্ষস্য পচ্যতে স্বাদু কিং ফলম্?" অর্থাৎ অধর্ম্মরূপ বিষবৃক্ষে কি সুমিষ্ট ফল ফলে? বিষবৃক্ষের ফল খাইলে যেরূপ বাঁচিবার কোন আশা থাকে না, তদ্রূপ পাষণ্ডিগণের সঙ্গ করিলে ভবসিন্ধু উত্তীর্ণ হইবার কোন সম্ভাবনা থাকে না। "অসৎ কার্য্যের বিপরীত ফলের" ন্যায় পাষণ্ডীর কার্য্যের ফল কখনই শুভ হইতে পারে না। পাষণ্ডিগণ 'কুকুরের লেজের' ন্যায় তাহাদের স্বভাবানুযায়ী বৈষ্ণবগণের নিন্দা ও অপমান করিয়াও নিজেদের কেউকেটা মনে করে। ফলস্বরূপে তাহারা ভবসমুদ্রে পতিত হইয়া হাবুডুবু খাইয়া জীবনের পরিসমাপ্তি করিতে বাধ্য হয়। তথাপি পরদুঃখদুঃখী বৈষ্ণবগণ সমস্ত নিন্দা ও অপমান উপেক্ষা করিয়াও তাহাদের মঙ্গলের নিমিত্ত পরমকরুণাময় ভগবানের নিকট প্রার্থনা করেন।

পাষণ্ডিগণ দুর্ব্বুদ্ধিক্রমে ভগবল্লীলার নিত্যত্ব উপলব্ধি না করিয়া নিত্যভক্তি-তত্ত্বকেও কালদ্বারা খণ্ডিত ও অনিত্য কর্ম্মমাত্র মনে করে। ভগবদ্বিমুখতা প্রবল হইলে পাপীগণ শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনরূপ ঔষধ গ্রহণে পরাঙ্মুখ হয়। নাম-কীর্ত্তনের

বিরোধ-ভাব-পোষক জনগণ সর্ব্বদা জ্বলিয়া পুড়িয়া ক্লিষ্ট থাকে এবং ঈর্ষান্বিত হইয়া স্বীয় গাত্রদাহ নিবারণের নিমিত্ত ভগবদ্ভক্তের বিদ্বেষ করিয়া থাকে। মায়াবশ জীব অথবা মায়িক জড়বস্তুর সহিত মায়াধীশ শুদ্ধসত্ত্ব চেতন বিগ্রহ শ্রীবিষ্ণুর 'এক' বা সমজ্ঞানকারীই 'পাষণ্ডী'। যাহারা মায়াধীশ বিষ্ণুতত্ত্বের সহিত মায়াবশ শিবাদি তত্ত্বের সাম্য কল্পনা করে ; তাহারাও 'পাষণ্ডী' সংজ্ঞায় সংজ্ঞিত। কৃষ্ণ-কীর্ত্তনের সহিত ইতর দেবগণের নামোচ্চারণ সমপর্য্যায়ে গণনা করাই পাষণ্ডীর স্বভাব। এই প্রসঙ্গে শাস্ত্রে পাওয়া যায়,—

যস্তু নারায়ণং দেবং ব্রহ্মরুদ্রাদিদৈবতৈঃ।
সমত্বেনৈব বীক্ষেত স পাষণ্ডী ভবেদ্ধ্রুবম্॥ (হঃ ভঃ বিঃ ১।৭৩)

"যিনি ব্রহ্ম-রুদ্রাদি দেবতার সহিত শ্রীনারায়ণকে সমান করিয়া দেখেন, তিনি নিশ্চয়ই পাষণ্ডী।"

শাস্ত্রের বিভিন্নস্থানে 'পাষণ্ড' শব্দের ব্যবহার দেখা যায়। যাহারা বেদসম্মত কার্য্য পরিত্যাগ করিয়া অন্য কর্ম্মে নিযুক্ত থাকে, তাহারা পাষণ্ডীর মধ্যে পরিগণিত। শাস্ত্রে পাওয়া যায়,—

যো বেদসম্মতং কার্য্যং ত্যক্ত্বান্যৎ কর্ম্মকুর্ব্বতে।
নিজাচারবিহীনা যে পাষণ্ডাস্তে প্রকীর্ত্তিতাঃ॥
(পাদ্ম-ক্রিয়াযোগসার ১০ম অধ্যায়)

শ্রুতিশাস্ত্রনিন্দনকারীও পাষণ্ডী। যেমন :—

যথা পাষণ্ড-মার্গেণ দত্তাত্রেয়র্ষভদেবোপসকানাং পাষণ্ডিনাম্।
(শ্রীভক্তিসন্দর্ভ ২৫৫ সংখ্যা)

শ্রীভক্তিসন্দর্ভে (১৫৩ সংখ্যায়) হরিনামে অর্থবাদ ও বৈষ্ণবাপরাধ বর্ণন করিতে গিয়া বলিয়াছেন,—"তাদৃশাপরাধে ভক্তিস্তন্তশ্চ শ্রূয়তে। * * * দেহাদি-লোভার্থং যে পাষণ্ডা গুর্ব্বজ্ঞাদিদশাপরাধযুক্তাঃ।" শ্রীভক্তিসন্দর্ভে (২৫৫ সংখ্যা) দশাপরাধের অন্যতম অপরাধ 'অহং-মম বুদ্ধি' বা দেহাত্মবুদ্ধি বর্ণন প্রসঙ্গে পাওয়া যায়,—"দেহ-দ্রবিণাদি-নিমিত্তক-'পাষণ্ড' শব্দেন চ দশাপরাধা তব লক্ষ্যন্তে পাষণ্ডময়ত্বাৎ তেষাম্।" পাষণ্ডী কিরূপ ও তাহাদের চিহ্ন কি ? এই প্রসঙ্গে বৈষ্ণবশ্রেষ্ঠ শম্ভু বলিয়াছেন,—

যেঽন্যং দেবং পরত্বেন বদন্ত্যজ্ঞানমোহিতাঃ।
নারায়ণাজ্জগন্নাথাত্তে বৈ পাষণ্ডিণস্তথা॥
কপালভস্মাস্থিধরা যে হ্যবৈদিকলিঙ্গিণঃ।
ঋতে বনস্থাশ্রমাচ্চ জটাবল্কলধারিণঃ॥

অবৈদিকক্রিয়োপেতাস্তে বৈ পাষণ্ডিণস্তথা ।
শঙ্খচক্রোর্দ্ধপুণ্ড্রাদিচিহ্নৈঃ প্রিয়তমৈর্হরেঃ ॥
রহিতা যে দ্বিজা দেবি তে বৈ পাষণ্ডিণঃ স্মৃতাঃ ।
শ্রুতিস্মৃত্যুদিতাচারং যস্তু নাচরতি দ্বিজঃ ॥
সমস্তযজ্ঞভোক্তারং বিষ্ণুং ব্রহ্মণ্যদৈবতম্ ।
উদ্দিশ্য দেবতা এব জুহোতি চ দদাতি চ ।
স পাষণ্ডীতি বিজ্ঞেয়ঃ স্বতন্ত্রো বাপি কর্ম্মসু ॥
অবস্থাত্রিতয়ে যস্তু মনোবাক্কায়কর্ম্মভিঃ ।
বাসুদেবং ন জানাতি স পাষণ্ডী ভবেদ্দ্বিজঃ ॥
অবৈষ্ণবস্তু যো বিপ্রঃ স পাষণ্ড প্রকীর্ত্তিতঃ ॥

(পাদ্মোত্তর ৯২-৯৩ অধ্যায়)

যাহারা পরমবৈষ্ণব শম্ভুকে স্বতন্ত্র ভগবান্‌জ্ঞানে উপাসনা করে, তাহারা অবশ্যই পাষণ্ডী। এই প্রসঙ্গে ভৃগু শিবানুচর নন্দীকে অভিশাপ প্রদান করিতে গিয়া বলিয়াছেন,—

ভবব্রতধরা যে চ যে চ তান্ সমনুব্রতাঃ ।
পাষণ্ডিনস্তে ভবন্তু সচ্ছাস্ত্রপরিপন্থিনঃ ॥　(ভাঃ ৪।২।২৮)

"যাহারা শিবব্রত ধারণ করিবে কিংবা যাহারা শিবব্রতধারি-ব্যক্তিগণের অনুবর্ত্তী হইবে, তাহারা সৎশাস্ত্রের প্রতিকূলাচারী হওয়ায় পাষণ্ড হউক।"

ব্রহ্ম চ ব্রাহ্মণানাংশ্চৈব যদ্‌যূয়ং পরিনিন্দথ ।
সেতুং বিধরণং পুংসামতঃ পাষণ্ডমাশ্রিতাঃ ॥　(ভাঃ ৪।২।৩০)

"হে শিবানুচর! তোমরা যেহেতু বর্ণাশ্রমিপুরুষগণের মর্য্যাদারূপ সেতুর ধারক, বেদ ও বেদমার্গানুসারী ব্রাহ্মণগণের নিন্দা করিলে, সেই কারণে পাষণ্ড ধর্ম্মাশ্রিত হইবে।"

তদ্‌ব্রহ্ম পরমং শুদ্ধং সতাং বর্ত্ম সনাতনম্ ।
বিগর্হ্য যাত পাষণ্ডং দৈবং বো যত্র ভূতরাট্ ॥　(ভাঃ ৪।২।৩২)

"যেহেতু সেই পরম বিশুদ্ধ সাধুদিগের অবলম্বনীয় বর্ত্মস্বরূপ বেদের নিন্দা করিলে, অতএব তোমরা যেস্থানে তামস ভূতগণের পতি অবস্থান করিতেছে, সেই স্থানে গমনপূর্ব্বক সেই পাষণ্ড দেবতাকে প্রাপ্ত হও।"

পাষণ্ডিগণের সঙ্গক্রমে জীবের প্রয়োজনীয় বস্তু কৃষ্ণভক্তি অন্তর্হিত হইয়া যায়। জানিয়া শুনিয়া যেরূপ কেহ বিষপান করিয়া আত্মহত্যা করিতে চাহেন না, তদ্রূপ বুদ্ধিমানগণ পাষণ্ডিগণের ফাঁদে পা রাখিয়া ভববন্ধন দৃঢ় হইতে দৃঢ়তর করেন না। গুরু-বৈষ্ণবগণের আনুগত্যে কৃষ্ণভজন করিলে পাষণ্ডিগণ কাহারও কোন ক্ষতি করিতে পারিবে না—এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।

—শ্রীবলভদ্র দাস ব্রহ্মচারী

আত্মরক্ষা

জেগো রে মন জেগো।
করোনা তাহার সঙ্গ কভু কপট শঠ যে গো।
ওগো কৃষ্ণকথা শুনে,
আর একদিকে কান যে ফিরায় গান ধরে গুন্‌গুনে
কাল্ ভুজঙ্ সে গো
জেগো রে মন জেগো!
ও যার মুখে নাইকো কৃষ্ণকথা বল্‌ছে আমি ভক্ত
গুরুর কৃপার জোরে,
তাহার মানস বড়ই জেনো শক্ত
তাহার সঙ্গ কর্ব্বে নাকো গেলেও তুমি ম'রে,
কইবে কথা মুখে, স্থান দিও না বুকে
কথায় তাহার কভুও নাহি রেগো,
জেগো রে মন জেগো।
ও যার প্রতিষ্ঠাশা বেজায়, (বল) তাহার কাছে কে যায়,
সে যে ঘুরছে সদা কেমন করে প্রতিষ্ঠাকে পাবে,
ফল্গু বিরাগ ভাবে।
ধিক্‌রে তাহার জীবন, কর্‌ছে না যে সেবন,
হরির।
ঘুরছে পিছন হরিণপারা, সেই প্রতিষ্ঠাপরীর।
ভক্তি থেকে পড়ে আছে দূরে বহুৎ যোজন।
এক কথাতেই বুঝবে তাহার ওজন
(ও মন) এমন যাহার ধরণ,
পালিয়ে যাবে সেলাম্ করে চালিয়ে জোরে চরণ।
বিষের আকর তাহার কাছে
কিছুই নাহি মেগো।
জেগো ও মন জেগো।

—শ্রীনারায়ণদাস চট্টোপাধ্যায়

॥ শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ ॥

শ্রীশ্রীনবদ্বীপধাম-পরিক্রমা

ও

শ্রীগৌরজন্ম-মহোৎসব

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি
(রেজিষ্টার্ড)
ফোন ঃ নব-২৪৭

শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠ,
তেঘরিপাড়া, পোঃ নবদ্বীপ ;
জেলা—নদীয়া (পশ্চিমবঙ্গ)।

সাদর সম্ভাষণপূর্ব্বক নিবেদন—

কলিযুগ-পাবনাবতারী স্বয়ং ভগবান্ **শ্রীশ্রীশচীনন্দন গৌরহরির** নিখিল ভুবন-মঙ্গলময়ীয় **আবির্ভাব-তিথিপূজা** (ফাল্গুনী-পূর্ণিমা) উপলক্ষে শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির প্রতিষ্ঠাতা-নিয়ামক নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ **১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজের** শুভাশীর্ব্বাদে উপরিউক্ত ঠিকানায় আগামী ২৯শে ফাল্গুন, ১৩৯৮ (ইং ১৩।৩।৯২) শুক্রবার হইতে ৫ই চৈত্র, '৯৮ (ইং ১৯।৩।৯২) বৃহস্পতিবার পর্য্যন্ত এক সপ্তাহব্যাপী বিরাট **মহোৎসবের** অনুষ্ঠান হইবে। এই মহদনুষ্ঠানে প্রত্যহ পাঠ, বক্তৃতা, কীর্ত্তন, ইষ্টগোষ্ঠী, শ্রীবিগ্রহ-সেবা, **মহাপ্রসাদ বিতরণা**দি বিবিধ ভক্ত্যঙ্গসমূহ যাজিত হইয়া থাকে।

বিশেষতঃ এতদুপলক্ষে **শ্রীনবদ্বীপধামের** অন্তর্গত নয়টী (৯টী) দ্বীপ দর্শন, তত্তৎস্থান মাহাত্ম্যকীর্ত্তন ও নগরসঙ্কীর্ত্তন-মুখে **ষোলক্রোশ শ্রীধামপরিক্রমা** হইবে।

ধর্ম্মপ্রাণ সজ্জন মহোদয়গণ উক্ত শুদ্ধভক্ত্যনুষ্ঠানে সবান্ধবে যোগদান করিলে সমিতির সদস্যবর্গ পরমানন্দিত ও উৎসাহিত হইবেন। এই মহদনুষ্ঠানের গুরুত্ব উপলব্ধি করিয়া প্রাণ, অর্থ, বুদ্ধি ও বাক্যদ্বারা সমিতির সেবাকার্য্যে সহানুভূতি প্রদর্শন করিলে ভক্ত্যুন্মুখী সুকৃতি অর্জ্জিত হইবে।

শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর জন্মোৎসব এবং **শ্রীধাম নবদ্বীপ-পরিক্রমাপঞ্জী পরপৃষ্ঠায় প্রদত্ত হইল।** ইতি—২৯শে মাঘ, '৯৮

শুদ্ধভক্ত-কৃপালেশপ্রার্থী—

সভ্যবৃন্দ,
শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি

দ্রষ্টব্য ঃ কোন বিষয়ে বিস্তারিত জানিতে বা সাহায্যাদি পাঠাইতে ইচ্ছা করিলে উক্ত সমিতির **"সাধারণ-সম্পাদক"** -এঁর নামে উল্লিখিত ঠিকানায় জ্ঞাতব্য ও প্রেরিতব্য।

শ্রীগৌরধাম-পরিক্রমা ও জন্মোৎসব-পঞ্জী

১। ২৯শে ফাল্গুন (ইং ১৩।৩।৯২), শুক্রবার ;—(১) **শ্রীগোদ্রুমদ্বীপ** (কীর্ত্তনাখ্য)—গঙ্গাস্পর্শনান্তে শ্রীগৌর-যোগপীঠ শ্রীধাম-মায়াপুর উদ্দেশ্যে দণ্ডবৎ-প্রণত হইয়া স্বরূপগঞ্জ, গাদিগাছা, সুরভীকুঞ্জ, স্বানন্দ-সুখদ-কুঞ্জ, সুবর্ণ-বিহার, হরিহরক্ষেত্র, **নৃসিংহপল্লী** ; এবং (২) **শ্রীমধ্যদ্বীপ** (স্মরণাখ্য)—মাজিদা, হাটডাঙ্গা, আনন্দবাস, বামনপুরা, হংসবাহন।

২। ৩০শে ফাল্গুন (ইং ১৪।৩।৯২), শনিবার ;—(৩) **শ্রীকোলদ্বীপ** (পাদ-সেবনাখ্য)—গদখালির কোল, তেঘরির কোল, কোলের আমাদ, কোলের গঞ্জ, কোলের দহ, সমুদ্রগড়, চাঁপাহাটি ; এবং (৪) **শ্রীঋতুদ্বীপ** (অর্চ্চনাখ্য)—রাতুপুর।

৩। ১লা চৈত্র (ইং ১৫।৩।৯২), রবিবার ;—(৫) **শ্রীজহ্নুদ্বীপ** (বন্দনাখ্য)—জান্নগর (জহ্নুমুনিস্থান), বিদ্যানগর (সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যের পাট) ; এবং (৬) **শ্রীমোদদ্রুমদ্বীপ** (দাস্যাখ্য)—**মামগাছি** (শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুরের পাট), অর্কটীলা বা একডালা, মাতাপুর (পঞ্চপাণ্ডবের অজ্ঞাতবাস)।

৪। ২রা চৈত্র (ইং ১৬।৩।৯২), সোমবার ;—(৭) **শ্রীরুদ্রদ্বীপ** (সখ্যাখ্য) —রুদ্রপাড়া, শঙ্করপুর, ইন্দ্রাকপুর ও গঞ্জের ডাঙ্গা ; এবং (৮) **শ্রীসীমন্তদ্বীপ** (শ্রবণাখ্য)—শিমুলিয়া, শরডাঙ্গা, শোণডাঙ্গা, মেঘার চড়, বেলপুকুর ; অতঃপর শহর নবদ্বীপস্থ শ্রীল জগন্নাথদাস বাবাজী মহারাজের সমাধি, পোড়ামাতলা (প্রৌঢ়া-মায়াস্থান)।

৫। ৩রা চৈত্র (ইং ১৭।৩।৯২), মঙ্গলবার ;—(৯) **শ্রীঅন্তর্দ্বীপ** (আত্ম-নিবেদনাখ্য)—শ্রীধাম মায়াপুরে শ্রীগৌর-জন্মভিটা, শ্রীবাস-অঙ্গন, শ্রীঅদ্বৈত-ভবন, শ্রীচৈতন্যমঠ (শ্রীচন্দ্রশেখর আচার্য্য-ভবন), জগদ্গুরু শ্রীল প্রভুপাদের সমাধি-মন্দির, শ্রীধর-অঙ্গন ও শ্রীমুরারী গুপ্তের পাট, চাঁদকাজির সমাধি প্রভৃতি দর্শনান্তে মঠে প্রত্যাবর্ত্তন।

৬। ৪ঠা চৈত্র (ইং ১৮।৩।৯২), বুধবার ;—**শ্রীগৌরজন্মোৎসব**।

৭। ৫ই চৈত্র (ইং ১৯।৩।৯২), বৃহস্পতিবার ;—**সাধারণ-মহোৎসব (মহাপ্রসাদ বিতরণ)**।

জ্ঞাতব্য ঃ—পরিক্রমায় যোগদানেচ্ছু যাত্রিগণ মশারীসহ বিছানা এবং হাল্কা থালা ও ঘটি অবশ্যই সঙ্গে আনিবেন এবং ২৮শে ফাল্গুন (ইং ১২।৩।৯২) বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় শ্রীমঠে উপস্থিত হইবেন। এতদ্ব্যতীত উক্ত দিবসের পূর্ব্বেই কেহ মঠে আসিলে থাকার ও প্রসাদাদির ব্যবস্থা করা সম্ভব হইবে না।

শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকার নিয়মাবলী

১। **"শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা"** প্রতিবৎসর দ্বাদশ মাসে দ্বাদশ সংখ্যা প্রকাশিত হইবেন। ফাল্গুন মাস হইতে মাঘ মাস পর্য্যন্ত ইহার বর্ষ গণনা করা হয়। প্রতি মাসের অন্তিম দিবসের মধ্যেই শ্রীপত্রিকা প্রকাশিত হন।

২। সাধারণ ডাকযোগে "শ্রীপত্রিকা" গ্রহণ করিতে আগ্রহী হইলে বার্ষিক ভিক্ষা ২৫·০০ টাকা ও ষান্মাসিক ১৪·০০ টাকা এবং আজীবন সদস্যপক্ষে ১০০১·০০ টাকা অগ্রিম প্রেরিতব্য। ভারত ও বিদেশবাসী সকলের পক্ষেই ভারতীয় মুদ্রা দেয়। ভি. পি. তে লইতে হইলে অতিরিক্ত খরচ গ্রাহকগণের স্বীকার্য্য।

৩। যে-কোনও সময়ে শ্রীপত্রিকার গ্রাহক হইতে পারিবেন। অতীত সংখ্যা লইতে হইলে প্রকাশকের সহিত পৃথক বন্দোবস্ত করিতে হয়।

৪। গ্রাহকগণ ঠিকানা পরিষ্কার করিয়া লিখিবেন। ঠিকানা পরিবর্ত্তন করিতে হইলে সত্বর প্রকাশকের নিকট জানাইবেন। **সর্ব্বদা গ্রাহক-নম্বর উল্লেখ করিবেন। পত্রের উত্তর পাইতে ইচ্ছা করিলে জোড়া পোষ্টকার্ড বাঞ্ছনীয়।**

৫। **শ্রীপত্রিকার কোন সংখ্যা না পাইলে পরবর্ত্তী মাসের মধ্যেই জানাইবেন।**

৬। শ্রীমন্মহাপ্রভুর আচরিত ও প্রচারিত শিক্ষা-সম্বন্ধে প্রবন্ধাদি পাঠাইলে তাহা সাদরে গৃহীত হইয়া থাকে। অমনোনীত প্রবন্ধ ফেরৎ পাঠান হয় না। ঈর্ষামূলে আক্রমণ-সূচক প্রবন্ধাদি শ্রীপত্রিকায় প্রকাশিত হইবে না। সৎ-আলোচনা সর্ব্বদা আদরণীয়।

৭। কোনও কিছু জানিতে বা টাকাকড়ি পাঠাইতে হইলে **'কার্য্যাধ্যক্ষ'** অথবা **'প্রকাশক'** শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা কার্য্যালয়, শ্রীবিনোদবিহারী গৌড়ীয় মঠ; ২৮, হালদার বাগান লেন; কলিকাতা-৭০০০০৪ ঠিকানায় জানিতে বা পাঠাইতে হইবে।

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির প্রকাশিত শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থাবলী

১। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা, ২। সিদ্ধান্তরত্নম্ (ভাষ্য-পীঠকম্), ৩। শ্রীচৈতন্যশিক্ষাষ্টক, ৪। শ্রীগৌড়ীয়-গীতিগুচ্ছ, ৫। মায়াবাদের জীবনী, ৬। শরণাগতি, ৭। শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী-চরিত, ৮। শ্রীশ্রীনবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্যম্ (প্রমাণখণ্ড), ৯। সৎক্রিয়াসার-দীপিকা ও সংস্কার-দীপিকা, ১০। শ্রীশ্রীনবদ্বীপ-শতকম্, ১১। শ্রীনবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য, ১২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা, ১৩। জৈবধর্ম্ম (বাংলা ও হিন্দী), ১৪। বিজনগ্রাম ও সন্ন্যাসী, ১৫। শ্রীদামোদরাষ্টকম্, ১৬। অর্চ্চন-দীপিকা, ১৭। শ্রীশ্রীচৈতন্যলীলা ও শিক্ষা, ১৮। শ্রীগৌরাঙ্গ, ১৯। শ্রীচৈতন্য-পঞ্জিকা, ২০। শ্রীএকাদশী-ব্রতকথা, ২১। শ্রীহরিনাম-চিন্তামণি, ২২। উদ্ধারের পথ, ২৩। শ্রীনবদ্বীপ-ভাবতরঙ্গ, ২৪। শ্রীমনঃশিক্ষা, ২৫। শ্রীউপদেশামৃতম্, ২৬। তত্ত্বমুক্তাবলী (যুক্তিমল্লিকাসহ), ২৭। **Shri Chaitanya Mahaprabhu**, ২৮। **The Bhagavat**, ২৯। **Nam-Bhajan**, ৩০। **The Vedanta**, ৩১। **Vaishnavism**, ৩২। **Rai Ramananda**, ৩৩। শ্রীশ্রীকৃষ্ণপ্রেম-তরঙ্গিণী ৩৪। শ্রীচৈতন্যদেবের বৈশিষ্ট্য।

Central Regd. No. R. N. 5111/57
Postal Regd No. W. B/NDA-13

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির পরিচালিত

শুদ্ধভক্তি প্রচারকেন্দ্রসমূহ

১। শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠ—তেঘরিপাড়া, নবদ্বীপ পোঃ (নদীয়া)।
২। শ্রীউদ্ধারণ গৌড়ীয় মঠ—চৌমাথা, চুঁচুড়া পোঃ (হুগলী)।
৩। শ্রীকেশবজী গৌড়ীয় মঠ—কংসটীলা, মথুরা পোঃ, (মথুরা), ইউ. পি.।
৪। শ্রীরূপ-সনাতন গৌড়ীয় মঠ—দানগলি, বৃন্দাবন পোঃ, (মথুরা) ইউ. পি.।
৫। শ্রীগোপীনাথজী গৌড়ীয় মঠ—রাণাপতঘাট, বৃন্দাবন পোঃ, (মথুরা) ইউ. পি.।
৬। শ্রীভক্তিবেদান্ত গৌড়ীয় মঠ—সন্ন্যাস রোড্, কন্খল পোঃ, (হরিদ্বার) ইউ. পি.
৭। শ্রীনীলাচল গৌড়ীয় মঠ—গৌরবাটসাহি, পুরী পোঃ, (পুরী), উড়িষ্যা।
৮। শ্রীবিনোদবিহারী গৌড়ীয় মঠ—২৮, হালদার বাগান লেন, কলিকাতা-৪।
৯। শ্রীগোলোকগঞ্জ গৌড়ীয় মঠ—গোলকগঞ্জ পোঃ (ধুবড়ী), আসাম।
১০। শ্রীনরোত্তম গৌড়ীয় মঠ—অরবিন্দ লেন, পোঃ ও জেলা কোচবিহার।
১১। শ্রীগোপালজী গৌড়ীয় প্রচারকেন্দ্র—রান্দিয়াহাট পোঃ, (বালেশ্বর) উড়িষ্যা।
১২। শ্রীকেশব গোস্বামী গৌড়ীয় মঠ—শক্তিগড়, শিলিগুড়ি পোঃ, (জলপাইগুড়ি)।
১৩। শ্রীপিছলদা গৌড়ীয় মঠ ও পাদপীঠ—আশুতিয়াবাড় পোঃ, (মেদিনীপুর)।
১৪। শ্রীসিদ্ধবাটী গৌড়ীয় মঠ—সিধাবাড়ী, রূপনারায়ণপুর পোঃ, (বর্দ্ধমান)।
১৫। শ্রীবাসুদেব গৌড়ীয় মঠ—বাসুগাঁও পোঃ, (কোকড়াঝাড়) আসাম।
১৬। শ্রীমেঘালয় গৌড়ীয় মঠ—তুরা পোঃ, (ওয়েষ্ট গারো হিলস্) মেঘালয়।
১৭। শ্রীশ্যামসুন্দর গৌড়ীয় মঠ—মিলনপল্লী, শিলিগুড়ি পোঃ, (দার্জ্জিলিং)।
১৮। শ্রীমদনমোহন গৌড়ীয় মঠ—মাথাভাঙ্গা পোঃ (কোচবিহার)।
১৯। শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত চতুষ্পাঠী—মণিপুর, নবদ্বীপ পোঃ, (নদীয়া)।
২০। শ্রীত্রিগুণাতীত সমাধি আশ্রম—দথালি, নবদ্বীপ পোঃ, (নদীয়া)।
২১। শ্রীগৌড়ীয় দাতব্য চিকিৎসালয়—তেঘরিপাড়া রোড্, নবদ্বীপ (নদীয়া)।

BOOK-POST SL. No.

To

From—
Ph. 33-8973
Shri Goudiya-Patrika Office [redacted]
SHRI BINODE BEHARI GOUDIYA MATH
28, Halder Bagan Lane
Calcutta-700004